"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)
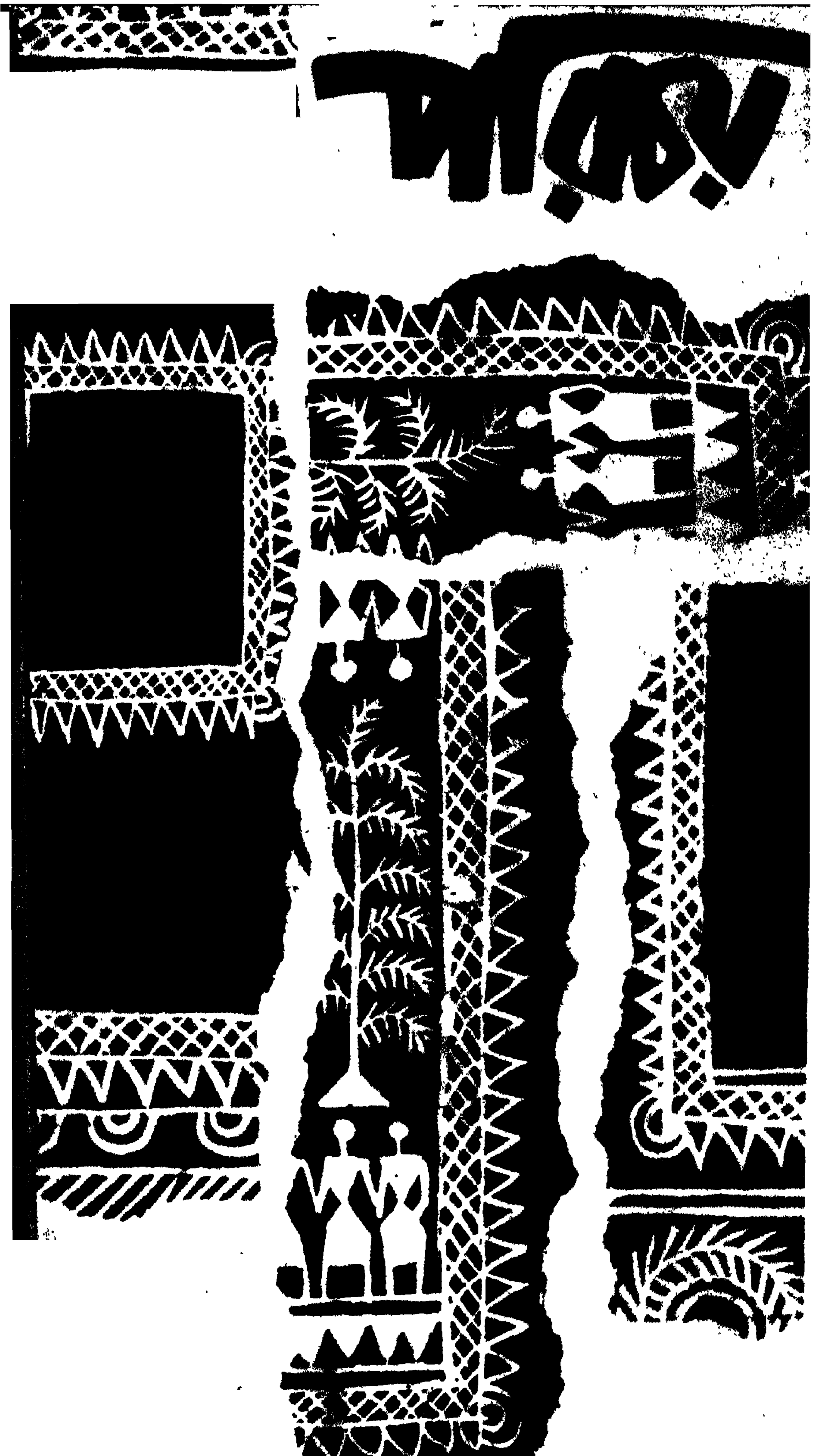
www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিতে সর্বত্র সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের অসুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় অর্থ ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। চাঁদা আদায়ের নামে যাঁরা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে যাঁরা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে যাঁরা জনজীবনকে বিপন্ন করেন তাঁদের সমর্থী আচরণে উদ্দীপিত করা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোনো মানুষকে বিরক্ত করা [illegible], সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

যুবসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন, শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। অন্যের অসুবিধা না করে উৎসব উদযাপন করুন।

আই সি এ ৯১৩০ /৭৯

পুজোয় চাই
নতুন জুতো
Bata
লিলিপট ৪৫
সাইজ ৫-৮
টা. ১৯.৯৫
সাইজ ৯-১১, ১২-১, ২-৫
টা. ২৫.৯৫, ২৮.৯৫, ৩২.৯৫

ছন্দ
সমন্বয়
গড়ে ওঠে
যৌথ
প্রচেষ্টায়

রাজ্যের প্রয়োজনে আরো বিদ্যুৎ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ রাজ্যের গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। আজ পর্ষদের প্রায় ৫ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে আছেন সবস্তরের মানুষ, আছেন হাজার হাজার কৃষক—যাঁদের কাছে বিদ্যুৎ পর্ষৎ আজ সত্যিকারের বন্ধু; আরো আছেন অসংখ্য শিল্পসংস্থা—যাঁদের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে বিদ্যুৎ পর্ষদের সাহায্য না হলেই নয়। বর্তমানে পর্ষদের উৎপাদন ক্ষমতা হল ৬৩৫ মেগাওয়াট।

সারা রাজ্য জুড়ে পর্ষদের ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার দৈর্ঘ্য ৬৫,০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশি। বিদ্যুৎ পর্ষদ ইতিমধ্যে ১২,০০০-এর বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে এবং ২২,৪০০টি সেচের জন্যে পাম্প সেট বিদ্যুৎ চালিত করেছে।

উপরন্তু ১১২টি হরিজন বস্তি ও ৩৮০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।

আগামী দিনের কাজ

সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র: এখানকার ১২০ মেগাওয়াটের তৃতীয় ইউনিটটি বর্তমানে পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হচ্ছে। ১২০ মেগাওয়াটের চতুর্থ ইউনিটটি ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ চালু হবে।

ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র: ২১০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সম্প্রসারণের কাজ ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি শেষ হবে।

জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়): ৮ মেগাওয়াটের এই কেন্দ্রটি ১৯৮০-৮১ সালে শেষ হবে।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র: প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াটের তিনটি অর্থাৎ ৬৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রটি তৈরির কাজ ১৯৮৩ সালে শেষ হবে। আরো ৬৩০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে।

রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র: ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ১৯৮৩-৮৫ সালে শেষ হবে।

অন্যান্য কেন্দ্রে: মোট ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে গ্যাস-টারবাইন বসানোর কাজ এ বছরের অক্টোবরের মধ্যে শেষ হবে। কসবায় ৪০ মেগাওয়াটের কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যে বর্তমান লাইনের সম্প্রসারণ ছাড়াও নতুন একাধিক লাইন তৈরি করা হবে। এগুলি হল: দুর্গাপুর-কসবা ২২০ কেভি, মালদা-রায়গঞ্জ ১৩২ কেভি, দুর্গাপুর-বিষ্ণুপুর ১৩২ কেভি, খড়গপুর-এগরা ১৩২ কেভি, বেহালা-লক্ষ্মীকান্তপুর ১৩২ কেভি, হাওড়া-কসবা ২২০ কেভি এবং হাওড়া-কোলাঘাট ২২০ কেভি লাইন। এই সব কাজগুলির জন্যে এবছর যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, পর্ষদের ইতিহাসে এত টাকা আর কখনও বিনিয়োগ করা হয় নি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

SEB 565A2/79

ই ঈ
ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
SSDG-72

পরিচয়

১ নভেম্বর ১৯৭৯ থেকে চাঁদার নতুন বর্ধিত হার কার্যকর হবে।
আজীবন ২০০ টাকা। বার্ষিক, ডাকে নিলে ২৩ টাকা, হাতে নিলে ২০ টাকা।

প্রতি সংখ্যার দাম ২ টাকা।

গ্রাহক হওয়ার বিশেষ সুবিধা (৩১ অক্টোবর পর্যন্ত)

এই সময়ের মধ্যে পুরনো হারে (বার্ষিক ১৫ টাকা) গ্রাহক হওয়া যাবে। বিষ্ণু দে সপ্ততিবর্ষ পূর্তি বিশেষ সংখ্যা (দাম ৭ টাকা) ও এই শারদীয় সংখ্যাটি (দাম ১০ টাকা) তাঁরা পাবেন—এই উদ্দেশ্যে রাখা নির্দিষ্ট-সংখ্যক কপি যতক্ষণ থাকবে।

পরবর্তী সংখ্যা নভেম্বরে বেরবে।

শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত গোপাল হালদার-এর 'সংস্কৃতির সদর্থ', নীহাররঞ্জন রায়-এর 'ভারতীয় জীবনে ও মননে শিল্পের স্থান', শোভন দত্তগুপ্ত-এর 'কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গে' ও পূর্ণেন্দু পত্রীর [illegible] আলোয় একটা দিন'—এই রচনাগুলির অপরাপর স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশও 'পরিচয়' এ প্রকাশিত হবে।

পরিচয়

শারদীয় ১৯৭৯

শিল্প-সংস্কৃতি

সাহিত্য

সঙ্গীত

সমকালীন ইতিহাস

কলকাতা

আলোচনা-সমালোচনা

৪৯ বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা অগাস্ট-অক্টোবর

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

স্কেচ চিত্রভানু মজুমদার

রদাঁর দুটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি প্যারিসের রদাঁ মিউজিয়াম'এর থেকে সংগৃহীত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয় প্রা: লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক—গুপ্তপ্রেস, ৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সংস্কৃতির সদর্থ

গোপাল হালদার

সংস্কৃতি কি ?

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটি এখন সাধারণত ইংরাজি 'ক্যালচর' শব্দের সমার্থক। ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও তাই। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। তার আগে 'ক্যালচর' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন—প্রবর্তিত হলেও তা প্রচলিত হল না। এ শতাব্দীতে কিছুদিন আমরা 'ক্যালচর' শব্দটার মূলগত রূপ ধরে তৈরি করেছিলাম ঐ অর্থে আরেকটি শব্দ—'কৃষ্টি'। সে শব্দটি মূলে বোঝাত 'কর্ষণ', ভূমিজাত 'বস্তু'। পরে বোঝাত চাষ। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দটি একালের ভাষায় উদিত হবার পরে 'কৃষ্টি' শব্দটি ক্রমেই ত্যক্ত হয়েছে —ওর গায়ে যে কৃষির গন্ধ আছে তা যেন 'চাষাড়ে'। 'সংস্কৃতি' শব্দটি 'ক্যালচর' এর সমার্থক শব্দরূপে খোপে টিঁকেছে।

'সংস্কৃতি শব্দটি কুলীন শব্দ' একেবারে বৈদিক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শব্দটির যে প্রয়োগ পাওয়া যায় তা আমাদের পক্ষেও সুসঙ্গত প্রয়োগ। উদ্ধৃতই করি যদিও উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি (দ্রঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, পৃঃ ৮)

ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ
দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে—
হস্তী, কংসো, বাসো হিরণ্যম্ অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।…
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান
আত্মানং সংস্কুরুতে।

এ উক্তির মর্ম হয়তো দুর্বোধ্য নয়—মানুষের শিল্প দেবশিল্পের অনুকৃতি। মানুষের শিল্পের (তৎকালীন) দৃষ্টান্ত—হাতির দাঁতের কাজ, কাংস্যপাত্র, বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার, অশ্বতরীযুক্ত রথ।... এই শিল্পসমূহ আত্মার সংস্কৃতি; এগুলি দিয়ে যজমান (গৃহস্থ) আপনাকে সম্যক ছন্দোময় করে।

মনে হয়, সংস্কৃতি কথাটির, সম্পূর্ণ না হোক, প্রধান কটি তাৎপর্য এখানে উল্লেখিত হয়েছে। যথা, ১. বাস্তবকৃতি বা শিল্প রচনা (দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্ট)—যা এখন আমরা আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস বলে বোঝাই, ২. সভ্যসমাজের বা শিষ্টজনের আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মও, যা ও সবের দ্বারা আচ্ছাদিত হচ্ছে, যাকে হয়তো আমরা সদাচার, 'অ্যাপ্রুভ্‌ড ওয়ে অব লাইফ' বলে অনুমান করতে পারি, (যাকে আধুনিক বাংলায় 'শিষ্ট জীবনচর্চা', 'জীবনধর্ম' বললেও ভুল হবে না। এবং ৩. যে সব কৃতিতে বা শিল্পে মানুষ ছন্দোময় বা সুমার্জিত (পলিশড, পরিশীলিত) হত, যা তার অধ্যাত্ম সম্পদ, আত্মার সংস্কৃতির বিকাশ হয়—অর্থাৎ আমরা এ কালের নিয়মে যার মধ্যে এখন প্রধান বলে গণ্য করি সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা (চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি), এবং নৃত্যকলা, নাট্যকলা, (ফিল্ম, এবং অংশত রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতিও যার বাহন) প্রভৃতি—পুরানো আলঙ্কারিকের ভাষায় বলতে পারি যার মধ্য দিয়ে মানুষের 'কারয়িত্রী প্রতিভা'র ও 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'র আমরা প্রকাশ দেখি—তার দর্শন ও বিজ্ঞানকেও এরূপ সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য না করলেই নয়। বলা বাহুল্য, বাস্তবরচনা, জীবনচর্যা ও অধ্যাত্মসম্পদ—উল্লেখিত তিনটি ধারাই অল্পাধিক পরস্পর-সম্পর্কিত—বিশেষ করে জীবনচর্যার পরিচায়ক, আর জীবনচর্যার দিকটা আমরা একটু পরে দেখতে পাব জীবিকা-পদ্ধতিরই ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারই দ্বারা সমর্থিত ও নিয়মিত। তার পূর্বে আরো কয়েকটা স্থূল বিষয়ও পরিষ্কার হওয়া চাই।

চলিত প্রয়োগ

'স্থূল' বললেও সেই কথাগুলি মিথ্যা নয়—তবে বর্তমান আলোচনায় আমরা তাতে গুরুত্ব দিই না। বিশেষ করে, মূল 'ক্যালচর' শব্দটা অনেক অর্থেই পাশ্চাত্য দেশে প্রযুক্ত হয়, আর আমরাও সে সব অর্থে 'ক্যালচর' শব্দটি ব্যবহার না করে পারিনা, কারণ 'সংস্কৃতি', 'ক্যালচর'-এর প্রতিশব্দ হলেও এখন

পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ হয়ে উঠতে পারে নি। তাই, আমাদের আলোচনার পক্ষে গৌণ হলেও আমরা 'ক্যালচর'-এর বহু-ব্যাপক কতকগুলি অর্থ একবার সংক্ষেপে নির্দেশ করি। যেমন, ১. আমরা কথায় কথায় বলি লোকটা (বা তার গোষ্ঠী) 'ক্যালচরড' ('সংস্কৃতিবান' বললে তা যেন কৃত্রিম শোনাবে, রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 'প্রকর্ষবান' বলতে চেয়েছেন, 'অমিট্রায়'-এর মতোই সেই বিদগ্ধ লোকরা), অর্থাৎ যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সদাচার শিষ্টাচারে পুষ্ট ও অভ্যস্ত এবং পাশ্চাত্য কায়দা-কানুন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও মোটামুটি ওয়াকিবহাল। —এ হচ্ছে বৃত্তিভিত্তিক নামকরণ। ২. 'ক্যালচর'-এর দ্বিতীয় আর-এক ধরণের অর্থ বোঝায় যখন আমরা অনেক সময়ে কথায় কথায় ব'ল 'হিন্দু ক্যালচর', 'মুসলিম ক্যালচর' প্রভৃতি। এরূপ স্থলে 'সংস্কৃতি'ও ব্যবহার করি। কিন্তু এ-রূপ ধর্মভিত্তিক সংজ্ঞা, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হোক, যতটুকু সত্য তার অপেক্ষাও বেশি বিভ্রান্তিকর। সহজ দৃষ্টান্ত—সৈদ আরবের ক্যালচর আর মিশর বা ইরানের ক্যালচর এক নয়। এ-সংজ্ঞা অবৈজ্ঞানিক। ৩. তৃতীয় একটা নাম বা পরিচয় হচ্ছে 'দেশভিত্তিক' (বা 'জাতিভিত্তিক'), যথা, ভারতবর্ষের ক্যালচর (বা সংস্কৃতি) কিংবা 'বাঙালি সংস্কৃতি', তামিলি সংস্কৃতি' ইত্যাদি। এগুলি বিশেষ অর্থে সত্য, না হলে বাঙালি সংস্কৃতিকে আমাদের জিজ্ঞাস্য করেছি কেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-নামকরণও আংশিক সত্য। কারণ, সকল জাতির কালচারই মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা, কেউ বা অন্য-কারো নিকট, কেউ-বা পর। (কেন মানব সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ তা পরে দেখব)। তবে, 'বাঙালি সংস্কৃতি', 'তামিল সংস্কৃতি' প্রভৃতি যে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, তার এক-একটা বিশেষ রূপ—তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তার বিশিষ্ট অঙ্গ তা আমরা জানি। ৪. ক্যালচর বা সংস্কৃতির অন্যবিধ প্রয়োগও প্রচলিত আছে এবং তা-ও অনেকাংশে স্বীকার্য। তা হচ্ছে কালভিত্তিক পরিচয় ও নামকরণ। যথা, 'প্রাগৈতিহাসিক ক্যালচর', 'ঐতিহাসিক ক্যালচর'—এ হল তার প্রধানতম পরিচয়। আরও বেশি প্রচলিত নামকরণ—'ঐতিহাসিক ক্যালচর'-এর বিভিন্ন যুগের বা পর্বের নাম, যেমন, 'এনসেন্ট ক্যালচর', 'মিডিয়েভাল ক্যালচর', 'মডার্ন ক্যালচর'। এ-সবের সঙ্গে দেশের নাম জুড়েই তাদের বিশেষ রূপকে চিহ্নিত করা হয়—বিশেষ করে ক্যালচর-এর বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করা সম্ভব, যেমন, 'মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়ান ক্যালচর'। ৫. সামাজিক বিকাশের প্রধান রূপ

(সমাজভিত্তিক সংজ্ঞা) দিয়ে এসব কালভিত্তিক বা তথাকথিত ঐতিহাসিক যুগকে বিশেষিত করলে তা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিসঙ্গতও হয়। যেমন ইউরোপের মধ্যযুগের বিশেষ রূপকে 'ফিউডাল সমাজ-বিন্যাস' বললে, সেই 'মিডিয়েভাল ক্যালচর' এর নাম হবে, 'ফিউডাল ক্যালচর'। এ-রূপ আধুনিক যুগের প্রধান রূপ ও প্রারম্ভ বুর্জোয়া বা বণিক-ধনিক সমাজ-বিন্যাসে তার নাম 'বুর্জোয়া ক্যালচর'। আবার এই মডার্ন বা আধুনিক যুগের আধুনিকতর পর্ব সমাজতন্ত্রে বা সোসালিস্ট সমাজ-গঠনে উদ্যোগী। এই পর্বের ক্যালচরের নাম সোস্যালিস্ট ক্যালচর বা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সব নামকরণই অবশ্য প্রচলিত ও সচরাচর গ্রাহ্য। সুশৃঙ্খল আলোচনার জন্য এ-রূপ সমাজভিত্তিক আলোচনাই সুবিধাজনক।

বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ

একটা কথা এখানে বুঝে নেয়া উচিত—'কালভিত্তিক' বললে আমরা সাধারণত মনে করি 'ঐতিহাসিক' কিন্তু বোঝা দরকার 'ইতিহাস' বিষয়টা কি ? ('হোয়াট ইজ হিস্টরি'—অধ্যাপক ই. এচ. কার এর বইখানা দ্রষ্টব্য)। ইতিহাসের মূলকথা রাজার পর রাজার কথা নয়—অর্থাৎ রাজনৈতিক ইতিহাস নয়—মূল কথা, সমাজ কী ভাবে গড়ে উঠেছে, উঠছে, সেই কথা। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক আর্থিক ক্রমবিকাশের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির পরিচয় ও নামকরণে পুরাতত্ত্ব (আর্কিওলজি) 'সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগ করেছে। পুরাতাত্ত্বিক নীতি মূলত 'বস্তুভিত্তিক ও 'উপকরণভিত্তিক'। কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের বা দেশের উল্লেখ তার আনুষঙ্গিক হিসাবেই গণনীয়।

মৃত্তিকাভ্যন্তরে খনন করে পুরাতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর নানা স্থানে লিখিত ইতিহাসের ও পূর্বেকার যুগের মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। মাটির তলায় নানা স্তরে তাদের সমাধি, বাসচিহ্ন ও প্রাণযাত্রার উপকরণ ও তা থেকে তৈরি নানা ব্যবহার্য শিল্পবস্তু প্রভৃতি আবিষ্কার করেছেন। নানা বিজ্ঞানের সহায়তায় তা থেকে ক্রমেই স্থির থেকে স্থিরতর রূপে সে সব মানুষের কৃত বস্তু (আর্টিফ্যাক্টস) থেকে তার তাৎপর্য ও কালপর্যায় নির্ণয় করেছেন—কী মূলে উপকরণ থেকে সে সব নির্মিত. কী কৌশলে সে সব নির্মিত, কী উদ্দেশ্যে

নির্মিত, কী ছিল তার উপযোগিতা ইত্যাদি। তা থেকে এসব ব্যবহারকারী মানবগোষ্ঠীর বাস্তব জীবনযাত্রা অনুধাবন করতে পেয়েছেন; আবার, সেই জীবনযাত্রার রূপ থেকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সম্ভাব্য সমাজরূপ এবং মানসিক ভাবনা-ধারণাও যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে অনুমান করতে পেয়েছেন। এই সমস্ত জিনিস নিয়েই প্রাগৈতিহাসিক ক্যালচরের রূপ ও বিকাশধারা স্থিরীকৃত হয়েছে, বিভিন্ন আবিষ্কার-ক্ষেত্রের ও বিভিন্ন কালের খননলব্ধ 'কৃতবস্তু' (আর্টিফ্যাক্টস) এভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করে সেই সংস্কৃতির উপকরণভিত্তিকরূপ স্থির করেছেন। বিভিন্ন খনিত ক্ষেত্রের ও বিভিন্ন কালের ডিসটিংটিভ ফিচারস হচ্ছে বিশিষ্ট বস্তু উপকরণ, টিপিক্যাল আর্টি-ফ্যাক্টস, তা দিয়ে তখন সেই ক্যালচরের পরিচয় ও নামকরণ করাই পুরা-তাত্ত্বিক পদ্ধতি। যেমন, কাশ্মীরের সোয়ান নদীর উপত্যকায় প্রস্তরোপকরণ থেকে নির্মিত এক বিশেষ ধরণের পাথরের চিলতের ক্ষুদ্রবস্তু (মাইক্রোলিথিক) —সেখানকার প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের মানুষ এ সব ক্ষুদ্র প্রস্তরবস্তু তৈয়ার ও ব্যবহার করত। সেই বিশেষ ধরণের (মাইক্রোলিথিক) থেকে প্রস্তরযুগের কালচরের অন্তর্ভুক্ত এই বিশেষ ক্যালচরের নাম হয়েছে 'সোয়ান ক্যালচর'।

এর রূপ অনেক, নামকরণও অনেক—পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা প্রয়োজন, তার নামগুলি মোটামুটি পুরাতত্ত্বের পারিভাষিক—আমাদের সাধারণ সংস্কৃতি জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন না হতে পারে কিন্তু বিশেষ পরিচয় দিতে হলে আমরা তা প্রয়োগ না করে পারি না।

এই পুরাতাত্ত্বিক বিস্তার বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে 'ক্যালচর'-এর বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় গৃহীত হয় তার জীবিকোপকরণ থেকে—'কৃতবস্তু' দিয়ে এই কৃতবস্তুরই নাম— শিল্পও এক অর্থে।

তারপর এই বিকাশের ধারা এগিয়ে যায় বস্তু-উপকরণে পরিচালিত জীবন-যাত্রা দিয়ে, যূথবদ্ধ সমাজরূপ দিয়ে। মানুষের ক্যালচর-এর এই বিকাশধারায়,

---

The locality of the recognised types, current *simultaneously* in a *gienv area* is termed a culture. V. Gordon Childe, What Happened in History (Palican) উদ্ধৃতাংশে নিম্নরেখাচিহ্ন বর্তমান লেখকের।

বা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঐতিহাসিক এবং আধুনিক ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের, পরিচয় নিলে 'ক্যলচর' এর সেই বৈজ্ঞানিক অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, আপাতত সেরূপ গবেষণা মুলতুবি রেখে আমরা তার সিদ্ধান্ত, তার পদ্ধতি প্রভৃতির আলোকে বুঝতে চাই—সংস্কৃতি কি। এইটিই আপাতত জ্ঞাতব্য, তবে স্থূলভাবে হলেও ঐ পূর্ব ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও আমাদের স্মরণীয়। দু-এক কথায় এখানে তা নির্দেশ করা যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, আড়াইলক্ষ বৎসর পূর্বে হয়তো এই নৃ-জাতির সূচনা। দু হাত, মস্তিষ্ক ও তার সহায়ে জীবিকোপায় আয়ত্ত করার দায়ে হাতিয়ার (টুল) নির্মাণের চেষ্টায় ও কথাবলার (স্পিচ) সূত্রে নৃজাতির বিকাশ। একেবারে প্রথম যুগে তার কৃতবস্তু প্রস্তরের উপকরণ থেকে প্রস্তুত। এই তার প্রথম সৃষ্টি—এই পাথুরে সৃষ্টি-উদ্যোগ প্রস্তর যুগের ক্যলচর (স্টোন এজ ক্যলচর)।

ক. প্রস্তর যুগের ক্যলচরের আবার পর্ব বিভাগ হয়—(১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ (প্যালিওলেথিক)—হাতিয়ার তো অনেক স্থূল, হয়তো হাজার ৩০/৪০ বৎসর হল। এই প্রাচীন প্রস্তর যুগের ক্যলচরের নিদর্শন ভারতবর্ষে সোয়ান উপত্যকা, চিংলিপুট, নর্মদা উপত্যকা প্রভৃতিতে এবং বাংলা দেশের সন্নিকট ময়ূরভঞ্জে পাওয়া যায়। (২) তারপরে এলো মধ্যপ্রস্তর যুগ (মিডিওলিথিক) তার কৃতবস্তু একটু উন্নত, ভারতে তার চিহ্ন পাওয়া যায় সবরমতী উপত্যকায় ও অন্যত্র। (৩) তৃতীয় পর্বে নব্যপ্রস্তর যুগ (নিওলিথিক) —যা হয়তো হাজার-দশ বৎসর স্থায়ী হয়, হাতিয়ার উন্নত ও অন্যান্য বস্তুও তৈরি হয়। তখনই, সভ্যতা যাকে বলি, তার বীজ বপন শুরু হয়। এরই পরে, লিখিত ইতিহাসের বা ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। নব্য প্রস্তর যুগের কৃতবস্তু বেশ উন্নত। ভারতবর্ষে অনেকখানেই তার চিহ্ন পাওয়া যায়। দুমকার কাছে বীরহানপুরে এই নব্যপ্রস্তর যুগের কৃতবস্তু পাওয়া গিয়েছে। আসলে বঙ্গদেশে প্রস্তর যুগের মানুষের চিহ্ন দু-একটার বেশি পাওয়া যায় নি। তবে নানা পাহাড়ে বা এদিকে-ওদিকে তাদের অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

মানুষের এই বিকাশধারা সঠিক জানবার পক্ষে দ্রষ্টব্য—ভি. গর্ডন চাইল্ড

এর দুখানা স্বল্পমূল্যে প্রাপ্য বই—'ম্যান মেকস হিমসেলফ' ও 'হোয়াট হ্যাপেণ্ড ইন হিস্টরি'। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই জন্মকথা জানবার পক্ষে সুলভ মূল্যে প্রাপ্য বই-বি. আকাচিনের 'দ্য বার্থ অব ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন'। সব কয়খানিই সংস্কৃতি জিজ্ঞাসায় অবশ্যপাঠ্য। প্রয়োজন হ.ল এ আলোচনায় উল্লেখিত হবে সংক্ষেপিত নামকরণে—যথাক্রমে MMH, WHH, I-CIV বলে।

সকল জীবের মতো মানুষের মূল কাম্য আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। অন্য সকল জীবের থেকে এই কাজ মানুষের সুসাধ্য হয়েছে। কারণ মানুষ দুই হাত ও মস্তিষ্ক স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে। একযোগে হাত লাগিয়ে ও মাথা লাগিয়ে মানুষ প্রাণধারণের উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তেমনি হাতিয়ার (Tool) তৈরি করে তাতে জীবিকা অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছে। জীবিকা লাভ যেমন সহজ হয় মনও সঙ্গে সঙ্গে হয় উদ্ভাবনায় সক্রিয় আবার কথার সাহায্যে কাজে ও ভাবপ্রকাশে পরস্পরের যূথবন্ধনও হয় সহজতর—জীবনযাত্রা সংগঠিত হয় আর চিত্তসম্পদেরও বিকাশ হয়। এই টুল মেকিং থেকেই তাই ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—মানুষের শক্তি। আর সামগ্রিক ভাবে এই মানুষের কৃতির নামই 'ক্যালচর' বা সংস্কৃতি— জীবিকোপায় উদ্ভাবন, সমাজ-সম্পর্ক গঠন এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তির ও সৃষ্টিকল্পনার অগ্রগতি। এ সকল মিলিয়ে গড়ে ওঠে তার সমগ্র ওয়ে অব লাইফ আর ক্যালচরের বিজ্ঞানসম্মত ও সাধারণ অর্থ হল এই ওয়ে অব লাইফ—জীবনধারা, জীবনযাত্রার ছাঁদ। আবার অন্য ভাষায় বলা যায় ক্যালচর হচ্ছে মানুষের জীবন রচনা; আপন সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, শ্রমশক্তিরও সার্থকতা, 'মানবপ্রকৃতির স্বরাজসাধনা'। বিভিন্ন প্রক্রিয়া ধরে একই ব্যাপারের কথাই বলা যায়।

তাই মানুষের সৃষ্টি সাধনার উন্নত (high)* পরিচয় তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৃষ্টি-সম্পদ দিয়ে—যেমন সঙ্গীত, সাহিত্য, চারুশিল্প, নৃত্য, নাট্যকলা প্রভৃতি। আমরা একালে 'সংস্কৃতি' বলতে সাধারণত এ সব কটিই বোঝাই, কিন্তু 'সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের সমস্ত সৃষ্টিসম্পদ—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ যা 'শিল্প' বলা হয়েছে। সে সব আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস, হস্তশিল্প এবং একালের যন্ত্রশিল্পও—সবই ত সৃষ্টি। এবং শুধু তাও নয়, সামাজিক সংগঠনে ও সামাজিক পদ্ধতিতে, প্রতিষ্ঠানে, অনুষ্ঠানেও ক্যালচরের রূপই

বিধৃত। তার অর্থও বোঝা উচিত আমাদের কালের পার্লামেন্ট থেকে গ্রাম-পঞ্চায়েত পর্যন্ত, চেম্বার অব কমার্স থেকে ট্রেড ইউনিয়ন পর্যন্ত, সামাজিক-রাজনৈতিক যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, খৃস্টমাস থেকে মহরম দুর্গাপূজা পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান, যোগাযোগ আদান-প্রদানের অঙ্গ ডাক, ট্রান্সপোর্ট, সংবাদপত্র, রেডিও প্রভৃতি সামাজিক সংগঠন বা আধারসমূহও এ-কালের ক্যালচরের অন্তর্ভুক্ত। আবার, তাও শুধু নয়, এ সব আধ্যাত্মিক-মানসিক, সামাজিক 'কৃতি' বা রচনাসমূহ তো আছেই, আছে সেই সবেরও ভিত্তি যা সেই বাস্তব কৃতিসমূহও, সেই মূল আর্থিক ব্যবস্থা ; প্রধান যা-উৎপাদনপদ্ধতি, আরেক ভাষায় একটু পরিষ্কার করে বলতে পারি—আছে ('টুল-এর যা পরিণতি) টেকনলজি, ('টুল' এর যা উদ্দেশ্য) প্রোডাকশন বা ইকনমিক সিস্টেম, (যা সেই আর্থিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে) সোশ্যাল রিলেশনশিপ, সামাজিক পদ্ধতি এবং ধর্মবোধ এবং (প্রত্যক্ষে পরোক্ষে যা এ সবের সঙ্গে যুক্ত) স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেণ্ট, নীতিধর্ম, শিল্প-ভাবনা, ধারণা, ভাব রূপ -এ সবই বৈজ্ঞানিক অর্থে ক্যালচরের অঙ্গ। বরং পুরাতত্ত্বের মূল সাক্ষ্য মনে রাখলে বুঝব—সকলেরই বাস্তবভিত্তি এক সময়ে ছিল প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে জীবিকা ও জীবনরচনা। সমাজ বিকাশের সঙ্গে সেই মূল ভিত্তি উৎপাদন বা আর্থিক-ব্যবস্থা।

ইকনমির সে উৎপাদন কি দাস-শ্রমে উৎপাদন, না ফিউডাল (বা সামন্ত প্রথায়) উৎপাদন, না ক্যাপিটালিস্ট (বা ধনিকতন্ত্রী) উৎপাদন, না, সোসালিস্ট (বা সমাজতন্ত্রী) উৎপাদন—বিভিন্ন এ-সব উৎপাদনব্যবস্থার বা ইকনমির প্রতিফলন প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পাওয়া যায় নিজ নিজ আধ্যাত্মিক-মানসিক সৃষ্টিতে—সঙ্গীতে, শিল্প-সাহিত্যে, কারুকলায়।

তবে সকল কৃতিই সংস্কৃতির অন্তর্গত হলেও তার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। গুরুত্বেও সব সমতুল্য নয়। যেমন বাস্তবের আক্ষরিক প্রতিফলন সত্যকার সার্থক শিল্পকলায় না-থাকাই বাঞ্ছনীয়, তবে তার আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তা সংযুক্ত থাকবেই।

সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অর্থ আমরা অতি-সরলীকৃত ভাবে বুঝে নিতে চেয়েছি। বলা বাহুল্য, 'ভারতীয় সংস্কৃতি' কিংবা তার একটি শাখা 'বাঙালি সংস্কৃতি'-র কথা যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জানতে-বুঝতে চাই, তা হলে তাও এই ভাবেই আলোচ্য। তবে আরও দুটি কথা হয়তো এখানে সেরে

নেওয়া উচিত। দর্শন, ধর্মনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিবিধ শিল্পকলা প্রভৃতি যে সব জিনিসকে আমরা সাধারণভাবে 'সংস্কৃতি' বলি তা হচ্ছে সংস্কৃতির উচ্চতর অঙ্গ, সূক্ষ্মতর (রিফাইনড) ধারা, অর্থাৎ যা সংস্কৃতির ভাবপ্রধান ফিচারস। এ-সব ভাবপ্রধান বিষয় বা রিফাইনড ইফেক্টসকেই প্রধানত ক্যলচর বলতে বোঝায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো সংস্কৃতি ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ বিচারক বাংলায় কম। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত বিচারটি এ-রূপ দৃষ্টিতে প্রণীত :

> আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, একাধারে সভ্যতার পুষ্প ও আভ্যন্তরীণ প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে culture। অবশ্য একেবারে সর্বজনস্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ রূপে civilization বা সভ্যতা আর culture শব্দ দুটিকে * সকলেই সব সময় এই ভাবে ব্যবহার করে না, কিন্তু যখন কোনো জাতির বাইরেকার সভ্যতা দেখে তাকে পুরোপুরি চেনা যায়, তখন বলতে হয়—'এহো বাহ্য', ভিতরের কথা কী? তখন তার মানসিক ও আনুভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার সাধনা আর প্রকাশ, তার দর্শন, সাহিত্য, শিল্পসঙ্গীত প্রভৃতি আর মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহজ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটী এ-সমস্তের কথা এসে যায়। এ সমস্তকে বাহ্য সভ্যতা ছাড়া একটা সর্বস্বর সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা হয়। এই শব্দটি ইউরোপে culture শব্দরূপে দেখা দিয়েছে।

আমাদের ভাষায় গত পঞ্চাশ বৎসরে 'সংস্কৃতি' শব্দটি এ তাৎপর্য ক্রমশ অর্জন করেছে—এখনও সম্পূর্ণ করে নি।

মূলত civilization—civis বা পুর, নগর প্রভৃতিতে বিকশিত মার্জিত জীবনযাত্রা ও তার বিশেষ প্রকাশ, বাংলায় বলা উচিত 'পৌর সভ্যতা'। ইতিহাস-লেখা ও পুরজীবন—প্রায় একসঙ্গে শুরু—তাই পৌর সভ্যতাকে ঐতিহাসিক যুগের শুরু ধরা হয়।

মাত্র হাজার পাঁচ বৎসর পূর্বে পৌর সভ্যতার প্রারম্ভ (পৌর জীবন ও

* civilization ও culture শব্দ দুটির ওরূপ বিশিষ্ট অর্থ 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটির দ্বারা প্রকাশ এখনো সুনিশ্চিত হয় নি; তবে প্রয়োজন-বোধে ব্রাকেটে ইংরেজি শব্দ দুটি দিয়ে সে কাজ চালানো যেতে পারে।

পৌর সভ্যতার কথা আবশ্যক মতো পরে আলোচ্য); কিন্তু পুর-গঠনের বা ঐতিহাসিক যুগে পৌঁছবার পূর্বেও মানুষ জীবন রচনা করত—তা নিয়েই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবিধ পর্ব। প্রথম প্রস্তর ও প্রস্তরোপকরণ ক্রমে ধাতব উপাদানের থেকে প্রস্তুত জীবিকোপকরণ, আচ্ছাদন বস্ত্র, বাসগৃহ, হাড়িকুড়ি প্রভৃতি উদ্ভাবিত ও নির্মিত হয়েছে। সে সব পৌর জীবনযাত্রার কালচরের অঙ্গ।

এখানে সংক্ষেপে স্মরণীয়—পুর বা নগরের বৈশিষ্ট্য কী :

১. একসঙ্গে বহু লোকের বাস, ২. কর আদায় ও আরো কাজের নানা প্রতিষ্ঠান, ৩. অতিকায় পূর্ত কর্ম, ৪. লিপির আবিষ্কার, ৫. পাটিগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিদ্যার উদ্ভব, ৬. বৈদেশিক বাণিজ্য, ৭. কারুবিদ, কারিগর (ক্রাফট্সম্যান) প্রভৃতি বৃত্তিধারীর বিকাশ, ৮. শাসকশ্রেণীর উদ্ভব, ৯. রাষ্ট্র, শাসন-বিভাগ ও আইন প্রভৃতির পৃথক পৃথক বিকাশ (দ্রষ্টব্য V. Gordon Childe—Man Makes Himself, Chapter VII, The Urban Revolution)। যাই হোক্, মিশরে এই পৌর সভ্যতার সূচনা আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে আর আমাদের সিন্ধুসভ্যতা মহেঞ্জোদড়োতে আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ২৮০০ অব্দে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা—Otto Spengler প্রমুখ পণ্ডিতেরা culture ও civilization-এর মধ্যে মূলগত বিরোধিতা দেখেন এবং সেদিক থেকে মনে করেন কালচর—প্রাণবস্তু। যখন সিভিলাইজেশন রূপে তা গড়ে ওঠে, তখন কালচর-এর প্রাণই বাঁধা পড়ে। তাই সিভিলাইজেশনে কালচরের আয়ুক্ষয় হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এরূপ পার্থক্য টানার আমরা প্রয়োজন দেখি না —প্রয়োজন হলে তা স্পষ্ট করে বলা হবে।

বলা উচিত—অন্যত্র ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে) বিশেষ করে বাংলার সংস্কৃতির আলোচনায়, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় যেরূপ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে প্রায় সর্ববিধ লোক-চর্যা ও লোক—'সংস্কৃতির নির্দেশ দিয়েছেন' তা তৎপূর্বে আর কোথাও আমরা পাইনি। 'সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে তিনি পূব পর অবহিত; তবে উচ্চ-কোটির সৃষ্টিতেই যে তার প্রকৃত মহিমা, এই ভাবাশ্রিত (idealistic) ধারণাও তিনি পোষণ করেন। এই প্রসঙ্গে তাই সেই কথাটি স্মরণীয়—It is wrong to judge by the cultured only.

সংস্কৃতির শ্রেণী রূপ

ঐতিহাসিক কাল থেকে আমরা দেখছি—সমাজের যারা উচ্চকোটির মানুষ, যারা শাসক শ্রেণী, তাদেরই শিক্ষাদীক্ষা ও পরিশীলনের সুযোগ থাকে, এবং সেই শাসক—আদর্শেই প্রধানত মার্জিত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যাকে আমরা বলতে পারি 'শিষ্ট সংস্কৃতি' অথবা সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় culture of ruling class ; তার বাইরে সমাজের শাসিত শ্রেণী তা স্থষ্টির মতো শিক্ষা পায় না, এবং নিজেদের জীবন-চর্যার মূল প্রেরণানুযায়ী রচনা করে নিজেদের ভাবনা-ধারণা ও বাস্তব প্রয়োজনানুযায়ী নিজেদের সংস্কৃতি যাকে বলা যায় লোক 'সংস্কৃতি'—Folk culture বা Peoples' culture। তথাকথিত ইতিহাসের সব সংস্কৃতি শ্রেণী সংস্কৃতি, মোটামুটি এ কথাটা সত্য—কথাটিকে অন্ধভাবে না নিলে তা বলতে হয়। কারণ শ্রেণীতে শ্রেণীতে যোগাযোগও জীবন্ত সমাজে থাকে। কিন্তু যেখানে শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেখানে সে সমাজের থেকে প্রাণরস আহরণ করতে ততটা পারে না। সেখানে তার শাসক সংস্কৃতি বা 'শিষ্ট সংস্কৃতি' যতটা পরিশীলিত বা কলা-কৌশলে মার্জিত (Sophisticated) হতে পারে ততটা কিন্তু সমাজের প্রাণসম্পদের (Vitality) বাহন থাকে না। অন্যদিকে এ-কথাও সত্য, লোক-সংস্কৃতি সাধারণত সুরক্ষিত হয় না, আর তার মধ্যে লোকসমাজের প্রাণ-স্পর্শ যেমন সহজ সেরূপই শ্রবণের প্রকাশ-কৌশল তাতে প্রায়ই অপরিস্ফুট, আর যা অপরিস্ফুট রচনা তার প্রাণস্পর্শও অনুভব-গোচর হয় না। তার মধ্যে অশিক্ষিত-পটুত্ব থাকলেও তা সমাজের উচ্চ চেতনার ও উচ্চ মহিমার পরিচায়ক নয়। মোটামুটিভাবে তাই এই কথাটা স্বীকার্য—ঐতিহাসিক যুগের সমাজে সংস্কৃতির মধ্যে এই দুই অংশই থাকে, 'শিষ্ট সংস্কৃতি' ও 'লোক সংস্কৃতি', দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও পাওয়া যায়। একটি 'পরিশীলিত', তাই স্বভাবতই উচ্চকোটির দ্বারা আদৃত ও সুরক্ষিত, অপরটি 'লোক-সংস্কৃতি', তার অনেকটাই রুচিতে ও কৌশলে সামান্য, তাই প্রায়ই কালধর্মে বিলুপ্ত হয়। এই কথা বাঙালি সংস্কৃতির সম্বন্ধেও সত্য।

বাঙালি সংস্কৃতি সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ কথাও আছে—সৌভাগ্যের না, তা দুর্ভাগ্যেরই দিক। সমস্ত ভারতবর্ষের ভারতবাসীর মতো বাঙালিরাও অতীতে তাদের ইতিহাস লিখে রেখে যায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই দুঃখ

করে বলেছিলেন—'বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।' ইদানীং যাও বা আমরা সাংস্কৃতিক কর্মের কিছু কিছু উত্তরাধিকারের খোঁজ পেয়েছি তারও কালক্রম ও যাথার্থ্য বিচার-সাপেক্ষ; সময়ে সময়ে অতীতের যথাযথ সামাজিক তথ্য নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তবে এ কথা পরিষ্কার কিছুটা যা রক্ষিত হয়েছে তা 'শিষ্ট শ্রেণী'র অংশ মাত্র; 'লোক সংস্কৃতির' অংশ অতীতে রক্ষণ করার আয়োজন ছিল না, রক্ষিতও হয়নি, 'শিষ্ট সংস্কৃতি'তে ও লোক-সমাজের জীবন ও ভাবনার স্পর্শ লাগত—আর তা থেকে লোকজীবন-চর্যা ও 'লোক-সংস্কৃতি'র অবস্থা অনুমান করা যায়। মধ্যযুগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। এদিক থেকে দেখলে বাঙালির অতীত সংস্কৃতি মোটামুটি সেই অতীতের 'শিষ্ট সংস্কৃতি—প্রধানত তার থেকেই 'লোক-সংস্কৃতি'ও অনুমানসাপেক্ষ। তাই বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনা—আধুনিক যুগের সীমানায় না পৌছানো পর্যন্ত—আসলে বাঙালির শিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। আধুনিক যুগের পূর্বেকার সে ছবি সামান্য পাওয়া যায় মৌখিক ছড়া, গান, লোককথা, রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি থেকে। তা বাদ দিয়েও সেই 'শিষ্ট সংস্কৃতি'র আংশিক তথ্য ছাড়া আমাদের হাতে সমাজজীবনের সকল তথ্যও নেই। শিষ্ট সংস্কৃতির সেসব তথ্য প্রায়ই তাদের ভাবনা ও ধারণার বাহক, তাদের বস্তুনিষ্ঠ জীবন চর্যার বাহক নয়—সমগ্র বাঙালি জীবন-চর্যার তো নয়ই; এমনকি, তা শিষ্ট-শ্রেণীর ও বাস্তব জীবন-যাত্রার যথেষ্ট পরিচায়ক নয়। এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই আমাদের 'বাঙালি সংস্কৃতি'র কথা বুঝতে হয়। প্রধানত শিষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং দর্শন, নৈতিক আদর্শ মোটামুটি মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যদৃষ্টির কৃতি বা কর্ম প্রভৃতি যা আমরা পাই, তার থেকেই আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তর অনুধাবন করতে হয়। এই প্রয়াসে যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি ও সমাজভিত্তিক যুক্তি-পদ্ধতিই গ্রাহ্য; অবলম্বন - ভাববাদী পদ্ধতি নয়।

একটি ঘরোয়া বৈঠকে উক্ত বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত উপলক্ষে কথিত। পরে অনুলিখিত। লেখক।

কলকাতা নিয়ে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বছর দুয়েক আগে অক্সফর্ড কিংবা কেম্ব্রিজে নানা দেশের নগর শাসনতত্ত্বে বিশারদ ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা হয়েছিল। কলকাতার কথা অবশ্য উঠেছিল আর এ দেশের (এবং খাস কলকাতারই) কয়েকজনের মুখ থেকে আমাদের এই দুর্দশাজর্জর শহরের কথা অনেকে শুনেছিল; বিবিধ তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়ার পর তাদের বক্তব্য গ্রন্থাকারে ঘটা করে প্রকাশিত হয়েছে; নগদমূল্য যথারীতি বেশ উঁচু হারেই অবশ্য বাঁধা—কিন্তু তা পড়া আর না-পড়ার মধ্যে আমাদের কাছে কোনো ইতরবিশেষ নেই। কলকাতার ব্যথাবেদনা কলকাতাকেই বয়ে যেতে হবে আর যথাসম্ভব তার উপশমের চেষ্টা করতে হবে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডীস্ বলেছিলেন যে মানুষের পক্ষে সুখী হবার প্রথম শর্ত হল এই যে একটা নামজাদা শহরে তাকে জন্মাতে হবে! আমরা যারা কলকাতায় জন্মেছি বা এখানেই জীবনের সর্ববিধ সংস্থান করেছি বা করতে চাইছি তারা অন্তত সান্ত্বনা পাবে যে আমাদের এই শহরের খ্যাতি জগৎজোড়া। হোক্ না তা প্রায় নিদারুণ কুখ্যাতি, কলকাতা দুনিয়ার মানচিত্রে জাজ্জ্বল্যমান্ জায়গা নিয়ে রয়েছে। সাম্রাজ্যশাসন আর শোষণের একটা প্রধান কেন্দ্র বলে ইংরেজ আগে কলকাতার গুণ গাইতে সংকোচ করত না, আজ তারাই কোমর বেঁধে কলকাতার কালিমা নিয়ে কথকতায় বোধ হয় অগ্রণী। আমরা বাঙালিরাও এই শহরের দিনের পর দিন বেড়ে ওঠা দুর্দশা দেখে বুক চাপড়াই কম নয়—হয়তো এভাবে নিজেদের নির্যাতন করা কলকাতাকে ভালোবাসারই

এক প্রকার রূপান্তর। তবে সঙ্গে সঙ্গে জানি এ-শহরের ইন্দ্রজাল বা বিদেশীকে মুগ্ধ না করলেও বিস্মিত করে—আন্তর্জাতিক অর্থ দফতরের এক বড় সাহেব হ্যারল্ড্ ল্যুবেল্‌ সম্প্রতিও বলে গেছেন যে কলকাতা শহর মনের উপর যে ছাপ রাখে তা হল প্রধানত যেন "একটা প্রাণময়তা আর সৃষ্টিশীলতা আর অদম্য উদ্দীপনার অনুভূতি" ('The Exploding Cities,' by P. Wilsder and R. Righter, 1978, epilogue by Barbara Ward, দ্রষ্টব্য)।

প্লেটো তাঁর বিশ্ববিদিত রিপাব্লিক পুস্তকে লিখেছিলেন যে সব শহরের দুটো ভাগ থাকে, একটা থাকে গরিব, অন্যটায় যারা ধনী, আর এদের মধ্যে মিল নেই। এর প্রায় বাইশ শো বছর পরে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আর সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রধান এক প্রতিভূ ডিজ্‌রেলি বলেছিলেন যে সে দেশে বাস করে দুটো জাত, একটা হল গরিবের জাত আর-একটা হল ধনবানের জাত। সমাজে শ্রেণী-বিভক্তি মার্কস্ এঙ্গেল্‌স্-এর যেমনো আবিষ্কার নয়, সে-দাবি তাঁরা কখনও করেননি—এটা হল নিছক বাস্তব ঘটনা। সমাজ-বিষয়ক তথ্য। এর ফলাফলের সঙ্গে মোকাবিলার চেষ্টা হল ইতিহাসের একটা বড় অংশ। এ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রাচীন গ্রীসের মহামনীষীরা বার করতে পারেন নি। আদর্শ রাষ্ট্রচনার ফরমায়েস যে শাসক-বন্ধু প্লেটোকে দিয়েছিলেন, তারই খেয়ালে অবশ্য মানুষটিকে গোলামের হাটে বিক্রি করে দেওয়ার হুকুম হয়—ভাগ্যক্রমে এক শুভার্থীর সাহায্যে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরতে পারেন। মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ভেবে-চিন্তে স্থির করেছিলেন যে আদর্শ রাষ্ট্রে (যা ছিল গ্রীক চিন্তায় একটা নগর আর তার উপকণ্ঠ নিয়ে) নাগরিকসংখ্যা ৫,০৪০ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়, কারণ তা হলেই তারা স্বচ্ছন্দে যেখানে হাট বসে সেখানে জড়ো হয়ে শাসন পরিচালনা করতে পারবে। অবশ্য প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর 'নাগরিক' সংজ্ঞার মধ্যে মেহনতী মানুষের স্থান ছিল না; যাদের পরিশ্রম গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধারণ করে রাখত। তারা হয় ক্রীতদাস নয় বিদেশাগত বলে নাগরিক অধিকারের বালাই তাদের ছিল না।

এখনও নগরজীবনের এই নিদারুণ দ্বৈত আর দ্বন্দ্ব প্রায় সর্বত্র বিরাজমান—ধনবাদ যেখানে পরাস্ত সেখানে নতুন আলেখ্য দেখা যেতে থাকলেও বহুকালের ছাপ সম্পূর্ণ মুছে যেতে সময় লাগে। মাঝে মাঝে এরই সংঘাত উৎকট ঘটনার মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্তর্নিহিত

কালিমা জল্‌জল্‌ করে ওঠে, উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কার পারদবৃন্দের টনক একটু নড়ে। এমনি ঘটনা ঘটেছিল নিউইয়র্ক্ শহরে ১৯৭৭ সালে যখন প্রায় আঠারো ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ফলে দোকানহাট ভেঙে প্রচণ্ড লুটপাট চলতে থাকে—আর গোটা আমেরিকা সচকিত হয়ে যেন নতুন একটা আবিষ্কার করে বসে যে তাদের মধ্যে আছে একটা 'অধঃ-শ্রেণী' ("under-class"), যাদের প্রায় সবাই হল 'টাইম্' পত্রিকার রূঢ় ভাষায় "Blacks and Mexiques"। অর্থাৎ সেদেশের 'সমৃদ্ধ' 'গণতন্ত্রে' যাদের অংশীদারি প্রায় নেই তারা। হঠাৎ অমন ব্যাপার ঘটায় তাজ্জব হয়ে মার্কিন সাংবাদিকরা পর্যন্ত সমাজ বিষয়ে কতকগুলো মূলকথা কিছুটা বুঝেছিল—তাদেরই মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে তখন শোনা গেল যে রোজগার আর জীবনযাত্রার মান বাড়লে কি হবে, প্রকৃত ধনীদের দৌলত এতই বেড়েছে যে অধিকাংশের, বিশেষ করে বেকারদের মনে জমে-ওঠা হিংসাদ্বেষের বিস্ফোরণ অস্বাভাবিক নয়।

উপরোক্ত প্রবন্ধটিতে মন্তব্য রয়েছে (সঙ্গে সঙ্গে তথ্য এবং চিত্র) যে দুনিয়ার সব চেয়ে ধনী শহর নিউইয়র্কে (যেমন ১৯৬৪-৬৫ সালে) মারামারি কাটাকাটি আর সর্ববিধ অপরাধের অবধি নেই। অথচ জগতের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গরিব শহর কলকাতাকে বলা যায় "মোটের ওপর অপরাধ-মুক্ত"। এ থেকে উল্লাস সংগ্রহে লাভ নেই। কারণ আমরা তো জানি আমাদের নিজস্ব হাজার গ্লানির কথা যা মাঝে মাঝে ফেটে পড়ে দাঙ্গায় আর নোংরা, ছিঁচকে অথচ হিংস্র হানাহানিতে। কিন্তু হয়তো এটাও সত্য যে আমাদের দেশের মানুষের মনে আছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি, যা অবশ্যই নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর বলে নিন্দার্হ অথচ যা সমস্ত কারণে বোবাক্ততা থেকে নিবৃত্ত করে রাখতে পারে। হয়তো ভবিতব্যে আস্থা, নিয়তিকে অবাধ্য অকাট্য জেনে সর্বদা স্বীকার করা আর সনাতন সমাজের নিগড়ে নিজেকে বেঁধে রাখার নিত্যকর্মপদ্ধতিতে বহু যুগ ধরে অভ্যস্ত থাকার এটা ফল। বলতে সংকোচ আসে কিন্তু হয়তো বা এর-ও মধ্যে আছে বিচিত্র এক মহিমা যার আশ্চর্য রূপ দেখা দিয়েছিল ছত্রিশ বছর আগে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কলকাতার রাস্তায়। রসালো খাবারের দোকানের সামনে আর আশেপাশে তখন ক্ষুধিত মানুষের তিলে তিলে মৃত্যু চাক্ষুষ করার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছে—কেউ কোনো উপদেশ দেয়নি কিন্তু অনাহারক্লিষ্টের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে দোকান লুঠ করেনি। ১৯৭১ সালে বহু লক্ষ বাঙালি শরণার্থ

শিখিয়ে, কলকাতারই উপকণ্ঠে, কোনোক্রমে জীবনধারণের মতো খাদ্য পেয়েছে কিন্তু কেউ ছোটেনি শহরকে লণ্ডভণ্ড করতে।

'মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ, ন চ ধূমায়িতং চিরং'—সর্বদা নিজের মনের মধ্যে ধোঁয়া দুয়তে থাকার চেয়ে মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠা অনেক ভালো। মহাভারতের এই কথা অনেকের মনে আসবে। আমাদেরও চেতনায় বিদ্রোহের প্রদীপ্তি আসবে—কিন্তু কবে, এ প্রশ্নের উত্তর আজও নেই। মাৎস্যন্যায়ী ভারতবর্ষে তাই আজ পর্যন্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। যে-ক্লৈব্য পরিহার করার সমুজ্জল মন্ত্র অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, তা হয়তো আজও অশ্রুত, খণ্ড, ক্ষুদ্র অথচ বহ্নিমান সাহসিকতার বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সাম্প্রতিক বিবরণীতে, কিন্তু সংহত, ব্যাপক গভীর জাগৃতি ঘটেনি। 'ঝড় ও ঝরাপাতা'-র মতো রচনাতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার যে ছবি (১৯৪৫-৪৬) এঁকে গিয়েছেন, তা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে। আরও অনেক কাছের দিনের কথা স্মরণ করা সহজ; স্বাধীন ভারত সরকারের দুর্দান্ত দমননীতিকে উপেক্ষা করে অসম-সাহসিকতার বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা দেখেছে কলকাতা, কিন্তু গোটা শহরের মানুষ জেগে ওঠেনি। ক্ষোভ আর রোষে দীপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়নি, তেমন ডাকও তারা শোনেনি। যাক সে কথা।

বিপ্লব হঠাৎ আনবে নূতন প্রভাত, আর তার পর থেকে সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারব, এমন চিন্তা স্রেফ অচল; অতটা হাবা-গোবা ভাব কারও আছে মনে করাই কঠিন। সমাজের বিবর্তনে বিপ্লব যে পূর্ণচ্ছেদ আনে, তা নয়; একেবারে চূড়ান্ত রূপান্তর সিদ্ধ হয়ে গেল, প্রশ্নাতীত তার প্রকৃতি, এমন চিন্তা অন্তত মার্কসবাদ-এর সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। বিপ্লবের ইতিবৃত্তে সকল বিপ্লবের বিকাশ-বিবরণেও, দেখা যাবে উত্থান-পতনের ঘটনা, বহু ত্রুটি-গ্লানি। অপরাধ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে, একেবারে শান-বাঁধানো পাকা সড়ক দিয়ে বিপ্লবের রথ চলে না। মহাচীনে বিপ্লব গোটা দুনিয়ার মেহনতী মানুষকে একদা মুগ্ধ করেছিল; তার কর্মকাণ্ডের দিকে ভারতবর্ষের মতো দেশ সাগ্রহে ও সানন্দে তাকিয়েছিল; কিন্তু সেখানে এসেছে বিকৃতি, এসেছে বৈচিত্র্য পদস্খলন, এসেছে প্রায় অমার্জনীয় অধোগতি। তবুও সন্দেহ নেই বিপ্লবের সোনার কাঠি বিরাট এবং প্রাচীন এক জাতির সুপ্তিভঙ্গ ঘটিয়েছিল, যার জের নষ্ট হবার নয়, এবং সেজন্যই চীনের বর্তমান নায়কদের দুষ্কৃতি সত্ত্বেও সেখানকার জনগণের কাছে ইতিহাসের অনন্ত ভরসা। আর রূপান্তর যে সেখানে

ঘটেছে—ভারতবর্ষের তুলনায় যা হল বিপুল এবং গভীর—এ বিষয়েও সংশয় নেই। মনে পড়ছে ১৯৬৬ সালে শুনেছিলাম টরোন্টো শহরে লেখক Felix Greene-এর মুখে যে বিপ্লব-পূর্ববর্তী সাংহাই শহরে প্রতি বৎসর গড়ে ১৮,০০০ মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকত বে-ওয়ারিশ অবস্থায়, কেউ জানত না সেই সব সনাক্ত এবং দাবি করতে। বিপ্লবের পর থেকে এ ধরণের ঘটনা আর ঘটে না, ঘটতেও পারে না। কলকাতার পথে-ঘাটে বহু দৃশ্য আজও দেখা যায়, যার অবসান হয়তো তখনই ঘটবে যখন আমাদের জীবনের শিকড়ে গভীর টান না পড়লেও অন্তত মোটামুটি সমাজে একটা বিবর্তন আসবে যার লক্ষণ শত বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও আজ নেই।

কলকাতা শহরের ইতিহাস বেশি দিনের নয়—তিনশো বছরের বৃত্তান্তে প্রকৃত শহরে ছাপ আছে তার এক ভগ্নাংশে মাত্র। তাছাড়া শহর আর গ্রামের তারতম্য বৃহত্তর কলকাতার বহু এলাকাতেই খুব অল্প। ইংরেজ শাসক কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই কলকাতার কর্তৃত্ব পেয়ে গিয়েছিল, শহর হিসাবে যে মুর্শিদাবাদ বা হুগলীর তুলনায় কলকাতা উঠতি জায়গা তা বোঝা যায় বেশ দেরিতে, ইংরেজ শাসন যে জাঁকিয়ে বসতে পারবে তা নিশ্চিত হতেও দেরি ঘটেছিল। তবু বিদেশী কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে কিছু পরিমাণে এবং অত্যন্ত সীমিত অঞ্চলে শহর বানাবার চেষ্টা করে। পরিকল্পনা ব্যাপারটা ফরাসীদের তুলনায় ইংরেজদের ধাতে ছিল খুবই কম, তাই অবস্থা-বুঝে-ব্যবস্থা-র 'নীতি,' তারা চালিয়ে এসেছে; কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে প্রায় অযাচক কায়দায়। কিপলিং-এর ভাষায়: As the fungus sprouts chaotic from its bed So it spread.../And above the packed and Pestilential town/Death looked down। প্রায় নব্বই বছর আগে লেখা কবিতায় কিপলিং আরও বলছেন কলকাতার নানা অসঙ্গতির কথা: 'Palace byre, hovel poverty and pride/Side by side। সাহেব-পাড়া আর বিস্তীর্ণ 'নেটিভ' অঞ্চল অদ্ভুত অথচ অত্যন্ত স্বস্তির সঙ্গে কলকাতায় সহাবস্থান করেছে বহুকাল; সেদিন পর্যন্ত খাস কলকাতার ভিতর শহর আর পাড়াগাঁ গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থেকেছে, পুকুর আর মাটির ঘর, জলা আর 'বস্তি' দেখা গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতো মস্ত ইমারতের ছায়ায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে কলকাতা যখন সেরাই শহর হয়ে উঠল, বাংলার পল্লীবাসীরা যখন প্রায় শিউরে উঠে বলতে থাকল যে কলকাতায় আছে 'বাহায় বাজার আর তিপ্পান্ন গলি', তখন থেকে এর চেহারা দিব্যি থেকে

'বিচিত্তর' হয়ে চলেছে—মেহনতি মানুষ সাধারণত থেকেছে খোলার বাড়িতে আর কলম-পেষা 'বাবু'-রা থাকতে চেষ্টা করেছে খুপচি, স্যাঁৎসেঁতে হলেও মোটামুটি পাকা বাড়িতে 'বাসা' করে—আমাদের ছেলেবেলাতেও কাউকে 'বাড়ি' কোথায় জিজ্ঞাসা করলে জবাবে শোনা যেত আদি নিবাস যেখানে সেই গ্রামের কথা (অবশ্য যারা খাস কলকাতার বাসিন্দা তাদের কথা বাদে)। 'ত্রিস্তর কেন, বহুগুণ ত্রিস্তর' গলির আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষের বসতি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে বাধ্য হল, উঠতি শহরের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গলিঘুঁজির অরণ্য ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠল, ফেঁপে ওঠা শহরের আকৃতিপ্রকৃতি সঙ্গে সঙ্গে কিম্ভূতকিমাকার হওয়ার প্রক্রিয়া বেশ প্রকট হতে থাকল।

তবু বহুদিন কলকাতার আবহাওয়াতে এক-ধরনের আধা-'গ্রাম্য' ভঙ্গি বলে বস্তু হয়তো ছিল, পাড়াগুলোর যেন একটা আলাদা সত্তা ছিল, অনেক পরিবারের মধ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক প্রকার নৈকট্য ছিল। শহরের বহু রাস্তায় ছিল মাটি যা বর্ষাতে কাদায় পিছল হলেও ছোটদের লাট্টু বা ডাণ্ডাগুলি খেলার জায়গা ছিল। কবে আমাদের গবেষকরা কলকাতার ইতিবৃত্ত মরমী কলমে লেখার আয়োজন করবেন জানিনা, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক জিনিসই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। চুনোগলির চিহ্ন বোধ আর আর নেই। পটারি রোডে আছেন যাঁরা তাঁরা 'কামারডাঙা' শব্দটি শুনলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন—রাধারমণ মিত্রের মতো মানুষ হয়তো ডুবে আছেন কলকাতার পুরোনো চেহারা আর চরিত্রের সন্ধানে। কিন্তু কলকাতার বহু বিচিত্র এলাকা আর খেটে-খাওয়া মানুষের সংখ্যাহীন পেশা নিয়ে কচিৎ কদাচিৎ কিছু লেখা যা চোখে পড়ে তা একেবারেই কম—কলকাতা হাইকোর্টে'র প্রাক্তন বিচারপতি চৌধিক আমীর আলিকে যেমন দেখা যেত রবিবারে হাফপ্যান্ট পরে সাইকেলে ঘুরছেন হজুরিমল লেন-এর রহস্য-উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে তেমন অনুসন্ধিৎসা প্রায় নেই। এই শহরের নানা অঞ্চল আর বাজার আর গলি আর বস্তি, হাটখোলা আর দর্জিপাড়া আর বৈঠকখানা আর জানবাজার আর বিবিবাগান আজও ধ্বংসাবশিষ্ট দশায় বর্তমান। এর বিবরণ আমাদের প্রায় অজানা, আর গোটা শহরের হাল কি ছিল, কি হতে চলেছে, তা নিয়ে চিন্তা আজ আতঙ্ক ঘটায় বলেই বুঝি তাকে বর্জন করা হল বুদ্ধিমানের কাজ।

কলকাতা ১৯১১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজধানী ছিল আর ১৮৭৪ সাল নাগাদ নাকি কলকাতার জলসরবরাহ ব্যবস্থা নাকি ছিল পৃথিবীর অনেক বড় শহরের সঙ্গে শুধু তুলনীয় নয়, ছিল তাদের কাছে ঈর্ষনীয়। তবে কলকাতাকে খুব একটা মনোরম জায়গা বলে মনে করার কারণ তেমন কখনও ছিল না। গঙ্গা নদীর শোভা সত্বেও তাকে নগরের শোভাবৃদ্ধির কল্যাণে টানা হয়নি, একটা রেচন রেল থাকার জন্যই সম্ভবত (উত্তর কলকাতায় যেহেতু 'কালা আদমি'-দের প্রাধান্য সেহেতু সেদিকে ইংরেজ-প্রভুর নেকনজর ছিল না)। কালীঘাটের একটা খ্যাতি অবশ্য অনেক দিনের কিন্তু তীর্থ মাহাত্ম্য, ও মন্দির তার অভ্যন্তরের দৈন্যকে কখনও ঢাকতে পারে নি। 'প্রাসাদ নগরী' (City of Palaces) বলে তার অষ্টাদশ শতকীয় বর্ণনায় যা আছে তার সাক্ষী হয়ে থাকা ইমারৎ আজ আর প্রায় নেই। বিলাতের কায়দায় বানানো সরকারী ও বে সরকারী কিছু উল্লেখযোগ্য সৌধ এখানে ছিল এবং আজও কয়েকটি আছে, কিন্তু তা নিয়ে 'আহা মরি' করারও কিছু নেই। (দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে না হলেও ইতিহাসবোধের দিক থেকে কলেজ স্কোয়ারের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো যে মস্ত থাম-ওয়ালা বাড়ি ছিল সেটার অগ্রভাগটি অন্তত না বাঁচিয়ে আধুনিক কেতায় কিন্তু বাস্তবিকই চরিত্রহীন ইমারৎ বানানো স্বাধীন ভারতের একটি অপকর্ম)। 'গড়িতে গেলাম তাজ, গড়িলাম গম্বুজ' বলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করেছিলেন, সেটাই বোধ হয় আজও কলকাতার সব চেয়ে দর্শনীয় নির্মাণ। আধুনিক পদ্ধতির অল্প হলেও লক্ষণীয় উদাহরণ দিল্লী বা বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু আজও কোনো অজানা কারণে কলকাতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বানানো বাড়ির মধ্যে তাকিয়ে দেখার মতো কিছু প্রায় নেই। যখন কলকাতার আধা-গ্রাম্য চেহারা আরও স্পষ্ট ছিল তখন সেই দৈন্যের মধ্যেও ছিল একটা বিশেষ সত্তার লক্ষণ—আজকের নোংরা নিছক নোংরা, তাই গ্রামের অনাবৃত্তি আর শহরের শিষ্টতা উভয় বস্তুই সেখানে অনুপস্থিত। পার্ক স্ট্রীটের কবরখানার গা বেয়ে খোন্দলভরা রাস্তার উপর বঞ্চিত মানুষের জীবনযাত্রার শুধু আছে একটা সর্বদা-গুমরে-থাকা যন্ত্রণার ছাপ, নেই কোনো স্বেচ্ছাচরিত সংগ্রামের লড়াইয়ের নিশানা। পশ্চিম ভারতের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তুলনা সমীচীন নয়; ভুল পথে চালিত হলেও মরিচঝাঁপির বাস্তুহীনেরা দেখিয়েছে যে তারাও লড়তে আর গড়তে জানে; কিন্তু কলকাতার পথেঘাটে দৈন্য-

দশায় যে প্রদর্শনী, তা যেন বিষম এক বিজ্ঞপ্তির সিদ্ধি, নিজের বিজ্ঞাপন।

দাম্ভিক বড়লাট কার্জন নাকি কলকাতাকে ভালোবাসতেন—বিশ্বাস করা শক্ত কিন্তু তিনি নাকি একবার বলেন যে গোটা দেশের শাসকের চেয়ে কলকাতা শহরের কর্তার (তখনকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান) কাজকে তিনি নিরেশ মনে করেন না। তখন অবশ্য আজকের পরিস্থিতির আভাস মাত্র দেখা দেয়নি—আজ যখন বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন যে মহানগর বা বিরাটনগর হয়ে দাঁড়াবার আগে আমাদের মতো দেশের শহর পরিণত হতে চলেছে মরাধিক্ষেত্রে ("doomed to be being a necropolis before it becomes a metropolis or a megalopolis")। কলকাতার দুঃস্বপ্ন দশা আজকের চেয়ে বেশি বই কম মর্মান্তিক যে আগে ছিল তা নয়, তবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল আলাদা। আজ যেখানে কলকাতার রাস্তায় শোয় প্রায় ছ লক্ষ লোক, তখন তার সংখ্যা কম থাকলেও তাদের মধ্যে একেবারে নিঃস্বের অনুপাত নাগরিক সংখ্যার হিসাবে ছিল অনেক বেশি (আমাদের মতো দেশে রাস্তায় শোওয়াটা সর্বদা নিঃস্বতার পরিচায়কও নয়)। যাই হোক, ইংরেজের কলকাতা বিষয়ে একটু মায়াও ছিল। এখনও একেবারে তা যায় নি—তার এ 'ভালোবাসা' অবশ্য ছিল 'মুসলমানের মুর্গী পোষা'-র মতো কারণ কলকাতাই ছিল তার শাসন ও শোষণের মূল কেন্দ্র। বেশ মনে আছে ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে কলকাতায় ইংরেজ মালিকানায় চালানো দৈনিকে বড়দিন সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধ "পকেট যদি ভারি থাকে তো ক্রিসমাস্ কাটাবার পক্ষে দুনিয়াতে সবচেয়ে উপভোগ্য জায়গা হল কলকাতা"! কলকাতায় বাস করেছে এমন সাহেব সচরাচর বোম্বাই দিল্লীকেও পছন্দ করে না সেখানকার জীবনযাত্রা কলকাতার চেয়ে সুগম হলেও। কলকাতার নামে কুৎসা রটাতে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগ পর্যন্ত শতমুখ, তখন হঠাৎ দেখা গেছে বিদেশী বিমান কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে কলকাতার একটু যেন প্রশস্তি (এটা হল তখনকার কথা যখন কলকাতা বিমানবন্দরের অধঃপতন আজকের মতো ঘটেনি বা ঘটানো হয়নি)। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রপ্তানির শতকরা ৪২ ভাগ আর আমদানির শতকরা ২৫ ভাগ কলকাতা বন্দর বহন করেছে। ষাটের দশক থেকেই কলকাতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে ঔদাসীন্য আর অবহেলা—রাজ্যের নেতৃত্ব, কী কংগ্রেসী কী বামপন্থী, মাথা তুলে এবং নিজেরা কাজ দেখিয়ে সেই অবহেলাকে ঠেকাতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রান্ত ব্যাপ্তি ও বিকাশের বোঝা

অন্যান্য শহরের মতো কলকাতাকেও বহন করতে হয়েছে। কষ্ট হয়েছে ঘোরতর, কারণ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই (মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ) কলকাতাকে যে প্রচণ্ড চাপ সইতে হয়েছে, তার সঙ্গে অন্য শহরের তুলনাই হতে পারে না। কলকাতার 'infra' 'Supra' (অধঃ-তল আর সমুচ্চ) কাঠামো অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়েছে।

'হায়, কলকাতা!' বা 'চুপ' (আমাদের এক রসিক ব্যারিস্টার বন্ধু বেঁচে থাকলে হয়তো সংশোধন করতেন, 'হিন্দুস্তানী চুপ') বা ঐ রকম কোনো উদ্ভট অপ্রাসঙ্গিক আখ্যা দিয়ে কলকাতার (তথা ভারতবর্ষের) অপযশ বিস্তারে তথাকথিত 'শিল্পীরা' পাশ্চাত্ত্যের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকলেও আমাদের বিচলিত হবার কারণ নেই। সাম্রাজ্যদর্পী মনোবৃত্তি গত ত্রিশ বৎসর ধরে আঘাতের পর আঘাত তো খেয়ে চলেছে; আজও প্রাক্তন পশ্চাৎপদ পৃথিবী পূর্ণ জাগ্রত হয় নি বলেই তাদের মহিমা তার এত বেশি। যাদের চোখে আমরা "The lesser breed without the law" তারা আমাদের একটু-আধটু পিঠ চাপড়ায় মাঝে মাঝে, যাতে তাদের আধিপত্য অন্তত প্রকারান্তরে আমরা মেনে চলি, কিন্তু তাদের জনগণের শ্রেষ্ঠত্ববোধ কখনও আমাদের স্বাধীন সত্তার সম্যক স্বীকৃতি দেয়নি, দিতে পারে না। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে পি-এন্-হক্সর উদ্ধৃত করেছেন ১৯৭৮ সালে লেখা বিবরণ যা টেলিভিশন মারফৎ মার্কিন মুলুকে দুই থেকে তিন কোটি লোককে দেখানো হয়েছিল, যা নাকি এক সুবিদিত ফিল্ম্‌ও নাট্য-সমালোচকের পরিচালনায় তৈরি হয়—এতে রয়েছে যে তাজমহল দেখার মোহ কেটে গেল পার্শ্ববর্তী গঙ্গানদীতে ('যমুনা' নয়!) ছোট্ট শিশুর শব নিয়ে শকুনিরা ছিঁড়ে খাচ্ছে, আর কলকাতার কথা শিল্পী মানুষ বলবেন কেমন করে, কারণ তিনি ভেবেছিলেন সেটা হলো 'পৃথিবীর শেষ'। এরোপ্লেনের বিদেশী পাইলটরা নাকি সেখানে বিমান থেকে নামতে সাহস পায় না, খায় টিনের মাছ আর বোতলের জল। আর রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা দেয় কারণ শহরের রাস্তায় পা দিলে মড়ার খুলিতে ঠোক্কর দিতে হবে। রাস্তা আর দেওয়াল মানুষ আর জানোয়ারের মলমূত্রে ভরা, আবার হাতি আর অন্যান্য জন্তু সেই কাদা আর জঞ্জালের মধ্যে ছুটছে! (Mainstream, May 26, 1979)। এ-হেন ভয়াবহ কলকাতায় যে আমরা বাস করি, তা ঠিক বিশ্বাস করে ওঠা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানেই সদলে এবং সোৎসাহে আসবে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতি-

মিছিল, আসবে কলকাতায় বিজলী সরবরাহ কোম্পানির সাহেব মালিকদের লোক, আসবে কলকাতা উন্নয়ন ব্যাপারে নাক গলিয়ে ভারতবর্ষের অর্থ ব্যবহারকে যথাসম্ভব কব্জায় রাখার মতলবে ব্যস্ত বিদেশী বণিকেরা।

বছর আটেক আগে Moorhouse নামে এক সাহেব কলকাতা সম্বন্ধে চলনসই একটা বই লেখেন—মুস্কিল যে সাহেবরা না লিখলে আমরা তেমন মানি না কারও কথা আর নিজেরা সচরাচর ভালো লিখেও উঠি না! —যাতে দেখা গিয়েছিল কিছুটা কলকাতাকে বোঝার চেষ্টা, উল্লেখ ছিল অবশ্য রবীন্দ্রনাথের। আরও উল্লেখ ছিল বর্তমানে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর, একটা সোনাকাতেরও বিবরণ ছিল, মনে করে রাখার মতো কয়েকটা মন্তব্যও ছিল। এই বইয়ে এবং অন্যত্র প্রায়ই দেখা গেছে কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তিরস্কার আর বিষোদ্গার যার অভিপ্রায় সম্ভবত হল ভারতবাসীর (এবং বিশেষত বাঙালির) শাসন ব্যাপারে অপটুতা আর দুর্নীতি প্রমাণ করা। কিন্তু যাকে সহজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেনে নেওয়া অসম্মানকর শুধু নয়, অসঙ্গত মনে করি। নগর-পরিচালনা ক্ষেত্রে অন্যান্য (বিশেষত পাশ্চাত্যের মধ্যমণি মার্কিন) দেশের সঙ্গে তুলনায় নেমে আমরা বরং কম খারাপ—এ ধরনের যুক্তি বাতুলতা মাত্র। কিন্তু একথা সত্য নয় যে নিছক আমাদের সহজাত চরিত্রদৌর্বল্য ও অকর্মণ্যতার ফলে কলকাতার বর্তমান দুর্দশা। এর অর্থ নয় যে কলকাতা কর্পোরেশনের কৃতিত্ব নিয়ে বড়াই করা সমীচীন সঙ্গে সঙ্গে এটাও এর অর্থ নয় যে কলকাতায় কর্পোরেশন সর্বদাই 'চোরপোরেশন' ছাপ গায়ে লাগিয়ে বসে থেকেছে। অধ্যাপক রজত রায় সম্প্রতি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এ নিয়ে অনুপাত বোধ বজায় রেখে বাস্তবিক ভালো লেখায় কলকাতার নগর প্রশাসন ও তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ইতিহাস আমাদের ধাতে কম, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতেও সময় লাগে না। সেজন্যই বিশেষ দরকার অধ্যাপক রজত রায়ের মতো চিন্তাশীল বিদ্বানের কাজ। এমন লোকের সংখ্যা খুব কম নয় যাদের আজও মনে পড়বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্তৃক কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব গ্রহণের কথা। এককালে দেশবরেণ্য বলে বর্ণিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার নগর-শাসনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বহুকাল লিপ্ত ছিলেন; সাবাস্ আটাশ-এর মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। যা নিয়ে উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা ভাষায় নানান

ছড়া ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড আইনের আওতায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা কর্পোরেশন আইন প্রণয়ন করেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার দিন ছিল তখন; সুভাষচন্দ্র বসু নিযুক্ত হন, কর্পোরেশনের কর্মকর্তা দেশবন্ধু কর্পোরেশনের মেয়র এবং তৎকালে তরুণ শহিদ সোহরাওয়ার্দি ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন; শিক্ষাবিস্তারে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে নগর-নিগম ব্যস্ত হয়, অমল হোম-এর মতো সুনিপুণ সাংবাদিক কর্পোরেশনের প্রচার-পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন; বেশ কিছুকাল আমাদের এই পোড়া দেশের পক্ষে ভালোভাবেই কাজ যে চলে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে, বিশেষত 'নেটিভ্'-পাড়ার দিকে পৌরসভার নজর তখনই প্রকৃতপক্ষে প্রথম পড়েছিল কোনো সন্দেহ নেই। কর্পোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ দুঃখকর হলেও এমন কিছু অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা কোনো দেশেই নয়, কিন্তু ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে যে পরাধীন ভারতবর্ষে কলকাতার মতো শহরের প্রশাসন মারফৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বহু কাজ তখন হয়েছিল; কর্পোরেশনের কারখানায় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনাও প্রকৃত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহু বিসম্বাদ, যা আমাদের সামগ্রিক জীবনকে কলঙ্কিত করে রেখেছে, অবশ্য কর্পোরেশনে (এবং অন্যত্র) বিড়ম্বনা ও ব্যর্থতা এনে দেয়, কিন্তু তা বলে সেদিনকার কথা মন থেকে উড়িয়ে দেওয়া একেবারে অসঙ্গত ব্যাপার। ১৯৮৫ সালে আবার যখন সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়, তখন বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল—তার ইতিহাসও স্মরণীয়, কারণ বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণে অগ্রসর হয়েছিল সন্দেহ নেই। তারই জের টেনে বলাতে চাই যে কলকাতা প্রশাসনের ইতিবৃত্তে শুধু কলঙ্ক দেখব না, তার উজ্জ্বল দিকটাও দেখব—তা না হলে আজ যে কাজ অপরিহার্য, সে-কাজগুলোও হয়ে উঠবে না। সবাই মিলে বিলাপ করা এবং বুক চাপড়ানো ছাড়া কলকাতার চেহারা বদলাবার যে উদ্যোগ অপরিহার্য, তাতে যোগদান সম্ভব হবে না।

যদি লণ্ডন, প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ক-এর আজও বর্তমান 'বস্তি' এলাকার (প্যারিসে রয়েছে 'bidonville') সাক্ষ্য টেনে এনে বলা হয় যে কলকাতা ঐসব শহরের তুলনায় বহুগুণ দুঃস্থ বলে উন্নয়নের আশা মরীচিকা মাত্র, তা হলে জবাব দিতে হয় যে এটা কোনো যুক্তি নয়,

এটা প্রকৃত তথ্যেরও মর্যাদা রাখে না। একথার একমাত্র তাৎপর্য এই যে আমরা হারিয়ে ফেলছি মানুষের উপর আস্থা (যার চেয়ে মহাপাপ নেই, বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ)। আর সমাজসত্য শুধু কতকগুলো কাঠির মতো সাজানো তথ্য নয়। সমাজজীবনে জটিলতার তো অন্ত নেই, মাথা-পিছু রোজগার হংকং শহরে হল কলকাতার চেয়ে দশগুণ বেশি। কিন্তু রাস্তায় জলের কলের সামনে হংকং-এর সারি ('কিউ') মাঝে মাঝে কলকাতাকেও হার মানায়, কিন্তু এ থেকে স্থির সিদ্ধান্ত কি ?

পেরু-র রাজধানী লিমা-র একটা ছবি রয়েছে 'The Exploding Cities' বইটিতে ; সেখানকার একেবারে গরিব এলাকার নর্দমার উপর ভাঙা তক্তায় পা ফেলে হাঁটছে একটি মেয়ে, অথচ বিজয়িনী ভাবে, তার কাছে সেটাই হল "citylights"। মনে পড়ে যায় কলকাতার বহু দুঃস্থ এলাকায় ইটের উনুনে রান্না বসিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন গৃহিণী, নির্বাচনের প্রাক্কালে—চোখে মুখে দারিদ্র্যের শত বঞ্চনাতেও অবিকৃত দীপ্তির আভাস, একে মর্যাদা দেবার অধিকারই হয়তো আমাদের নেই। কিন্তু এখানেও জীবনসত্যের সম্প্রকাশ। কে বলে কলকাতা মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ্য রাখে না। কে ভাবতে পারে এমন অনর্থের কথা যদি সে একটুও জানে আমাদের এই নিরন্ন নির্জিত দেশবাসীর অপরাজেয় মানসমহিমা।

'India : Population, Economy, Society' (1979) গ্রন্থে R. H. Cassen মনোজ্ঞ আলোচনায় বলছেন সম্মুখীন হতে হয় পশ্চিম জগতে এই ধরণের প্রশ্নের : 'আচ্ছা, ভারতবর্ষ দেখে কি দমে যেতে হয় না খুব।' কিংবা—'ভারতবর্ষের বেলায় কি সব আশাই ছাড়তে হবে?' এর অর্থ হল যে কেউ বেশিক্ষণ ধরে ভারতবর্ষের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় জড়াতেই চায় না। আর তাছাড়া, যা হোক্ করে ভারতবর্ষে তো টিকে থাক্‌বে-ই ! ভারতবর্ষ, আর বিশেষত কলকাতা নিয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে পাঠকের মনে স্বল্পস্থায়ী চাঞ্চল্য সৃষ্টি একটা বইয়ের প্রচার কতকটা নিশ্চিত করতে পারে বটে, কিন্তু তা কোনো সৎ সমাজবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এদেশের—এবং কলকাতার মতো শহরের—সমস্যা কঠিন এবং ঠিক সেজন্যই বিশ্লেষণ ও আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু তা এমন সঙ্গীন-অসম্ভব নয় যে 'হা হতোঽস্মি' বলা ছাড়া রাস্তা নেই।

তবে অকুণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের মধ্যে, বিশেষত বাংলায়, আছে নিষ্ঠার সমব্যবহারে ঘাটতি, আছে একটা অদ্ভুত নিরুদ্যমতা, যা সমস্যা থেকে পলায়নবিলাসে পরিণত। গত দু-বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎসংকট ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব গ্লানি স্বীকারে সংকোচ এবং কিছু পরিমাণে অসঙ্গত না হলেও পরিপূর্ণ ভাবে প্রাক্তন প্রশাসনের উপর দায়িত্ব আরোপ করে স্বকীয় অপরাধ স্খালনের উদ্ভট প্রয়াস এর এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিছক নিজের কটু অভিজ্ঞতার দু-একটা কথা এখানে বললে অতিরিক্ত ভুল-বোঝাবুঝি হবে না ভরসা করি। ১৩৫৩ সালের কলকাতা পৌর নির্বাচনের অব্যবহিত পরে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন এক্যবদ্ধ। নেতৃত্বের কাছে একটা প্রস্তাব লিখিতভাবে দিয়েও বিন্দুমাত্র সাড়া পাইনি—প্রস্তাবটা মোটের উপর ছিল এই যে শহর এলাকায় বামপন্থী যুবশক্তিকে উন্নয়ন-কর্মে লিপ্ত রাখার কার্যক্রম অত্যাবশ্যক, যেহেতু নিয়মিতভাবে প্রতি পল্লীর সমস্যা বিষয়ে পার্টির তরুণ কর্মীরা সর্ববিধ তথ্য সংগ্রহ করে, জনসংযোগকে সুগঠিত করে, প্রশাসনকে যথাসম্ভব সার্থক রূপ দিয়ে, নিজেদের এবং নগরবাসীদের সমাজচেতনাকে চাঙ্গা রাখতে পারবে এবং নেতৃত্বের সুচিন্তিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজে নেমে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মৌলিক রূপান্তর বিপ্লব বিনা অসম্ভব জেনেও যথাসম্ভব উন্নয়ন সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী পরিবর্তনের ঐকান্তিক আবশ্যিকতার ব্যাপক প্রচার ঘটাতে পারবে। হয়তো আমার যুক্তি বা বিবেচনায় ভুল ছিল। কিন্তু কেউ যে এসব দিকে নজর রাখা দরকার মনে করেন নি তা বুঝেছিলাম। এর বহুদিন পরে, বোধহয় ১৩৭৫ সালে, কলকাতার পাতালরেল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পরিপূর্ণ অনীহা সন্দেহ করে (যে অনীহা পুষ্ট করেছিল কেন্দ্রের তাচ্ছিল্য এবং আজও করছে) চেয়েছিলাম যে কলকাতার মানুষ যেন সচেতন থাকে আর পাতালরেল নির্মাণকে ত্বরান্বিত করার কাজে সহায়তার কার্পণ্য না করে। মনে পড়েছিল পাতালরেল পত্তনের দিন স্টুডেন্টস্ হেল্থ হোম কর্তৃক আয়োজিত এক মিছিল যা একটু উদ্দীপ্ত করেছিল আমাকে—কিন্তু ফল হল বামপন্থী মহল থেকে, নিজেরই রাজনৈতিক আত্মীয়দের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ উপহাস ও তিরস্কার। এই পাতালরেল নির্মাণের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কলকাতার জল সরবরাহ এবং জলনিকাশ ব্যবস্থার শতবর্ষাধিক কালের অবহেলাকে

পরিহারের প্রশ্ন। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মুষ্টিমের মোটরবিহারীর স্বাচ্ছন্দ্য নয়, জড়িত রয়েছে লক্ষ লক্ষ পদচারীর যাতায়াত সমস্যার আংশিক হলেও মৌলিক সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ—গরুর গাড়ির যুগে ফিরে যাওয়া (কাম্য হলেও) সম্ভব যখন নয়, তখন কলকাতাকে বাঁচতে হলে এ-ধরণের কার্যক্রম অপরিহার্য কিন্তু জানি না—স্বীকার করছি আমার মনে সংশয় রয়েছে—কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষীয়দের মনে এসব ব্যাপারে আগ্রহ বা দুশ্চিন্তা বা ব্যাকুলতা আছে কিনা।

গত দশ-পনেরো বছর ধরে যে প্রশ্ন কলকাতার মতো শহরে কাঁটার মতো সর্বত্র ফুটে বেরোচ্ছে, তার সমাধান কল্পে বাঙালি চিন্তার লক্ষণ দেখি অত্যন্ত অল্প। শহর, আধা-শহর, সিকি-শহর, এগুলি বেপরোয়া কায়দায় বাড়তে চলেছে—কারণও রয়েছে যেহেতু গ্রামের জীবনে সৌষ্ঠব ক্রমেই শুধু ম্লান পাওয়া নয়, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যাকে মার্কস একটু কঠোরভাবেই বলেছিলেন "the idiocy of rural life," ('গ্রাম্যজীবনের বেয়াকুবি') —শহরে জড়ো হয়ে তাকে এড়ানো আর জীবনসংস্থানের ধারাকে উন্নত করার ইচ্ছাকে দোষ দেওয়া শক্ত। এখনও পর্যন্ত গ্রামের জীবন অধিকাংশ গ্রামবাসীর পক্ষে এমন যে নির্দয় শহরের নৈর্ব্যক্তিক নির্যাতনও তুলনায় হয়তো সহনীয়। পঞ্চায়েতী রাজ হোক বা না হোক, গ্রামের অবস্থার উন্নয়ন আর কলকাতার (বা তার অদ্ভুত দোসর হাওড়ার) মতো অতিরিক্ত ছড়িয়ে-পড়া আর বেড়ে ওঠা আর হেলা-ফেলা শহরের সংকুচন ও যথাসম্ভব সমুন্নতি কবে আমাদের লক্ষ্য হয়ে বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে? ভয় হয় দেখে যে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষেই যেন আজ অসংকোচে বলার সাধ্য নেই যে কলকাতাকে আর বাড়তে দেওয়া হবে না। এমন কথা বলতে পারে সমাজবাদী দেশ—মস্কো বা বার্লিন সম্বন্ধে পরিকল্পনায় কোথায় নগরবিস্তার ব্যাপারে দাঁড়ি টানতে হবে তা জানা আছে, বলতে কুণ্ঠা নেই। কিন্তু সমাজবাদী দেশ নই বলে যে সাধারণ সদবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে বা তার স্বপক্ষে যুক্তি দেশবাসীকে জানবার সাহস রাখব না, এ হবে কেমন করে?

আমাদের পুরোনো পরিচিত কলকাতাকে ফেরানো যাবে না। কলকাতার জীবনে অঙ্গীভূত বহু বাঞ্ছনা বলে যাকে মনে করা হয়েছে তাকেও অবিকল ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতার সত্তার গভীরে যে মাধুর্য হয়তো আমরা অনুভব করেছি তাকে হারিয়ে বসব কেন? কলকাতার প্রায় সর্বত্র এর অশান্ত অপরিচ্ছন্ন, সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অবিচলিত সহনশক্তির একনায়ক

ছবি ছড়িয়ে রয়েছে, তাকে নতুন তুলি দিয়ে অন্যভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হবে না কি? এখানেই তো অজস্র বর্ণের ভেদ করে কবিতার নব নব উন্মেষে বাধা পড়তে দেয়নি বাঙালি। এই কলকাতা সম্বন্ধেই তো একজন কবি হয়ে বলেছিলেন যে প্রতিটি গলিতে আছে এমন গল্পলেখক যার লেখা খাজা আহমদ আব্বাস এর চেয়ে ঢের ভালো! যদি কেউ বিদ্রূপ করে বলে যে কলকাতা তো শুধু করুণার উদ্রেক করতে পারে আজ, তাহলে বলতে হয় যে করুণাতে তো কেবল খেদ নেই, দূর থেকে মমতা টানবার করুণ দাবি নেই, করুণায় আছে তমসা নদীতীরে আদি কবি বাল্মীকির প্রথম উদাত্ত শব্দঝংকার যাতে নিহিত রয়েছে ভারত-মানসের মূল মন্ত্র, বিশ্বলোকের মানবিক স্তোত্র।

সঙ্গীত প্রসঙ্গ

রাজেশ্বর মিত্র

কয়েক বৎসর আগে গানের জগৎটা দখল করে নিয়েছিল আধুনিক বাংলা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত জাত বাঁচিয়ে বেরুতো সামান্য কিছু,—অপর গান নগণ্য। আজকে ছবিটা যেন অনেকটা পালটে গেছে : আধুনিক গানের চাহিদা অনেক পরিমাণে কমে এসেছে—রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার তেমন না বাড়লেও, আগের চেয়ে বোধ হয় অল্পস্বল্প বেড়েছে, অতুলপ্রসাদের গান জনপ্রিয় হচ্ছে, দ্বিজেন্দ্র-লালের এবং রজনীকান্তের গান বেশি পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করছে এবং সর্বাপেক্ষা বেশি চাহিদা নজরুলের গানের। হ্যাঁ, পরিস্থিতি এ-রকমই। গ্রামোফোন কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি—আধুনিক গানের কাটতি সম্বন্ধে কোনও আন্দাজ করা যায় না, যেটা বিক্রি হল না, সেটা একেবারেই জমা হয়ে রইল, যেটার বিক্রি হল, সেটাও যে কতটা হবে তার পরিমাপ করা সম্ভব না ; অথচ অপরাপর ক্লাশ গান সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যায়। কেননা, যে শ্রেণীর শ্রোতা এইসব রেকর্ড কেনেন, তাঁদের সংখ্যা মোটামুটি একটা নিয়মিত রকমের থাকে, সেই হিসেবে বিক্রি হলে তেমন নিরাশার কারণ ঘটে না। কিন্তু, খুব নামকরা শিল্পী, যাঁর জনপ্রিয়তা খুব সাধারণ মহলে, অর্থাৎ ব্যাপক, তাঁর রেকর্ড হঠাৎ অচল ঠেকলে ক্ষতির কারণ হয়। কয়েক বছর ধরে এরকম ঘটনার ফলে আধুনিক গাইয়েরা একটা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রত্যেক বছরেই পুজোর আগে তাঁদের দুর্ভাবনায় কাটাতে হয়, যদি কোম্পানি

মুখ ঘুরিয়ে বসে! একাধিক কোম্পানির সদয় দৃষ্টিপাত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এমন শিল্পী প্রতি বছরই দু-একজন করে দেখা যাচ্ছে। হাল আমলে বেতারে, আমি যতদূর জানি, আধুনিক গান গাইবার আবেদন নিয়ে আসছেন কম সংখ্যক ব্যক্তি; অথচ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—এঁদের গান প্রচার করতে উৎসুক গায়ক-গায়িকার সংখ্যা মোটামুটি বেশ ভাল; যদিও কোনও বিভাগেরই মান তেমন উন্নত নয়। অপরদিকে লোকসঙ্গীতের প্রচারকামী ব্যক্তিদের সংখ্যা মোটেই অল্প নয়; কিন্তু সেখানেও একটা কৃত্রিম প্রচেষ্টা আমাদের নিরতিশয় উদ্বিগ্ন করেছে। লোকসঙ্গীতের নামে যে ব্যাপারটা ঘটে চলেছে তাকে সমর্থন করা উচিত তো নয়ই, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় হবে।

এই পরিস্থিতি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে আমরা ক্লাসিক পুরাতন সৃষ্টির মধ্যেই ঘুরছি, নতুন সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখাতে পারছি না। চলমান কাব্যসঙ্গীত, যাকে লঘুভাবে "আধুনিক" বলা হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের ইনটেলেকচুয়েল মহলে প্রভূত অবজ্ঞা। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে বলেন—"আমি আধুনিক মোটে বরদাস্ত করতে পারি না"। তাঁদের এ মন্তব্য করবার পক্ষে সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু নতুনকে বরণ করব না, কেবল পুরনো আর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব, এ-রকম চিন্তা বা মনোভাবটাও তো মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল—এঁদের গানের এত চর্চা করছি, অথচ নিজেরা সৃষ্টির কোনও সার্থক নির্দেশ পাচ্ছি না কেন? গাইবার লোক হচ্ছে, অথচ কম্পোজার হচ্ছে না, এটা অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতি। কেন এমনটা হচ্ছে সেটা ভেবে দেখা দরকার।

প্রথম কথা হচ্ছে, আধুনিক বাংলা গানে আমরা এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, যা আমাদের মনকে পরিতৃপ্ত করে। এসব গানের কথা হালকা বলে নয়, বিষয়বস্তু একেবারে ফাঁকা বলেই আমরা এদিকে একেবারেই আকৃষ্ট হই না। অনেকে বলেন—একেবারেই কমার্শিয়াল বলে বাংলা গানে সত্যিকারের রসসৃষ্টি হচ্ছে না। এই বক্তব্যে আমার মন সায় দেয় না; যিনি স্রষ্টা তিনি সব পরিস্থিতিতেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করতে পারেন; হয়তো সব রচনা রসোত্তীর্ণ না হতে পারে, তবু কয়েকটা গান নিশ্চয়ই শ্রোতাদের ভাল লাগবার মতো হয়। নজরুল তো পুরোপুরি কমার্শিয়াল গীতিকার ছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনাগুলি অধিকাংশই জনমনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। তিনি একই প্রেমের

গান রচনা করে যান নি ; সব বিষয়ের গানই রচনা করেছেন, বিভিন্ন শ্রোতারা সেগুলি শুনে তৃপ্ত হয়েছেন। রেকড কোম্পানিরা যে সব ক্ষেত্রেই খুব সস্তা গান চালাতে চান, এমন নয়, ঝুঁকিও তো মাঝে মাঝেই বহন করেন। বরঞ্চ আকাশবাণী এদিকে বহুল পরিমাণে উদাসীন ; কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যাতে তাঁদের ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। আসল কথা, আমাদের গীতিকারগণ যতটা কবি তার চেয়ে অধিক অর্থকামী। সিনেমার চাহিদা মেটাতে তাঁরা অবসরকালেও এমন সব গান রচনা করে রাখেন, যা একমাত্র চলচ্চিত্রের কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কোথাও ঠাঁই পাবার উপযুক্ত নয়। তাঁরা প্রযোজকদের এতটা বশংবদ যে তাঁদের চিত্রকাহিনী ছাড়া নিজেদের ব্যক্তিত্ব আরোপ করবার মতো মনের জোর তাঁদের মধ্যে একটুও অবশিষ্ট নেই। আগেও এসব অল্পবিস্তর ছিল, কিন্তু এতটা নয়। হিমাংশু দত্ত সুরসাগর এবং অজয় ভট্টাচার্য তো বহু চলচ্চিত্রেই তাঁদের রচনা এবং কম্পোজিশন প্রয়োগ করেছেন—সেখানে তাঁরা হীনতা স্বীকার করে আপস করেছেন বলে মনে পড়ে না। অবস্থা এমন এসে দাঁড়িয়েছে যে আজকাল অনেক কবি এবং সুরকার গায়ক গায়িকাদের বাড়িতে গিয়ে ধরনা দিচ্ছেন যাতে অনুগ্রহ করে তাদের গান এবং সুর তাঁরা প্রচার করেন। হবুচন্দ্র রাজাদের যেমন গবুচন্দ্র গোছের মন্ত্রী নইলে চলে না, তেমনি গবেট মার্কা আর্টিস্টদের পিছনে নিরেট মস্তিষ্ক গীতিকার, সুরকার ছাড়া আর কারা ধাবমান হবেন? ট্র্যাজেডিটা ঘটছে এইখানেই ; আরও আছে।

আজকাল বাংলাগান সম্প্রদায় হিসাবে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথমটা এর সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের উঁচু মহলের রক্ষণশীলগণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেল গেল—রব তুলে তাঁরা কলকাতায় একাধিক অভিজাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া অন্য কোনও গান উচ্চারণ করাও মহাপাপ। তৎকালীন এইরকম দু-একটি প্রতিষ্ঠানকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। কিন্তু, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রক্ষা করার মহৎ আদর্শ এঁদের কাছে ছিল না—রবীন্দ্রসঙ্গীত যে আজ একটি সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে তার সূত্রপাত করেছিলেন এই দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ। ব্যাপার হচ্ছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিত্তশালী বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসতেন ; তাঁদের আনুকূল্যে সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুবিধা নেওয়া সহজ ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও অনুরূপ অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলাগানের অতীত, বর্তমান কিছুই যারা জানে না তাদের ক্রমাগত স্বরলিপি মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে

বিশেষজ্ঞ করা হতে লাগল। ফলে, এক ধরনের স্টাইলের সঙ্গেই তারা পরিচিত হতে লাগল, এবং অপর কম্পোজিশন সম্বন্ধে পোষণ করতে লাগল অপরিসীম অবজ্ঞা। ঠিক এই সময় "বেতার জগৎ" পত্রিকায় আমরা একটি আন্দোলন আরম্ভ করি যে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি রচয়িতাদের গানও পরিপূর্ণ স্বীকৃতির সঙ্গে প্রচার করা হোক। অনেকেই এই প্রস্তাবের সমর্থন করেছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে অপরাপর কম্পোজারদের গান বেতারে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এতে এই লেখকের শত্রু বৃদ্ধি হয়েছিল কম নয়। কিছুদিন পরে আমি যখন "দেশ" পত্রিকায় বাংলাগানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখতে থাকি এবং বাংলাগানকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানাতে থাকি তখন এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ "আনন্দবাজার পত্রিকা"র আপিসে এসে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়াতে আরম্ভ করেন। তাঁদের অভিযোগ আমি নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। এতে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে আমি নিজে থেকেই কিছুকালের জন্য লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এতে ওঁদের কি লাভ হয়েছিল বলতে পারি না, তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মান ধীরে ধীরে অবনতির দিকেই গেছে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ঐতিহ্য আজ প্রায় বিলুপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর কারণ এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ থেকে শিক্ষক, শিক্ষিকারা বাংলা গানের ধারাবাহিক রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত নন, একাডেমিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে এঁরা কোনো ধারণা পোষণ করেন না। ফলে আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে প্রতিফলিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা লাইনড্রয়িং ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের তাঁরা আর কিছু দিতে পারেন নি।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা একবার প্রবেশ করলে তাকে বিচ্যুত করা দুষ্কর। প্রথমে যে উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে, তার ফলে আমরা কি দেখছি? বাংলার সঙ্গীত জগৎ আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল—এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধারার শিল্পীরা নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এঁদের গলা এক-একটা বিশেষ ধরনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং অন্য কোনো গান আয়ত্ত করতে গেলেই তাঁদের গলায় এক-একটা বিশেষ বিশেষ "ম্যানারিজম্" ফুটে উঠছে। বাংলা গানকে এঁরা আদৌ জানতে চাননি এবং বুঝতে চাননি অথচ বিশেষ বিশেষ ধারা বিশেষত্ব অর্জন করতে চেয়েছেন। যিনি নিধুবাবুর টপ্পার "ট"টুকু পর্যন্ত জানেন না, তিনি রবীন্দ্রনাথের গানে টপ্পার শৈলী ফুটিয়ে তুলতে

চাইছেন এবং কোথায় যে তাঁদের ব্যর্থতা, সেটা অনুভব করবার ধারণাটুকুও তাঁদের দেখা যায় না।

এইরকম তোতাপাখির মতো যাঁরা গান শিখে সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠেছেন তাঁরা কি কোনদিন কম্পোজার হতে পারবেন? এত সীমিত ধারণা নিয়ে আর যাই হোক, সুরকার হওয়া যায় না। আর এক ধরনের শিল্পী আছেন, যাঁরা রেকর্ড জগতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ছেলেবেলা থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে যেসব আধুনিক গান প্রচারিত হয়ে এসেছে তাঁরা সেইগুলি গলায় তুলে তাদের জনপ্রিয়তাকেই সঙ্গীতের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচনা করে এসেছেন। এঁরা বাংলাগানে ক্লাসিসিজমের ধার ধারেন না, কিন্তু নিজেদের নিও-ক্লাসিসিস্ট বলে প্রচার করে নতুন ঐতিহ্য প্রবর্তনের আন্দোলনে বিশ্বাসী। বাংলাগানের জগৎ আজ শ্রেণীবিদ্বেষে ছেয়ে গেছে, কিন্তু এই শ্রেণীও যেমন আদর্শহীন, বিদ্বেষ তেমনি অকারণ। এইভাবে কোনো দিন কোনো আর্ট এগুতে পারেনি, আজও এগোবে না।

আমরা যে সঙ্গীত সম্বন্ধে সামগ্রিক মূল্যবোধকে হারিয়েছি, তাকে অর্জন করতে হবে, বাংলার সঙ্গীতকে একত্রভাবে উপলব্ধি করে প্রত্যেক কম্পোজারের সৃষ্টিকে "কমপারেটিভ স্টাডি"-র মাধ্যমে না বুঝলে বাংলার সঙ্গীতের মূল ধারাকে অনুসরণ করা যাবে না। এটি না করতে পারলে কোনদিন বাংলা-গানে মূল্যবান শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দেশকে, জাতিকে তার ইনটেলেকটকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে হবে, তবেই আসল সৃষ্টির প্রেরণা আনবে যা স্রষ্টাকে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করতে পারবে।

বাঙালী শ্রোতা এবং উঠতি শিল্পীরা বাংলাগানে আর্টের দিক থেকে একটা বিপুল শূন্যতা অনুভব করছেন বলেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি স্রষ্টাদের গানকে আঁকড়ে থাকতে চাইছেন—কেননা সেখানে তাঁরা তৃপ্তির সন্ধান পান, রসে নিমগ্ন হতে পারেন। বাঙালী তরুণেরা হিন্দী সিনেমার গান লাউডস্পীকারে শুনবে, নাচানাচি করবে, কিন্তু বাংলাগানে সেই রকমটা বরদাস্ত করতে চাইবে না। সেখানে তাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়, তাই বাংলা রেকর্ড যখন হিন্দী সিনেমার নকল হয় তখন সেটা রকবাজ ছেলেদেরও প্রত্যাশা পূরণ করে না, তারা প্রকাশ্যেই তাদের আপত্তি জানিয়ে বলে বাংলাগানে এমনটা না হওয়াই উচিত ছিল। আমাদের আধুনিক সুরকারদের ভুল হচ্ছে এইখানেই, বাংলার গড়পড়তা মনকে তাঁরা ঠিক এস্টিমেট করতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেছেন সাধারণ

রুচি যখন নিম্নস্তরের, তখন যতটা ফাঁকা আর হালকা গান রচনা করা যায় ততটাই জনপ্রিয়তার দিক থেকে সুবিধাজনক হবে ; কিন্তু সেই স্তরেরও একটা স্বধর্ম আছে একটা "মিনিমাম" রুচিবোধ আছে, একটা জাতিগত ইজ্জতবোধ আছে। সেই কবিগান, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, যাত্রা, থিয়েটারের যুগ থেকে বারে বারে বহু স্রষ্টা এলোমেলো গান রচনা করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়েছেন,—লোকরুচিকে তাঁরা যতটা খেলো ভেবেছেন আসলে তা ততটা লঘুস্তরের নয়। অতএব, আবার সঙ্গীতকে সংস্কার করতে হয়েছে, আবার এক-একটা নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে, তবে স্রষ্টারা লোক-সমাদর লাভ করেছেন। কিন্তু, আজকের গীতিকার এবং সুরকারগণ কি এই ইতিহাসের পথে পরিভ্রমণ করেছেন ? করেন নি,—তাই তাঁরা আজ এতখানি বিপর্যস্ত এবং উদ্দেশ্যহীন। নজরুলের বিপুল জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ এই যে তিনি কোনদিনই বাংলাগানের চিরাচরিত মানকে লঙ্ঘন করেন নি ; তাঁর কাব্য এবং সুর থেকে বাঙালীরা বরাবর সেই বস্তুটি পেয়েছেন যা তাঁদের গড়পড়তা রুচিকে পরিপুষ্ট করেছে, আঘাত করেনি। যথেষ্ট পরিমাণে কমার্শিয়াল হয়েও নজরুল বাংলাগানের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি, অনাদর করেন নি অথবা রিভাইভেলিজমের প্রচার করে বাংলাগানকে পেছিয়ে দিতে চাননি। আজকের গীতিকার বা সুরকারেরা যদি এটা বুঝতেন তাহলে বোধ করি আজকের ফ্রাসট্রেশন থেকে অব্যাহতি পেতেন।

পরিশেষে, লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে একটু বক্তব্য গোচর না করে পারছি না। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না বা কোনও উদ্দেশ্য আরোপ করবেন না। আমি কয়েক বৎসর ধরে কলকাতার আকাশবাণীকে লোকসঙ্গীতের শিল্পী নির্বাচনে সহায়তা করেছি। এই সুযোগে দিনের পর দিন আধুনিক তরুণ তরুণীদের কণ্ঠে লোকসঙ্গীতের নিদর্শন লক্ষ্য করেছি। আমার ধারণা, আমাদের লোকসঙ্গীত প্রচারের শতকরা আশিভাগ পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত, অথচ যারা এসব গান গাইছে তারা জন্মাবধি পশ্চিমবঙ্গে লালিত পালিত, পূর্ববঙ্গের চেহারা দেখবার সুযোগও তাদের জীবনে আসেনি। তাদের কথাবার্তা পশ্চিমবঙ্গের—যে দেশকে তারা জন্মাবধি চেনে। স্বভাবতই পূর্ব-বঙ্গের লোকগীতি তাদের কণ্ঠে বহুলভাবে কৃত্রিম শোনাবে এবং এসব গানে সার্থকতা লাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ এরা এই সংখ্যাতীত প্রচেষ্টা করে চলেছে এবং পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করছে। এ বিষয়ে কারুর কারুর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করার সময় তাঁদের দেখেছি

যে দুই বাংলার সংস্কৃতি অচ্ছেদ্য. অতএব তার মধ্যে বিভেদ আনা অসঙ্গত। কিন্তু লোকসঙ্গীত সম্পূর্ণভাবেই আঞ্চলিক এবং সেই অঞ্চলের লোকেরাই তার একমাত্র ধারক। এ তো হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী নয় যে তার একটা সংক্রমণশীলতা আছে। সেক্ষেত্রে এইরকম কৃত্রিম লোকগীতির প্রচার হলে তা সমগ্র লোকসঙ্গীতের প্রতি অবিচার হবে। আমাদের এই বঙ্গের যে সব অঞ্চলে এই তরুণশিল্পীরা মানুষ হচ্ছে সেখানকার আঞ্চলিক গীতকেই তাদের গ্রহণ করে সম্প্রচারে ব্রতী হতে হবে, নইলে যা হবে তা কোনদিক দিয়েই অভিপ্রেত হবে না। এই বঙ্গে ঝুমুর গানের যে সব আর্ট আছে তার খুব কমই আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়। ঝুমুর গান বলতে আমরা যা বুঝি তা সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরের ঝুমুর এবং তা কতটা লোকসঙ্গীত সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ঝুমুর শুনলে মুগ্ধ হতে হয়. কিন্তু তার প্রচার খুব সীমাবদ্ধ। এমনি আরও অনেক ধরনের লোকগীতি আছে, যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না। আমি এমন কথা বলছি না যে পূর্ববঙ্গের লোকগীতি সম্বন্ধে আমরা অবহিত থাকব না, কিন্তু সেটা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য, আমাদের ধারণাকে পরিপুষ্ট করবার জন্য ; প্রয়োগের বেলায় যেটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ তাকেই অবলম্বন করতে হবে। যে লোকগীতি আমাদের লোকযাত্রায় ব্যবহৃত আমরা কেবল তাকেই অবলম্বন করতে পারি, যা নেই তাকে বাইরে থেকে এনে প্রয়োগ করলে আমাদের লোকসঙ্গীতের উদ্যানে একটা নতুন কলমের গাছ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার কোনো অবকাশ নেই। ইতিহাসের এই সত্যটিকে আজ উপলব্ধি করা দরকার।

বাংলাগানের ক্ষেত্রে আমরা যেমন ঐতিহ্যকে অবহেলা করে চলেছি, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখছি না। আমরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছি তা জানি না, কেন এমনটা করে চলেছি তাও নিরূপণ করা যাচ্ছে না : অথচ কোনদিকেই যে তেমন কিছু ফলপ্রসূ সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করছি না. সেটাও আমাদের অন্তরে প্রবেশ করছে বলে মনে হয় না। বাংলার কাব্যসঙ্গীতের এই অবস্থায় আমাদের সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং যাঁরা এই জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁরা আত্মসমীক্ষা করে সমগ্র জাতির হিতের জন্য চিন্তা করলে অবশ্যই একটা পথ খুঁজে পাবেন। তার একটা সূচনা অন্তত আত্মপ্রকাশ করুক, এই আশাই আমরা পোষণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ও আবুল ফজল

অন্নদাশঙ্কর রায়

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেব রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের বছরখানেক আগে তাঁকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন তাঁর লেখা তিনখানি বই। ততদিনে আবুল ফজলের যথেষ্ট সুনাম হয়েছে, আর আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কবিগুরু তখন চোখের অসুখে ভুগছিলেন, তা সত্ত্বেও নিজের হাতে লিখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। হাতের লেখা তখনো বেশ পরিষ্কার ও স্বাভাবিক, যদিও কিছুদিন পরে তিনি নাম সই করতেও কষ্ট পান। আমাকে যে টাইপ করা জন্মদিনের কবিতা পাঠান তাতে তাঁর নামের স্বাক্ষর হিজিবিজি। মনে হয় তাঁর দৃষ্টিশক্তির দ্রুত অবনতি ঘটে। শরীরও যে ভেঙে পড়ে সেটা তো আমার চোখে দেখা।

সম্প্রতি আবুল ফজল সাহেব 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামে একখানি বই লিখেছেন। পড়ে দেখছি, আবুল ফজল কবিকে যা লেখেন তাতে ছিল—'গল্পগ্রন্থ দুটিতে বঙ্গের পূর্ব সীমান্তবাসী মুসলমান সমাজ ও পরিবার জীবনের কিছু কিছু ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে, ফলে তাদের মুখের ও জীবনের, সাহিত্যে এখনো অপ্রচলিত, বহু শব্দ ও প্রকাশ ভঙ্গিমা বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং আমার বিশ্বাস মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে গেলেই এরকম বহু অপ্রচলিত শব্দ বাঙলা ভাষাকে হজম করতেই হবে। মুসলমান নায়িকা মুসলমান নায়ককে দস্তরখানা বিছিয়ে নাস্তা পরিবেশন করছে, বহু ভেবেও

এ রকম বাক্যকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিবর্তিত করিতে পারিনি। দস্তরখানার কোনো বাঙলা প্রতিশব্দ আমি খুঁজে পাইনি, তৈরের করে নিতেও পারিনি। অথচ দস্তরখানা মুসলমান পরিবারে রোজ দু'বেলাই ব্যবহার করা হয়। নাস্তার প্রতিশব্দ জোর করে হয়তো 'জলখাবার' করা যায়, কিন্তু তা করলে মুসলমানের কানে তা 'শুদ্ধিকরণে'র মতোই শোনাবে। আর নিশ্চিত মুসলমান জীবনেও শব্দের ব্যবহার ঘরোয়া না হয়ে পোশাকী হয়েই থাকবে। আমি অবশ্য আমার পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।...” এ চিঠির তারিখ ৩১।৮।৪০।

রবীন্দ্রনাথ লেখেন আরো দীর্ঘ উত্তর। “ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাবপ্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানি করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজি শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করছে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না।...'খুনখারাবি' শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে, তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশ লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বল বৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।...আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এর প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই

অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা করে রইলুম। চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলোক পড়ে না সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলা দেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তা হলে আমরা বাংলা দেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে। কিন্তু এই পরিচয় স্থাপন ব্যাপারে কোনো একটা জিদ বশত ভাষার প্রতি যদি নির্মমতা করেন তা হলে উল্টো ফল ফলবে। এই উল্টো ফল ফলাবার অধ্যবসায়ে বাংলাদেশ আজ কন্টকিত।...”এই চিঠির তারিখ ৬।১।৪০।

এখানে আমার একটু মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছি। 'নাস্তা' কথাটা আমি বিহারী হিন্দুদের মুখেও শুনেছি। রোজ তাদের হাতে নাস্তা খেয়েছি। তেমনি 'পানি'ও পিয়েছি। বাঙালী মুসলমানরা এ দুটি শব্দ ব্যবহার করেন, তা বলে এ দুটি মুসলমানী শব্দ নয়। হতে পারে 'নাস্তা' মুসলমানী কিন্তু 'পানি' হিন্দী। তথা উর্দু। বাংলায় এ দুটি শব্দ চলে না। কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের কথা লিখতে গেলে অবশ্যই চালাতে হবে। নয়তো সমাজচিত্র যথাযথ হবে না। রক্ত অর্থে খুনের ব্যবহার বিহারী হিন্দুর মুখেও শুনেছি। বাঙালী মুসলমান যদি সেই অর্থে ব্যবহার করেন তো হিন্দী উর্দু থেকেই পেয়েছেন। আরবী ফারসী থেকে সরাসরি নয়।

আবুল ফজল এর একটি জবাব লেখেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসুখের খবর শুনে জবাবটি পাঠাতে ভরসা পান না। ওটি তাঁর নিজের কাছেই থেকে যায়। তার তারিখ ১৯।১।৪১। জবাবের শেষ অংশ—

“...আপনি লিখেছেন 'বাঙলা দেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো পড়ে নি'। অতি কঠোর সত্য কথা। যদি বেয়াদবি মনে না করেন তবে এ প্রসঙ্গে আমার ও আমার বন্ধুগণের দীর্ঘ দিনের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি। বাঙলা সাহিত্যের অনির্বাণ ভাস্কর পর্যন্ত এ আধখানা বাঙলার দিকে ফিরে তাকান নি, —রবির কিরণে বিশ্ব আলোকিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙলার মাটির আঙিনায় রবির আলোকপাত হল না। এর যথাযথ কারণ আমরা ধারণা করতে পারছি না। শুনেছি গল্পগুচ্ছের অনবদ্য গল্পগুলি শিলাইদহে আপনাদের জমিদারীতে বসেই লেখা. শিলাইদহের মুসলমান প্রজামণ্ডলীর মধ্যে আপনার কী আসন তা শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ না পড়েও আমরা আন্দাজ করতে পারি, অথচ এদের জীবন আপনার কোনো সাহিত্য প্রচেষ্টায় উপাদান হতে পারল না। মনে হয় আসল কথা, মানুষের বাইরের চেহারা বা তার সঙ্গে বাহ্যিক সম্বন্ধ যতটুকু না সাহিত্যের উপাদান. তার

অন্তরের চেহারা তার থেকে বহুগুণ সাহিত্যসৃষ্টির কারণ ও প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশের এক বৃহৎ অংশের অন্তরলোকে প্রবেশ করার চেষ্টা কোন দিক থেকেই লক্ষিত হচ্ছে না, বরং রাষ্ট্রনেতা ও সংবাদপত্র সম্পাদক-গণের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দিন দিন হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমাদের সামনে আদর্শ কী? হয় আমাদের এক জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, না হয় পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে একটা বোঝা-পড়া করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে। বাঙালী জাতি গঠনই যদি আমাদের আদর্শ হয় তা হলে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য আমাদের ত্যাগ করে উভয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলিই গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজন হলে উভয় সম্প্রদায়ের অনাপত্তিকর নূতন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তৈয়ের করে নিতে হবে। তখন আমাদের শুধু অশনবস্ত্রে এক হলে চলবে না। রক্তেও এক হওয়ার সাধনা করতে হবে। তখন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু বেড়া আলগা করতে হবে ও বহু ধারণা আমাদের বদলাতে হবে। যদি পরস্পরের তথাকথিত বৈশিষ্ট্য আমরা ছাড়তে না পারি তা হলে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, তখন প্রতি ক্ষেত্রে একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে। তখন ভাগ-বাঁটোয়ারার গাণিতিক নির্ভুলতাই হবে আমাদের সাধনা ও আদর্শ। ভবিষ্যৎ বঙ্গসন্তানের পক্ষে কোন্ সাধনা অধিকতর কাম্য হবে কে জানে! আমাদের জীবনে রবির আলোকপাত হোক।"

চাঁদের আধখানার উপর সূর্যের আলো পড়ে না, এই উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে কঠোর সত্যকে কোমল ভাষায় ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন ইতিহাস তাকে আরো কঠোর ঘটনাবলীর সাহায্যে সকলের দৃষ্টিগোচর করেছে। বাংলাদেশ এখন দুই আধখানা। বাঙালী জাতিও তাই। আবুল ফজল সাহেবও তাঁর দ্বিতীয় পত্রে এর পূর্বাভাষ দিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রস্তাব সেই বছরই লাহোরের মুসলিম লীগ অধিবেশনে গৃহীত হয়। পরে দেখা গেল আবুল ফজলের মতো বুদ্ধিজীবী মুসলমানরাও পাকিস্তানের সমর্থক। তখন কিন্তু তাঁরা চাঁদের দুই আধখানাই গাণিতিক নির্ভুলতার যুক্তিতে পাকিস্তানে অর্থাৎ মুসলমানের ভাগে প্রত্যাশা করেছিলেন। বাঙালী যদি এক জাতি না হয়ে দুই সম্প্রদায় হয় তবে বাংলাদেশও ভাগ বাঁটোয়ারার সময় দুই ভাগ হয়। এটাই তাঁর যুক্তির লজিক্যাল পরিণতি।

অথচ এটা তাঁর মনের কথা নয়। তাঁর মনের কথা বাংলাদেশ অবিভক্ত

থাকবে, বাঙালী জাতিও হবে একজাতি, এর জন্যে ছাড়তে হবে পরস্পরের তথাকথিত বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু বেড়া আলগা করতে হবে, বহু ধারণা বদলাতে হবে, উভয়ের পক্ষে অনাপত্তিকর নতুন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তৈরি করে নিতে হবে, রক্তেও এক হওয়ার সাধনা করতে হবে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে পন্থা। এসব কথা আমিও ভেবেছি ও বলেছি। কিন্তু ঘটনার স্রোত যার অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছিল তার নাম ভাষাভিত্তিক একজাতি নয়, রক্তভিত্তিক একজাতি নয়, ধর্মভিত্তিক দুই জাতি, সমাজভিত্তিক দুই জাতি। আমাকেও এটা মেনে নিয়ে বোঝাপড়ার সন্ধিসূত্র চিন্তা করতে হচ্ছিল। তেমনি কাজী আবদুল ওদুদের মতো ভাবুকদেরও। দুইকে মেনে নিয়ে কী করে এক সূত্রে গাঁথা যায় এ মীমাংসার কথা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শত শত জন ভেবেছিলেন। সাধারণ হিন্দু মুসলমানও সেটা চেয়েছিল। ভারত ভাগ না হলে বাংলা ভাগ হতো না। বাংলা ভাগের মূলে ছিল ভারত ভাগ। তারও মূলে ছিল ব্রিটিশ রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে হবে এই প্রশ্ন। কংগ্রেস না লীগ? হিন্দু রাজ না মুসলমান রাজ?

আবুল ফজল সাহেব পরে আমাকে চিঠি লিখে জানতে চান, কংগ্রেস কেন পার্টিশনে রাজি হলো। ততদিনে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু সেটাও ছিল গাণিতিক নির্ভুলতার নিক্তিতে ওজন করা সমাধান। গান্ধী তেমন সমাধান চাননি। তিনি চেয়েছিলেন হৃদয়ের ঐক্য। দুই ভাইতে মনের মিল থাকলে যে সমাধান ঘরে ঘরে দেখা যায়। কিন্তু সেটাও কি ধোপে টেকে? কত ঘর ভেঙে যায়। জিন্নার সাধের পাকিস্তানও ভেঙে গেল। শুধু গান্ধীর সাধের ভারতই নয় বা আমাদের সাধের বাংলাই নয়। কঠোর সত্য।

এবার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কবির মুসলিম পাঠকদের বহুদিনের অভিযোগ তিনি তাঁদের সমাজের বেলা নীরব বা উদাসীন। কবি এর উত্তরে কী বলতেন জানিনে। তবে ওঁর কথা আমি যেটুকু জানি সেটুকু হল, ওঁর মতো লেখকের কর্তব্য নিজের সীমা বা লিমিটেশনস্ মেনে চলা। একবার কবি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ভাখ হে, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে আমি এত কম জানি যে তোমাদের মতো নির্ভয়ে লিখতে পারি নে। পাছে ভুল হয়ে যায় সেইজন্যে অতি সাবধানে লিখি।' ব্রাহ্মসমাজে যা নিন্দনীয় নয় হিন্দু-সমাজে তা নিন্দনীয়। শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজের অন্ধিসন্ধি জানতেন, পাঠকপাঠিকার সংস্কারগুলোর সঙ্গে রফা করে চলতেন। একবার তিনি এক মহিলাকে

বলেছিলেন 'আমি কখনো আমার উপন্যাসে বিধবার বিয়ে দিই নি।' শুধু কি বিধবার বিয়ে? অসবর্ণ বিবাহেও তাঁর অন্তরের অরুচি ছিল।

'ঘরে বাইরে' যখন 'সবুজপত্রে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় তখন এক পাঠিকা তাঁকে খুব কড়া করে একখানা চিঠি লেখেন। বলেন, 'বিমলার ব্যবহার আপনাদের ব্রাহ্ম মেয়েদের মতো হতে পারে, কিন্তু আমাদের হিন্দু ঘরে অমন ব্যবহার দেখা যায় না।' কবি তার উত্তরে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু তাঁর একজন নিয়মিত পাঠক সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেন যে তখন থেকে 'ঘরে বাইরে'র ধারা বদলে গেছে। কবি তাঁর পাঠিকাদের ভয়ে ভীত। পরে পাঠিকাদের অনেকের সংস্কারমুক্তি ঘটে। তখন কবিরও সংস্কারভীতি ভেঙে যায়। সেই তিনিই লেখেন 'ল্যাবরেটরি'। তবে নায়িকাটি বাঙালী নয়। হলে আবার পত্রাঘাতে জর্জর হতেন।

তাঁর প্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি নতুন গল্পের খসড়া লেখেন। সেটি উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয় প্রথমে 'ঋতুপত্র' বলে শান্তিনিকেতনের একটি অখ্যাত পত্রিকায়। সালটা মনে নেই। প্রয়াণের দশ বারো বছর পরে। কাহিনীটির নাম 'মুসলমানীর গল্প'। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি ওটি সত্যঘটনামূলক। এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বালিকা কন্যা তার শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পায়ে হেঁটে বাপের বাড়ির পথে রওনা হয়। তাকে সন্ধ্যাবেলা একলা দেখে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে একজন সচ্চরিত্র বৃদ্ধ মুসলমান তাকে তার বাপের বাড়ি পোঁছে দেন। ব্রাহ্মণ তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা। মেয়েকে বলেন, 'তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যা। এ বাড়িতে তোর স্থান হবে না।' মুসলমান ভদ্রলোক এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁকেও গালমন্দ শুনতে হয়। যেন তিনি মহা অপরাধ করেছেন। স্তবস্তুতি ব্যর্থ হয়। ব্রাহ্মণের জাত যাবে, যদি তিনি ও মেয়েকে ঘরে নেন। তখন নিরাশ্রয় মেয়েটি স্বেচ্ছায় মুসলমান পরিবারে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ কর্তা তাঁকে হিন্দু আচার পালন করতে দেন। তাঁর নিজের মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে তিনি বলেন, 'তোমার জন্যে কী ব্যবস্থা করে যাব, বল। তুমি যদি রাজী থাক তো আমার এক ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে যাই।' মেয়েটি রাজী হয়। বিয়ের পরেও সে হিন্দু আচার পালন করে। কেউ তাতে বাধা দেয় না। বিধবা হবার পরে সে হিন্দু বিধবার মতো জীবন যাপন করে। রামায়ণ মহাভারত পড়ে শান্তি পায়। কেউ তাকে কোরান পড়তে বলে না। তার ছেলেমেয়েরা

কিন্তু মুসলমান মতে চলে। সে তাতে আপত্তি করে না। সুজিতবাবু পূর্ববঙ্গ বেড়াতে গিয়ে তাকে তার বৃদ্ধ অবস্থায় দেখেন ও তার কাহিনী শোনেন। পরে রবীন্দ্রনাথকে শোনান। লেখাটা তেমন ওতরায়নি। কবি তখন অথর্ব। তা ছাড়া ভয় তো একটা ছিলই। হিন্দু পণ্ডিতের সমালোচনা করলে হিন্দুরা চটবে। বলবে ওই মুসলমানটি এক মতলববাজ। মুসলমানরাও যে খুশি হবে তা নয়। কই, মেয়েটি তো কলমা পড়ে মসলিম হয়নি। আজীবন কাফের থেকে গেছে। ওই মুসলমানটি ইসলামের শত্রু। ও নিজে না-পাক। ওর পুত্রবধূও না-পাক। মুসলমানের অন্দরে রামায়ণ মহাভারত! পৌত্তলিকতার জয়জয়কার। ও-গল্প লিখে রবি ঠাকুর মুসলমানের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন।

হিন্দুকে হিন্দু রেখে মুসলমানকে মুসলমান রেখে দু'জনের বিয়ে দেওয়া পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। মজিদ সাহেব তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। মজিদ সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ কাঁধে তুলবেন না কোনো মুসলমান। দেহ অনেক বেলা পর্যন্ত বাড়িতে পড়ে থাকে। শেষে মুসলমান সমাজের নেতাদের সুমতি হয়। জামাইটি মুসলমান হয়নি বলেই এই বিপত্তি। ঘটনাটা ১৯৪৫ সালের। তবে জামাতার পরিবারে পুত্রবধূর আদর ছিল। কেউ ওকে হিন্দু করতে চায়নি। করতে চাইলেও পারত না। সন্তানদের কী ধর্ম, জানিনে।

রক্তের মিলন না হলে জাতি গড়ে উঠে না। পাতানো সম্বন্ধই যথেষ্ট নয়, কিন্তু যে সমাজে এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের বিয়ে হয় না, অন্তত সাহিত্যে তার সাক্ষ্য অতি সামান্য, সে সমাজ হিন্দু মুসলমানের বিবাহে সহজে সায় দেবে না। মুসলিম সমাজ তো আরো গোঁড়া। আগেকার দিনে মুসলমানদের লেখা উপন্যাসে হিন্দু নায়িকাকে পবিত্র ইসলামে দীক্ষা দিয়ে মুসলিম নায়কের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। হিন্দুরা পড়ত না। এক সম্প্রদায়ের লেখা অপর সম্প্রদায় না পড়লে এক সাহিত্য গড়ে ওঠে না। আমরা না পেরেছি এক-নেশান গড়তে, না পেরেছি এক-সাহিত্য গড়তে। পরস্পরকে দোষ দেওয়া বৃথা।

ভানু মজুমদার

ঘুঙুর

সিদ্ধেশ্বর সেন

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই। কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে?...

ক্ষুধিত পাষাণ

তারও পর ঝম্‌ঝম্‌ অন্ধ ঘোর অন্ধ
দিনের

পরও রাত—সমস্ত রাত—বেজে বেজে চলেছে
ঘুঙুর

ঘুঙুর না ঝিল্লী

অতি সামান্যের স্বর
ছন্দও নয় কিছু অসামান্য

ভেজা ঘাস, সোঁদামাটির খুবই
জানাশোনা

তাই-ই তবু নৃত্যপর

অবশ্য অজ্ঞান অর্থে, সহজাত স্বাভাবিক ক্রিয়ায়,
মানুষের সচেতন শিল্পের চর্যার
অর্থে নয়

তবু তাই-ই নৃত্যপর

যেমন নৃত্য ওই মেঘের ফোকর থেকে দেখা-চেনা রাত্রির
আকাশের দূর শূন্যের আঁধারে
দিব্য নক্ষত্রবল্লী

০০০

যেমন জোনাকি—
শহরের না হলেও শহরতলীর, যেমন, ধরা যাক
বালি-বেলুড়ের, কিছুটা কল-কারখানার ঘিঞ্জির

হলেও আবার মঠের ধারের গঙ্গাও
—স্বামীজীর সময়ের মতো অনাবিল নিশ্চিতই নয়—
বরং জল বেশ ঘোলাই, নিত্য

কলকারখানার দায়িত্বহীন মালিকের আবর্জনার নালা—
কেমিক্যাল জলে ভাসে, তেল-তেল, জল
বর্ষার পলির রঙের মেটেল মোটেই নয়—

অবশ্য ততটা এখনও নয়—যে কোনো সময়, যদিও
হ'য়ে যেতে পারে তাই-ই, আর চিমনির ধোঁয়ায়
ধুলোমুঠিসোনার মুনাফাখোরের দৌলতে তো আশেপাশের

সবুজ অনেকখানি খাক্—
তবু সেখানে রেল লাইনের বা পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড়ের
বা গাছপালার যেটুকু আছে তারই মধ্যে জোনাকির

জ্বলা-নেভার নাচ, পুকুরের কচি কচুরিপানাও একটু আলতো
হাওয়ায় সরেও যায়, এই জোনাকির না নক্ষত্রের
আলোর প্রতিবিম্ব ধরবার আশায়, এক-আধটুকু, তাই কি ?

চোখেও লাগে বেশ নিয়মিত জ্বলা-নেভা, জ্বলা-নেভা

হয়তো অলিখিত
প্রাকৃতিক ছন্দের নিয়মেই বুঝিবা

000

কিংবা অতদূরে কেন, এই আজকালের আমাদেরই
বিরাট-বিশাল-মেট্রোপলিটান

—কেউ ভাবে প্রাদেশিক, এবড়ো-খেবড়ো
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, যথেচ্ছ, গজিয়ে-ওঠা
কিপ্‌লিঙের বর্ণনার মতো—সে যাই-ই হোক

এই শহরও যে ক্রমেই চারপাশের
জন-বিস্ফোরণে স্ফীতির অতি চাপে
নানামুখী-সংলগ্ন কারণে, সামাজিক, বাণিজ্যিক, হয়তো বা

বিশ্বব্যাঙ্কের কুড়োনো দাক্ষিণ্যে, সন্দেহ কী যে
ক্রমে ক্রমে দশাসইরকম-ই আয়তনবান

আকাশস্পর্ধী তবু ম্যাচবক্স-প্রতিম বাড়ির সারিতে সৌধ বা প্রাসাদ
বলি কি করে, সেরকম স্থাপত্য-সৌষ্ঠব কই, চোখে পড়ে কই—
উপযোগিতার ফ্লাই-ওভারে নিশ্চয়ই

কিংবা আরও আধুনিক সাজে, দ্বিতল স্টেটবাসের মতোই
দুইটি তলে—ময়দানের ঘাস জলে গেলেও, গাছ-
পালা শিকড়ের মাটি ঝুরঝুর্ এতো বড় শহরের

প্রকাণ্ড ফুসফুস্—সেই সবুজ ময়দান-ই—কেন হয়ে যেতে হবে
পাষাণের মরু—কেন কংক্রিটেও কি সৌন্দর্যের ছায়া-আলো
নড়ে না'ক,—যদি থাকে শিল্পের স্রষ্টার চোখ—যা অন্তত আশা করা যাবে

আধুনিকে—যখন এই দুইতল ভূগর্ভ শহরে—ওসারে-বহরে
সি-এম-ডি-এ যাকে নাকি বিজ্ঞাপনে বলে—ভেঙে-ভেঙে নাকি গড়ে,
নাকি ডানাও লাগায় এই বৃদ্ধ জটায়ু-কে

জনকের মাটির দুহিতা আমাদের সীতা যদিও যখন
এম-টি-পির মেট্রোর রথে না চড়েই আজও যান রাবণের রথে

000

বলাইবাহুল্য
শহরের এইসব, আরও, পাঁচ-সাত তারার
এ্যাপার্টমেন্টে, লাখ-দু লাখে শীতাতপ
নিয়ন্ত্রিত কক্ষে
আজকাল এরিয়েল-বিনা বিল্ট-ইন

ট্রান্সিস্টরে কিংবা সলিড-স্টেট
টি. ভি.র পর্দায়, মানুষের
হাসি-কান্না, আশা-নিরাশার ছবি বেশ বসে দেখা যায়

একপাশে পড়ে থাকে—থাক্—বস্তি ও ফুটপাথ
চটের থলের নিচে অঝোর বৃষ্টিতে খোঁজে হা-ঘরের মাথা
গোঁজবার সংসার

আর বৃষ্টির পর টইটুম্বুর খোলা ড্রেন কেননা রাস্তাও খোঁড়া—
—দুই ভাবেই খোঁড়া—খোঁড়াখুঁড়ি আবার পা ফেলবার জমিও অসমান,
ফলে, আজও ঈশ্বর গুপ্তের কলকাতায় দিনে মাছি রাতের মশায়

অজস্র কামড়, বলবার জো কোথায়
ম্যালেরিয়া কি ফিরে আসবে অথবা জাপানী
এনকেফেলাইটিস

কে বধির আর কোন্ বধিরের কানে কথা দেয় -
হদিশ
হয়তো মেলে শ্বাসকষ্টে ডিজেলের অস্থির ধোঁয়ায়

000

জাপানী কথায়
সেই বোমার সময় কলকাতায়

বিয়াল্লিশে—বোমা মাত্র দুটিই
পড়েছে—
হাতিবাগানের বাজারের চাল ফুটো ক'রে

আর-একটি খিদিরপুরে—তাতেই
অর্ধেক কলকাতা
ফাঁকা, পলায়নপর, পশ্চিমে,

পশ্চিম বলতে তো গিরিডি
কি মধুপুরে
রামপুরহাটে—

নিদেন জেলায়
দেশ-গাঁয়ের বাড়িতে
যেন হুগলির চরের কাছে কেউবা

ত্রিবেণীতে, যেন
স্নানমাহাত্ম্যে এই সব, এয়ার-রেডের
কিংবা এ্যাক্-এ্যাক্ কামানের পাল্লা থেকে দূরে

তবে এরই খেসারতে, এই
বকলম যুদ্ধে
বিদেশীর দুঃশাসনে স্বদেশীয় সুড়ঙ্গে-আড়তে

চাল পালায় গর্তে ইঁদুরের
চোরাই মুনাফা-
কারবারির ধূর্তামি মজুতদারির হাতে-গড়া ফাঁড়া

ইংরেজের লাট-বেলাটের উপনিবেশের
লাম্পট্যের প্রত্যাক্ষতায়
কেঁপে-বেড়ে

পঞ্চাশের বাংলা-জোড়া ভয়ঙ্কর
—মন্বন্তর—

মুমূর্ষুর তেতাল্লিশে ধুঁকে ধুঁকে মরা দেশে, সারা দেশে

লঙ্গরখানায়

চালের কণায় খুদের ফ্যানেও নেই ভিক্ষা

দলে দলে গ্রাম ছেড়ে মাঠের চাষির মুখ-থুবড়ে শান-বাঁধানো শহরেও নেই ভিক্ষা

অন্নপূর্ণা নিজেই তাই ভিখারিণী তাই কোন্ শিবনেত্রে চাইবে ভিক্ষা

শিবনেত্রে তাই থাকে চেয়ে থাকে মরা মাছের চোখের
হাঁ-হ'য়ে-যাওয়া চোয়ালের ঠোঁটের মাছির পোকার
আহারের খোঁজ রেখে—শহরের শানে নেই ভিক্ষা

0 0 0

ভিক্ষা নয়, এদিক-ওদিকে অনুগ্রহ, দর-
কষাকষির রফায় ছিলও কি তা ?
ভারত ছাড়-র পরেও—

কিছুকাল পরে হস্তান্তরে
ক্ষমতার—

কিবা বীর করমুদ্রার সশরীরী
ছন্দে
কি ঝলমল্ কোমরবন্ধে ক্ষমতার দুর্বার অধিকারে নয়

আই-এন-এ-র বিচার-সওয়ালে নয়,
অন্তত কি নয় নৌ-
বিদ্রোহেরও প্রতাপে

চারিদিকে বিদ্রোহের দিনপঞ্জি লেখার গৌরবে
কবি-কিশোরের

পদাতিকে—মিছিলে-জাঠায় হরতালে, আকালেও
নবান্ন-উৎসবে, আবেদিন-স্কেচে, সন্দ্বীপের চরের
মৃত্যুহীন

নবজীবনের মতোই জাগ্রতের গানে, চিহ্ন চিনে চিনে, মন্বন্তরে-ও
তিনপুরুষের আত্ম-শ্লেষ মেনে
—এমন কি, সেকালীন কবিতাভবনেরও কবিতার
নিরিখের তর্কে—

কসাকের ডাকে—
ফ্যাসিস্ত-বিরোধে কবি-শিল্পীর সততায়, ভারতীয়
সাম্যবাদীর প্রাথমিক
স্বপ্নের নিষ্ঠায়

প্রতিবাদে-প্রতিরোধে মূল্যবোধ চিনে-জেনে
অপূর্ণের হয়তো এক সংস্কৃতিরই বিপ্লবে

তবু দেশ স্বহস্তে নিয়তিতে ছিন্নমস্তা

যেন সেই বিহারের চৌত্রিশের উন্মাদ
ভূমিকম্পের মাটি
ফেটে ভেঙে দু-ভাগ, চৌচির

কত কি তলিয়ে যায়, হয়তো বা অগ্নিপরীক্ষায়
লব-কুশেরও মাতা

০ ০ ০

তবু সে একদা
কলকাতার সাতচল্লিশের আগস্টের
পনেরই রাত্রির সন্ধিতে

নোয়াখালি-ফেরা গান্ধীজী
রয়েছেন বেলেঘাটায়

শহরের রাজপথে মাঝরাত্রি উৎসবের ভিড়ে
পতাকায়-পতাকায়
মোড়া এক আকাশের রঙিন বাহারে,
অদৃষ্টের সঙ্গে যেন নেহরুর মধ্যবর্তিতায়,
জোড়াসাঁকো-চিৎপুর-কলুটোলায় নাখোদা
মসজিদে ইমামের আতরজলের ঝারি সারা গায়ে মেখে
স্বাধীন-স্বাধীন চিত্তে পথে পথে ঘোরার
সারারাত পথে পথে নিদ্রাহীন ফেরার
সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে নয় আর
নয় দীন প্রাণে
শির নত যত অপমানে তত যেন উন্নতের শিরে
কে ভ্রমিছে, ভ্রমিছে কে কোন্ সন্নিধানে

০ ০ ০

এও ঘনছন্দ
মুক্তির নিবিড় জীবনের চলনের
লোকবাহন কথোর দিবসের-নিশীথেরও
স্পন্দ

তবু সে মুক্তিও কালে ঠেকে মরীচিকা, কাল-খণ্ডিতা
নয় নবায়নে জারিতা
মুক্তিরও স্ফুরণ চায় নিরসন অহরহ সামাজিক দ্বন্দ্বের

তাই সেই নদী—'বচ্ছতোয়া'—অপভ্রংশে
আজ শুধু শুক্তা

০ ০ ০

দেখেছি ভাবার ছন্দ তবু স্ফুলিঙ্গের
ক্ষণকালের হ'লেও
জোনাকি

শুনেছিও ঘুঙুর
ঝিল্লীর

এই নদী-পাড়েরই শহর, নিকষ
রাত্রির
ঠিক ব্ল্যাক-আউটের নয়, নেই ব্যাফ্‌ল
-ওয়াল, নেই বালিরও বস্তা

শুধু এনার্জি ক্রাইসিসে, ঘাটতিরই দুরবস্থায়, বিদ্যুতের
ছাঁটাই আঁধারে নামে সঘন আঁধার

উড়ন্ত-
জোনাকি,
অন্ধকারও

তাই-ই নৃত্যপর

হাউসিং এস্টেটে—সিমেন্টের শহর—বলা যায়,
পাষাণেরই চত্বর—
সবুজ যেখানে সংকুচিত

বর্ষার জল পেয়ে যদিও, ঘাস
কিছুটা নধর

ঘুঙুর, সেখানেই বাজে
ঝিল্লীর

তাই-ই নৃত্যপর

0 0 0

এ কী সেই ক্ষুধিত
পাষাণ-ই

যেখানে ঘুঙুর বাজে, বেজে যায়
নিশিভোর

শতকক্ষ-প্রকোষ্ঠের, ধ্বনি-প্রতিধ্বনির

কত অলিন্দের, পথের, অলিগলির
উঁকিঝুঁকি গবাক্ষের

আলো-ছায়ার, প্রকাশ্যের-গোপনের
মুখোশের
শহর

শহরই বা বলি কাকে, কেন এই সারাটা দেশেরই তো বিরাট
পাষাণে
নিশি-পাওয়া কেউ মাথা কোটে

পাষাণভিত্তির তল ফেটে যায়, আর্দ্রতল যেনবা
গোরের তল, নোনা-লাগা, অশ্রুর তল
থেকে কেউ কান্না নিয়ে ওঠে

যে বলেছে, 'উ-দ্ধা-র'

বন্দিনী, অশোক-কাননে, চেয়েছেন, পেয়েওছিলেন, সেই কবেই
প্রাচীনের ত্রেতায়
তেমন উদ্ধার

এ-ও বলে,—ক্রীতদাসী—একালের, মুক্তির আবেগে চায়
রৌদ্রের প্রদেশে বাঁচবার—উদ্ধার—প্রাণের আশায়

শুধু, ভীরু সেই-ই, সামান্য
মাশুলেরই কালেক্টর

কিসের মাশুল দিতে গিয়ে
সভয়ে পিছিয়ে, সরে যায়

বুঝি মেহের আলিই শুধু জেনে নেয় এই সব দুঃস্বপ্নের বা
অতি-স্বপ্নের বহর

০০০

এখানেও ছন্দ চাই, কেননা সে ছন্দের
পতন—কানে লাগে
মনে লাগে, প্রাণেও যে লাগে

না লেগে পারে না তাই লাগে

এ ছন্দ যান্ত্রিকের
করাঙ্গুলি
গোনামাপের ব্যবহারিকের মাত্রা নয়

চলার যেমন ছন্দ
যতি ও গতির

বলার যেমন অনায়াস
স্পন্দ

শ্বাসের-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক মানুষের
জীবনের

আবার জীবনেরই ছন্দ ফিরিয়ে-আনার
উৎক্রান্তিক

বিপ্লবীর-ই ছন্দ, যা শিল্পীরও
স্রষ্টারও

—লেনিনের বিপ্লবের যেমন বিজ্ঞান যেমন
আবার শিল্পও—

রূপান্তরে সামাজিক দ্বন্দ্বের উত্তরণের
ছন্দ

০ ০ ০

যে ছন্দ আমাদেরও কবির

দুই হাতে—

কালের
মন্দিরার ছন্দ

ডাইনে-বাঁয়ে
দুই হাতে

হাতে-পায়ে
সারা শরীরেই, সর্বদাই ক্লান্তিহীন

সুপ্তি-ও টুটে যায়, নৃত্য
ওঠে

সাদাকালো—আলোয়ছায়ার
দ্বন্দ্বে

ডাইনে-বাঁয়ে
দুই হাতে

মন্দিরায়
কালের—

মন্দিরায়
নিত্যের নূতন সংঘাতে—ভারতীয়

নট-ভৈরবের
পদপাতেই সঙ্গত ॥

চিত্রভানু মজুমদার

ভারতীয় জীবনে ও মননে শিল্পের স্থান

নীহাররঞ্জন রায়

ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের ভগ্ন-অবশেষ যা আমাদের সামনে রয়েছে এবং প্রত্ন-বিদ্যা যা কিছু আমাদের গোচরে এনে দিয়েছে—এদেশের লোকজীবনে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণের পক্ষে সেই উপাদান যথেষ্ট। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিপ্রায় যাই হোক, শিল্পক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত সামগ্রী (সাহিত্য এবং নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় শিল্পের কথাও বিবেচ্য) তাদের জীবনের কোনো না কোনো প্রয়োজন মেটাত, জীবনে একটা নতুন মাত্রা এনে দিত, —আর কোনো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগে এ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব ছিল না। এভাবে না দেখলে এই উপমহাদেশের চার হাজার বৎসরেরও বেশি সময়ের জ্ঞাত ইতিহাসের পর্বে পর্বে দেশের সমগ্র অঞ্চলের ও বিচিত্র জন-সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণ শিল্পবস্তু উৎপাদনের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

স্বভাবতই এই সব শিল্প অভিপ্রায়, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক নয়; এদের মধ্যে পার্থক্য গুরুতর এবং দৃশ্যত ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে বৈচিত্র্যময়। হরপ্পায় পাওয়া নাচিয়ে পুরুষের মাথা-হাত-পা-ভাঙা মূর্তিটি মহেঞ্জোদড়োর নাচিয়ে মেয়ের মূর্তি থেকে আঙ্গিকে ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে ভিন্ন। এর দুটিই আবার ছোট নারী মূর্তি ও পুতুলগুলি এবং পুরোহিতের

মতো দেখতে দাড়ি-মুখে পুরুষের রীতিসিদ্ধ মূর্তিগুলি থেকে আলাদা। প্রয়োজন ও অভিপ্রায়ের ভিন্নতায় এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পবস্তুর স্রষ্টা জনগোষ্ঠীগুলির স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য পৃথক হওয়ায় ভারতে যে-কোনো কালপর্বের যে-কোনো অঞ্চলের শিল্পেই অনুরূপ প্রভেদ দেখা যায়। বৈদিক যজ্ঞে প্রয়োজন হত নানা ধরনের বাসন, পুতুল এবং কাঠ ও সম্ভবত ধাতুর তৈরি নানা বস্তু, যেমন আজও গাঁয়ের মেয়েরা ব্রতের অনুষ্ঠানে মাটি দিয়ে পুরুষ-নারীর পাখি-পশুর পুতুল গড়ে এবং চালের গুঁড়ো রাঙিয়ে বা পিটুলি দিয়ে বিচিত্র নক্‌শার আলপনা আঁকে। নানা অঞ্চলের আদিবাসীরা কোন্ অজানা কাল থেকে তাঁদের কাপড়ে জমকালো নক্‌শা বুনে আসছেন। গ্রামের মেলায় বিক্রির জন্যে গড়া হয় বিচিত্র সব পুতুল, উপাস্য দেবতার বিভিন্ন আকারের মূর্তি তৈরি হয় কাঠ মাটি ইট খড়, এমনি কোনো অস্থায়ী উপাদানে, কখনো-বা পাথরে। গ্রামের মানুষেরা এবং আদিবাসীরা মাটির তৈরি বা মাটি-লেপা দেওয়াল ও মাটির মেঝে বিচিত্র নক্‌শা ও ছবি দিয়ে অলংকৃত করতেন, যেমন আজও করে থাকেন। কালের দিক থেকে আরও পরের, অপেক্ষাকৃত সভ্য বসতি এলাকার কর্ষিত রুচির মানুষ তাঁদের বাড়ির দেওয়াল, ছাদ, দরজার পাল্লা লৌকিক এবং ধর্মীয় বা আধা ধর্মীয় পুরাবৃত্ত ও উপকথা আশ্রিত ছবি দিয়ে অলংকৃত করতেন। ফ্রেমে বাঁধানো ছোট আকারের আঁকা ছবি বা টাঙিয়ে রাখার মতো ছুঁচের কাজ, কুলুঙ্গিতে রাখবার মতো পোড়ামাটির বা ধাতুর মূর্তি ছিল ঘর সাজাবার উপকরণ। কাঠ বা ইটের তৈরি নাগরিক আবাসের বা মঠ-মন্দিরের দরজায়-জানালায়, দেওয়ালের তাকে বা চৌকাঠে থাকত জমকালো খোদাই-এর কাজ। বৌদ্ধ, জৈন ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ ধর্মাশ্রিত মানুষ যে উচ্চাঙ্গের মূর্তিশিল্প, চিত্রকলা ও স্থাপত্যকে তাঁদের পুরাবৃত্ত, উপকথা, দেবদেবী, প্রতিমা-প্রতীক ও নিজেদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা জনপ্রিয় করার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও যৌথ পূজার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতেন—এই বহুবিদিত তথ্য পুনরাবৃত্তি না করলেও চলে। সমাজের সব স্তরে, সব সময়েই কিছু শিল্পসামগ্রী জাদুবিদ্যার উপকরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হত।

এ ছাড়া সমাজের সমস্ত স্তরে, দেশের সব অঞ্চলে এবং সকল কালে কিছু কিছু সামগ্রী অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষভাবে প্রাত্যহিক জীবন যাপনের বাস্তব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, যেমন—আসবাব, রথ, বাঁট লাগানো ছুরি

বা তরোয়াল, তীর-ধনুক, ঘটি-বাটি-কলসি, তাঁতের কাপড়—এই সব। এ-সব জিনিসকেও শিল্পসামগ্রী মনে করা হত, কারণ, এ-সবই ছিল হস্তশিল্প-জাত—যা তৈরি করতে খানিকটা নৈপুণ্যের দরকার হত। ভারতের মতো একটি যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলনের পূর্ববর্তী অবস্থার প্রথানুবর্তী সমাজে শিল্প ও কারিগরির বা চারুকলা ও ফলিত কলাবিদ্যার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট, পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য খুব একটা প্রত্যাশিত নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মহাভারত, জাতক প্রভৃতি আকর গ্রন্থের উল্লেখ থেকে জানা যায়, কিছু, নিপুণতার পরিচয় আছে—মানুষের হাতে তৈরি এমন সব সামগ্রীকেই বলা হত শিল্প এবং সেই কাজকে বলা হত শিল্পকর্ম। সাহিত্যসৃষ্টির বেলায় বলা হত কবিকর্ম। এ-সব শব্দ শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত ছিল, এখনও চালিত রয়েছে। মানবিক শিল্পনৈপুণ্য বলতে বুঝতে হবে সচেতনভাবে অর্জিত নৈপুণ্য, এ ঠিক পাখির বাসা বোনার সংজাত প্রবৃত্তি বা আশ্চর্য আকৃতি ও বর্ণের ফুল ফোটানোয় কোনো গাছের স্বাভাবিক দক্ষতা নয়।

প্রাচীনতম ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই ধরনের বেশ কিছু মানবিক নৈপুণ্য বা শিল্পের উল্লেখ আছে। মহাভারতে এবং বৌদ্ধ জাতকে আঠারোটি চিরাচরিত শিল্পের কথা পাওয়া যায় যার মধ্যে কয়েকটি, যেমন চামড়ার কাজ, ঝুড়ি বোনা—এগুলি নিচু কাজ মনে করা হত; এসব কাজ করতেন অবজ্ঞাত বৃত্তিগত-জাতির মানুষেরা। কিন্তু অন্যেরা, যেমন ভাস্কর বা চিত্রকর, ধাতু বা কাঠের কাজ যাঁরা করতেন, স্থপতি কিংবা মৃৎশিল্পী, বা তাঁতি—এঁরা মনে হয় খানিকটা সামাজিক মর্যাদা পেতেন—যদিও বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজে সবচেয়ে নিচু স্তরের বৃত্তিগত-জাতির লোকেরাই বংশানুক্রমে এই সব বৃত্তি অনুশীলন করতেন।

ভারতে শিল্পের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা যায়, ঐতিরেয় ব্রাহ্মণের এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ অনুচ্ছেদে (ষষ্ঠ, ৫,১) শিল্পকর্ম সম্পর্কে দুটি শর্তের উল্লেখ আছে: ক. সেটি হবে নৈপুণ্যময় কাজ, খ. কাজটি হবে ছন্দোময়। 'ছন্দ' শব্দে সৌষম্য-সঙ্গতি-সামঞ্জস্য ইত্যাদি ধারণা ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞার্থ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, খ্রীস্টীয় অব্দের পূর্ববর্তী সহস্র বৎসরের গোড়ার দিকে নৈপুণ্যময় প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সৃজিত কোনো সামগ্রীকেই শিল্পমূল্য দেওয়া হত এবং বোধ হয় মনে করা হত যে নৈপুণ্যের ছাপ থাকলেই শিল্প হয় না, নৈপুণ্যময় সামগ্রীর মধ্যে

যেগুলি ছন্দোময় শুধু সেইগুলিই শিল্পসামগ্রী বলে গ্রাহ্য হতে পারে। এ নিপুণতা বিশেষ ধরণের, ছন্দোময় নিপুণতা।

মানুষের কল্পনাশক্তি, নৈপুণ্য ও উদ্ভাবনী দক্ষতার বৈচিত্র্যের মতোই ছন্দও বৈচিত্র্যময় হতে পারে। ছন্দ হতে পারে কোনো ছবিতে আঁকা তরোয়ালের তীক্ষ্ণ বাঁকা রেখার মতো বা কোনো লতার ঢেউ খেলানো রেখার মতো বা ঘুমপাড়ানি গানের স্পন্দের মতো সরল, কিংবা হতে পারে এলোরার গুহায় উৎকীর্ণ পাটার মতো, ভারতনাট্যমের মতো, ভাস বা কালিদাসের নাটকের মতো অথবা উপনিষদের মহিমান্বিত গীতিকাব্যের মতো জটিলতাময়। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির সেই আদি স্তরে যে ছন্দোগত সারল্য ও জটিলতা অনুযায়ী শিল্পসামগ্রীর স্তরবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ করা হত কিংবা বিশেষ শিল্পসামগ্রীর প্রয়োজন বা ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে—সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা হত এমন মনে হয় না। ছন্দোময় কোনো বস্তু মানুষের সংবেদনায় ও মানসে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—সে বিচার যে করা হত না তা বলাই বাহুল্য। ঐতরেয়র যে অনুচ্ছেদটির কথা বলছি সেখানে এ সব প্রশ্ন বোধহয় প্রাসঙ্গিকও নয়, কারণ, মনে হয় ঐতরেয় ঋষি শিল্পসামগ্রীর নিম্নতম পরিচয়টুকু শুধু ধরে দিতে চেয়েছেন। তাঁর নিরিখ অনুসারে ছন্দ, সৌষম্য, সঙ্গতি, সামঞ্জস্য প্রভৃতি নীতি মান্য করে প্রস্তুত মানুষের নৈপুণ্যজাত যে কোনো বস্তুই শিল্প বলে গ্রাহ্য। সেই বস্তু নির্মাণে যদি মানসের সচেতন প্রয়াস নাও থাকে এবং যদি তা দর্শকের সংবেদনায় বা কল্পনায় কোনো অনুভবযোগ্য সাড়া না জাগায় তবুও তা শিল্প-বস্তু—যেমন কাঠের রথ বা কোনো ধাতব তৈজস। ভারতীয় ঐতিহ্যে শিল্পের এই মৌলিক সংজ্ঞার্থ স্বীকৃত হয়ে এসেছে এবং যে কারিগর তাঁর কাজে এ-দুটি শর্ত পূরণ করেছেন, হোক সে ইটের কারিগর বা তাম্রশাসনের খোদাইকর কিংবা লিপিদক্ষ তাকেই বলা হয়েছে শিল্পী।

তবুও মান্য যে ঋগ্‌বেদের ও উপনিষদের বেশ কিছু স্তোত্র মহৎ কাব্য, যা ছন্দের নিপুণ শিল্প, মানব মনের তুরীয় ও দীপ্ত কল্পনার প্রকাশ এবং মানব আত্মার গভীর আকূতি। সামবেদের স্তোত্রগুলি গাওয়া হত এবং এ-সব স্তোত্রেই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের কাঠামো রচিত হয়ে উঠেছিল। নৃত্যও শিল্প বলে বিবেচিত হত, বৈদিক দেবতা ও ঋষিরা নৃত্যের আনন্দ উপভোগ করতেন। এও জানা কথা যে বুদ্ধদেব "কামছন্দ" নামে এক জ্ঞান-প্রস্থানের বিষয়ে অবহিত ছিলেন—যা ইন্দ্রিয়ের সৃজনা-

কাজ্ঞার ছন্দ, যা শিল্পের উৎস। পণ্ডিত ও টীকাকার বুদ্ধঘোষকে মানলে বলতে হয়, বুদ্ধদেব শিল্পসৃষ্টিতে মানস ও কল্পনার ভূমিকা স্বীকার করতেন। আরণ্যক ও উপনিষদগুলিতে এমন অনেক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে যা থেকে মনে হয় দৃশ্য রূপকল্পের (ইমেজ) স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এবং রূপের অবয়বে এদের একাত্মকতা সম্পর্কে সেকালের মনীষীবৃন্দ ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। এছাড়া রূপ ও অরূপ, রূপ ও বিষয়বস্তু, বিষয়ী ও বিষয়—ইত্যাদি শিল্পসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সবই তাঁরা বিবেচনা করেছেন। এই বিচার-বিবেচনা নিছক অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্বের স্তরের, এর সঙ্গে জীবনের ও জীবনচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পকলার কোনোই সম্পর্ক নেই—এমন কথা অভাবনীয়। এসব তত্ত্বগত আলোচনায়ও প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু রূপকল্প ও উপমা শিল্প থেকে নিয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

একথা সত্য যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার শিল্পবস্তু ছাড়া মৌর্যপূর্ব ভারতের শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা গঠনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে মূর্ত শিল্পকলা ও কারিগরি উৎপাদনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি। যুক্তিযুক্তভাবে এইটুকু বলা যায়, যখন বৈদিক স্তোত্র ও উপনিষদ রচিত হয়েছিল সেই সময়ে শুধু সমাজের উঁচু স্তরে নয়, নিম্নবর্তী স্তরেও কাব্যের বিভিন্ন রূপ, সংগীত, নাট্য ও নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। লোকজীবনের নিম্নস্তরে এইসব শিল্প কেমনভাবে 'সমাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তা বোঝা যায় মৌর্য অশোকের অনুশাসনে 'সমাজ' সম্পর্কে বিরূপতা থেকে। কৌটিল্যও এই 'সমাজ' উৎসব সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানিয়েছেন। তবুও মনে রাখতে হয়, ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ভাস্কর্যের অতি মূল্যবান প্রথম অধ্যায়টি এই সম্রাটেরই দান। তাঁর প্রেরণার উৎস এবং এই সব ভাস্কর্যের রূপগত বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করা কঠিন যে মাটি ও খড়, কাঠ ও ইট প্রভৃতি অস্থায়ী উপাদানে যে শিল্পচর্চা চলে আসছিল তাকে তিনি পাথরের স্থায়ী উপাদানে এবং বিস্ময়কর আকার-আয়তনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারহুত, সাঁচি, ভাজা, কার্লা, অমরাবতী এবং অন্যান্য জায়গায় খৃস্টপূর্ব যুগের পুরানিদর্শন যা কিছু আমাদের গোচরে এসেছে তা থেকেই প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মূর্ত শিল্প যেমন, তেমনি সংগীত ও নৃত্যের মতো অমূর্তের শিল্প তখন জনপ্রিয়, সুপরিজ্ঞাত ও রীতিমতো প্রচলিত ছিল।

এইসব শিল্পের মধ্যে বেশ কিছু, বিশেষ করে নৃত্য, নাট্য (সাহিত্যিক দিক সমেত) ও সংগীত উন্নত ও প্রকাশরীতির দিক থেকে এত বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল যে এদের লক্ষ্য ও প্রয়োজন, রূপ ও আঙ্গিক এবং মানসিক অনুভূতি ও সংবেদনায় আবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস ও বিধিবিধান নির্ণয় সম্ভব হয়েছিল ;—ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নাট্যশাস্ত্র পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলে ধরা হয়, কিন্তু সকলেই মনে করেন ভরতের মূল রচনা আরও তিন বা চার শতাব্দী আগের। সে যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, খৃস্টীয় যুগের সূচনায় কাব্য ও নাটক, নৃত্য ও সংগীত, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে (দুটিকেই বলা হত চিত্র) নিছক নিপুণতা ও ছন্দ সমন্বিত অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় উচ্চতর এবং তাৎপর্যময় মনে করা হত। যেন বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, এই উচ্চতর ও তাৎপযময় শিল্পগুলি নিপুণতা ও ছন্দ ছাড়াও এক ধরনের মানসিকবৃত্তি সাপেক্ষ সৃষ্টি। আরও মনে হয়, প্রজ্ঞাবান মননশীলেরা কোনো কোনো শিল্পবস্তুতে অন্যবিধ তাৎপর্য সন্ধান করেছেন এবং পেয়েওছেন। দেখেছেন, এইসব শিল্পসামগ্রী সংবেদনায় গভীরতর সাড়া জাগায়, এমন সুখপ্রদ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে যা আর কোনো সৃজনবৃত্তিতে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই শিল্পগুলিকে তাঁরা তাই উচ্চতর ও মহত্তর মনে করেছেন। আরও বিবেচনা করেছেন যে শুধু নিপুণভাবে ও ছন্দোবিধি মান্য করে সম্পাদিত হলেই কোনো বস্তু শিল্প হয় না, তাকে মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং সেই বস্তু ইন্দ্রিয় এবং সংবেদনাকে পরিতৃপ্ত করবে, অনুভূতি সঞ্চার করবে এবং তাকে হয়ে উঠতে হবে অনন্যসদৃশ অভিজ্ঞতার আশ্রয়। ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে এবং ভারতীয় জীবনে শিল্পকলার ভূমিকা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিচার করলে এখানে যে উচ্চতর শিল্পের কথা বলা হল তার সঙ্গে আধুনিক পরিভাষায় যাকে কারিগরি উৎপাদন (ক্রফ্‌ট) বা ফলিতশিল্প বলা হয়—উভয়ের মধ্যে যে ভাবেই হোক এক ধরনের পার্থক্য যে মানা হত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'শিল্প' পদটির অনেক পরে 'কলা' পদটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, হয়তো এই পার্থক্যবোধ থেকেই তার উৎপত্তি। উচ্চতর ও পরিশীলিত শিল্পগুলিকে ললিতকলা বলা হতো অনুমান করা যায়। কালক্রমে কলাবিদ্যার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল চৌষট্টিটি শিল্প, যার মধ্যে

এমনকি চুল বাঁধা এবং ফুল সাজানো পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল। যৌন আচরণ ও যৌন কল্পনাকে বলা হতো কামকলা। চৌষট্টি কলার মধ্যে আপেক্ষিক ভাবে পরিশীলিত ও সূক্ষ্ম সংবেদনাময় যেগুলি, তার বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয়েছে 'ললিত' বা তুলনামূলকভাবে অতি সূক্ষ্ম আখ্যায়।

২

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ছাড়াও চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতেরা ধারাবাহিকভাবে কাব্যতত্ত্ব, নৃত্য, নাট্য, সংগীত, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। এর কোনো রচনাকেই যথার্থত নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ বলা না গেলেও বিশেষ বিশেষ শিল্প ও শিল্পক্রিয়ার এবং প্রাসঙ্গিক বিচার-বিবেচনার সারসংক্ষেপ মনে করা চলে। শাস্ত্রগুলিতে শিল্প বিশেষের উপকরণ ও প্রকরণের বর্ণনা আছে : বিভিন্ন আঙ্গিকের ও তার আদর্শের শ্রেণী বিভাগ, সূত্র নির্ণয়, উপাদান বিশ্লেষণ, গুণ ও দোষ নির্ণয় করা হয়েছে এবং শিল্পের মর্মবস্তু ও স্বভাবধর্ম, এমনকি লক্ষ্য বিষয়েও আলোচনা আছে। প্রত্যেকটি শাস্ত্রগ্রন্থেই যে এর সব কিছু আলোচিত হয়েছে এমন নয়, তবুও উপরের উল্লেখ থেকে এই শাস্ত্রকার ও সংকলকেরা যে পরিসীমার মধ্যে কাজ করেছেন তার আভাস পাওয়া যাবে।

শাস্ত্রগুলি রচনাকালের দিক থেকে দুটি বড় বিভাগে ভাগ করা যায়। ৪০০ থেকে ৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় একই সাংস্কৃতিক যুগের মধ্যে পড়ে ভরত, ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট ও বামন-এর রচনা, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ (অগ্নিপুরাণের শিল্পবিষয়ক অধ্যায়টি অবশ্যই আরও পরবর্তীকালের) এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্-এ চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্প সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ। এসব গ্রন্থে অনুপুঙ্খ বিচারে মত-বিরোধ প্রকাশ পেলেও সর্বত্রই সাধারণভাবে প্রধান অভিনিবেশের বিষয় ছিল শিল্প-বিশেষের 'শরীর' বা অবয়ব গঠনের উপাদান। শিল্পের আত্মা বা মর্মবস্তু, অথবা শিল্পের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ও উদ্দেশ্য তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রথম 'রস'-এর ধারণা সূচিত হয়, তিনি আট প্রকার রসের কথা বলেন। কিন্তু রসকে তিনি শিল্পের 'শরীর' সম্পৃক্ত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলে ব্যাখ্যা করেন,—নৃত্য ও নাট্যের প্রভাবে দর্শকের মনে সৃষ্ট ভাবাবহকেও তিনি অবশ্য রসই বলেন। রস শব্দটি আয়ুর্বেদ থেকে ধার

নেওয়া, যার আক্ষরিক অর্থ নির্বাণ, বাদ; মনোশারীরবিদ্যা অনুসারে শরীরের গ্রন্থি থেকে নির্গলিত লালা। (গ্রীক নন্দনতত্ত্বে ক্যাথারসিস শব্দটি রসের মতোই চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে গৃহীত। গ্রীক ও প্রাচীন ভারতীয় নন্দন-তত্ত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: **R. K. Sen, Nature of Aesthetic Enjoyment in Greek and Indian Analysis,** ***Transactions of the Indian Institute of Advanced Study*****, Simla, 1968, pp. 206-222.**)। ৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শিল্প ও শিল্পবৃত্তি বিষয়ে সমস্ত আলোচনাই ছিল অকাদেমিক এবং অবয়বগত দিক সংক্রান্ত। ভরতের কৃতিত্ব এই যে তিনি এ-জাতীয় আলোচনার বৃত্তে একটি নতুন ধারণার সূচনা করেন। শিল্প-অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে তাৎপর্যময় বিষয় হিসাবে 'রস'-এর ধারণা সূচিত হয়েছিল তাঁর রচনায়।

অনুবাদক—সত্যজিৎ চৌধুরী

মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা

সমরেশ বসু

আজ ছুটি। আজ উৎসবের দিন। আজ পনরোই আগস্ট। আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পূর্তি দিবস। আজ ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। (মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল !) লক্কা পায়রা ওড়াবার খবর পাওয়া যায় নি, তবে একুশবার তোপধ্বনির খবর সারা দেশের লোক জেনে গিয়েছে। কারণ এখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

আজ যে-যাই বলুক বা বলুন, 'গণতন্ত্রের আসন্ন বিপদের সংকেত দেখা দিয়েছে' 'দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে' কিন্তু আজ আনন্দের দিন। আজ পতাকা ওড়াবার দিন, গৃহস্থেরাও সন্ধ্যা পর্যন্ত পতাকা ওড়াতে পারে, আজ রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবীদের বিশেষ ব্যস্ততার দিন, কারণ আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে, জনসাধারণকে তাদের মহান কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, বিশাল বোঝা বহন করবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, তথাপি আজ বড় আনন্দের দিন, (মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল কারণ এই বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, অতএব আজ আলিপুরের চিড়িয়াখানা শিশু উদ্যানে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খোকাখুকুদের বিনা পয়স ঃ ঢুকতে পারা থেকে শহরে গ্রামে গঞ্জে তাবত বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়াবার দিন, নানা রকম খেলাধুলা ছবি আঁকা ইত্যাদির হারজিতের দিন, নানারকম কুচকাওয়াজের দিন, ভবিষ্যতে তারা কী হবে বা হতে যাচ্ছে, সে-কথা ওদের মনে করিয়ে উপদেশ

দেবার দিন, কারণ, ওরা কারা ? ('বাচ্ছালোগ, এক দফে হাততালি লাগাও, ইয়ে হ্যায় মাদারিকে খেল' রাস্তায় আজ এখন খেলোয়াড় খেলা দেখাচ্ছে, কেন না আজ ছুটির দিন, খুশির দিন। চটপট হাততালি পড়ছে, এবং সেই সঙ্গে 'লে হালুয়া, লে হালুয়া!' খুশির চিৎকার শোনা যাচ্ছে।) ওরা দেশের ভবিষ্যৎ !

আজ এই উৎসবের দিনে তাই দিকে দিকে মাইকের চড়া আওয়াজে গান বাজছে, কে কতো আওয়াজ বাড়াতে পারে, তার জন্য রেষারেষি চলছে। সব অবশ্য দেশাত্মবোধক গান না, কেন না আজ ফুর্তির দিনও তো বটে! যাদের যেমন ইচ্ছা, হিন্দি বাংলা, সিনেমার গান, পপ্ সং সবরকমই শোনা যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা ? বৃষ্টি পড়ছে ? বাজার চড়া ? তা হোক, আজ ছুটি, আজ উৎসব, আজ পনরোই আগস্ট। আজ এই উত্তর শহরতলীর পথে পথেও লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, জটলা করছে, আর হাসিখুশির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করছে। কেন না প্রতিবাদও তো করতে হবে। খুশি উৎসব ছুটি প্রতিবাদ, সব মিলিয়েই আনন্দ। সেই কতকালের দুর্ভাগিনী দেশমাতাকে ডাস্টবিনের পাশ থেকে তুলে এনে, খড়মাটি রঙ দিয়ে নতুন করে বানানো হয়েছে। মায়ের আজ বত্রিশবছর পূর্ণ হচ্ছে। তার সঙ্গেই এ বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পড়ে গিয়েছে। মায়ের জন্মদিনে আজ শিশুদেরই তো সব থেকে বেশি কদর করতে হবে।

'মরেছে প্যালগা ফরসা, দে হরিবোল !'··· আট দশ থেকে চৌদ্দ পনরো বছরের, খালি গায়ে ধুলা কাদা মাখা, বেপে সব ছেঁড়া ঝোল ঝাপ্‌পা পাত্‌লুন ইত্যাদি পরে আধ ন্যাংটার দল। একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, একটা ছেলের মড়া কাঁধে বয়ে, রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে, আর চেঁচাচ্ছে, 'মরেছে প্যালগা ফরসা, দে হরিবোল !'—মড়া ছেলেটার ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা ঝুলে পড়েছে. আর বাঁশ কাঁধে ছেলেদের নাচের তালে তালে, ছেলেটার মাথাও নাচছে।

খুশির দিনে অবাক জলপান ! কী মজা ! হা ঘরে ভিখিরি, শহরের আপদগুলোর ধ্বনি আর নাচের তালে, অনেকেরই শরীরে তাল লেগে যাচ্ছে। হাসছে কেউ, অবাক কেউ। শহরের যতো খুদে আপদ, নেংটি ইঁদুরের বাচ্চাগুলো এ আবার কী সঙ্ বের করেছে ? সত্যি মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি মজা মারছে। বাঁশে বাঁধা ছেলেটা কি আজই মরেছে নাকি ? বড় ভালো দিনে মরেছে তো !

আজ বড় ভালো দিন !

কিন্তু আজকের ভালো দিনটিতে প্যালগা ফরসা মরেনি। সে নৌতাল্লা ও করে আসেনি। ও মরেছে গতকাল দুপুরের একটু পরে। শহরের যে-খাল নর্দমাটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, যার দু পাশে ঘিঞ্জি শহরের যাটা পায়খানা, বাড়ি-বাজারের পিছন দিকে, যতো নোংরা জল আবর্জনা ভেসে যায়, তারই ধারে, কোনো এক কালের একটা পুরনো ধ্বসে পড়া বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে, লোক চোখের আড়ালে, ওদের একটা আস্তানা আছে। শহরের বাজারের পাশে একটা গলি দিয়ে ঢুকলে, খোলা খাল নর্দমাটার ধার দিয়ে সেই পোড়োর চাতালে যাওয়া যায়। ডান দিকে ঘিঞ্জি পাকা বাড়ি, নিচে সবই দোকান পাট, দোতলা তেতলায় মানুষ থাকে। সামনের দিকে শহরের বাজার দোকানের রাস্তা। পিছন দিকে খোলা খাল নর্দমাটা, যতো নোংরা ফেলার পক্ষে বড় সুবিধা।

বাঁদিকে, খাল নর্দমাটার পাড় বাঁচিয়ে, বেশ্যাপল্লী, জুয়ার আড্ডা, বেআইনি মদ চোলাইয়ের কারখানা। যে-টুকু পাড় বাঁচিয়ে রেখে শহরের এই অংশ মৌমাছির চাকের মতো জমে উঠেছে, সেই পাড়টুকুতে যে-কোনো বয়সের মেয়ে পুরুষরাই প্রস্রাব পাইখানা করে। নোংরা জঞ্জাল তাদেরও কিছু কম না। সবই খাল নর্দমার ধারে ধারে জমা হয়। তারই পাশ কাটিয়ে, ময়লা নোংরা মাড়িয়ে, প্যালগা ফরসাদের পোড়োয় যাবার রাস্তা। আর গঙ্গার ধারের ক্যাওরাপাড়ার যতো ধাড়ি শুয়োরের দল, সেই খাল দিয়ে, বাজারের গলির মোড় অবধি যাতায়াত করে। বাড়ি বাজারের যতো নোংরা, জঞ্জাল, বিষ্ঠায় আর খালের পাঁকে, ধারে ধারে জঙ্গলের শিকড় মূলে খাবারের বড মোচ্ছব তাদের।

গতকাল দুপুরে প্যালগা ফরসার বন্ধুরা, পোড়ো বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে গিয়ে দেখতে পায়, ও একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে। সাধারণত, ঘোর দুপুরে বাজার যখন ফাঁকা থাকে, দোকান-পাটগুলো ঝিমোয়, রাস্তাঘাটে লোকজনের ভিড় কমে যায়, এমন কি রেল ইস্টিশনেও যাত্রীদের আনাগোনা কম, আর সিনেমা ম্যাটিনি শো (আজকাল বেলা একটা দেড়টার মধ্যেই ম্যাটিনি শো শুরু হয়ে যায়।) শুরু হয়ে যায়, তখন ওরা যে যেখানেই থাকুক, ওদের নিরালা আস্তানায় এসে জড়ো হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যার যা আয়, সব ওরা নিজেদের সামনে ঢেলে দেয়। আয়ের সব থেকে মূল্যবান বস্তু হলো পয়সা। সবই ভিক্ষের পয়সা। চুরি, পকেটমারা, বাটপাড়ি করে পয়সা রোজগারের পথে এখনও ওরা যায় নি।

অথবা যাবার সাহস হয় নি। তার জন্যে শহরে আলাদা দল আছে। তারা ওদের সঙ্গে মেশে না, বরং কাছে পিঠে দেখলেই তাড়া করে। তাদের চেহারা আলাদা, ভাবভঙ্গি আলাদা আর তাদের আস্তানাও অন্য জায়গায়। সেখানে অনেক বড় বয়সের লোকেরা আছে। সেই সব লোকেরা আবার শহরের পুলিশদের, বাবুদের কপালে হাত ঠুকে সেলাম করে, হেসে কথা বলে, হাবভাব অনেকটা বাবুদের মতো। তাদের আস্তানাটাও প্যাল্‌গা ফরসার বন্ধুরা চেনে। পাড়ায় ঢোকবার বাঁ পাশেই দিদি, মাসীদের (বয়স অনুপাতে, বেশ্যাদের ওরা এই রকম সম্বোধন করে, এমন কি খুড়ি জেঠি ঠাকুমা দিদিমাও আছে) পাড়ার ভিতরে তাদের আস্তানা। সেই আস্তানায় এদের যাওয়া নিষেধ। ওদের যাবার কোনো দরকারও হয় না। পাড়ার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করলেই সব জানা যায়।

বরং সেই আস্তানার অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ ওদের জঙ্গল ঘেরা পোড়োর চাতালে হানা দেয়। চোখ পাকিয়ে মুখ শক্ত করে ওদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, আশেপাশে নজর করে, জিজ্ঞেস করে, 'কী রে ছুঁচো হারামীর দল, কী করছিস? ছিঁচকেমির মালগুলো কোথায় গাপ্‌ করে রেখেছিস?'

প্যাল্‌গা ফরসাদের মধ্যে সব থেকে যার বয়স বেশি, ওর নাম চটা। চটা শব্দের মানে নাকি চড়ুই পাখি, এটা ও নিজেই বলে। কিন্তু দলপতি হিসাবে ওর সাহস সব থেকে বেশি। ও ওর ছেঁড়া পাতলুনের গিট খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'দ্যাখ কোথায় রেখেছি।'

চটার কাণ্ড দেখে, ওর বন্ধুরা হেসে ওঠে, আর 'আস্তানা'র চোখপাকানোর দল তেড়ে মারতে আসে। চটারা তখন এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করে, কিন্তু হাসে, আর জবাব দেয়, 'আমরা চোর চোট্‌টা নই, বুইলে বাবা? আমরা মেগে নিই, চেয়ে চিন্তে খাই।'

'আর রোজ যে ভিখ্‌ মেগে নগদ পয়সা নিয়ে আসিস, সেগুলো কোথায় যায়?' আস্তানার ওস্তাদরা জিজ্ঞেস করে, চোখে তাদের কুটিল সন্দেহ। অবিশ্যি এই সব ওস্তাদরা কেউই বয়সে খুব বড় না। চটাদের থেকে দু-চার বছরের বড়, দলের হয়ে কাজ করে। ওরাই মাঝে মাঝে চটাদের ওপর খবরদারি করতে আসে। এটাই নিয়ম। একদল, আর এক দলের ওপর সর্দারি করে। চটারাও সর্দারি করে। শহরের একেবারে পুঁচকে মাগার দলগুলো, নাকে শিকনি, চোখে পিচুটি, পেটে চাপ পড়লে

রাস্তার যেখানে-সেখানেই বসে যায়, অনেকের মুখের বুলি এখনও পরিষ্কার ফোটেনি, চটারা তাদের ওপর সর্দারি করে।

চটারা জবাব দেয়, 'নগদ পয়সা? বাবুদের হাতে খা, নগদ কে দেবে? যা দু এক পয়সা পাই, তখুনি কিছু কিনে খেয়ে ফেলি। যাবে আবার কোথায়? ওই যে, দেখছ না? ওখেনে সব আছে।' চারপাশে ছড়ানো বিষ্ঠা দেখিয়ে দেয় আর হাসে।

আস্তানার ওস্তাদেরা গরগরিয়ে তেড়ে আসে। যাকে ধরতে পারে, চাটি গাট্টা মেরে, সারা গায়ে মাথায় হাতড়ায়। হয়তো কারো ছেঁড়া ঝোল-ঝাপ্পার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দু একটা দুই পাঁচ দশ পয়সা। তাই নিয়েই কেটে পড়ে। যাবার আগে হেঁকে যায়, আবার আসবে।

আসে ওরা, পায় ওই রকমই, তার বেশি না। কিন্তু চটাদের সকাল থেকে দুপুরের নগদ আয়, সাত আট জনের মিলিয়ে, কোনদিনই এক দেড় টাকার কম হয় না। অবিশ্যি সবদিন না। কোনো কোনো দিন আরও অনেক কম হয়। তবে, কোন সকালে বেরিয়ে, ঝিমনো দুপুরে ফিরে আগে ওরা যে যার নগদ পয়সা একসঙ্গে হিসাব করে। তখন একজনকে চাতালের থেকে এগিয়ে, জঙ্গলের ধারে লুকিয়ে পাহারা দিতে হয়, কেউ আসছে কী না। নিজেদের মধ্যে নিয়মটা কেমন করে গড়ে উঠেছে, ওরা নিজেরাই জানে না। আসলে, এদের সাত আট জনের দলটা যখন কয়েক বছর থেকে গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই, ওরা যে যার মেগে পেতে পাওয়া যা কিছু এক সঙ্গে জড়ো করে। হিসেব নিয়ে ঝগড়া মারামারিও আছে। কেন না, কেউ হয়তো যা পেয়েছে, তা থেকে খরচ করে খেয়ে ফেলেছে বেশি। হিসাব তো কেউ দেয় না। একজন আর একজনের চোখে পড়ে যায়। ইস্টিশান আর বাজার আর সিনেমা হল ঘিরে, শহরে মেগে বেড়াবার চৌহদ্দি খুব বড় না।

পয়সার হিসাবের পরে, আগেই সেগুলো চালান হয়ে যায়, পোড়োর পিছনের জঙ্গলে একটা ইট, চুন সুরকির চাংড়ার নিচে। পাহারাদারকে ডেকে এনে, তারপরে যে যার ভিক্ষের ঝুলি ঝোলকৌটা খোলে। একটা খবরের কাগজ পেতে, তার ওপরে সব ঢালে। মুড়ি, চিড়ে, ভাঙা বিস্কুটের টুকরো, পাঁউরুটির টুকরো, বাবুদের মুখের থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সিঙাড়া, জিলিপি, গজা, এমন কি রসগোল্লা সন্দেশের কুচিও তার মধ্যে থাকে। সব মিলিয়ে মাখিয়ে, এক এক জনের এক আধ মুঠো করে হয়ে যায়। তারপর যে যার

ঝোল ঝাপ্পার কষি কোমর খুঁজে বের করে পোড়া সিগারেটের টুকরো। আগেই বড়গুলো বাছাই করে, যে যার মতো তুলে নেয়। দেশলাইও একটা থাকে। আগে একজন ধরায়, বাকিরা তার কাছ থেকে ধরায়। শুরু হয় ধূমপানের মজলিস আর খ্যাকর খ্যাকর কাসি। প্যালগা ফরসা বা কোড়ে, ওদের বয়স আট-নয়ের বেশি না। লুকা, চেনো, রামের দশ-বারোর মধ্যে। চটা, টোনা তের-চৌদ্দর কাছাকাছি। বগ্গিরও তাই, তবে ও প্রায়ই দলছুট হয়ে হঠাৎ কোথায় কোথায় হাওয়া হয়ে যায়। দলের মধ্যে বগ্গিই একমাত্র বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। প্রায়ই ভবঘুরের মতো এদিকে ওদিকে চলে যায়, আবার ফিরে আসে।

প্যালগা ফরসা, কোড়ে, লুকা, চেনো, রাম ওরা এখনও পাকা সিগারেট-খোর হয়ে উঠতে পারে নি। টানতে টানতে কাশে, কাশতে কাশতে লালা ঝরে, চোখগুলো লাল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসে, হাঁপায়, তবু টানতে ছাড়ে না। ওরা এ শহরের ছেলে না, নানা জায়গা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে। কার বাপ মা কোথায় কেউ জানে না। কারো কারো বাপ মায়ের কথা একটু আধটু মনে আছে, কোথায় কবে যেন ছিল। এখন আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কাকে কার বাবা মা এ শহরে ছেড়ে গিয়েছে, মনে করতে পারে না। কতটুকু বয়সে কে এই শহরে এসেছিল, মনে নেই। বাজারের ধারে, ইস্টিশানে, রাস্তার ধারের দোকানের ঝাঁপের তলায় থাকতে থাকতে ওরা এ বয়সে পৌঁছেছে। আস্তে আস্তে মিলেছে। এ শহরে খুঁজলে এরকম আরও দু চারটে দল পাওয়া যাবে।

কে বা কারা ওদের নামগুলো রেখেছে? তাও ওরা জানে না। ওরা নিজেরা নিজেদের নাম রাখেনি, অথচ যে যার একটা নাম নিয়েই এসেছিল। এর থেকে বোঝা যায়, একদা কেউ ওদের ছিল, বোধহয় যারা জন্ম দিয়েছিল, আর তারাই নামগুলো দিয়েছিল। কেবল প্যালগার নাম পাগলা কী না এটা ওরা কোনোদিন ভেবে দেখেনি। ও নিজের থেকেই বলত ওর নাম প্যালগা। আর ফরসা কথাটা জুড়ে দিয়েছে দলের সবাই মিলে। কারণ ওর রঙ বেশ ফরসা। কেউ কেউ শুধু ফরসা বলেই ডাকে। পুরো নাম প্যালগা ফরসা।

দুপুরে শহর যখন ঝিমোয়, সে সময়টা ওদেরও আড্ডা বিশ্রাম গল্পের সময়। কেউ চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তার ঘাড়ে আর একজন। কেউ কারো পিঠে তাল ঠুকে গান গায়। কেউ কোমরের কালকোপণা খুলে, বসে যায়

খাল নর্দমার ধারে, আর দরকারে নর্দমার জলই ব্যবহার করে। ধাড়ি শুয়োরের দল সাধারণত গন্ধের ঝোঁকে আসে। দুপুরে এসে গেলেই ওরা ইট ছুঁড়তে শুরু করে। খাল নর্দমায় শুয়োরের দাপাদাপি, চিৎকার, তার সঙ্গে ওদেরও শিকারের হৈ হল্লা উন্মাদনা। কে ঠিক তাগ্ করে মারতে পেরেছে, তাই নিয়ে বাদানুবাদ। বাদানুবাদ থেকে মারামারি। মারামারিটা আসলে খেলা।

ওদের সব থেকে মজার গল্প হয় দোকানদার, রাস্তার, সিনেমার আর ইস্টিশানের বাবুদের নিয়ে। অধিকাংশ দোকানদারের হাতের কাছেই ছপ্‌টি থাকে, বিশেষ করে ওদের তাড়াবার জন্যই। একবারের বেশি দু-বার হাত বাড়ালেই, 'তবে রে হারামির বাচ্ছা!'…কোন্ দোকানদারের ভাবভঙ্গি ভাষা কেমন, সব ওদের মুখস্থ, নকল করে দেখায়। ওরা তরিতরকারি মাছের বাজারে ঢোকে না। কিন্তু খৈ মুড়ি চিড়ের বাজারে ওরা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। দড়া ছেঁড়া গরু ছাগলের সামনে, শাকের খেতের মতো, খৈ মুড়ি চিড়ের বাজারটা। বড় বড় বস্তার মুখগুলো দোকানের সামনে খোলা থাকে। খদ্দের এসে হাতে করে ভালো মন্দ পরখ করে। খদ্দেরের ভিড়ের মধ্যে গরু ছাগল যে আসে না, তা না। বিশেষ করে গোটা দুয়েক ষাঁড়, তাদের জন্য দোকানীরা সব সময়েই ডাণ্ডা উঁচিয়ে আছে। ওরাও সেই ফাঁকে এক আধ মুঠো, ঝটিতি তুলে মুখে পুরে দেয়, না তো ঝোলায় ঢোকায়। দোকানীর চোখে পড়লেই ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া। মাঝে মধ্যে দু চার ঘা পিঠে পড়েই। আর খিস্তি খেউড়?

গালাগালগুলো ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। শহরের দোকানদাররা সবাই ওদের চেনা। কিন্তু বাবুরা না। বাবুদের এক একজনের এক একরকম ভাব। খিটখিটে মেজাজের বাবুদের চেনা যায়। 'বাবু, সারাদিন খাইনি বাবু, বাবু—।' কথা শেষ হবার আগেই তারা খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভাগ, পালা! যত্তো এঁটুলির দল!'

ওরা মনে মনে বলে, 'তোর বাবা এঁটুলি।'…কিন্তু মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কোনো বাবু আছে, তাকায়ও না, কথাও বলে না। যেন দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। কিন্তু রাগও করে না, বড় জোর অন্যদিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। কোনো কোনো বাবু কেবল হাতের ইসারায় সরে যেতে বলে, গায়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কোনো

কোনো বাবু বলে, 'মাপ কর বাবা।' আবার এমন বাবুও আছে, কাছে গিয়ে হাত বাড়ালে, কথা বলে না, কপালে একটা আঙুল ছোঁয়ায়। যেমন অনেক বাবু রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে, বা ঠাকুর-দেবতার খাদির পড়ে গেলে, ঠিক একটি আঙুল কপালে ছোঁয়ায় সেইরকম।

এক এক বাবুর এক একরকম চাল। মা-দিদিমণিদেরও সেইরকম। সবাইকেই ওরা নিখুঁত নকল করে, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। আবার সেই সব বাবু মা-দিদিমণি দোকানদারদের কাছ থেকেই ওদের যা জোটবার জোটে। কে কেমন দেয়, কী ভাবে দেয়, কী বলে দেয়, সে-সবও ওরা নিজেদের নকল করে দেখায়।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পরেই আবার ওরা বেরিয়ে পড়ে। যাবার আগে, চাতালের পিছনে, ইট-চুন-শুরকির চাংড়ার নিচে থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে যায়। রাত্রের ভিড়টা কমে আসতে আসতেই, ওরাও গিয়ে জড়ো হয় ইস্টিশান থেকে দূরে, রেললাইনে। সারাদিনের মেগে পেতে পাওয়া পয়সা নিয়ে, খাল নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে ফিরে যাওয়া মানে, সব হাপিস্। ও পাড়ার আস্তানার মস্তানরা এসে সব কেড়ে নেবে। এরকম কয়েকবার হয়েছে। সেই থেকে রেললাইনের নিরালায় বসে আগে পয়সার হিসাব করে। জমাবার কোনো প্রশ্ন নেই। রেললাইন থেকে চলে যায় শহরের হোটেলগুলোর দরজায় দরজায়। গরম টাটকা ভাত-তরকারি নিয়ে ওদের জন্য কেউ বসে থাকে না। বাসি, বাড়ন্ত, নষ্ট সব মিলিয়ে যা জোটে, পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। কাগজে শালপাতায় মুড়ে খাবার নিয়ে ফিরে যায় আবার রেললাইনে। একপাল কুকুরও সঙ্গে জুটে যায়। একদিকে কুকুর তাড়ানো, আর একদিকে ভাগজোত। সারাদিনে সেটাই ওদের আসল খাওয়া। সব মিলিয়ে সাত-আটজনের পক্ষে অবিশ্যি সেই খাবার পেট ভরবার মতো না।

তারপরে ইস্টিশানের কলের জলে, পেট ঢাক করে, আবার খাল নর্দমার ধারে, জঙ্গলে ঘেরা পোড়োয়। আস্ত ঘর বলতে কিছু নেই, দু-একটা ঘরের মাথায় এখনও দু-চার হাত ছাদ ঝুলে আছে। তার সঙ্গে গাছপালার আড়াল। সেখানে গিয়ে যে যার ঘাড়ে-ঠ্যাঙে-মাথায়-পায়ে দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাঁদিকের পাড়াটা তখন, মেয়ে-পুরুষ মাতালের চিৎকারে হল্লায় সরগরম। ওদের তাতে কিছু যায় আসে না। নেহাত খুনটুন হয়ে গেলে, পুলিশ এলে, ওরা খাল-নর্দমার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যায়।

পেছনে কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। দিন আসে, রাত যায়, ওদের জীবনটাও কাটে। জীবন? তাই বলতে হবে। সব জীবেরই জীবন বলে একটা বস্তু আছে। জীবন তো নিরবধি। মানুষ অমর, কোনো সন্দেহ নেই। না হলে নিরবধি জীবন মিথ্যা হয়ে যায়। সেই নিরবধি জীবনের ছোট একটা গুচ্ছ, গতকাল দুপুরে, খাল-নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে এসে দেখলো প্যাল্‌গা ফরসা একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে আছে। ফরসাটা তখন শাদা প্যাংলা। মুখের কষে রক্ত, ঠোঁটের ফাঁকে কয়েকটা মুড়ি লালায় জড়ানো। চোখ দুটো মরা মাছের মতো, তারা দুটো নড়ছে না। ঘাড় আর কানের কাছে দু-তিনটে বড় পটলের মতো ফুলে উঠেছে।

প্রথম এল টোনা আর কোড়ে। কোড়ে বললো, 'ফরসা শালা কোথায় প্যাঁদানি খেয়ে এসেছে।'

টোনা কাছে এসে বললো, 'কীরে প্যাল্‌গা ফরসা, কেউ মেরেছে?'

প্যাল্‌গা ফরসার গলা দিয়ে গোঙানো শব্দ বেরুলো, 'অঁ-অঁ-অঁ।'

'কে মেরেছে?' টোনা জিজ্ঞেস করলো।

প্যালগা ফরসা তখনই জবাব দিতে পারলো না। একে একে ওদের সবাই এলো। সবাই প্যাল্‌গা ফরসাকে ঘিরে বসলো। চটা প্যাল্‌গা ফরসার ঘাড় আর কানের কাছে হাত দিয়ে বললো, 'শালা, খুব জোর মেরেছে। কে মেরেছেরে?'

প্যাল্‌গা ফরসা গোঙানো স্বরে যা অস্পষ্ট উচ্চারণ করলো, তা বোঝা গেল না, শোনা গেল, 'কঁ-অঁ-সা।'

সবাই মুখ তুলে সকলের মুখের দিকে তাকালো। বগ্‌গি বললো, 'কদম সা, মুড়িওয়ালা।'

'শালা নিজে যেমন মোটা, ওর ঠ্যাঙাবার ডাণ্ডাটাও তেমনি।' রাম বললো।

লুকা বললো, 'ওর মুখে মুড়ি লেগে রয়েছে।'

চেনো জিজ্ঞেস করলো:, 'বস্তা থেকে মুড়ি খেতে গেছিলি, না?'

প্যাল্‌গার গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো, 'অঁ-অঁ-অঁ...।'

'ওর মুখের থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।' রাম বললো।

জটা প্যাল্‌গাকে টেনে চিৎ করলো। প্যাল্‌গার হাত দুটো ল্যাটপেটিয়ে

ছড়িয়ে পড়লো। গা-টা ঠাণ্ডা। জটা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, যন্ত্রণা হচ্ছে?'

প্যাল্‌গার গোঙানো স্বরটা আরও ঝিমিয়ে গেল, চোখের কোণ বেয়ে জল পড়লো। অথচ ও কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। চোখের তারা দুটো নিথর। মুখটা একটু হা-করা, কয়েকটা মুড়ি বাইরে ভিতরে লালায় জড়িয়ে এখন শুকনো, আর কষে রক্ত। রোগা ফরসা খালি গায়ের নানা জায়গায় ধুলা কাদা। কোমরে একটা ঢলঢলে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা। একপাশের অর্ধেক নেই, আর এক পাশেরটা ছিঁড়ে সুতো ঝুলে পড়েছে।

বগ্‌গি জিজ্ঞেস করলো, 'কখন মেরেছে? কখন এখেনে এইচিস?'

প্যাল্‌গা ফরসার ঠোঁট পড়লো, কথা বেরুলো না। ওর ঠোঁটে মাছি বসছে দেখে, রাম হাত নাড়লো। কোড়ে ডাকলো, 'প্যাল্‌গা ফরসা! এই প্যাল্‌গা!'

প্যাল্‌গার ঠোঁটও নড়লো না, টোনা বলে উঠলো, 'ও মরে যাচ্ছে রে!'

চটা ঝুঁকে পড়ে দু হাত দিয়ে প্যাল্‌গাকে জড়িয়ে ধরে নাড়া দিল, ডাকলো, 'এই ফরসা! ফরসা!'

বগ্‌গি প্যাল্‌গার বুকে হাত দিল, বল্‌লো, 'ধুকধুকি নেই। নিশ্বেসও পড়ছে না।'

'কী হবে এখন?' লুকা লাফ দিয়ে দাঁড়ালো, ওর চোখে-মুখে ভয়।

ওর দেখাদেখি চেনো আর রামও উঠে দাঁড়ালো। টোনা বললো, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমরা কি মেরেছি?'

রাম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'পুলিশে ধরে নিয়ে যায় যদি?'

স্বাভাবিক! এ পাড়ায় কেউ মরলে, খুন হলে, আগেই পুলিশ আসে, আর লোকজনকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যায়।

এসব চোখে দেখা ঘটনা। কেবল কোড়েটাই চটা টোনা বগ্‌গির সঙ্গে বসে, প্যাল্‌গা ফরসার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

চটা বললো, 'কিন্তু মরেছে কী না, কী করে বুঝব? মার খেয়ে তো অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। প্যাল্‌গাও সেই রকম রয়েছে কী না, কে বলবে?'

বগ্‌গি বললো, 'চল্ তালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

'এই দুপুরে কোনো ডাক্তারবাবুরা থাকে না।' টোনা বললো, 'এখন

বাবুরা বাড়িতে খেতে গেছে। তবু ছ্যাখ তো আবার ডেকে, কথা বলে কী না।'

কোড়ে প্রায় চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'প্যাল্‌গা! প্যাল্‌গা, এই প্যাল্‌গা!'...

প্যাল্‌গা যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এখন দেখা গেল, ওর কানের ভিতর থেকে গালের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ল। বগ্‌গি বললো, 'মরেই গেছে মনে হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে লুকা চেনো রাম সরে পড়েছিল। একটু পরেই দেখা গেল, পাড়ার মেয়ে পুরুষরা কেউ কেউ চাতালে এসে উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। একজন এগিয়ে এলো। পাতলুন আর শার্ট পরা, চোখ টকটকে লাল, ষণ্ডামার্কা। সবাই জানে, ওর নাম 'টাড়ু'। মদ চোলাই, জুয়া, আর বেশ্যাপাড়ার সব থেকে বড় মস্তান। হাতে লোহার বালা, গলায় সোনার হার। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মধ্যে থাকে না। পাড়ার সবাই ভয় পায়। সে এ পাড়ার যম। টাড়ু এসে চাতালে দাঁড়ালো, দেখলো, তারপরে আস্তে আস্তেই বললো, 'এ তল্লাট থেকে নিয়ে চলে যা। তোল।'

লুকা চেনো রাম টাড়ুর পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া টাড়ুর সাঙ্গপাঙ্গরা তো ছিলই। একমাত্র কোড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাব? এখন তো ডাক্তার পাওয়া যাবে না।'

'আর ডাক্তার দেখাতে হবে না।' 'টাড়ু মেজাজ না দেখিয়েই বললো, 'রাস্তার ওপরে নিয়ে যা। এখান থেকে ঝামেলা হটিয়ে ফ্যাল।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি নিজেদের মধ্যে একবার চোখাচোখি করলো। জানতো এর ওপরে কথা চলবে না। ইচ্ছা করলে ওরা দৌড়ে পালাতে পারে। কিন্তু প্যালগাকে ফেলে পালাবার মতলব ওদের ছিল না। প্যালগাকে সবাই তুলে, হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে বাজারের রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালো। শুইয়ে দিল রাস্তার ধারে। লুকা চেনো রাম অবিশ্যি পিছনে পিছনেই এলো, রইলো কিছু দূরে। বিকাল হতে না হতেই রাস্তায় ভিড় জমতে আরম্ভ করলো। তারপরে এলো একজন লাঠিধারী সেপাই। সেপাই এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?'

ওরা সবাইকে যা জবাব দিয়েছে, সেপাইকেও তাই বললো, 'কদমসা মেরেছে।'

সেপাই ডাণ্ডা তুলে বললো, 'বাজে কথা বলিস না। কদমবাবুর

খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। চল্, থানায় নিয়ে চল্। রাস্তায় ভিড় করা চলবে না।'

চটা, টৌনা, বগ্‌গি আর কোড়ে প্যাল্‌গাকে বয়ে নিয়ে গেল থানায়। সঙ্গে সেপাই। তার পিছনে লুকা রাম চেনো ছাড়াও, আরও কিছু ওদেরই মতো ছেলের দল। দারোগা বাবু সব শুনলেন, দেখলেন। সেপাইকে কী বললেন। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ কদমসা প্রায় দশ-বারোজন লোক নিয়ে থানায় এলো। আর থানার ঘরের বাইরে উঠোনের অন্ধকারে, প্যাল্‌গার মড়া নিয়ে ঘিরে বসে রইল ওর সঙ্গীরা। ঘরের ভিতরের কথা ভিতরে চললো, ওরা কিছুই জানতে বা শুনতে পেলো না।

এক সময়ে কদমসা সদলবলে থানা থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সেই সেপাইটা এসে চটাদের বললো, 'মড়া তোল্। আজ নিয়ে গিয়ে রেল-গুদামের ধারে রাখ্, কাল সকালে আমি যাব। বৃষ্টি হলে গুদামের চালার নীচে থাকবি।'

চটারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝলো না। থানায় কোনো কথা বলতেও সাহস হলো না। প্যাল্‌গার মড়া বয়ে নিয়ে চলে গেল রেলগুদামের ধারে, লাইনের পাশে খোলা জায়গায়। লুকা চেনো রামও দূরে এসে দাঁড়ালো। খোলা জায়গাটার থেকে দূরে একটা মাত্র আলো। সেই আলোয় চটারা যে যার সকালের পয়সা বের করে হিসাব করলো। টৌনা শহরে চলে গেল পয়সা নিয়ে। হোটেলের দরজায় দরজায় ঘুরে যা পাওয়া গেল, বাসি-বাড়ন্ত সারাদিনের ভ্যাপসা নষ্ট খাবার নিয়ে এলো। প্যাল্‌গার মড়া ঘিরে বসে গেল। রাস্তার ধারেই টিউবওয়েল। জল খেয়ে যে যার কোমরের কষি থেকে সিগারেটের পোড়া টুকরো বের করে, ধরিয়ে টানলো।

বগ্‌গি বললো, 'প্যালগাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে, নইলে কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।'

ওরা সবই জানে। বিশেষ করে ভবঘুরে বগ্‌গি। কিন্তু সেপাইটা প্যাল্‌গাকে এখানে নিয়ে আসতে বললো কেন? থানার কদমসার দল এসে কী করলো? কী কথা হলো? থানার দারোগাবাবু কী বললেন? শুভদিনের আগের মেঘলা রাত্রে, ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কেউ ছিল না। বাতাসহীন গুমোটে জিজ্ঞাসাগুলো ওদেরই ঘিরে ভাসতে লাগলো। কেবল দেখা গেল, লুকা, চেনো, রাম, আস্তে আস্তে বন্ধুদের

কাছে এগিয়ে এলো, আর প্যাল্‌গাকে ঘিরে সকলে এক সঙ্গে দলা পাকিয়ে শুয়ে রইলো। বগ্‌গি মিথ্যা বলে নি।' কয়েকটা কুকুর সারা রাত্রিই ওদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করলো।

রাত্রে চটা আর বগ্‌গি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঘলা সকালে সবাই থানার সেপাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। তোড়ে বৃষ্টি ঝরছে না, কিন্তু ঝিপঝিপ ঝরছেই। কিন্তু প্যাল্‌গার মড়া আগলানো বন্ধুদের এ বৃষ্টিতে কিছু যায় আসে না। ওরা সেপাইয়ের অপেক্ষা করছে। কেন অপেক্ষা করছে, কী করতে হবে, কিছুই জানে না। এদিকে ঝিপঝিপ বৃষ্টি শহরের মেঘলা আকাশে, একটা একটা করে মাইকের গান বাজতে শুরু করেছে। বাদলা দিনেও শহরটা ক্রমেই যেন খুশি আর ব্যস্ততায় মেতে উঠছে। কেন? আজ কী? চটারা কিছুই জানে না। ওরা সেপাইয়ের অপেক্ষা করছে। কিছু কিছু ভিখিরি ভবঘুরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। আর নানারকম কথা বলছে। চটাদের মতো আরও যেসব ছেলেরা শহরে ঘুরে বেড়ায়, ওরাও আসছে। কেবল প্যাল্‌গা ফরসার গায়ে হাত রেখে, কোড়েটা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। কাঁদতে বারন করলেই, দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, কদমসার ভুঁড়িটা শালা কামড়ে খেয়ে দেব।'...

অবশেষে সেপাইটি এলো। সে একলা না, সঙ্গে আর একজন, মাথায় ঢাকা রিকশায় চেপে। গত দিনের সেপাইটি রিকশা থেকে নেমেই প্রথমে একটা গালাগাল দিল, 'কুত্তার বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'... তারপরে চারদিকের ভিড়ে একবার শাসানো নজর বুলিয়ে চটাকে হাত তুলে ডাকলো, 'এই ছোঁড়া, এদিকে আয়।'

চটা উঠে তার কাছে গেল। সেপাই একটু সরে গিয়ে বলল, 'ওই মড়াটাকে পোড়াতে হবে, বুঝলি? পোড়াবার খরচ আমি দেব, কিন্তু তোদের হাতে ত টাকা দেব না, মেরে দিয়ে কেটে পড়বি। একটা বাঁশ টাঁশে ঝুলিয়ে মড়াটাকে নিয়ে শ্মশানে যা, আমি সেখানে থাকব। পোড়াবার কাঠ কিনে দিয়ে, ডোমের খরচা দিয়ে চলে আসব। বুঝলি?'

চটা ঘাড় কাত করে জানালো, বুঝেছে। সেপাইটি আর কোনো কথা না বলে, রিকশায় চেপে চলে গেল। তার পরে চটার মুখ থেকে খবরটা সবাই শুনে হৈ হৈ করে উঠলো। জীবনে এরকম একটা ঘটনার কথা ওরা ভাবতেই পারে নি! শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাবার কথা শুনে, সকলেই কেমন খুশি আর ব্যস্ত হয়ে উঠলো। একটা বাঁশ যোগাড়ের অসুবিধে হলো

না। বাঁধা হাঁদা হয়ে গেল। তারপর কাঁধে ঝুলিয়ে যাত্রা। কে যেন প্রথমে বলে উঠলো, 'মরেছে প্যালগা ফরসা, দে হরিবোল্।'…

ঝরুক ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি, তবু আজ উৎসব। প্যাল্গাফরসার শবযাত্রীদের দলটা বাড়তে বাড়তে একটা বড় মিছিলের মতো হয়ে উঠেছে। শহরের লোকেরা নেংটিইঁদুরের বাচ্চাগুলোর নতুন সঙ দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। কিন্তু একটা সিনেমা হলের সামনে যেতেই, কয়েকজন নানা বয়সের বাবু ছুটে এসে হাঁকলো, 'এই, চুপ! এখানে তোরা ওসব হাঁক ডাক বাচলামো করবি না। মুখ বুজে চলে যা। এগিয়ে গিয়ে যতো খুশি হরিবোল্ দে।'

প্যাল্গার শবযাত্রী বন্ধুরা, আরও অনেকে চুপ করে গেল, আর নিঃশব্দে সিনেমা হলটা পেরিয়ে গেল। দেখলো, হলের সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে একটা পুলিশ ভ্যান্। আশেপাশে বাবু মা আর খোকা খুকুদের ভিড়। হলের মধ্যে ঢোকবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। শুধু হলের মাথায় লাল কাপড়ের ওপর সোনালী অক্ষরের লেখাগুলো ওরা পড়তে পারলো না। সেখানে লেখা ছিল,

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯।
'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ'
'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠুক ওদের জীবন'

প্যাল্গা ফরসার শবযাত্রীরা সিনেমা হলটা পেরিয়ে আবার হাঁক দিল, 'মরেছে প্যাল্গা ফরসা…।' কেবল কোড়েটাই কাঁদছে, আর দুধের দাঁতগুলো চিবিয়ে বলছে, 'কদমাসার ছুঁড়ির মাংস একদিন কামড়ে ছিঁড়ে খাব।'…

বিদেশী ছড়ার অবলম্বনে

বিষ্ণু দে

কথোপকথনের নিয়ম, জানো, বন্ধুরা,—
প্রথম হচ্ছে—প্রশ্ন করা :
পরে···উত্তরের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরা।

আমি অনেক সময়ে নির্জনে চিন্তা করে দেখেছি
খুব স্পষ্ট চেহারার অনেক কিছুই—
একেবারেই সত্য নয়।

কবি তো লক্ষ্য করে না
যথোচিত আমি—কে
বরঞ্চ অপরিহার্য তুমি—কে।

এসো, আমরা সময়কে সময় দিই :
যাতে পাত্রটি উপচে পড়ে—
তার আগে, পাত্রের কানায় জলটাকে আসতে দাও।

কবিতা লেখাতে, চেষ্টা করি
ওদের দুটি আলো দিতে : একটি
পড়বে, সহজ হবে, অন্যটি তির্যকে।

হাওয়া

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরে এসে আগে চলে যাওয়া
এখন উঠেছে কী যে হাওয়া

গেলে তো আমারও ভালো, বাঁচি
সেই কোন্ সকাল থেকে আছি
টিকি বাঁধা যেহেতু পুরাণে
জন্মসূত্রে কাজ করি ফুরানে

সন্ধ্যে হোক, কচ্‌লে হাত ধোবো
তারপর, আঃ লম্বা হয়ে শোবো

অমনি শিয়রে বসবে কাজী
ছুঁড়ে বলবে : মর্ পাজী—

এখন উঠেছে তাই হাওয়া
পরে এসে আগে চলে যাওয়া ॥

কথাগুলোকে

অরুণ মিত্র

আমি কথাগুলোকে উল্‌টে ফেলতে চাই। তারা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একঘেঁয়ে বকে ককায় শাসায় পায়ে লুটোয় ভোঁতা গলায় চেঁচায় হাঁপায় এলিয়ে যায় বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে। আমি তাদের সাপ্‌টে ধরি কিন্তু তারা আমার মুঠো ফস্‌কে নেমে দম-দেওয়া চাকায় ঘোরে সেই আগের আওয়াজ। "তুমি কি আমায় ভালোবাসো না?" অথবা "তুমি কি আমাকে ভয় পাও নাকি ভয় দেখাও?" ভালোবাসা ভয়, মানে কী? অথবা "চলো আমরা

ওইখানে পালাই", নয় "এসো আমরা মরুভূমি বানাই আর বালিতে মুখ গুজি", নয় "ধন্য যন্ত্রণা ধন্য বসুন্ধরা", নয়তো "সমস্ত কথাবার্তাকে ত্রিশূলে ফুঁড়ে আমরা জয়পতাকা উড়িয়ে দিই কেননা আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছি চুপ"। মানে কী?

কথাগুলোকে তাদের অভ্যেস থেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে তারা স'রে স'রে আবার পুরোনো খাতে। তাদের ধান্দাবাজি নাটুকেপনা বকবকানি অন্ধ ঘোরা ধাপ্পা ভাঙা গলা সমানেই চলতে থাকে। এ-আচরণ কাঁহাতক সওয়া যায়? কেতাদুরস্তি শেষ হোক। তোমার হাতটাকে লাঙল করো মাটি যেমন উলটে দেয় ঠিক তেমনি ক'রে উলটোও কথাগুলোকে তবেই তাদের উপর ধরে ধরে চারা জন্মাবে চোখ-ছাপানো ফসল। তখন নবান্ন তখন বসন্ত তখন শান্তি।

ক্রমাগত ক্রমাগত

রাম বসু

ফাল্গুন অরণ্য তটে কূল ভাঙা অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ
আকাশ রাঙিয়ে স্তব্ধ পলাশের অদ্ভুত আগুন
স্বর্ণচাঁপা আলোর ভিতর হীরার জলন্ত পাহাড়
পাতায় পাতায় অদৃশ্য প্রাণীর নীড় ও মূর্ছনা
শস্যের সন্তান কোলে নদীর গলায় ঘুম পাড়ানী গান
উদ্ভিদের হিমেল আঘ্রাণে তন্দ্রাতুর নৈঃশব্দ্য

আমি তবু প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব, দুই বিপরীতের শিঙ-এ বিদ্ধ
আমার নলিন সীমান্ত পার হতে পারিনি এখনো, এখনো হইনি
দূর নক্ষত্রের আলোয় ভেজা ফেনা আর পল্লবে আচ্ছন্ন সবুজ দ্বীপ
পাখির স্বপ্নের মতো স্থির কেন্দ্রে সমর্পিত

জানি না কতদূর বন্ধ আর সত্তার নিটোল বৃত্ত, ত্রিবেণী সঙ্গম
আরও কত পাঁক ঠেলে ঠেলে দিগন্ত বলয়, মুগ্ধ আবির্ভাব

শান্তত্বের ভারে অবনত আমাদের পরিণতি,—আরও কত দূর ?

শস্যের অশান্ত তিমিরে মুখ ডুবলেও, নতজানু হলেও ঘাসের ওপর
কানে আসে অন্তর্গত বিশৃঙ্খলার কর্কশ আওয়াজ, লুপ্ত জলধারার আর্তনাদ
মানুষের ভালবাসার ভাষা খুঁজতে যারা রূপান্তরিত পবিত্র দৃশ্যাবলীর
আনন্দে
তাদের দীর্ঘশ্বাস এখন মুক্তোফলের স্তবক, পদচিহ্নে সপ্তর্ষির কান্না

অথবা এই কি মানুষের নিয়তি বুকে কুরুক্ষেত্র নিয়ে মহাপ্রস্থানের
দিকে যাওয়া
বিশৃঙ্খলায় নিহিত শৃঙ্খলার বীজ প্রভুত্ব বাড়িয়ে নিয়ে যায় আরও
উন্নত বৃত্তে
আবার উন্নত বৃত্তের বিশৃঙ্খলা, আবার শৃঙ্খলা, আরও উন্নত বৃত্ত—
ক্রমাগত ক্রমাগত

বুকের ভাতার মাতাল আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে হতে ঘুমিয়ে
পড়লো গাছের গোড়ায়
তার এলোমেলো ধূলি ধুসরিত চুলে ঝরা পাতার স্নিগ্ধতা, চোখের
পাতায় জোনাকির আলো
ওই ছায়া ছায়া পাহাড়ের চূড়ার ওপারে যেখানে থমকে আছে
রাজেশ্বরী সন্ধ্যার রথ
বাতাসের আদিম বর্বরতা, দিগ্‌কন্যার অঙ্গের সৌরভ, অমিত শক্তির
মুখের আদল
সেখান থেকে ভেসে আসা স্বর্গীয় বিলাপের কমনীয়তা তাকে ঘিরে ধরেছে
আর তার দিকে তাকিয়ে আছে অরণ্যের নিস্তব্ধ আনন্দ মায়ের মতো
করুণা আর উদ্বেগে

রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর পথে মানুষের এই অসম্ভব সুন্দর প্রয়াস ক্রমাগত
নিবু নিবু শিখাটাকে উসকে দিয়ে আবার অভিযাত্রীর ঝোলা কাঁধে করা
আবার অনুসরণ করে চলা নতুন বৃত্তের সংকেত, বস্তু আর সত্তার ত্রিবেণী
আকাশ সমুদ্র মাড়িয়ে যাবার স্পর্ধা আর তারা থেকে তারায় সেতু
নির্মাণের ইচ্ছা

সমুদ্র নীল দ্বীপের কপালে স্থলভূমির তিলক এঁকে হাওয়ার বিস্তীর্ণতার
বুক রাখা
এই যেন আমাদের বিরতি, তিমির হনন উৎসের সূর্যের সংকেত এই যেন

আর তাকানো সূর্যের দিকে যার গভীরে প্রতি নিমেষেই হয়ে চলেছে
মারাত্মক বিস্ফোরণ
এই পৃথিবীর দিকে যার পাঁজরের তলায় ভূমিকম্পের গোঙানি, বজ্রের
সিংহের অশান্ত হুংকার
তার ওপর লেগে দেওয়া প্রসন্নতার পলি, অমিত বিক্রমে পরিণত করা
পূর্ণতার শস্য
সমুদ্র-কণ্ঠে স্তোত্রের উচ্চারণে নিস্তেজ হয়ে আসা নাগ বাসুকির ফণার
ওপর দাঁড়ানো

সূর্য পৃথিবী, হে আদি জনক জননী এই কি শিখায় অমোঘ বিধিলিপি নয় ?

মানুষ জানে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মানুষ জানে…
অনেক কিছু তৈরী করেছে সে নিজেই।
দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত হয়েছে সুরা,
কয়লা থেকে আগুন,
চুম্বন থেকে গভীরতর ভালোবাসা।

মানুষ জানে
দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের কালো হাওয়ায়
কী ভাবে গড়ে তুলতে হয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ;
মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে গভীরতর
অন্ধকারে

কী ভাবে এগিয়ে যেতে হয়

মানুষ জানে
কী ভাবে জলকে রূপান্তরিত করা যায় বিদ্যুতে,
স্বপ্নকে নিয়ে আসা যায় বাস্তবের কাছাকাছি
কুয়াশার তোরণের মধ্য দিয়ে ;
কোন যাদুতে এক সময়
হৃদয়ের অন্ধকার কোণ থেকে দ্রুত সরে যায়
অবিশ্বাসী মেঘ,
শত্রুতার রূপান্তর ঘটে সখ্যতায় ।

মানুষ জানে
কী ক'রে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে-যেতে
আবার ফিরে আসা যায় আলোর দিকে,
জীবনের দিকে ॥

একটা সিঁড়ি অন্তত

মণীন্দ্র রায়

কিছুই ঠিক দাঁড়িয়ে নেই,
না তুমি, না তোমার ঘর-সংসার,
এমন-কি আকাশ-জোড়া রাশিচক্র :
দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে যায় দাখিলা-পরচা,
ঘৃণা আর ভালোবাসা মুণ্ড বদল করে মাঝরাতে

যাযাবর সময়
চিরদিনই খেদিয়ে বেরিয়েছে মানুষকে
সদা পোষমানা পশুর মতো ।

পায়ের তলার বোবা মাটি
কথা বলতে চেয়েছে শস্যের বর্ণমালায়।

কিছুই ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে না,
না হিংসা, না অনুকম্পা, না ভালোবাসা।
প্রতি দশ বছরের দাঁড়িপাল্লাই আসলে নতুন।
পৃথিবীর উত্তর মেরুও নাকি
কাঁধ বদলে নিয়েছে একদিন বিষুবরেখায়।

মুঙ্গেরের খড়্গপুর হ্রদের ধারে
নবপ্রস্তর যুগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের কুঠার হাতে নিয়ে
একদিন আমি মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিলাম
সামনের দশহাজার বছর।

চল, এগোতে চেষ্টা করি
একটা সিঁড়ি অন্তত ওঠা যাক।

তারার মতো ফোটে

চিত্ত ঘোষ

কিছুই পাওয়া যায় নি
৬ একটা চেক-আপ শুধু বাকি
তারপরই ছেড়ে দেবে।

পি. জি. হাসপাতালের সাদা বাড়ীটার সিঁড়ি ভেঙে
আমরা দোতলার কেবিনের ভেতর উঠে এসেছিলাম
আমাদের পেছনে পেছনে অন্ধকারও উঠে এসেছিল।

অন্ধকারকে জায়গা না দিয়ে
লোহার খাটের ওপর ঘন হয়ে বসে

আমরা ভাগ করে ক্লাবের চা খেলাম
তারপর অনেক কথা হল : রোগের কথা, আরোগ্যের কথা।
ঘুমের মধ্যে অন্যরকম হয়ে যাওয়ার কথা।
তারপর চিন্তার একটা ছক তৈরি করতে করতে
অন্যমনস্কভাবে পি. জি. হাসপাতালের গেট পেরিয়ে বাইরে এসে
আমরা যে যার দিকে চলে গেলাম।
কালপুরুষের দিকে তাকানোর কথা
তখনও আমাদের মনে হয় নি।

চিন্তার সাজানো ছকগুলো যে
এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে
আমরা ভাবি নি।
ভাবি নি আগুনের এত কাছে।

কাগজে বার বার নিজের নাম লিখেছিলে কেন ?
সারারাত চিৎকার করে দুর্বোধ্য সব কথা বলেছিলে কেন ?
অক্ষরগুলো, সেই দুর্বোধ্য কথাগুলো
অনেক দূরের আকাশে নীল আগুনের তারার মতো ফোটে।

শেকড়

কৃষ্ণ ধর

আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি ;
আমি ব্রুকলিনের সেই কালো কুচ্ছিত ছেলেটা
জন্ম থেকেই বেজন্মা, কুত্তীর বাচ্চা ইত্যাদি মধুর বিশেষণ
শুনতে শুনতে যার মাথায় শয়তানের শিং গজাবে
আর ক'দিন পরেই

আমার সামনে হাডসন নদীতে এখনই সূর্যাস্ত হবে

আমার কুমারী মা গেছে ব্যানহাটানে গতর খাটতে
আমি এমনি সব শুয়োরের বাচ্চাদের সঙ্গে
তিপান্ন নম্বর রাস্তায় দিন কাটাই
আমাদের ঠিকানা ব্রুকলিনের ফুটপাথ
আমি দিনভর চকচকে সব গাড়ির হুস্ হুস্ শব্দ শুনি
কেমন জানি একটা নেশা ধরে গেছে
কোনো অরণ্য-জনপদের শেকড়ের কথা আমি জানি না
আমি অন্য কোথাও ফিরে যেতে চাই না
আমি এখানেই আর পাঁচজনের মতো বড় হতে চাই
আমি সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করি
যেদিন আমার অচেনা বাবা এসে মাকে নাম ধরে ডেকে
দরজায় কড়া নাড়বেন
আর দরজা খুলে দিলেই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে
তিনি বলবেন, এই তো তোর শেকড় বাছা আমার,
তোর মায়ের পাশে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে।

ম্লান জ্যোৎস্নায়

গোলাম কুদ্দুস

মৌন বিস্ময়ে ম্লান জ্যোৎস্নায়
পশ্চাতে ধাবমান ছায়ামূর্তি গাছপালা।
শুধু ছড়িয়ে যেতে পারছি নে
শক্ত টেলিগ্রাফের তার এবং খুঁটি
একটা অতিক্রম করা মাত্র আর একটা হাজির!
ওরা কেন আমার সঙ্গে চলেছে প্রায় সমান্তরাল রেখায়?
আমিও পাকা অশ্বারোহীর মত চাবুক হেনে
দ্রুত ছোটাচ্ছি আমার বাহনকে,
তবু ওরা কিছুতেই ছাড়বে না আমার সঙ্গ!
আমাদের পারস্পরিক ধস্তাধস্তিতে ব্যর্থ হল জ্যোৎস্না রাত্রি,

ব্যর্থ হল নির্জন প্রান্তরে পরীর দেশের হাতছানি,
নিষ্ঠুর প্রহরীর মত খুঁটিগুলো পাহারারত
আমার কল্পনার রাজপ্রাসাদের দ্বারে দ্বারে,
নিয়ত সূঁচের মত বিঁধছে এসে মনে।
ব্যথার তীব্রতায় রাত্রি কাটল নিদ্রাহীন।
সকালে ট্রেন এসে দাঁড়াল লাইনের শেষ স্টেশনে,
অমনি শেষ হয়ে গেল টেলিগ্রাফের তার এবং খুঁটি!
আগেও নয়, পরেও নয়।

শৈশবের সেই কলের গাড়ির সওয়ারি
আমি সারাজীবন ধরে দেখছি
তার এবং খুঁটি চলে গেছে
আমার সব চলার পথের পাশ দিয়ে,
সব লোকালয়ের ভিতর দিয়ে,
সব মানুষের মানুষের মানসজগৎ ভেদ করে।
শুধু তারে যখন কদাচিত অযাচিত বেজে উঠেছে সুর
তখন খুঁটিখোঁটা সব কিছু মধুর, মধুর!
বাকী কালটা দ্বন্দ্বের সঙ্গে ছন্দের পাঞ্জা কষাকষিতে
কত যে রসপাত্র পড়ে গেছে হাত থেকে,
কত যে ফুলফল দূর্বাদল কিশলয় মেঘ পাখী ঝর্ণা
আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে চলে গেছে মুখ ফিরিয়ে।
তোমরা তো বলো বৈপরীত্যের সংগ্রামই জীবন,
সব গতির তিনিই অধিপতি,
আমাকে রথে তুলে নিয়ে তাঁর এ কী খেলা,
শেষ স্টেশনে পৌঁছানোর আগে
তিনি কি কিছুতেই ফুরোতে দেবেন না
আমার অতিক্রমণের নেশা?
দুরন্ত অশ্ব একদিন পিঠ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে
নিশ্চিত মাড়িয়ে যাবে জেনেও
আমি ছুটে যাচ্ছি তার ঝুঁটি ধরে।

অভিজ্ঞান

ধনঞ্জয় দাশ

আজকাল দেখতে পাচ্ছি
হাসপাতালের হাঁ ক্রমশ বিশাল হচ্ছে
ডীপ অক্সিজেন টেন্ট
জলন্ত রোদের টুকরো গিলে খাচ্ছে

আজকাল বুঝতে পারছি
নিরাময় প্রার্থনা ক'রে
আমাদের প্রিয়জন, বন্ধু বা বান্ধবী
করজোড়ে যাঁরা ঐ দুয়ারে দাঁড়াচ্ছে
স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি
হাঁ-মুখ দানব এক গিলে খাচ্ছে
সেইসব সোনামোড়া জীবনের ট্রেন

তারপর উগরে দিলে
বাকীটুকু লুফে নিচ্ছে কাপালিক কেওড়াতলা
কিংবা কোনো আগুনের ক্রেন।

কর্পূর এবং পিঁপড়েরা

রত্নেশ্বর হাজরা

শাদা কর্পূরের কাছে যাবে না পিঁপড়েরা
ও-গন্ধ নিষিদ্ধ তবু কর্পূর মেশানো
বাতাস ওদের ডাকে আয়……
তাই নিষেধের খুব কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে
এবং নড়ে না
যেমন নড়ে না অনেকেই

নিষেধের কাছ থেকে সহজ ব্যাখ্যায়
যেমন বাঘের লোভ বসে থাকে মড়ির কাছেই
শিকারীও রয়েছে জ্যোৎস্নায়
জানে বাঘ, তবু
মড়ি ও শিকারী দুই প্রান্তে মাঝে ক্ষুধা
উবু হয়ে বসে থাকে—তার
[illegible] ওইখানে…
কিন্তু সব নিয়ম নিষেধ
ক্ষুধা কি মেনেছে—নাকি মানে !

পিঁপড়েরা যাবে না ওইখানে ওই কর্পূরের কাছে
তবু যায়
কেননা নিষেধ আর কতোদিন থাকে
কর্পূরও আক্রান্ত হলে উড়ে যায় প্রচণ্ড হাওয়ায়
দাবী করে নিজেরই মৃত্যুকে
বাতাস বহন করে তার মৃতদেহ অদৃশ্য নাস্তিতে
আবার পিঁপড়েরা ঘোরে
অসুখে-বিসুখে শীতে ঈশানে নৈঋর্তে—

ধরতে না ধরতেই

বিভোষ আচার্য

ধরতে না ধরতেই ফের নাগালের বাইরে যায়
মুচকি হেসে কী কটাক্ষে
এখনো পাগল করে :
কাঁটাকুশে রক্তাক্ত পায়ের পাতা
জখোছি নিসাড়, তবু
তার প্রেম
অবাক ছায়ার মতো

সামনে থেকে আরো সামনে টানে
এখনো নাচায়

ধরতে না ধরতেই খালি নাগালের বাইরে গেছে :
অবয়বে কী গভীর জাদু ঠমকে ঠমকে ঠাসা
দারুণ প্রশ্নের বিকিরণে
আচ্ছন্ন, বিহ্বল
কতোযুগ…
অথচ অলক্ষ্যে দিন আলোর পতাকা খুলে খুলে
নেমে গেছে কখন আড়ালে

রক্তে কী যে উন্মাদনা আজো খেলা করে :
ভরতে না ভরতেই তাই উপচে পড়ে
হাতের অঙ্গুলি থেকে পায়ের মাটিতে
দারুণ চমক দিয়ে ফণা তুলে কোথায় পালায়
এখনো জানিনে ॥

আপাতত আমরণ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

স্পাইর‍্যাল বেয়ে ধীরে উঠে আসে শীত
কত উচ্চে বসে আছি
নিরাপদ
দূরত্ব বাঁচিয়ে
ফুলের গন্ধ-ও ভুলে করে না উৎপাত

বন্ধ দরোজার পাশে কে ওই একেলা
হাওয়া নাচে

দাঁতে দাঁত ঘষে

চেঁচায় আর্তের মতো

মধ্যরাতে

জীবন…জীবন…যশোদাজীবন

সে কি ভিক্ষা যাচে

অথবা সম্মান

কানাকড়ি

আপাতত আমরণ

যা আমার একান্ত সম্বল

মহিষকুড়ার উপকথা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

আমাদের এই গল্পটা মহিষকুড়া নামে এক নগণ্য গ্রামকে কেন্দ্র করে। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় বিস্তীর্ণ সবুজ-সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ। এত ছোট, এত নগণ্য, চারিদিকের জঙ্গলে এমন ঘেরা যে তাকে আবিষ্কার করার জন্য জীপ্‌ গাড়ির বহর সাজিয়ে অভিযান করলে মানিয়ে যায়; বরং সুখ ও মৃদু উত্তেজনার কারণ হয়: বনের হিংস্র জন্তুদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পিকনিকের আবহাওয়ায় নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, কারণ মনে হতে থাকে এরা বোধ হয় বনে পথ হারিয়ে যাওয়া এক মানবগোষ্ঠীর বংশধর, যারা এই বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে।

এসব ধারণা অবশ্যই ঠিক নয়। একটু সাহস করে এদিক ওদিক হাঁটলে দেখা যাবে অরণ্যের শাল-সারির ভিতর দিয়ে সরু সরু পায়ে চলা পথ আছে; গরুর গাড়ি এমন কি জীপ চলতে পারে এমন একটা চওড়া মেটে পথ চোখে পড়া সম্ভব যা এক গ্রাম থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। আর সে পথ শেষ হয়েছে বনের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া কালো কোন পীচের পথে; কিংবা সে পথে কিছুদূর পর্যন্ত মিশে থেকে আবার তা থেকে পৃথক হয়ে আর একটি নগণ্য গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, যে গ্রামের নাম হয়তো ফুলন্দ কাটা, কিংবা তোটরারি, কিংবা সিহক ছোট শালবাড়ি।—সে সব গ্রামও জঙ্গলে ঘেরা।

তা, এদিকে এক সময়ে নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানী ছিল, এখন যাকে এ জেলা সে জেলা নামে বিভক্ত করে পরিচিত করা হয় সেই ভূমিকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করে। এমন গল্প যে এক রাজা তার সৈন্য-সামন্ত-অন্তঃপুর নিয়ে পালিয়ে থাকতে পেরেছিল। মীর জুমলার অনুচরেরা, বাঘা বাঘা ইরানী তুরানী তুর্ক, মাথায় কুল্লা-মুরেঠা-শিরপেচ্, কোমরবন্দে দামিস্কের কিরিচ, চোখে সুরমা সুর্ক, মুখে চুন্ত্ পুন্ত্—খুঁজে খুঁজে হয়রান। অবশেষে এ রাজ্যটাও আমাদের হলো এই ভেবে রাজ্য রাজধানীর মুগলাই নাম দিয়ে, রাজবংশের এক ছোকরাকে মুগলাই নামে তখৎ-এ বসিয়ে শুল্কে চারা দিয়ে মীরজুমলা আরও পূর্বদেশ কব্জা করতে রওয়ানা হয়েছিলেন। আমরা, অবশ্যই, শুল্কের ব্যাপারটায় কলপ্ নেব না, কেন না মীরজুমলার শুল্ক ছিল কিনা তা ইতিহাস লেখে না। প্রবাদ এই সাহেবান রাজ্যসীমার নদী পার হতে না হতে রাজার সৈন্যদল শালমারির মধ্যে দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছিল, রাজ্য রাজধানী আবার দখল করেছিল, তখৎনসিন সেই ছোকরা-নরাধমের যারপরনাই হেনস্তা করেছিল।

যাক সে কথা, ইতিহাস খুব গোলমেলে গল্প। মহিষকুড়ার চারিদিকে যে বন তার জাতি গোত্র চিনতে পারাই আসল কথা। কালবশে সে অরণ্যের হ্রাস হয়েছে নতুবা জেলাগুলির জন্ম হতো না। মুঘল তাতার তুর্কী যার কাছে হার মেনেছিল সেই বন যেন সাধারণ মানুষের ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। যাই হোক, এত ক্ষয় সত্ত্বেও সে অরণ্য এখন ইংরাজি নামের সম্মান পেয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট। সেই বনের মধ্যে এখন নদী আছে, তীব্র স্রোতের ঝর্ণা আছে, তড়াগ-পল্বল-সরোবর আছে, এক প্রান্তে তো নীল পাহাড় আবেগের ঢেউ বুকে হিমালয়ের দিকে এগিয়েছে। তা হলেও নামেই প্রমাণ, এখন সে অরণ্য মানুষের কব্জায়। তার বুকে, যেন এক শত্রুরাজাকে শাসনে রাখতে, লোহার শিকল পরানোর মতোই যা, কালো কালো পীচের রাস্তা-সড়ক। হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝর ঝর করে লরি-ট্রাক, কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও, কোথায় যেন এক চাপা অশান্তি ধিক্ ধিক্ করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন, যেন পাকা সড়কের বাইরে যাওয়া সব সময়ে নিরাপদ নয়। মনে হয় কোথাও এমন আদিম গভীরতা আছে যা একটা মানবগোষ্ঠীকে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে, যেন সেখানে এক দারুণ বন্য হিংস্রতা আছে যা মানুষের হিসাবকে ওলটপালট করে দিতে পারে। অন্যদিকে দেখো এই মহিষকুড়া,

কিংবা জোটদারি, অথবা তুষককাটি গ্রামগুলোকে : তারা যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে। এমন দেখে আমার একবার মনে হয়েছিল অরণ্যের দুই রূপ আছে, এক রূপে সে আশ্রয় দেয়, অন্যটিতে সে প্রতিহত করে। বাজাকে আশ্রয় দেয়ার সেই পুরাকালের ঐতিহ্য সে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু সেখানেই তার ভুল। সে প্রকৃতপক্ষে এক বোকা জানুয়িনের মতো হার্মাদদের নিজের মাঝে আশ্রয় দিয়ে বসেছিল। কারণ যারা বনের বুকে কুটিল, কালো, গরম পীচ ঢেলে সড়ক তৈরি করে আর যারা লাঙলের পিছনে ধৈর্য ধরে এগোয় তারা একই জাতের। আগুনে পুড়লে তবু আশা থাকে, ছাই-এর তলা থেকে নবাঙ্কুর দেখা দেয়; লোভের লাঙলে পড়লে তেমন যে শাল-শালাজিকের নিরেট নিশ্ছিদ্র ব্যূহ, এক বনস্পতির এলাকা থেকে অন্য বনস্পতির এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিষমুখ কাঁটালতার তেমন যে সব ব্যারিকেড—সব ধসে যায়।

কিন্তু মুস্কিল এই সংগ্রাম ও শান্তির প্রতীক হিসাবে তরবারি ও লাঙল ইউরোপের মানুষেরা এত বেশি প্রচার করেছে যে এখন আমাদের পক্ষে লাঙলের সঙ্গে লোভ শব্দটাকে যুক্ত করতে সংকোচ দেখা দিয়েছে। লাঙল যে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্ন না হয়ে তার আগ্রাসনের চিহ্ন হতে পারে তা ভাবতেও অনিচ্ছা হয়।

আর তা হয়তো যুক্তিযুক্তই। বনের কি চেতনা আছে যে তাকে সহৃদয় কিংবা হিংস্র বলা যাবে? সমুদ্র, হিমালয়, কালবৈশাখী কাকেই বা সহৃদয় কিংবা হিংস্র বলি?

বনে ক্রীড়াশীল হরিণ-হরিণী যেমন আছে, তেমন, মুহূর্তে সে-ক্রীড়াকে বিভীষিকায় পরিণত করে যে গ্রীবা কণ্ডুয়নের আদর আনত, তাকে, তীক্ষ্ণ দাঁতে চিরে রক্তপান করে এমন বাঘও আছে, বাস-ট্রাকের শব্দে অপমানিত বোধ করে ডালপালা ভেঙে শুঁড় তুলে ছুটে চলা হাতীর দল আছে, আগুনের গোলার মতো লাফিয়ে পড়া বাঘকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে রক্তচক্ষু মহিষরাজ তার কালো, ছড়ান, প্রকাণ্ড শিংজোড়া মেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে এমন হতে পারে, অযুত বিচিত্র চিত্র-দেহ পাখ-পাখালী আছে, তেমন আছে বিষ-থলি যুক্ত ফণা তুলে খরিশ-গোখরো। কিন্তু সেই বাঘ, সেই হাতী, সেই মোষ, কিংবা সেই ফণী, এরাই কি কেউ হিংস্র?

বোধ হয় তুলনাটাই বদলানো ভালো। অরণ্য সম্বন্ধে নানা রকম কথা যে মনে হয়, যার কোনো একটাকেই যথার্থ যে মনে হয় না, তার কারণ

বোধ হয় এই যে, সে বরং অবচেতন মনের মতো। যেন করাতের কলের শান দেয়া ধার, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল তার, হাল ট্রাকের কুণ্ডলাভিতে উচ্ছ্বসিত পীচ-সড়ক, এদিক ওদিক বনের গভীরে ডুবে থাকা গ্রাম, আর তাদের ঘিরে থাকা প্রাণীদের নিঃশব্দ কখনও বা চাপা তর্জন-গর্জনযুক্ত পদসঞ্চার-স্পন্দিত বন—এসব মিলে যেন একটাই মন, বন যে মনের অবচেতন অংশ। আর তা যদি হয় তবে মহিষকুড়ার মতো গ্রামগুলি অস্ফুট আবেগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

আমরা মহিষকুড়া গ্রামের কথাই বলছি, কিন্তু বনের কথা এসে গেল, কারণ বন থেকে এই সব গ্রামকে আলাদা করা যায় না।

এই সব গ্রামের নামের মধ্যে ছোট ছোট ইতিহাস লুকানো আছে মনে হয়। ভোটমারিতে নাকি স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ভুটিয়া দস্যুদের যুদ্ধই হয়েছিল। তুরুককাটায় নাকি মুঘলদের একটা ছোট বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল। মহিষকুড়া নাকি প্রথমে বুনো মোষদের বিচরণস্থান ছিল, পরে বুনো মোষ ধরে যারা বিক্রি করে তাদের আড্ডা।

কুড়া ডোবা, দোলা জমি, এমনকি দহ হতে পারে, নদী খাতের গভীরতর অংশ। এ অঞ্চলের বড নদীটা মহিষকুড়া গ্রাম থেকে এখন বেশ কিছু দূরে বনের আড়ালে। তখন মহিষকুড়া ছিল নদীর নাম। এখন সেই পুরনো খাতের চিহ্ন মহিষকুড়া গ্রামের প্রায় মাঝ বরাবর ক্ষীণভাবে পরস্পর সংযুক্ত কয়েকটি ছোটবড খাদ। এক দহের সঙ্গে অন্য দহের প্রণালী সংযোগের নাম ঝোরা। বর্ষায় জলে ভরে ওঠে সেগুলি, অন্য সময়ে দু-একটি ছাড়া অন্যগুলি শুকিয়ে যায়। খুব ভারি বর্ষায় যখন কুডাগুলোর মধ্যেকার সংযোগ বেয়েও জল চলে, আবার নদীর মতো দেখায়। নদী যখন বহতা ছিল তখন এই নদী বারবার বুনো মোষের আড্ডা জমত। কিছু দূরে দূরে যেন নিজ-নিজ চারণভূমির সীমার মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশটি করে মোষের এক একটি দল। কোনো কোনো দলে নাকি শতাধিক মোষও থাকত। শীত পড়লে নদীর জল শুকিয়ে উঠতে থাকলে এই মোষগুলি ধরতে একদল বেদিয়ার মতো মানুষ আসত এই অঞ্চলে। আমরা হাতী ধরার খেদার কথা জানি। সে কাজের বিপদ আন্দাজ করতে পারি। এই মোষ ধরার ব্যাপারও কম বিপজ্জনক ছিল না। মনে রাখতে হবে দলবদ্ধ বুনো মোষকে বনের হিংস্র পশুরাও সমীহ করে চলে। জলের ধারে, আধডোবা চর ও ঘাস বনে এই বুনো মোষদের আড্ডা। এই বেদিয়াদের সেই আড্ডার

ঢুকতে হতো। কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো চরের উপরে বসানো খড়ের ছোট ছোট নড়বড়ে চালার তলে তাদের মূল খাঁটি বসতো। এসব খাঁটি ক্রুদ্ধ ধাবমান মোষের ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কখনো কখনো। শিং-এর গুঁতোর পায়ের চাপে প্রকাণ্ড শরীরের ধাক্কায় মানুষের মৃত্যুও ঘটত। সেই খাঁটি থেকে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে জলে নেমে, মোষদের ভয় দেখিয়ে দড়িদড়ার ফাঁদে দমিয়ে ধরে ফেলার মধ্যে কৌশল ও বুদ্ধি যতটা লাগত সাহসও তার চাইতে কম লাগত না। ক্লেশ তো প্রতিপদেই, কখনো মৃত্যুও ঘটে যেত। শিঙের ধাক্কায় নৌকা উল্টে যেতে পারত, ফাঁদে ফেলা মোষের দলের মধ্যে জলে পাড়ে গিয়ে মৃত্যুও ঘটেছে দু-একবার। লাভের লোভে যেমন, নিজেদের পৌরুষকে কাজে লাগানোর নেশায় তেমন, এই বেদিয়ারা এই বিপজ্জনক ব্যাপারে নিজেদের নিযুক্ত করত। মোষ ধরার তোড়জোড় করা থেকে শুরু করে তাদের কিছুটা পোষ মানিয়ে বিক্রি করা পর্যন্ত তিন-চার মাস তারা কাটাতো এই অঞ্চলে। তখন থেকে এর নাম হয়েছে মহিষকুড়া।

সেই মোষগুলি কিংবা সেই মানুষগুলি কোথায় গেল কেউ জানে না। এখনো এ অঞ্চলে কিছু মোষ আছে, তবে তা কারো-না-কারো বাথানের, অথবা কারো-না-কারো গাড়িটানা, লাঙলটানা মোষ। বাথানের মোষগুলোর চেহারা ভালো। সেগুলোর বেশির ভাগই দুধেলা মোষ। বাচ্চা, মাঝবয়সী মোষও থাকে কয়েকটি করে। কোনো কোনো বড় বাথানে একটি-দুটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মোষও থাকে, যেমন মহিষকুড়ার জাফরুল্লা ব্যাপারির বাথানে। অধিকাংশ বাথানেই দুধেলা মোষের সংখ্যা চার-পাঁচটি। বাথানের মালিক অনেক সময়ে সে সব মোষ দিয়ে লাঙল চষায়। জাফরুল্লার বাথানে কিছুদিন আগেও ছোটবড় মাদী, মর্দা, বলদ-করা মিলে পঁচিশটা মোষ ছিল। তার মোষগুলোর চেহারাও ভালো। মোষগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যা রিজার্ভ ফরেস্টের পাশে পাশে, অনেক সময়ে ফরেস্টের ভিতরে ঢুকে গিয়েও চরে বেড়ায়। মর্দা আর বাচ্চাগুলো তো সারা বছরই। চাষের সময়ে বলদ-করা মোষগুলো চরে খেতে পায় না। আর সে সময়ে দুধ বন্ধ করেছে এমন গাবতান মাদীগুলোকেও লাঙলে যেতে হয় দরকার হলে। অন্য সময়ে বলদ-করা মোষগুলোও দুধেলা মোষগুলোর সঙ্গে বনে চরে। চাউটিয়া বর্মন দুধ দুয়ে নেবার পরই তাদের ছেড়ে দেয় আজিজ আর সোভানের খবরদারিতে।

মর্দা মোষ দুটোই তাদের বাহন। যে দুটোকে বাগে রাখতে পারলে অন্য সবগুলো তাদের গলার ছোট ঘণ্টার শব্দ অনুসারে তাদের অনুসরণ করে। দশ-বারো বছরের সেই ছোকরা দুটো গভীর বনে ঢুকেও নির্ভয়। অনুমান হয় তার অনেকখানি মোষ দুটোর আকৃতি ও চালচলন থেকে পাওয়া। বনের মধ্যে সে দুটির ব্যবহার যেন দলপতির মতো। যতক্ষণ গ্রামের মধ্যে বাথানে, একবারও ডাকে কিনা সন্দেহ—বনের মধ্যে থেকে থেকেই 'অঁা-অঁা-ড' করে ডেকে ওঠে। সে ডাকে বলদ মোষগুলো মাদী বাচ্চাগুলো দূর দূর থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

শুধু পুরুষ দুটো নয়, বনে স্বচ্ছন্দ বিহারের ফলে জাফরুল্লার বাথানের সব মোষের স্বাস্থ্য ভালো, যেন আকারেও বড়; শহরের ধারে কাছে দেখা মোষদের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে বন থেকে ধরে আনা মোষদের মতোও নয় তারা। তাদের বনের মধ্যে দেখে পোষমানা বলেই চিনতে পারা যায়। বুনো মোষ এ দিকে আর আসে না। যদি বছর দশেক আগেকার সেই ঘটনাটা, যার অনেকটাই ইতিমধ্যে অস্পষ্ট, তাকে গণনায় না আনা হয়।

রূপকথার মতো লাগে শুনতে। আসফাক শুনেছিল চাউটিয়ার কাছে। ভোটমারির এক গৃহস্থ তার মাদী মোষকে এনেছিল জাফরুল্লার বাথানে। এসব ব্যাপারে, যেমন বাথানের দুধ দোহার ব্যাপারে, কিংবা প্রাণীগুলোর কোনটিকে রোগে ধরলেও চাউটিয়াই কর্তা। এমন কি বীজের দাম দু-এক টাকা মাদী মোষের মালিকরা যা দেয় তাও চাউটিয়ার প্রাপ্য।

চাউটিয়া প্রথমে ভোটমারির সেই গৃহস্থকে জাফরুল্লার মোষদুটির মধ্যে একটাকে পছন্দ করতে বলেছিল। আকারে প্রকারে বলবীর্যে দুটো প্রায় একই রকম। বয়সে ছ-সাত বছরের তফাৎ। সম্বন্ধে পিতাপুত্র বলতে পার। বুনো অবস্থা হলে দলপতি কে হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়ার সময় হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কোনটি হয়তো তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এসব শুনে সেই গৃহস্থ তরুণতরটিকেই পছন্দ করবে মনে হয়েছিল, কিন্তু চাউটিয়া পরামর্শ দিয়েছিল বয়স্কটাকে নিতে।

সেই সূত্রেই এই গল্পটা বলেছিল চাউটিয়া। তখন আশ্বিনের শেষ রাতে গা শিন্ শিন্ করতে শুরু করেছে। সকালে বনের গায়ে কিছু কুয়াশা দেখা দিতে শুরু করেছে। বছর দশেক আগের কথা। জাফরুল্লার বাপ করেজুল্লা তখনও বেঁচে। চাউটিয়ার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি।

তখনও সে এই বাথানেই কাজ করে। চাউটিয়ার বাপ নাকি মোষখ্যা কাশি ছিল। যাক সে কথা, আশ্বিনের ভোরের প্রথম শীতের আমেজে অন্য লোকে যখন কাঁথা টেনে নিয়ে পাশ ফেরে, বুড়ো ফয়েজুল্লা তখনই উঠে পড়ত। আর তার দিনের প্রথম কাজই ছিল দারিঘরে এসে বসে বেশ বড় এক কলকে তামাক প্রাণভরে টানা। দিনের আলো তখন অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া। ফয়েজুল্লা অন্দর থেকে তার হুঁকা হাতে দারিঘরের কাছে প্রায় এসে পড়েছে, হঠাৎ মোষের ডাকাডাকি তার কানে গেল। সাধারণ ডাকাডাকি নয়, অস্বস্তিতে সে থেমে দাঁড়াল। কিন্তু নেশার টান। সে দেখতে পেল চাউটিয়া দারিঘরের কাছে খড়ের বোঁথায় আগুন দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে, তামাকের আগুন। সুতরাং সে দারিঘরের দিকেই হেঁটে চলল।

কিন্তু অস্বস্তিটা যাওয়ার নয়। কলকে হুঁকায় চড়াতে গিয়ে সে থমকে গেল। বাথানটা দারিঘর থেকে উত্তর-পূর্বে পঞ্চাশ হাত দূরে। প্রায় মানুষ সমান উঁচু দোফালা বাঁশের চেকোয়ার, শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে শক্ত করা। কিছু কুয়াশা সেদিকে। সেই কুয়াশার মধ্যে সেই মানুষসমান উঁচু বেড়ার মাথার উপর দিয়ে একটা মোষের কাঁধ আর উঁচু করা শিংসমেত মাথা। অভ্যস্ত চোখের এক পলকেই সে বুঝতে পারল সাধারণ মোষ নয় সেটা। অপরিচিত তো বটেই আর সেজন্যই বাথানের ভিতরের মোষগুলোর ডাকাডাকি। তাদের ফোঁস ফোঁস শব্দও যেন এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। বাইরের মোষটা বেড়ার মাঝামাঝি জায়গায় সামনের দু-পা বাড়িয়ে খাড়া হয়ে উঠল একবার। কি তার মাথা, আর কি তার শিং! ফয়েজুল্লা বলল, 'বুনা?'

'সনৎ খায়।'

মোষটা সেদিক দিয়ে বাথানে ঢুকতে না পেরে আরও উত্তেজিত হয়ে পুব দিকে ঘুরে এলো। তখন তাকে সবটা দেখা গেল; উত্তেজিত ক্রুদ্ধ একটা পাহাড়। দুটো শিং যেন দেড়গজ করে, মাথাটা সাধারণ মোষের সোয়াগুণ, কাঁধের কাছে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু, সেখানে আবার ঝাকড়া ঝাকড়া পশম। মনে হল বাথানের বেড়া ভেঙে ফেলবে এবার। আর তাও যদি না করে, বাড়ির ভেতরে ঢোকে যদি, কিংবা গোয়ালঘরে, মানুষ মারতে পারে, গোরু জখম হতে পারে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল চাউটিয়া আর ফয়েজুল্লা। এদিকে তখন বাথানের ভিতরে মোষের ডাকাডাকি, আর বাইরে সে যমদূতের আস্ফালন। বেড়ার

ফাঁক পেতে ঘুরছে সে। মাথা নামিয়ে আক্রমণের ভঙ্গিতে ফোঁস ফোঁস্ করছে। খুর দিয়ে মাটিতে গর্ত করছে। অরেই বুদ্ধি যোগান এখন। তারপর বুদ্ধিটাকে ফয়েজুল্লার পছন্দই হলো।

জানোয়ারটা মানুষের গলা না শোনে এমন ভাবে গলা নামিয়ে ফয়েজুল্লা বলল, 'ডাকপায়া মাদিটাক ছাড়ি দেও।'

যে মাদী মোষটা ডাকছে। ভোরের অন্ধকারে যার ডাক এই বুনোটাকে টেনে এনেছে, সেটাকে ছেড়ে দিলে অন্য মোষগুলো সমেত বাথান নিরাপদ হবে; কারণ দুটোই সে ক্ষেত্রে বনের দিকে চলে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত যদি মাদীটা বুনোটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে আনতে পারে একটা ভালো মোষ লাভ হয়ে যায়। এই শেষের যুক্তিটা মনে হতেই ফয়েজুল্লার চোখের কোণে হাসি দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু মাদীটাকে বাথানের বাইরে বের করে দেয়া সোজা কথা নয়। বাথানের ভিতরে ঢুকতে হবে। বাইরের ওই ক্ষেপে যাওয়া বুনোটাকে এড়িয়ে বাথানের বিশ হাতের মধ্যে যাওয়া মানে নিজেকে খুন করা। ভাবতেও গলার ভিতরটা শুখিয়ে যায়।

চাউটিয়া উবু হয়ে বসেছিল। নিজের দুই হাঁটুর পাশ দিয়ে হাত দুটোকে সামনে এনে আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে এ হাতে ও হাত ধরলো। যেন আড়মোড়া ভাঙলো। এমন শক্ত করে এ হাতে ও হাতের চাপ যে আঙুলের গাঁটগুলো পটপট করে ফুটলো। আলসেমি তাড়ানোর ভঙ্গিই যেন, কিন্তু এ আলসেমি ত্রিশ বছরের। তার বাপ ফান্দির কাজ ছেড়ে দেয়ার পরে যে দশ বছর বেঁচেছিল, তার বাপের মরার পর থেকে তখন পর্যন্ত তার নিজের জীবনের বিশ বছর, একুনে যে ত্রিশ বছর ফান্দির দাঁড়িতে হাত পড়ে নি। সেই ত্রিশ বছরের আলসেমি ভাঙতে চেষ্টা করছে যেন চাউটিয়া।

বাথান আর ছারিঘরের মাঝখানে যে পঞ্চাশ হাত, তাতে আড়াল আবডাল খুবই কম। দুটো আশশেওড়া আর একটা বুনো কুলের ঝোপ। ছোট ঝোপ, এপারে দাঁড়ালে ওপার দেখা যায়। মাঝে মাঝে ঘাস আছে একদেড় হাত উঁচু, কিন্তু বেশির ভাগ জমি দুর্বা ঢাকা। সব চাইতে বিপদের এই বাথানের বেড়ার কাছে চারপাত জমি একেবারে ফাঁকা। বাথানের দরজার দিকে যাওয়াই যাবে না। আর কাছাকাছিই বুনোটা। একেবারে উল্টো দিক দিয়ে বাথানের বেড়া বেয়ে উঠে বাথানের ভিতরে নেমে ডাকপায়া মাদীটাকে আলাদা করে দরজার কাছে নিয়ে এসে সেটাকে বার করে দিতে

হবে ; এক হাতে হুড়কো তুলতে হবে, অন্য হাতে তাড়াতে হবে মাদীটাকে। যদি বুনোটা টের পেয়ে যায়, বেরনোর পথে মাদীটাকে যদি বেধে ফেলে তবে সেটা ভেঙে আসবেই। তখন মাদীটাও বাথানে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। দুয়ের ধাক্কায় পিষ্টের গুঁতোয় প্রাণ যাওয়াটাই স্বাভাবিক হবে।

গামছাটাকে লেংটির মতো করে পরে, লম্বা সরুগোছের একটা পেন্টি পিঠের উপরে নেংটির কাঁদে গুঁজে বুকে হেঁটে চাউটিয়া বাথানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। বুনোটা তখন বাথানের পুব দিকে। দক্ষিণঘেঁষা পশ্চিমে বাথানের গা-ঘেঁষা জামরুল গাছটায় উঠে, তার ডাল বেয়ে এগিয়ে, তা থেকে ঝুল খেয়ে বাথানের ভিতরে নেমেছিল চাউটিয়া। ডাক-পায়া মাদীটাকে খুঁজে নিয়ে দরজা খুলে বের করে দিয়েছিল। মাদীটা মুখ বার করতে না করতে আর একবার ডেকে উঠল, আর একই সঙ্গে ঝড় আর ভূমিকম্পের মতো ভেঙে এল বুনো। ভাগ্য ভালো মাদীটা বাথানের দিকে না ফিরে বাইরের দিকে ছুটল।

সেই সময়ে চাউটিয়া বুনোকে ভালো করে দেখছিল। 'সামনার ঠ্যাং ছুকনা পিছলা ঠ্যাং ছুকনার চায়া আধা হাত উঁচা। সিংঘর ছবি দেখছেন তোমরা? কান্ধতে যেমন চুল।'

ভোটমারির সেই গৃহস্থ বলেছিল, 'থুস, তোমরা দেখি মস্করা করেন।'

তার বিস্ময় ও অবিশ্বাস স্বাভাবিক। মোষ সে অনেক দেখেছে, তার নিজেরও গোটা কয়েক আছে। হতে পারে সেই বুনোটা প্রকাণ্ড ছিল, তাই বলে ও রকম অদ্ভুত গড়ন হয় না।

কিন্তু আগ্রহভরে আসফাকও শুনছিল গল্পটা। সে নড়ে বসে বলল, 'তার পাছৎ?'

গল্পটার শেষটুকু এই রকম : ঘণ্টাখানেক পরে ভালো রকমে নাস্তা খেয়ে মজবুত হাত ত্রিশেক লম্বা দড়ি, লম্বা হালকা দা, বেতের পেন্টি (লম্বা সরু মজবুত লাঠি) কয়েক দিনের মতো চিড়া-গুড়-লঙ্কা-নুন নিয়ে নেংটিপরা চাউটিয়া মোষের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল।

ভোটমারির লোকটি জিজ্ঞাসা করল চাউটিয়া এই বড় মদ্দাটাকেই সেই বুনো বলে বোঝাতে চাচ্ছে কিনা।

চাউটিয়া বলল সে মোষ ধরা যায় নি। সেটা মোষ কিনা তাও সন্দেহ আছে। মাদীটাকে অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল সাত দিন পরে। ফরেস্টাররা খুব ঠাট্টা করবে ভেবেছিল। কিন্তু করে নি।

সেও ষোষটাকে দেখেছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেলো মাদীটা পাবতান। এই মদ্দাটা সেই বাচ্চা। আর ছোটটা সেই বাচ্চার বাচ্চা।

সেই দশ বছর আগে একবারই বুনো ষোষের দেখা পাওয়া গিয়েছিল মহিষকুড়ায়। তবে সে ষোষও অদ্ভুত। চাউটিয়া তো বলে কাজেই খানিকটা আলাদা। গায়ের রং-এ কালোয় খয়েরি মেশান। তাকে কি ধরা যায়? খানিকটা দেয়াসী নয়? দেয়াসী মানে দেবাংশী। দেবতার অংশে যে জাত। তা, সেই সাহেব বলেছিল, ওটা ষোষই নয় হয়তো—বাইসন ছিল।

সাহেব বলতে তারা নয়, যারা বিলেত থেকে এদেশে আসত আগে। এদেশেরই কালো-কোলো মানুষ, জীপ গাড়িটাড়িতে যায় আসে, নাকি মাজিস্টর, খুব পায়োর।

পায়োর শব্দটা আসফাক শিখেছে কিছুদিন আগে। ইংরেজি পাউয়ার শব্দটাই। আসফাক যতদূর পেরেছে উচ্চারণ করতে তার বেশি তার কাছে আশা করা যায় না। আর কি আজব এই শব্দ! জাফরুল্লার চশমার পায়োর বদলানোর সেই গল্প কে না জানে। ছমির বলে পায়োর বদলাতে গিয়েই জাফরুল্লা তিসরা বিবিকে দেখতে পেয়েছিল। জাফরুল্লা নাকি এতদিন বুঝতে পারে নি তার বড় আর মেজ বিবির বয়স হয়েছে। আবার দেখো, জাফরুল্লার সেই বন্দুকের পায়োর। সরু লাঠির মতো কালো চকচকে সেই নলটা থেকে যা বের হয় তা নাকি জমানো জমাট পায়োর, যার এক ফুলকিতে আকাশে ছোটা হরিণ নিথর হয়ে যায়। মাজিস্টরদের তো বটেই, এমন কি যারা মাজিস্টর নয় অথচ তার মতো পোশাক পরে!—পোশাকের কি পায়োর দেখ। আর দেখ সেই বুনোটা যে দশ বছর আগে একবার এসেছিল তার কি পায়োর, এ অঞ্চলের অনেক ষোষ আকারে-প্রকারে এখন অন্য ষোষ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার পায়োরের ফলে।

আসফাক পথে চলতে চলতে এসব কথাই ভাবছিল। সে জাফরুল্লার জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছে। মহিষকুড়ায় ডাক্তার নেই। একজন আছে বটে যে অন্যান্যদের মতো খেতখামারের কাজ করে, দরকার হলে এ-গাছ ও-গাছের ছাল-বাকলা শিকড় আল দিয়ে কিংবা তাদের পাতার রস দিয়ে বড়ি-টড়ি তৈরি করে দেয়। কিন্তু জাফরুল্লার এখন সহরের ডাক্তারের ওষুধ ছাড়া চলে না। রোজই নাকি তাকে ওষুধ খেতে হয়। তা জাফরুল্লার

বয়স ধাট তো হলোই। ওষুধগুলো যতক্ষণ হাতের কাছে ততক্ষণ জাফরুল্লাকে শক্তসমর্থই মনে হয়, ওষুধের অভাব হলে নাকি হাত-পা অবশ হয়ে আসে।

আসফাক তখন ছারিঘরের আর বাথানের মাঝের মাঠটায় এক ছোকরার সঙ্গে হাত লাগিয়ে পাটের সুতলি পাকিয়ে গোরুমোষ বাঁধার দড়িদড়া তৈরি করছিল। মোষের মতো অনেক গরুও আছে জাফরুল্লার। সংখ্যায় বরং গরুই বেশি। চল্লিশ-পঞ্চাশটা তো বটেই। এই অঞ্চলে এই গরুগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ণবয়স্ক হলেও আকারে এত ছোট যে দূর থেকে তাদের চলতে দেখলে রামছাগলের দল বলে ভুল হয়। তাহলেও এগুলোর মধ্যে ষাঁড়, বলদ, গাভী আছে। গাভীগুলোর এক আধপোয়া দুধ হয়। বলদগুলো দরকার হয় তামাকের ক্ষেতে চাষ দিতে যেখানে মোষ দিয়ে চাষ চলে না। ষাঁড়গুলো দলের শোভা বৃদ্ধি করে, গাভীদের শান্ত রাখে, আর মাঝে মাঝে তাদের দু-একটাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাভী-গুলোর দুধের একটা গুণ আছে। জাফরুল্লার এখন মোষের দুধ সহ্য হয় না, মুন্নাফ আরও কিছু বয়স না হলে মোষের দুধ ধরবে না। গাভীর দুধ তাদের জন্য আলাদা করে দুইয়ে দেয় আসফাক। কিন্তু এই গোরুর পালের আসল উপকারিতা গোবর—যা তামাকের খেতের পক্ষে অপরিহার্য। সেই খেতের জন্যই গোরু পোষা। মোষের গোবরে কেন হয় না, হয় কিনা তামাকের সার,—এ সব নির্বোধ ছাড়া কেউ আলোচনা করে না।

তা, মুন্নাফ বললে, 'এই যে মিঞা সাহেব শোনেন, আব্বাজানের অষুধ ফুরাই গেইছে, সহরৎ যাওয়া লাগে।'

আসফাক ধীরে ধীরে বলেছিল, 'সহর?'

'হাঁ, পিরহান্ পিন্ধি আসেন তোমরা।'

আসফাক সেই বলদদের ঘরে গিয়ে দেওয়ালে গোঁজা জামাটা ঝেড়েঝুড়ে গায়ে দিয়ে এসেছিল। আর মুন্নাফ তাকে খুচরোয় আর নোটে মিলিয়ে আটদশটা টাকা এনে দিয়েছিল আর একখানা কাগজ। শহরের দোকানটা আসফাকের চেনা। কাগজ দেখালেই ওষুধ দেবে।

মুন্নাফকে কে না চেনে এ গেঁদে? জাফরুল্লা ব্যাপারির একমাত্র ছেলে। তার চার নম্বর বিবির দরুন চারবিবি মিলে ওই এক সন্তান।

আসফাক হাঁটতে শুরু করেছিল।

আসফাক কেন? আসফাককেই কেন ওষুধ এনে দিতে হবে? তার

অবশ্য কারণ আছে। জাফরুল্লার খামারে কে কি কাজ করবে তা ঠিকঠাক বলে দেয়া আছে। যেমন মোষের বাথানের কঠিন কাজগুলোর ভার চাউটিয়ার উপরে। দুধও দোয়ায় সে। যায় দুধ দোয়ানো হলে সেই দেড়-দুই মণ দুধ বাঁকে নিয়ে শহরের দিকে যায়। রোজ সে শহরে ঢোকে না, শহরের তিন মাইলের মধ্যে দুই পীচের সড়কের মিল পর্যন্ত যায়, যেখানে এখন শহরের গোয়ালারা এদিকের সব বাথানের দুধ কিনতে আসে। সেখানে উনুন জেলে ছানাও তৈরি করে। তাতে দুধ পচার ভয় এড়ান যায়। আর মোষের দুধের ছানা গরু-দুধের ছানা বলে শহরে ঢোকে। চাউটিয়া তাদের চাইতেও তরখর। দুধ দোয়ানো হলে সে অনেক সময়েই মাখন তুলে নেয় এক সের।

ছমিরের কাজ খড়ি ফাড়া, তরকারি বাগান তদ্বির করা, হাঁসমুরগী দেখে রাখা। তার একটা বিশেষ কাজ আছে। খাসী হোক, এঁড়ে হোক তার জবেহ করা, ছাল ছাড়ান। আর বছরে একবার সেই দৃশ্যটা দেখা যায়—মোষ, গরু, পাঁঠাকে খাসী করা। এ ব্যাপারে অন্য লোকের সাহায্য দরকার হয়, পশুগুলোকে মাটিতে চেপে ধরে রাখতে হয়। তারা রাগ প্রকাশ করে, আর্তনাদ করে, পা ছোড়ে, ছটফট করে যন্ত্রণায়। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কিন্তু বোধ হয় তার আকর্ষণও আছে। কাছাকাছি যারা অন্য কাজে থাকে তারাও কাজ ফেলে কাছে এসে দাঁড়ায়। ঝিদের দেখতে দেখা গিয়েছে আড়াল থেকে। এমন কি জাফরুল্লার তিসরা বিবিকেও সেই ভিড়ে কিছুক্ষণের জন্য একবার দেখা গিয়েছিল। আসফাক বাঁশের একমাথা মাটিতে চেপে ধরে রাখা ছাড়া কিছুই করে নি এ পর্যন্ত। ছমির কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয় না, তার হাত কাঁপে না। কি কি করতে হবে তা যেন তার মুখস্ত। একবার তো সে আসফাককে বলেছিল—'নাও, মিঞা চোখু খুলি ফেল। হয়া গেইছে।' আসফাক চোখ খুলেছিল কিন্তু পশুটার অন্তরঙ্গ দিকে না চেয়ে বরং তার চোয়ালের দিকে চেয়েছিল আর তার মনে হয়েছিল সেই মোষের এঁড়ের বড় বড় চোখ দিয়ে জল পড়ে সর্দির মতো শুখিয়ে আছে চোয়ালে। ছমির কিন্তু এই পরবটার জন্যই যেন উৎসুক হয়ে থাকে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেদিন তার এবং যাদের সে সঙ্গী করে তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একের পর এক পশুকে, ছমিরের ইয়ারকি, সুন্নৎ করে।

নসির আর সত্তারকে লাঙলদার মনে হবে। লাঙলদার এখানে কে নয়? সে রকম চাপের তাড়া পড়লে, প্রকৃতির খেয়ালে তা পড়েও, জাফরুল্লাও পাঁচ-

সাত বছর আগে পর্যন্ত নিজেই লাঙল ধরেছে। কিন্তু সত্তার আর মনিরের কাজ তামাকের ক্ষেতে। অনেক সময়ে তাদের সাহায্য করতে তিন হাজিরার লোক রাখতে হয়, কিন্তু জমি চষা থেকে শুরু করে, পাতা কেটে তোলা পর্যন্ত সে ক্ষেতগুলোতে তারাই ওস্তাদ। কি আদর যত্ন সেইসব জমির আর তার ফসলের, ধান তার অর্ধেক পেলে ধন্য হয়। সারা বছরই যেন মনির আর সত্তার সেই জমিতে লেগে আছে। চাষ দিচ্ছে, খড়কুটো জড়ো করে পোড়াচ্ছে, সার দিচ্ছে, আল বাঁধছে। আর পাতা কাটা? তখন তো তাদের সেরা ওস্তাদি। তখন সেসব ক্ষেতে কারো নামাই বারণ। একবার আসফাক একটা তামাকগাছে কাস্তে বসিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে জাফরুল্লা ছুটে এসে এমন এক থাপ্পড় কষিয়েছিল যে সারা জীবনে তা ভুলতে পারা যাবে না।

কাজ তো ভাগ করাই আছে, কিন্তু শহরে যাওয়াই যদি কাজ হয় তবে চাউটিয়া নয় কেন? সে তো রোজকার মতো আজও শহরের তিন মাইলের মধ্যে সেই সলসলা বাড়িতে গিয়েছে দুধ নিয়ে। সে অনায়াসেই আর তিন মাইল এগিয়ে শহরের দোকান থেকে ওষুধ এনে দিতে পারতো। আর কোন কোন দিন সে ওই তিন মাইল পথ পার হয়ও। সরষের তেল, কেরোসিন তেলের টিন দুধের খালি টিনগুলো বাঁকে বসিয়ে নিয়ে আসে। মশলাপাতির জন্যও সেই শহরে যায়। কিন্তু ওষুধের বেলায় আসফাক কেন?

শহরে যাওয়ার দুটো পথ আছে। উত্তর আর পশ্চিমের ঠিক মাঝামাঝি দিক ধরে গিয়ে পাকা পীচ সড়ক। সেই সড়ক ধরে দক্ষিণ পূর্বের চাইতে বরং পুব ঘেঁষে পাঁচ সাড়ে-পাঁচ মাইল নামলে শহর। দ্বিতীয় পথ, তাকে অবশ্য পথ বলা হবে কি না সন্দেহ, মহিষকুড়া থেকে যে পায়ে চলা পথ দক্ষিণে গিয়ে বনে ঢুকেছে, সেই পথে গিয়ে বনে ঢুকতে হবে, আর তারপর বনের মধ্যে দক্ষিণে-পশ্চিমে চার মাইল গেলেই শহর। বনের এই পথ আদৌ নির্দিষ্ট নয়। এমন হতে পারে এই চার মাইল যেতে দ্বিতীয় মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না। বর্ষাকালে ছোট ছোট নদী, ঝর্ণা, ঝোরা পড়ে সে পথে। একটু বেহিসেবী হলেই দিক ভুল হতে পারে। গাছের নিচে নিচে চলতে চলতে একমানুষ সমান কোন ঘাসের জঙ্গলে পৌঁছাতে পারো যার মধ্যে দিয়ে চলা যায় না, আর তাকে ঘুরে চলতে গিয়ে এমন বনে পৌঁছানো সম্ভব যা হয়তো শহর থেকে সাত আট মাইল দূরে নিয়ে যাবে।

চাউটিয়া এই বনের পথ ধরেও শহরে যায়। আসফাকও কয়েকবার

গিয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে পায়ে পায়ে ঘাস মরে গিয়ে পথ হয়েছে। প্রত্যেককেই প্রতিবারে নিজের আন্দাজ মতো চলতে হয়। ঝোপঝাড়ের চেহারা দেখেই পথ করতে হয়। অথচ বলে এই ঝোপঝাড়ের চেহারা রোজ বদলায়, ঋতু অনুসারে তারা বাড়ে কমে।

তা হলেও 'অমুখ' বলে কথা। আসফাক গ্রাম থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ তাড়াতাড়ি হেঁটেছিল। তারপর একটা ধীর নির্দিষ্ট গতিতে চলছে। এই গতিটার এক বৈশিষ্ট্য আছে। দেখলে মনে হবে অলস উদ্যমহীন। আসলে কিন্তু সহিষ্ণু আর অচঞ্চল। গাড়ির আগে মোষের চলার ভঙ্গির সঙ্গে মেলে। শিং দুটোকে পিছন দিকে হেলিয়ে মুখটা একটু তুলে সে চলেছে তো চলেছেই। যেন সে জেনে ফেলেছে যে অস্বাভাবিক কষ্টদায়ক ব্যাপারটা তার কাঁধের থেকে ঝুলতে ঝুলতে তার পিছন পিছন চলছে —যত জোরেই যাও সে কাঁধ ছাড়বে না, পিছনে আসাও বন্ধ করবে না। বরং জোরে গেলে সে আরও জোরে পিছনে আসে, তখন হঠাৎ থামতে গেলে সে পিছন থেকে এমন ধাক্কা দেয় যেন পড়ে যেতে হবে। আবার যদি আস্তে আস্তে চলা যায় তবে পিছনের সেই বোঝার ধারাল গায়ে লেগে পিছনের পা দুটোয় ঘা হয়ে যাবে।

আসফাক ভাবল: সেই বুনো মোষটার কিন্তু জোড়া নেই যে তাকে লাঙলে কিংবা গাড়িতে লাগবে। সে মাথাটাকে একটু পিছনে হেলিয়ে মুখটাকে একটু তুলে হাঁটতে লাগল।

সেই বুনো মোষ যখন এসেছিল তখন আসফাক জাফরুল্লার খামারে আসে নি। কিন্তু সেই সাহেবকে যখন চাউটিয়া গল্পটা বলেছিল তখন আসফাক ঘারিঘরের বারান্দার নিচে বসে পাট থেকে সুতলি তৈরি করতে করতে শুনেছিল। এ তো বোঝাই যাচ্ছে চাউটিয়া সুযোগ পেলেই সেই খয়রা রঙের পিঠ উঁচু বুনোটার কথা বলে। তা, সে সাহেব শুনে বলেছিল 'ওটা বাইসনই ছিল। এদিকের জঙ্গলে বাইসন থাকা অসম্ভব নয়। কোচবিহার রাজবাড়ির বাইরের করিডরে সারি সারি বাইসনের মাথা সাজানো। কোন্ জঙ্গলে কোন্ তারিখে মারা রুপোর ফলকে তাও লেখা আছে। আর ১৯৫০-৫২-তে কোচবিহার শহরেই এক বাইসন এসেছিল। আর রাজাবাশাই তাকে গুলি করে মেরেছিল।' কিছুক্ষণ পরে সাহেব চাউটিয়ার মন রাখতে বলেছিল, 'তো, বুনো মোষও হতে পারে। মানুষে মানুষে চেহারার পার্থক্য থাকে। যেমন দেখো আসফাককে, ওর গায়ের রং মুখের চেহারা এখানকার অন্য

সকলের থেকে আলাদা। জন্মের সময় ধাক্কাধুক্কি লেগে হয়তো মোষটার কাঁধের হাড় উঁচু হয়ে গিয়ে থাকবে।'

আসফাক ভাবল: 'ফান্দি কিন্তুক সে ভইষাক বান্ধির পায় না।'

চাউটিয়া হয়তো ফান্দি হিসাবে তার বাপের মতো ওস্তাদ নয়, তাহলেও এ-অঞ্চলে চাউটিয়াই একমাত্র ফান্দি। সেও ব্যর্থ হয়েছে সেই মোষকে ধরতে। আসফাক দেখল তার সামনে একটা ঘাস বন। বনটা নতুন হয়েছে। কুশের জাত। এক কোমর উঁচু হবে। সেই ঘাসের গোড়ায় এক রকমের লতা। তাতে নাকছাবির মতো ছোট ছোট নীল ফুল। আসফাকের মনে পড়ল এই ঘাস মোষেরা খুব পছন্দ করে। গরু খায় বটে, তা উপরের নরম নরম অংশ। মোষ শক্ত গোড়া পর্যন্ত ছাড়ে না। ঘাস বনটাকে ঘুরে যেতে হবে। আসফাক বাঁয়ের দিকে সরলো। খুব বড় নয় এই নতুন গজিয়ে ওঠা বনটা; এখনও সব ঘাসই কচি। মোষের দল এখানে এলে নড়তে চাইত না।

কিছুদূর গিয়ে আসফাকের মনে হলো সে যেন একটা মাদী মোষের পিঠে শুয়ে আছে আর মোষটা ঘাস খেতে খেতে হাঁটছে। তা মাদী মোষের পিঠে শুতে প্রথম ভয় করেই। পরে অভ্যাস হয়ে যায় আর তখন মোষের গলার দু দিকে পা নামিয়ে তার পিঠে বরাবর শুয়ে পড়লেই হলো। কখনও গান গাওয়া যায়, কখনও ঘুমের ভাব আসে।

আর এ ঘাসও খুব মিষ্টি। লটা বলে। গোড়ার কাছে একরকম মিষ্টি রস থাকে। মানুষই ভালোবাসে, মোষের তো কথাই নেই। একছড়া ঘাস উপড়ে নিল আসফাক। অন্যমনস্কের মতো গোড়াটাকে মুখে দিল। চুষে মিষ্টি বোধ হওয়াতেই যেন খুঁত খুঁত করে হাসল।

'আরউ, এ দেখৎ ভইষার গোবর।'

ঘাসবনের ধারে মোষের শুকনো গোবর দেখে আসফাক হতবাক্। সে চারিদিকে তাকাল। এদিকে তা হলে মোষ আসে। বুনো মোষ নাকি? কয়েকপা গিয়ে সে আবার দাঁড়াল। তার গা ছম্ ছম করে উঠল। আবার সে চলতে লাগল। এখানে কি কোন বাথান থেকে মোষ আসে? আবার সে খুঁত খুঁত করে হাসল। পরমুহূর্তেই তার গা ছম্ ছম্ করে উঠল। এ তো সত্য কথাই যে সে তার পরিচিত ঝোপঝাড় একটাও দেখতে পাচ্ছে না। সে অবাক হয়ে থেমে দাঁড়াল। তাই তো, সে কোথায় এসেছে? নিজের হাতে ঘাসের ছড়া চোখে পড়ল। সে আর একটা ঘাস মুখে পুরে

চিবোতে চিবোতে আবার হাঁটা শুরু করে। তা হলে ওটা কি বুনো মোষের চিহ্ন।

অজান্ত একটা ভয়ে শিউরে উঠল সে, আর তার ফলেই যেন ছলাৎ ছলাৎ করে খানিকটা কালো কালো সাহস তার বুকের মধ্যে পড়ে গরম করে তুলল সেই জায়গাটাকে।

ঘাসবনটাকে ঘুরলে চলবে কেন? কতদূরে শেষ কে বলবে? এর মধ্যে দিয়েই পথ করে নিতে হবে। সে ঘাসবনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সর সর করে ঘাসের ঢেউ তুলে তুলে সে চলতে লাগল। ঘাসবনের মধ্যে কাঁটা গাছ থাকে, মরা মরা ঝোপ ঝাড়ের শুকনো ডালপালাও কাঁটার মতো হয়। একটায় লেগে তার পিরহান বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয়বার পিরহানে টান পড়তেই সে সেটাকে গা থেকে খুলে ফেলে দিল। খুঁত খুঁত করে কাসল সে। তার শেষবারের মতো মনে হল এ পথে কি শহরে যাওয়া যায়? সে কি পথ হারিয়ে ফেলেছে? এখন সে যতই হাঁটবে ততই বনের গভীরে ঢুকবে? সে আবার থমকে দাঁড়াল। দেখলে ঘাসবনের উপরে উপরে এখন গাছের মাথাগুলো এক হয়ে হয়ে ক্রমশ ঘন ছায়া করছে। সে দেখল তার নিজের গায়ে গাছের পাতার ছায়া। এদিকে মোষ থাকতেই পারে, কারণ পায়ের তলায় মাটি ঠাণ্ডা, যেন জল জল ভাব আছে। সে হঠাৎ মাথা তুলে ডাকল 'অঁা-অঁা-ড'। যেন সে তার মোষদের ডাকছে।

সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। আর সেই অবস্থায় গাছের পাতার ছায়া যেমন তার গায়ের উপরে ছায়ার ছবি অাঁকছিল তার মনের মধ্যেও ভয় আর সাহস, আনন্দ আর উত্তেজনা নানা রেখা এঁকে নাচতে থাকল। সে এবার আরও জোরে আরও টেনে 'অঁা-অঁা-অঁা-ড়' শব্দ করে উঠল। কান পেতে শুনল প্রতিধ্বনি যেন একটা উঠছে। আর সেই মুহুর্তে সে অনুভব করল সে মোষ হয়ে গিয়েছে। একটা বুনো মোষ সে নিজেই, এই ভেবে তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠল। সে প্রাণভরে ডেকে উঠল 'অঁা-অঁা-ড়'।

জাফরুল্লা ব্যাপারির খামারে এখন সকাল হচ্ছে। তার উঁচু ঘারিঘরের খড়ের ছাদের ওদিকে যদি আকাশে এখনও কোন রং থাকে তবে এদিক থেকে তা দেখা যাচ্ছে না। এ দিকে বড় জোর একফালি ধারে ময়চেধরা কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে।

ঘারিঘরটা ক্রমশ দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। খড়ের চালই, এখন যেন তা

আগের চাইতে পুরু। আগে খারার বেড়া ছিল, এখন কাঠের মসৃণ দেয়াল। যার বাইরেটা সবুজ আর ভিতরটা উজ্জ্বল শাদা রং করা। শুধু তাই নয় এখন ওটা যেন একটা পৃথক বাড়ি হয়ে উঠেছে। আগেকার চাইতে লম্বা হয়েছে ছাদ। আর তার নিচে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। ঘরের সামনে টানা বারান্দা। মেঝেও কাঠের। মোটা মোটা শাল কাঠের গুঁড়ি, তার উপরে কাঠের মেঝে।

এ রকম না করেই বা কি উপায়। এ অঞ্চলে শহরের সাহেবরা এলে এই ঘরের টানেই তো মহিষকুড়ায় আসে। থাকেও দু-একদিন করে। আগেও আসত, এখন বেড়েছে। এমন হয় যে মনে হবে, যেন শহরের কোর্ট বসে। এটাই চাউটিয়ার মত। চাউটিয়া, যে নাকি দু-একবার শহরের কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। আর ফূর্তিও হয়। ফূর্তি তখনই বেশি হয় যখন কোন সাহেব থাকতে থাকতে জাফরুল্লার কোন শালা-সম্বন্ধী আসে। বিশেষ করে মেজ বিবির দরুন শালা। তার নিজেরই করাত কল একটা আছে। সেই সেবার সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে হরিণের মাংস খাইয়েছিল। যাই বলো ওটা কিন্তু বে-আইনী, ওই হরিণ মারা। জাফরুল্লার শালা ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে ধান খেতের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মেরেছিল হরিণ। আসফাক জেনেছিল পরে সত্তারের কাছে। ছাল ছাড়িয়ে কাটাকুটি করে সেই মাংস খারিঘরের রসুইখানায় কখন পৌঁছেছিল তাও আসফাক জানত না এমন কি ছমিরও না। পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেট যখন তার জীপে উঠছে তখন এক টিন মাংস উঠতে দেখে আসফাক অবাক হয়েছিল। সে মাংস সেদিন জাফরুল্লার বাড়িতেও রান্না হয়েছিল। আসফাক খেয়ে থাকবে নিশ্চয় কিন্তু মনে রাখবার মতো কোনো সোয়াদ পায় নি।

সবই তো চোখের উপরে ঘটে কিন্তু কোন কোনটা এমন করে ঘটে যে মনে থেকে যায়। খাসী বল, বকরি পাঁঠা বল—সেসব জবেহ করার ভার ছমিরের। মাস ছয়েক আগে শহর থেকে আট-দশ জনের এক দল এসেছিল। তারা এদিককার গ্রামগুলোতে মিটিন করে বেড়াচ্ছিল। লাঠির ডগায়, দুই লাঠির মধ্যে লাল ফালি কাপড়, এসব নিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরল এ-বেলা ও-বেলা। কি কাণ্ড ছমির, সত্তার, নসির, আসফাক, চাউটিয়া মোটকথা জাফরুল্লার যত লোক, গ্রামের অন্য পাঁচজনও জানতে পারল নাকি আইন হয়েছে প্রতিদিনের কাজের জন্য সাড়ে আটটাকা করে পাওয়া যাবে। গ্রামের যত জমি দেখ পরিবারের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। তার চাইতেও মজার কথা গিরি-গৃহস্থ

আর আধিয়ার এরা নাকি দুই জাত। তাদের মধ্যে গিরিরাই আধিয়ারদের সঙ্গে শত্রুতা করে। আর যারা এসেছিল সকলেই নাকি এক জাত—আধিয়ারদের দলের তারা। অথচ চাউটিয়া বলেছিল সেই দলে জাফরুল্লার বড়বিবির ভাতিজা খলিল ছাড়া আর কেউ মুসলমান ছিল না। অন্যদিকে আধিয়ারদের মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে, গিরিদের মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। হিন্দু আর মুসলমানে মারামারি এদিকে এই জঙ্গলের রাজ্যে এমনকি এদিকের এই শহরেও কোনদিন হয় না। কিন্তু কোন হিন্দু বা কোন মুসলমান আছে যে দূর দূর শহরের সেইসব মারা-মারির গল্প না শুনেছে? আর জাফরুল্লার ছোটবিবির ঘরেও 'এডিও' যাতে গান হয় খবর বাঁটে। শহরের সেই দলবেঁধে আসা ছোকরা বাবুদের একজনকে আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল ভয়ে ভয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, এদিকে আধিয়ার আর গিরিদের দলে মারামারি হতে পারে কিনা। কলেজে পড়া সেই ছোকরা বাবু আসফাককে বুঝিয়েছিল সেটাই শেষ জিহাদ।

কিন্তু আসল কথা, সেই সেবার যে মাংস কাটা হয়েছিল ছারিঘরের কাছে। জাফরুল্লার গোরুর দলে দু-একটা করে সবসময়েই থাকে। এ ষাঁড়টার মাত্র মাস তিনেক হয় মাথার লোমা ছাড়িয়ে শিং-এর যোচা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে, ঘটনার দিন তিন-চার-এক আগে, এক গাভীর দরুন পাকা ষাঁড়টার সঙ্গে গুতোগুঁতি করেছে। ইতিমধ্যে দেড়-হাত পৌনে দু-হাত হয়েছে খাড়াই-এ। আসফাক দেখল গোরুর দলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ছমির কিছু করছে। তারপর দেখলে একটা গাভীকে তাড়িয়ে আনছে সে ছারিঘরের দিকে, আর তার পিছন পিছন সেই নতুন হরিণের রঙের ষাড়টা ছুটে আসছে। ছারিঘরের কাছাকাছি আসতে ছমির তার নিজের পিঠের দিকে কোমরে গোঁজা রশিটা হঠাৎ পরিয়ে দিল ষাঁড়টার গলায়। এখন, এই গোরুর দলে গলায় দড়ি পরান তেমন হয় না। রাতে তারা খোয়াড়ে থাকে, সকালে খোয়াড় খুলে ছাড়া হয়। দুধ দোয়ানর সময়ে গাভীদের বাঁধা হয়। তামাকের খেতের লাঙলে বলদ জোড়া হয়, তখন তাদের গলায় দড়ি ওঠে। কিন্তু এঁড়ে, ষাঁড়, বকন এরা দড়ি চেনে না। কাজেই দড়ির বাঁধনে পড়তেই, বিশেষ সেই সুযোগে গাভীটা সরে যেতেই, ষাঁড়টা পাগলের মতো লাফাতে শুরু করল। একবার তো ফেলেই দিল ছমিরকে হেঁচকা টানে। উঠে ছমির এদিক-ওদিক চাইল, ততক্ষণে ছারিঘরের বারান্দা ভরে গেছে, যেন তারা এক খেলা দেখতে উৎসাহিত, সেই

বাবুরা। তা বনের ছায়ায় ষাঁড়টাকে মদ্দা হরিণও ভাবা যায়। ছমির দেখলে গাভীটা ফারিষয়ের কাছে গাব গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছে ষাঁড়টাকে পিছনে নিয়ে আর একবার ছুটবার আগে। ছমির বুদ্ধি খুঁজে পেল যেন। হাতের দড়িতে ঢিল দিতেই ষাঁড়টা গাব গাছের দিকে ছুটল। এখানেই ছমিরের ওস্তাদি, ষাঁড়টা ছুটল গাছটার ডানদিকে ছমির দৌড়াল বাঁদিকে। দড়িটা ছিঁড়ল না, ষাঁড়টা গলার দড়ির টানে বে-দম হয়ে জিভ বার করে থেমে গেল। এই খেলার এই যেন নিয়ম। ছমির দড়ি হাতে দৌড়ে গাছটাকে ঘুরে এল। ততক্ষণে গাভীটা পালিয়েছে, ষাঁড়টা গাছের গায়ে গলার দড়িতে বাঁধা পড়েছে। এইবার ছমির আরও ওস্তাদি দেখাল। ষাঁড়টা বুঝতে না বুঝতে তার হাতের দড়িটাতে ষাঁড়টার পিছনের পা দুটোকে পাকিয়ে নিয়ে গাছটার গোড়ায় টেনে বেঁধে দিল। আসফাক ভেবেছিল এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে, এটা ছমিরের সেই কাজই, ষাঁড়টাকে খাসী করবে। এখন সময় নয়। ওটা শীতকালেই হয়। একটু অবাক লাগল আসফাকের। তারপরে সে স্থির করল, শহরের বাবুরা দেখতে চেয়েছে হয়তো। এটা খুব মজার ব্যাপারের মতো এখানকার লোকদেরও টানে। আর এটা হয়তো ছমিরের নতুন কায়দা। এ-কাজে অন্য সময়ে পায়ে দড়ি বেঁধে সে-পা বাঁশ দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে রাখার জন্য আরও দু-একজন লোক লাগে। এবার ছমির একাই কেরদানি দেখাবে।

আসফাক তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এটা তার একটা দুর্বলতা। কিছুদিন থেকে এসময়ে সে পালায়। অন্য কাজের ছুতো থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও যতদূর সেই গরু-মোষের চিৎকার শোনা যাবে তার বাইরে কোথাও গিয়ে বসে থাকে। কেমন যেন ভয় করে তার। তিন মাস আগে, সেই যে জাফর যখন তিন মাস খামারে ছিল না তখন এক দুপুরে এক স্বপ্ন দেখেছিল আসফাক। যেন সে নিজেই একটা এঁড়ে মোষ। ছমির তার হাত-পা বেঁধেছে, বাঁশ দিয়ে ভুঁইয়ে চেপে ধরেছে আর তার সেই বিশেষ ছুরি নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে তার ঘুম ভেঙেছিল। সেই থেকে দুপুরে সে ঘুমোয় না, জাফর বাড়িতে না থাকলেও। সেদিনও তাই সে করেছিল। জাফরুল্লার বাড়ির পিছন দিকে যে দহ, তার পারে সেই ফুলগাছের নিচে সে ঘন্টাখানেক পালিয়েছিল। কিন্তু এদিকেও তো তার কাজ। বাবুদের

মধ্যে যারা দহে নেমে স্নান করবে না তাদের জন্য জল যোগাতে হবে বাঁকে করে জল বয়ে।

প্রথম বাঁক জল নিয়ে এসে—একেবারে অবাক হয়েছিল সে। গাব গাছের একটা মোটা নিচু ডাল ছিল। তা থেকে একটা হরিণ যেন ঝুলছে। পিছনের পা দুটো ডালের গায়ে, মাথাটা মাটির কাছে। কাছে এসে বুঝেছিল সে এটা সেই ষাঁড়টাই। চামড়া ছুলছে ছমির।

বাবুরা চলে গেলে আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন ছমিরকে. 'অমন করি জবেই করলু আড়িয়াটাক।'

অন্য কাজে ব্যস্ত ছমির বললে, 'করলং তো।'

কেমন যেন একটা সহানুভূতির মতো কিছু অনুভব করছিল আসফাক ষাঁড়টার জন্য। সে আবার বলল, 'কি ফায়দা? কাঁয় খায়?'

'কেনে, ওই না ছোটবাবুর ঘর।'

সহানুভূতি জাতীয় মনোভাব মানুষকে নানা কথা অহেতুক বলায়। আসফাক আবার বলল, 'উমরা না সগায় হিন্দু।'

ছমির যা বললে তার সারমর্ম এই : ওরা সকলেই হিন্দু। কিন্তু চারটে ঠ্যাংই ওদের ভোগে লেগেছে। মুসলমানরাই রান্না করেছে ; ওরা তাদের সঙ্গে বসেই খেয়েছে।

অবশ্য আসফাক এই আধুনিকতার হেতু খুঁজে পায় নি, এমন কি একে আধুনিকতা বলেও বুঝতে পারে নি। জাত, ধর্ম কিছু নয় তা ওরা বোঝান।

এটা ছমিরের বৈশিষ্ট্য. ধান চাল ছিটিয়ে মুরগি ধরা আর গাভীর ফাঁদে এঁড়ে ধরা জবেহর জন্য।

আসফাক উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলদগুলোর পিঠের উপর দিয়ে দিনের আলোর খোঁজ করছিল। আলো দেখতেই সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল যেন ঘুম থেকে। তার এই কেরদানি ব্যর্থ হল, কারণ কেউ দেখল না। ছমির পর্যন্ত ধারে কাছে ছিল না। আসলে সে আদৌ ঘুমায় নি, বরং তার রাত্রির আশ্রয় এই বলদদের ঘরে সে ভোর-ভোর সময়ে এসে ঢুকেছে।

এই বড চালা ঘরটায় জাফরুল্লার ছ' জোড়া বাছাই করা বলদ থাকছে। আর-এক পাশে এক মাচায় আসফাক। তাকে উঠতে দেখে বলদগুলো উঠে দাঁড়াল, গরু-মোষ দুই-ই। রাত্রির জড়তা কাটিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করল। বাষ্পে ঘরটা ভরে গেল। আর তার মধ্যে দিয়ে মুখ বার করল

আসফাক। বছর চাব্বিশ-সাতাশ বয়স হবে। রোগা লম্বাটে হলুদ হলুদ চেহারা। চোখ দুটো টেরচা, উপরের পাতা দুটো বড় বলে মনে হয়। চিবুকে গোটা দশ-পনর চুল তার দাড়ির কাজ করছে।

সে যেন অবাক হয়েই চারিদিকে চাইতে লাগল। দ্বারিঘরের একটা জানলা খোলা। তার সামনে ধান-মাড়াই-এর ঘাস চাঁছা মাটি। তার বাঁদিকে ধানের দুটো মরাই, আর ডানদিকে বলদদের ঘর, যে ঘরে আসফাক শোয়। ধানের মরাই-এর পিছনে খড়ের মঠ আকাশের গায়ে ঠেকেছে। মঠের মাথায় শিমুলগাছের ডাগর ডালপালা। তার উপরে একটা পাখি বসে আছে ভোরের আকাশের মধ্যে। অত উঁচুতে পাখিটাকে ছোট দেখাচ্ছে। দ্বারিঘরের বিপরীত দিকে ধান মাড়াই আখড়ার অন্যপারে টিনের দেয়ালের টিনের ছাদের সেই ঘর যার একপাশে তামাকের গুদাম, অন্যদিকে প্রকাণ্ড সেই সিন্দুক-খাট যার উপরে দুপুরে ঘুমায় জাফরুল্লা। বিস্মিতের মতো এই সব দেখতে লাগল আসফাক। অথচ এমন পরিচিতই বা কি? সাত বছর হল দশ হতে তিন বাদ।

এমন সময়ে খুক করে কাশল যেন কেউ। আসফাক চমকে উঠে কাছিম যেমন খোলায় গলা ঢুকিয়ে নেয় তেমন করে সরে গেল দরজা থেকে। জাফরুল্লার টিনের দেয়ালের দিনমানের শোয়া-বসার ঘরের দিকে চাইল সে। না, সেদিকে কোনো জানলা খোলা হয় নি।

বরং ছমিরই আসছে খাবার

তখন সে বুঝতে পারল সারারাত ঘুমিয়ে এত মাত্র ওঠার যে অভিনয় করছিল সে নিজের কাছেই, দর্শক তো ছিলই না, তার কোন মানে হয় না। ছমির তো তাকে ফিরে আসতেই দেখেছে। সে যতই চেষ্টা করুক ছমিরের নিশ্চয়ই মনে থাকবে আসফাক সন্ধ্যায় না ফিরে রাত শেষ করে ফিরেছে।

ভোর-ভোর রাতের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল। দ্বারিঘর পর্যন্ত এসে সে তখন থমকে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে সে কোন সাহসে এগিয়েছে তা যেন খুঁজেই পেল না। অন্ধকারের আড়াল ছিল বলেই বোধহয় সাহস।

এগোবে, না পিছবে—ভাবছে সে, এমন সময়ে কে একজন অন্দরের দিক থেকে বেরিয়ে এল—হাতে পাটকাঠির মশাল।

আসফাক যেন আলোর অনিবার্য টানে এগিয়ে গিয়েছিল।

‘কে? কাঁয়?’

‘আসফাক।’

'আসফাক !'

'জে।'

'জে না। আমি ছমির। আইসলা?'

একটা অবসন্নতায় আসফাকের শরীর ঝিম্ ঝিম করে উঠেছিল। টলতে টলতে সে বলদদের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

এখন ছমির ছারিঘরের বারান্দায় উঠে তামাক সাজতে বসল। কি করবে এখন আসফাক। দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রোজ যেমন বলদগুলোকে খুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাই করবে?

এতে আর সন্দেহ নেই এবারেও ব্যাপারটা বোকামিই হয়ে গিয়েছে। অথচ তখন সেটাকেই একমাত্র ঠিক ঠিক বলে মনে হয়েছিল।

আর এ সবের জন্য সেই হাকিমবাবুই দায়ী। সরকারি কর্মচারী। রাজ বদলেছে। গল্পে শোনা সেই রাণীর আমল তো ফিরবে না। তাই বলে সরকারি কর্মচারী তো সব বদলায় না। বিশেষ করে যার হাকিমের মতো পোশাক।

সেই হাকিমই দায়ী কিন্তু, এই স্থির করল আসফাক। জাফরুল্লার ছারিঘরে সে বসেছিল তার দপ্তর বিছিয়ে। গ্রামের অনেক লোকই যাওয়া-আসা করছিল। তাদের অনেক অভিযোগ কর্মচারীটি শুনছিল। কোন কোন সময়ে সে কাগজেও কিছু লিখে নিচ্ছিল। আর এসবই শুনতে পেয়েছিল আসফাক ছারিঘরের বারান্দার নিচে বসে পাঠ থেকে সুতলি তৈরি করতে করতে। অবশেষে জাফরুল্লা খেতে গেল। তার অন্য চাকররাও তার পরে। চারিদিকে আর কেউ নেই। এখন এদিক ওদিক চেয়ে আসফাক হাকিমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হাকিম বলল, 'কি চাও?'

'জে।' আসফাক ঘরের আসবাব পর্যবেক্ষণ করল যেন।

'কি দরকার তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

'জে।' আসফাক ঘরের ছাদ পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

হাকিম চেয়ার থেকে উঠল। তখন তার বিশ্রামের সময়। সেই ঘরেই তার বিছানা পাতা। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদিকের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে ব্যাপারির মতো ধনী কেউ নেই। টিনের ছাদ, কাঠের দেয়াল এমন ছারিঘরই বা কার?

হাকিম সোজা পিঠের চেয়ার থেকে উঠে ঢালু পিঠের এক চেয়ারে শুয়ে

সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল। যেন ঘরে আর কেউ নেই। তারপর পাশ ফিরে আসফাককে দেখতে পেল।

'কি যাও নি? এখানেই চাকরি কর?'

'জে'।

'কত টাকা পাও? খেতে-পরতে দেয়? বলি মাইনা-টাইনা পাচ্ছ তো?'

'না'।

'না'?

'না'।

হাকিম অবাক হল। 'কতদিন পাও না?'

'ছ-সাত মাস'।

হাকিম হো হো করে হেসে উঠল। এই অদ্ভুত কথা শুনে আর আসফাককে দেখে তার খুব মজা লেগেছে সন্দেহ নেই। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কার চাকরি'? 'জাফর ব্যাপারীর'। 'জাফর কি খুব ধনী? তার কি অনেক জমি।'

জে, জি বলতে বলতে আসফাকের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে। নিজের বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্যও কম হয় নি। সে ভেবে উঠতেই পারল না এমন একটা নালিশ সে কি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে করতে পারল। কারণ হাকিমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার নালিশের কতটুকু উচ্চারণ করেছিল আর কতটুকু চিন্তা করেছিল সে হিসাব রাখার পক্ষে অনেক উত্তেজিত ছিল তার মন। বরং যা উচ্চারণ করে নি সে কথাগুলোই স্পষ্ট করে বলেছে এমন অনুভব করছিল সে নতুবা মাইনা কত, মাইনা সে পায় কি না, এসব কিছুই নয়। নালিশ হল অবাক্ত মনের কথা, অনেক কথা। প্রথমে সে দশ বিঘা জমি পেয়েছিল চাষ করতে। কিন্তু সে জমিতে ধান ফলান কি সহজ কথা, জংলা ভাঙা জমি। জাফরুল্লাকে ধানের ভাগ দিলে যা থাকবে তাতে ছ মাস চলা সম্ভব। জমির বিরুদ্ধেও তার নালিশ ছিল। জাফরুল্লা বরং তার খাওয়া পরার ভার নিল। জমি এখনও তার নামে আছে। এখনও ধান হয়। খাওয়া পরার উপরে যে মাইনার কথা, মাইনার পরিমাণ এসবই তো আসফাকের নিজেরই প্রস্তাব। হাকিমকে এসব কথাও কি সে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে নি!

হাকিমের সম্মুখ থেকে চলে আসতে আসতে আসফাক নিজেকে অদ্ভুত রকমে ভারমুক্ত মনে করেছিল। এসব নালিশ শুনলে গ্রামের লোকেরা ঠাট্টা

করতে পারে। গত সাত বছরে সে কি একবারও নালিশ করেছে? হাকিমও হেসেছে বলা যায়। তা হলেও—

কি অদ্ভুত কাণ্ড। দুপুরে আসফাক সেদিন খেতেই পারল না। তারও আগে ঝোরায় স্নান করতে গিয়ে উত্তেজনায় যেন তার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। স্নান করে ভিজে গায়েই খানিকটা সময় সে দুপুর রোদে ঝোরার পার ধরে ধরে হেঁটেছিল। তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছিল তখন। হাকিমকে কিনা সব বলে দিয়েছে সে।

কিন্তু হঠাৎ তার গা ছম ছম করে উঠেছিল হাকিম সাহেব কি ব্যাপারিকে সব বলে দেবে? এতক্ষণ বলেও দিয়েছে হয়তো। তা হলে? আসফাক যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গি নিয়ে নালিশ করার আগে যেমন পাঠের সুতলি নিয়ে বসেছিল তেমন করে আবার বসল।

আর তখনই মুন্নাফ এসে বলেছিল তার আব্বাজানের জন্য ওষুধ আনতে হবে শহর থেকে।

ব্যাপারির বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়েছিল আসফাক। ওষুধ, যা কিনা মানুষের চূড়ান্ত বিপদের সময়ে দরকার হয়। ব্যাপারির বয়স হয়েছে, তিন কুড়ির কম নয়। আজকাল কঠিন কঠিন অসুখ হয়। কয়েকমাস আগেই শহর থেকে ডাক্তার এসেছিল। যাওয়া আসার জীপ ভাড়া ছাড়াও দু' দিনে পাঁচ শ টাকা নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার তা এমনটাই মানায় জাফরকে। এখনও আড়া'শ বিঘা জমি তার—যার চার পাঁচ শ বিঘাই একলপ্তে বিজাড় ফরেস্টের ধার ঘেঁষে

আসফাক তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করেছিল বনের মধ্য সড়কের অর্ধেক। সময়ও লাগে আধাআধি। অভ্যাস মতো কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন চলে গিয়েছিল বনের মধ্য দিয়ে চলেছিল সে হঠাৎ একটা অস্বস্তির মতো কিছু মনে দেখা দিল কিছু ভুলে গেলে যেমন হয়। তারপর সেই অস্বস্তিটাই যেন উগ্র হয়ে উঠল। তখন তার মনে পড়েছিল হাকিমঘটিত ব্যাপারটা। যা সে করে ফেলেছে তার তুলনা তার নিজের জীবনে নেই। কিন্তু ঠিক সে কথাই নয়। অন্য আরও কিছু, যা আরও উগ্র। এই চিন্তাগুলো যেন তার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছিল। তারপর কি হলো কে জানে।

যখন সে আবার পাকা রাস্তায় উঠেছিল, কিংবা বনের শেষে এমন এক নীচের রাস্তায় এসে পড়েছিল যার ওপারেও বন তখন যেন সম্বিত পেয়ে নীচের

রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করেছিল ওপারের বনে না নেমে। তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। তারপর সন্ধ্যার পরে সে শহরের হাটখোলায় পৌঁছেছিল যেখানে ওষুধের দোকান।

তারপর ওষুধ নিয়েছিল সে। কিন্তু সোজাসুজি বনের পথ না ধরে সে পাকা পথ ধরেছিল মহিষকুড়ার। সে নিজের কাছে যুক্তি দিয়েছিল—পথ তো পাকাই হওয়া উচিত, বনের পথ তো গ্রামের লোকের মনগড়া কিছু। সে পথে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই সেবার যে ডাক্তার এসেছিল, সেও এই পাকা সড়ক ধরে।

কিন্তু এই জায়গাটায় একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। বনের মধ্যে ও ব্যাপারটা কেমন হয়েছিল? অদ্ভুত বললে কিছু বলা হয় না। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? তার সারা শরীর ছমছম করে উঠল—ঘুম যদি হয় তবে তার গায়ের নিশান কোথায়? পাকা পথ হলেও তো অন্ধকার, আর দুপাশেই নিশ্ছিদ্র বন এখন। তখন আসফাক স্থির করেছিল সাহস করে চলতে হবে। ভয় পেলেই খারাপ

এর এখন এই দিনের বেলায় একটা ব্যাপারই পরিষ্কার, আসফাক দেরি করে ফেলেছে। কাল সন্ধ্যার মধ্যে যার ফেরার কথা ছিল সে ওষুধ নিয়ে [illegible]। কাজেই তার নিয়ে এমন দেরি সে করতে পারে—এ[illegible] সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় না। [illegible] আসতে হয়েছে তবে সেসময়ে [illegible] কি দরকার ছিল?

[illegible] মূল।

সেই সেবারের কথা [illegible] ব্যাপারটা ঘটবে আগেই জানা ছিল। অনেকেই বলেছিল তাকে। সংসারে থাকার মধ্যে ছিল তার বাপ। মা'র বয়স অনেক হয়েছিল। চলগুলো শনের নুড়ি, চোখেও ঝাপসা দেখত। কাজেই তার মৃত্যু ধরে নেবার মতো ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু তার বাপ তুলনায় যোয়ানই ছিল বলতে হয়। অথচ মায়ের মৃত্যুর মাস কয়েকের মধ্যে তারও মৃত্যু হল। তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল অঘটন কিছু ঘটবেই। বাড়ি বলতে একখানা খড়-পচা পুরনো চৌরী ঘর, যার বারান্দায় রান্না হতো। অন্য একটা ঘর ছিল যার বেড়া ছিল ফাটান বাঁশের, আর ছাদ ছিল খড়ের। এই ঘরে থাকত একটা নড়বড়ে মই, আর মরচে ধরা একটা লাঙল। কিছু দড়িদড়া থাকত। অন্যদিকে থাকত একটা বুড়ো বলদ

যার কাঁধে একটা পাকাপোক্ত রকমের ঘা ছিল। ছ-বিঘা জমি চষত আসফাকের বাপ। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পরই আসফাক শুনতে পাচ্ছিল এবার নতুন আধিয়ার আসবে। এই ছ-বিঘা জমিতে সে সোনা ফলাবে। ও আর আসফাকের কর্ম নয়। কি বলিস আসফাক! দশজনের মুখে শুনে সে বলতো—'হুঁ'। কাজেই খড়ের সেই চৌরীখানা যে ছাড়তে হবে এ বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ হল। কিন্তু এত জেনেও কি হল? সেই একদিন সকালে সেই নতুন চাষী যখন বাড়ি দখল নিতে এল তখন কার কাছ থেকে দখল নেবে তা খুঁজে পেল না। কারণ গোয়ালঘরের চালার নিচে পাট, তামাক রাখার জন্য আসফাকের বাবা যে বাঁশের টোং মাচা বেঁধেছিল সেখানে লুকিয়ে আসফাক তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কে যেন বলছে দূরে যাও, আড়ালে যাও, এখানে কিছু নেই। চোখ বন্ধ করে সে সেখানে পড়েছিল একটা দিন একটা রাত্রি। অথচ কি ছিল ভয়ের? নতুন বর্গাদার তো আদালতের পেয়াদা নয়, পুলিশও নয়।

আসফাক এখন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। নিজের বুকের দিকে চোখ নামাল সে। কেমন যেন গরম লাগছে সেখানে। হাত দিয়ে মুছে দিল একবার। পরে সে বুঝতে পারে, কিন্তু যখন বোঝা দরকার তখন যেন সব গুলিয়ে যায়।

এখন ছমিরের মনোভাবটা বোঝা দরকার। তার দেরি করার ফলে তো কিছু ঘটবেই। এসব ব্যাপারে চুপচাপ মেনে নেবার লোক নয় জাফরুল্লা। তার দেরি দেখে নিশ্চয়ই জাফরুল্লা সন্ধ্যায়, রাত্রিতে খোঁজ খবর নিয়েছে। ছমির, নসির, সত্তার—এদের সঙ্গে আলাপও করেছে। ছমিরের কাছে সুতরাং বোঝা যাবে।

সে ছমিরের দিকে এগোচ্ছিল, পিছিয়ে আসতে হল তাকে। জাফরুল্লার শোবার ঘরের এদিকের জানলাটা খুলছে। ওই জানালায় এখনই জাফরুল্লার মুখটা দেখা যাবে আর বাজ-ঠাটার মতো গর্জন শোনা যাবে: আসফাক, এই বেইমান।

জানালাটা খুললো কিন্তু কিছুই ঘটল না। এমন বিস্ময় কেউ কল্পনাও করতে পারবে না—এই কিছু না ঘটা। এতক্ষণে যেন বেলাটাও নজরে পড়ল। তা এতক্ষণে জাফরুল্লার ছিলিম তামাক পুড়ে যায়। আসফাককেই তা দিতে হয়। সে না থাকলে ছমির দেবে। কিন্তু দেখ ছিলিম সরিয়ে

নিজেই মজা করে টানছে ছমির। তাও এমন জায়গায় বসে যে জাফরুল্লার জানলা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কথা।

তা হলে? তা হলে কি ব্যারামের মুখে ওষুধ না-পেয়ে জাফরুল্লা— বাকাটাকে চিন্তাতেও শেষ করতে পারল না সে। স্তম্ভিত আসফাক তার চিবুকের যেখানে সেই ছ-সাতটা লোমা দাড়ির কাজ করে সেখানে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তার দেরি করার এই ফল দেখে। সে জাফরুল্লার ঘরের খোলা নিঃশব্দ জানালাটার দিক চাইল আর তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ছমির কলকেটা শেষ করে মাটিতে উপুড় করল। দু-হাত জড়ো করে মট্‌মট্‌ করে আঙুল ফোটাল। আবার নতুন করে ছিলিম ধরাল। এইবার আসফাক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ছমিরের দিকে।

মৃদুস্বরে সে বলল, 'তা, ছমির, ব্যাপারি—?

ধোঁযায় মুখ বন্ধ ছমিরের। আরও দু-টান দিয়ে ছিলিমটা সে আসফাককে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ব্যাপারী শহরে'। ছমির চলেও গেল।

আসফাক বসে পড়ল। অবসন্নতায় তার শরীর যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রাত্রিতে ঘুম হয় নি। কাল দুপুর থেকে খাওয়া হয় নি। বনের সেই ব্যাপার, পথের সেই ধকল; আর ভয়, যা এই মাত্র একটা চূড়ান্ত ধাক্কা দিল তাকে।

কিন্তু এটার একটা ভালো দিকও আছে। খানিকটা সময় তো পাওয়া গেল। বসে থাকতে থাকতে এই বুদ্ধি এল আসফাকের মাথায়। বুদ্ধিটাকে আর একটু পাকা করে নেযার জন্য নতুন করে ছিলিম ধরিয়ে নিল সে। অবশেষে স্থির করল, ছমির বা অন্য কোন চাকর হয়তো এখনও ব্যাপারটা সবটুকু বোঝে নি। সময় মতো ফিরে, তা রাত হয়েছিল ফিরতে বনে পথ হারিয়ে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—এটাকে কৈফিয়ৎ হিসাবে দাঁড় করান যায় কিনা দেখতে হবে। দেরি করে নি সে ইচ্ছা করে।

রোজকার মতো কাজ শুরু করল সে। সেটাই কৌশল হিসাবে ভালো হবে। বলদগুলোকে ছেড়ে দিল। অন্যান্য দিনের মতো হেইহাই করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। না তাড়ালে খড়ের মঠে মুখ দিয়ে পড়বে।

খামার থেকে কিছুদূরে এক চিলতে বন আছে। এক চিলতেই বটে, পঞ্চাশ ষাটটা শালের গাচ। এই বনের পাশ দিয়ে ঝোরা। ঝোরার ওপারে কাশের ঝোপ একেবারে জলের ধার ঘেঁষে। ঝোরায় এখানে এক হাঁটু জল।

এপার থেকে ঢিল ছুঁড়লে ওপারে গিয়ে পড়ে। কিন্তু স্রোত আছে। আরও পশ্চিমে এর জল স্বচ্ছ। পাথর কুচি মিশান বালির খাত—অনেকটা চওড়া কিন্তু শুকনো। ঝোরা সেখানে অনেকগুলো ধারায় ভিন্ন ভিন্ন করে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আসফাক, সেখান থেকে সিকি মাইল গেলে বাপারির দহ—জাফরুল্লার নাম থেকেই নাম। সেখানে জল বেশ গভীর। জলের [illegible] প্রায় [illegible] তার তার উপরেই জাফরুল্লার খামার বাড়ি।

এখানেও এই বনের মধ্যে ঢুকে থাকা জমিও জাফরুল্লার। 'আসল বনের সীমার বাইরে এই বনটা কি করে হল?' চাউটিয়া ছমিরকে বলেছিল, আর তখন আসফাক শুনেছিল, বনটার দোষ নয়, জাফরুল্লাই বনের মধ্যে ঢুকেছে। আগে এদিকে কার কতটুকু জমি আর কতটুকু বন তার খোঁজ কেউ রাখত না। গাছ কেটে চাষ দিলেই হল। কোন আমলা এতদূর এসে জমির মাপ দেখে খাজনা নেবে? সেইবার সেটেলমেন্ট হলো। আর তখন সেই এক কানুনও এসেছিল। জাফরুল্লার বাবা [illegible] সঙ্গে তার ফিসফাস ফুসফাস ছিল। খেলে ওখানে বনের মধ্যে ঢুকে বনের জমিকে চষের জমি বলে লিখিয়ে [illegible] সব করে গিয়েছে। এখন এই ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে জট খোলা কঠিন। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে এদিকে কে [illegible] বন, কোথায় [illegible] সীমা, কোথায় কার কতটুকু জমি কেউ জানত না। একবার বন এলো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেশির ভাগ।

নদী, চাষের ক্ষেত এবং বন সম্বন্ধে এত [illegible] চিন্তা। শেষ করে আসফাক আবার খামারের দিকে [illegible]।

তার এখন মনে হল, যাই হোক, ছমির কি ভাবছে তা এখনও [illegible] যায় নি। এটা মনে হতেই তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে নিজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধ খামারবাড়িকে লক্ষ করতে লাগল। কেউ যেন সাড়া দেয় না, অন্য চাকরগুলোই বা গেল কোথায়।

বলদগুলোর ঘরটা এখনো সাফ করা হয় নি। আসফাক [illegible] ঝুড়ি করে গোবর ফেলতে শুরু করল। যেখানে-সেখানে ফেললে চলবে না। হয় খামারের পিছনের ডাঁইতে কিংবা তামাকের খেতে। অন্যদিনের চাইতে বেশি মন দিয়ে করলেও ঘরটা সাফ করতে বেশি সময় লাগল না। এর পরে গাভীদের আড়গড়াতেও ওই একই কাজ। কিন্তু

ঘণ্টাখানেক ধরে এ-কাজটা শেষ করেই আবার তার মনে হল : আশ্চর্য, ছমির নিজে থেকে কিছুই বলছে না।

খানিকটা ভেবে সে স্থির করল হয়তো ছমিররা সকলেই কোন চাষের কাজে গিয়েছে। কি চাষ হবে এই বৃষ্টি না হওয়ার দিনে তা সে বুঝতে পারছে না। ছারিঘরের বারান্দা থেকে ছিলিম নিল আসফাক, বড় এক দলা তামাক। খড়ের নুড়ো পাকান ছিল। তাতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে সে চাষীদের খোঁজে বেরল।

খামারবাড়ির পিছন দিকে দহের ধার ঘেঁষে একটা জমিতে চাষ দিচ্ছে বটে কয়েকজন কৃষান জল বৃষ্টি নেই অথচ জমিটা যেন জলে টৈটম্বুর। তা বোঝা যাচ্ছে উপায়। দহের পারে খুঁটি আর খুঁটি থেকে ঝোলান নৌকা নৌকাকে ঢেঁকির মতো চালিয়ে দহের জল থেকে চালান দিয়েছে।

সেখানে পৌঁছে আলের উপরে বসে ছিলিম ভরল আসফাক। নুড়ো ভেঙে সেই ছাইসে তামাকে আগুন ধরাতে ধরাতে হঠাৎ তার মনে পড়ল—এই আট-দশ বিঘা জমিটা তাকে চষতে দিয়েছিল জাফরুল্লা। সে ঠিক দুরস্ত করতে পারে নি জমি তারপর এক সময়ে এটাকেই ভোগ ধানের জন্য পছন্দ করে জাফরুল্লা। তা সেই সুগন্ধ ভোগধান লাগেই তো—জাফরুল্লার নিজের খোরাকি, ছারিঘরে যারা আসে সেই সাহেবদের পলাউ। তিনটে হাল চলছে। ছমির ছাড়া আরও দুজন। নসির আর সত্তার।

আসফাককে তামাকের যোগাড় করতে দেখে এক একজন করে কৃষান আসতে লাগল হাল ছেড়ে। সব শেষে ছমির এল। আর তাকে দেখে ছিলিম নতুন করে ভরল আসফাক। ছমিরের হাতে ছিলিম তুলে দিয়ে নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছমিরও নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল।

অবশেষে আসফাকই বললে, 'কেন, কাল রোয়া গাড়েন ?'

'না তো কি ?'

'আর কাঁয়ও চাষ দেয় না কিন্তুক। জল ঝরি নাই।'

ছমির ছিলিমটা আসফাককে ফিরিয়ে দিল

'কেন, ছমির—'

'কি ?'

'না ; তাই কং।

চমির আল থেকে নেমে লাঙল ধরল। চাষীদের পা কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বলদগুলোরও সেই অবস্থা। দহের জল যেন দহ ছেড়ে উৎলে এসেছে জাফরুল্লার হুকুমে।

কিন্তু ছমির এবারও কথা বলল না। তা হলে? তার দেরি করে ফেরার ব্যাপারটা জেনে শুনেও দম মেরে আছে। ব্যাপারি ফিরলে লাগাবে সাতখানা করে। শুধু দেরি নয়, ওষুধ যা নাকি মানুষের জীবন বাঁচাবে তা আনতে গিয়ে দেরি করা।

আসফাকের হাতে তামাকটা বৃথা পুড়তে লাগল। লাগাবেই বা কি চমির। ব্যাপারি শহরে যাওয়ার আগে কি জেনে যায় নি নিজেই।

হঠাৎ কথাটা মনে এল। সে কি ইতিমধ্যে এদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে গিয়েছে? সে একটা গল্প জানে: দাগি আসামীদের নাকি এরকম হয়। তার নিজের গ্রামের লোকেরাও 'কথা বলে না। বললেও তা না-বলার শামিল। অথচ দেখো ওরা একই রেখায় হাল চালাতে চালাতে কথা বলছে। সাওার হাসলও যেন একবার। আসফাক কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে সে ওদের আলাপের পরিধিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াল যেন, কিন্তু কেউই ওকে আমলে আনছে না।

হ্যাঁ, দেরি তো হয়েছে, শহরে পৌঁছে যেখান থেকে ওষুধের দোকান দেখা যায় সেখানে এক গাছতলায় বসে পড়েছিল আসফাক। তখন কে যেন বলেছিল: ওষুধ বলে কথা। ওঠ, দেরি হয়। আসফাক তা শুনে হাঁপাতে লাগল। যেন বলবে: তাই বলে মানুষ কি জিরাবে না। অবশেষে ওষুধ নিয়েছিল। ফিরবার পথে সে পাকা পীচের পথে এসে তারপর গোরু-গাড়ির পথ ধরে এসেছে। অর্থাৎ বনের পথে সোজা আসে নি। দোষ কি বলো? বনের পথ তো আর পথ নয়, গ্রামের মানুষের মনগড়া কিছু। আর তা ছাড়া অত রাতে বনে ঢুকলে কি পথ বোঝা যায়? পীচের পথে খানিক দূর এসে তার মনে হয়েছিল বনের পথে ঢোকার কথা, কিন্তু পীচের পথের দু-ধারে তখন বনের অন্ধকার। তার ভয় করেছিল। সে অন্ধকার যেন আতঙ্কের মতো কিছু।

অবশেষে সে নিজে থেকেই বলল, 'বোঝ কেনে।'

ওরা যেন শুনতেই পেল না।

দ্বিতীয়বারও সে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'বোঝ কেনে।'

লাঙলের পাকে সত্তারই কাছে এসেছিল। সে বলল, 'কও'

আসফাক বলল, 'কাল ভুলুয়া না কি কয় তায় লাগছিল।'

সাত্তার হাল ধরে ততক্ষণে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকেই বলল,'তা লাগে অনেক সময়।'

আসফাক বলল, 'সাঁঝ থাকি দুইপর রাত। শেষত দেখি শালমারির বনত চলি গেইছি।'

এবার নসির দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুলুয়া অপদেবতা। যে নাকি মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয়, তেমন তেমন হলে দহের জলে ডুবিয়ে মারে। নসিরের বয়স হয়েছে। শুনে সে অবাকও হলো। সে বলল, 'শোনেক সাত্তার। আসফাক কয় ভুলুয়া ধরছে পাছত। কোটে যেইছিস আসফাক?'

'শহর।'

'শহর?' নসির কথাটা যেন ভালো করে জেনে নিল।

'শহর?' সত্তার বলল, 'ও সেই ব্যাপারির ওষুধখানা।'

আসফাকের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠল। জানে, এরা সকলেই জানে তা হলে দেরি হওবার কথা।

সাত্তার বলল, 'তা আসফাক, ভুলুয়া ধরলে বসি যাওয়া লাগে। হাঁটা লাগে না।'

নসির বলল, 'বুঝলা সাত্তার, আমার বড চাচাক একবার ভুলুয়া ধরছিল।'

নসির আর কি বলল আসফাক তা শুনতে পেল না। কারণ প্রথমে সাত্তার, তার পিছনে নসির, সবশেষে চমির হালের পিছন পিছন আবার দূরে চলে গেল গল্প করতে করতে। ভুলুয়া লাগার গল্পই। দূর থেকে আসফাক দেখতে পেল ওরা যেন হাসছেও। বিমর্ষ মনে সে ভাবল, ওরা বিশ্বাস করে নি। মিথ্যাটাকে ধরে ফেলেছে।

হঠাৎ আসফাক উঠে দাঁড়াল। কি সর্বনাশই সে করে ফেলেছে। সাত্তার আর নসির হয়তো জানত না তার দেরি করে ফেরার কথা। তারাও এখন জেনে ফেলল।

কি করবে এখন সে? কোথায় যাবে?

নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে তামাকের খেতগুলোর কাছে এসে পড়েছে। যতদূর চোখ যায় একখানা বাদামী কাগজ যেন বিছান আর তার উপরে সমান, দূরে দূরে সবুজের ছোপ। কিন্তু এখানে কেন এল সে? এসে

কি কাজ আছে? কথাটা চিন্তায় ফুটে ওঠার আগেই আবেগটা দেখা দিল। এই খেতেই, এই তামাকের ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েই জাফরুল্লার কাছে থাপ্পড় খেয়েছিল আসফাক একদিন।

আলের উপরে বসল আসফাক। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাথা কাৎ করে কানটাকে সে চেপে ধরলো কাঁধের উপরে যেন শব্দটাকে থামাতে। চেষ্টা করে সান্ত্বনার মতো একটা চিন্তা নিজের মনে ফুটিয়ে তুলল সে। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে—তা সে বোধহয় না খেয়ে থাকার জন্য। কাল দুপুর থেকে খাওয়া হয় নি তার।

তামাকের খেতের খুঁটিনাটি লক্ষ করতে লাগল সে। তা এটা দেখার মতো কিছু বটে। তাকিয়ে দেখ, যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখ—একটা ঢিল দেখতে পাবে না, কিংবা একটা ঘাস। এমন জমি আর জীবনে দেখা যাবে না। যে জমিতে গোবর সার দেবার জন্যই দু-কুড়ি গরু বাছুর আছে জাফরের। গর্ব করার মতো কিছু বটে। আসফাকের কৃষক মনে অকৃত্রিম প্রশংসার ভাবটাই দেখা দিল। সে এ জমির কাজ কিছুই শিখতে পারে নি। কজনেই বা তা জানে। আর সেই কিনা গিয়েছিল তামাকের পাতা ঝুরতে। জল দেবার জন্য দহের মধ্যে যে টিউবকল বসে তা পাম্প কর—আচ্ছা। জমির ঘাস তোল একটা একটা করে খুঁটে, তাও খুব। কিন্তু পাতা ঝোরা? জাফর নিজে ছাতা মাথায় অষ্টপ্রহর দাঁড়িয়ে থাকে, পাতা ঝোরায়। আসফাক তাদের দেখাদেখি দা হাতে করে একটা গাছে কোপ দিতেই ছুটে এসে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল জাফর। স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধি আছে জাফরের। সেই হুঁইউতির খেতটা ভাবো। আর কেউ কি ভাবতে পারে ডোঙা দিয়ে জল ছেঁচে এই বৃষ্টি না-হওয়া দিনে হুঁইউতির জমি তৈরি করতে। আল্লা পানি দেয় না, না দিক জাফর ডরায় না। আট'শ বিঘা জমি এখনও তার। নতুন আইনে দু'শ বিঘা বনকে ফিরিয়ে দিয়েই নাকি এই। তখন ব্যাপারির বাড়িতে গোলমাল লেগেছিল বটে। তা জাফর সে সব কাটিয়ে উঠল। চারবিবি তার, এক ছেলে। সকলের নামে জমি লিখে দিল সে। একেবারে রেজেস্ট্রি করে। শেষে বাড়ির পাঁচজন চাকরের নামে। আসফাকের নামেও জমি লেখা হয়েছিল তখন। তারপর জাফর সকলকেই একশ টাকা করে নগদ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকার রেহানিখত লিখিয়ে সেসব জমি নিজের তাঁবে এনেছে। নিজের জমি অন্যকে লিখে দিয়ে মিথ্যা ঋণের রেহানিখতে আবার সে জমিকে নিজের

হাতে আনা। বুদ্ধি আছে বটে। সেই জমিতে ধান হয় আর তামাক।

আসফাক যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই সে ছমিরদের আবার দেখতে পেল। তাদের একজন ছিলিম ধরাতে বসল। আর দুজন গেল দহের দিকে। স্নান করবে নাকি?

কিন্তু এ সব সে ভাবছে কেন?

[আসফাক বুঝতে পারল না তার মন চারিদিকের এই সব টুকরো ব্যাপার দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।]

দু-তিনটে আল পার হলেই সেই আল যেখানে ওদের তিনজনের একজন ছিলিম ধরাতে বসেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আসফাকের মনে হল, ও যদি ছমির না হয়ে সত্তার কিংবা নসির হয় তবে কিছু খবর নেয়া যায় ওর কাছে। এটা ছমিরকে জিজ্ঞাসা করা যেত। কিন্তু সকাল থেকেই ছমিরকে তার ভয় করছে।

সে যেখানে বসেছিল তার কিছু দূরে এক টুকরো জমি। দূর থেকে বাতাসে দোলা গাছগুলো দেখলে মনে হবে ধান। কিন্তু আউস নয়। ছন্। ঘর ছাওয়ার ছন্। কচি অবস্থায় বলদ খায়। বেশি খেলে সহ্য হয় না। কিন্তু মোষ ছাড়ে না। বরং ভালোবাসে। আগে মহিষকুড়ায় যখন মহিষের আড্ডা তখন সব দহের পার ধরে শুধু এই ছনেরই জঙ্গল ছিল।

হঠাৎ কোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। প্রথমে এই জমিটাই চষতে দিয়েছিল তাকে জাফরুল্লা। তিন বছর প্রাণপাত করেছিল আসফাক। কিন্তু দশ বিঘায় আট-ন মণ ফললে খুব। চার মাস হল ওই জমি ছেড়েছে সে। •

তখন একদিন খুব ভোরে, সেদিন মনটা খুব ভাল ছিল জাফরের, খারিঘরে সে এসে বসতেই তার হুঁকায় ছিলিম বসিয়ে দিয়েছিল আসফাক। হুঁকায় কয়েকটান দিয়েই জাফর বলেছিল, 'তা আসফাক দহের ধারে ওই দশ বিঘা জমি তোমাক দিলাম। মনত ঠিক রাখিস।' যেন এক কৃতজ্ঞতার দান, যেন কেউ পরামর্শ দিয়েছে আর তা মানতে পেরে জাফর খুশী। সেই জমিতে আজ রোয়ার যোগাড় করা হচ্ছে।

এটা অন্য জমি বন্দোবস্তের মতো ব্যাপার নয়। এর জন্য কোন দলিল

হয় নি, কোন রেহানের কাগজে টিপ দিতে হয় নি। কিন্তু জমিটার নাম হয়েছে আসফাকের ভুঁই।

কিন্তু তার চিন্তা ঘুরে গেল। জাফরুল্লা কখন গেল, কি অবস্থায় গেল, কখন ফিরবে এ সব ভাবতে ভাবতেই এদিকে মন চলে এসেছিল। দেখাই যাচ্ছে ও ছমির নয়। সাত্তার। এখনই ওর কাছে জেনে নেয়া দরকার ব্যাপারির কথা।

কথা বলার আগে আসফাক হাসল খুঁত খুঁত করে।

সত্তার বলল, 'ছিলিম' ?

আসফাক হাত বাড়াল। ছিলিমটা দিল সাত্তার।

সাত্তার বলল, 'পিঁপড়া চলে, ঝরি হবার পায়।'

আসফাক বেশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে কাশল। ছিলিমটা সত্তারের হাতে ফিরিয়ে দিল।

'তো হৈঁউতির চাষ আশুই হইবে মনত কর।' বলল সাত্তার।

আসফাক কথা না বলে অ্যাও-অ্যও করল।

সাত্তার জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলিব চাও, সেই ভুলুয়া ?'

আসফাক গডগড করে হাসল। বলল, 'ব্যাপারি ফেলা গেইছে দেখছ ?'

সাত্তার বলল, সে নিশ্চয় দেখেছে। ব্যাপারি সেই হাকিমের সঙ্গে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর ভঁকৃভঁকি এসেছিল তার। সেই গাডিতে ব্যাপারি গেল তার সঙ্গে আব মুন্নাফও গিয়েছে। হাকিমই পীডাপীডি করে নিযে গেল।

'অ'।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল আসফাকের। তারপর সে হাসল আবার। ভারমুক্ত বোধ হল যেন হঠাৎ নিজেকে। সে জোরে জোরে হেসে উঠল দ্বিতীয়বার।

সাত্তার বলল সে ভুলুয়ার কথা যা বলেছে তা মিথ্যা নয়। তার বডচাচা সব আইন জানত। সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে যখন ক্লান্ত তখন সে বুঝতে পেরেছিল ভুলুয়া ধরেছে। পিরহান খুলে ফেলে, কাপড় ঝেডে পরে বগলের তলা দিয়ে চেয়ে সে আবার পথ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু বগলের তলা দিয়ে চাইতে গিয়ে সে ভুল করে ফেলেছিল। কারণ সে একজনকে দেখে ফেলেছিল যার চোখদুটো রক্তের মতো লাল। মোটর

গাড়ির পিছনের আলোর মতো। আর তার মাথায় শিং। বাড়িতে ফিরে বড় চাচা প্রাণে বাঁচল, কিন্তু মাথায় দোষ হয়ে গেল।

ছিলিমটা সত্তারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসফাক। নিঃশব্দে সে হাঁটতে শুরু করল। এ সব ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে আসে উঠে ধরান ছিলিমে টান দিয়ে আবার কাজের দিকে ফিরে যাওয়াই প্রথা। বিদায় দেয়া-নেয়ার প্রথা নেই।

একটু যেন ভয় ভয় করল আসফাকের। সত্তারের বড় চাচার সেই ভুলুয়া কি দেখতে মোষের মতো ছিল নাকি? কিন্তু মানুষ যেমন করে কাজে যায় তেমন করে বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটতে শুরু করল, যেন একটা দরকারি কাজ মনে পড়েছে। সেই ভঙ্গিতে চলতে চলতেই সে যেখানে বলদগুলোকে বেঁধে রেখে এসেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এটার পিঠ চাপড়াল, ওটাকে ধাক্কা দিয়ে রোদ থেকে ছায়ার দিকে সরিয়ে দিল। যেন সব কয়েকটি ঠিকঠাক খাচ্ছে কিনা দেখল। তারপরই একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল।

দেখো কাণ্ড। হাকিম জাফরুল্লার মিতা। আর তার কাছে কিনা নালিশ জাফরুল্লার নামে!

কাল রাতে ঘুম হয় নি। তার উপরে সে সকাল থেকে কাজ করছে। কাল দিন-রাতে একবারও খাওয়া হয় নি। এখন আজকের খাওয়ার সময়ও গড়িয়ে যাচ্ছে। যেখানে সে বসেছিল সেখানে বাতাস চলছিল। ক্লান্তি, অবসন্নতা, ক্ষুধায় ঝিমুনির মতো লাগল তার। আর তার মধ্যে দিয়ে যেন এই খামারে তার নিজের অবস্থিতির কথা ঠাণ্ডাঠাণ্ডা হয়ে মনে হতে লাগল। খানিকটা যেন ঔদাস্য।

সাত সাল হল তার এই খামারে। এক কুড়ির কম ছিল বয়স তখন। আঠার-উনিশ হতে পারে। এখানে পৌঁছানর পর সব যেন এক সাজান-গোছান বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বুধাই রায়ের খামার ছাড়ার মাস চার-পাঁচ পরেই হবে।

আর এখানে সে খারাপই বা কি আছে? দুবেলা খেতে পায় সে। পরিশ্রমও বেশি নয়। বরতে গেলে ধীরে ধীরে জাফর তাকে অন্য চাকরদের থেকে একটু পৃথক করেই দেখে, সেই খাপ্পড়ের ঘটনাটা ঘটলেও। তামাকের খেতের কঠিন কাজে তাকে যেতে হয় না। ধানের খেতে বেচাল বর্ষায়

ঘাস জলে নিড়ানি নিয়ে বসতে হয়। বলদ, মোষ, গরু দেখাশোনা, রাখালদের খবরদারি করা, দড়ি পাকান, তামাক বানান, বাজার সওদা করা —এসবই তার কাজের ফিরিস্তি। বড় জোর চাউটিয়াকে মউনি টেনে সাহায্য করা। তা সেটা বর্ষার পরে শীত আসার সময়ে যখন দুধে মাখন বেশি হয়।

আর এছাড়াও প্রমাণ আছে। তিন সালের পুরনো হল ব্যাপারটা। জমি নিয়ে কাজিয়া। যদিও জাফরের দাড়ির অধিকাংশই তখন সাদা। তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, সঙ্গে সঙ্গে চাকর আধিয়ার মিলে আট-দশ জনকে। মানুষ নাকি খুন হয়া গেইছে।

সে যখন যাচ্ছে আসফাককে ডেকে বলেছিল: আসফাক, বাপজান, ইদিক শোনেক। সব দেখি-শুনি রাখবা, কেমন? আসফাক বড় ভাল ছাওয়াল।

জাফরুল্লার চার বিবি তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ফোঁত ফোঁত করছে। তখন জাফরুল্লা ধীরে ধীরে তার সঙ্গে যারা ধরা পড়েছে, পুলিশের ঘেরের মধ্যে কাছারিঘরের বারান্দায় যারা বসেছিল তাদের নাম করে করে প্রত্যেককে ছ-সাত বিঘা চাকরান দেয়ার কথা বলেছিল। যার যেখানে বাস তার চারিদিকে ছ-সাত বিঘা করা চাকরান। লেখা-জোখা নাই। কিন্তু বড়বিবিকে বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে অন্য তিন বিবিকে সাক্ষী রেখে বন্দোবস্ত ঠিক করেছিল। আর, তারপরে, বলেছিল দহের ধারে নাবলা দশ বিঘা আসফাকের। বলেছিল, 'মুই যেদু না-ফিরির পাং তো ওই জমি আসফাকের থাকি যাইবে।'

কথার ভাব শুনে মনে হয় জাফরুল্লা ধরে নিয়েছিল, সে আর ফিরবে না। বলেছিল, আমার যদি ফেরা না হয় সবই মুন্নাফের। চার বিবি সব দেখে রাখবা, কেমন। আর আসফাক সকলেক দেখবা।

এই শুনে, তাকে নিয়ে যেতে দেখে, আর জাফরের চারবিবি আর মুন্নাফের কান্নার সামনে আসফাকের চোখে জল এসেছিল। জাফরুল্লা প্রায় তিনমাস পরে ফিরেছিল। কিন্তু কথা ফিরিয়ে নেয় নি। সেই চাকর আধিয়াররা—ছমির, নসির, সত্তার, চাউটিয়া, দুপরু, ঠেংঠেঙ্গা যে যখন ফিরেছে তারই সে-চাকরান ভোগ করেছে। দহের ধারের সেই দশবিঘা এখনও আসফাকের ভুঁই।

আর জাফর যখন অনুপস্থিত তখন আসফাক কি না করেছে। ধান তামাকের খেতখন্দ দেখাশোনা তো বটেই জাফরের বিবিদের জমির

তদারক। আর বলদ গরু ঘোষ যা তার আসল জিম্মি তাদের চেহারা তেমন কোনদিনই আর হবে না, সেই তিনমাসের যত্নে যা হয়েছিল। সেই সময়ে মুন্নাফ কথা বলতে শিখছিল। তখন তাকে কেউ শিখিয়ে দিয়ে থাকবে। সেই থেকে মুন্নাফ থাকে বলা মিঞা বলে। এখনও ছমির, নসির, সত্তারদের যেমন নাম ধরে ডাকে তেমন নাম ধরে ডাকে না আসফাককে।

সেই বড়বিবির সঙ্গে অনেক কথা হত। একদিন বড়বিবি বলেছিল, তা আসফাক, এই পিথিমিতে যত জমি দেখ তা সবই কোন না কোন জাফরের। এই যে বন দেখ তাও একজনের।

আসফাক বলেছিল, এই এত বড় বন। যে বনের মালিক সে কি এতবড় বনকে আগাগোড়া চোখেই দেখেছে, যে তার হবে।

বড়বিবি ফুর্সিতে ঠোঁট লাগিয়ে বলেছিল, এই দেশের সীমার মধ্যে যত কিছু দেখ সবই কারো না কারো। বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যত দূরে যেখানে যাও বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে কর, তাও সেই মালিকের।

বড়বিবির গল্প শুনতে শুনতে ঘুম পেয়ে যায়।

দুপুরটা গড়িয়ে গেল। ছমির, সত্তার, নসির, চাউটিয়া খামারবাড়ির এদিকে ওদিকে নড়া-চড়া করছে। ওদের সকলেরই স্নান খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ছমির একবার তার বিশ হাতের মধ্যে দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় নিজের বাড়ির দিকে গেল। কিছু পরে সে পিরহান গায়ে ফিরেও এল। আসফাক বুঝতে পারল ছমির হাটে যাচ্ছে। সপ্তাহের হাট। এই সময়ে আসফাক ক্ষুধা অনুভব করল। চব্বিশ ঘণ্টা সে খায় নি। তা, এই খামারে আসার পরে চব্বিশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা তার এই প্রথম।

এখন সে কি করবে? ধারিঘরের বারান্দার পাশে উঁচু বাঁশের আড়াটায় পাট আছে। কাছেই লাটাইও থাকবে। সে বলদগুলোকে আর একটু সরিয়ে সরিয়ে বেঁধে দিয়ে ধারিঘরের দিকে চলল।

আবার ছমিরের সঙ্গে দেখা হলো। ছমির তা হলে হাটে যায় নি। টাকা-পয়সা-খামা আনতে অন্দরে গিয়েছিল। এখন হাটে যাবে।

মুখোমুখি দেখা হতে আসফাক বলল,' হাটত যাইস একা।'

'রাখাও যাইবে।'

প্রেশিডুনা ন্যুক

'ও আচ্ছা', বলে আসফাক পা বাড়াল।

ছমির বলল, 'এক কথা। আইজ তো তোমরা আছ। তা আমি ঘরত যাই। কি কও।'

'আর কাঁয় থাকে খামারত ?'

'কাঁয়ও না।'

'কেনে, ব্যাপারি ?'

'আজি না আইসে।'

ছমির চাকর বটে কিন্তু এ গ্রামেই তার বাড়ি। কাল রাত্রিতে সে বাড়ি যায় নি। জাফরুল্লার বাড়িতে পাহারা দিয়েছে। আজ আসফাককে পাহারার ভার দিয়ে বাড়ি যেতে চায়।

'আচ্ছা, যাও', বলে আসফাক হাঁটতে শুরু করল।

খানিকটা দূরে গিয়ে সে ভাবল : ছমির আজ থাকবে না। তা হলে সেই যে একবার আসফাক জাফরুল্লার ঘরবাড়ি তিনমাস ধরে পাহারা দিয়েছিল আজও তেমন হলো।

কিন্তু তফাৎ দেখ। ঘাড় কাত করে থুথু ফেলল আসফাক।

খারিঘর পার হয়ে সে বরং অন্দরের ঘরগুলোর দিকে তাকাল। ঘরগুলোর পিছন দিকে বাঁ পাশে একটা ছোট বনের আভাস দিয়ে কতগুলো গাছের মাথা। সবুজ মেঘের মতো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। মেঘ নয় তা বোঝা যায় এজন্য যে গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে নীল মেঘের ঢেউ। ওটাও অবশ্য মেঘ নয়। পাহাড়। যেন পাহারাদার হিসাবে অন্দরটা এখনই একবার দেখে নেয়া দরকার। যদিও এখন দুপুর সবে মাত্র গড়িয়েছে। যত দেরিই হয়ে থাক, ওষুধ আর ফেরৎ টাকা পয়সাও তো বিবিদের কাছে দিতে হবে। তার সেই বলদঘরের মাচা থেকে ওষুধ নিল সে।

অন্দরে ঢুকে আসফাক দেখতে পেলে বড় বিবিকে তার ঘরের বারান্দায়। যথারীতি সে নিচু একটা মোড়ায় বসে তার ফুর্সিতে তামাক টানছে। তার সামনে গিয়ে ওষুধের শিশি আর পয়সা নামিয়ে দিল আসফাক।

অন্দরের তিনদিকে ঘর। বড় বিবি আর কামরুন বিবি দক্ষিণদুয়ারী ভিটায় পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকে। মেজবিবির ঘর উত্তরদুয়ারী, ছোটবিবির ঘর তার লাগোয়া কিন্তু পুবদুয়ারী। মাঝখানে উঠান। তা বৃষ্টিবাদলের দিন ছাড়া ভিটা উঠান দুরীর কল্যাণে নিকানো ঝকঝকে তকতকে। এই দুরী ঝি পারে বটে। সকালে একপেট পান্তা খেয়ে সে তার গোবর-কাদার চারি

আর পাটের নুড়ি নিয়ে নিকোতে শুরু করে। এ-ঘর ও-ঘর করে সব ঘরের ভিটা, মেঝে, বারান্দা, তারপরে উঠোন। পাঁচ-ছ ঘণ্টা একটানা কাজ করে। গোবরকাদার চারিটাই তো আধমণি হবে ওজনে। অবলীলায় সেটাকে সরিয়ে সরিয়ে সে উবু হয়ে বসে লেপে যায়। তা নিজের ওজনও মণতুয়েক হবে। দরকার হলে খড়িও ফাড়তে পারে যদিও নাকছবি, কপালের চুল আর থলথলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুক দেখে বুঝতে পারা যায় সে মেয়েমানুষ। চাকরদের মহলে ঠাট্টা, সে এক মাদীপোষ যে মানুষের মতো কাজ করতে শিখেছে।

'কে? আসফাক!' বলল বড়বিবি।

'জে।'

বড়বিবি হাসল। নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তার মুখের পেশীগুলোর মধ্যে তার চোখ দুটো ডুবে গেল হাসির দমকে।

হাসি থামলে বড়বিবি বলল, 'কেনে পথ হারাইছিলা?'

'জে।'

আবার কুর্সিতে মন দিল বড়বিবি। আর আসফাক সেই নিচু করে রাখা মুখের দিকে তাকাল। এবার সে বড়বিবির উপরের ঠোঁটের উপর সরু মন্দা গোঁফের রেখাটাকে দেখতে পেল।

একমুখ পোঁয়া ছেড়ে মুখ তুলল বড়বিবি আর তখন তার মুখখানা হাল্কা গোঁফের রেখা সত্ত্বেও, বোধ হয় তার সাদা চুলের কুণ্ডলীগুলোর জন্য, স্নিগ্ধ দেখাল।

সে বলল, 'জ্বর হইছে আসফাক? চোখ দুখান লাল দেখং।'

আসফাক উত্তর দিতে পারল না।

বড়বিবি বলল, 'তা হয়। ভুলুয়া ধরলে কালে জ্বর হয়।'

ভুলুয়া একটা অপদেবতা যা মারাত্মক চেহারা নিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কোন মানুষ যদি সে অপদেবতাকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পারে তা হলে সে কৌতূহলের বিষয় হয়, আর রাতের অন্ধকারে পরিচিত পথ চিনতে না-পেরে গোলকধাঁধাঁয় ঘোরার সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কৌতুকেরও হয়। খেতে এসে ছমির, সত্তার, নসির আসফাকের ভুলুয়া ধরার গল্পটা নিশ্চয়ই করে থাকবে। বিবিদের সকলেরই কৌতূহল থাকার কথা। তা ছাড়া এখন রান্না খাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে।

প্রথমে এল মেজবিবি প্রায় ছুটতে ছুটতে। তা বছর চল্লিশ বয়স হবে

তার। মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। কিছু বলার আগেই সে খিল খিল করে হাসল। হাসি থামলে বলল, 'তা আসফাক, ভুলুয়ার শিং কেমন ছিল? তাক দেখছ?'

হাসির শব্দে আর জোরে জোরে বলা কথার শব্দে পায়ের মলের শব্দ তুলে ছোটবিবি, আর তারপর বড়বিবির পাশের ঘর থেকে ধীরেসুস্থে কামরুন বিবিও বেরিয়ে এল।

ছোটবিবির বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে, যদিও জাফরুল্লার বয়স তিনকুড়ির উপরে। ছোটবিবি সব সময়েই ফিটফাট থাকে। এখনও তার পরণে আসমানি নীল শাড়ি। আর চোখে সুর্মা। আর তার হাঁটা চলা দাঁড়ানোর কায়দায় তার রঙীন কাবিজ চোখে পড়বেই অল্প অল্প। কামরুন বিবির বয়স বরং বেশি যদিও সে শেষ নিকা। ছোট বিবি যদি দশ-বার মাস আগে এসে থাকে, কামরুন বিবির সবে সাত সাল চলছে। তা কামরুন বিবির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে, ভারভরন্ত শরীর।

ছোটবিবি বলল, 'তা দেখং আসফাক তোমার চোখুও লাল। ভুলুয়ার চোখু লাল থাকে সাত্তার কইছে।'

আসফাক কিছু না বলে তার উস্কোখুস্কো মাথাটা ঝাঁকাল। এতক্ষণে সে অনুভব করল তার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। তাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে ছোটবিবি শিউরে উঠে দূরে সরে গেল। তার সেই শিউরে ওঠা দেখে মেজবিবিও তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গেল। সেখান থেকে বলল, 'বড়বিবি, উয়াক তেন্তুল পানি খাওয়ান লাগে?'

বড়বিবি ভাবল। একটু পরে বলল, 'না বোধায়।'

আসফাক ভাবল ওষুধ দেয়া হয়েছে, এখন ফিরে যাওয়া ভাল।

ছোটবিবির চোখ দুটো উত্তেজনায় ঝক্‌মক্ করছে। এ সময়ে তাকে যেমন সুন্দর তেমন ধারাল দেখায়।

গম্ভীর হয়ে বড়বিবি বলল, 'এলা পানি-পড়া খাওয়া লাগে। আর হাতত বান্ধা লাগে তাগা। তো মাইঝলা, তোর ঘরত কালা সুতা হইবে?'

মেজবিবি মাথা ঝাঁকাল। ছোটবিবি বলল, 'রোস, মুই আনং।' সে তার নিজের ঘরে গেল। আসফাক এবার অবাক হল, তার চেহারা কি ভূতেধরা মানুষের মতো দেখাচ্ছে। একটু ভয়ই পেল সে। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চোরা চোখে দেখল।

কমরুন অবাক হয়ে দেখছিল আসফাককে। এতক্ষণে সে তার ভারি

কিন্তু মৃদু স্বরে বলল, 'কেনে, আসফাক, কাল দুইপরত খাও নাই, আতত খাও নাই, আজ দুইপরত খাওয়া বাদ দিলু।'

মেজবিবির হেঁসেল আজ। সে বলল, 'ঠিকে তো। খাবু এলা আসফাক। পান্তা করা আছে ভাত।'

বড়বিবি তার কব্জিস্থ ফলাল। 'না, মাইঝলা। মনত কয়, উহার জ্বর আসি গেইছে। তো জলপান খায় তো আনি দেও। উপাশ-পারা ভাল হইবে আজ।'

ছোটবিবি পায়ের পাতার উপরে নাচতে নাচতে তার ঘর থেকে একটা কাল কাপড়ের পাড় এনে দিল। আর বড়বিবি সেটা হাতে করে মন্ত্র পড়তে নিজের ঘরের মধ্যে উঠে গেল। আসফাক ভাবল, এখনই তাগা এনে পরাবে বড়বিবি তার হাতে। আর তা কি তার পরা উচিত। সত্যি কি তাকে ভুলুয়া ধরেছিল !

কমরুন বোধ হয় আসফাকের না-খেয়ে থাকার কথা ভুলতে পারছিল না। সে বলল, 'তোমার গামছা কোটে, আসফাক। চুড়া গুড় দেং। খায়া, পানি খাও।'

আসফাকের সঙ্গে গামছা নেই। তার মনে পড়ল এতক্ষণে। তা'লে সেটাও সে কাল বনেই হারিয়েছে পিরহানের সঙ্গে। সে ভাবল, সে কথা বলা কি ভাল হবে ?

এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। এখন কার কি করা দরকার বোঝা যাচ্ছে না। তা হলেও এ এক ভয় ভয় খেলা। যা খেলতে ভালো লাগে। আবার ছোটবিবি বলল, 'বোস, মুই গামছা আনি দেং।'

সে শুধু গামছা আনল না। গামছায় করে খানকয়েক বাতাসাও আনল। তার হাত থেকে গামছা নিয়ে কামরুন নিজের ঘরে গেল। দুপ্রান্তে গিট দিয়ে গামছাটাকে থলের মতো করে চিড়া গুড় নিয়ে এসে আসফাককে দিল। আর সেই গামছা নিতে গিয়ে চোখ তুলেছিল আসফাক। তখন তার লাল টকটকে চোখের উপরে ঝাপসা ঝাপসা ধোঁয়া ধোঁয়া কিছু দেখা গেল।

মন্ত্র পড়া কাল কাপড়ের পাড়টাকে (সেটাকে আরও সরু করে ছিঁড়ে পাকান হয়েছে) নিয়ে বড়বিবি তার ঘর থেকে এল। আসফাককে এগিয়ে আসতে বলল। আর সে এগিয়ে এলে তার ডান কুনুই-এর কিছু উপরে

বেঁধে দিল সেই তাগা। বলল, 'ভয় না-খাও আসফাক। অর জোর হইবে না মনত কয়। পানিত না ডুবান আজ।'

মেজ বিবি বলল, 'এলাও কি উয়ার পানিত ভয় আছে?'

ভুলুয়া যে অনেক সময়েই মানুষকে জলের ধারে কিংবা জলার পাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এ তো জানা কথাই। ছোটবিবি আর একবার শিউরে উঠল।

অন্দরের থেকে বেরনোর সময়ে বাড়ির পিছন দিকের পথ ধরল আসফাক। খানিকটা দূরে গিয়েই একটা ঝোরা। জল এখন এত কম যে মার্বেলের গুলির মতো ছোট ছোট পাথরের সবটুকু ডোবে না। দহের কাছে গিয়ে, অবশ্যই, ক্রমশ গভীর। ঝোরার পাশ দিয়ে হেঁটে চলল আসফাক। জলপানের গামছাটার গিঁট দেয়া একপ্রান্ত তার হাতে, অন্য প্রান্ত কাঁধের উপরে। বেশ বড়, আর নতুন গামছাই। আর তা থেকে একটা সুগন্ধ উঠছে। আসফাক ভাবল, ও, এটা তা হলে ছোট-বিবির নিজের ব্যবহার করা গামছা। সে জন্যই এই মিষ্টি গন্ধ। কবে যেন এ-রকম মিষ্টি গন্ধ সে পেয়েছিল।

দহের কাছে ঝোরার ধারে একজায়গায় দু-তিনটি পিঠুলি গাছ। আসফাকের মনে পড়ল জাফর একদিন বলেছিল, বড গাছটাকে খড়ির জন্য কাটলে হয়। আসফাক স্থির করল এবারও যদি জাফরের দু-চারদিন ফিরতে দেরি হয় গাছটাকে সে কেটে দেবে।

কিন্তু তফাৎ দেখ সে-বারে আর এ-বারে। আর এসব কিছুর জন্যই দায়ী সেই হাকিম। হাকিম না এলে, আর সে সকলের সঙ্গে দরবার না করলে এমন হত না।

পিঠুলি গাছটার নিচে একটা পুরনো গোবরের স্তূপ। অনেকটা উঁচু। উপরটা শুখিয়ে কাল হয়ে গিয়েছে। টিপিটার পাশে একটা বড় মোরগ চরছে। প্রকাণ্ড কালচে খয়েরী রঙের, মাথার ঝুঁটি টকটকে লাল। আধা ওড়া আধা ছোটার ভঙ্গিতে সেটা টিপিটার উপরে লাফ দিয়ে উঠল। তারপর পাঁয়তারা করার ভঙ্গিতে একবার ডান একবার বাঁ পা দিয়ে গোবরের শুকনো আবরণটাকে সরাতে লাগল। আর তখন আসফাক তার পায়ের বড় বড় নখগুলোও দেখতে পেল। পুরনো সার সরে যাওয়ায় উপরের স্তরের চাইতে নরম গোবর বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ঠোঁট না নামিয়ে নিজের এই আবিষ্কারের গর্বে গলা ফুলিয়ে মোরগটা কক্ কক্ কক্ করে

ডাকল। ঝপ্ করে একটা শব্দ হল। আসফাক দেখল মোরগটার কাছে একটা মোটাসোটা তার মতোই বড় সাদা মুরগী উড়ে এসে পড়ল। কিন্তু মোরগটা এক ধাক্কা দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিল। সেটা টিপির নিচু দিকে পা দিয়ে গোবরের স্তরটাকে খবলাতে লাগল। মোরগটা তার সেই আবিষ্কারের জায়গার চার পাশে তার বড় বড় নখওয়ালা পা দিয়ে গোবরের শুকনো আবরণটাকে ভাঙতে লাগল। ঝুপ করে আর একটা শব্দ হল। আর একটা মুরগী এসে পড়ল। আর তা দেখে মোরগটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যেন তার গোবরশৃঙ্গ থেকে নেমে পড়ল। যেন তার পুরুষোচিত পরিশ্রমের পথে এরা বাধাস্বরূপ। কিন্তু তা নয়। গোবর আড়াল থেকে আর একটি মুরগী আসছিল সেটিকেই পছন্দ হল তার। সেটার দিকে তেড়ে গেল। আর…

আসফাক টিপিটার পাশ দিয়ে গেল। মোরগটা তাকে গ্রাহ্যও করল না। এখানে ঝোরাটা খানিকটা গভীর। এক হাত জল হবে। আর তা বহতা এবং পরিষ্কারও। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজে নিয়ে আসফাক বসে পড়ল তার জলপানের গামছা নিয়ে।

সে এবার খেতে শুরু করল। খানিকটা খেয়েই জল পিপাসা পেল তার। ঝোরার ধারে গিয়ে গোরুদের জল খাওয়ার ভঙ্গিতে জলে মুখ নামিয়ে জল খেল সে। আবার খেতে বসল সে। গামছাটার সুগন্ধ আবার নাকে গেল তার। হাতে বাঁধা কাল সুতার তাগাটাও চোখে পড়ল। জল খেয়ে মুখটা সরস হয়েছিল। জলপান মুখে সুস্বাদ বোধ হল এবার। ক্ষুধা বোধটা জেগে উঠেছে।

ক্ষুধার তৃপ্তিতে মন যখন ডুবে যাচ্ছে তখন সে ভাবল : তা হলে বিবি-সাহেবরা মেনে নিয়েছে যে তাকে ভুলুয়াই ধরেছিল। আর তা হলে তা সকলকেই মেনে নিতে হবে। জাফরও মানবে।

সে খুঁত খুঁত করে হাসল। তারপর কথাটা তাঁর মনে তৈরি হল। শোধবোধ। 'তা, ব্যাপারি তোমরা থাপ্পড় মারছেন, মুইও দেরি করছুং। তোমরা মরেন নাই। তামাম শুধ।'

গামছার চিড়ার অধিকাংশ শেষ করে, বাকিটুকু জলের উপরে ঢেলে দিল সে। হালকা চিড়াগুলো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে কিছুদূর জলে ভার হয়ে তলিয়ে যাওয়ার আগে। তা, এই সুগন্ধ চিড়াও সকলের জন্য নয়। কমরুন বিবির নিজের ঘরে ছিল। বিবি সাহেবানদের জন্য তৈরি হয়।

খুব তৃপ্তি করে জল খেল আসফাক বোয়ার জলে ঠোঁট লাগিয়ে। তারপর সে জলে পা নামাল। পা দুখানা ভাল করে ধুল। অনেক জায়গায় কাটা ছড়ার দাগ। দু-এক জায়গায় বাদামী বাদামী কাদা সরে যাওয়াতে রক্তের চিহ্ন বেরিয়ে পড়ল। জল লেগে জালা ধরল। এ সেই ঘাস বনে ছোটার চিহ্ন। ধক্ করে উঠল আসফাকের বুক। সত্যাই সেটা ভুলুয়া না কি?

জলে হাত মুখ ধুয়ে নতুন পাওয়া গামছায় মুছে সে এবার বেশ স্পষ্ট করেই বলল, 'মুই অযুধ আনং নাই। তোমরাও মরেন নাই। তামাম শুধ।' সে আপন মনে খুঁত খুঁত করে হাসল।

এখন বেশ ভালই লাগছে। সেই আধভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সুগন্ধ গামছাটা গায়ে জড়িয়ে সে আবার অনির্দিষ্টভাবে হাঁটতে শুরু করল। সুগন্ধ গামছাটার স্পর্শ কেন যেন ছোটবিবির কথা মনে এনে দিল। সুগন্ধ ধারাল এক পরীর মতো ছোট বিবি। আর এ যেন তারই গায়ের গন্ধ।

চমকে উঠে গামছাটাকে গা থেকে খুলল আসফাক। না, না এ গামছা তো ফেরৎ দিতে হবে।

কয়েক পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল আসফাক। বেলা ডুবে যাচ্ছে। রং বদলাচ্ছে চারিদিকে। বনের দিকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো কমে আসছে। এতক্ষণ যেন সে জ্বরের ঘোরে ছিল, এখন জ্বরটা ছাড়ছে—সেজন্য ক্লান্ত বোধ হচ্ছে এখন। না খেয়ে না ঘুমিয়ে শরীরটা টান টান ছিল এখন ভেঙে আসছে। আর তাতেই যেন আরও খারাপ লেগে উঠল।

এখন সে কোথায় যাবে? ঘারিঘরে গিয়ে বসবে, না বলদগুলোকে ঘরে তুলবে? এখন তো তার অনেক কাজ। দেখতে হবে চাউটিয়া এল কি না, রাখালগুলো মোষ নিয়ে ফিরছে কি না। আর সেসব কাজ দেখা শোনা শেষ হলে অন্দরে খোঁজ খবর নিতে শুরু করবে। বাড়িতে আজ জাফর নেই। ছমিরও থাকবে না। একাই তাকে সব দিকে চোখ রেখে ঘুরতে হবে।

সেবারে আর এবারে তফাৎ আছে। তার মনের উপরে যে শক্ত স্তরটা জমেছিল হাকিম সেটাকে খাব্‌লে খা করে দিয়েছে ওই মোরগটার মতো। নিচের নরম কিছু বেরিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগেকার কথা। তা, সাত সাল হবে।

চালার নিচে লুকানো জায়গা থেকে নেমেই আসফাক হাঁটতে শুরু করেছিল। অবশেষে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যে যেখানে উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সব সময়েই চোখে পড়ে। শালের জঙ্গল। তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি জোতজমা। হলুদ ফসল। তারপর আবার সবুজ বন। এমন করে বন আর কৃষকের জমি পর পর। সাধারণত মানুষ দিনে হাঁটে রাত্রিতে বিশ্রাম করে। আসফাক তখন উল্টোটা করছিল। চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় ব্যাপারটা অন্য রকম হল। আগের সন্ধ্যায় পথের পারের একটা জমি থেকে গোটা দুয়েক শশা চুরি করেছিল সে। কিন্তু আজ কি হবে এই ভাবনা নিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোট শাল বন তার সামনে, সেটাকে পার হতে হবে। যদি তার ওপারে কোন খেতে শশা বা ফুটি থাকে। এদিকের খেতে সরষে। কোথাও এতটুকু ছোলা মটরের চাষ নেই যে তা খেয়ে বাঁচা যাবে। থমকে দাঁড়াল সে। অদ্ভুত দৃশ্য তার সম্মুখে। জঙ্গলের মধ্যে নীল নীল আলো। আরও দূরে দপ্ দপ্ করে মেটে মেটে আলো জ্বলছে। তার কাছাকাছি সাদা সাদা কি যেন সব। ভয় আর কৌতূহলের টানে আরও দু-এক পা এগিয়ে গিয়েছিল আসফাক আর তখন সে আবিষ্কার করেছিল বনের অন্ধকার হ'য়ে আসা গাছের ফাঁকগুলোতে আট-দশটা মোষ চরছে। কাছের আলোগুলো মোষের চোখ। আর সেগুলোর পিছনেই পাঁচ-সাতটা তাঁবু। হাত তিনেক উঁচু একটা করে বাঁশের আড়ের উপর দিয়ে একটা করে কাপড় দুদিকে নামিয়ে এনে চারটে খোঁটায় কাপড়ের চার কোণ বাঁধা। সেই তাঁবুর মধ্যে পুরুষ-মেয়ে-শিশু। আগুন জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে। এক জায়গায় সকলে এক সঙ্গে কথা বলছে, যেন ঝগড়া লেগেছে। কিংবা ভয় পেয়েছে। তার একবার মনে হয়েছিল, ওখানে গেলে কি কিছু খেতে পাওয়া যায়। যেন দূর থেকেই খাবারের সুগন্ধ আসছে। হ্যাঁ, নিছক খাদ্যেরই একটা সুগন্ধ আছে, তা পোড়া পোড়া ময়দার তাল হোক্, কিংবা আধফোটা আধপোড়া ভিজে চাল হোক্। কিন্তু যারা নিজেরাই রেগে আছে কিংবা ভয় পেয়েছে তারা উটকো অপরিচিত লোককে খেতে দেয় না। তখন বর্ষা-বাদল ছিল না। বনের মধ্যে ঢুকে একটা গাছতলায় শুয়ে পড়েছিল আসফাক।

এই তাঁবুর বস্তির কাছেই কমরুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। আর

ক্ষুধাই তাকে বস্তির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষা করে কিছু কি পাওয়া যাবে না?

ক্ষুধা সম্বন্ধে সে প্রায় সাত সাল ভুলে আছে, কিন্তু ক্ষুধা সম্বন্ধে জানতে তার বাকি নেই। খেতে যে সব ফসল থাকে তার সব খাওয়া যায় না। ফলের খেত আর কয়টা। মানুষ শুধু ফল খেয়েও বাঁচে না। কঠিন অসুখ করে, আর তখন মনে হয় চুরি করে কাঁচা কাঁচা শুঁটি আর ফল খাওয়ার পাপেই অসুখ। শহরে তৈরি করা খাবার পাওয়া যায়। 'কিন্তুক পাইসা লাগে।' চেয়ে-চিন্তে খাওয়ার জায়গা সেটা নয়। তা হলে আর 'ই মাথায় উ মাথায় সড়কত মানুষ পড়ি থাকে কেনে?' আর তা ছাড়া শহরের পথই তখন সে চিনত না। অন্য কথায়, হয়তো হয়তো, শহরের পথ খুঁজতেই সে এই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। বনে পাখ-পাখলি আছে, খরগোস লাকাড় থাকে। ঝোরায় মাছ থাকে। সে সব ধরতে পারলে খাওয়া যায়। কিন্তু আগুন লাগে, লোহা লাগে। লোহা ছাড়া পাখ-পাখলি ধরা যায় না। খাওয়ার উপযুক্ত করা যায় না। আগুন দিয়ে না ঝলসালে তা মুখেও তোলা যায় না। আর এখন তো সে জানে সব খেত যেমন কারো না কারো, সব বনই তেমন কারো না কারো। ইচ্ছা মতো তুমি বনের পাখ-পাখলিও ধরতে পার না। লুকিয়ে চুরিয়ে মানুষের চোখ এড়িয়ে মাত্র তা করা যায়। আর তখন তার পিছন ফিরে আবার গ্রামের দিকে যাওয়ারও উপায় ছিল না। পথের ধারের অনেক খেত থেকেই সে ফুটি, শসা, ছোলা-মটরের শুঁটি চুরি করেছে। সে সব মাঠের ধারে তার পদচিহ্ন। এখন সে পদচিহ্নর রেখাকেই এড়িয়ে যেতে হবে।

সে সময়কার ক্ষুধার কথা ভাবলে শরীর আনচান করে। আর সেই মোরগের মতো টিপি খাবলান হাকিমই এসব কথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। সেবার যখন জাফর তিনমাস ঝিল না খামারে তখন কিন্তু বেশ একটা মোরগের মতোই ঝুঁটি ফুলিয়ে বেড়াত আসফাক।

ক্ষুধাই ফিরিয়ে এনেছিল তাকে সেই তাঁবুর বস্তির কাছে।

একটু চমকে উঠল আসফাক। আধরশি দূরে পথের ধারের ঝোপটার আড়াল থেকে প্রকাণ্ড শিংওয়ালা একটা প্রকাণ্ড মাথা বেরুচ্ছে। না, ওটা আর কিছু নয়। মোষ ফিরছে বাথানের দিকে। তাঁর হিসাব মতো সকলের আগে চাউটিয়ার গল্পের সেই মর্দা মোষটাই। আসফাক অনুভব করল এবার তার ওঠা দরকার। রাখালরা বাথানে ঠিক ঠাক সব কটাকে

ঢোকানো কিনা তা দেখা দরকার। বলদগুলো বাঁধা আছে সেগুলোকে ঘরে আনা দরকার। সেবার এ সব ব্যাপারে সে উৎসাহিত ছিল। এবার—

সেই মোরগটা—ওটা কিন্তু জাফরুল্লার মতোই বরং। নতুন মুরগী দেখা মাত্র। চার বিবি জাফরুল্লার।

এসব ডিঙিয়ে তার মন আরও অনেক দূরে চলে গেল। যেন বনের মধ্যে যেখানে কালো আর লালচে আলো তার মধ্যেও তার চোখ আছে।

আসফাক লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল তাঁবু খুলে নিয়ে লোকগুলো কোথাও যাওয়ার যোগাড় করছে। একটা করে তাঁবু ওঠে আর মোষের পিঠে তাঁবু আর অন্যান্য সরঞ্জাম চাপিয়ে দুজন প্রাণীর একটা করে দল রওনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব তাঁবু উঠে গেল, সব পরিবারই রওনা হয়ে গেল। আর তখনই সে দেখতে পেল, খানিকটা দূরে একটা মোষ তখনও বাঁধা। অন্য সব মোষ যেমন করে বাধা ছিল, একটা পা লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর একটা ঝোপের আড়ালে অন্য তাঁবুগুলো যেখানে ছিল তার থেকে কিছুদূরে একটা তাঁবু যেন, অন্য তাঁবুগুলোর মতোই পুরানো, খানিকটা ছেঁড়া ছেঁড়া। আশ্চর্য, ভুলে গেল নাকি এটাকে নিতে?

ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে তাঁবুটার কাছাকাছি গিয়ে আসফাক চমকে উঠল। সেই তাঁবু ছিল কামরুন আর তার স্বামীর। স্বামীর বসন্ত। কিছুক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয়েছে। এসব আসফাক পরে জেনেছিল। সে তখন দেখল তাঁবুর নিচে মাটিতে একটা চটের বিছানায় এক পুরুষের মৃতদেহ, সারা গায়ে ঘা আর ফোস্কা। সে-সময়ের কথা সব মনে আসে না। যেমন আসফাক মনে করতে পারে না কেন সে না-পালিয়ে কমরুনের কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছু খেতে পাওয়ার আশা নিশ্চয়ই ছিল না। অনেকক্ষণ সে নিজের চিবুকে হাত দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। কমরুন কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে নাক ঝেড়ে আর একবার কাঁদতে শুরু করার আগে আসফাককে দেখতে পেল।

তারপর কবর দেয়া হয়েছিল কমরুনের স্বামীকে। একটা সুবিধা জুটে গিয়েছিল। কাছেই একটা ঝোরা। বর্ষার শেষে নাতিগভীর সেই ঝোরাটার কাঁকর-পাথর মিশান মাটির পাড় ঘেঁষে মাছ ধরার জন্য কেউ গর্ত করে থাকবে। সেই গর্তে তার চটের বিছানা সমেত মৃতদেহটাকে রেখে চারিদিক থেকে পাথরকুচি মিশান বালি-মাটি অঁাজলা অঁাজলা তুলে এনে গর্তটাকে বুজিয়ে দেয়া হয়েছিল। এদিক ওদিক থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে

এনে আসফাক যখন সেই গর্তটার উপরে রাখছিল, তখন বালিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল আবার কমরুন। আসফাক কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সেই ঝোরার প্রায় শুখিয়ে আসা খাদে নেমে গিয়েছিল, কারণ গর্তটার মধ্যে ঝোরার জলের সংযোগ আটকান পাথরগুলোর একটাকে সরাতে গিয়ে সে যা দেখেছে তা যদি সাপের মাথা না হয়ে থাকে তবে সেটা প্রকাণ্ড একটা চ্যাং মাছ। মাছের সন্ধানে প্রায় আধঘন্টা কাটল আসফাকের। সেখানে তো ঝোরাটা একটা নদী হয়ে উঠেছে। নদীটার মাঝখানে জল। তাতে স্রোতও আছে, কোথাও বড় বড় পাথরও, অন্য কোথাও পাথুরে মাটির চরা। সেই চরার কোন কোন জায়গা নিচু, সেখানে মাটি ভিজে ভিজে, জলও দু-এক আঙুল কোথাও। এইসব জায়গায় কুচকুচে কাল সাপের মতো চেহারার কুচলা মাছ থাকে গর্ত করে। সারা গায়ে কাদা মেখে আধ-হাত পৌনে এক-হাত কয়েকটা চ্যাং, গজার, একটা হাত দেড়েক লম্বা কুচলা মাছ ধরে ঘন্টাখানেক পরে আসফাক তাঁবুর দিকে ফিরল। তার একটা কথাই মনে ছিল, এখন আগুন দরকার। মাছগুলো রান্না করতে পারলে ভালো ছিল, আর তা না হলে অন্তত পোড়াতে তো হবে। আর আগুন এই মেয়েমানুষটার কাছে থাকতে পারে।

সে তাঁবুর অবস্থানে পৌঁছে দেখল কমরুন তাঁবু খুলছে। আসফাক এখন বুঝতে পারে তখন কমরুনকে আগুনের কথা বলা, মাছপোড়ানর কথা বলা খুব বোকামি হয়েছিল। কমরুন বলেছিল, মড়া ছোঁয়ার পর স্নান না করে কেউ খায় না। বিশেষ করে সেই বসন্তের মড়া। তারপর তাঁবুতে যা কিছু ছিল, বেত বাঁশের দুটি ডুপড়ি, সরু সরু বাঁশের কয়েকটা লাঠি, খানকয়েক শাড়ি, লুঙি, এমনকি তাঁবুর কাপড়, তাঁবু খাটানোর বাঁশ সব না ধুয়ে বাউদিয়ারা খায় না। কমরুনও খাবে না। তখনই আসফাক জেনেছিল, যাকে কবর দেয়া হল সে কমরুনের স্বামী। তার বসন্ত হয়েছিল। কমরুন গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল। কাল বিকেলে খারাপ হতে শুরু করে। সন্ধ্যায় জানাজানি হয়। তাদের দলের অন্য লোকেরা বলেছিল কমরুন ইচ্ছা করলে তাঁবু আর মোষ নিয়ে তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে। এখানে সকলে মরবে। তারপর আজ ভোর হতে না হতে সকলে চলে গিয়েছে। যে লোকটা মরছে তাকে ফেলে কমরুন কি করে যাবে? এখন সে দেখছে

তারা যাওয়ার সময়ে তার তাঁবুর মূল্যবান জিনিস কিছু কিছু নিয়ে গিয়েছে।

খাওয়াটা অত সহজ ব্যাপার নয়। সে মাছগুলো সেদিন খাওয়া হয় নি। কমরুন তার তাঁবুর সব কিছু নদীর জলের ধারে নিয়ে এক এক করে ধুতে শুরু করল। এক ফাঁকে আসফাককে বলল, 'তোমরাও গাও ধোয়া করেন।'

আসফাকের মনে ততক্ষণে এই অজানা রোগের আতঙ্ক এসেছিল। সে ঝোরায় স্নান করতে নেমেছিল।

খাওয়ার ব্যাপারটা সোজা নয়। কমরুনই বরং কতগুলো সরু সরু বাঁশের টুকরো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার আগে। আসফাককে দূরে থাকতে বলে সে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে গিয়েছিল। বক সাবধানি শিকারী কিন্তু বকের চাইতেও সাবধানী কমরুন একটা বাঁশের টুকরোয় আর একটাকে লাগিয়ে সরু লম্বা একটা নল তৈরি করে তাই গাছের উপরে বসা একটা বককে ঠুকে দিয়েছিল। সেই বকটাকে পুড়িয়ে খেয়েছিল কমরুন, আর আসফাককেও দিয়েছিল খেতে।

কমরুন বলেছিল সে রাতটা নাকি খুব ভয়ের। তাঁবু ধোয়া হলেও তাঁবুতে থাকা যাবে না। কমরুন বনে কোথাও গিয়ে ঘুমাবে। আসফাকের অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে বাধা কোথায়?

মৃত সম্বন্ধে একটা ভয় মানুষ মাত্রেরই আছে। আসফাক বনে ঢুকে দেখেছিল মোষটা সারা দিনে ধারে-কাছের সব ঘাস খেয়ে ফেলেছে। সে সেটার দড়ি খুলে নিয়ে একটা ঝোপের পাশে বেঁধে দিল। সে জানত এই ঝোপের পাতা খেতে মোষরা ভালবাসে। সে মোষের কাছাকাছি শুয়ে পড়েছিল। বনে পোশা মোষ মস্ত সহায়। জন্তু জানোয়ারের আসা যাওয়া বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে পারে। সে ঘুমানোর আগে একবার ভেবেছিল কমরুনের কথা। মোষটা কমরুনের। সে রাত কাটাতে কোথায় বা আশ্রয় পেল।

কমরুনের স্বামীকে কবর দেয়ার পরের দিন যা ঘটেছিল তার মতো আশ্চর্য ব্যাপার আর-কিছু নেই। প্রথম ঘুমের পর আসফাক একবার উঠেছিল। অন্যদিন যে রকম হয় না তেমন একটা ভয় ভয় করছিল। শালগাছের ফাঁক দিয়ে আবছা এক রকমের আলো। তাতে গাছপালার আকার

বোঝা যায়, চেনা যায় না। সে দেখেছিল ঘোষটা একটা বাঁকড়া গাছের তলায় কয়েক হাত দূরে শুয়ে আছে। সে উঠে গিয়ে ঘোষটার কাছাকাছি তার পিঠ ঘেঁষে শুয়েছিল। ভোর রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে সে চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণ থেকেই তার ঘুমটা হালকা হয়ে এসেছিল। এতক্ষণ সে অনুভব করছিল ঘোষের গা-ই তার গায়ে লাগছে। বুকের কাছে হাত দিয়ে চমকে উঠে বসল। কারণ তার হাতে যা লেগেছে তা হয় মানুষের মাথা কিংবা অন্য কোন জন্তুর পশম ঢাকা শরীর। সে ভোর ভোর আলোতে দেখতে পেয়েছিল তার আর ঘোষটার পিঠের মধ্যে যে হাতখানেক ফাঁক সেখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছে কমরুন। তা, সেদিন কমরুনের ঘুম তখন খুবই গভীর ছিল বলতে হবে। আসফাকের চমকানি, ওঠাবসা, নড়াচড়া কিছু টের পেল না। শোক-তাপ, হয়তো কয়েকদিনের না ঘুমান, উদ্বেগের শাস্তি এসবই তাকে সেদিন নেশার মতো বিবশ করেছিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ভোরে উঠে দেখল আসফাক কোথায় বাইদানী কোথায় তার ঘোষ! যে জায়গায় ভিজে তাঁবুটা বাঁশের ঝাড়ে টাঙিয়ে দিয়েছিল শুকাতে, যে জায়গায় বকটাকে পুড়িয়ে ছিল নদীর ধারের সেই উঁচু পাড়টায় দুই হাঁটুর উপরে হাত দিয়ে ঘের তৈরি করে তার মধ্যে আসফাকের মাথা গুঁজে বসে থাকাও তার তুলনায় কিছু আশ্চর্য নয়। খুব ভোর থাকতে উঠেই তা হলে কমরুন রওনা হয়ে গিয়েছে।

কি ভেবে আসফাক ঝোরার পাড় দিয়ে হেঁটে চলল। তাকে কি কমরুনকে খুঁজতে যাওয়া বলা চলে?

নদীর ধারে ধারে এক প্রহর চলে কমরুনের বাঁশের টুকরোকটিকে দেখতে পেল আসফাক। তার পাশে দুটো ডাহুক দড়িতে বাঁধা। একটা তখনো নড়ছে। কিছু দূরে বনের ধারে পিঠের দুপাশে বোঝা ঝোলান ঘোষটাকেও দেখা গেল। সেটা গলা বাড়িয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। কিন্তু কমরুন কোথায়?

অবশেষে তাকে দেখা গেল। একটা বড় পাথরের আড়ালে শাড়ি পাথরে রেখে সে স্নান করছে। পাহাড়ী নদী, ঝোরা বলা চলে না আর। স্বচ্ছ জল, স্নানের উপযুক্তই বটে, নদীর আসল স্রোত নয়, বরং তির তির করে স্রোত চলছে এমন একটা বাঁক, কিন্তু গভীরতা এক হাঁটুর বেশি নয়। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখবে কমরুন তার উপায় নেই।

কমরুন স্নান করে উঠে এসে আসফাককে দেখে হেসে ফেলেছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাহুক দুটোকে পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছিল। কমরুন এতক্ষণ কি সেলাই করছিল। এখন শুয়ে পড়েছে তাঁবুর ছায়ায়। দুপুরে এখন আর কি কাজ ?

বিস্ময়ের মতো শোনালেও জন্মদরিদ্র আসফাক সেই প্রথম এক স্বপ্ন দেখেছিল। নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের সমান্তরাল সরল রেখার মতো গাছের গুঁড়ি, তার কোলে হাল্কা নীল নদীর জল। সেই নদী যেখানে সবুজে নীলে মিশান, কখনও বা মোষ রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়ে মানুষের শরীর। তা এখন শাড়ীতে ঢাকা আছে বটে। কিন্তু কি এক সর্বগ্রাসী মাধুর্য কমরুনের মুখে, তার কপালে, একটু খোলা ঠোঁটদুটিতে, নীল মীনা করা পিতলের নাকফুলে, আধবোঁজা চোখ দুটিতে, যার কোণে হাসি জড়ান মনে হয়। কেমন যেন অদ্ভুত শক্তিশালী টানে টানতে থাকে মানুষকে। আসফাক এখনও ভেবে পায় না কি করে তেমন সাহস হয়েছিল তার।

কমরুন তাকে চড থাপ্পড় কিছু মেরে থাকবে। কিন্তু সেই প্রথম আসফাক তার সেই রোগা রোগা আঠার-উনিশ বছরের বুকে দারুণ সাহস আর শক্তি পেয়েছিল। তাঁবুর দরজার কাছে বসে, তার একটা চোখে তখন সে কম দেখছে, নাক দিয়ে কিছু গডাচ্ছে ভেবে হাত দিয়ে দেখেছিল রক্ত। কিন্তু তখন তাঁর যে ভয় হয়েছিল তা এই যে সে কমরুনকে মেরে ফেলে নি তো ?

কিছু পরে যে কেউ তার নাম ডাকছে শুনে অবাক হয়েছিল। কমরুন বলেছিল, 'পানি ধর, মুখ ধও, নাকত রক্ত দেখং।' তখন আসফাকের মনে হয়েছিল কমরুন মিটমিট করে হাসছে। না ঠোঁটে নয়, চোখের মধ্যে হাসি।

এরপর মোষের পিঠে তাঁবু চড়িয়ে কমরুন একদিন হাঁটতে শুরু করেছিল। পিছন পিছন আসফাক। দু-তিন দিনে দলটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। কমরুন জানত সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাবে দলটা।

দলকে পাওয়া সহজ নয়। সেই গহন বনের মধ্যে তারা কোথায় গিয়েছে মোষগুলো তাড়াতে তাড়াতে কে বলে দিতে পারে ? বিশেষ করে

যে দলের কোন গন্তব্যস্থল নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু যারা কেবল চলেই বেড়ায়। আসাম বলে নাকি এক দেশ আছে। তার উত্তর-পূব কোণ থেকে বছরখানেক আগে রওনা হয়েছে পাহাড় আর তার কোল-ঘেঁষা বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হয়তো চেনা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এরা চলে যাবে। বন থাকলেই হল। সন্ধ্যায় যেখানে মানুষের চোখে পড়ে না এমন জায়গায় তাঁবু ফেলে সারা দিনের সংগ্রহ আগুনে ঝলসে খেয়ে রাত কাটত আসফাক আর কমরুনের। সকালে তাঁবু গুটিয়ে মোষের পিঠে তুলে দিয়ে হাঁটা আর হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে চোখ রাখা বনমোরগ, তিতির, ডাহুক, বক, মেটে আলু, চৈ, চ্যাং, শাটি, কুচলা, গজার সংগ্রহ করার দিকে। মেটে আলুর লতা দেখে আসফাক একবার প্রায় দশ সের আলু সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ঝালের জন্য চৈ খুঁজে বার করতে কমরুনই পেরেছিল। কমরুন শুধু বয়সে বড় নয়, (কমরুনের তখন এক কুড়ি পাঁচ-ছয়, আর আসফাকের এক কুড়ি হয় নি) অনেক বিষয়েই আসফাকের তুলনায় অভিজ্ঞ। পাখি শিকার, সেই মাংসকে খাদ্যে পরিণত করা, এমনকি লোহা আর পাথর ঠুকে আগুন জ্বালান, মাছ মাংস না পুড়িয়ে তাকে সুস্বাদ করা সেই আগুনে, কলাগাছের ডোঙা পুড়িয়ে ছাই তৈরি করে নুনের অভাব আর চৈ দিয়ে ঝালের অভাব পূরণ করার—সব বুদ্ধিই কমরুনের। একদিন আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল বনে তারা ভাত, রুটি এসব খায় কিনা, খেলে কোথায় পায়। তা থেকে সে এই দলটার জীবনযাত্রার পদ্ধতি আর খানিকটা জানতে পেরেছিল। এরা লুকিয়ে-চুরিয়ে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে, বছরে কোন কোন সময়ে এদের মোষ এত দুধ দেয় যে তখন তা থেকে মাখন তৈরি করে, ধনেশ পাখি পেলে তার চর্বি সংগ্রহ করে রাখে, বনে অনেক সময়ে হরিতকি, বহেড়া ইত্যাদি ফল সংগ্রহ করে, প্রতি বছরই কয়েকটা করে মোষের বাচ্চা বিক্রি করে—এসবে টাকা হয়, সেই টাকা থেকে চাল, আটা, কাপড় কেনা হয়। এসব ব্যাপারে দলের যে কর্তা সেই সর্বেসর্বা। তার কথা সকলকেই মেনে চলতে হয়। কারণ সে দলের ইতিহাস জানে, পশ্চিমা ভাষায় কথা বলতে পারে, অসম্ভব সাহস তার, সে কখনও ঠকে না, বরং বনের কোলঘেঁষা কোন গ্রামের হাটে কি বিক্রি করা যাবে কি কেনা যাবে তা যেমন জানে তেমন জানে কোন অসুখে কোন লতা-পাতা লাগে। সে শুধু বসন্তের ওষুধ জানে না। হাঁা তাকে দলের স্বার্থে নির্দয় হতে হয়। যাকে বসন্ত ধরে ফেলেছে তাকে তার মুখেই ছেড়ে দেওয়া

উচিত। এ তো বাঘ নয় যে মোষ সাজিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে হাঁড়ি হাঁড়া পিটিয়ে চিৎকার করে মোষের বাচ্চাকে বাঁচান যাবে।

তখন বনের পথে চলা মাসদুয়েক হয়ে গিয়েছে। শীতটা পড়ে যেতে শুরু করেছে। বনে ঘাসের মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কোন কোন গাছে নতুন পাতা, কোন কোন গাছে ফুলের কুঁড়ি। বনে পাখীর সাড়া বেশি পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় শুকিয়ে ওঠা এক ছোট ঝোরার কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত শুখনো জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছে কমরুন। এখন এ কাজে আসফাক তাকে সাহায্য করতে শিখেছে। সেদিন মোষটাকে তাঁবুর কাছাকাছি বেঁধে রেখে মাছের খোঁজে বেরিয়েছিল দুজনে। মাছ পাওয়ার আগে একটা মোটা-সোটা তিতির পড়েছিল কমরুনের কাঠিতে। পরে ঝোরার কাদা খুঁচিয়ে দু-দুটো কুচলা মাছ। এত বড়, ধরার পরেও এমন কিলবিল করছিল তারা যে মনে হবে ছোবল কাটতে পারে। তিতির রাতের জন্য থাকবে ঠিক করে, মাছ দুটোকে পাকাতে বসেছিল কমরুন। ছুরির লম্বা টানে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চিরে ভিতরের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে ঝোরার দিকে গেল কমরুন। জল দিয়ে না ধুয়ে বরং শুখনো শুখনো এঁটেল কাদা দিয়ে মাছ দুটোকে এমন করে লেপে দিল যে সে দুটো যেন মাটির তৈরি লতা। তারপর পাথরে লোহা ঠুকে শুকনো ঘাসে আগুন জেলে সে দুটোকে আগুনে ফেলে দিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে আগুন নিবে গেলে সে দুটোকে বার করে টোকা দিয়ে দিয়ে পোড়া মাটি ভেঙে ধোঁয়া-ওঠা গরম গোলাপী মাংস নতুন শালপাতায় রেখে কমরুন আসফাককে খেতে দিয়েছিল। সুস্বাদু সেই মাছ খাওয়া হলে তারা ঝোরায় গিয়েছিল জল খেতে। ঝোরায় না নেমে জলের উপরে ফুঁ দিয়ে ভেসে আসা পাতাটাকে সরিয়ে পশুর কায়দায় জল খেয়েছিল।

তারপর বিশ্রামের সময়।

তখন আসফাক বোকার মতো বলেছিল এখানে চিরজীবন থাকলে চলে কি না। কমরুন মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, দুজনে দল হয় না, আসফাক। আসফাক, তার পক্ষে যতদূর তা সম্ভব, তেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিল, কমরুনের অনেক বাচ্চা হলে দলটা ক্রমশ বাড়বে। তখন কমরুন বলেছিল, তা হলেও মোষ কোথায়? এই বুড়ী মোষের আর বাচ্চা হবে না। কি বিক্রী করবে যে কাপড় শাড়ী কিনবে, চাল, নুন, আটা কিনবে। তুমি কি বনের মোষ ধরতে জান? তাদের দলের কর্তা যেমন মোষের ডাক ডেকে বনে চরা অন্যের

বাথানের মোষকে বিপথে নিয়ে ধরে ফেলে তাও কি আসফাক পারে? না, এসব কিছুই সম্ভব নয়। আসফাক কি দু-তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে যে, দলকে শোনপুরের মেলায় নিয়ে যাবে, আসফাক কি পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে দল নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভাগতে পারে। আসফাক সে সবের পক্ষে একেবারেই বাচ্চা, কমরুনের চাইতেও ছ-সাত সালের ছোট। আসফাক নিজের অযোগ্যতার এই তালিকা শুনে মলিনমুখে বনের দিকে চেয়ে বসেছিল। কমরুন শুকনো নরম সবুজ ঘাসে শুয়ে একটু হেসে আসফাককে নিজের স্তনে টেনে নিয়েছিল।

কমরুনই বা কি করবে? দলের সন্ধান পাওয়া গেলে আসফাক তার সঙ্গে থাকত কি না ভেবে লাভ নেই। হয়তো থাকত। এদিকের বনের ক্ষণস্থায়ী বসন্ত শেষ হয়ে প্রবল বর্ষা নেমে গেল। এ বর্ষা বাউদিয়ার কাছে ভয়ের ব্যাপার। তাঁবু খাটানোর মতো শুকনো মাটি পাওয়া যায় না। খাটালেও তাঁবুতে জল মানে না। পাখিরা পালায়। তিনচারদিন চলে যায় একটা শিকার ধরতে। নদী ঝোরা ফেঁপে ফুলে প্রতি পদে পথ আটকায়। সে জলে মাছ ধরাও যায় না। বরং সে জল পেটে গেলে সেই ভয়ঙ্কর আমাশা ধরে যার ওষুধই হয় না। এই বন থেকে এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হবে। গতবারের বর্ষার সময় বনের বাইরে এক রেল ইস্টিশনের পাশে বটতলায় তাঁবু ফেলে থেকেছিল বাউদিয়ারা। চারটে মোষ বিক্রি করে দলের খাওয়া পরা চালিয়েছিল দলের কর্তা কাণ্ডু বর্মন। ভাগাও কাজ করে। ভাগা না হলে আসফাকই কি কমরুনের দেখা পেত। কমরুনের মতো যোগাযোগ অবিরত ঘটছে, তুমি সেটাকে কাজে লাগাবে কি না-লাগাবে সেটা তোমার বুদ্ধি।

মোষের নতুন গোবর দেখে এ দিকে একদল মোষ গিয়েছে এই আশা নিয়ে তারা যেদিকে রওয়ানা হয়েছিল সেটা যে মহিষকুড়ার পথ তা তারা জানত না। মহিষকুড়া বলে যে একটা গ্রাম থাকতে পারে তাই বা জানবে কি করে? অন্য একটা ব্যাপারও ঘটল। মোষটা যে বুড়ী তা কমরুনের কাছেই শুনেছিল আসফাক। তার চোখের একটা মণিও সাদা হয়ে গিয়েছিল বয়সের জন্য। ইদানিং সারা গায়ের হাড় চোখে পড়ত। বোধহয় সব দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ায় নরম ঘাস ছাড়া কিছু খেতে পারত না। কিন্তু সে যে এমন বার্ধক্য তা বোঝা যায় নি। একদিন সেটা কাদার মধ্যে বসে পড়ল। দেখ মোষ বলে কথা, এক হাঁটু কাদাতেই আটকে গেল। দু-দিন

ধরে মোষের তত্ত্বির চলল। গাছ-গাছড়ার দাওয়াই কমরুন যা জানত সব প্রয়োগ করা হলো। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে দেখা গেল শেয়াল খেতে আরম্ভ করেছে।

সেই কমরুন এখন জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। তা বুদ্ধি আছে জাফরুল্লার। এখানে আসার মাসখানেক পর থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। যদিও আসফাক তখন তা ধরতে পারে নি। কবেই বা সে ঠিক সময়ে ধরতে পারে। তখন সে একবেলা খাওয়া আর দিন একটাকা কিংবা একসের চালের বদলে ঘাস নিড়াচ্ছে জাফরের জমিতে। কমরুনও কাজ করে জাফরুল্লার অন্দরে। দু-বেলা নাকি পেটপুরে খায়। আর ইতিমধ্যে দুখানা আধা-পুরানো শাড়িও পেয়েছে। তা, ভাবল আসফাক, জাফরুল্লার হাসি নাকি কমরুনের দলের সেই কর্তা কান্টু বর্মনের মতো। তেমন করেই প্রায় কামিয়ে ফেলা হেঁড়ে মাথা। হঠাৎ একসন্ধ্যা থেকে কমরুন আর এল না। তারপর সেই দারুণ বর্ষায়, জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা।

কিন্তু, আসফাক নিজের অবস্থিতিটা বুঝবার জন্য এদিক ওদিক চাইল, কিন্তু—পিছন দিকে জাফরুল্লার বাড়ি চোখে পড়ল। এখান থেকে পশ্চিম দিকে সেই পিঠুলি গাছ, আর তার কিছু দূরে ঝোরা। সেখানে আকাশ এখন লাল হয়ে উঠছে। চোখ মিটমিট করল সে। যেন দেখতে চায় না। আসফাককে এখন কেউ দেখলে বলত লোকটা হাঁপাচ্ছে। চোয়ালটা অবশ হয়ে গিয়েছে নাকি? মুখটা হাঁ করা। সেবার, সেই তিন মাস আগে, জাফরুল্লা যখন বাড়ি ছিল না—কিন্তু তফাৎ আছে···সেই সেবার যখন জাফরুল্লাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল—

তখন একদিন বলদ আনতে গিয়েছিল আসফাক দহের ধারে। যখন সে বলদগুলোকে খোঁটা উপড়ে ছেড়ে দিয়েছে কেউ যেন মৃদুস্বরে ডেকেছিল, আসফাক, ও আসফাক। বাতাসটায় জোর ছিল, শব্দটা ঠিক এল না। এরকম সময়েই, তখন বোধহয় দিন বড় ছিল। সেজন্য আলোটা একটু কম লাল। কিন্তু রোদ পড়ে গিয়েছিল। একবার সে মাথা তুলে শুনতে পেল কে যেন 'কুই' করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বাতাসটা আরও জোরে উঠে পড়েছিল। পথের পাশে বড় বড় ঘাস। সেগুলো

বাতাসের তোড়ে ছপ ছপ করে গায়ে লাগছে। আসফাক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল। পাক খাওয়া এই ঝড়ো বাতাস শেষ পর্যন্ত ঝড় হয়ে উঠবে কি না তা বোঝার চেষ্টা করল। এমন সময়ে বাতাসে ভেসে আসা কি একটা তার গায়ে পড়ল। সেটা গড়িয়ে পায়ের কাছে পড়লে আসফাক দেখল টোপা কুল। সে বিস্মিত হল। এদিকে টোপাকুলের গাছ কোথায়? দহের ওপারে একটা আছে বটে। ওপারের টোপাকুল এপারে এসে পড়বে এত জোর বাতাসে? কাজেই সে ওপারের দিকে তাকাল। আর তখন সে দেখতে পেল, দহের গলার কাছে যে সাঁকো তার উপরে সাঁকোটা অর্ধেক পার হয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে কমরুন। বাতাসে তার চুল উড়ছে, মাথার কাপড় খসে গিয়েছে। পায়ের কাছে এলোমেলো কাপড়ের ঢেউ ওঠানামা করছে। আঁচলে টোপা কুল। আঁচল সামলে, শাড়ী সামলে সে আর এগোতে পারছে না। নিচের দহের জল আথাল-পাথাল।

'ও আসফাক, আসফাক।'

'কি?'

'নামায়ে দাও।'

কমরুন, জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি কমরুন।

তিন সাল আগে তখন আসফাকের বয়স এক কুড়ি পার হয়েছে। কমরুনের এক কুড়ি দশ হয়তো, তা হলে কমরুনকে সে মাথায় ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আসফাক এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। আর তখন ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কোলে ওঠে তেমন করে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে সেই টালমাটাল বাঁশের সাঁকো থেকে নামল কমরুন। কেমন যেন লজ্জা পেয়ে হাসল। সাঁকো থেকে নেমেছে তখন, পায়ে মাটি ছুঁলেও কিন্তু কমরুন দু-হাতে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। একবার সে মুখ তুলল, আসফাকের মুখটা দেখল, তার পরে আসফাকের কাঁধের উপরেই মুখ রাখল। যেন তখনও সাঁকোটা পার হচ্ছে।

তারপর মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল সে আসফাকের মুখোমুখি। বাতাস আর এক পাক খেলে গেল। খানিকটা ধুলো উড়িয়েও গেল। বাতাসের জন্যই যেন কমরুনের পদক্ষেপগুলো অসমান হচ্ছে। কয়েক পা গিয়ে পথের ধারে বড় বড় ঘাসগুলো যেখানে বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে সেখানে

শুয়ে পড়ল কমরুন, যেন হঠাৎ পড়ে গেল। বাতাস যেমন শব্দ করছে তেমন রিন্ রিন্ করে হাসল সে।

আসফাক বলল, 'পড়ি গেইছ?'

কমরুন হাসল। তার চোখ দুটো, যাতে সুর্মার টান ছিল ঝিকমিক করল। মুখটা গাঢ় রঙের দেখাল। আসফাক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। আর তখন ধনুকের ছিলার মতো উঠে পড়ল কমরুন। হাসল। দৌড়ে পালাল। আসফাক তার গোড়ালির কাছে রুপোর বেঁকি মলের ঝলকানি দেখতে পেল। হয়, হয়, ঠিক-এ তো, তখন আসফাক এক সুগন্ধ পেয়েছিল, যে সুগন্ধ আজ ছোটবিবির গামছায়।

কমরুনের তেমন করা ভাল হয় নি। বিশেষ যখন জাফরুল্লা বিদেশে। তা ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। সেই বাতাসের মতোই আসফাকের রক্তে কি একটা চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। তাতে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। তার চাপে কি হয়? সব নিষেধ সব বাধা ভেঙে মানুষকে একটা দিশেহারা শক্তিতে পরিণত করে। কিংবা কেউ যেন দারুণভাবে টানে, সেই টান আর বাধার টানে দম ফেটে যায়। চোখের সম্মুখে অন্ধকার হয়ে যায় আর সে অন্ধকার যেন রক্তের মধ্যে উথাল পাথাল করে। দহের জল যেমন লাফাচ্ছিল তখন।

এক মুহূর্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল আসফাক। আশ্চর্য, এই সুগন্ধটা কিন্তু সেদিন ধরতে পারে নি আসফাক। হাঁ, এরকম অবাক সে আগেও হয়েছে। তখনই কি বলেছিল কথাটা কমরুন, নাকি সেদিনই রাতে? কমরুন বলেছিল: 'আ, আসফাক ব্যাপারির এক গাবতান ভৈষী ধরি না-পলান কেনে?' এত বোঝাই যাচ্ছে সেটা বর্তমানের অনুরোধ ছিল না। তারও চার মাস আগে আসফাক যা করতে পারে নি সেজন্য অনুযোগ। কমরুন জাফরুল্লার বিবি হওয়ার আগে আসফাক খেত নিড়ান শেষ করার পর মোষ চরাত তখন। তখন যদি সে একটা গাবতান ভৈষী নিয়ে পালাতে পারত তাহলে হয়তো সে আর কমরুন হারান দলটাকে খুঁজে বার করার জন্য আবার বনের পথে চলে যেতে পারত। নতুবা সেই গর্ভবতী ভৈষীর সাহায্যে নিজেরাই একটা দল তৈরি করে নিতে পারত।

ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল। নিজের চিন্তায় সে এত দূরে চলে গিয়েছিল যে বাইরে মন দিতেই তার মনে হল একটা কালপাখি যেন তার

মাথা ছুঁয়ে নেমে এল দুই ডানা নেড়ে। কফকনের সেই বুড়ী বোষ্টার দিকে যেমন শকুন নেমেছিল।

সে চমকে উঠল। গা শিরশির করে উঠল। হাতের সেই তাগা চোখে পড়ল না। হাতড়িয়ে দেখল আছে কিনা। সে যেন অন্ধকারের মধ্যে হেসে উঠবে নিজের এই ভয় লক্ষ্য করে। কিন্তু হঠাৎ তার একটা সন্দেহ হল, ওরা কি সকলে ভুল বলছে? তেমন একটা ব্যাপার হয় নি সেই ঘাস বনে? তার কি মনে আছে কেন তেমন হয়েছিল?

চাকররা সারাদিন কাজ করে, সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই তাদের খেতে দেয়ার নিয়ম। তারা খেয়ে যার যার বাড়িতে যাবে। আজও কিছুক্ষণের মধ্যে ছমির এসে খেতে ডাকল আসফাককে। কিন্তু সে নিজে এখানে খাবে না। খাবার নিয়ে বাড়ি যাবে। সে কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিল।

ছোটবিবি এ-বেলাতে খাবার ঘরের মালিক। কথা সে কার সঙ্গেই বলে না। আসফাক আর তার মত যারা তারা বারান্দায় উঠে বসতেই নুরী এসে ভাত দিয়ে যেতে লাগল সানকি করে। তা চাকর রাখাল ধরে সাত আটজন হবে। ছোটবিবি কখনও সামনে আসে না এ সময়ে। নুরী তদ্বির করছে আজ।

খাওয়া যখন মাঝামাঝি হঠাৎ দমাদম পা ফেলে রসুই ঘরে এল মেজবিবি। তার পায়ের মল ঝম ঝম করে বাজল। ভারি শরীর ভারি পায়ের চাল। তা, আসফাকরা জানে দু-কুড়ি বয়স হল তার। তার ভাব দেখেই বোঝা যায় এবার কিছু হবে। চাকররাও এ ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল। মাঝে মাঝে যা হয়। ঘরের মধ্যে কথাগুলো চাপা গলায় হচ্ছে কিন্তু অন্যদিনের মতো বাইরে থেকেও কানে যাচ্ছে। ছোটবিবির দিকে মেজবিবি যদি তেমন করে ছুটে আসে বুঝতে হবে ঝগড়া হবেই। এ ঝগড়ায় কেউই বা দৃকপাত করে এখন? আসফাকের কিন্তু কানে গেল কথাগুলো। আর তখন তার অনুভব হল সবই ঠিক আগের মতোই। মাঝখানে তার ওষুধ আনতে দেরি করে ফেলার ব্যাপারটা। আর তাও এর মধ্যে লোকে ভুলে যেতে শুরু করেছে। এখন খেতে বসে সে বিষয়ে একটা কথাও কেউ বলছে না।

অন্ধকারে পা ছড়িয়ে বসল আসফাক। সব চাকরই বাড়ি চলে গিয়েছে। রাখাল ছোকরা কজন আজ খারিঘরের বারান্দায় ঘুমাবে। আসফাক

আরাম করে বসে ছিলিম ধরাল আবার। সবই ঠিক যেন আগেকার মতো। মাঝখানে হাকিম সাহেবের পাগলামি। কি? না, মানুষের দুঃখ দেখতে এসেছে। জমি জিরাৎ হাজিয়া নিয়ে কোন অন্যায় নাকি থাকবে না।

যাক এখন তো সব মিটে গেল। দু-দিনের মাথায় পেটে ভাত পড়েছে। শরীর মনকে পরোয়া না করে স্নিগ্ধ হতে চাইছে, বাইরে স্নিগ্ধ অন্ধকারের সঙ্গে মিলে যেতে চাইছে। ছিলিম ঢেলে সে উঠে দাঁড়াল। যেন রোজকার মতো এখন সে তার বলদের ঘরে শুতে যাবে। যেন সে কৌতুকবোধও করতে পারবে। বিবিদের ঝগড়ার কথা মনে হল। সে হাসল মিটমিট করে।

মেজবিবি বলল, 'শরীক কন্ পা দাবাবার।'

'এদিকেও আনাজ কোটা যায়।'

'মানষির তো বাধাবিষ হবার পায়।'

'বাব্বা। এক আইত ঘরত নাই তাও এও গায়ে বিষ।'

'সে বিষ তোমার।'

'হয় তো হয়। নছিব করা লাগে।'

'অও দেমাক না-দেখাইস। নছিব। তাও যদি খ্যামতা থাকিল হয়।'

'খ্যামতা?'

'না তো কি? কমরুনক লাগে কেনে? মুই আর বড়বিবি নাই তো পতিত থাকলং। তুই পতিত কেনে সোহাগী?'

আসফাক ভাবল 'তা এটা এক মজাক দেখং।' বলদের ঘরে এসে সে দাঁড়াল আগরের পাশে। আর একটু ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগলে হয়। সে ভাবল, এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, বড়বিবি মেজবিবি ছোটবিবি সবাই নিঃসন্তান। বড়বিবি এসেছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আর ছোটবিবির বছর দশেক হল আসা হয়েছে। এর মধ্যে তিনবিবির কারও সন্তান হয় নি। কামরুন বিবি নিকার আট-দশ মাসের মধ্যে সন্তান দিয়েছে ব্যাপারিকে। কিন্তু বাড়ির গুণ বোধহয়, সাত সাল আগে মুস্রাফ। কিন্তু তারপরে কমরুনও দ্বিতীয় সন্তান দেয় নি ব্যাপারিকে।

এত বড় বাইরের চত্বরে এখন কিন্তু আর আলো নেই। ভারিঘর, মোষের বাথান, পোয়ালের পুঁজ, গুদামের ঘর সব এক-একটা কালো কালো আকার মাত্র অন্ধকারে। একেবারে আলো নেই তা নয়। ধানমাড়াই-এর

নিকান চত্বরে বসে তামাক খেয়ে সে ছিলিম ভেলেছিল। বাতাসে সেই চত্বরের উপর দিয়ে সে আগুনের লাল লাল ছোট গুলি গড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে। না, ওতে আগুন লাগে না। যেটা গড়াচ্ছে একটু ফুলকি ছড়িয়েই নিবে যাচ্ছে।

একটা লম্বা শ্বাস ফেলে আসফাক অন্ধকারকে বলল, তো, ব্যাপারি। তোমরা থাপ্পড় মারছেন, দুশ বিঘা ভুঁই দিছেন, মুইও চাষ দে' নাই। মুই ওষুধ আনং নাই তোমরাও না-মরেন। তামাম শুধ।

কিন্তু এখন কি তার শোয়া হবে? তার মনে পড়ল কিছু কাজ তার বাকি আছে। জাফরুল্লা বলেছিল বটে কয়েকদিনের মধ্যে তামাক বাঁধার চটি বাঁশ লাগবে। সোজা নয় প্রয়োজনটা। দু-তিনটে আস্ত বাঁশকে চটি করতে হবে। তাও আবার মাপ মতো হওয়া চাই—লম্বায় পোন হাত, চওড়ায় দুই সুত, আর পাতলা কাগজের মতো। কাঁচা বাঁশ কেটে টুকরো করা আছে। এটা তারই কাজ। গতবার যখন ব্যাপারি ছিল না তখন থেকেই সে এ কাজটা নিজে থেকে গুছিয়ে রাখে। এখনও দু ঘণ্টা কাজ করা যায় অন্দর থেকে টেমি চেয়ে এনে।

আসফাক খুঁত খুঁত করে হাসল। অন্ধকারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আজ থাউক, কালি করা যাইবে। ইহাকও তোমার শোধ-বোধের হিসাবত ধরি নেন, ব্যাপারি।

সে ভাবল, শোধ-বোধ যখন চলই তখন সেই হিসাব শেষ করার আগে এইসব ছোটখাট অবহেলা ও অমনোযোগও ধরে নিও। যেমন এই বাঁশের চটি না তোলা, যেমন গরু-মোষ ঠিকঠাক উঠল কিনা তা না দেখা, যেমন না-ঘুমিয়ে সারারাত উঠে উঠে তোমার অন্দর পাহারা না-দেয়া।

কোন কোন রাতে ঘুম সহজ হয় না। যেমন ধর অন্ধকারকে অন্ধকার মাত্র মনে না হয়ে অন্য কিছু মনে হতে থাকে। আসফাক স্থির করল একটা কাজ তাকে করতেই হবে। গোটা দু-এক মশাল তৈরি করে রাখা দরকার। যদি কোন বিপদ হয় রাতে আর যদি সে সাড়া দেয়ই তা হলে মশাল ছাড়া চলবে না। বাঁশের আগাল, কাটারি, পাট এই ঘরেই আছে। তেল আর দেশলাই যোগাড় করতে হবে।

একটা টেমি না হলে কি করা যাবে? উঠে দাঁড়িয়ে সে অন্দরের দিকে গেল। বড়বিবির ঘরেই থাকে তেল। কিন্তু ভেতর থেকে খুব মৃদু ফুসির

শব্দ পাওয়া গেলেও ঘরের দরজা বন্ধ। ওদিকের ঘরটায় আলোর ইশারা। মেজবিবির গলার সাড়া পাওয়া গেল।

'কে? কায়?'

'আসফাক।'

'কি চাও।'

'না। একনা টেমি।'

'ছোটবিবির দুয়ারত দেখ।'

ছোটবিবির দুয়োরে টেমি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু লজ্জাও পেতে হল। মেজবিবির ঘরের জানলা খোলা ছিল। আর সেই খোলা জানলা দিয়ে সে মেজবিবির বিছানায় নুরী ঝিকেও দেখতে পেল। নুরী হয়তো মেয়েমানুষই, যদি তাকে এখন আরও বেশি মাদী মোষের মতো মনে হচ্ছে। মেজবিবির হয়তো সারা গায়ে বিষ, কিন্তু আবরু থাকা দরকার।

ছোটবিবির ঘরে আলোটা জোরদার ছিল।

'কায়?'

'আসফাক।'

'রইস।'

ফিসফিস করে এই বলে ছোটবিবি উঠে এসে দরজা খুলল। আর চোখে ধাঁধা লাগল আসফাকের।

ছোটবিবি গলা নামিয়ে বলল, 'বইসেক। তোর গল্প শোনং।'

'কে?'

'ঠিক করি ক। পরী ধরছিল তোক।'

আসফাক লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল।

একেই তো পরী বলে বোধ হয়। তা, পরীর মতোই দেখায় বটে ছোটবিবিকে, শালবাড়ির জঙ্গলে তাকে পরী নাই ধরে থাক। ছোটবিবি রাতের ঘুমের জন্য তৈরি হয়েছিল। পরনে একটা পাতলা শাড়ি আলগা করে পরা। জলে ভিজলে যেমন হতে পারে কোথাও কোথাও গায়ের রং আর বাঁক চোখে পড়ছে। চোখের কি জেল্লা! নাক-ফুল আর কান-ফুলের কাচগুলোর চাইতে সুর্মার টানের মধ্যে বসান চোখের মণি-দুটো বেশি ঝকঝকে।

এই সময়েই মেজবিবির জানলায় চোখ পড়েছিল আবার আসফাকের।

আর তা লক্ষ্য করে ছোটবিবি অদ্ভুত এক স্বরে বলেছিল, 'উয়ার গায়ত বিষ ধরে। উদিক না দেখিস।'

তারপর সে আরও অদ্ভুতভাবে গলা নামিয়ে এনে বলল, 'আইসেক, খানেক গল্প করং।'

আসফাকের মনে হল এরকম নামিয়ে আনা স্বর যেন কোথাও সে শুনেছে। সে বলল, 'তেল, টেমি আর শালাই লাগে।'

ছোট বিবি কান পেতে শুনলো। সে যেন আসফাকের এই অদ্ভুত প্রয়োজনের কথা শুনেই জোরে জোরে হাসল। আর সেই হাসিতে নিজেকে সামলে নিল।

সে গলা তুলে বলল : 'রইস, দেং।'

তেল, টেমি, দেশলাই এনে দিল ছোটবিবি।

আসফাক নিজের ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে দেখল ছোট বিবি দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবছে। গা শির শির করে উঠল তার। বনের মধ্যে ভুলুয়া ধরলে এমন কাউকে দেখে নাকি কেউ কেউ। আর তখন তার দিকে না এগিয়ে উপায় থাকে না সে পথভ্রষ্ট হক, আর বিপথভ্রষ্ট হক। কিন্তু রসুই ঘরের ঝগড়াটাও মনে হলো তার। দশ সাল হয় এই রূপসী ছোট বিবি জাফরুল্লার ঘরে। অথচ এই পঁচিশ-ছাব্বিশে এসেও সে এখনও পতিত। 'ছাওয়া পোওয়া' কিছু হয় নি।

নিজের ঘরে ফিরে আসফাক বাঁশের আগালে, কেরোসিন তেল ভরে, তাতে পাটের পলতে ডুবিয়ে দুটো মশাল তৈরি করে রাখল। আলো দেখলে খারাপ মানুষ, বনুয়া জানোয়ার কিছুটা ভয় পাবেই।

শেষ মশালটা তৈরি করতে করতে তার মনে হলো তিন বিবির খবর পেলাম, কমরুনকে দেখা গেল না। সে তো সত্যিই ব্যাপারির সঙ্গে যায় নি।

টেমিটায় তেল নেই। মিটমিট করছে। রাত্রির অন্ধকারটাও গভীর হয়ে আসছে। বাঁশের চটি তুলতে তুলতে অন্ধকারের দিকে চাইছিল আসফাক। চারিদিক সুমসাম হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বলদদের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে, আর নিজের হাতের কাটারি বাঁশের উপরে যে মৃদু শব্দ করছে।

তখনও কিন্তু এমনই সুমসাম হয়ে যেত এই খামার বাড়ি। শুধু ব্যাপারি

এবার তাকে দেখাশোনা করতে বলে যায় নি। তা হোক। কেমন একটা আলসেমি লাগছে। এবার সে শুতে যাবে। এই টুকরোটা শেষ হলেই হয়।

হঠাৎ সে থামল আর টৌমর মিটমিটে আলোতে নিজেকে দেখে অবাক হয়ে গেল। দেখ কাণ্ড? সে না বলেছিল এসব কাজ না করে কালকের জন্য ফেলে রাখবে। বাঁশ আর কাটারি সরিয়ে রাখল সে। উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল। চিবুকে হাত রাখল। কি যেন একটা মনে আসছে ঠিক ধরতে পারছে না কি সেটা।

সেবারও এমন অন্দর বাড়ি সুমসাম হয়ে যেত আর সারা রাতে প্রহরে প্রহরে উঠে সে অন্দরের বন্ধ দরজার সামনে সামনে ঘুরে তদ্বির তদারক করত।

এবারেও তা সে করেছে একবার। কিন্তু কমরুন বিবিকে আজ সে দেখে নি। খবর নেয়া দরকার। ওরা যেমন বেহিসাবী—বিবিরা দরজা-টরজা ঠিকঠাক দিল কি না তা দেখবার জন্য অন্দরের দিকে পা বাড়াল আসফাক। কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ যেমন একটা আলসেমি লেগেছিল কাজ করতে করতে তেমন কিছু অনুভব করল সে আবার। তারপর গা শির শির করতে শুরু করল। গলার কাছে কি একটা দলার মতো ঠেলে উঠল। আবার তার মনে পড়ল সেবারও এমন নিঃসঙ্গ ছিল ব্যাপারির বাড়ি। সে অন্দরের দিকে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সে অনুভব করল, দেখ, এ ব্যাপারটাও সে আগে বুঝতে পারে নি অন্য সব ব্যাপারের মতোই। ভাব তো কতদিন দেখা হয় না কমরুনের সঙ্গে। সেবারের সেই সাঁকোর কাছে কথা হওয়ার পর আর কথাও হয় নি। অন্য বিবিদের তদারক না করে সে সোজা কমরুনের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখন তার রক্ত চলাৎ চলাৎ করে গলায় ধাক্কা মারছে।

'কমরুন, কমরুন, ঘুমোও? ওঠ।' ফিসফিস করল আসফাক।

কমরুন তখনও ঘুমায় নি। ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে বসে কি একটা সেলাই করছে।

ডাক শুনে কমরুন সেলাই নামাল হাত থেকে। উঠে এল জানলার কাছে।

'কায়? সব্বোনাশ! আসফাক?' কমরুনের মুখ একেবাঁরে রক্তহীন হয়ে গেল।

সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ব্যাপারি ঘরত নাই।'

'জানং।'

'রাইত নিশুতি।'

'জানং।'

'তো?' কমরুন যেন হাঁপাচ্ছে, আর তার দমকে তার মুখে একবার রক্ত আসছে আবার সরে যাচ্ছে।

যন্ত্রচালিতের মতো কমরুন দরজা খুলে দিল। তা করে সে কয়েক পা পিছিয়ে ভয় ভয় মুখে ঘরের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

'আসফাক!' কমরুন কি বলবে খুঁজে পেল না।

আসফাক বলল, 'কুমর, কি খুবসুরত তোক দেখায়।'

কমরুন বলল, 'রাগ খাইস না আসফাক। মুই খানেক ভাবি নেং। তুই কেনে আসলু, আসফাক কেনে আসলু। তোক ঠিক-এ ভুলুয়া ধরছে।'

কথাগুলো বলতে থরথর করে কেঁপে উঠল কমরুন।

আসফাক কমরুনের দিকে চেয়ে রইল। হলদে সাদায় ডুরি একটা খাটো শাড়ি পরনে তার। গলায় একেবারে নতুন একটা রুপোর চিকহার কমান লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। কমরুন যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে তার সুদৃশ্য বিছানা। মশারিটা তোলা। সাদা ধবধবে বিছানায় দু একটা মাত্র কোঁচকান দাগ। আর কমরুনের এক কুড়ির উপরে দশ পার হওয়া কিছু তার মুখকে আলো করে নীল কাচের নাকফুল। ওটা সোনা না হয়ে যায় না।

'কেন, কমরুন?'

'কি আসফাক?'

আসফাক কথা খুঁজে পেল না।

কমরুন বলল, 'কেন আসলু আসফাক এই রাইতত।'

আসফাক হাসল। বলল, 'দেখেক কুমর, এলা মুই শিয়ানা হইছং। তোর মাথা ছাড়ি উঁচা।'

'জানং।'

'তো।'

যেন তার দম আটকে আসছে এমন করে চাপা গলায় বলল কমরুন, 'আসছিস, আজ রাইত থাকি যা। কিন্তুক মোর গাও ছুঁয়্যা কথা কর আর তুই আসবু না।'

কমরুন কি কেঁদে ফেলবে—এমন ভয় হল আসফাকের। কি ওঠা নামা করছে সেই স্তন দুটি।

হঠাৎ আসফাক বলে বসল, 'ঠিক-এ তো। মুই যাং। তুই কেমন আছ কুমর তাই দেখির বাদে আসছং।'

'তুই রাগ না-করিস, আসফাক, রাগ না-খাইস।'

'না। রাগ কি!'

দরজার কাছে ফিরে গেল আসফাক। কমরুন এগিয়ে এল দরজা দিতে। আসফাক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুয়ার দেও কমরুন বিবি।'

কমরুনের ঘরের ডোয়া ঘুরে বাইরে যাওয়ার পথ। সে পথে যেতে যেতে কমরুনের জানলা। চোখ তুলল আসফাক। সে দেখল ইতিমধ্যে কমরুন জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে দেখল কমরুনের গালে কি চক চক করছে, তাতে চক্‌চকে নাকফুলটা জল লেগে আরও চক্‌চকে। তার মধ্যে হাসল কমরুন। অসম্ভব রকমে মিষ্টি সেই হাসি। আসফাক দাঁড়িয়ে পড়ল। কমরুন দু' হাতে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল, এখন একটা হাত শিক গলিয়ে লম্বা করে দিয়ে আসফাকের মাথায় রাখল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলা যায় না। আসফাক সরে জানলার গোড়ায় গেল আর তার ফলে কমরুনের আঙুলগুলো আসফাকের চুলের মধ্যে খেলা করতে পারল। কমরুন এবার হাসল, সেই হাসির মধ্যে বলল, 'তোক ভুলুয়া ধরছে আসফাক। ঠিক-এ। তুই কেনে হাকিমক নালিশ জানালু ব্যাপারির বাদে?'

'তো।'

'আচ্ছা এলা যা।'

আসফাক রওয়ানা হয়েছিল কমরুন আবার ডাকল। একেবারে গলা নামিয়ে দারুণ গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, 'মুন্নাফ'।

'মুন্নাফ!'

'মুন্নাফ—।'

'হ্যাঁ মুন্নাফ, তার পাছৎ কি?'

'শোনেক।'

তারপর ফিসফিস করে কমরুন যা বলেছিল তার অর্থ এই হয় যে সে মুন্নাফকে শিখিয়ে দিয়েছে যতদিন কমরুন বাঁচবে সে আসফাককে মিঞা সাহেব বলে ডাকবে।

'হাঁ, তাই কয়।' বলে আসফাক চলে এসেছিল।

নিচের শোবার মাচাটায় বসে তার যে অনুভূতি হল কথায় দাঁড় করালে তার অর্থ হয়, এ কমরুন সে কমরুন নয়। দেখেছ তো তার পোশাক, তার গহনা, তার সুস্বাস্থ্যে ডাগর হয়ে ওঠা শরীর, তার ঘর-তার বিছানা। তখন সেই তাঁবুর নিচে ছেঁড়া শাড়ি পরা কমরুন, রোগা রোগা পঁচিশ-ছাব্বিশের কমরুন এত সুন্দর ছিল না। না, না। সুন্দর ছিল বৈকি। ছেঁড়া ময়লা কাপড় ফেলে রেখেছে এমন সদ্যস্নাত দুজনের অনাহার কৃশ কিন্তু নীরোগ অবয়বে সৌন্দর্য নিশ্চয়ই থাকে। বনের গভীরে সেই তাঁবুর নিচে নতুন সংগ্রহ করা সেই ঘাসের উপরে নিশ্চয়ই তেমন কমরুনও সুন্দর ছিল।

কোন কোন কথা আছে উচ্চারণের সময়ে তার যতটা অর্থবোধ হয় পরে সেটাকে গভীরতর মনে হতে থাকে। মিঞা সাহেবই বলে মুম্নাফ। কিন্তু আজ রাত্রিতে ঠিক ওভাবে বলল কেন কথাটা কমরুন। ওদিকে দেখ এখন কমরুনের কথাবার্তা কেমন বিবি সাহেবদের মতোই।

এই কথাটাই ভাবল আসফাক কিছুক্ষণ। বিবিসাহেবাদের মতো হয়ে গিয়েছে কমরুন। এও একরকমের সৌন্দর্য। কিন্তু বনে একদিন হরিণ-হরিণী দেখেছিল তারা। মসৃণ উজ্জ্বল রং আর কি হাল্কা সুঠাম চেহারা। কমরুনকে সে রকম দেখাত স্নান করে উঠলে সেই সব গাছের ছায়ায় ঢাকা অল্প আলোর ঝোরার ধারে—এখনও কি তেমন দেখায়?

তো, বিবিসাহেবা কমরুনও বলেছিল তাকে ভুলুয়া ধরেছে। এখন কি সে সব ব্যাপারটা ভেবে দেখবে? হঠাৎ মনে হল ভুলুয়াই ঠিক। আর এই মনে হওয়ার ফলে তার হৃৎপিণ্ড গরম হলো, ধক্ ধক্ করতে লাগল। নতুবা কেন সে হঠাৎ মনে করেছিল সে নিজেই একটা মর্দা মোষ হয়ে গিয়েছে? মর্দা মোষের মতো ডাক দিতে দিতে বনবাদাড় ভেঙে ছুটেছিল সে। ভুলুয়া না হলে কি তেমন হয়? তখন খুব ফুর্তি লাগছিল, রক্তের চাপে হাত পায়ের শিরা ফেটে যাচ্ছিল যেন। মাচায় শুয়ে সে ভাবল, কমরুন বলেছিল তাদের বাউরিয়াদলের কর্তা মোষের মতো ডাকতে পারত। আর তার সেই আঁ-আ-ড ডাক শুনে অন্য বাথানের মাদী মোষ, বাচ্চা মোষ, এমন কি বুনো মোষের বাচ্চাও তাদের দলের কাছে আসত। আর কখনও কখনও তাদের গলায় দড়ি দিয়ে সরে পড়ত তাদের দল।

তা, দেখ কমরুন, আসফাক মনে মনে বলল যেন, এখনও জাফরুল্লার বাথানে গর্ভবতী মোষ আছে। সে রকম একটাকে পেলে ধীরে ধীরে

একটা মোষের দল গড়ে তোলা যায় বটে। আর তাহলে সেই মোষের দলকে অবলম্বন করে দুটো মানুষ থেকে ক্রমশ এক ঝাঁক বাউদিয়ার এক দলও হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা তুমি তখন বল নি। বললে তিন সাল বাদে। তখন, যখন বুড়ি মোষটা মরল, আর আমরা মহিষকুড়ার খামারে, আর বৃষ্টিবাদলে বন ভিজে গিয়েছে, আর জাফরুল্লার মধ্যে তুমি তোমার পুরনো দলপতিকে খুঁজে পেয়েছিলে, বোধহয় আমিও ভেবেছিলাম এটাই ঠিক হল।

আসফাকের বাইরের অন্ধকার আর মনের অন্ধকার যেন একই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানিতে চিড় খেল। আর সেই চিড় খাওয়া ফাটল দিয়ে বিবিদের ঝগড়ার কথাগুলো ভেসে উঠল। মেজবিবির সঙ্গে ছোটবিবির ঝগড়া। ঝগড়াটা ঠিক নয়। ঝগড়ায় সংবাদ ছিল। ছোটবিবি, মেজবিবি, বড়বিবি, এমন কি মুন্নাফের পর থেকে কমরুনবিবিও পতিত থাকে কেন?

আর তা যদি হয়? সে জন্যই কি মুন্নাফ তার নাম ধরে ডাকে না। আর কমরুন তাকে শিখিয়ে দিয়েছে সম্মান করতে।

অদ্ভুত কথা তো। ভারি অদ্ভুত কথা। এ ছাড়া কোন কথাই আসফাকের মন তৈরি করতে পারল না। কমরুন কি বুঝেছিল সে বর্ষায় ক্রমশ তার বিপদ বাড়বে, যে বিপদে তখনকার সেই এক কুড়িতে না-পৌঁছান আসফাক থৈ পেত না। বরং বুড়ো হেঁড়ে মাথা একবুক দাড়ি জাফরকে ভরসা করা যায়? আর চালাক, চাড়-চাল্লাক জাফরও কি কমরুনের অবস্থা ধরতে পেরেছিল। অদ্ভুত কথা তো। আসফাক অনেকদূর থেকে ভেসে আসা কমরুনের কথা শুনতে পেল। এখন মনে হচ্ছে কথাটা দামী। তখন নিজের মনের দুঃখে দামই দেয় নি সে। কমরুন বলেছিল বোধহয়, 'এ ভালই হয়।'

আসফাকের মনে কথা তৈরি হচ্ছে না। আর কথা তৈরি না হলে চিন্তাও করা যায় না।

ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল আসফাকের। ধড়মড় করে সে উঠে বসল। তার আদৌ ভালো ঘুম হয় নি। একবার তার মনে হয়েছিল হাঁক মারতে মারতে একটা কালো মোষ এসে দাঁড়িয়েছে ছাবিঘরের সামনে। ছাবিঘরের চাল ছেয়ে এত উঁচু, আর আগুনের মালসার মতো চোখ। আর তখন সে যেন নতুন এঁড়ে মোষের মতো ভয়ে ভয়ে এই ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। সেটা কি স্বপ্ন? না চোখেও দেখেছিল সে?

সজাগ হল আসফাক। এখন দিনের আলোই চারিদিকে। এটা সেই বলদের ঘরই। ঘুম ভাঙতে খুব দেরি হয়েছে তার। এমন আলো ফোটার আগেই বলদ ছেড়ে দেয়ার কথা।

তা, কমরুন, ভাবল আসফাক, আসল কথা বাথানে গাবতান ঘোষ থাকতে পারে কিন্তু বন কোথায় আর? চাউটিয়া যা বলে বড়বিবি যা বলে তা মানাই ভালো। এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কি? এখন বোঝা যাচ্ছে গাবতান ঘোষ আর গাবতান কুমরকে নিয়ে বনে গিয়েও কিছু হত না।

বলদগুলোকে এক এক করে খুলে দিল আসফাক। বলদের ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বার করে শুনল অনেক লোক কথা বলছে, হাঁক ডাক উঠেছে। একজন কে তার নাম ধরে ডাকল।

ঠিক যেন জাফরুল্লাই, তেমন কর্কশ করে কেউ তাকে ডাকছে। মাচার উপরে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সকালের দিকে বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল তার। এই হাঁক ডাক, ডাকাডাকিতেই তার ঘুম ভেঙেছে। অনেক বেলা হয়ে গেলে চাকররা যেমন করে তেমন করে চোখ ডলতে ডলতে সে বলদঘরের দরজার কাছে এল।

কিন্তু জাফরুল্লা নয়। মুন্নাফ ডাকছে। তাকে খুঁজছে বোধহয় অন্য চাকরদের মধ্যে। না পেয়ে এদিকে আসছে। বেলা একটু হয়েছে। কিন্তু যতটা আশঙ্কা করেছিল তা নয়।

মুন্নাফ বলল, 'উঠছো আসফাক?'

'উঠলাম। কখন আইসলেন তোমরা।' আসফাক বিবর্ণ মুখে হাসল।

'ভোর-রাইতত।'

'কেন, শহর থাকি রাইতত রওনা দিছিলেন? অন্ধকারের পথ তো!'

'লরিত আসলাম। তা দেখ নাই? আব্বাজান লরি কিনছে একখান। তারই বাদে শহরত গেইছং।'

'অ।'

'এখন থাকি গরুগাড়িত তামাক পাট যাইবে না বন্দরত। লরিত যাবে। কি ভকং ভকং হরন্, আর কও বড়্ বড়্ চাকা। ড্রাইবারও আসছে।'

'অ। তা, মুন্নাফ—'

'শোন, তোমাক এক কথা কই, আসফাক। বলদ এড়ে দ্যাও। আব্বাজানের ঘুম ভাঙার আগত বলদ ধরি দুরত যান। আম্মা কয়া দিছে।'

বলদের পিছনে বেরিয়ে যেতে যেতে পেইনটি লাঠি হাতে নিল আসফাক, গামছাটা কাঁধে ফেলল।

মুন্নাফ দরজার কাছ থেকে কিছু দূরে সরে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডেকে বলল, 'শোন, আসফাক, আর এক কথা কই।'

আসফাক এগিয়ে গেল। তার বুকের মধ্যে কি একটা ধক্‌ধক্‌ করছে, উথাল পাথাল করছে। জাফরুল্লা এসে গেছে, জাফরুল্লা এসে গেছে। নাকি এটা আবার সে ভুলুয়ার হাতে পড়ার অবস্থা হতে চলেছে। কেমন যেন জটিল লাগছে নিজের মনকে তার। আর মুন্নাফের সুন্দর মুখটাকে দেখ।

'আম্মা কইছে।' মুন্নাফ বলল, 'আব্বাজান খাওয়া-লওয়া করি শুতি না গেইলে তুমি বাড়িত আসবা না।'

আসফাকের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। একটু ইতস্তত করল সে। কথাটা কি ভাবে আরম্ভ করা যায় তা খুঁজতে দেরি হল।

'কেন, মুন্নাফ তোমরা মোক আর মিঞাসাহেব না কন ?'

মুন্নাফের মুখে লজ্জার মতো কিছু একটা দেখা দিল। 'না, আব্বা কয় চাকরক তা কওয়া লাগে না।'

ঠিক এমন সময়ে কে যেন ডাকল—'আসফাক।'

কে যেন কয়। চিনতে কি ভুল হয় ? এই বজ্রগর্জনের মতো স্বর। খোলা জানলায় মেহেদিরঙান দাড়ির খানিকটা দেখা গেল।

আসফাক বারিঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল, দৌড়ে চলার মতো হাত পা নেড়ে। বজ্রটা কাটল না। হাসির মতো লাগল শুনতে, 'আকাশের চেহারা ভাল নোয়ায়, আসফাক। বলদক দূরত না-নিস। কেই বলদ।'

আকাশের দিকে তাকাল আসফাক। আকাশে কালো মেঘ নেই। দিনের আলোয় যে আকাশ ঝক্‌ঝক্‌ করে তাও নয়। এমন ঘোলা আকাশ সে কোনদিনই দেখে নি।

বারিঘরের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বাপ্পু! বলল সে মনে মনে। আর অবাক হয়ে থেমে গেল। চাকর, আধিয়ার, গ্রামের মানুষদের

ভিড়ের মধ্যে সে এক প্রকাণ্ড গাড়ি। মানুষের কাঁধ সমান উঁচু উঁচু চাকা। কুচকুচে কাল রং।

চিবুকে হাত দিয়ে সে ভাবল এটাকেই কি তা হলে সে বুনো মর্দা মোষ ভেবেছিল রাত্রিতে। নাকি স্বপ্নই ছিল সেটা।

আসফাক অবশ্যই জানত না ঘুমের ঘোরে দেখা বস্তু স্বপ্নে অন্য রূপ নিতে পারে যদি চিন্তার যোগ থাকে।

সে বলদের পিছনে যেতে যেতে মন্তব্য করল, 'বাব্বা ইয়ার সাথত কাঁউ পারে।'

সে বলতে চায় এই কলের মোষের সঙ্গে কোনো মোষেরই লড়াই-এ জেতার ক্ষমতা হবে না। সে যত দেখল তত অবাক হয়ে গেল।

অনেক বেলায় সে খামারমুখো হল। পথে দেখা হল সাত্তারের সঙ্গে, সে স্নান করে খেতে যাবে বলে খামারে চলেছে। আসফাক জিজ্ঞাসা করল, 'এও দেরি?'

সাত্তার বলল, শহর থেকে সেই ভোটবাবু পার্টির লোকরা ফিরছে অনেক। খুব খাওয়া-দাওয়া ধুম-ধাড়েক্কা। রাত্তিরেই হরিণ মারছে একটা।

'কেন, সাত্তার?'

'তোমরা শোন নাই? ব্যাপারি পঞ্চায়েত পিধান হইছে।'

সাত্তার চলে গেল।

আসফাক ট্রাকটার সামনে দাঁড়াল। লেল্যাণ্ডের ট্রাক। চারিদিকেই একমানুষ দেয়াল তোলা। সে জন্যই সাধারণ ট্রাকের দ্বিগুণ দেখায়। কাছারিঘরে অনেক লোকের ভিড়। কিন্তু এপাশে দাঁড়ালে চোখে পড়বে না বোধহয়—এই ভেবে ট্রাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ভয়ে ভয়ে ট্রাকটার গায়ে একবার হাত ছোঁয়াল।

পঞ্চায়েত পিধান কথাটা তার অজানা নয়। ভোটবাবুরা, এমন কি সেই হাকিমও আশ্বাস দিয়েছিল এই নির্বাচন হলে গ্রামে আর জমিজিরাৎ নিয়ে অন্যায় থাকবে না।

আসফাক ট্রাকের আড়ালে হেসে ফেলবে যেন। দেখ কাণ্ড সেই জাফরই হল পঞ্চায়েত পিধান যার নামে সে হাকিমকে নালিশ করতে গিয়েছিল।

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়।

এতক্ষণে কি জাফর স্নান আহার শেষ করে ইচ্ছা মতো বিবির ঘরে ঘুমিয়েছে? আসফাককে তো স্নান আহার করতে হবে।

কেননা, এতো বোঝা যাচ্ছে সব বনই কারো না কারো যেমন সব জমিই কারো না কারো। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তুমি বুনা ষাঁড় মোষ হতে পার, কিন্তু বন আর বনের নয়, তাও অন্য একজনের।

আর, এই কথাটাই মনে পড়েছে আসফাকের বলদগুলোকে খোঁটায় বাঁধতে—সেই যে এক সাহেব গল্প করেছিল, কুচবিহার শহরে এক রাজা শেষ বাইশন মোষটাকে গুলি করে মেরেছে। তারপর আর বুনো মর্দা মোষ কারো চোখে পড়ে নি। এদিকে বুনো মোষ নিশ্চিহ্ন।

এত বোঝাই যাচ্ছে শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছা মতো বনে চরতে আর কোনদিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইশন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে।

বর্ণভেদের চারিত্র নির্ণয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

এদেশের সামাজিক কাঠামো—বিশেষ তার বর্ণভিত্তিক শ্রম-বিভাগ-নির্ভর গ্রাম-সমাজ (Village community) কতখানি ঘাতসহ ছিল—তার বিষয়ে নানা প্রশংসাবাক্য আমরা শুনেছি—চার্লস মেটকাফের কথাগুলি তো বহুল উদ্ধৃত। কিন্তু সেই 'রিজিড' সামাজিক কাঠামো এবং আবদ্ধ (closed) সমাজ যে উনবিংশ শতাব্দীতেই উন্মুক্ত (open) সমাজের দু-একটি লক্ষণকে স্বীকার করে নিচ্ছিল—এটাও ধীরে ধীরে আমাদের চোখে পড়তে শুরু করেছে। আবদ্ধ সমাজ ও উন্মুক্ত সমাজের মৌল পার্থক্যটি এই সূত্রে একটু মনে করে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে। আবদ্ধ সমাজে সামাজিক স্তরন্যাসে বর্ণ, শ্রেণী, ক্ষমতার কোনো হেরফের হয় না। উন্মুক্ত সামাজিক বিন্যাসে তারা একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে সমন্বিত হতে পারে। প্রথাগত ভাগে ধরা যাক বর্ণ, শ্রেণী, ক্ষমতা—এই তিনভাগই কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সেই স্তরন্যাসে বর্ণ—J_1, J_2, J_3···; শ্রেণী—C_1, C_2, C_3···; ক্ষমতা—P_1, P_2, P_3···এইভাবে বিভক্ত। আবদ্ধ সামাজিক স্তরন্যাসে J_1, C_1, P_1-এর কোনো নড়চড় হবে না। যেমন হবে না J_2, C_2, P_2-এর, বা J_3, C_3, P_3-র। উন্মুক্ত সামাজিক স্তরন্যাসে এই সমন্বয় ভেঙে যেতে

পারে। তা হতে পারে—$J_1C_2P_1$ বা $J_2C_1P_2$। অথবা 'Y' বা 'Z'-এর মতো আরেকটা নতুন স্তরও উদ্ভূত হতে পারে। সাধারণত (ব্যতিক্রমের উদাহরণ অবশ্যই আছে) উচ্চবর্ণের প্রবীণ ব্যক্তিরা ক্ষমতা, ভূসম্পত্তি এবং বর্ণাভিজাত্যের সুবিধা একই সঙ্গে ভোগ করে এসেছেন[১]। বলা যায় উনবিংশ শতকে শহর অঞ্চলে তো বটেই গ্রামেও এই সামাজিক কাঠামোয় ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে। ফলপ্রসূ না হলেও।

তারাপ্রসাদ মুখার্জির 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এর প্রবন্ধে[২] বলা হয়েছিল, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন ইংরেজ। মনে করি বর্ণীয়, শ্রেণীগত, ক্ষমতাগত ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করতে আমরা কত নারাজ ছিলাম একথা তারই সাক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যাপারটি লক্ষ করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণীয় আভিজাত্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যে একস্তরে কেন্দ্রীভূত ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ভূমিকায় ('বিজ্ঞাপন') বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, ঐ বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ তিনি তাঁর লেখা 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে প্রবন্ধ থেকে নিয়েছেন। এই কথা তিনি ঐ দুই পরিচ্ছেদে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতবর্ষে আধুনিক সামাজিক বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্যের ফলই শুধু নয়, বর্ণবৈষম্যের ফলও বটে। এই বিষয়টি তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে, বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিতে নতুন কালে কেমন নতুন সমালোচনার উপাদান এসে জমছে। 'আর এক প্রকারের বড়লোক আছে। গোপালঠাকুর 'কন্যাভারগ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত' বলিয়া দুই-চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড়লোক। কেননা, গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শূদ্র, যত বড়লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র আরো দেখেছিলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র জজ হতে পারেন, ব্রাহ্মণের অপরাধের বিচার করতে পারেন—প্রাচীন ভারতবর্ষে তা পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কিন্তু এই ধরনের বর্ণীয় আভিজাত্যের স্বরূপভেদের কোনো পরিচয় পাই না। সেখানে 'মৃণালিনী'র মাধবাচার্য থেকে শুরু করে 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী ঠাকুর পর্যন্ত যে-সব ব্রাহ্মণ চরিত্রের অবতারণা তিনি করেছেন, তারা যতটা না বর্ণীয় নেতা তার চেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন সামাজিক-রাষ্ট্রিক নেতা। কোম্‌তে কথিত পজিটিভিস্ট সমাজের পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে তাদের মিল বেশি। কিন্তু একথা স্বীকার করি বঙ্কিম উপন্যাসে এই বিষয় নিয়ে খুব ভাবিত

ছিলেন না। যে বর্ণবৈষম্য নিয়ে একদা তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন—এমনকি একথাও বলেছেন যে, তাঁর কথা শিক্ষিতে না বুঝুন, অশিক্ষিতে বুঝলেও কিছু অঙ্কুর দেবে—সেটা তাঁর উপন্যাসকে কখনো স্পর্শ করে নি।

দুই

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে কোনো মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণের পিঠে° সাহেবে পাদুকাঘাত করলে হয়ে থাকে অপ্রতিবিধেয়—চাণক্যের মতো সে দ্বাদশ সূর্যের তেজে ফেটে পড়তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন যে, প্রেস্টিজ কর্মনির্ভর। কাল বিগুণ বা সগুণ যাই হোক, নতুন শক্তি বিন্যাসের ফলে ব্রাহ্মণের পুরাতন শ্রেণীবর্ণক্ষমতা-ভিত্তিক প্রেস্টিজ এখন আপোষের ভিতর দিয়ে নতুন চেহারা নেবে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেথরের হাতে জমিদারের নায়েব ব্রাহ্মণ হরকুমারের লাঞ্ছনায় আমরা বুঝলাম, নতুন কালে ব্রাহ্মণের বর্ণীয় আভিজাত্য পোলিটিক্যাল ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত। তামাসার বিষয় নয়, এটাই বরং বিড়ম্বনার ব্যাপার যে, সেই বর্ণ-অভিজাত মানুষটিও বিদেশী শক্তির সঙ্গে আপোষের জন্যই ব্যস্ত। হরকুমার এবং তার জমিদারের আচরণে আমরা একথার প্রমাণ পাই।

আপোষের ফলও যে কত বিচিত্র হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ দেখান 'গোরা' উপন্যাসের চরঘোষপুর-ঘটনায়। 'গোরা' উপন্যাসের বাঙালি হিন্দু সমাজের উঁচু নিচু স্তরভেদের পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপারের ওপর লেখকের দৃষ্টি-পাত আমাদের মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। তা হলো বিশুদ্ধির অভিমান বা সংস্কার রক্ষা। কার হাতে জল খাওয়া যাবে, কার হাতে যাবে না—'গোরা' উপন্যাসে এ প্রশ্ন একাধিকবার ফিরে এসেছে। গোরার নিজেরই এ বিষয়ে মানসিক বাধা ছিল কত দুর্মর—কেমনভাবে এ থেকে তার মুক্তি হলো, উপন্যাসের সেই বিখ্যাত শেষাংশ আমাদের সকলের মনে আছে। কিন্তু চরঘোষপুরের ঘটনায় এই বিশুদ্ধির অভিমান ধরে—জল-ভাত কোথায় গ্রাহ্য কোথায় নয়—এই বোধের মীমাংসা করতে-করতেই গোরার সামনে এবং আমাদের সামনে সামাজিক নতুন শক্তি-বিন্যাসের স্বরূপটি খুলে যায়। পুরনো '$J_1C_1P_1$'-বিন্যাস ভেঙে যাবার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখালেন শ্রেণী-স্বার্থের আত্মরক্ষার তাগিদে তা আবার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ মাধব চাটুয্যে ব্রাহ্মণ বলে বর্ণীয় আভিজাত্যের দাবিদার, সুতরাং 'J_1'। সে নীল কুঠির কাছারির তশীলদার, অতএব তিনি 'C_1' না হলেও তাঁর স্থান

সেই শক্তি শিবিরেই। দারোগা এবং ব্রাউনলো সাহেবের সহযোগে তিনি 'P_1'-ও বটে।

কিন্তু এ আলোচনা যেহেতু আগাগোড়া উপন্যাস নামক শিল্পবস্তুর আলোচনা, সেই হেতু আমাদের দেখা দরকার উপন্যাসের উন্মোচিত অংশের এই সমাজদৃষ্টির সাহায্যে উপন্যাসের নিহিত অংশের ব্যক্তিবীক্ষণ কোন্ গূঢ়ার্থের সন্ধান দেয়। এগুলির সাহায্যে গোরার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শহুরে ইংরেজি শিক্ষাসম্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্তের অসম্পূর্ণতার চেহারা। 'গোরা' উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে সে-উপলব্ধির সংযোগ নিবিড়। গোরার কারাবাসের ঘটনা কাহিনীকে—তথা গোরার সর্বৈব অন্বেষা ও এই কাহিনীর প্রেমরত্ত দুইকেই গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। চরঘোষপুরের শ্রেণী-বর্ণ-ক্ষমতার নবীভূত ঐকরূপ দেখে তীব্রতা পেল তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা বিস্ফোরিত হতে চায় আশু কর্মে। কারাবাস তার ফল। এ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে গোরার উত্তরণ—জীবনার্থের দিক দিয়ে এবং প্রেমের দিক দিয়ে—হতো লেখকের তরফ থেকে আরোপিত মাত্র। কাহিনী কাঠামোর কোনো অংশে বক্তব্যের মূল সুতো ঠিকমতো জড়ানো না থাকলে গোটা কাঠামোটা নড়বড়ে হয়ে যায় এ জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল।

তিন

ছিল শরৎচন্দ্রেরও। তাই 'পণ্ডিত মশাই' (১৩২১ বাংলা সাল) উপন্যাসের উন্মোচিত অংশে তিনি তৎপরতার সঙ্গে আনেন গ্রাম সমাজের বর্ণ-শ্রেণী-শক্তি বিন্যাসের তৎকালীন হেরফেরের চরিত্র। "ফাস্ট্ ডেস্পটিজ্ম্' কতখানি ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা ('টেম্পারড্ বাই ম্যাট্রিকুলেশন')* সমঞ্জস করিয়ে নেওয়া গিয়েছিল, কতখানি যায় নি—বৃন্দাবনকে দিয়ে শরৎচন্দ্র তার পরীক্ষা করেছেন। এক হিসাবে তা গোরার থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গোরা চরঘোষপুরে বহিরাগত। সেখানকার সকল যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ দর্শক সে। বৃন্দাবনের গ্রামসমাজ তার একান্ত প্রাত্যহিক অস্তিত্বের অংশ। গ্রামে কলেরা শুরু হয়েছে। বৃন্দাবন—বর্ণীয় শীর্ষাসন নেই—শিক্ষাগত অধিকারে এবং সম্পত্তিগত শক্তিতে সে বর্ণীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে বলে ভেবেছিল। তাই বৃন্দাবন তার পুকুরের পানীয় জলে (সারা গাঁয়ের লোকই সেখান থেকে খাবার জল তোলে) ব্রাহ্মণ পরিবারের কলেরা রোগীর কাপড়-চোপড় কাচা বন্ধ করে দেয়। সে কিন্তু এটা পারে দু পাতা ইংরেজি শিক্ষার জোরেই নয়।

সে 'বড়লোক' বলেও বটে। অর্থাৎ 'J_2' হলেও 'C_1' বলে বটে। কিন্তু সে যে 'P_1'-এর মধ্যে পড়ে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটু পরেই। বৃন্দাবনের ছেলের করুণ মৃত্যু তাকে অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করতে হলো। উক্ত ব্রাহ্মণদের বর্ণীয় প্রভুত্বের জোরে কোনো ডাক্তার তার ছেলের চিকিৎসা করতে এল না। শরৎচন্দ্র খুব ভালো করে দেখিয়েছেন, ব্যক্তি বৃন্দাবনের স্বাধীন ভূমিকাগ্রহণের চেষ্টা কিছুতেই তার চারপাশের 'রিয়্যালিটি' পরিবর্তিত করতে পারে না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর বেশি আর কিছু করতে পারেন নি। বৃন্দাবনের অভিজ্ঞতা একটা ভালো মানুষের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা থেকে গেল মাত্র।

১৩২২ বাংলা সালে বেরুল 'পল্লীসমাজ'। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামা ধরে বিচার করলে এই উপন্যাসের তাৎপর্য একটু আলাদা। এখানে ঠিক শ্রেণী-বর্ণের তারতম্য ধরে সমাজ-বিন্যাসের স্তরভেদ শরৎচন্দ্র দেখান নি। এ উপন্যাসে তাঁর দেখানোর বিষয়—নিজেদের ভিতরের দ্বন্দ্বে বর্ণীয় উচ্চ শ্রেণীর কেমন অধঃপতন হচ্ছে। ব্রাহ্মণ বেণী আর ব্রাহ্মণ দীনু ভটচাজ বর্ণবিচারে একাসন পেলেও আর্থিক স্তরবিচারে এক জায়গায় মোটেই নেই। রমেশ ও বেণীর লড়াইটা বেণীর দিক থেকে আধিপত্য রক্ষার লড়াই। তার কাছে সম্পত্তি রক্ষা ও আধিপত্য রক্ষা একই ব্যাপারের দুদিক। উপন্যাসের উন্মোচিত স্তরে এটাই ব্যক্ত হল। ব্যক্ত হল না শুধু চরিত্রগুলির তথা উপন্যাসের নিহিত স্তরে এই বিষয়টির অভিঘাত কী এবং কতটা। পটভূমিতে নায়ক বহিরাগত হবার ফলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াটি পুকুরে ঢিল পড়ার মতো হঠাৎ আলোড়ন তুলেছে। এবং তা আলোড়ন মাত্র। ভেতর থেকে গ্রামসমাজ এবং ব্যক্তি চরিত্র-গুলিতে কোন্ ধাক্কা এল, কেমন করে এল, নতুন কোন্ পোটেন্সিয়াল তৈরি হল তার বিশ্বাস্য বিবরণ নেই। শরৎচন্দ্রের চিঠি থেকে জানি 'পল্লীসমাজ' বইটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে সমাপ্তিলাভ করেছিল নবম পরিচ্ছেদে[৫]। আমরা যা বললাম, নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তার থেকে বেশি কোনো অভিপ্রায় ছিল না। দশম পরিচ্ছেদে তারকেশ্বর-সাক্ষাতের ঘটনা থেকে আবার নতুন করে তাঁকে ছক সাজাতে হল। রমা-রমেশের তারকেশ্বর-সাক্ষাত-ঘটনা যে একটু হঠাৎ মনে হয়, একটু ঝাঁকুনি লাগে, তার কারণ এই পুনরারম্ভের উদ্যোগ। পুনরারব্ধ 'পল্লীসমাজ'-এ গ্রামসমাজের বর্ণ-শ্রেণী-ক্ষমতার চাপ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট

চিত্র তুলে ধরার সজাগ ইচ্ছে শরৎচন্দ্রের ছিল। তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়, তিনি বলছেন, বিষয়গুলো প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে বলার মতো। এ থেকে বুঝি, তিনি সমস্যাটিকে সমীক্ষার স্তরে নিয়ে যেতে চাইছেন। 'পল্লীসমাজ'-এর নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নায়ক-কল্পনার যে-ক্রেম তাকে দিয়ে সে সমীক্ষা হয় না। হলও না। কাহিনীটি রূপান্তরিত হল রমেশের সংকল্পিত সদিচ্ছা ও রমার অসংকল্পিত প্রেমের গল্পে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ক্রমশই অধিকতর সজাগ হচ্ছিলেন। সমস্ত বিষয়টি যে অন্যদিক থেকে দেখা দরকার তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল 'বামুনের মেয়ে' (১৩২৭) উপন্যাসে। এই উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সমাজপট বিষয়ে লেখকের নিখুঁত জ্ঞান। বর্ণ-হিন্দু ও অ-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষক-শোষিত রূপ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা পরিষ্কার। বর্ণ-হিন্দু সমাজপতির শ্রেণীচরিত্রের ও বর্ণীয় মহিমার যোগসাজসের ফলটিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে গোলোক এবং চোঙদারের সংলাপ ও অভিসন্ধি এখানে স্মরণীয়। এই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবটি আসলে একটি চালানদার ব্যবসায়ী। যুদ্ধে তিনি ছাগল-ভেড়া—তারাও 'কেষ্টর জীব'—চালানের 'কন্ট্যাক্টো' নেন। গরুতে আপত্তি আছে বটে, কিন্তু খুব একটা নয়। তিনি সুদখোর মহাজনও বটে। অথচ তিনি 'মুখের কথায় বামুনকে শুদ্দুর শুদ্দুরকে বামুনের দলে' তুলে দিতে পারেন। সমাজপতির সামাজিক শক্তির মূল ভিত্তিটা যে বর্ণ-মহিমার উপরে নির্ভরশীল নয়, সেটা এই উপন্যাসের বহির্মহল ও ভিতরের মহল দুই দিক থেকেই দেখানো হল। ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ী হতে বাধছিল না, জমিদারের বাধল না কন্ট্রাকটর হতে। কাঞ্চন-তৃষা কিভাবে প্রাচীন কৌলীন্যের রকমফের ঘটাচ্ছে—বিংশশতকের প্রথম পাদের সেই সমাজ বাস্তবতা এই উপন্যাসে ব্যবহৃত হল। এ গল্প মহেশের গল্প নয়, তাই সন্ধ্যাদের শেষ গন্তব্য হয় না শিল্পাঞ্চল—হয় বৃন্দাবন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ক্রমশই উপরতলার সদিচ্ছুকদের তরফ থেকে দেখার ভঙ্গিটা পরিহার করে নিচের তলার মানুষদের জীবনের প্রত্যক্ষ ভূমিতে নেমে আসতে চেয়েছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সখ্য ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছিল। ১৩২৮-এ তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হয়। রাজনীতিতেও তিনি প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। এই সময়ের গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'। 'মহেশ' আগে বেরোয়—'বঙ্গবাণী' / আশ্বিন ১৩২৯,

'অভাগীর স্বর্গ' বেরোয় ঐ বছরই ঐ পত্রিকায় মাঘ মাসে। বর্ণবৈষম্য এবং জমিদার-প্রজার সম্পর্ক এই দুটি গল্পেরই ফ্রেম। বর্ণহিন্দু জমিদার এবং একটিতে মুসলমান ও অন্যটিতে 'দুলে'—প্রকৃত প্রস্তাবে ভূম্যধিকারবিহীন বাঙালি প্রজার সম্বন্ধ-স্বরূপটি এই গল্প দুটিতে উন্মোচিত হয়েছে। দুটি গল্পের সাদৃশ্য অবিস্মরণীয়। দুটি গল্পেই বর্ণীয় স্বৈরাচার এবং শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারকে এক মোড়কের ব্যাপার বলে দেখান হয়েছে। দুটি গল্পেই জমিদারের কাছারির আমলাদের ছবি একরকম। তর্করত্নকেও তার মধ্যে ধরে নেওয়া হল। কারণ তিনি আমলা না হলেও জমিদারের অন্যতম স্তাবক। দুটি গল্পেই গাল্পিক বিষয় কতকটা এক—মানবিক দুর্দশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও গফুর এবং কাঙ্গালীচরণ দুজনেই, যে-ভালবাসা শুধু মানুষেই বাসতে পারে, তাকে খাঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে। সে চেষ্টার ব্যর্থতার ফলে কমবেশি দুজনেই গ্রাম থেকে ছিঁড়ে যাবার পথে পা বাড়াল। মিল আরো আছে। একটা করে সজীব গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভূমিস্বত্ববিহীন গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণ কাহিনী। গোচারণ জমি—যা গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত—তা জমিদার বিলি করে দেয়। নিজের উঠোনের গাছে কুড়ুল বসাবার হক্ প্রজার নেই। বর্ণীয় আভিজাত্যের শীর্ষাসনটি জন্মসূত্রে দখল করে তারই বাবদে শ্রেণীগত ও ক্ষমতাগত আধিপত্যটি এক করে ঘুলিয়ে নেওয়া—শরৎচন্দ্রের এই দুটি গল্পে কিছুই বাদ যায় নি। গফুরের মহারানীর দোহাই, সাশ্রু কাঙ্গালীচরণের অধিকার ঘোষণা—এই ন্যূনতম সিভিল লিবার্টির সাধ—'$J_1C_1P_1$'-এর ধাক্কাতে গুঁড়ো হয়ে গেল—মিল এখানেও। কিন্তু একটা গুরুতর অমিলও আছে বটে। 'মহেশ' গল্পে গফুর প্রথম থেকেই পরাস্ত, পর্যুদস্তচিত্ত। মহেশের সঙ্গে তার, দুঃখ-দুর্দশা মেনে নেবার ব্যাপারে প্রায়, কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু কাঙ্গালীচরণের গল্প তা নয়। সমানাধিকারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ গল্পের মূল কথা এবং সে আকাঙ্ক্ষা কোনো ইংরেজি পাঠশালা থেকে কেতাবী বুলি মারফৎ আসে নি। সেটা এসেছে একান্ত ভারতীয় জীবনের নিজস্ব অন্ধিসন্ধি থেকে। শুধু যে আকাঙ্ক্ষাটা এসেছে তাই নয়—আকাঙ্ক্ষাকে সফল করার জন্য মায়ের ব্যগ্রতা এবং ব্যাটার প্রাণপণ চেষ্টা দুটোই লক্ষ্য করার বিষয়। কাঙ্গালীচরণ বয়সে কাঁচা বলেই অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—ভাবে নি প্রতিকূলতা কত কঠিন! কত নিষ্ঠুর! বিষয়টি নিয়ে এক-একটি ভাবনা-সংহত মুহূর্ত রচনা করেন শরৎচন্দ্র এইভাবে

—"কুটির প্রাঙ্গণে একটি বেলগাছ, একটি কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন? এই গোলমালে একটা ভীড় জমে গিয়েছিল। তারা কাঙালীর ব্যাপারে দরদী হয়েও বলল, বিনা অনুমতিতে গাছ কাটতে যাওয়া ঠিক হয় নি।' প্রজাস্বত্বের এমন চেহারা বাংলা গল্পে-উপন্যাসে আমরা আরেকবার দেখেছি। তা হলো তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে। এ উপন্যাসেও এমনই একটা গাছ কাটার বর্ণনা রয়েছে। ঈদ সামনে। রহম শেখ একটা তালগাছ কেটেছিল, বিক্রি করে দেবে বলে। 'গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল।' 'এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনোদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড কঠিন ঠেকিয়াছিল।' 'একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। ওই গাছটার স্বামীত্বের কথা। তিন পুরুষের মধ্যে স্বামীত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই।' 'তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুয্যে বাবুকে।' 'রহমের বাপ জমি বিক্রি করিবার পর—বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে—রহমও চষিতেছে। কোনদিন একবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই, জমিটা তাহাদের নয়।' 'গাছটা তাদের নয়' এ কথা রসিক বা কাঙালীরও মনে হয় নি। ঘটনাংশের এই সামান্য মিলটুকু মনে রেখে একটা কথা এখানে বলার আছে। তারাশঙ্কর এ জাতীয় ঘটনা-চিত্রণের বেলায় ব্যাপারটিকে দিতে চেয়েছেন 'বাবু' এবং 'অ-বাবু'-দের সংঘাতের রূপ*। গ্রামীণ উচ্চ-শ্রেণী আর শহরে উচ্চশ্রেণী তাঁর জনতার কাছে 'বাবু' অভিধার মধ্যে এক হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র যেমন 'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে গ্রামীণ-পুরোধা (রুর‍্যাল এলিট)-দের শ্রেণী ও বর্ণীয় ভূমিকা দুয়ের ওপরই সমান জোর দেন—তারাশঙ্কর সেক্ষেত্রে 'বাবু' 'অ-বাবু'-র প্রশ্নকেই সামনে আনেন। এতে তারাশঙ্কর কিছু ভুল করেন না। শুধু সওয়ালের তীক্ষ্ণতা একটু কমে যায় বলে মনে করি। জেলে বলদের সঙ্গে বাঙালি চাষির সম্পর্ক কতটা বাস্তব

মানবিকতার ওপর স্থাপিত, ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে সে-সম্পর্ক যে মাত্র প্রথাগত সংস্কার—'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র সেটাও দেখিয়েছেন। আমাদের মনে পড়েই 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের তিনকড়ি-রহমশেখের গরুর ঘটনা। তিনকড়ির গরু কঙ্কণার বাবুরা ধরে বেঁধে রেখেছিল। তিনকড়ি আর রহমশেখ দুজনে ছুটেছিল সে গরু ছাড়িয়ে আনতে। রহম বাবুকে বলে—'গরুটাকে মেরা৷ জখম করা৷ দিছ শুনলাম ? হিন্দু বেরাম্ভন তুমি ?' কিন্তু উক্ত বাবুদের ব্রাহ্মণত্বের বিষয়টিকে সামনে আনার চাইতেও তারাশঙ্কর রহম আর তিনকড়ির সামনে আনতে চাইছেন এক নতুন ব্যবসায়ী চরিত্র—আরো চতুর, আরো নাগরিক পরিশীলনে দুরন্ত, কিন্তু আরো বিচ্ছিন্ন। এঁরা কলকাতায় থাকেন। ধান বেচে দিতে মফঃস্বলে এসেছেন। সুতরাং গরীব গ্রাম্য চাষির কাছে কসুর কবুল করতে তার বাধে না। তা বলে তিনি চাষিদের ধান ধারও দেবেন না—সুদ পেলেও না—'ওসব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি'। চাষি হিন্দু-মুসলমান অবাক হয়ে যায় নতুন এই বাবু মানুষকে দেখে। বাবুর উপকারের পুণ্যে লোভ নেই, সুদের টাকায় লোভ নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মণটির মতো বাবুটির কোনো ক্রূপলও নেই—'ভালোতেও সে নেই, মন্দতেও সে নেই'। এই ভদ্রলোকই ক্ষতিকর বেশি। 'গণদেবতা'-অংশে আমরা জেনেছি আলিপুরের রহমৎ শেখ আর কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্জে একযোগে ভাগাড় দখল করেছে চামড়ার ব্যবসা করবে বলে। 'বামুনের মেয়ে'-তে গোলোক চাটুয্যে গরু চালানের ব্যবসায়ে টাকা খাটানো সঙ্গত হবে কিনা একথা দুঃখের সঙ্গে বিবেচনা করেছে—তার একদশক পরেই 'রমন্দ চাটুজ্জে'-রা চামড়ার ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। বর্ণীয় মহিমা নয়, শ্রেণী-মহিমাই তখন হয়ে উঠেছে কাম্য ও লভ্য। এবং তারা আর স্বগ্রামবাসীও থাকছে না। 'গণদেবতা'-র অনিরুদ্ধ কামারদের অনেক আগেই তারা-ই বেরিয়ে পড়েছে গ্রাম ছেড়ে, শহরের দিকে। গ্রামীণ অর্থনীতিক প্যাটার্নের রূপবদলের ব্যাপারে তাদের ভূমিকাও কম নয়।

আগেই বলেছি তারাশঙ্করের গল্পে বর্ণাভিমানের বিষয়টি সামনে আসে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু প্লটকে সেটাই মুখ্যভাবে অধিকার করে না। তারাশঙ্করের গল্পে প্রধান হয় নিচের তলার মানুষের একক ব্যক্তির আত্মমর্যাদার অভিমান। এটাকে তার ব্যক্তি-অভিমান বলা যায়—তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ-রূপও বলা যায়। তাই 'আপনি-তুমি-তুই'-এর

ব্যাপারটিকে তারাশঙ্কর খুব চমৎকার ব্যবহার করেন। এতদিন পর্যন্ত 'আপনি-তুমি'-র হেরফের বাংলা গল্পে প্রেমের ঘনীভবন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেই কাজে লেগেছে—তারাশঙ্কর এটাকে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যে প্রয়োগ করলেন। প্রেমের ঘনীভবনে আপনি থেকে তুমিতে অবতরণ কাহিনীকে কতখানি ভেতরের দিক থেকে গতিশীল করে তোলে, কতখানি তা নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে 'গোরা' উপন্যাসের সাতান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদটি তার নিদর্শন। তারাশঙ্করের 'আপনি-তুই'-এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া যায় 'গণদেবতা' উপন্যাসে। দেবুর সঙ্গে সেটেলমেন্টের কানুনগো 'তুই তোকারি' করেছিল। এর জবাবে দেবুও কানুনগোকে 'তুই তোকারি' করে জুতসই জবাব দেয়। কানুনগো সরকারি কর্মচারী, হয়তো ইংরেজি শিক্ষিত—দেবু গ্রাম্য পণ্ডিত হলেও চাষির ছেলে। কানুনগো ইংরেজি শিক্ষিত এবং শহরবাসী বলে দেবুর ঘরে জল খেতে পারে—কিন্তু দেবুকে সে 'আপনি' বলতে পারে না। গাঁয়ের 'বাবু' ক্লাসটাই পারে না। দেবুই কি পারে গ্রাম্য পুরোভাগীদের 'বাবু' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে? কানুনগো-ঘটনাই তো তার অভিজ্ঞতায় প্রথম দাগ ফেলে নি। তার আগে পুলিশের এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর তাকে 'তুই তোকারি' করেছিল। 'চাষির ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম'—কাজেই সে তার ব্যক্তিত্বের অধিকারে সমানাচরণ দাবি করে—পায় না। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো ম্যাজিস্ট্রেট তাকে 'আপনি' বলে বটে—কিন্তু সেটাও ব্যতিক্রম। কিন্তু এ বিড়ম্বনার বীজ তো দেবুর মনের মধ্যেই। সে যখন নিজের চাষি-বাবার জমিদারের হাতে লাঞ্ছনার কথা ভাবে, তখন সে জমিদারকে 'বাবু' বলেই অভিহিত করে। অর্থাৎ সে বিশ্বনাথের সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও—ইংরেজিতে দরখাস্ত লিখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে জানে জমিদার—এবং হয়তো ব্রাহ্মণ—'বাবু' অভিধার জন্মগত অধিকারী। এবং সে আর সকলের মতো অ-বাবু।

তবু আত্মসম্মানের দাবিতে মাথা চাড়া দিচ্ছিল গ্রাম-সমাজ। কিন্তু সেটাও পুরোনো আর্থিক বাঁধন ছিঁড়তে পারার আগে নয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় করালী-হেদো মণ্ডল ঘটনা এখানে স্মরণীয়। হেদো মণ্ডল যেই বলেছে করালী সম্বন্ধে 'তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে'—'করালী ভুরু কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হলে হয়তো ভুরু কুঁচকেই মাথা হেঁট করে চলে যেত, কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল—

উ কি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দর লোকের উ কি কথা!' বনওয়ারীর নিজের ভাষাতেই করালীর এই প্রকার বিস্ময়কর আচরণের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাটি মেলে—'ওই চন্নপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ করে দিলে।'

তবু 'বাবু' একটা অর্থনৈতিক পরিচয়ই বটে। শ্রীহরি পাল 'ঘোষ' হবার জন্য সচেষ্ট ছিল—বাবুত্বের দিকেই ছিল তার অভিলাষ। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ন্যায়রত্নের কাছে শ্রীহরি ঘোষ গিয়েছিল দেবুকে পতিত করার ব্যাপারে—ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলেছিলেন—'কঙ্কনার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহামহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো একজন উপাধ্যায় হে!' ন্যায়রত্ন সামাজিক মর্যাদায় কোনো 'বাবু'র চেয়ে নিচে নন। কিন্তু তিনিও নতুন কালের গ্রাম-নাগরিক এলিটদের প্রসঙ্গে 'বাবু' শব্দটিই ব্যবহার করেন। পৌত্র বিশ্বনাথ একটু কটুভাবে হলেও এক দিক দিয়ে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা মন্দ দেয়নি—'দেশে' নতুন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হলো, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজপতির বংশ বলে আমাদের, তখন যাত্রাদলের রাজার কথা মনে পড়ে।' কিন্তু পুরো ব্যাখ্যা বোধ হয় মেলে না ন্যায়রত্নের ট্রাজিক প্রস্থানের মধ্যে। তারাশঙ্করের ট্রাজিক চেতনা আরিস্ততলীয় ট্রাজেডি চেতনার ফল। তা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে অনুধাবনের ফল নয়। তবু তারাশঙ্করের পক্ষে একটা কথা বলার আছে। শরৎচন্দ্রের গ্রাম-সমাজ অনুধাবনের অপূর্ণতা কোথায় ন্যায়রত্ন চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তা দেখিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক-সামাজিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে তার খাপ খাওয়াতে না-পারার-বিষয়ও পরিষ্কার করে তুলে ধরা হলো। গোড়া কেটে দেওয়া বটগাছের অথবা নিজ বাসভূমে নির্বাসিত রাজার আত্মস্থ অন্তরাগ মূর্তি ধরেছে ন্যায়রত্নে। নিঃসন্দেহে প্রস্থানের করুণ অর্থ-গৌরবে লেখক সে মূর্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অথচ এ অভিযোগ আমাদের যায় না যে, তারাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' (এবং পূর্বগ রচনা 'গণদেবতাতে'ও) ন্যায়রত্ন উপবৃত্তকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন নি। শ্রীহরি ঘোষ দেবু-দেবু-বৃত্তই এ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রধান বৃত্ত। ন্যায়রত্ন-বিশু-বৃত্ত বেশ খানিকটা দূরগত এবং পরোক্ষও বটে। সে বৃত্তটা দেবুকে মাঝে মাঝে গিয়ে ছুঁয়ে আসতে হচ্ছিল। তবে কি তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন সে বৃত্তটা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারণ সংযোগে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক?

চার

আবার মনে হয় বুঝিবা তারাশঙ্কর বর্ণ এবং শ্রেণীর ভিতরকার জটিল সম্পর্কটি ভেদ করার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন। তার চেয়ে বোধকরি তাঁকে বেশি টানে বর্ণীয় স্বাধিকারের ও মর্যাদা-আদায়ের প্রশ্ন। তখন আবার 'বাবু' কথাটি শ্রেণীবাচক না হয়ে বর্ণবাচক হয়ে যায়। 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫) উপন্যাসটিতে তার প্রমাণ আছে। প্রথমত লক্ষণীয় বর্ণীয় ডিটারমিনিজমের বিরুদ্ধে সীতারাম পণ্ডিতের লড়াই। 'গণদেবতা পঞ্চগ্রামে'র দেবু এবং 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম—এই দুজনেরই 'পণ্ডিত' উপাধি কর্মবাচক। কিন্তু এই উপাধিটির জন্য দেবুর পরোক্ষ এবং সীতারামের প্রত্যক্ষ বাসনা ছিল। সীতারামের পাঠশালা প্রতিষ্ঠার লড়াই প্রকৃত প্রস্তাবে তা নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই। এর সঙ্গে সে যুক্ত করে নিয়েছিল গ্রামীণ ভদ্রলোক শ্রেণীর বর্ণীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অসম্মানিত 'অ-বাবু'-দের পক্ষের মর্যাদা আদায়ের প্রশ্নটি। পাঠশালা বসানোর ব্যাপারে জ্যোতিষ সাহাকে রাজি করানোর জন্য সীতারাম যে-সব যুক্তি দিয়েছিল, তার সব শেষেরটি ছিল সব থেকে লক্ষ্যভেদী—'তা ছাড়া এ হবে আপনাদের ছেলেদের জন্যে পাঠশালা, বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের ছেলের তফাত থাকবে না। অসম্মান হবে না আপনাদের।' বর্ণীয় স্বৈরাচারের সম্বন্ধে তিক্ত স্মৃতি রয়েছে জ্যোতিষেরও, সুতরাং সে 'চকিত হয়ে মুখ তুললে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রথমে সীতারামের মুখের দিকে, তারপর সামনের দিকে ওই আলো-ঝলমল পুকুরের দিকে।' কিন্তু জ্যোতিষও জানে, আমরাও জানি, এই সমস্ত আবেগ শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক হবার আবেগ। ইংরেজি লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে 'এডুকেশনাল মিড্‌ল ক্লাশ' গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা তাদের মধ্যে প্রবল। জ্যোতিষ লক্ষ্য করেছে, তাদের ঘরের ছেলে এম. বি. বি. এস পাশ করলে আর 'জল-অচল' থাকে না—সুতরাং পাঠশালা দরকার লেখাপড়ার পথে অগ্রসর হবার জন্য, গ্রামের এস্‌টাবলিশ্‌মেন্ট বাধা দিলেও দরকার। তারাশঙ্কর অবশ্য তাঁর কাহিনীকে এই আবর্তের মধ্যে ফেলে রাখেন নি। বৃহৎ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা-তরঙ্গের তাড়নায় সে আবর্তকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু 'বাবু'দের স্কুল বনাম 'অ-বাবু'দের পাঠশালার ব্যাপারটি উপন্যাসের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে। 'ন চাষা সজ্জনায়তে'—এই কুৎসিত ছড়াটি উচ্চারণ করেছিল গ্রামের বাবুরা। মাতাল ভদ্রলোক বলেছিল—'চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শৌণ্ডিক ছাত্র! কাগজং কলমং খরচং মাত্র।' সীতারামের উচ্চারণ-রীতির

গ্রাম্যতা বাবুদের কাছে বিদ্রূপের বিষয় হয়। সীতারামের পাঠশালাকে 'ইতরতম উপায়ে ময়লায় পরিপূর্ণ করা' হয়েছে। গ্রাম্য দরখাস্ত ছাড়া হয়েছে রাজনৈতিক অভিযোগ সৃষ্টি করে তার পাঠশালা অচল করে দেবার জন্য। এ সবই বাবুদের স্যাবোটেজ অ-বাবু-দের আত্মোন্নয়ন প্রয়াসে।

কিন্তু এটুকুই সব নয়। প্রচ্ছন্নভাবে তারাশঙ্কর প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন একটা মধ্যবিত্ত অভিমানকেই। সদ্‌গোপ শিক্ষকমশাইকে দেখে বাবুদের ছেলেরা নমস্কার করলে তা হয় অনুপ্রেরণার বিষয়। ধীরাবাবুর মা সীতারামকে প্রথম অভ্যর্থনার দিন ভূম্যাসন পরিহার করে জমিদার প্রজার সম্পর্ক ভুলতে নির্দেশ দিলে অথবা দেবু, শ্যামু, সীতারামকে পায়ে হাত দিলে প্রণাম করলে আবহাওয়ায় একটা বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি হয়—নানা ঘটনা বিপর্যয়ের পর দেবুকে মা সীতারামের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলে অথবা মণিবাবু তার পৌত্রকে সীতারামের কাছে লেখাপড়া শেখার জন্য নিয়ে এলে সেটা সীতারামের জয়ের দিন বলে প্রতিভাত হয়। এ-সমস্তের কোনোটাই 'ভদ্রলোক' জীবন-বৃত্তের গড়ন ভেঙে ফেলার ব্যাপার নয়—ভদ্রলোকের বিকার সংশোধনান্তে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর আয়োজন। বর্ণীয় অভিমান থেকে মুক্ত হবার জন্য তারাশঙ্করের ব্যস্ততা কম নয়। তাই উপন্যাসে তিনি বারবার আনেন তৎপ্রাসঙ্গিক ঘটনা। ধীরাবাবু কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করেন, বামুনের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে জয়ধর বৃত্তির পর বৃত্তি পেয়ে প্রবল ভদ্রলোক বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মানুষ হয়ে যায়। কোতাল ঘোষার কায়স্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক বংশের বালক ছাত্রকে অশিক্ষকোচিত ব্যঙ্গ করলে সেটা ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ব্যাপার হয়ে যায়। পুলিশ সাহেব বৈদ্যবংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সন্দীপন মুনির নাম জানে না দেখে সীতারাম বিস্মিত হয়—ভাবে না, বোঝেও না যে এর সঙ্গে বৈদ্যবংশের সন্তান হওয়া না-হওয়ার কোনো প্রশ্ন জড়িত নেই—ওটুকু পুলিশ সাহেবের সমাজ লক্ষণ! বইটা শেষও হল সীতারামকে ধীরানন্দের নমস্কার করার ভিতর দিয়ে।

অথচ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের প্রশ্নটি ব্যবহৃত না হলেও গরীব-বড়লোকের ব্যবধান-চেতনা এই উপন্যাসের চরিত্রদের মুখ থেকে শোনা গেল। পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই ব্রাহ্মণ হয়েও চমৎকার ব্যঙ্গে বর্ণ এবং শ্রেণীর ভেদাভেদের জটিলতা ধরে দেন—'শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখিরী ব্রাহ্মণ তো

এক নয়।' সীতারামও সেই ভেদের কথা জানে না এমন নয়। ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে তার বলে উঠতে ইচ্ছে করে—'ওরে তোরা বাবুদের ছেলে, তোদের ঘরে ভাত আছে, সিন্দুকে টাকা আছে। মান-ইজ্জত দালান কোঠার ইঁটে-চূণে চাপা হয়ে মজুত আছে, তোদের এতে দরকার কি? কেন গরীবদের ছেলের পড়ায় ব্যাঘাত করিস?' কিন্তু এ চেতনা কখনোই যে পূর্ণ একটা আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ সীতারামের সাধনার লক্ষ্যও তো 'বাবু' তৈরি করা। 'সাঁওতালরা ক্রীশ্চান হয়ে লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হয়েছে, সে শুনেছে। শুনেছে, এই সব ছোট জাত বলে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গবর্নমেণ্টের ঘরে ভাল চাকরি পায়। কোনরকমে একজনকেও যদি সে সেই রকম করে তুলতে পারে, তবে তার আশা পরিপূর্ণ হয়।' সীতারাম নিজে বাবু হয় নি, কিন্তু বাবু সৃষ্টি করার লোভ সে সংবরণ করে নি, করতে চায় নি—বাবুত্বের হাতছানি কত দুর্মর এ তারই এক প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের থেকে তারাশঙ্করের পটজ্ঞান অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ, অনেক বেশি ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ—কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিষয়জ্ঞান স্পষ্টতর। বিশেষ ক্ষুদ্র পরিসরে তা তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী। পরিবর্তনের মোচড়গুলি গ্রামের কোন্ অংশে কেমন ভাবে লাগছে—তারাশঙ্কর তা সবচেয়ে ভাল বলেন। কিন্তু সে পরিবর্তমান শিবির সন্নিপাতে 'আমার স্থান কোথায়' এটা বলতে শরৎচন্দ্রের কোনো দ্বিধা ছিল না।

পাঁচ

তবু মনে হয় বাঙালি ঔপন্যাসিককে তথা তার চরিত্রপাত্রকে ১৯৫৪ সালে এস্টেট এ্যাকুজিসন এ্যাক্ট্ পাশ হবার অনেক পরে এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় পারিবারিক জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশক আইন তৈরি হবার পরেও অবস্থাটার পুরনো জট ছাড়াতে সমান বেগ পেতে হচ্ছে। একদিকে 'সানা বাউড়ির কথকতা'র মতো গল্পে সমরেশ বসু অব্যর্থ ভাবে দেখান 'বাবু-অ-বাবু' কোন বিস্ফোরণমুখী অবস্থার মুখোমুখি, অপর দিকে বিপ্লবী কালী সাঁতরার (অগ্নিগর্ভ / মহাশ্বেতা দেবী) জীবনের গোধূলিবেলার চিন্তা এই জটের সামনে দাঁড়িয়ে দিশাহারা—'ব্লকের কুয়ো থেকে ডোমরা জল নিতে পারে না দেখলে, অথবা বিধবা সহকর্মিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম স্কুল থেকে নিতাজীবন দলুইকে বিতাড়িত হতে দেখলে

(বিধবাটি বামনী) কালী সাঁতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলিই বিফল হয়েছে' অথবা 'মনে হচ্ছে, জাতিভেদ ও ছুত-অছুতের মতন মৌল সমস্যার সমাধানই করা হয় নি যখন, তখন বিপ্লব ও সমাজবাদ বড্ড বড় কথা, বড্ড দূরের স্বপ্ন, তার আগে নিজের জেলায় সকল জাতের জন্যে বহু কুয়ো দেখতে পেলে শান্তি হত।' ভারতীয় উপন্যাসকে বারে বারে নতুন নতুন তাগিদ নিয়ে ও তাগদ নিয়ে৮ এই জটের মোকাবিলা করতে হবে।

সহায়ক সূত্র :

১. Caster Old & New—Andra Bètelle (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

২. 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামে প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। বর্ণভেদ বিষয়ে তাঁর নানা ভাবনার বিশিষ্ট নিদর্শন রয়েছে ধর্মতত্ত্বের ২২তম পরিচ্ছেদে, 'সাম্য' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে। সে সব সূত্রও এই লেখায় ব্যবহার করা হলো।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের (চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, রবীন্দ্র রচনাবলী) 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ।

৪. Elite conflict in Plural Society.—Twentieth Century Pengal —J. H. Broomfield (Bengal and the Bhadralok পরিচ্ছেদ থেকে)।

৫. শরৎচন্দ্র—৩য় খণ্ড পত্রাবলী—গোপালচন্দ্র রায়।

৬. অ-বাবু না বলে 'অ-বর্ণহিন্দু' জাতি, 'যেমন বলেছেন মহাশ্বেতা দেবী, তাও বলা যায়।

৭. তারাশঙ্করের সমাজবীক্ষার সঙ্গে মার্কসবাদের সামীপ্য থাকলেও ব্যবধান যে দুস্তর—সে সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ পেয়েছি শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের 'সমাজের মাঠে এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস : চৈতালী ঘূর্ণি' নামক আলোচনায় (এক্ষণ / পূজা সংখ্যা—১৩৮২)।

৮. 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্য এবং নানা উপন্যাস, গল্প।

এই বিষয়ের সূত্রে আরো দুটি প্রবন্ধ পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক

‘অদ্ভুত অপৃথিবী’ ঃ জীবনানন্দের উপন্যাস

অশ্রুকুমার সিকদার

জীবনানন্দের ‘সুতীর্থ’ উপন্যাসের শেষের দিক থেকে ক্ষেমেশের সঙ্গে জয়তীর একটা সংলাপ উদ্ধৃত করছি। জয়তীকে ক্ষেমেশ জিজ্ঞাসা করছে—

এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি ?

বাংলা আমার ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাই নে।

কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি ?

যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।

তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে ?

তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গে মেশ নি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম দাঁড়াচ্ছে টের পাওনা তুমি।

জীবনানন্দ টের পেতেন। তীব্র সংবেদনশীল এই মানুষ তাঁর আশ্চর্য শোষণশক্তি দিয়ে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন পরিবর্তমান মুখের ভাষার স্পন্দকে, নাগরিক অপভাষার শাণিত প্রখরতাকে। এই সময়ের কবিতায় যেমন পাই আমরা মরখুটে, টেঁসে যায়, গাড়ল—এই সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, অথবা ‘ভালো করে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী / দিব্য মহিলা এক’ এই ধরনের চরণ, তেমনি উপন্যাসে পাই অনর্গল নিচের ধরনের বাক্য।

(ক) এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতায় এ সব জায়গাজমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিরিশকুন লাফাচ্ছে। ('সুতীর্থ')

(খ) যাচ্ছিলে কোথায় শীত রাতের লক্ষ্মীপেঁচার মতো; কলকাতার কালপেঁচারা ধাড়ি ইঁদুরের ঘাঁটি বেঁধে রেখেছে বুঝি? সে ঝপাঝপ্ করে

দাঁড়িয়ে না পড়লে মূলে হাভাতে করে দেবে?' ('সুতীর্থ')

(গ) আঠারো উনিশের অনেক মেয়ে অশিশিা ষাট বছরের প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিয়ে ছাড়ে। ('সুতীর্থ')

(ঘ) ঘাড়ের রোঁ শাদাটে মেরে গেল, এখনও ন্যালা কুকুরের মতো খুব যে শুঁইগাঁই—খুব যে শুঁই গাঁই। ('মাল্যবান')

(ঙ) এমন শীতের দুর্বার রাতে কোথাকার একটা
মিকড়ে হারামজাদা জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকার
খুপরির ভেতর এটাকে সটকাল! ('মাল্যবান')

মাল্যবানের আহ্লাদ হয়ে যায় 'বুড়ো ধাড়ির দেইক্ষিপনা', মেসের ঝি গয়মতী 'খিচে সিগারেট টানে'।

অয়ন্তীর কথা ধার নিয়ে বলা যায়, চিন্তা বদলে যাচ্ছে, আর তাই বদলে যাচ্ছে ভাষা। চিন্তা বদলে যাচ্ছে, যেহেতু বদলে যাচ্ছে সমাজ, জীবনযাপন। রূপসী বাংলার ধ্যানে যে নির্জনতার কবি একদিন তন্ময় ছিলেন, তিনিই কলকাতার নাগরিকজীবনের সংসর্গে এসে সেই পরিবর্তমান জীবনযাপনের তীব্র অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আকুল হয়েছিলেন। সেই অভিঘাতের ফলে লেখা হয়েছে তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা কবিতা। সে-সব কবিতায় তিনি দেখেছিলেন মূল্যবোধের অবক্ষয়, 'গভীর অসূয়া'। 'সংকুচিত বিবমিষা'-র দ্বারা প্রাণিত সেই সব কবিতায় আছে বীভৎস-ক্লেদতাময় ছবি, বিশ্বসংসারের প্রতি বিরূপ বিতৃষ্ণা। মনে হয়েছিল সভ্যতাসংসার 'প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সঙ্গীতে মুখর'। সেই বীভৎসতাবোধ থেকেই রচিত হয়েছে তাঁর দুখানি উপন্যাস—'সুতীর্থ' আর 'মাল্যবান'। 'মাল্যবান' উপন্যাসের রচনাকাল দেওয়া আছে জুন, ১৯৪৮। 'সুতীর্থ'-এর দেওয়া নেই। তবে মনে হয় 'মাল্যবান'-এরই সমকালে, ঈষৎ আগে-পরে 'সুতীর্থ' রচিত হয়েছিল। বলা হচ্ছে 'উনিশ শো ছেচল্লিশ তো

এখন'; উপন্যাসে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাচ্ছি, সোদপুরে গান্ধিজীর কথা পাচ্ছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, স্বাধীনতা আসছে। সময়প্রবাহ সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন জীবনানন্দ। সেই কালচেতনার প্রমাণ আছে তাঁর কবিতায়, এই উপন্যাস দুটিতে। সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহতার কথা ভাবে মাল্যবান—'সচ্ছল সকল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তিজীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়,—সময় শুধু'। আমরা যে সময়ের মধ্যেই থাকি সে বিষয়ে সুতীর্থও সজ্ঞান—'একই তো সময়, একই প্রবাহ; রয়ে গেছে,—রইছে; আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, তেরছা কাল্লিক মেরে।' এই সময়চেতনা থেকেই এসেছে নিজের কাল সম্বন্ধে তীব্র সংবেদনশীলতা, জীবনানন্দের রচনায়। উপন্যাস দুটির পটভূমি, কেমন সেই সময়? সুতীর্থর প্রাক্তন সহপাঠী, বর্তমানে ক্ষৌরকার মধুমঙ্গল বলে, 'মন্বন্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব; হাড়গোড় ছিবড়ে শুঁকতে আরশোলারা ঠ্যাং নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং? দিতে তবে পারি। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্তমাংস চাইছেন আপনি? কার কাছে? কে দেবে আপনাকে?'

দুটো উপন্যাসেই সাকার হয়েছে এক অতি তীব্র বিবমিষা। এমন এক প্রতিকূল ক্লিন্ন বহির্জগতের সংস্রবে যেন তিনি এসেছিলেন এই সময়ে যে তিনি শত শত শূকরের চিৎকার ও শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার যন্ত্রণার আর্তনাদে মুখর কবিতা লিখেও তাঁর অদম্য ঘৃণাকে চূড়ান্ত প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি, তাই তাঁর দরকার হয়েছিল বিস্তৃততর মাধ্যম—উপন্যাসের বিস্তার। গল্প তিনটিতে হাত পাকিয়ে শেষে জীবনানন্দ সমাজ ও সময়কে বিস্তীর্ণ পটভূমিতে ধারণ করার জন্যে উপন্যাসও লিখেছিলেন। সতীর্থ লেখক, যদিও ইদানীং লেখে না। সে ভাবে এতদিন 'যা লিখেছে সে তো আত্মরতি, কুঁড়ে গোরুর গল্প।' জীবনানন্দও কি সেই আত্মরতি থেকে বেরোতে চাইছিলেন? ব্যক্তিগত দৃষ্টিকেই দিতে চাইছিলেন একটা নৈর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিত? হয়তো তাই এই সব উপন্যাস তিনি গোপনে সন্তর্পণে লিখে-ছিলেন, না-লিখে উপায় ছিল না বলে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর

ভরে গেছে ; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি…।

সুতীর্থ মণিকাকে বলে 'সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পণ্ড, মানুষের হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে ভাইয়ের হাতে।' 'মাল্যবান' উপন্যাসে বারে-বারে পড়ি—

(১) মানুষের পৃথিবী আজ পাগলা গারদ—সেখানে মানুষের শিশু আর বেড়ালের ছানার একই অবস্থা।

(২) মানুষের চেয়ে বড় শয়তান কে আছে এই সৃষ্টির ভেতর! শয়তান! শয়তান!

মাল্যবানের ঘর পাখি নোংরা করেছে দেখে উৎপলা বলে 'পাখিরা আর কদ্দূর করবে ; মানুষেরা পাখিদের চেয়ে শয়তান ; না হলে পৃথিবীটা এ-রকম পৃথিবী হয়।' মানুষের শয়তানির পরিণাম আমরা জেনে যাই যখন ধর্মঘটী মজুরদের আমরা বলাবলি করতে শুনি, 'মাকড়শার জাল ছাড়া আর কি আমরা? মানুষ তো নয়—মানুষের পিত্তি। শরীরের পিত্ত কফ বায়ু ঠিকরে যে আঁশ বেরিয়ে আসে তার ক্যাকড়া তুমি আমি অনন্তরাম, ঘনশ্যাম—।' কবিতায় দেখেছি এই তীব্র বিবমিষাকে অবয়বত্ব দিতে গিয়ে জীবনানন্দ সেই সব জীবজন্তুর প্রসঙ্গ আনেন যারা কুশ্রী অসুন্দর—বানরবানরী, ব্যাং, ইঁদুর, শেয়াল, শকুন, প্যাঁচা। এই সব, এবং আরো অন্য জুগুপ্সিত প্রাণীর সমাবেশ উপন্যাসেও। ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো খেতের কাঁকড়ার মতো গাঢ় চোখে তাকিয়ে কথা বলে, পকেটমার ছোকরাকে মনে হয় লিকলিকে ছিপছিপে বানরের বাচ্চা, ধর্মঘটীরা 'পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদঘুটে বর্ষায় খালুয়ের ভেতর ল্যাটামাছের মতোন,' সদ্যোজাত শিশু যেন মগরাহাটার কুচো চিংড়ির মতো, মেসের ঝি গয়মতী 'মাকরের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ, ভেটকীর মুখের মতো', অমরেশকে মনে হয় আট ঠ্যাংওয়ালা মাকড়সা, মাল্যবান নিজে উৎপলা সম্পর্কে ভাবে 'কতো যে সজারুর খাটাযো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির'। সব কিছু ঘৃণ্য, কারণ মানুষের সংসারের সব কিছুর মধ্যে মাল্যবান দেখে 'মূল্যবিশৃঙ্খলা'।

মূল্যবোধের ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে গেছে যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাংলাদেশে, জীবনানন্দের পৃথিবীতে ; তাই তিনি ভয়ংকর বিবমিষায় পীড়িত হয়েছিলেন। সুতীর্থ ভাবে, 'কেমন একটা অন্ধকার যুগে আছি আমরা।'

মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিনরাত গা ঘেষাঘেষি করে জীবনযাপন করতে হয়। গলদঘর্ম ভিড়ে হন্তদন্ত সুতীর্থের বাসযাত্রার যে বর্ণনা পাই তার মধ্যেই মনুষ্যবিরোধী বিতৃষ্ণাকে আমরা সাকার হয়ে উঠতে দেখি। কোনো সহযাত্রীর মুখে সদ্যবসন্তের দাগ, খোসা উড়ছে, কোনো লোকের মুখে দুর্গন্ধ, 'ডানদিকের মানুষটার গরমির রোগ', কারো কালো পুরু ঠোঁট জুগুপ্সা জাগায়। বিরূপাক্ষ-জয়তীর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সেই বিরূপতা সংহতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জয়তীকে বিয়ে করেছিল অশিক্ষিত রুচি-হীন হঠাৎ-বড়লোক বিরূপাক্ষ টাকার জোরে—'তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল টাকার জোরে, আমার জোরে নয়।' জয়তীর প্রাক্তন অনুরাগীদের সে পরমাই বলে; তার কোনো প্রেম ছিল না, সে শুধু খোকার বাপ হতে চেয়েছিল। জয়তীও বিরূপাক্ষের লক্ষ-লক্ষ টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, আন্তরিক ঘৃণাকে অবদমিত করে। ক্ষেমেশের বাড়িতে জয়তী থাকতে চাইলে ক্ষেমেশ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বাবুর মত আছে তো?' যেন জয়তী বিরূপাক্ষর স্ত্রী নয়, রক্ষিতা। একটি ছোটগল্পের নায়িকা শচীর যেমন মনে হত, বারবিলাসিনী' সে। বিরূপাক্ষ-জয়তীর দাম্পত্য জীবনের কদর্যতারই বহুগুণিত রূপ যেন অন্য উপন্যাসে মাল্যবান-উৎপলার দাম্পত্য জীবনে। মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা, এই 'শচীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল', নয় এই নারী দিব্যকল্পনার 'স্বর্গীয় শিখার মতো' নয়। মাল্যবান উৎপলার সেই শ্রীহীন দাম্পত্যজীবনের জুগুপ্সাময় বর্ণণার মধ্যেই যেন প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে জীবনানন্দের বিরূপ বিতৃষ্ণা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'অনুভূতির সমতা নেই'। দুটি প্রাণী, উপর নিচ দুই ঘরে আলাদা থাকে। নিচে মাল্য-বানের ঘরে প্রায় কখনোই আসে না উৎপলা, বাড়ির গৃহিণীর স্পৃহার সম্পূর্ণ অভাবে, তার ঘরটা হতচ্ছাড়া। উপরের বাথরুমেও স্বামীকে স্নান করতে দিতে চায় না উৎপলা। মাল্যবানকে ফুটপাতে শুতে যেতে বলতেও কুণ্ঠিত হয় না। মেজদা-মেজবৌঠান এলে বাস্তবিকই মাল্যবানকে চলে যেতে হয় মেসে। 'অপ্রেমই শিখিয়েছে উৎপলাকে' মাল্যবানের প্রতি এমন তীব্র দুর্ব্যবহার করতে। স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ মানেই বিবাদ, মাল্যবানের ভাষায় 'চমৎকার কবিয়ালী লড়াই'। রাত্রে দোতলায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে রেগে যায় উৎপলা—'রাত দুপুরে ঝাকড়া করতে এলো শায়েন।' উৎপলার চাই শাড়ি গয়না খাওয়া দাওয়া আরামবিলাস—'পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ ঘুচিয়েছে বটে উৎপলা, কিন্তু তাই বলে শরীরের স্বাদের সঙ্গে নয়।'

মাল্যবানের স্বভাব বিপরীত। মেয়েকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গিয়ে দুজন সারাক্ষণ ঝগড়াই করে। মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দিকে নজর দেবার সময় পায় না—'রাজযোটকে যাদের বিয়ে হয়েছিল, সেই বাপ-মা এই মেয়েটির কোনো কথা খেয়ালের ভেতর আনল না।' তাদের অনুভূতির যে সমতা নেই তা আরো প্রমাণ হয়ে যায়, যখন চিড়িয়াখানায় হাতি দেখে মাল্যবানের মনে হয় চীনের বা ভারতের জ্ঞানবিন্দুদের মতো, তখন উৎপলা হাতির বুড়ো দিদিমার মতো মুখ দেখে কৌতুক, অসাধ ও নিরেট অবস্তি বোধ করে। এই দাম্পত্য পরিস্থিতির মধ্যে কেন যে সে বাবা হয়েছিল তা সে ভাবতেই পারে না—কেন হীন কুৎসিত উচ্ছ্বাসে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল তা ভাবতে মাল্যবানের মাথা গরম হয়ে যায়। মেয়ে যে দিনে-দিনে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে দিকে উৎপলারও খেয়াল থাকে না। স্বামীর প্রতি অবজ্ঞায় বিরূপতায় উৎপলা ভাবে সে যদি জনৈক অনুপম মহলানবীশের স্ত্রী হতে পারতো। এখন কখনো সে শ্রীরঙ্গের সঙ্গে, কখনো 'শিশ্নোদরতন্ত্রী' অমরেশ, যার সর্বশরীর থেকে 'সুলভ আত্মতুষ্টি চুইয়ে পড়ছে', তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিভৃতে সময় কাটায়। উৎপলা সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়েদের মতো বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে, মাল্যবানের সঙ্গে বিয়েই তার বিধিনির্ধারিত ছিল। আজ মনে হয়, বিয়ে না হলেই সে সুখী হত। চিড়িয়াখানায় অবিবাহিত কয়েকটি মেয়েকে দেখে সে ভাবে 'যারা বিয়ে করে নি, তাদেরই রগড়।' সে অবিবাহিত কুমারী মেয়ে সাজতে চায়, 'ভেবেছিলাম আজ কপালে সিঁদুরের টিপ পরে আসবো না।' উৎপলা চায় মাল্যবান হ্যাট-টাই পরুক, তার পদক্ষেপে সৌন্দর্য মাত্রা দৃঢ়তা আসুক। অন্যদের ঈর্ষা জাগানোর জন্যে এই নারী সিনেমায় বক্সে বসতে চায়, অন্যেরা ঈর্ষায় না পুড়লে রগড় জমাও হয় কী করে?' সিনেমায় গিয়ে সে পাশের সীটের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করে অনর্গল, আধ-ঘুমন্ত মন্টুকে গাঁট্টা মেরে জাগিয়ে দেয়। একবার মাল্যবান অসুস্থ হয়ে বমি করলে, মানুষটাকে খানিকটা নির্যাতন-নিষ্পেষণ করার জন্যেই তার দুটো দামি ধোয়া ধুতি দিয়ে নোংরা জায়গাটা নিকিয়ে নেয় উৎপলা। অথচ একেবারেই যে হৃদয়হীন উৎপলা তা নয়; তীব্র বকাবকির শেষে যে প্রতি-বেশিনী মেয়েকে ক্ষীর খেতে দেয়, সোনার মাকে তার কুষ্টরোগগ্রস্ত ছেলের জন্যে রোজ ভাত-ডাল-মাছ নিয়ে যেতে বলে, তার সমস্ত হৃদয়হীনতা মাল্যবানের প্রতি। মাল্যবান ভাবে, 'কী হবে এই বাতাস যন্ত্রণার নিয়ে। এই নারী নিয়ে কী করবে সে।' বাঘের মাসি বেড়ালকে মেরে মাল্যবান

ঘরের ভিতরের নারীসোনালিয়াদের হিংস্রতাকে হত্যায় একটা নিগূঢ় তৃপ্তি পায়—এইটুকুই সে করতে পারে। উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না, তবু আজীবন চালাতে হবে। যে-সব স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্যনিষ্ফলতায় জীবনযাপন করে, 'একটা ভাঙা গেলাসের কাচগুলো জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের···ভাঙবেই, জল খেতে হবেই···।' নিজেদের যৌনজীবন নিয়ে ভেবে মাল্যবান বিষন্ন শ্লেষে হেসে ওঠে, মজুমদার সরকারের মতো হেসে পেট ফেটে যায় তার। সে ভাবে তাকে, 'নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অপ্রেমে কামনার টানে, বেশি লালসা রিরংসায় উৎপলার মতোন একজন ভালো বংশের সুন্দর শরীরের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের নিরেস মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কী নিদারুণভাবে···।'

কিন্তু কেন এই নির্মম হৃদয়হীনতা? পাশের বাড়ির সদ্যোজাত শিশুটি আঁতুড়ে মারা গেলে স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যেই মাল্যবান ভাবে, হয়তো উৎপলা বহু সন্তানের মা হতে চেয়েছিল, হয় নি, হয়তো তাই 'সেই সব নিহিত তেজ উৎপলার আপাতমূর্খতায় অতৃপ্তিতে ঝরে পড়ছে।' ভাবে, তার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে আটটি-দশটি সন্তানের মা হয়ে সুখী হতো উৎপলা। যৌন-অতৃপ্তিই তার হৃদয়হীনতার কারণ হয়তো। কারণ যাই হোক, তার জীবনে 'নম্র বন্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হলো না, খড়খড়ে আগুনখড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনীর মতো মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ আর বিবাহিত জীবন।' দুঃস্বপ্নময় সভ্যতার প্রতীক যেন এই দুঃস্বপ্নময় দাম্পত্যজীবন—মূল্যবিপর্যয়ের প্রতীক। বিবাহিত জীবনে আর নয়, বরং হয়তো অবিবাহিত নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে সেই স্নিগ্ধতা দেখা দিলেও দিতে পারে। যেমন সুতীর্থ-মণিকার রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে। মণিকা সুতীর্থের বাড়িউলী; উপরতলায় স্থায়ীভাবে অসুস্থ স্বামী ও মেয়ে অমলাকে নিয়ে থাকে। মাসের পর মাস সুতীর্থর ভাড়া বাকি পড়ে থাকে। কর্তব্য হিসাবে ভাড়ার তাগাদা দেয় বটে মণিকা, কিন্তু আসলে তার যেন তাগিদ নেই। প্রায়ই সুতীর্থ মণিকার কাছে খায়। তার সব দায়দায়িত্বই যেন মণিকার। 'চেহারা অনির্বচনীয় তবু, যেন চল্লিশ ফিরে যাচ্ছে ত্রিশে, ত্রিশ ঠেকছে গিয়ে কুড়িপঁচিশে। অথচ সত্যিই বয়স হয়েছে; তেমনি মর্যাদা···।' মণিকার শরীরে রূপ আছে, রূপের অহঙ্কার আছে, ভাবক পুরুষের সামনে সে ছাড়া অন্য কেউ নারীসত্তা' আছে তা সে ভাবতে পারে না। এই নারীর সঙ্গে

সুতীর্থর রাত্রিকালীন সংলাপ উপন্যাসের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। বিরূপাক্ষ আর মণিকা ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে বসে আছে দেখে সুতীর্থর ভালো লাগে না, মণিকাও সেই আচরণের কারণ বারে-বারেই ব্যাখ্যা করতে থাকে সুতীর্থর কাছে। তারা কি পরস্পরকে ভালোবাসে? বাস্তবিকই রহস্যময় তাদের সম্পর্ক। একটা ইঙ্গিত আছে লেখকের দুটি বাক্যে, পরপুরুষের প্রতি প্রেমের 'সে সব ধাক্কা আসে না অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় সূর্যে কোনো শস্য ফলায় না।' সুতীর্থ-মণিকা কি সেই রকম 'আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি' করছে। আজ বিবাহিত জীবনের 'নম্র বশ্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা' অতীতের ঘটনা—স্মৃতিচারণের বিষয় প্রায়।

তাই মাল্যবান-উৎপলার বিবাহিত বিষাক্ততার পাশে বৈপরীত্যরচনার জন্যে আমরা পেয়ে যাই এ উপন্যাসে উৎপলার মেজদা মেজবৌঠানের এবং বিপিন ঘোষের বিবাহিত জীবনের কথা। মেজদা মেজবৌঠানের প্রত্যেক কথার ভিতর দিয়ে যৌনসম্বন্ধের মিছরি-মাখানো ভালোবাসার মর্ম ফুটে ওঠে। আর বিপিন ঘোষ এত বেশি স্ত্রীনির্ভর ছিল যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে দিশেহারা হয়ে যায়; জনে-জনে ডেকে সে দাম্পত্যসৌভাগ্যের স্মৃতি রোমন্থন করে। বিপিন ঘোষের বিবাহিত তৃপ্তির খবর মাল্যবান উৎপলাকে জানালে, উৎপলা তাকে খুব-সংক্ষেপে বলে 'উল্লুক'। মেজদা-মেজবৌঠান, বিপিন ঘোষের দাম্পত্য-প্রণয় যেন অতীত থেকে ছিটকে এসে পড়েছে বর্তমানে। তা অতীত; আর কোনো দিন ঘটবে না। বর্তমানের এই দুঃস্বপ্নময় তটভূমিতে দাঁড়িয়ে নায়কেরা অতীতের স্মৃতিচারণ করে। যেন তৃতীয় পর্যায়ের জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'-র অতীত সুষমার দিকে শেষবারের মতো ফিরে তাকান। 'গ্রাম ও সহরের গল্প'-এর শচী বালিগঞ্জের ড্রইংরুমে বসে ভাবে 'বাংলার পাড়াগাঁর উচ্ছন্ন-যাওয়া ভিটের ওপরেও যে-অন্ধকার নেমে আসে, যে-ঘেটুফুল ফণিমনসা বাসা বাঁধে তা কি নরম,—নিবিড়।' স্বামীর যাওয়ার সময় সে ভিনেগারের শিশি সরিয়ে বরং আর একটু কাসুন্দি ঢালে। সোফার উপর বসে ভাবে, 'চকমোহানার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে।' মণিকাকেও সুতীর্থ বলে, 'আমি নিজেও তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ, ঘাট, বিল, জঙ্গল, তেপান্তর থেকে।' আজ 'নিভে গেছে সব' আজকের নষ্টভ্রষ্ট সভ্যতার তুলনায় বাংলার মুখ রমণীয় ছিল একদিন।

বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আল্পনার পটের ছবির মতো সুহাস্য পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায়...।

আগের পৃথিবীও ঢের ভালো ছিল—লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙযুগের চীন, খ্রীষ্টানের ভারত, খিলিয়ুন পেরিক্লিসের গ্রীস। প্রায় যেন ক্লসট্রোফোবিয়া-পীড়িত নাগরিক অবরুদ্ধতার মধ্যে বাস করে মাল্যবানকে উন্মথিত করে পুরোনো স্মৃতি শীতের শেষ রাতে হিজলবনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে বাউলের গানের সুর ভেসে আসা, কালিজিরা ধানশালি রূপশালি ক্ষেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফেরা। অঘ্রাণের বিশই জন্মদিনের তারিখে তার মনে পড়ে যায় বেয়াল্লিশ বছর আগে কলকাতা থেকে দেড়শো মাইল দূরে পাড়াগাঁয় সে জন্মেছিল—সেখানে ছিল খেজুরের আকাল, সুপুরির বন, শীতের রাতে ধানখেতের শূন্যতা, উদাস রাতে ফেউয়ের ডাক। সেই হারানো পাড়াগাঁই যেন তাঁর মৃত মা। মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তার 'পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ে—মার কথা।' যেমন উৎপলা আর শহর একাকার। উৎপলাও মা হয়েছে—'নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপছিপে ছটফটে জল যেমন পুকুরের সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপের ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে।' ভিন্ন পরিবেশে সেই সদাত্মাকে চায়, কিন্তু আজ আর পায় না। শুধু ভাবে 'কোথায় গেল সে-সব।' সুতীর্থর সহপাঠী মধুমঙ্গল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, 'কোথায় গেল পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী? ...সেদিনকার সমাজ-সংসার দিনক্ষণ রূপযৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হয়ে গেল।'

সমাজসংসার কেন এমন পচে ছিবড়ে হয়ে গেল? 'মাল্যবান' উপন্যাসে একটা বাক্য—'আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যশক্তির গোলকধাঁধা নিয়ে এমনি অদ্ভুত অপৃথিবী।' এই অদ্ভুত আঁধার-ভরা পৃথিবী যে অপৃথিবী হয়ে উঠেছে সে জন্য কলকাতার বাণিজ্যশক্তি, অর্থাৎ নাগরিক বণিকসভ্যতার অর্থের অনর্থ তার জন্যে দায়ী। 'মাল্যবান'-এ সভ্যতার অসুখের কারণ স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নি। সেই কারণকে পৌনঃপুনিকভাবে নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন জীবনানন্দ 'সুতীর্থ' উপন্যাসে। উপন্যাসের শেষে ক্ষেমেশ বলে, 'মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।' সে কবিতার শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে আরো বলতে পারতো, 'জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।' কেন নেই? নেই, কারণ আজকের সভ্যতার

উপাস্য দেবতা টাকা এবং 'এই দেবতাই ব্যাধি।' 'আজকালকার পৃথিবীতে বোলতা, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই প্রমিসরি নোট খায়, চেক খায়, চিনি মিশ্রি খেতে চায় না…।' সুতীর্থর এক বন্ধু বিজনও জানায়, সে এক বাটিতে চিনি, অন্য বাটিতে টাকা রেখে দেখেছে পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। 'টাকা দিয়ে বকনার দুধও পাওয়া যায়'—মণিকাকে এই খবর দেয় তার অসুস্থ, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামী অংশুবাবু। যে-টাকার বীজাণু এমন ভয়ংকর, বৈনাশিক শক্তি তারই যেন মনুষ্যমূর্তি বিরূপাক্ষ। এই বিরূপাক্ষর টাকা ভদ্র-অভদ্র সব ঘাঁট থেকে টেনে আদায় করা। সে তার স্থূল অকপট ভঙ্গিতে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলে, 'আমিত্তির নাহান প্যাচে প্যাচে রস সেই জিনিসের হেইয়ার নাম ট্যাহা।' সেই নিবিড় রাত্রে মণিকা এই বিরূপাক্ষ সম্বন্ধে মনে মনে ভাবে 'ও বড়জাতের মানুষ নয়—কোনো স্বাভাবিক মহত্ত্বই নেই—ওর হালচাল; ধাষ্টামো আছে, শরীরের তাগদ—তেজ যাকে বলে—হেঁড়ে—বেল্লিকপনা এই সব আছে; এই সবের থেকেই টাকার উৎপত্তি হয়, আমাদের ব্যাঙ্কগুলো বেঁচে থাকে।' সেই সময়েই আবার মনে মনে ভাবছে বিরূপাক্ষ—মণিকার মতো নারীদের চেনে সে, নিরবচ্ছিন্ন ভান ও ভাঁড়ামোয় প্রায় কোনো পুরুষের কাছেই এরা শিং ভাঙে না, 'কিন্তু সে বেটাচ্ছেলের টাকাটা টাকার মতো হলে বেশ এলিয়ে আগ বাড়িয়ে থাকে।' কলকাতার সব অলিগলিতে, সব দেবী-পিশাচীর মুখেই সে একটা কথাই শুনতে পায়—'টাকার বড় দরকার।' পঞ্চাশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক জয়তীর হাতে দিয়ে জয়তীকে আজ রাতে তার ঘরে শুতে বলে বিরূপাক্ষ সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাসে। সে ভাবে, 'মাঝে-মাঝে ধনবৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ না দেখালে মানুষ কি করে জীবন পায়।' 'বিলাস' গল্পের শান্তিশেখরও বলেছিল, 'নানা মেয়ের মুখ চেয়ে চলতে হলে ষাঁড়ের মতো শরীর চাই, ধর্মের ষাঁড়ের মতো টাকা …।'

> পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
> অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।
> পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে
> সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।

শুধু যে নারীকেই নিয়ে যায় তাই নয়। 'যার তিনটে বাড়ি আছে—দুটো গাড়ি, চেম্বার অব কমার্সের চাঁই. মাথায় খদ্দরের টুপি, হাতে হুণ্ডি, তার টাকায় যে খায়, মুখ মোছে, তারই আজ সত্য অসত্য সম্বন্ধে মতামত দেবার অধিকার।' সুতীর্থ বুঝে যায় অদ্ভুত আঁধার পৃথিবীতে আসবেই, মানবসম্পর্ক

দূষিত-বিষাক্ত হবেই, সাহিত্য-জ্ঞান-জিজ্ঞাসা-নিরীক্ষা যা হবার হয়ে গেছে, আর কোনদিন হবে না। 'এখন থেকে টাকা হবে শুধু।'

এই পরিবেশের সঙ্গে জীবনানন্দের নায়কেরা, যাদের নামে উপন্যাস দুটির নামকরণ, তারা এই মুদ্রাকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজের 'repressive anxiety structure'-এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তারা আত্মমগ্ন, বিচ্ছিন্ন, একাকীত্ববোধে আচ্ছন্ন। পশ্চিমী সাহিত্যে ডস্টয়েভস্কি থেকে এই ধরনের অনিকেত মানুষের মিছিল শুরু হয়েছিল। আধুনিক উপন্যাসের একটা লক্ষণই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জাতীয় নায়কচরিত্র। যে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে, কাফকার ভাষায় 'nihilistic fragments' হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার যন্ত্রণাবোধ আধুনিক উপন্যাসের মতো এই উপন্যাস দুটিতেও বিধৃত। 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এর হেরম্ব, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র শশীর মধ্যে আমরা এই অনুভূতিকে রূপায়িত হতে দেখেছিলাম, 'চতুষ্কোণ'-এর রাজকুমারের মধ্যে —যে রাজকুমার সারাদিন নিজের ঘরে 'একাই সে অনেক হইয়া নিজের জগৎ ভরিয়া রাখে।' জীবনানন্দ নিজেই এই অনুভূতির কাব্যরূপ দিয়েছিলেন 'বোধ' এবং 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায়। 'বিলাস' গল্পের শান্তি-শেখরও এই রকম অনিশ্চিত মানুষ। মধ্যবয়সী, কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, উদ্যম নেই তার। শরীর ভারি খারাপ লাগে তার। হাতঘড়িটা সে মামার টাকায়, না খুড়োর টাকায়, না অন্য কারো টাকায় কিনেছিল তা মনে করতে পারে না।

সুতীর্থকে হীরো না বলে অ্যান্টি-হীরো বলাই ভালো। লিখতো, ইদানীং লেখে না। সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, ছোটখাট সিদ্ধান্ত নিতেও এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে। সে বলে বেড়ায় তার শ্বশুরবাড়ি-পাশগাঁয়ে ছেলেমেয়েবৌ আছে—কিন্তু সবই বানানো গল্প। 'লোকটা অন্যমনস্ক'—একটা শূন্যতা আধোশূন্যতায় মগ্ন হয়ে থাকে তার মন। সুতীর্থ তার ম্যানেজিং ডাইরেকটরকে বলে, 'আমি একজন নিতান্তই বাইরের মানুষ।' বাস্তবিকই সে বাইরের মানুষ, কোথাও যেন তার শিকড় নেই। তার প্রতি সহানু-ভূতিশীল একজন ধর্মঘটী তাকে 'ত্রিশঙ্কু' বলে। মণিকার মতে সে 'কাচাছাড়া ভাবের মানুষ।' সে হিজলী ক্যাম্পেও ছিল, অনার্স পরীক্ষাও দিয়েছে; রিজলবার ছুঁপিয়েছে, এম-এও দিয়েছে—অথচ রিজলবার বা বিশ্ববিদ্যালয় কোনটাতেই তার আস্থা ছিল না। বামপন্থী রাজনীতিতেও সে বিশ্বাস করতে পারে না, আবার মোহনবাগ করমচাঁদকেও সারাৎসার মনে করতে

পারে না। দ্বিতীয় নায়ক মাল্যবানের বিয়াল্লিশ বছর বয়স। 'বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেল জীবনে। সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল। কাটাকাটি এখনো চলছে—চলবে, যে পর্যন্ত না মাটিতে মাথা রাখি।' মধ্য-শ্রেণীর মানুষ মাল্যবান, ভালো মাইনে পায়, কিন্তু সংসারে তার কোনো মর্যাদা নেই। স্ত্রী উৎপলা মেয়ে মনুকে নিয়ে দোতালায় চমৎকার থাকে, নিচের তলায় অবজ্ঞাত জীবন মাল্যবানের। স্ত্রীর সঙ্গে মর্মান্তিক বিরূপতার সম্পর্ক তার, অথচ 'স্ত্রীকে ঘুচিয়ে দিয়ে একা চলবার কোনো শক্তিই তার নেই।' কোনো সহজ স্বাদ নেই জীবনে তার, প্রায়ই তার চোখে ঘুম আসে, বড্ডো একঘেয়ে লাগে তার সব কিছু—কী ক.রে সে কিছুই ঠিক পায় না। 'শান্তি ভালোবাসে; নিজের সুখ-সুবিধা খানিকটা ছেড়ে দিয়েও।' 'নিজেকে অবিচারিত—অভালোবাসিত—বিড়ম্বিত মানুষ বলে খতিয়ে নিতে নিতে মনটা লঘু হয়ে ওঠে তার।' সে নিঃসঙ্গ একা মানুষ, সে 'আলতো জীবন যাপন করে।' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে উৎপলা বলে, মাল্যবানের 'কোথাও ডাক নেই, কেউ পোঁছে না·· কোনো মানুষই আসে না—ডাকলেও আসে না।...সেই বিয়ের পর থেকেই দেখছি কেরানীবাবুর নিচের তলার ঘরটিতে দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন, আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন।' সে খায়দায়, সংসারের বে:নগিরি করে বটে, কিন্তু সে ভাবে 'মাটির নিচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো অফিসগিরিই তার সব নয়...এ-সবের চেয়ে সে আলাদা।' সে পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না ভেবে বিষণ্ণ হয়। নিবিষ্ট পাঠকের মনে পড়বে 'রূপসী-বাংলা'য় দেশবন্ধুর কথা আছে, যেমন আছে ইয়েটস-এর কবিতায় পার্নেলের কথা। পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না, বটমলি বিগল্যাণ্ড ব্রাদার্সের চাকরির চেয়ে বড় কিছু তার পক্ষে সম্ভব নয়, স্ত্রী-মেয়ে এবং কলেজ স্ট্রিটের তিনখানি ঘরই তার চরম প্রাপ্তি—এ-সব জেনেও তার 'মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে' আরোহণের ইচ্ছে হয়, কেরানীর ডেস্ক ও উৎপলার স্বামীত্ব থেকে ঘুচিয়ে সে গোলদীঘিতে ঘুরতে ঘুরতে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালির দুরবস্থায় উত্তেজিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা হলে অবশেষে 'একটা বিড়ি জ্বালায়'। সে নানা কল্পনা করে—সমাজসেবা করবে, দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করবে, বিপ্লবের তাড়নায় তাড়িত হবে। নিজের মেয়ে মনুকে যদিও বেশি পছন্দ করে না মাল্যবান তবু মাঝে মাঝে তাকে ইতিহাস-ভূগোল পড়াতে বসে এবং সেই সঙ্গে 'মানুষের জীবনের মানে—প্রথম মানে—মাঝারি মানে—

বিশেষ করে অন্তিম অর্থ শেখাতে চায়। প্রতিবেশিনী বধূ রমার মৃত্যুর পর প্রায়ই সে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে আর ভাবে 'স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস'। বিরুদ্ধ পরিবেশের নির্মমতা স্বার্থপরতার মধ্যেও জীবনের সে অন্তিম অর্থ খোঁজে বলেই সে আলাদা নিজভূমে পরবাসী মানুষ। নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানাতে পারে না বলেই সে ক্রমে ক্রমে বস্তুজগৎ থেকে নিজের সত্তাকে সরিয়ে নিয়ে অন্তিম জিনিস স্বপ্নের মধ্যে আত্মস্থ হয়।

'মাল্যবান' উপন্যাসের শেষে প্রতিধ্বনি মুখর কয়েকটি বাক্য গানের ধুয়ার মতো বারে বারে ফিরে আসে :

শীতের রাত ফুরুবে না কোনোদিন ?
না।
কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না. ফুরুবে না।…
কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনোদিন—

মাল্যবান-উৎপলার এই কবিতার মতো সংলাপের সামান্য আগে উৎপলা বলেছিল 'ভোর হবে না আর', আর মাল্যবান ভেবেছিল 'কোনোদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর'। মনে পড়ে যায়, জীবনানন্দ কবিতায় অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছিলেন, কারণ অস্তিত্বের ভয়াবহতা জেনে তাঁর সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়, বেদনায় আক্রোশে ভরে গিয়েছিল ; বারবার তিনি বলেছিলেন, কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন জাগবো না আর—।' যে-মানুষ একগাছা দড়ি হাতে অশথের কাছে গিয়েছিল, সেও

রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার
কোনোদিন জাগিবে না আর।

জীবনানন্দকে ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে 'বড়ো জাতের রচনার মধ্যে যে শান্তি আছে' তার ব্যাঘাত ঘটেছে জীবনানন্দের লেখায় এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই শান্তির ব্যাঘাতের জন্যেই তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। মনে হয়

তারই উত্তরে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন—তারই উত্তরে মনে হয়, কারণ সেখানে এই প্রশ্নেরই বিস্তৃত আলোচনা আছে। জীবনানন্দ লিখেছেন, 'অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকেরা Serenity জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ [ক্ষুণ্ণ ?] হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর Serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না।...mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে তাতে Serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলে তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।...আমার তাই মনে হয় রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা Serenity-র সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টিপ্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাই নিষ্ফল হয়ে যায়। বীঠোফেনের কোনো কোনো symphony বা sonata-র ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে,—কিন্তু আজও তো টিঁকে আছে—চিরকালই থাকবে টিঁকে, তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।'

জীবনানন্দের এই চিঠির অধিকাংশটাই উদ্ধৃত করলাম, কারণ তার আলোয় উপন্যাস দুটির স্বরূপ বুঝে নিতে সুবিধা হবে। 'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ' কোনো উপন্যাসেই শান্তি নেই, বরং যে-অশান্তি আঘাত করে তা-ই এই উপন্যাস দুটির সৃষ্টিপ্রেরণা। আর সেই সৃষ্টিপ্রেরণার অকৃত্রিমতা সন্দেহাতীত। বানানো নয়,—আভ্যন্তরীণ কোনো মর্মভেদী যন্ত্রণায় তাদের জন্ম, তাঁর এই সময়ের অনেক কবিতার মতোই। আনন্দের নয়, দুঃখের তুমুল আবেগে এরা রচিত। এখানে তিনি পাতালের বিষজর্জর অন্ধকারে অবতরণ করেছেন—তাই নায়কীয় পরিবেশ সম্বন্ধে এমন ঘৃণা, এত জুগুপ্সা। দান্তের

ভিভাইন কমেডির উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ; বাস্তবিক দান্তের ইনফের্নোর এক আধুনিক প্রতিরূপ তিনি গড়ে তুলেছেন শহর-কলকাতার পটভূমিতে লেখা এই দুই উপন্যাসে। 'নরক শ্মশান হলো সব'—এই মর্মান্তিক অনুভূতির দ্বারা এই দুই উপন্যাস প্রাণিত। আগুন জ্বলে উঠেছে তাদের মধ্যে, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে সংহত হয়ে আছে বিস্ফোরণ। অবশ্য কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে, আকস্মিক মৃত্যুর কিছু আগে থেকে, জীবনানন্দ যে 'তিমিরবিনাশী' হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন কবিতায়, সেই জ্যোতির্ময়তার আভাস উপন্যাসেও ঈষৎ আছে। তিনি কবিতায় 'নব-নব 'মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে' 'মানুষের অরুণোদয়, জয়' উচ্চারণ করেছিলেন। আর এক কবিতায় লিখেছেন—

> সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই ;
> লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
> চাই।

উপন্যাসের শেষে 'উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ' শুনতে শুনতে জেগে ওঠে মাল্যবান। আবার ঘুমিয়ে পড়ে। মেজদা মেজ-বৌঠানের ছেলেমেয়েকে, মনুকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে মাল্যবানের মনে জাগে 'একটা সর্বাত্মক করুণা', 'একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতা'—মরা বেড়ালছানা, মনু, বিপিন ঘোষের স্ত্রী, এমনকি মাল্যবানের নিজের স্ত্রীর জন্যেও তার মন করুণায় অভিষিক্ত হয়; স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে। সুতীর্থ দেখে 'চারদিকে মাধবীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে—শূন্যে শূন্যে—বন্ধ্যা পৃথিবীর কোলে—আলোর নির্ঝরে।' মাঝে মাঝে প্রীত, খানিকটা উদ্‌গত ও সমাহিতভাবে সে অন্তরে নীলনদের শীতের রৌদ্রের নীলিমা অনুভব করে। জয়তীর প্রতি কেমেশের কথার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ নিজেই যেন বলেন, 'মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে, ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার ঝোঁক, অশান্তর দিকেই ঝুঁকে পড়েছে বেশি। তবু উৎরে যাবে.. জীবনেই; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে। সেই ভাঙার দিকে ঝোঁকেও, অশান্তির কথাই জীবনানন্দ উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। দূর পারপ্রেক্ষিতে তাকিয়ে যে আলো স্নিগ্ধতার কথা তিনি বলেছেন, সেই অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি ইনফার্নোকে যেমন বিশ্বাস্য করেছেন, অকালে আকস্মিক মৃত্যু না হলে, তেমনি হয়তো পারাদিজোকেও বিশ্বাস্য

করে তুলতে পারতেন। কিন্তু সে কথা থাক। দূরের দিকে তাকিয়ে যেমন ভেবেছিলেন 'উৎরে যাবে', তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন 'আমরা থাকতে ও-সব হবে না কিছু'। যা হয়েছে তারই রূপায়ণ, হয়তো অভিপ্রেতভাবেই আপাত-শিথিল, সৃষ্টিপ্রেরণায় অকৃত্রিম এই দুই অন্ধকার উপন্যাসে। যে দুটি, কবিতার ভাষ্য হিসেবে শুধু নয়, নিজেদের মর্যাদাতেই পরম মূল্যবান।

আইনস্টাইন ও তাঁর জগৎ

দিলীপ বসু

এলবার্ট আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে দুনিয়ার বহু দেশেই নানা রকমের আলোচনা হচ্ছে এবং আলোচনা কেবল জটিল অংক বা পদার্থবিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। তার কারণ আইনস্টাইনের আসল পরিচয় বড় বৈজ্ঞানিক হলেও তিনি ছিলেন, যাকে বলে পূর্ণ মানুষ, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যথার্থ উত্তরসূরী। এই অশান্ত আত্মভোলা মানুষটি বৈজ্ঞানিকের গজদন্ত মিনারে কোনদিনই বাস করেন নি। সারাজীবন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। এইরকম একজন মানুষ জগৎ-সংসার ও বিশ্বপ্রপঞ্চকে কি ভাবে দেখেছিলেন, তাঁর **weltaus-chvung** (বিশ্ববীক্ষা) কি ছিল, এটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, আর সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই স্বল্পপরিসরে হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে আইনস্টাইনের স্থান কি ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে সেটা আগে এক নজরে দেখে নিতে হবে।

আইনস্টাইনের বিশ্ববীক্ষা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীদের সামনে কয়েকটি সমস্যা: ক) আলো কি কণিকা প্রবাহ না তরঙ্গ? খ) আলোর গতিবেগ কি যে কোন অবস্থাতেই সমান থাকে? গ) নিউটনীয় বলবিদ্যা পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র জগতে, তেমনি নক্ষত্রের অতি বৃহৎ জগতে কাজে লাগে না কেন? ঘ)

সূর্যের একেবারে কোলের কাছে বুধগ্রহ কেপলারের নিয়মানুসারে ঠিক ঠিক উপবৃত্তাকারে সূর্য-প্রদক্ষিণ না করে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে কেন ?

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে নিউটনীয় সামঞ্জস্য (Newtonian Synthesis) আমাদের জগৎ-প্রপঞ্চের ধারণাকে বেশ নিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপন করেছিল। তখনকার বৈজ্ঞানিকদের অনেকের মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিজ্ঞানের প্রগতি এতদূর হয়েছে যে, জগৎ-প্রপঞ্চের মূল ব্যাপারটা যেন আমরা বুঝে ফেলেছি। এখন প্রয়োজন হলো—কেবল বিজ্ঞানের নানা শাখাতে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ করা। কাজেই উপরে যে চারটি সমস্যার কথা বলা হলো, তাতে নিউটনীয় সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে উনবিংশ শতাব্দী অবধি বিজ্ঞানের জগতে ধাপে ধাপে যে নিশ্চিত প্রত্যয় জেগে উঠেছিল সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এরই পাশাপাশি অবশ্য দেখতে হবে, ভিক্টোরিয় যুগে, ধনতন্ত্রের স্বর্ণ-যুগে ধনিক শ্রেণীর যে নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয় ছিল, বুর্জোয়ার আধিপত্যই যেন মানব সভ্যতার শেষ কথা। সেটাও ভেঙে চুরমার হলো ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটে, যার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ইতিহাসে প্রথম সফল প্রলেতারিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটল; তেমনি বিজ্ঞানের জগতেও বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই মহাসংকট দেখা দিল, যার কথা আমরা বলেছি। অবশ্যই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক যান্ত্রিকভাবে দেখলে চলবে না, কিন্তু মানুষের চিন্তাজগতের উপরের সৌধে মৌলিক বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটবেই, যদিও অনেক সময়ে পরোক্ষভাবে এবং দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে।

বিজ্ঞানের জগতের এই মহাসংকটে আইনস্টাইনের আবির্ভাব। ১৯০৫ সালে 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের' প্রবক্তা রূপে যখন তিনি এগিয়ে এলেন, তখন বয়স তাঁর মাত্র ২৬, সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন শহরের তিনি একজন সামান্য পেটেন্ট অফিসার মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল চাকচিক্যময় পি. এইচ. ডি প্রমুখ তকমাও তাঁর নেই। আইনস্টানের পিতৃ ও মাতৃকুল, দুই-ই অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি খোঁজ করে দেখা গেছে তার মধ্যে সাধারণ ইহুদী ব্যবসায়ী ছাড়া আর কোন তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল না। অজ্ঞাতকুলশীল বলা যেতে পারে সব দিক থেকেই।

১৯০৫ সালে 'বিশেষ' এবং ১৯১৫-তে 'সাধারণ' আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে আইনস্টাইন নতুন যে বিশ্ববীক্ষা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, তার প্রধান কথা হচ্ছে—দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা, এই তিন মাত্রার সঙ্গে তিনি কাল (বা

সময়)-কে আর একটি চতুর্থ মাত্রা ধরে প্রমাণ করলেন যে, অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর বা অতি বৃহৎ নক্ষত্রলোকের কাণ্ডকারখানা বুঝতে হলে আলোর দুরন্ত গতি-বেগের তুলনায় আনুপাতিক ভাবে হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য এমন গতিবেগ দিয়ে কাজ করতে হয়, আর সেটা করলেই তখন সময় (বা কাল) একটি নতুন চতুর্থ মাত্রা রূপে দেখা দেয়।

সামান্য অংকের অবতারণা করা যাক। আইনস্টাইনের ফরমূলা হচ্ছে :—

$$t=\frac{t\,o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে t হচ্ছে ধাবমান বস্তুর সময়, t o হলো স্থির বস্তুর সময়, v হলো ধাবমান বস্তুর গতিবেগ এবং c হলো আলোর গতিবেগ। খুব সোজা অঙ্কের সাহায্যেই তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে v যদি c-র আনুপাতিক ভাবে হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য হয় তাহলেই $\frac{v^2}{c^2}$ সংখ্যাটিও হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য হবে, না হলে সাধারণভাবে t হবে t o-এর সমান, অর্থাৎ সময়-সংকেত হবে না।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। উপস্থিত আমাদের মহাকাশগামী রকেট-গুলি সেকেণ্ডে ৫ মাইল করে চলে। তাহলে তাদের সময় সংকোচন কত হবে, উপরের ফরমূলাতে v যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল হয়, তাহলে দাঁড়াল :—

$$t=\frac{t\,o}{\sqrt{1=\frac{5\times5}{186000\times186000}}}$$

কার্যত t=t o দাঁড়াল। কিন্তু v যদি ধরা যাক ½c হয় তাহলে নিশ্চয়ই সময় সংকোচনের ব্যাপারটা হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। আইনস্টাইনের এই ফরমূলা আজ পরীক্ষিত সত্য রূপে আমরা জানি। মহাজাগতিক রশ্মি যখন আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপরদিকে আঘাত করে ভেঙে গিয়ে মেসন-রশ্মির আকার দিয়ে নেমে আসে, তখন তাদের বায়ুমণ্ডলের নিচে বলে আমাদের সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা নয়, কারণ তাদের অ্যাটমীয় 'অর্ধ-জীবন' খুবই সামান্য সময়ের জন্য। কিন্তু আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে তারা

ছুটে আসছে বলে তাদের 'অর্ধ-জীবন' যেন দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা তাদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

তাছাড়া আজকের দিনে যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম (sophisticated) কম্পিউটার গণকযন্ত্রের সাহায্যে আমরা প্রতি সেকেণ্ডের শতভাগের এক ভাগ বা এক হাজার ভাগের এক ভাগকেও পরিমাপ করতে পারি (যেটা নিশ্চয়ই কোনো মানুষের চেতনায় ধরা পড়ে না) তখন অতি সামান্য সময়-সংকোচনও আমরা আজকাল হিসাবে ধরতে পারি। তার দ্বারা আইনস্টাইনের সময় (বা কালের) চতুর্থ মাত্রার সত্যতা প্রমাণিত করতে পেরেছি।

আইনস্টাইনের অন্য অবদানের মধ্যে ভর ও শক্তির সমীকরণের কথা আমরা জানি ($E=mc^2$)।

আইনস্টাইনের সঙ্গে নিউটনের অন্যতম প্রধান প্রভেদ হচ্ছে, নিউটন মহাকর্ষকে দেখেছেন একটি বল হিসাবে যেটা দূরের আর এক বস্তুর উপরে কাজ করে (action at a distance)। আইনস্টাইন মহাকর্ষকে দেখেছেন একটি ক্ষেত্ররূপে।

লিংকন বার্নেটের ছোট্ট কিন্তু সহজবোধ্য "The Universe and Dr. Einstein" বই-এ এই সম্পর্কে সুন্দর একটা উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। মনে করা যাক, একটি এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর, যাতে অনেক খানা-খন্দ আছে, কয়েকটি বালক মারবেলগুলি নিয়ে খেলা করছে। মারবেলগুলি ছুঁড়ে দিলে সেগুলি অসমান এবড়ো-খেবড়ো জমি অনুসারে ছড়িয়ে পড়ে। এই জমির পাশে একটি ১৪ তলা স্তম্ভের ওপরের তলায় এক ভদ্রলোক ও তার নিচের তলার জমির সমান সমান তলে আর এক ভদ্রলোক মার্বেলগুলির ছড়িয়ে যাওয়ার চেহারাটা দেখছেন। যে ভদ্রলোক ১৪ তলার ওপরের তলায় রয়েছেন তাঁর চোখে জমির অসমান চেহারাটা ধরা পড়বে না, কাজেই তিনি ধরে নেবেন, মার্বেলগুলির ওপর একটা বল কাজ করছে। আর যে ভদ্রলোক জমির সমান সমান নিচের তলায় রয়েছেন তাঁর চোখে নিশ্চয়ই জমির অসমান চরিত্রের জন্যই যে মার্বেলগুলি ঐভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, সেটা বুঝতে পারবেন।

তাহলে ১৪ তলার ওপরের ঐ ভদ্রলোকটি হলেন নিউটন আর জমির সমান সমান নিচের তলার ভদ্রলোকটি হলেন আইনস্টাইন।

আইনস্টানের ধারণাতে মহাবিশ্বে যত বস্তু আছে তাদের মহাকর্ষে মহাবিশ্বের বা মহাকাশের চেহারা নির্ধারিত হচ্ছে। এইভাবে মহাকাশের

চেহারা হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোলাবৃত্তি (spherical)। সেটা নির্দিষ্ট (finite), কিন্তু যার কোনো সীমানা (unbounded) নেই।

এর বিরুদ্ধে তর্ক উঠেছে প্রধানত অঙ্কের দিক থেকে, যার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে: মহাবিশ্বের বক্রতা (curvature) যদি ইতিবাচক হয় তাহলে সেটা নির্দিষ্ট, আর নেতিবাচক হলে নয়। ইতিবাচক বা নেতিবাচক বক্রতা বুঝতে হলে আমরা এইভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে পারি: বক্রতা যদি গোলাকার (spherical) হয় তাহলে সেটা ইতিবাচক। আর যদি ঘোড়ার চড়ার জীনের মতো ঢেউ-খেলানো হয়, তাহলে নেতিবাচক, অবশ্যই এই সামান্য উপমার আসল তাৎপর্য অঙ্কের দিক থেকে যেটা এখানে উত্থাপন করা গেল না।

এক কথায় আইনস্টাইনের বিশ্ববীক্ষার (weltanschavung) যদি প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আমরা সূত্রাকারে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে:

আইনস্টাইন প্রকৃতিকে দেখেছিলেন ও বুঝেছিলেন তার বস্তুতান্ত্রিকরূপে, যেটা মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করতেন, জগৎ-প্রপঞ্চ অজ্ঞেয় নয়। তৃতীয়ত, প্রকৃতির রূপ ছিল তাঁর কাছে গতিময়, এর মধ্যে তিনি মহাবিশ্বের বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতিক্ষুদ্র পরমাণু থেকে অতিবৃহৎ নক্ষত্রলোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। মহাকর্ষের ও তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রে যে একীকরণের সন্ধান করেছেন, সেটা কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যতিরেকে অতীন্দ্রিয় কোনো ধ্যানলোক থেকে নয়। বস্তুজগতের মধ্যে খুঁজেছেন মহাবিশ্বের সুষমা বা cosmic harmony, যেটা তিনি তাঁর ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। আর স্পিনোজার ঈশ্বর যদি তাঁর ঈশ্বরিক ধারণা হয়, যা তিনি বলেছেন, তাহলে অবশ্য নিরীশ্বরবাদিতার খুব কাছাকাছিই তাঁকে আসতে হয়।

মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার খুব নিকটেই আইনস্টাইনের অবস্থান, আর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাতেও বরাবরই নিপীড়িত' মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।

আগেই বলেছি, রেনেসাঁসের যথার্থ উত্তরসাধক, পূর্ণ মানুষ আইনস্টাইন। ১৯১৪-এর মহাযুদ্ধের বিরোধিতা করে জার্মানির ৯৩ জন বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ সমর্থনের ইস্তাহার প্রকাশ করল, আর তিনি দু জন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে পাল্টা বিবৃতি দিলেন। সেই যুদ্ধ-বিরোধী বিবৃতিতে বলা হচ্ছে:

'বিশ্ব যাকে এতাবৎ সংস্কৃতি (কুলটুর) নামে ডেকে থাকে, তাকে জাতিদম্ভী প্রচণ্ড আবেগের (প্যাশনের) দোহাই পেড়ে ঢাকা যাবে না। যদি বুদ্ধিজীবীরা এর (জাতিদম্ভের) দ্বারা আচ্ছন্ন হন তাহলে তা বিশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা বিশ্বাস করি, এর দ্বারা সংস্কৃতিকে নষ্ট করা যে হবে শুধু তাই নয়, এর ফলে যে জাতিদের রক্ষার্থে এই বর্বর যুদ্ধকে লাগানো হয়েছে, সেই জাতিদেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।'

১৯২০ সাল থেকেই তাই আইনস্টাইন জার্মানিতে বিতর্কিত পুরুষ, যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের গভীর জগৎ থেকে শ্রমিকের মিছিলে যোগ দেন, যে বৈজ্ঞানিক ১৯২৮ সালে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগ'-এর পৃষ্ঠপোষক (patron) হয়ে ভারতের ও অন্যান্য নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। যিনি বিশ দশকের জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা আয়োজিত শ্রমিকদের ক্লাসে 'প্রকৃতি-রাজ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক' নিয়ে ক্লাস করেন, তাঁকে ফ্যাসিস্তরা ক্ষমা করতে পারে না।

কাজেই জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে তাঁকে জার্মানি (ভাগ্য-ক্রমে সে সময়ে তিনি আমেরিকা ছিলেন) ত্যাগ করতে হল, 'প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স' থেকে ইস্তফা দিতে হলো এবং এর কিছু পরেই আইনস্টাইনকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে শান্তিবাদিতার (pacifism) পথও ছাড়তে হলো। তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দিতে বাধ্য হলেন।

১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাত্র একমাস আগে) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে আইনস্টাইন চিঠি দিলেন হিটলার জার্মানি অ্যাটম বোমা তৈরি করতে পারে, তার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে। আবার ১৯৪৫-এ যখন হিটলার-জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত হলো তখন জাপানে আমেরিকার অ্যাটম বোমা ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন।

আমেরিকা অবশ্য অ্যাটম বোমা ফেলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ঘোষণা করে আমেরিকার প্রগতিশীল মানুষদের ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমননীতি চালালো, যার বলি হলেন রোজেনবার্গ দম্পতি?

মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আইনস্টাইনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর ও মতভেদ যা ছিল তাও তিনি মুক্তকণ্ঠেই বলেছেন ১৯৩৫ সালের এক সাক্ষাৎকারে।

'টলস্টয়ের পরে সত্যিকারের এতো বড় নীতিবাদী নেতা আর কেউ

নেই বলে আমার ধারণা…অনেক ব্যাপারেই তিনি (অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী—লেখক) আমাদের কালের প্রথম সারির ভবিষ্যৎদ্রষ্টা (prophet)…। আমি গান্ধীর গভীর অনুরাগী কিন্তু আমার মতে তাঁর প্রোগ্রামে দুটি দুর্বলতা আছে : যদিও প্রতিরোধ না করাটা (non-resistance, অসহযোগ অর্থেই বুঝতে হবে—লেখক) বিপরীত অবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ, তথাপি এটা একমাত্র আদর্শ অবস্থাতেই প্রয়োগ করা সম্ভব। হয়তো ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এটা করা ফলপ্রসূ হতে পারে কিন্তু আজকের জার্মানিতে নাৎসীদের বিরুদ্ধে নয়। তাছাড়া আধুনিক যুগে যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করাটা গান্ধীর ভ্রান্ত ধারণা। যন্ত্রপাতি আমাদের মধ্যে এসে গিয়েছে এবং তারা থাকবেও।' (Einstein on Peace, পৃষ্ঠা ২৬১, বঙ্গানুবাদ লেখকের)।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ সালে দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল 'এ্যাটমীয় নিরস্ত্রীকরণের' জন্য আইনস্টাইনের কাছে প্রস্তাব করেন, বিশ্বের ১২ জন বিশিষ্ট চিন্তা-নায়কদের দিয়ে একটি আবেদনপত্র স্বাক্ষর করে প্রচার করা হোক। আইনস্টাইন তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন প্রায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে। রাসেলের জবানীতে আমরা জানি, আইনস্টাইনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে (১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫) রাসেল ভেবেছিলেন, আইনস্টাইন হয়তো স্বাক্ষর দেওয়ার পূর্বেই মারা গেছেন, কিন্তু না তা হয় নি। আমাদের যুগের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ পারমাণবিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে আইনস্টাইন আমাদের কাছে বিদায় নিয়েছেন।

তাই দেখি, দেশে দেশে সাধারণ মানুষ থেকে বৈজ্ঞানিকরা, সবাই আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এগিয়ে আসছেন।

আমরাও অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করি।

পিকাসোর শিল্পচিন্তা

অশোক ভট্টাচার্য

শিল্পী হিসাবে পাবলো পিকাসো কেবল অনন্যসাধারণ নন, বিপুল বিস্ময়েরও কারণ। তাঁর শ্রম ও সাফল্য মিকেলাঞ্জেলোর শ্রম ও সাফল্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ কে না জানে এই দুই মহান শিল্পীর অবস্থান ইউরোপের শিল্পধারার দুটি বিরোধী পর্যায়ের বিকাশে। একজন আলবার্তি-দা ভিঞ্চি—দেলা ফ্রান্সেস্কা চিহ্নিত ইতালীয় রেনেসাঁসের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি; অন্যজন বিকশিত হয়েছেন গইয়া-সেজান-লত্রেক-ভান গখের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে, আধুনিককালের সম্ভবত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসাবে। কিন্তু দুটি কারণে এঁরা পরস্পর তুলনীয়: প্রথমত, সমকালে এবং নিকট-পরবর্তীকালে আপন আপন প্রভাবের জন্য, দ্বিতীয়ত, তাঁদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির জন্য, যে প্রাণশক্তি তাঁরা সম্মিষ্ঠ শ্রমে দুটি বিভিন্ন যুগে নিজ নিজ শিল্পকর্মে সঞ্চারিত করে গেছেন। পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসে মিকেলাঞ্জেলো এমন এক ব্যক্তিত্ব যে তাঁকে পাশ কাটিয়ে কোনো শিল্প শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। আর প্রায় ঠিক একইভাবে পিকাসোর শিল্পকর্ম ও জীবন সম্পর্কিত আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা ছাড়া আমাদের সমকালের কোনো শিল্পীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না। এ কথার অর্থ এই নয় যে, যে-কোনো 'আধুনিক' বা 'সমকালীন' শিল্পীর পক্ষে পিকাসোকে গ্রহণ বা বর্জন অবশ্যকর্ম; এ কথার অর্থ এই পিকাসোর শিল্প অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে 'আধুনিক শিল্পে'র বহু বিচিত্র তাৎপর্যের অনেক কিছুই

অজানা থেকে যায়! পিকাসো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, তাঁর বিশেষ শিল্পী-ব্যক্তিত্বের জন্যেই, তাঁর চিত্রে ও ভাস্কর্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলে না। সে জিজ্ঞাসাকে, সদুত্তরের আশায়, তাঁর শিক্ষা ও জীবন সম্পর্ক ধ্যান-ধারণার সমীপবর্তী করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ পিকাসো বরং, হয়তো রেনেসাঁসের ধারাতেই, শিল্পকে শিল্পীর থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চান না। তিনি বলেন, 'শিল্পী কী আঁকেন সেটা বড় কথা নয়, বরং শিল্পী কী সেটাই বড় কথা। সেজাঁর প্রতি আমি এতটুকু আগ্রহ বোধ করতাম না, যদি তিনি জ্যাকুই এমিল ব্রাঞ্চের মতো ভাবতেন ও জীবন কাটাতেন; এমনকি তাঁর আঁকা আপেলগুলো যদি দশগুণ বেশি সুন্দর হত, তাও নয়। সেজাঁর উদ্বিগ্নতাই তাঁর প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করে—এই উদ্বিগ্নতাই সেজাঁর শিক্ষা; ভান গখের যন্ত্রণাবোধ—তাই হল তাঁর জীবনবেদ। বাকি সবই তুচ্ছ।'[১]

২

প্রাণশক্তির দিক থেকে তুলনীয় হলেও মিকেলাঞ্জেলো ও পিকাসোর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। মিকেলাঞ্জেলোর সৃষ্টিকর্ম তাঁর পূর্বসূরী রেনেসাঁশ-শিল্পীদের অন্বেষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। সেই দিক থেকে গ্রীকো-রোমান শিল্পাদর্শের নবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় শিল্পের যে বিকাশ তারই প্রবল ও পরাক্রান্ত প্রতিভূ তিনি। তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী রচিত চিত্র ও ভাস্কর্যে এক দিকে দেখা যায় রেনেসাঁশ আদর্শের চরম উৎকর্ষ অন্য দিকে, তাঁর শেষ দিকের কাজে, রেনেসাঁস-পরবর্তী ম্যানারিজমের সূত্রপাত। সব মিলিয়ে ইতালীয় শিল্পের কালক্রমিক যে বিবর্তন তার এক দীর্ঘ, সঠিকভাবে বলতে গেলে একাধিক, পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় তাঁর কাজে। কিন্তু পিকাসোর শিল্পকর্মে বা ভাবনায় কোনো এক 'জাতীয়' শিল্পের বিকাশ ঘটে নি। এমন কি তাঁর নিজের দীর্ঘকাল প্রসারিত জীবনের সৃষ্টিকর্মগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি চিহ্নিত করা শক্ত। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার শিল্পকর্মে আমি নানান পদ্ধতি অনুসরণ করেছি, কিন্তু সেগুলিকে আমার শিল্পের বিবর্তন বলে, কিংবা এক অজানা চিত্রাদর্শের প্রতি বিভিন্ন পদক্ষেপ বলে মনে করলে ভুল হবে। আমি

যখন যা করেছি, তা বর্তমানের জন্যেই করেছি; আর এই আশাতেই করেছি যে তা সব সময়েই বর্তমানে থাকবে।'[২]

পিকাসোর জন্ম ১৮৮১ সালে, স্পেনের মালাগা শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন ড্রয়িং টিচার। বাবার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে বার্সিলোনার স্কুল অব ফাইন আর্টসে পড়েন, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই সেখান থেকে মাদ্রিদে গিয়ে স্পেনের প্রধান শিল্প-শিক্ষালয়ের ছাত্র হন। কিন্তু যা প্রণিধানযোগ্য তা হল কৈশোরেই তিনি এমন এক দক্ষতার অধিকারী হন, যা রাফায়েলের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯০০ সালে তিনি প্রথম পারিতে যান এবং তার পরের বছর সেখানে তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলে ফরাসীদের দ্বারা অভিনন্দিত হন। ১৯০৪ সাল থেকে পারিতে তাঁর স্থায়ী বসবাস।

পিকাসোর আগে অনেক শিল্পীই স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গেছেন, যেমন হান্স হলবেন গেছেন জর্মন দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে, এল গ্রেকো ইতালী ছেড়ে স্পেনে, কিন্তু তাঁদের দেশত্যাগ ও পিকাসোর দেশত্যাগের মধ্যে বড় পার্থক্য হল তিনি এক দেশ ছেড়ে অপর দেশে গিয়ে সে দেশের শিল্পধারায় নিজেকে যুক্ত করেন নি। তিনি স্পেন ছেড়ে পারিতে এসে ফরাসি হন নি; হয়েছেন বিশ্বনাগরিক। শিল্পী হিসাবে তাই তাঁর অবস্থান কেবল ফরাসি দেশের শিল্পধারার মধ্যেই নয়, বরং তিনি পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসেরই একটা অধ্যায় হয়ে উঠেছেন। তাঁর শিল্প-ভাবনাতেও দেখা যায় কোনো এক দেশকালগত নান্দনিক রুচির পরিবর্তে এমন এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যা জাতীয়তার বেড়া অবলীলায় অতিক্রম করে এবং কালগত পরিধিকেও মেনে নেয় না। পিকাসো বলছেন: 'আমি প্রায়ই বিবর্তন কথাটা শুনে থাকি। বারংবার আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কিভাবে আমার ছবির বিবর্তন ঘটেছে। আমার কাছে শিল্পের কোনো ভূত বা ভবিষ্যৎ নেই। যদি কোনো শিল্পকর্ম সব সময়েই বর্তমান হিসাবেই বেঁচে থাকতে না পারে, তবে তাকে শিল্প হিসাবে গণ্য করার প্রয়োজন নেই। গ্রীকদের, মিশরীয়দের, বা অন্য কোনোকালের মহান্ চিত্রকারদের শিল্পকর্ম গতকালের শিল্পকর্ম নয়; সম্ভবত সেই শিল্পকর্ম অন্য কোনো কালের চেয়ে আজই সব থেকে জীবন্ত।'[৩] তিনি তারপর আরও বলেছেন, 'পরিবর্তনকালীন শিল্প বলে কিছু নেই। কালানুক্রমিক শিল্প-ইতিহাসে এমন কিছু যুগ আছে যে-গুলি অন্যযুগের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক এবং অনেক বেশি সুসম্পূর্ণ। তার অর্থ

হল কোনো কোনো যুগে অন্য যুগের তুলনায় উন্নতমানের শিল্পীরা জন্মেছেন। যদি শিল্প-ইতিহাসকে একটা গ্রাফের সাহায্যে দেখানো যেত, যেমন একজন নার্স তার রোগীর জ্বর দেখিয়ে থাকে, তবে দেখা যেত একই ধরনের পর্বতশ্রেণীর উচ্চোবচ্চ রেখাচিত্র, এবং প্রমাণ হত যে শিল্পে কোনো ক্রমোন্নতি নেই; বরং তার পতন-উত্থান আছে, আর তা যে-কোনো কালেই ঘটতে পারে। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে থাকে।[৪] এমনিভাবে পিকাসো সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে শিল্পের যে তুঙ্গগুলি দেখা যায় তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, এবং কোনো একটি বিশেষ কালই যে শিল্পের পক্ষে আদর্শস্বরূপ, এমন চিন্তার বিরোধিতা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি সেই সব শিল্পবেত্তাদের মতকেও খণ্ডন করেছেন, যাঁরা কিউবিজমকে এক 'পরিবর্তনকালীন' পরীক্ষা বলে মনে করেন, এবং ভাবেন কিউবিজম এক বড় রকমের শিল্পাদর্শের বীজস্বরূপ। পিকাসো তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই বলেছেন, 'কিউবিজম কোনো বীজ বা জ্রূণ নয়, বরং এমন এক শিল্প যা প্রধানত রূপনির্ভর; এবং যখনই রূপকে ফোটানো সম্ভব হয়েছে, তখনই সে নিজের সার্থকতা অর্জন করেছে।'[৫]

৩

আজীবন শিল্পকর্মে নিয়োজিতপ্রাণ ছিলেন পিকাসো। তাঁর শিল্পকর্মের বিপুল পরিমাণ ও বিচিত্র পরিধি তার প্রমাণ। কিন্তু সেই তুলনায় শিল্প-বিষয়ক আলোচনা তিনি কমই করেছেন। তাঁর কবিতা বা চিঠিপত্রে শিল্পের আদর্শ বা রীতিনীতি প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। আলবার্তি, দা ভিঞ্চি বা মিকেলাঞ্জেলোর লেখায় তাঁদের শিল্প-ভাবনা যতখানি স্পষ্ট ততখানি স্পষ্ট বা নির্ভরযোগ্য রচনা পিকাসো কখনও লেখেন নি। শিল্পবিষয়ে বাগাড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না, এবং খবরেকাগজে সমালোচকদের প্রতি ছিল তাঁর স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা। তাঁর মতামতগুলি প্রধানত সংকলিত হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের স্মৃতিচারণ থেকে—এবং তদাতিরিক্ত এমন দু-তিনটি রচনা থেকে, যেগুলি পিকাসো স্বয়ং দেখে দিয়েছিলেন বলে নির্ভর করা হয়। ওপরের উক্তি-গুলির মতো ছোটো ছোটো মন্তব্যে তিনি রাশি, বিশেষত চিত্রকলা ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এইসব মন্তব্যগুলি সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় অধুনা তাঁর চিত্রাদর্শ ও জীবনবোধ সম্পর্কে সরাসরি ধারণা করে নেওয়ার সুযোগ এসেছে। বলা বাহুল্য, পিকাসোর সব মন্তব্যই সমান

গুরুত্বপূর্ণ নয় ; এবং বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কখনও পরস্পরবিরোধী মনোভাবের সাক্ষাতও তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সব মিলিয়ে যা মেলে তা হল মৌলিক চিন্তার অধিকারী এক সৃজনশীল শিল্পীর পরিচয়। ইতিহাস, বিবর্তন, শিল্পীব্যক্তিত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকটি মন্তব্যে তিনি দৃশ্যশিল্পের একটি মূল ও প্রাথমিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। তা হলো প্রকৃতি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই একটি প্রসঙ্গকে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলতে পারলে পিকাসোর শিল্পচিন্তার সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রকৃতি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কোনো স্পষ্ট আলোচনা প্লেটো বা আরিস্টটলে পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভাববাদীদের মধ্যে চিন্তার দিক থেকে বস্তুবাদীদের কাছাকাছি এসেও আরিস্টটল শিল্পকে 'পরমাত্মা' (absolute soul) 'বিশ্ববিবেক' (universal will) বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি কিংবা শিল্পীর অবচেতন মনের ধ্যান-ধারণার প্রকাশ বলেই মনে করেছেন। নিও-প্লোটনিকদের আধিপত্যের কালে (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শতক) এবং তার পরবর্তী ক্রীশ্চানদের আমলে শিল্প, বিশেষত চিত্র ও ভাস্কর্য দৃশ্যজগৎ অপেক্ষা কল্পনার, বিশেষ করে মিথের জগতের ওপরেই বেশি নির্ভর করেছে। এরপর ক্যাথলিক ধর্মবেত্তা টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪)-এর প্রভাবে ভক্তির প্রাবল্য দেখা দিলে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাই শিল্পীদের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে, ইতালীয় রেনেসাঁসের সূচনায়, 'শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্ক' বিষয়ক ভাবনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। এই নতুন ভাবনা প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে ফ্লোরেন্সের শিল্পী লিওন বাতিস্তা আলবার্তির (১৪০৪-৭২) রচনায়। ইতালীয় রেনেসাঁসের মূলে যে ভাবধারা কাজ করেছে সেই মানবিক ও যুক্তিবাদী ভাবধারাই ব্যক্ত হয়েছে আলবার্তির শিল্পবিষয়ক মতামতে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে শিল্পীর চোখকে তিনি সরিয়ে এনেছেন প্রকৃতির দিকে, যে প্রকৃতিকে তিনি মনে করেছেন সকল সৌন্দর্যের আকর। বস্তুতপক্ষে, প্রকৃতি থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে, অনেকটাই আমাদের চলতি ধারণার তিল তিল করে তিলোত্তমা সৃষ্টির অভিপ্রায়, 'আদর্শ রূপ' (Ideal Form) সৃজনের নির্দেশ দিয়েছিলেন আলবার্তি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের অঙ্কনীয় বস্তুগুলি আমরা সর্বদাই প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করবো ; এবং সকল সময় তার মধ্য

থেকে সুন্দর জিনিসগুলিই বেছে নেবো।'[৬] কেন না, 'এমন কি প্রকৃতিতেও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দৈবাৎ দেখা যায়।'

প্রকৃতি-নির্ভরতা রেনেসাঁসের চরম উৎকর্ষের কালে, বিশেষ করে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) হাতে আরও অনিবার্য ও সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। আলবার্তির যুক্তিবাদকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিলেন দা ভিঞ্চি। তাঁর মতে চিত্রকলা 'প্রকৃতির দৃষ্টিগোচর সৃষ্টিসমূহের অনন্য অনুকারী।'[৭] তিনি আরও বলেছেন, 'সেই চিত্রই সব থেকে প্রশংসনীয় যা অনুকরণীয় বস্তুর যথাযথ অনুকৃতি।' এই মতবাদ দা ভিঞ্চি যে সব সময়েই যান্ত্রিক[৮] ভাবে অনুসরণ করেছেন, এমন নয়। কিন্তু প্রকৃতির ওপর চিত্রের পরিপূর্ণ নির্ভরতার কথা তিনি বারবারই বলেছেন। এমন কি শিল্পীকে সঙ্গে একটা আয়না রাখার উপদেশ দিয়েছেন তিনি, যাতে সে মিলিয়ে দেখতে পারে তার ছবি আয়নার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে কতখানি মিলছে। তিনি একজন পুরোদস্তুর প্রকৃতিবাদীর মতো এও বলেছেন যে, 'দর্পণের প্রতিবিম্ব হল সত্যকারের চিত্র (true painting)।'[৯] এইভাবে, প্রকৃতির বিশ্বস্ত রূপায়ণকে চিত্রের আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়ে তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বর্ণ, বাতাবরণ ও গতিশীলতাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় অনুধাবন করেছেন। তারই ফলাফল আমরা তাঁর ছবি ও রচনায় পাই। তিনি তাঁর চিত্রকলা বিষয়ক রচনাটির সম্পর্কে লিখেছেন, 'চিত্রকলা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দশটি গুণকেই, যথা শ্যামতা ও উজ্জ্বলতা, সারবস্তু ও বর্ণ, রূপ ও স্থান, নিকটত্ব ও দূরত্ব এবং সচলতা ও অচলতাকে প্রয়োজনীয় মনে করে; আর তাদের পারস্পরিক বুননেই গড়ে উঠবে আমার এই বইটি, যা চিত্রকরদের স্মরণ করিয়ে দেবে কোন নিয়মে, কিভাবে তার শিল্প প্রকৃতিসৃষ্ট বিষয়গুলি তথা পৃথিবীর অলংকারগুলিকে অনুকরণ করবে।'[১০]

৪

প্রকৃতি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে রেনেসাঁসকালীন, বিশেষ করে দা ভিঞ্চির মতবাদের প্রেক্ষিতে পাবলো পিকাসোর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি তুলে ধরলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পিকাসো সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমি প্রকৃতিকে অনুকরণ করার চেষ্টা কেন করবো? আমার করণীয় হল বস্তুসকল আমার মনে যে ভাব

জাগায় তার যতদূর সম্ভব সার্থক ব্যবহার ; আমার ভেতরে তারা যে ছায়াপাত করে তাদের পারস্পরকে যুক্ত করে, দ্রবীভূত এবং বর্ণান্বিত করে, ভেতরে থেকে উজ্জ্বল করে তোলা। এবং কার্যত আমার চোখ যখন আর একজনের চোখের চেয়ে যথেষ্ট ভিন্ন, আমার ছবি একই উপাদান ব্যবহার করেও বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতায় ব্যাখ্যা করবে।' ১১ একই প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলছেন, 'অনেকেই আধুনিকতার বিরোধিতায় প্রকৃতি-বাদের কথা বলেন। আমি জানতে চাই কেউ কখনো প্রাকৃতিক (natural) শিল্পকর্ম দেখেছেন কিনা। আসলে প্রকৃতি ও শিল্প স্বতন্ত্র জিনিস এবং তারা কখনো এক হতে পারে না। শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি যা নয়, আমরা সেই ধারণাই প্রকাশ করি।' ১২ কেন না, তাঁর মতে, 'আমাদের জ্ঞান আমাদের দৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে।' ১৩

এই ভাবে পিকাসো চিত্রে প্রকৃতির সরাসরি অনুকরণের বিরোধিতা করেছেন। কেন না চিত্রের সত্য এবং বস্তুজগতের সত্যকে তিনি এক করে দেখেন নি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, 'আমরা সকলেই জানি শিল্প সত্য নয়। শিল্প হল এমন এক অসত্য যা আমাদের সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে ; অন্তত পক্ষে আমাদের বোধযোগ্য সত্যকে।'১৪ অর্থাৎ পিকাসো শিল্পের নিজস্ব সত্য মূল্যের ওপর জোর দিয়েছেন ; যে সত্যমূল্য চূড়ান্ত বিচারে বস্তুজগতের ওপর নির্ভরশীল হলেও. শিল্প হিসাবেই মূল্যবান—প্রকৃতির সার্থক অনুকরণ হিসাবে নয়। এখানেই তিনি শিল্প ভাবনায় রেনেসাঁস-কালীন ধ্যান-ধারণা থেকে সরে এসেছেন, এবং এমন এক বিশ্বাসকে চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার সঙ্গে য়ুরোপীয় শিল্পভাবনা অপেক্ষা প্রাচ্যদেশীয় শিল্পভাবনার সাদৃশ্য অনেক বেশি। কেন না সকলেই জানেন. রেনেসাঁস-প্রবর্তিত শিল্পাদর্শের ভিত্তি হল প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের চিত্ররূপায়ণ। এই শিল্পাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত য়ুরোপের শিল্পীদের নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। এই প্রচলিত আদর্শ সম্পর্কে প্রথম জিজ্ঞাসা তোলেন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা ; যাঁরা বর্ণ ও বর্ণিকাভঙ্গের (tone) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রকৃতিকে আরও সঠিক ভাবে তার আলোছায়ার বিচ্ছুরণে চিত্রপটে ধরতে চাইলেন। আদর্শের দিক থেকে ততখানি না হোক, প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে ইমপ্রেশনিজম্ রেনেসাঁস ধারার একাডেমিক রীতির প্রতিবাদী হিসাবে দেখা দিল এবং পরবর্তী নতুন চিন্তা-ভাবনার দরজা খুলে দিল, সেই পথেই এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে.

সুররিয়ালিজম ও কিউবিজমের মাধ্যমে দেখা দিল রেনেসাঁসের বিপরীত এক শিল্পাদর্শ। এই 'আধুনিকতা' শিল্পবিষয়ক চিন্তায় এমন এক পরিবর্তন আনে যা গুরুত্বের দিক থেকে প্রায় রেনেসাঁস-কালীন আবিষ্কারগুলির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য এই নতুন চিন্তাধারার পশ্চাদ্‌পট রচনা করেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবগুলি এবং সেই সময়কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ। যেমন, শেভ্রল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের বর্ণসংক্রান্ত পদার্থবিদ্যার গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ইম্‌প্রেশনিস্টরা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আধুনিক শিল্পচিন্তা গড়ে উঠেছিল য়ুরোপীয় শিল্পীদের পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভিন্নতর শিল্পাদর্শের অভিজ্ঞতাও। এক সারগ্রাহী মানসিক ঔদার্যের পরিমণ্ডলেই আধুনিক শিল্পের বিকাশ ; এবং সেই কারণেই 'আধুনিক শিল্প' এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা হিসাবে য়ুরোপের ভৌগোলিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে কোনো কোনো দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

৫

পিকাসোর শিল্প-চিন্তার প্রাথমিক ভিত্তি হল পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্টদের আদর্শ। ইমপ্রেশনিজম থেকে নিও-ইমপ্রেশনিজমে যান্ত্রিকভাবে আধা-বৈজ্ঞানিক ধারায় প্রকৃতিবাদী চিত্র রচনার রীতিবদ্ধতার প্রতিবাদী পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীরা, যাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন সেজান, চাইলেন শিল্পকে তার শুদ্ধতায়, প্রকৃতিবাদের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত করতে। বর্ণ বিচ্ছুরণের প্রতিভাস থেকে মুক্ত করে তাঁরা চাইলেন চিত্রকে রূপনির্মিতির আধার হিসাবে। আর এই পথেই পিকাসো ও ব্রাক্‌ পৌঁছেছিলেন কিউবিজমে। কিন্তু পিকাসোর ভাবনা সেখানেও বাঁধা পড়ে থাকে নি ; তিনি নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গিতে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৭৩)। আর তাঁর মতাদর্শও প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্ন দেশকালের সূত্র থেকে। তাই তাঁর শিল্পাদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যের শিল্পভাবনার সাযুজ্য লক্ষ করলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।

প্রকৃতিবাদী যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতির অনুকরণকেই শ্রেষ্ঠ শিল্প বলে মনে করা হয় তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীদেরও পরিচয় ছিল। কেন না, শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'যে-চিত্রে সাদৃশ্য দর্পণের প্রতিবিম্বের মতন (সাদৃশ্যং দৃশ্যতে বস্তু দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ)'[১৪] তাও এক শ্রেণীর বিখ্যাত চিত্র।

এ জাতীয় চিত্র রচনায় কুশলী শিল্পীদের উল্লেখও পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। কিন্তু প্রকৃতির এই অনুকরণসিদ্ধি ভারতীয় শিল্পের আদর্শ হিসাবে সর্বব্যাপী স্বীকৃতি পায় নি কোনো দিনই। কেন না ভারতীয় শিল্পবিদদের মতে চিত্র রচনা করতে হবে স্বস্থচিত্তে, সুখাসনে বসে, প্রকৃতিকে অনুকরণ করে নয়, তার যে রূপ মনের ওপর ছায়া ফেলেছে তাকেই ফিরে ফিরে স্মরণ করে (স্মৃত্বা: স্মৃত্বা: পুন: পুন:)[১৫]। কুমারস্বামী প্রকৃতি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে শুক্রনীতিসারের (৪ ॥ ৪ ॥ ৭০-৭১) যে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন তাতেও এই কথাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে: **The imager must be expert in vision *(dhyana)*, and in no other way, certainly not in the presence of a model *(pratya-kshena)* can the work be accomplished.**[১৬] অথবা যেখানে তিনি বলছেন, 'মূর্তিতত্ত্বের পদ্ম আর উদ্ভিদ্‌বিদের পদ্মকে ঘুলিয়ে ফেলা দুষ্কর ; যে শিল্পে এই ধরনের ঘুলিয়ে যাওয়া সম্ভবপর, তা শিল্প নয় মূর্তিতত্ত্বও নয়,—তা হলো প্রতীকতত্ত্ব (seniotic)'[১৭]। তিনি আরও বলেছেন, 'যদি অঙ্কিত ফুলের সাহায্যে মৌমাছিকে ঠকানো হয়, তা হলে তার সঙ্গে মধু দিলেই বা দোষ কি ?'[১৮] যে প্রতিকৃতি 'প্রতিকৃতির যত কাছাকাছি' (true to nature), সে প্রতিকৃতিই ততখানি মিথ্যাচারী এবং তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই অর্থেই মিথ্যাচারী। হয় তো তাই শুক্রনীতিসারের (৪।।৪।।৭৬) মতে 'প্রতিকৃতি' অর্থাৎ প্রকৃতির অনুকরণ হল 'অস্বর্গ', অর্থাৎ অসার্থক শিল্প। এই একই কথা যেন পিকাসো বিপরীত দিক থেকে বলেছেন: 'আমরা সকলেই জানি শিল্প সত্য নয়। শিল্প হলো এমন এক অসত্য, যা আমাদের সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে…।'

৬

পিকাসোর চিত্রে বা ভাস্কর্যে সৃজনপ্রক্রিয়া কি ভাবে কাজ করেছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া দুষ্কর। এবং আজ অবধি তার নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা শিল্প-ঐতিহাসিক বা মনোবিজ্ঞানীদের কেউ তুলে ধরেন নি। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির আলোচনায় স্বভাবতই পিকাসোর চিন্তা-প্রবাহের প্রসঙ্গ এসেছে, এবং সে ক্ষেত্রে সকলেই এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তাঁর অধিকাংশ মহৎ শিল্পকর্ম গড়ে উঠেছে মানসিক রূপ সংগঠনের

প্রক্রিয়ায়, প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপায়ণের আদর্শে নয়। তাঁর সব থেকে অধিক আলোচিত ছবি 'গুয়েরনিকা'র ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্য।

১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি বাস্ক সভ্যতার এক পুরনো কেন্দ্র, দশ হাজার অধিবাসীর শহর গুয়েরনিকা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষাবলম্বী জার্মান বোমারুর তিনঘণ্টাব্যাপী আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনা ঘটার কয়েক দিনের মধ্যেই পিকাসো তাঁর বিখ্যাত ছবিটি আঁকতে শুরু করেন এবং তা জুন মাসে পারিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় স্পেন রিপাবলিকের পক্ষে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শন মাত্রই গুয়েরনিকাকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। বামপন্থীরা ছবিটিকে বলে দুর্বোধ্য; আর দক্ষিণপন্থীরা তাদের আত্মরক্ষার কারণেই তার নিন্দা করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গুয়েরনিকা দুর্লভ খ্যাতির অধিকারী হয়; এবং আজও তা 'বিংশ শতাব্দীর সব থেকে বিখ্যাত ছবি' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এই ছবিটিকে মনে করা হয় ফ্যাসিস্ট নির্দয়তার বিরুদ্ধে, আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে এক স্থায়ী প্রতিবাদ।[১১]

অথচ ছবিটির উপাদানে কোথাও কোনো আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের ব্যবহার নেই; এবং প্রচলিত অর্থে ছবিটিকে কিছুতেই বাস্তবসম্মতও বলা চলে না। আসলে 'গুয়েরনিকা' গভীরতর অর্থে এক 'মানসিক' শিল্পকর্ম, এবং তাই-ই হলো তার শক্তির উৎস। পিকাসো ঘটনাটিকে যথাযথ বিবৃত করতে চেষ্টা করেন নি। ছবিতে তাই কোনো বোমারু বিমান নেই, বিস্ফোরণ নেই, নেই স্থান বা কালকে চিহ্নিত করতে পারে এমন কোনো বস্তু। এমন কি কোনো শত্রুকেও ছবিতে দেখানো হয় নি, যা দেখানো হয়েছে তা মানুষ আর পশুর মিলিত যন্ত্রণা, মাতার অসহায়তা, বালকের আর্তনাদ, শিশুর মৃত্যু; আর এক বলদর্পী ষণ্ডের অবস্থান। বিচ্ছিন্নভাবে নানা অর্থের প্রতীকী সমন্বয়ে নয়, এক সামগ্রিক আবেদনেই 'গুয়েরনিকা' তার অসাধারণত্ব অর্জন করেছে। ঘটনা বা বিষয়কে সরাসরি চিত্রপটে তুলে না ধরে, ঘটনা বা বিষয় তাঁর মনে যে রূপের আলোড়ন তুলেছে, তাকেই তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে এঁকেছেন পিকাসো। আর এই পদ্ধতিতেই তাঁর শিল্পদর্শনের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে 'গুয়েরনিকা' বা অন্যান্য ছবিতে।

টীকা:

১। *Picasso on Art*, Dove Ashton (ed), London, 1972, পৃঃ ২
২। ঐ, পৃঃ ৫; ৩। ঐ, পৃঃ ৪; ৪। ঐ, পৃঃ ৫; ৫। ঐ, পৃঃ ৬।
৬। *Artistic Theory in Italy 1450-1600*, Sir Anthony Blunt, Oxford, 1962, পৃঃ ১৫।

৭। *The Notebooks of Leonardo La Vinei*, Robert N. Linscott, New York, পৃ: ৫৭।

৮। *Artistic Theory in Italy 1450-1600*, পৃ: ৩০।

৯। ঐ, পৃ: ৩০।

১০। *The Note Books of Leonardo La Vinci*, পৃ: ৫৯।

১১। *Picasso on Art*, পৃ: ১৯।

১২। ঐ, পৃ: ১৮।

১৩। ঐ, পৃ: ১৫।

১৪। *Chitralaksana : A Treatise on Indian Painting*, Calcutta, 1974, পৃ: ৭৮।

১৫। ঐ, পৃ: ৬৮।

১৬। *The Transformation of Nature in Art*, Anand K. Connaraswamy, New York, 1956, পৃ: ১২৬।

১৭। ঐ, পৃ: ১২৪।

১৮। ঐ, পৃ: ১২৯।

১৯। *The Success and Failure of Picasso*, John, Berger, Penguin, 1956, পৃ: ১৬৯।

শৈলাবাসে একা

অসীম রায়

নীল টেরেলিনের শার্ট-পরা নেপালী বেয়ারাটি সুপুরুষ। টান টান করে কম্বল নতুন চাদর প্রথম বিছানাটায় পেতে দ্বিতীয় বিছানায় হাত দিয়ে উসখুস করে। স্বরূপ তখন বেডরুমসংলগ্ন কাচের ঘরখানার জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। লাগোয়া বাগানে ক্রিপটোম্যারিয়ার দীর্ঘ ছুঁচলো ঝাড় আকাশ ফুটিয়েছে। ঠিক মাঝখানে পিকচার পোস্টকার্ডের ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

'সাব ?'

'কী ?'

'মেমসাব ?'

স্বরূপ ভুরু কুঁচকে বললে, 'মেমসাব নেই।'

'জী!' কেতাদুরস্ত বেয়ারাটি সেলাম দিয়ে যাবার আগে বললে, 'আপকো কল বেল হ্যাঁয়।'

গোলাপী আলোর ডোমের নিচেই ছোট্ট সুইচ। সেদিকে না চেয়ে স্বরূপ বললে, 'আচ্ছা, এখন যাও।'

বয়স্ক অবিবাহিত মানুষের কি ছুটি কাটাবার কোথাও জায়গা নেই? এইরকম, খবরের কাগজে চালাক হেডলাইনের মতো প্রশ্নটা খেলে যায় তার মনের মধ্যে। তার আর একটা অশরীরী অঙ্গ যেন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে

তাকে ঘিরে। শুধু বেয়ারা কেন, আসবার সময় হোটেল বুকিংয়ের অফিসারটিরও প্রশ্ন : 'আপনি একলা ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ডাবলরুম নিতে হবে। তার জন্যে একস্ট্রা আরও পঁয়ত্রিশ টাকা ডেলি।'

'সিঙ্গলরুম নেই ?'

'সিঙ্গলরুম আমরা তুলে দিয়েছি। সবাই ডাবল রুম চায়। বুঝলেন না ? আপনি আর কারুর সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। ফালতু টাকা দেবেন কেন ? আর তাছাড়া এখন দার্জিলিং-এ যা রাশ। আপনার নেহাত ভাগ্য ভালো। লাস্ট মোমেন্ট ক্যান্সেলেশান একটা ছিল। তাই পেলেন।'

তারপর অন্তরঙ্গভাবে ভদ্রলোক বললেন, 'নিয়ে যান মশাই মিসেসকে। কতো আর খরচা পড়বে। যদি বারো বছরের নিচে চাইল্ড থাকে তাহলে আপনার অ্যান্টিচেম্বারে একটা ছোট ডিভান আছে। ওটার জন্যে আলাদা চার্জ লাগবে না। তবে ওপরে হলে অবশ্য কটের জন্যে একস্ট্রা পনেরো টাকা।'

'আচ্ছা দেখি', স্বরূপ বলেছিল। একবার ভাবলে, ভদ্রলোক কি জেনে-শুনে রসিকতা করছেন ?

তার চেনাশোনা এয়ারলাইন্স অফিশিয়ালেরও একই প্রশ্ন, 'একটা টিকিট ? তাই বলুন। আমি ভাবলাম ফ্যামেলি নিয়ে যাচ্ছেন। একটা টিকিট ম্যানেজ করা যাবে।' ভদ্রলোক হাত সাফাই করে ওয়েটিং লিস্টে তার একশো এগারো নম্বর টিকিটখানা অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'অফিসের কাজে ?'

'এমনি বেড়াতে।'

'একলা ?'

'দোকলা কোথায় পাব ?'

'করে নিন মশাই। দোকলা হতে কতক্ষণ ?'

তিরিশ বছর পর দার্জিলিং। সেই স্মৃতির দার্জিলিং-এ সাহেব মেমসাহেবরা ঘোরে। ম্যালের কাছে এক আলোকিত দোতলায় সাহেব মেমসাহেবরা বক্ষসংলগ্ন হয়ে বল নাচছে। সে বাড়িটা এখন কেকের দোকান। প্রচুর উত্তরভারতীয় যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া মড ড্রেসে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। জীন প্যান্টপরা উত্তরভারতীয় প্রৌঢ়াদের জাপানী ক্যামেরায় পটা-পট ছবি তুলছেন তাদের স্বামীরা অথবা বন্ধুরা। স্বরূপের মনে হচ্ছিল মুসৌরী অথবা নৈনিতালের মতো উত্তরভারতীয় শৈলাবাস। ধুতি একদম নেই। আগে স্বরূপের ধুতি দেখলে এলেবেলে লাগতো, এখন সম্ভ্রম জাগে। নিশ্চয় মিনিস্টার, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা অথবা বিদেশে ভারতীয় ইমেজ রক্ষায় বদ্ধপরিকর কোনো পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্ব। কাশ্মীরী আর সিন্ধিদের পর পর দোকান চৌরাস্তায়। আশ্চর্য! এর মধ্যে এই বিস্তীর্ণ জলরাশিতে একটি মাত্র দ্বীপ—মালা আর আংটি বেচছেন এক বৃদ্ধ বঙ্গসন্তান।

'টিবেটান আংটি রাখেন? ড্রাগনের মুখ?'

'ওগুলো কালিম্পং-এ পাবেন।'

ঝলমলে নানা রংয়ের মালার ওপর দিয়ে স্বরূপের চোখ ঘোরে। তার মধ্যে বড় থোলো থোলো আঙুরের দানায় তার চোখ আটকে যায়।

'মেমসাহেবরা পরে। অ্যাগেট। একছড়া দিয়ে দিই।'

'আমি?'

'এটা অরিজিন্যাল। অক্সফোর্ড ডিকশানারিতে পাবেন নামটা।'

'না, তা বলছি না।'

'চমৎকার জিনিস। বৌমার খুব পছন্দ হবে।'

খদ্দরপরা গান্ধিবাদী ভদ্রলোক। এই সে সম্যান ভনিতা করুণ লাগে স্বরূপের কানে। নিশ্চয় ভদ্রলোক প্রবল কমপিটিশান-ক্লান্ত, সামনের বছর হয়তো এখানে কাশ্মীরী কিউরিওর দোকান উঠবে।

হাতে নিয়ে ছাড়ানো লিচুফলের মতো লাগে—সাদার ওপর হালকা বেগনি।

'আচ্ছা দিন।'

স্বরূপ স্থির করলে তাদের ফার্মে রাজনের বউকে দেবে। রাজেন বেশ চালাক চতুর ছেলে। মাসতিনেক হোল বিয়ে করেছে।

প্যান্টের পকেটে মালাটা ফেলে হিল কার্ট রোড দিয়ে এগোতেই সে অবাক হয়। থিক থিক করছে পোকার মতো লোক। এক একটা ল্যাণ্ড রোভার আর টুরিস্ট বাস থামছে। আর উগলিয়ে দিচ্ছে লোকজন। ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী পথহারার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেলের সন্ধানে। চারদিকে দালাল ঘুরছে। সর্বত্র হোটেল, মানে প্রত্যেক গেরস্থই তার বাড়িটাকে সিজনে হোটেল বানিয়েছে। কিন্তু জায়গা

নেই। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল স্বরূপ। দালালের সঙ্গে রফা হচ্ছে—দুশো টাকায় না একশো আশী টাকায়—একখানা লম্বা ঘর, কিন্তু বাথরুম একতলায়।

বিকেলের আলো পড়ে আসছে। ডান দিকে তাকাতেই আবার সেই পিকচার পোস্টকার্ডের ঝলমলে ছবি। বিরক্ত হয়ে স্বরূপ চোখ ফিরিয়ে নেয়।

হোটেলে খাবার টেবিলে আগরওয়ালার সঙ্গে আলাপ হয়। কলকাতার এক স্বনামধন্য রবার ফ্যাক্টরির মালিক। একজনের বসার আলাদা টেবিল নেই। বাধ্য হয়ে বসতে হয়, বাধ্য হয়ে কথার জবাব দিতে হয়। আর কথা মানে নির্ঘাত লোডশেডিং। এ সমস্যা এমন সর্বগ্রাসী যে অপরিচিতের সঙ্গেও এ প্রসঙ্গে অনায়াসে আলাপ করা যায়। এবং ঠিক এই আলোচনার মধ্যেই খাবার টেবিলে লোডশেডিং।

'দেখলেন! দেখলেন!' ভদ্রলোক এক চামচ ফ্রায়েড রাইস শূন্যে তুলে বললেন।

'আপনি একটা মস্ত ফার্মের কস্ট একাউন্টেন্ট! আমার চেয়ে আপনি ভালো জানবেন। মাসে মাসে···

'হ্যাঁ জানি, কত কোটি টাকা আপনারা লস করছেন।'

'তবে?'

আলো এসে গেল। এখানে কয়েকটা পাওয়ার স্টেশন। একটা গেলে আর একটা আসে। কলকাতার মতো নয়। আর তা ছাড়া এখানে অন্ধকারে বিশেষ অসুবিধে নেই। গলগলে ঘাম, চিটপিটে ঘামাচি, মশা এগুলোর বদলে এখানে এখন কলকাতার জানুয়ারির ঠাণ্ডা। কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নিচে অন্ধকার ভ্যালিতে একসঙ্গে আলো জ্বলে উঠল।

'জ্যোতিবাবু কী করছেন?'

'আচ্ছা, আমি উঠি। একসকিউজ মি।'

'সুইট ডিসটা খান।'

'না থাক, থ্যাঙ্ক ইউ।'

একগুচ্ছের পেপার ব্যাক এনেছিল। অ্যালিস্টার ম্যাকলিন, আগাথা ক্রিস্টি, হ্যারল্ড রবিন্স। একটার পর একটা বই ধরে। আর ফেলে দেয় স্বরূপ। সব একরকম লাগে। হীরে জহরত নিয়ে কারবার, ধনদৌলতের ব্যাপার, তারপর পিস্তল ছুরি বিষ। তারপর কে আসামী এই ধাঁধায়

ঘোরা। কলকাতায় যে ফার্মটা এইসব বই একচেটিয়া আমদানি করে পূর্বভারতে তারা বছরে এক কোটি টাকার বই আনে। তার মানে দেশে সমৃদ্ধি বাড়ছে নিশ্চয়।

রিমলেস চশমা পরা জীন আঁটা এক অর্ধনারীশ্বরকে লক্ষ করছিল স্বরূপ ম্যালে এমন সময় তাকে কেউ ডাকছে মনে হোল।

'এসব রোগ কবে থেকে হোল স্বরূপদা? বললাম বিয়ে করতে। সময়ের জিনিস সময়ে না করলেই যত গণ্ডগোল।'

পনের বছর আগে সৌগতর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়াত স্বরূপ। খুব ফুর্তিবাজ তুখোড় ছেলে।'

'তুমি এখন কোথায়?'

'সি এস আই আর।'

একটুক্ষণ থমকে স্বরূপ বললে, 'আর রুবী?'

'বাঃ আপনি জেনেশুনেই কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন। সে এখন টরন্টো, আমার চেয়ে অনেক শাঁসাল মক্কেল পাকড়েছে।

'আমি জানতাম না, বিশ্বাস করো। আগের কারুর সঙ্গেই এখন যোগাযোগ নেই।'

রুবীর প্রসঙ্গ তার মাথায় এল কারণ এক সন্ধেবেলা অবিবাহিত রুবী ও সৌগত রাত্রিযাপনের প্রস্তাব নিয়ে শান্তিনিকেতনে তার দুখানা ঘরওয়ালা বাড়িতে চড়াও হয়েছিল।

'আমার এখানে রাত কাটাতে পারো এক শর্তে, তোমাদের বিয়ে করতে হবে' স্বরূপ বলেছিল হাল্কাভাবে।

'তুমি দাদা বড্ড সেকেলে! আসলে বডিটা কোনো ব্যাপারই না', সৌগত তাকে তত্ত্বকথা শুনিয়েছিল।

'এখানে তো আর থাকা যাবে না। সাংঘাতিক গণ্ডগোল বাধবে শুনছি।'

'কী ব্যাপার?'

'কেন তুমি কাগজ পড়ো নি? রেডিও'তে তো বেশ কয়েকবার বলেছে।'

'গত দু দিন ওসবের সঙ্গে আমার সংশ্রব নেই।'

'রেডিওর কী দরকার? এই যে দেখো না।'

সামনেই একটা ম্যিপটোম্যাারিয়ায় মোটা গুঁড়িতে হরতাল ঘোষণা, নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতির দাবী।

'আমার পরশু নামার কথা। ভাবছি কালই নেমে যাব। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসেছি। তোমার মতো দাদা তো মুক্তবিহঙ্গ নই। চলে এসো না। আজ সন্ধেবেলা কী করবে? ভালো জিনিস আছে। ইমপোর্টেড।'

'হরতাল হবে, তাতে কী?'

'সে তুমি বুঝবে না দাদা। একলা লোক হলে রিস্ক নেওয়া যায়। আর একটা লোকের জীবন-মরণ তোমার হাতে। তার ওপর বাচ্চাকাচ্চা।'

'সেসব তো বুঝলাম। কিন্তু হরতাল হলে তোমার কী? তারা নেপালীরা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছে। আমরা তো একই দেশের লোক।'

'সেইটাই তো কথা। এ নিয়ে দু-পক্ষ আছে, তারা সব বক্তব্য রাখছে। তুমি কাগজ পড়ো না স্বরূপদা?'

'না:! কাগজ-পড়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি! এখন তো খবরের কাগজেরই জগত।'

'খবর কাগজ রেডিও টি-ভি, এগুলো আজকাল বড্ড বোর লাগে। তার চেয়ে একটা তেজালো গাছের দিকে চেয়ে থাকলে খানিকটা চোখের আরাম হয়, একটু জমি থাকলে বাগান করতাম।'

সৌগত বললে, 'তোমার এইসব বিকৃতির কারণ কী জানো দাদা, যে সময়ের যা তা করো নি।'

'তোমরা তো করেছো, আমি না হয় একটু আলাদাই থাকলাম।'

'দেখবে! শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা নেপালীই বিয়ে করে ফেলবে।' নিজের কথায় নিজেই হেসে ওঠে সৌগত।

দামী হোটেলে থাকার মনস্তত্ত্বটা চারপাশ থেকে মাথাচাড়া দেয়। দামী হোটেলে দামী সুখ চাই। আগরওয়ালা মুর্গীর ঠ্যাং ছুঁড়ে দেয় শূন্যে কারণ ঠিক সেদ্ধ হয় নি।

'আপনি কী করে খাচ্ছেন?'

'আমারটা সেদ্ধ হয়েছে,' স্বরূপ বললে।

আশেপাশের টেবিল থেকেও নানা ধরনের প্রতিবাদ খাবার নিয়ে অথচ খাবার যথেষ্ট ভালো। মাছ-মাংস তরকারি প্রচুর, এবং বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রান্নার চেষ্টা। কিন্তু কারুর কিছু মনঃপূত হয় না। স্বরূপ অনেক-

কাল পর ভুরভুরে দার্জিলিং চায়ের গন্ধ পায়। অথচ চা নিয়েও ঝগড়া। তারপর জলের টানাটানি শহরে। তাই নিয়ে ভোর না হতেই খেচাখেচি।

সেদিন বিকেল হতে না হতেই চারপাশে টেনশ্যান লতিয়ে ওঠে। সদ্য-বিবাহিত হানিমুনি ব্যানার্জী দম্পতি নীচে নামবার জন্যে গাড়ির সন্ধানে ছোটাছুটি লাগিয়ে দেয়।

স্বরূপ বললে, 'অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা তো সবাই আছি।'

'না মশাই, ওরা বড্ড রাফ টাইপ। আপনার মতো একলা থাকলে রিসক নেওয়া যায়।'

ছোকরাটি সামনে এগিয়ে ড্রাইভারদের সঙ্গে দরাদরি করতে থাকে।

মিসেস ব্যানার্জী বেশ দেখতে, কাঁচা বাঁশের মতো চেহারা। স্বরূপের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসে।

'আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি। আপনি সাউথে থাকেন?'

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বললে, 'আপনি নিশ্চয় আমাকে দেশপ্রিয় পার্কের স্টপে দেখেছেন। ওখান থেকে আমি মিনিতে উঠি! সপ্তাহে দু-দিন বাতিক শিখতে যাই।'

'বাঃ! আপনি তাহলে একজন গুণী মহিলা!'

মহিলাটি খুশিতে ছলছল করে ওঠে। তার হাসির টানে তার স্বামী চোখ ফেরায়। ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা থামিয়ে ছুটে আসে।

'কী বলছেন? কী বলছেন?'

এরকম ব্যাকুল কণ্ঠ হবার কারণ কী? ভদ্রলোক হয়তো ভাবছে তার জিনিসে কেউ ছোঁ মারছে।

'না না, আপনার স্ত্রী তো মশাই গুণী মহিলা। বাতিক-ফাতিক করেন।'

আশ্বস্ত হয়ে ছোকরাটি বললে, 'আপনাদের ফার্মের বড় সাহেবের একটা অর্ডার সাপ্লাই করলাম সেদিন। আমাদের তো বিজনেস, ইলেকট্রিকাল গুডস। গেইসার কিট করে দিলাম। আর কোনো অর্ডার হতে পারে?'

ভীষণ ব্যাজার লাগে স্বরূপের। সারা সন্ধেটা ম্যালে একলা একলা ঘোরে। ব্যাণ্ড বাজছে হিন্দি ফিলমের সুরে। সমস্ত বিকেল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স অফিসের সামনে হুড়োহুড়ি। গণ্ডগোল লাগবার আগেই, কেউ কেউ কেটে পড়ছে। ম্যালে প্রচণ্ড ভিড়। অন্ত শেষ রজনী। ব্রাউনিং-এর 'লাস্ট রাইড' কবিতা।

নেপালী টুপি মাথায় আগরওয়ালা চীৎকার করে ডাকে, 'এই যে স্যার। কী খবর?' স্বরূপ সেদিকে চাইতেই বললে, 'কাল নেমে যাচ্ছি শিলিগুড়ি।'

'টিকিট পেয়েছেন?'

'না, শিলিগুড়ির হোটেলে থাকব দুদিন। তারপর বাগডোগরা।'

'এত ভয়!'

'আপনি কারেজাস ম্যান। আপনি থাকুন।'

চন্দ্রালোকিত বার্চ ছিল। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের রাস্তা ধরে অনেক দূর হাঁটে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে চাপা অস্থিরতা আসে। সৌগতর ডেরায় ইমপোর্টেড বস্তুটির সদ্ব্যবহার করবে নাকি? ওটা বড্ড একঘেয়ে। আগে বেশ একটা দেবদাসী রোমান্স ছিল। এখন ওটা বেশী হলেই গ্যাঁট খরচা আর ডাক্তারী বিল। অথচ জীবনটা একটু খেলানো দরকার। ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনে এক অনিবর্তনীয় ভবিতব্য। যে কস্ট একাউন্টেন্ট সে সারা জীবনই কস্ট একাউন্টেন্ট, যে কলেজের মাস্টার সাংবাদিক রাজকর্মচারী, সারাজীবন ধরেই তাই। এর মধ্যে খালি দুটো ভ্যারিয়েশান—রাজনীতি অথবা সাঁইবাবা, আশ্রম অথবা জেল। এই অনিবর্তনীয় ভবিতব্য এড়াতে গিয়ে সে বিয়াল্লিশেও কুমার। কিন্তু এই কৌমার্য মাঝে মাঝে ডানা হয়ে আকাশে ওড়ার বদলে শেকল হয়ে তাকে মাটিতে আঁকড়ে রাখছে। শেষ পর্যন্ত সে অফিসের এক এফিসিয়েন্ট বস।

একলা কাচের ঘরে বসে সেই সন্ধেটা স্বরূপ এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট করলে। বহুকাল আগে সে কবিতা পড়তে ভালবাসত। একখানা পুরনো মলাট ছেঁড়া ইয়েটস এনেছিল। কিন্তু পড়তে পড়তে তার অস্থিরতা বেড়ে যায়। সেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত পাগলাটে বুড়োর প্রশ্ন যেন এক একটা শরীর নিয়ে নড়েচড়ে বেড়ায় তার মনের মধ্যে। 'কেন বুড়োরা পাগলা হবে না যখন কেউ কেউ দেখেছে ফুটফুটে যে ছেলেটা বোলতার ডিম দিয়ে একদা মাছ ধরত ছিপ ফেলে সে এখন মত্তপ সাংবাদিক; যে মেয়েটার গোটা দান্তে ছিল মুখস্থ সে এখন বছর বছর একটা গবেটের ছেলে পেটে ধরে। কেন বুড়োরা পাগলা হবে না?'

ইয়েটসের পাগলী জেন যেন তার পাশের শূন্য খাটটায় বসে তাকে ডাক দিচ্ছে দু হাত বাড়িয়ে। আশ্রম নয় জেল নয়, আগামী পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা নয়, কোনো দিব্যধাম নয়। এই পৃথিবী, এই পৃথিবীরই যা আছে.

যতটুকু আছে তাই তাকে ডাক দিতে থাকে। স্বরূপ মাঝরাতে উঠে পাশের বিছানার ডানলোপিলোর ভারি গদিটা আছড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমোয়।

ভোর হতে না হতেই ভোঁ ভোঁ করে কলবেল বাজতে থাকে চারপাশে—বেড টি, গরম জলের জন্যে। স্বরূপও ভোঁ বাজায়।

বেয়ারা এসে সেলাম করলে বলে. 'জলদি চা আনো, এখনি বেরোব।'

বেরোবার মুখে ব্যানার্জি হাঁক দিলে, 'কোথায় যাচ্ছেন? আজ হরতাল।'

'তাই তো দেখতে যাচ্ছি।'

'ওরা হোটেল কমপাউণ্ড থেকে বেরোতে বারণ করেছে বোর্ডারদের।'

'তাই নাকি?' স্বরূপ তরতর করে নামতে থাকে।

রাস্তা একদম ফাঁকা। পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। চারদিক থমথমে। ম্যাল চেনা যায় না। কয়েকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ভাঙচুর শুরু হয়েছে, চৌরাস্তায় দোকানের ইংরিজি সাইনবোর্ডগুলো উল্টে পড়ে আছে। দোকানপাট হোটেল রেস্তোরাঁ সব বন্ধ। তরতর করে স্বরূপ নামতে থাকে। কোথাও বাধা পায় না। বাজারের কাছে এসে প্রথম বাধা পায়। একদল নেপালী তরুণ তার দিকে এগিয়ে আসে।

স্বরূপ ব্লাফ দেয়, 'রিপোর্টার। আপনাদের ভাষা সমিতির অফিস কোথায়?'

ছেলেরা সাগ্রহে তাকে নিয়ে যায়। তাদের নেতার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে স্বরূপ। বেশ লোকটি। শুকনো বেঁটে ছোটখাটো প্রৌঢ়। কিন্তু খুব সজাগ ঝকঝকে।

'আমি খুব ভালো পোস্টার আঁকতে পারি।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

'যদি আপনাদের আপত্তি থাকে কোনো বাইরের লোক সম্পর্কে…

'না না, আপনি বাইরের লোক না। ইউ আর নট অ্যান আউট-সাইডার।'

একটা সিঁড়ি বেয়ে চাতাল, যেন প্রায় শূন্যে, নিচে বাজার সারি সারি, থাকে থাকে বাড়ি, গাছ আকাশ, গোটা শহরটার ল্যাণ্ডস্কেপ। আশপাশ নোংরা কিন্তু জীবন্ত।

চাটাইয়ের ওপর বসে নেপালী তরুণ-তরুণীরা পোস্টার আঁকে।

স্বরূপ তার জীবনের প্রথম পোস্টারে লিখলে, 'নেপালী ইজ দ্য ল্যাংগুয়েজ অফ্ সিক্স মিলিয়ান ইণ্ডিয়ানস।'

তার পাশেই সবুজ স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরা একটি তরুণী মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে পোস্টার লেখে। তার পাশে বিস্কুট হাতে তার বছর খানেকের শিশু।

'আপসে হামারা আচ্ছা', মেয়েটি বললে ভাঙা হিন্দিতে।

'মোটেই না, আপনার কলমটা আমার কলম থেকে ভালো।'

'বেশ, চেঞ্জ করুন।'

পোস্টার লিখতে লিখতে মেয়েটি বললে, 'ভাষা শ্বাসকা মাফিক।'

'ঠিক বলেছেন, 'নিঃশ্বাসের মতো।'

ইতিমধ্যে বাজারের কাছে টিয়ার গ্যাস চলে। হাওয়ায় ঝাঁজ। ছেলেগুলো ছুটতে ছুটতে অফিসে ঢোকে। স্বরূপ চাটাইয়ের পাশে রাখা কলসী থেলে জলে রুমাল চুবিয়ে তাদের কাছে ধরে।

কিছুই না, কিন্তু জীবনের সামান্য ভ্যারিয়েশান। চাটাইয়ে গা এলিয়ে দিয়ে বসে স্বরূপ। ভাষা নিয়ে এই উৎসাহটা বেশ। বাংলাদেশেও একদা এরকম একটা উৎসাহ ছিল না? তারপর বোধহয় বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

লাঞ্চের পরও সে সমিতি অফিসে আসে। বিকেলে বাটিতে এলাচ দেওয়া র চা। আবার একটা লাঠি চার্জ হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আবার উত্তেজনা, আবার কিছু একটা বড় ঘটবে তার প্রত্যাশা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে গেছে মেঘে। সেদিকে চেয়ে পিঠ টান করে উঠে দাঁড়ায় স্বরূপ। সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়। সিগারেট ধরাবার জন্যে প্যান্টের পকেটে হাত দিতেই কাগজে মোড়া প্যাকেট খড়মড় করে ওঠে।

'আর শুনুন, এটা আমার পাহাড়ী বোনের জন্যে একটা প্রেজেন্ট।' মেয়েটির হাতে গুঁজে দেয় মোড়কটা।

প্রথমে অবাক তরুণীটি টপ করে মোড়কটা খুলেই মালাটা গলায় পরে নেয়। লিচুর দানাগুলো ঝলমল করে ওঠে তার গলায়।

পরিষ্কার বাংলায় মেয়েটি বললে, 'আবার আসবেন।'

'আসব। তিরিশ বছর পর, যদি বেঁচে থাকি।'

ধরমারু

মহাশ্বেতা দেবী

যশপাল পালামৌয়ে ধরমখুরা যাবে শুনে ওর সহকর্মীরা কেউ অবাক হয় নি। 'কেউ' বলতে তারা, যারা ধরমখুরা কি, তা জানে। ধরমখুরা বিষয়ে যশপালের যে গবেষণা তাই ওর কপাল খুলে দেয়। সে জন্যেই যশপাল এখানে ওখানে লেখার ডাক পেতে থাকে এবং এখন দিল্লীতে নামী কাগজে যোগ দিতে যাচ্ছে।

ধরমখুরা কেন?

দেখে যাবার ইচ্ছে।

সেই জন্যেই?

তাই বলাই তো ভাল।

কাগজে যোগ দিতে না দিতেই কাগজের লোক হয়ে গেলে? ধরমখুরার নাম কয়েকবার কাগজে দেখেই ছুটছ?

ঠিক তা নয়। ছিয়াত্তর সালে ধরমখুরায় আমরা তাঁবু ফেলি। ডেপুটি কমিশনারের উদ্যোগে দনুজমর্দন ত্রিপাঠির পাঁচশো তিরিশ জন কামিয়া, বনডেড লেবারকে জানানো হয় তোমরা মুক্ত। পঁয়ষট্টিজনকে নিয়ে মুক্ত-কামিয়া-শিবিরে সাতদিন আলোচনায় বসি। তাদের জমি দেওয়া হয় অনেককে; মুরগি, শুওর ও দুধেলা গাই মোষ। তাদের বোঝানো গিয়েছিল যে তারা মুক্ত। তারা বুঝেছিল।

তারপর?

সেই ধরমধুরা হঠাৎ কাগজে খবর হয়ে উঠছে কেন? তারা সংঘবদ্ধ হয়েছে। কেন? কেন আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য আন্দোলনে শামিল হচ্ছে? জানতে যাচ্ছি।

যাও।

ওরা তো সবাই আদিবাসীও নয়।

দেখ গিয়ে।

ঘাসি খাজরির নাম দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এ যদি সেই ঘাসি খাজরি হয়? লিখছে, এক হরিজন।

তোমার সেই কেস-স্টাডি?

হ্যাঁ।

কি যেন হয়েছিল?

কামিয়া বা সেবকিয়া, বনডেড লেবারের ইতিহাসেও সে ছিল বিরল এক দৃষ্টান্ত। ডেপুটি কমিশনার ওকে দেখিয়ে বলেছিলেন, লোকটাকে দেখুন। এখন ওর বয়স উনচল্লিশ। জন্ম ১৯৩৭ সালে। স্বাধীনতার বছর, কোদাল ও খুরপি মেরামতির জন্যে নয় আনা, ছাপান্ন পয়সা ধার নিয়ে ও দনুজমর্দনের বাপ ভানুপ্রতাপকে টিপসহি দিয়ে দেয়, আর উনত্রিশ বছর ধরে ও বনডেড লেবার হয়ে আছে। এই ঘটনা কোনো গল্পকথা নয়। সত্যি। লোকটাকে আপনারা স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছেন এবং দনুজমর্দন ত্রিপাঠী পালামৌয়ের সবচেয়ে প্রতাপশালী লোক।

কি অর্থে যশপাল?

সকল অর্থে। জেলার প্রশাসন ওই চালায়। বিহার-রাজ্য-লাক্ষা মার্কেটিং-সমবায়-ফেডারেশনের এক মস্ত অফিসার। ফলে সরকারী মদতে লাক্ষার পাইকারী কারবার করে। বিহারের পঞ্চাশ ভাগ লাক্ষা আসে পালামৌ জঙ্গল থেকে—ভারতের তিরিশ ভাগ। এতেই ওর লাভের বহর বুঝুন।

বেশ লোক। মন্ত্রী হয় নি কেন?

মন্ত্রীদের ও চালায় বলে। সেচ-বিভাগ ওর টাঁকশাল। সেখানে প্রতিটি ঠিকাদার ওর নিজের লোক, আত্মীয়। জামাই এক হোমরা-চোমরা অফিসার। ওর এক গণ্ডমূর্খ আত্মীয় ওর জোরে চাকরি পেয়ে শিক্ষক-ইউনিয়নের কর্তা। এ হচ্ছে দনুজমর্দনের প্রচারযন্ত্র। দনুজ বীরমহিমা প্রচার করতে সাপ্তাহিক কাগজও ছাপে। ১৯৭৬ সালেই জেনেছি, সাধারণ

নির্বাচনে হেরে গিয়েও, মস্তান আর টাকার জোরে ও বিধান-পরিষদে ঢুকেছে একটা ছোট শহর থেকে।

ডেপুটি কমিশনার এই লোকের কামিয়াদের মুক্তি দিতে গিয়েছিল? সাহস তো কম নয়। তাকে বদলি করায় নি লোকটা? এর হাতেই তো সব।

সে ডেপুটি কমিশনার প্রায় বদলি হয়। পরে যে যায় সে আরো জবরদস্ত। দনুজের সঙ্গে লড়ে ও দনুজের গুণ্ডাদের সর্দার দনুজের ভাইপোকে মিসা করিয়ে দেয়। দনুজের ভাগনেদের কাছ থেকে বন্ধকি গয়না উদ্ধার করে খাতকদের দিয়ে দেয়।

তারপর কি হয়?

খবর রাখিনি আর। না-রাখাটা অন্যায় হয়েছে। একেবারেই খবর রাখি নি।

আমার ইনস্টিটিউশন থেকেও চলে যাচ্ছে যশপাল, কিন্তু আমি তোমাদের সে শিক্ষা দিই নি। তোমরা যুবক। আধুনিক শৃঙ্খলাবিজ্ঞানে গবেষণা কর, বুড়ো মানুষের কথা তোমাদের ভাল লাগে না।

বলুন দাদা। কবে আপনার কথা শুনি নি?

একে কি শোনা বলে? গেলে কামিয়া-সেবকিয়া-মুক্তি-শিবিরে, থাকলে, চমৎকার লিখলে বনডেড লেবার বিষয়ে, ঘাসি খাজরির কথা আরো ভাল লিখলে। জানলে মুক্ত কামিয়াদের বিষয়ে পর পর দু-জন ডেপুটি কমিশনার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। সবাই জমি পেয়েছিল?

না।

জমির অবস্থা কি?

বললাম যে জেলা মালিক *দনুজমর্দন*? সে খোদকর, আদিভোক্তা, রায়তী, ভূদান-লব্ধ, এমন কি সরকারের ঘরের মজরুয়া আম জমিও কেড়ে নিয়ে দখল করে রেখেছে। এ জমি সাধারণত আদিবাসী ও হরিজনই পায়।

চমৎকার। যারা জমি পেল, কেমন জমি পায়?

তেমন ভাল নয়।

তাতে চাষ করবে কি উপায়ে?

জেরার মুখে যশপালের অবস্থা নাজেহাল। সে বলে, ডেপুটি কমিশনার বলেছিলেন, জমি সারালো করতে ভূমি-সংরক্ষণ-দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

চমৎকার। দু-জন ভাল অফিসার গেলেন। জেলার দণ্ডমুণ্ডের আসল

কর্তার কামিয়া-সেবকিয়াদের মুক্তি দিলেন। ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু তারপর কি হল খোঁজ রাখবে তো? খোঁজ নিয়ে কি জানবে আমি বলে দেব?

অনুমান করতে পারি।

দনুজমর্দন ত্রিপাঠি সমস্ত কেড়ে নিয়েছে। প্রশাসন ও পুলিশ তাকে মদত দিচ্ছে। বিহার এখন ছোট একটা ভারতবর্ষ। প্রতীকী অর্থে।

হরিজন ঘাসি খাজরি বেজায় নিরীহ ছিল।

ওই ব্যাপারটা সত্যিই কৌতূহলের, জান? ছাপান্ন পয়সা ধার করে ও দনুজের বাপের কাছে। কেননা গ্রামে এমন কেউ নেই, যে ওকে ও পয়সা ধার দিতে পারে। আর একজন নামীদামী সরকারী কর্মচারী, ছাপ্পান্ন পয়সার বিনিময়ে একটা লোককে কিনে রেখে দেয়।

হঁ্যা। যখন মুক্তি পায়, তখন জানা গিয়েছিল, উনত্রিশ বছরে ছাপান্ন পয়সা সুদে-আসলে বেড়ে দু-হাজারের ওপর দাঁড়িয়েছে

বুঝলাম। তবে তোমারও তো ধার আছে ঘাসি খাজরির কাছে। ওর কথা লিখেই তো তুমি সকলের নজরে পড়লে। ভাল কথা, খাজরি কি জাত হে?

ও জাতে নাগেসিয়া। তবে পদবীতে কি বুঝবেন? খাজরি নয় ও কালা-খাজরি। কাগজে লিখেছে খাজরি। কিন্তু একই পদবী আমি অন্যদেরও দেখেছি। ওখানে ছিল তিনজন ঘাসি কালাখাজরি। এ নাগেসিয়া, একজন ওঁরাও, একজন মুণ্ডা। এ কি করত জানেন।

কি করত?

জোয়ান, হট্টাকট্টা চেহারা। দনুজের গোমস্তা খেত থেকে ধান বা গম বা ছোলা—অড়হর-সর্ষে নেবার সময়ে বলদের বদলে ওকে দিয়ে গাড়ি টানাত। হরিজন ঘাসি খাজরি যখন লিখছে, তখন তার কথাই বলছে।

দৃশ্যটা ভাবো। বিধান পরিষদের সভা, সে একটা মানুষকে গাড়িতে ফসল টানাচ্ছে।

এখন মনে পড়ছে।

কি?

ঘাসি কালাখাজরি কামিয়া বা সেবকিয়াই ছিল। বার দুয়েক পালাবার চেষ্টা করার পর 'ধরমারু' হয়ে যায়। ধরমারু মানে বুঝলেন?

আন্দাজ করতে চেষ্টা করছি।

ধরমাক্তদের অবস্থা সব চেয়ে অসহায়। তাদের সামান্য জমি বা গাই-ছাগল স্রেফ নিয়ে নিল। সেই জমি তারা চাষ করে দনুজকে ফসল দিতে বাধ্য। দনুজ যা বলবে এরা তাই করতে বাধ্য। দনুজ যা বলবে এরা তাই করতে বাধ্য। দনুজ যা বলবে এরা তাই করতে বাধ্য। নইলে মালিকের মস্তানরা তাদের ধরবে, মেরে কাজ করাবে।

ঘাসি কি করে ধরমাক্ত হয়ে যায়?

ঘাসির বেলা জমিজমা নেবার কথাই ওঠে না। পালিয়েছিল বলে ওকে ধরে এনে মেরে মেরে মেরে কাজ করানো হত। ওকে ধরমাক্তই বলত সবাই।

পালিয়ে যেতে পারে নি?

না। কামিয়া হাসপাতালে থাকলেও দনুজের মস্তানরা তুলে নিয়ে যেত।

চমৎকার লোক।

যশপাল এখন ভাবে, ভাবতে থাকে ভুরু কুঁচকে। বলে, এই যার জীবন, হঠাৎ তাকে ডেকে এনে বলে, তুমি মুক্ত।

তুমি দনুজের দাস নও।

হাসেন প্রশ্নকর্তা, সে কি তা বিশ্বাস করেছিল?

প্রথমে বিশ্বাস করে নি। পরে বিশ্বাস করেছিল। বারবার বলেছিল, সরকার! এখন তো মদত দিলে। পরে দেবে?—ডেপুটি কমিশনার খুব ভরসা দেন।

দনুজ কি ভাবে নেয়?

কিছুই বলে নি।

তাহলে ধরমথুরা অশান্ত কেন? মালিকের কোনো কাছারি ছিল কি ধরমথুরায়?

না। মালিক তো শহরে। নিজের গ্রাম চৈনপুরায় বাড়িটা কেল্লার মতো। ধরমথুরা একটা গ্রাম মাত্র। ওর কাছারি রাখারও দরকার ছিল না। একশো তিনটে গ্রাম জুড়ে ওর রাজত্ব। কেউ কখনো ওর শাসনে আপত্তি জানায় নি।

কাকে জানাবে?

না, কাউকে জানালেই লাভ হত না। সেখানেই খোলা হয় শিবির। প্রথমে কেউ আসে নি। ডেপুটি কমিশনার নিজে নাম জোগাড় করেন

ঘুরে ঘুরে সকলকে খালাস করেন। সবাই হরিজন ও আদিবাসী। মাগেসিয়াদের নাম দুই বিভাগেই ছিল। তা নিয়ে কিছু গোলমালও হয়।

আমার জীবনে আমি এরকম ভাল অফিসার আরো দেখেছি। ওই কালেভদ্রে একেকজন একক চেষ্টায় যা পারেন, তাই করেন। তারপর সব চুলোয় যায়।

এখন তাই মনে হচ্ছে।

আমার সময়ে কি ওরা ছিল? হাঁ দাদা। ছিল। ডেপুটি কমিশনার বিদায় ভাষণও দিলেন। ওদের বললেন, আইন হয়েছে। ভরসা রাখো। আইনের সাহায্য যে পাবে সে তো দেখলেই। ওরা অনেক দূর অবধি এগিয়ে দেয়। এখনো মনে আছে।

ঘুরে এস।

ধরমথুরা যেতে হলে প্রথমে গোমো। গোমো থেকে ট্রেনে চড়তে হয়। ট্রেন যেতে থাকে, যেতে থাকে। পলাস স্টেশনে পৌঁছতে বিকেল হবে। তখন ওরা জীপে গিয়েছিল। নইলে ধরমথুরা হেঁটে যেতেই হয়। জীপে গেলেও অনেক হাঁটতে হয়েছিল।

ট্রেনের ঝাঁকানিতে অনেক কথা মনে আসে। জানুআরির তীব্র শীতে ওরা নেংটি পরে এসেছিল, খালি গায়ে। সকালে কম্বল জড়িয়েও কাঁপত যশপাল আর ঘাসি বলত, দেখ মহারাজ! কম্বল ফেলে দাও। কম্বল গায়ে দাও বলে শীতে বেশি কাঁপছ।—যশপাল ওকে একটা জামা দিয়েছিল।

ভূমি-সংরক্ষণ-বিভাগ কথা দিয়েছিল জমি ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে সারালো করে দেবে। বি. ডি ও. কথা দিয়েছিল সার, পোকামারা ওষুধ দেবে—সেচের জল না পেলেও পলাস দুই নং ব্লকে বড় ইঁদারা করে দেবে—তাতে ঘাসিরা জল পাবে—জলটো বড় মাহাঙ্গা মহারাজ, মিলে না। পলাস থানা কথা দিয়েছিল, কামিয়া-সেবকিয়া-ধরমারুদের আর্থিক পুনর্বাসনের যে চেষ্টা সদাশয় ডি. সি. করে গেলেন। মালিক তাতে বাধাত ঘটালেই ঘাসিরা থানায় জানাবে। এখন থেকে ঘাসিদের আর্জি সম্যক গুরুত্বে বিবেচনা করা হবে। যশপাল ভেবে দেখল, প্রশাসনের তরফ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না।

পলাসে নামতে তার চেহারা স্টেশনমাস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি রাঢ়ের বাঙালী। আগেও ছিলেন। যশপালকে দেখে তিনি বলেন, চিনা মানুষ মনে হয়?

চিনেছেন ?

তা চিনব নাই ? হেথা বাবু মানুষ তো হরবখত আসে না। তাতেই দেখে চিনলাম। তা, যেছেন কুথা ?

ধরমখুরা।

কেনে ?

কাজ আছে।

ধরমখুরাটো তো অলি আছে মশায়।

দেখি।

সিবার ছিলেন তাঁবুতে। থাকবেন কুথা ?

মানুষ নেই ?

আছে তো কালাখাজরা দল। ঢুকতে দিবে নাই।

দেখি।

তারা ভি ছামুতে নাই।

কোথায় আছে ?

স্টেশনমাস্টার বলেন, জানি নাই।

কুলি পাব ? কুলি ?

কুলি ? হেথাক ? না মশায়।

চায়ের দোকান থেকে উঠে আসে একটি লোক। তাকে দেখেই স্টেশনমাস্টার বলেন, জাট্টু ! তু কিস আসছিস বাপ ? আমারে কি মারা করবি ?

মাল নিব।

জাট্টু। জাট্টু কালাখাজরা না ?

হাঁ মহারাজ।

চল।

জাট্টু যশপালের ব্যাগ নেয় ও বলে, চল মহারাজ। আন্ধার হই যায়। জাড়াটো ঘুনাইছে।

স্টেশনমাস্টার বলেন, যাবেন নাই বাবু।

জাট্টু দাঁত বের করে নিরানন্দ হাসে ও রুক্ষ গলায় বলে, আমার চিনা মানুষ। তুমি যাও কেনে ? টরে টকা বাজাই থানায় জানাই দাও ?

হেই জাট্টু ! আমি খবর দিই না থানায়। পরিবার লয়ে থাকি বাপ,

তুরাদের সাথ কুনো বিবাদ করি না। থানায় খবর ভি দিই না। পুলিস গিছিল…

খবরটো চালালে ভাল করবে নাই বাবু। আমরা জলি আছি। চল মহারাজ।

হেই দেখ!

জাট্টু ও যশপাল স্টেশনের সীমানা ছাড়ায়। জাট্টু বলে, হাঁ, ডরি আছে এখুন। আগে ডরে নাই।

জাট্টুর গা সেদিনের মতই উদলা, পরনে নেংটি। যশপাল বলে, এদিকে যাচ্ছি কেন?

ধরমথুরায় পুলিস চৌকি।

কোথায় যাচ্ছ?

ডরি গেলে মহারাজ?

না জাট্টু। তোমাদের ভয় পাব কেন?

তুমার চিঠিটো লিখছিলে বিড্ডি বাবুরে. লয়?

হাঁ। তাতে অবশ্য ভুলও করেছি। আগামীকাল আসব বলে লিখেছি। তারিখের গোলমাল। তিনি বললেন?

তিনি মোরাদের বলবে? উ আপিসে মুনার দাহো জল দেয়। সি ভুইয়াটো—যি তুমাদের বাইস্কোপ দেখি ডরে পলাই গিছিল, সি জানাই গেল। ডাহিনে ঘুর।

ডানদিকে ঘোরে ওরা। উৎসুক চোখে তাকায় যশপাল, কিন্তু পিপল গাছের ওধারে ধরমথুরা গ্রামের ঘরদোর চোখে পড়ে না। কানে আসে জল টানার শব্দ।

জাট্টু বলে, মোরাদের ঘর নাই। হাঁথি দিয়া ভাঙি দিছে। এখন খেত বানাচ্ছে।

যশপালের অবসন্ন ও রিক্ত লাগে। উত্তর জেনেও সে বলে, কে?

জাট্টু যেন মজা পায়। হেসে বলে, কেনে? দগুজ তিরপাঠি? জল টানার শব্দ শুন? বিড্ডি বাবু কুয়াটো বানাই দিছিল। খেতে জল দিতেছে।

ও তাঁবু…

পুলিসের। না। আমারদের লেগেও বটে, নহেও বটে। পুলিস রাখি খেতে কাম করাতেছে।

সেই কুয়ো !

হাঁ মহারাজ। কুয়াটো করছিল বটে, তবে আগে করে নাই। তিরপাঠি আমি মোরাদের উঠাই দিল, হাঁথি দিয়া ঘর ভাঙি চাষের জমিন বানাল, তখুন হল কুয়া। ধরমখুরাতেই হল। এখুন ভাল চাষ উঠে। আগে ছিল আকাশের জল। ফিন ভি ডাহিনে ঘুর মহারাজ।

ওরা চলে কাপঝোপের মধ্যে দিয়ে। তারপর একটি নালা পেরোয় নালায় জল। তারপর জাট্টু বলে, আমি গেলাম মহারাজ। চিনতে পার ?

কোসালি গ্রাম।

গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে ওরা। পরিত্যক্ত গ্রাম। জাট্টু বলে, হেথা হতে উঠি গিছে সব।

এখানেও ?

জাট্টু বলে, না। হেথা ঢুকে না। কাগজে লিখছে ধরমখুরায় বলোয়া উঠছিল। ওনি লিখছে। লড়াইটো হেথা হতে হয়। এখুন ভি উরা হেথা ঢুকে না।

পুলিস ?

তিরপাঠির লোক। পুলিস এখুন আসতেছে না। তিরপাঠির ভাইপুতটো দুটা পুলিস মারি দিল।

কেন ?

পুলিস কেনে মোরাদের ধরতেছে না।

কবে ?

তা দশ দিন হল ? কাগজে উঠায় নাই ?

না।

উঠাবে।

তারপর ?

তিরপাঠির উপর থানার এখন মন নাই। তিরপাঠি টাকা দিতেছে না। আর পুলিস ভি মারি দিছে। আর মুসলমান পুলিস দারোগা ভি আনছে, তিরপাঠি তারে বদলি করি দিবে। পুলিস ভি দুনামুনা হই আছে। ঘাসি লড়াই কালে বলছিল, তুমারদের সাথ মোরাদের বিবাদ নাই। মোদের বিবাদ তিরপাঠির সাথ। তুমরা হটি যাও। আর বিটিরা ছামুতে

দাঁড়ায়ে গিছিল ছেলা লয়ে। তাতে ভি পুলিস গুলি ছুঁড়ে না। তাতেই মোরা পলাই, আর তিরপাঠির ভাইপুত পুলিস মারি দিল।

তখন কি হল?

তিরপাঠির লোকে-পুলিসে দাঙ্গা হয়। বিটিরা পলায়ে আসে।

সেই নামটি একটু চওড়া হয়ে ঘুরে এসেছে। যশপাল বলে, ও তো ছোটা পলাস।

হাঁ। হোথাই যেতেছি।

ছোটা পলাস গ্রামটি কাছে আসে। ঝাটু হেঁকে বলে, ঘাসি হে! মোরা আসি গিছি।

যশপালের বুকের নিচে অসম্ভব উত্তেজনা। প্রায় গাঢ় অন্ধকারেও চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকায়। দশবছর বয়সে ছাপ্পান্ন পয়সা ধার করে যে বলেছিল ঋণের দায়ে দাস, যাকে উনচল্লিশ বছর বয়সে মুক্ত করা হয়েছিল—মুক্ত হবার আগে দু বার যে পালাতে চেষ্টা করে এবং আর যাতে না পালায় সেজন্য যাকে দিয়ে বলদের জায়গায় জুতে ফসলবোঝাই গাড়ি টানানো হত—যাকে দেওয়া হয়েছিল শরমখুরায় ছয় বিঘা জমি—সেই ঘাসি কালাখাজরাকে আবার দেখবে।

স্বতন্ত্র আদিবাসী রাজ্য আন্দোলনে সেও শরিক এখন। কি করে? যশপালের ভিতরের সমাজ-সমীক্ষক কৌতূহলী, আরো ভিতরের ও গভীরের মানুষটি আরো কৌতূহলী।

আমি গেলাম ঘাসি।

চেঁচাইতে দেখ। মাথাটো কিনে নিছে।—ঘাসি বেরিয়ে আসে একটি ঘর থেকে লণ্ঠন হাতে, অন্য হাতে বল্লম। তারপর, যশপালের এখানে, এই অন্ধকারে, পলাস স্টেশন থেকে চারমাইল হেঁটে হাজির হওয়া যেন একান্ত প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক—এইভাবে বলে, তুমি মহারাজ! আস।

ঘরে ঢোকায় যশপালকে। ঘরে আরো সাত-আটজন। ঘাসি বলে, তুরাদের চিনা মানুষ। মহারাজ কি চিনছ এরাদের? দেখছ সবারেই।

ঘাসি মুণ্ডা, ঘাসি ওঁরাও, কালা···

না, জাকান। কালা মরি গিছে।

এ জগদীশ।

হাঁ। ইয়ারে দেখ নাই। সাবুদ ভাহো।

লোকগুলি কোনো কথা বলে না। মস্ত কড়াইয়ে তুষের আগুনটা খুঁচিয়ে দেয় ও ঘন হয়ে ঘিরে বসে। এতখানি পথ খালি গায়ে পাড়ি দিয়ে এসে এখন জাটুর শীতও লাগে, খিদেও পায়। ঘরের আড়ায় ঝোলানো মকাইছড়া থেকে একটি মকাই ছিঁড়ে নিয়ে ও খেতে থাকে আগুনের ধারে বসে ও সকলের উদ্দেশে বলে, টেন হাতে আর কেউ নামে নাই। শুধা মহারাজ। এখুনো দারোগা বদল হয় নাই। তিরপাঠির ভাইপুত এখুনো টাউনে।

কে বলল ?

রামদাস, সুমরা।

আর কি শুনলি ?

তিরপাঠির ঠিকাদারের লোকরা বলছে, থানাতে দশহাজার টাকা দিবার কি বা কাম। মোরাদের দশজনারে দুইশৎ করি বাটি দাও, আমরা আলায়ে দিতেছি কোসালি। আন্ধারে যাব—আসব। ডর নাই কুনো। হুঁ, ই কথাটো খুব বাগে শুনে নিছি। চায়ের দুকানের ছামুতে ঘুমাতেছিলাম। চক্ষু মুদা ছিল, কান খুলি রাখছিলাম। খুব বলতেছিল উয়ারা।

তোর ছামুতে বলল ?

আমি যাই কুলি কাজে, আর যেয়ে তুরাদের গাল পাড়ি খুব, আর যা বলে, 'হাঁ' বলি।

ঘাসি বলল, কবে আসবে ?

তা বলে না।

দশ জন !

হাঁ রে, বন্দুক লিস্‌বে।

বন্দুক আনুক কেনে, আসবে তো ধরমগুরার দিক হতে, লয় ? কাশবন দিয়ে আসবে নাই। মহারাজ ! তুমি ভি আগুন পুহাও খানিক। তখন তাম্বুকানাত বসায়ে আর আনারদের খুব খাওয়াছ। আমরা তো খাওয়াব মকাই।

জল খাব।

জল ! চল কেনে।

ঘাসি ও যশপাল বেরোয়। সেই নালাটি, ঘাসি বলে, লেমে যেয়ে জল খাও। বিটিগুলানও নাই, আর কলসিতে জলও ধরার মানুষ নাই।

তারা কোথায় ?

তাতে তুমার কাম ?

নেমে যায় যশপাল, জল খায়। ঘাসি বলে, দাঁড়াও কেনে হেথা।

আমি আসতেছি।

ঘাসি চলে যায়। যশপাল দাঁড়িয়ে থাকে একা। ঘাসি তাকে বিশ্বাস করছে না। সেই ঘাসিই বটে। কিন্তু রূপান্তরিত। বদলে গেছে। হঠাৎ ওর মনে হয়, এই অন্ধকারে কোসালী গ্রামে ওকে যদি পুলিসের চর সন্দেহে মেরে রেখে যায় ঘাসিরা, তাহলেও ওর কিছু করার নেই।

ঘাসি ফিরে আসে। সঙ্গে সাবুদ ও ঘাসি মুণ্ডা। সাবুদের কাঁধে যশপালের ব্যাগ।

ব্যাগটো নিয়ে এলম মহারাজ। এখুন কোসালী যাব। সেথা যেয়ে কথা হবে।

আমি কিন্তু কালকের দিনটা থাকতে পারতাম ঘাসি। থাকব বলেই এসেছিলাম।

যশপাল ক্ষুণ্ণ, আহত গলায় বলে। ঘাসি ওর আহত হওয়ার ব্যাপারটিকে মোটেই আমল দেয় না। বলে, মহারাজ! আমরা আজ আছি। কাল কুথা যাব ঠিক কি ? আর দারোগাটো বদলি হতে যা দেরি। নূতন দারোগা এল কি পুলিস আসি পড়বে। মোরাদের যেতেও হবে।

কোথায় ?

যেতে যবে মহারাজ! ইয়ার মাঝে পড়ি মরবে তুমি ? তাতেই আনছি ব্যাগটো।

কথা বলব না ঘাসি ?

কথা ? তা বলবে। তুমরা তো কথা বলতে ভি পার। শুনতে ভি পার বহুত। তখুন ভি দেখলম। চল।

ঘাসি মুণ্ডা হঠাৎ বিজাতীয় রোষে বলে, ইটো করবে নাই, উয়াটো করবে নাই, বলবে না মহারাজ। তুমারদের হতে মোরাদের এত দুখ উঠছে।

ঘাসি বলে, এই, চুপ যা। উ মোরাদের কাছ আসছে, এখুন কিছু জানেও না।

কাগজে পড়েছি।

কাগজ! সি খবরটো তো দমুজ তিরপাঠি পাঠাইছে।

সাবুদ এদিক-ওদিক চেয়ে বলে, সাতটো গ্রামে মানুষ নাই। কি রকম পোঁপান-পারা দেখাইছে।

ঘাসি কালাখাজরি বলে, নালাটো পার হও মহারাজ। মোর কাঁধে চাপবা?

না না। পাগল না কি!

মোরাদের বিপদ চলতেছে খুব। তুমার জানের জিম্মাদারি কে করে বল।

সাবুদ বলে, হাঁড়িটো ভরে লই।

মেটে হাঁড়ি ভরে নেয় ও, ঘাসি মুণ্ডাকে দেয়। যশপাল হোঁচট খায়। বলে পথ দেখতে পাচ্ছি না।

আমার হাত ধর কেনে?

ওর হাত চেপে ধরে চলে ঘাসি। বলে, আর কতদিন। ই দফায় ফয়সালা না হলে সাত গ্রাম ধুলামাড়ি করবে হাঁথি দিয়া, আর খেত বনাই নিবে। বিড্ডি বাবু বসি আছে, তখুন দিবে কুয়া বানাই।

উ পালোরে আগে মারি দিলে হত।

কত জনারে মারবি সাবুদ?

হোই আসি গেলম।

ধরমথুরার পথ পানে চল্ কেনে। হোথা তুর ঘরের ছামুতে বসব। মহারাজ, পথ দেখে চল।

যা ছিল সাবুদের ঘর, তার সামনে এখন শুকনো পাতার পাহাড়। ওরা পাতা সরিয়ে বসে। শীত। আগুন জালায় ঘাসি মুণ্ডা ও সাবুদ। ঘাসি বলে, আমি মহারাজের সাথ কথা বলি। তুমার বুঝি খিদা লাগছে মহারাজ। জাটুরা আসতেছে মকাই লয়ে। আসলে খাবে।

তোমরা এই ক জন?

না, আরো আছে। বল মহারাজ।

কি বলব বল। সেই যে চলে গেলাম···

হঁ। হঁ।···

মনে হল সব ব্যবস্থা হল।

মোরা ইবার সুখে রব।

কামিয়া তো আর রইল না কেউ।

ঘাসি কালাখাজরি ঈষৎ হাসে। আগুন খোঁচায় ও। আগুন দপ্ করে ওঠে। ঘাসি আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। শীর্ণ হয়েছে। তবু ও যথেষ্ট শক্তি রাখে। হাড়ের আড়াটি চওড়া ছোট, কোঁকড়া, কাঁচাপাকা চুল।

ঘাসি বলে, আগুনের দিকে চেয়ে বলে, কামিয়া-দেবকিয়া-ধরমারু। হ্যঁা, তুমরা এলে, হাকিম এল। খালাস করি দিল। আর বারবার বুঝাই দিল, আমারদের জোট বাঁধিবার লাগবে। সকল কামিয়ারে বুঝাতে হবে, তুমি কিনা বান্দা নও।

হ্যঁা, বলেছিলেন।

মোরা ডরি যাই। তা বাদে খুব আনন্দ হচ্ছিল। মোরাই ঘুরি ঘুরি কত কামিয়ারে বলছি, আইনটো হচ্ছে।

বলছিলে?

হ্যঁা মহারাজ। তখুন সি হাকিম চলি যায়। আর হাকিমটো ভি ভালাই করতে চাছিল।

তারপর?

কিন্তু মহারাজ! জিলা-হাকিম, ছোটা হাকিম মদত দিবে, বিড্ডি মদত দিবে। ই সকল জানাই গেলে। দু হাকিম বদলি হতে আইন উঠি যাবে তা তো জানাও নাই? ই কি ভাল করছিলে?—স্মৃতিতে শোণিত ক্ষরণ, ভাল করছিলে?—বলে ঘাসি চুপ করে?

যশপাল বলে, ঘাসি, ঘাসি মুণ্ডা, সাধুদ! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি তো জানতে চাই, সেইজন্যই ছুটে এসেছি। আইন, আইন তো উঠে যায় নি?

ঘাসি কালাধাজারি আরক্ত চোখে তাকায়। বলে, মিছা বল না মহারাজ। আইন আমারদের লেগে কুনোদিন আছিল না, দু-বার জানি চিকুরপারা ললকাছিল, বাস্ আবার সি তিরপাঠি। আগে সি নিছিল ওই সাবুদের ভূদানে মিলা জমি, কার বা অধিভুক্তা জমি, আর এমুন কামিয়াও ছিল দুই-চার ঘর, যারাদের জমি ছিল। ধরমারুদের তো ছিলই।

হাঁ ঘাসি, ছিল।

দু-নম্বর হাকিম চলি গেল। তখুনো ইন্দিরা গাঁধীটো আছে। বাস্, দনুজ তিরপাঠি নিজে আসি পড়ল বন্দুক, লাঠি লয়ে। তিনশো লোক আনছিল। যার যা জমি ছিল সবতে চিন্ দিল। বলি দিল, সব আমার জমি।

তারপর?

আমাদের যি জমি দিছিলা, তা ভি গেল। আমরা দৌড়াছিলাম থানা,

বিডিও আপিস। তাতে পুলিস নামি গেল। তখনি কালাটো ধরে মহারাজ। চব্বিশজন জেলে পচতেছে তিন বছর হয়।

তারপর?

থুথু ফেলে খানি। বলে, যি গাই-মোষ দিছিলা, পুত্তর, সকল কাড়ি নিল আর বলি দিল, সি হাকিমটো ভাত দিবে তুরাদের। আবার খেতে আনমজুর লাগাই কাম করাব। সেচের কামে মাটিকাটাই মজুর অগণন, কামের মানুষ পাব।

তখন?

বহুৎ হাতে-পায়ে ধরছিলাম। বলে, সাদা কাগজে টিপছাপ দিবি, তবে কাম। তখুন মানা করলম। কিন্তুক দারোগা ভি চক্ষু ঘুরাল আর ছোটা হাকিম···

এস. ডি. ও···?

হাঁ হাঁ, সি ভি চক্ষু ঘুরাল। তাতে কতজন টিপ দিল। তা বাদে খেতি কাম হলে পরে দিন-দিন আধা সের ভুট্টা দিল। বলে আর কিছু নাই। এহি মজুরিতে কাম উঠাবি বলি ছাপ দিছিস। কামিয়া নয় তুয়া। বান্ধাবান্ধি কামিয়াতি বান্ধাবান্ধি নয়। কিন্তু ছাপ দিছিস, যতদিন কাম করার এহি মজুরিতে কাম করবি। সি বান্ধাবান্ধিটো নিজেরা সাধি নিছিস।

ওঃ, ভাবা যায় না।

কেনে? হতে পারে আর ভাবতে যত দুখ্? তুমারদের বুঝি নাহি পারি মহারাজ।

বল।

ই ভাবে চালাল, চালাতেছে। আইনটোর মদত মাঙি তো খুব শিক্ষা হছিল মোরাদের। তা টিপ দিছিলাম, তব ভি পলালাম আমি। হোই রাঁচি, হোই বাস সাফাই কাম করতে করতে চাইবাসা। আর সেথা বাসটো উলটায় পথে। তা এক মাহাতো গ্রামে থাকলম। সিথা মিটিন্ করতেছিল বড্ডর আদিবাসী রাজ্য দল। সিথাই থাকলম। তাদের সাথ। এক সাথ। ঘুরলম।

তারপর ফিরে এলে?

হঁা মহারাজ। আবার লড়াইটো দেখো।

সে তো, সে তো শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রাম।

আমারদের ভি তাই।

কিন্তু...

তিরপাটি মারি চলবে, মোরা কামিরা হয়ে ভি মার খৈতম, আর ধরমারু করি রাখি দিবে, আর কিন ভি বলবে শালো খালি কালাখাকরি? তু সবারে চেতাছিল উ টিপসহি মানব না, চল্ শালো তোরে গাড়িতে জুড়ি ধান টানাব। কিয় ভি বলবে আর ঘাড়ে হাত দিবে খপ করি। তা আমি টাঙিটো লই পাক মারি ঘুরি দাঁড়ায়ে একটো কোপে সি ঘাড়ের হাতটো তাহার ঘাড় হতে নামালেই শাস্তি লাশ হই গেল? তোমারদের কথা আমি বুঝি পারি না মহারাজ।

তারপর?

সবারে খেদায়ে বাগার করে আনছিলম।

ওরা কি করল?

বলল। ধরমারু করি দিবে ইলাকা।

আর কি করল?

ঠিকাদাররা গুণ্ডা দিল। জবর লড়াই।

তোমরা দুজনকে মেরেছিলে।

উরা ভি দুজনরে।

তারপর?

তখুন ছোটা পলাসে আসি সবারে জমা করলম। বিটিদের, ছেলাদের, বুড়াদের সরালাম।

কোথায়?

তিরিশটা গ্রামে রাখছে তাদের।

আর কি হল?

আর যা হল, তা হবে বলি ভাবি নাই মহারাজ। আমারদের কথাটো যেমন শুকনা কাশ বনে আগুন পারা দৌড়াল। তাতেই শত্‌খানি গ্রামে কামিরা-মজুর থানা দৌড়াতেছে। তিরপাটির মজুরিতে কাম করব নাই। তাতেই বড়া হাকিম ভি বলছে দেখবে কি হছে।

ধরমথুরা ভাঙল করে?

আমি যখন সবারে লয়ে ছোটা পলাশ।

এখনো ম্যাজিস্ট্রেট আসে নি?

না। বিদ্রোহেছে ইলাকা। জুবের আগুন যেমুন। পুলিশ ভি ছলোমুলো হই গিছে।

কি করে হল, যাদি?

এই দেখ মহারাজ! তুমরা বললে জোট বাঁধ, তা জোট বাঁধলাম। আর্জি দিলাম, লাথ খেলম। তা বাদে সবারে বললম, এখুনো বলি, সকল পালো আসি শুধায়, কি করব যাদি? আমি বলি, উরা এতকাল ধরমারু করি রাখছিল মোরাদের। এখুন মোরা ভি করব।

করছ?

হঁা মহারাজ। মোদের বিটিদের ইজ্জত লিবা? ধর আর মার। গরু-মহিষ কাড়ি লিবা? ধরমারু কর্ শালোদের। ঘর হতে টানি লয়ে বেগার খাটাবা? ধরমারু কর্ শালোদের। তুরা না-মারলে ভি মার খাবি, তবে মেরে মার খা কেনে? তা উরাদের সকল তেজ বন্দুক-লাঠিতে। এক-শং মরদ 'ধর্‌মারু করি দিব' বলি আগালে ডরে পলায়।

ধরমখুরাটা…

সব কাড়ি নিব মহারাজ। ধানটো হতে দাও কেনে, কাটি লয়ে চলি যাব।

ওরা যে আসবে বলেছে।

আসুক।

এখন এসে যায় জাটু, যাদি ওঁরাও, অন্য সকলে। আগুন জাইয়ে দেয় জাটু। পাতা পোড়ার সুগন্ধ। যশপাল ও ওরা মকাই খায়। জল। জাটু বলে, এত হবে ভাবে নাই তিরপাঠি। ঠিকাদারদের সঙ্গে ভি লাগি গিছে।

যাদি বলে, উ ঘাগ-ভাতারে বিবাদ। মিলি যাবে।

আবার পুলিস আসবে।

আসলে আসবে মহারাজ। তাদের ভি ধর্‌মারু করতে হবে, না কি বল?

যারা আদিবাসীদের জন্যে লড়ছে…তোমাদের কতজন তো আদিবাসী নয় যাদি।

যারা লড়তেছে তারা অনেক, অনে—ক! যাদি একটু একটু দোলে। তারপর বলে, তারা জানে, কালা দুলাদ আর যাদি ওঁরাও একহিসাব কাথিরা রয় মহারাজ, একহিসাব ধরে তিরপাঠির হাতে। আগে শুধাই ডরাছি, এখুন আর ডরাই না মহারাজ।

কিন্তু ঘাসি, অস্ত্র নিয়ে লড়লে…

পুলিস জেয়াদা মারে মহারাজ ?

অন্যভাবে সমাধান হওয়া উচিত ছিল, খুব উচিত ছিল, হল না। সেই কথাই মনে হচ্ছে।

সুরজটা তো কোনোদিন পছিমে উঠি পারে মহারাজ। তুমি যা বল, যা বলছিলে, তা হবার নয়।

ভাবতে পারি না।—হঠাৎ যশপাল কেঁদে ফেলল। এই রাত, এই আশ্চর্য রাত, পাতা জলা আগুনে সুগন্ধ। বিহার রাজ্য প্রশাসনের নির্লজ্জ ও উদ্ধত চণ্ডনীতির প্রতিবাদী কয়েকজন কামিয়া, ধরমারু, সকল প্রতিপক্ষকে 'ধরমারু' ঘোষণা করে এখন মকাই চিবোচ্ছে। কেন এ রকম হলো? যশপাল কাঁদে। এদের সামনে কাঁদা চলে। এরা বুঝবে। জীবনের এই সব একান্ত গোপন বেদনাগুলি বুঝবে তারা, যারা যশপালের জগৎ বা জীবনের মানুষ নয়।

ঘাসি বলে, ভেব না মহারাজ। ই তুমার ভাবার কথা নয়, আমারদের। আমরা ভাবি পারি। শুন, সাবুদটো তখুন জোয়ান। যেথা তুমি বসছ, সেথা ভালু আসছিল একটো…

গল্প হয়। রাত বাড়ে। রাত ফুরায়। সাবুদ উঠে যায় গাছে। ভোরের ঠাণ্ডা।

আসতেছে। পাঁচজন—সাবুদ বলে, নেমে আসে। ঘাসিরা উঠে দাঁড়ায়।

কত দূর।

অনেক। ছোট ছোট দেখা যায়।

লুকাই পড়্, লুকাই পড়্। নিচুপ রবি। মহারাজ, চলি যাও তুমি। কুনো কথা নয়। আমারদের দেখ নাই। তুমারে শুধাবে টিশনে। বিড্ডি খবর দিবে থানায়।

কোনো কথা বলব না। …

যা—ও!

ঘাসিরা বদলে যায়, বদলে যেতে থাকে। ভীষণ ক্রোধে ওরা স্থির, ধূর্ত, কৌশলী। ঘাসি বলতে থাকে, আয় শালো। ধরমারু করি দিব, ধরমারু করি দিব।

যশপাল বেরিয়ে পড়ে, হাঁটতে থাকে সূর্য পিছনে রেখে। ওকে ওরা

চেয়েও দেখে না। স্বাভাবিক। ওদের তো যশপালকে দরকার নেই। যশপাল এসেছিল নিজের তাগিদেই। কিন্তু নিজেকে ওদের কাছে দরকারী করে তুলতে পারে নি। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু ধরনাকরা যখন ঘাসিদের কাছে আসছে, সে সময়ে যশপালকে অবাঞ্ছিত তৃতীয়পক্ষের মতো সরে যেতে হচ্ছে বলে সামনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকেও মনে হয় মেকি ও মিথ্যে জিনিস। যা খাঁটি, যা সত্য তা এখনি ঘটবে। অন্তত্র। যশপাল খুব অভিভূত বলে বোঝে না। এ উপলব্ধি শুধু এই মুহূর্তের। ট্রেন চললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভদ্রলোকদের যেমন যায়।

মানসাঙ্কের হিসেব

অমলেন্দু চক্রবর্তী

বাবুদের বাড়ি মুড়ি ভাজতে ভাজতেই খবরটা শুনেছিল শৈলবালা। বড়ো নাতনী পুষ্প হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেছিল।

চৈত্তির মাসের গনগনে দুপুরে আকাশে নিদয় সুয্যিঠাকুর আর উঠোনের মস্তো উনুনটায় তেজী আগুন। গরম বালিতে চালগুলি ফেলতেই যেমন খোলা ভরে ফটফটিয়ে ফুটে উঠছে মুড়ি, গায়ের চামড়ায় সর্ব অঙ্গে চিড়-বিড়ানিতে শরীরটা জ্বলছে, জ্বলতে জ্বলতে অস্থিরতায় যখন দশ আঙুলের এলোপাথারি নখের আঁচড়ানিতেও সোয়াস্তি নেই, বুকে পিঠে দুঃসহ দাহে উন্মাদিনী, হাতের নাগালে কিছুই না-পেয়ে কুঁচি কাঠির উল্টোদিকটাই ঘসতে থাকে পিঠে। পিঠ জ্বলে যায়। ডান হাতটায় ভাঁজ পড়ে এবং কনুইটা মাথার উর্ধ্বে উঠে গিয়ে হাতের মুঠোটা চলে যায় পিছনের দিকে, ছুতোরের রাঁদা ঘষার মতো পিঠটা ঘষতে ঘষতে আবার টানটান হয়ে ছুটে যায় খুলিটার দিকে। একই কুঁচিকাঠি গরম বালি নাড়ে। খুলি থেকে ছাঁকনিতে ঝরে যায় বালি। হাজারো হাজারো অগুন্তি শিউলির মতো বাবুদের মুড়ি।

তখনই মোচড় লাগল শুকনো পেটে। সেই-কখন, কাজ শুরুর আগে বেলা এগোরাটা নাগাদ এক পালি মুড়ি আর এক দলা গুড় দিয়েছিলেন গিন্নি ঠাকরুণ। রোদে আগুনে পুড়তে পুড়তে গলা শুকিয়ে এবং টিউবকলের জল খেয়ে খেয়ে পেটটা ঢাউস বানিয়ে যখন শরীরটা আর চলছিল না কিছুতেই, ভাতের রসেই শরীর বাঁচে জেনে ভাতের ভাবনায় পেটের

হেচকানিটা বুক ঠেলে থুতুর দলা হয়ে উগরে উঠছিল গলায়, ফুঁপিয়ানি চলছিল তখনও। চালাতে হয়। বড়ো জোতদারের ঘর। শুধু মুড়ির চালের জন্যেই দরদালানের কোণে আলাদা চাঁই-করা বস্তা কতোগুলি।

সুতরাং আগুনপোড়া শরীরে শৈলবালা খবরটা শুনল এবং শোনার পর, খোলা থেকে ভাজানো বালি ছিটকে এসে গায়ে পড়লে যেমন হয়, এক লহমায় বম্মাগুটা পাক খেল চারপাশে, তারপরই চণ্ডালী রাগের ঝাঁঝে আর কোন হুঁশ নেই, নাতনীর নরম গালে আচমকা চড় কষিয়ে জলন্ত চেলাকাঠ নিয়েই তেড়ে গিয়েছিল চেঁচাতে চেঁচাতে—'আবাগি ছুঁড়ি, কী কচ্ছিলি তুরা! ছিলি কুথা? বসে বসে খাবি আর পাড়া চইবে বেড়াবি ছেনালির মতন। কেনে, তুরা ঘরে থাইকতে কেনে আমার ঘরের জিনিস কেইড়ে লেবে দশজনে......'

এবং বড়োঘরের বড়োমানুষেরা, কাজেকম্মে জন লাগাবার পর দিনের শেষে কাজের-বুঝ বুঝে নেওয়া ছাড়া যারা উদাসীন, হঠাৎ দুপুরবেলায় হুড়োহুড়িতে ছুটে এল সবাই—'কী হল, কী হল আবার তোদের। মেয়েটাকে মাচ্চো কেনে মাচ্চো কেনে গ ভুতোর মা। আহাহ্‌হ্‌ করো কী, করো কী...'

জলন্ত আগুন ছুঁয়ে ফেলেছিল মেয়েটাকে। সবাই এসে আটকাল।

বাড়ির কত্তা হারান মুখুজ্জে গাঁয়েরও একজন মাথা। ধমকে উঠলেন—'মাথাটাথা খারাপ নিকি তোর। কচ্চিলি কী। অ্যাঁ...'

সত্যি, মাথামগজের ঠিক নেই শৈলবালার। হঠাৎ বলে বসল—'ই মুড়ি আজ আর ভাইজবনি গ বাবু। আমায় ছাড়ান দিন...'

'ছাড়ান দেবো! বাঃ, আহ্লাদের কতা আর কী! আমার এত্ত এত্ত কাঠ পুইড়ে এখন বলচিস ছাড়ান দিন। ভারি তেল হয়েচে তোদের! তা আমার লোসকানটা কে দেবে শুনি। নে যা যা, সব কটা চাল তুলবি, তবে ছাড়ান...'

মুরুব্বিমাতব্বরদের উঠোনে বাড়িজনেরা ঘিরে ফেলেছে তাকে। অসহায় শৈলবালা ইতিউতি তাকাতেই পাকাবাড়ির দোতলায় দীঘল লালপাড় পান-চিবোন মাঠাকরুণদের হাই তুলতে দেখল। নিচে এতগুলি ব্যাটাছেলে। চিড়-ধরা গলায়, কান্নায়, কত্তাবাবুর পায়ের গোড়ায় আকুল—'আমার সব্বোনাশ হয়ে গেচে গ বাবু। আমার সোনামণিকে ধইরে নে গেচে...'

'সোনামণি! সে আবার কে! কে হয় তোর?'

'আমার এট্টা ছাগী গ বাবু। তিনটে বাহায়ের বাচ্চা। সকালে সাঁঝে দেড় পোয়াটেক দুধ দেয়...'

'যা বাব্বা,...এট্টা ছাগী! তার জন্তে এত কাণ্ড...' সবাই হাসলেন। কর্তাবাবু বিরক্ত—'তা তোর ছাগীর হলোটা কী? কে নিয়েছে। সে ত বলবি...'

'উ মরাখেকো শাকচুন্নি মাগীটা গ বাবু। সখার-মা। একশটা ট্যাকা ধার নেছলাম, সুদ দিতি পারিনি তিনমাস। ঘরের পাশে নিমগাছটায় দুকুর-বেলা বাঁধা ছেল সুনি আর ত্যাখন...'

'সখার-মা! সেটা আবার কে?' বুড়ো মুখুজ্জেমশাই তার নিজের লোকদের দিকে তাকালেন।

কে বলল—'ওই যো সাঁতরাপাড়ার সখারাম দুঃখীরাম, ওদের মা...'

'অ...' ভেজা গামছায় ঘাড়গর্দানবুকভুঁড়ি ঘসতে ঘসতে হারান মুখুজ্জে—'আরে ও মাগী ত নিজেই ঘুঁটে বেচে মুড়ি ভেজে খায় তোর মতোন। তা ওর এত রস হল কী র‍্যা! ও আবার ট্যাকা দেবে তোকে! তায়

'

'উ মাগীর অনেক ট্যাকা গ বাবু। দু-দুটো ছেইলো চাকরি করে শ'রের কারখ্যানায়...'

চড়চড়ে রোদ্দুর মাথার উপর। মুড়িভাজার বালির মতোই জলছে মাটি। জলতে জলতে পাতা-হলদে-হয়ে-ওঠা উদ্ভিদ বা গাছপালার মতোই একজন, যখন মাটিতে লেপটে পড়ে আছাড়িবিছাড়ি দাবড়াচ্ছে উন্মাদিনী, আগুনে-পুড়তে-নারাজ মানুষেরা বিরক্ত হলেন—'যত্তো ছোটলোকের হল্লা-বাজি বাড়ির ভেতর। এসব চলবেনি, চলবেনি এখেনে। আজ বাদে কাল মে'র বে। বাড়িতে এত বড়ো কাজ। কুটুমরা সব আসবে দশ জায়গা থেকে। নইলে এত মুড়ি কেউ ভাজায় আজকাল! দেখেচিস কোথাও! ডাকে কেউ তোদের! নে ওঠ ওঠ, কাজ কর। বড্ডো রস বেড়েচে তোদের। বলে কাজ কব্বোনি। কব্বিনে ত আগে বললিনে কেনে! দেশগাঁয়ে নোকের অভাব...দানা ছড়ালে শালা নওরখ্যানার চেল্লামেল্লি লেগে যায় ঘরের দোরে...'

অগত্যা শৈলবালা, যেহেতু চতুষ্পদ নয়, খাড়া পায়ে উঠে দাঁড়াল আবার এবং অবোলা কেষ্টর জীব তার সোনামণি যেমন, সে নিজেও পরের দোরে বন্দীদশায় টলতে টলতে এগোল সেই আগুনের দিকে, যেখানে চিতার মাচানে

ধাউ ধাউ নিঃশেষে পুড়ে যাচ্ছে খরায় খরার রস নিংড়োন চেলাকাঠ এবং মাটির খোলায় তাতানো বালি যখন উত্তাপে উত্তাপে আরও বেশি লাল, এতদূর থেকেও চোখ ঝাঁঝাচ্ছে, নতুন করে চাল ঢালল খোলায়। কুঁচিকাঠি ধরল হাতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া পড়েনি এখনও। গাছপালা ঘরবাড়ি দমে রোদের ঝালর। শৈলবালার চোখ জ্বলে। বুক জ্বলে। পেটের ভিতর অসম্ভব খিঁচুনি।

শৈলবালা অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে।

এবং অনুনিতে বুকের মধ্যে খাই খায়ে সোনা। সোনা, সোনামণি, সোনা···সোনার বাচ্চাগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে খেলে বেড়ায় বুকের উঠোনে। শৈলবালা হাঁপায়! পিণ্ডি পড়ুক পেটে, খাও আর না-খাও, রাত পোহালেই তিনটে কড়কড়ে দশ-টাকার নোট গুনে গুনে তুলে দিতে হবে ওই শাকচুন্নি ভাতারখেকো সখার-মার হাতে। নইলে তার পুষ্যি সোনা বেহাত। ডাইনি মাগী। তার সোহাগের ঝিঙেসই।

আপাতত এখন, শৈলবালার আলাদা কোনো চোখের জল নেই। মাটির খুলিতে চালভাজা শেষ। খোলার বালিতে কুঁচিকাঠি নাড়তে নাড়তে দগদগে তাতানো বালি আর আগুনের ঝলকায় টনটন করছে চোখ। কপালের সোনা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে। সর্ব অঙ্গে জ্বালা।

পাশাপাশি লাগোয়া ঘর। বিপদে আপদে পড়শীরা দেখবে দশজনে, ডাকখোঁজ নেবে যে-যেমন পারে—এই তো নিয়ম। ছুতোর-বৌ এবার পোয়াতি হতেই, পাঁচ মাসের মাথায় গাঁয়ের বামুন ডাক্তার যখন বললেন—'শ'রের হাসপাতাল নে যা, মোটেই রক্ত নেই শরীলে···' দিশেহারা শৈলবালা এক শ' টাকা কর্জ নিয়েছিল ঠিকই। সখার-মা গাঁয়ের অনেক মানুষকেই দুঃখেদুদ্দিনে যেমন ধার দেয় তাকেই বা না দেবে কেন! লেখাপড়ার টিপসই নেই, সোনাদানা থালাবাটির বন্ধকি নেই, শুধু মুখের বাক্যি—টাকায় দশ পয়সায় সুদ মাসে মাসে। পেটে দানা না জোটে তো দশটাকার একটা আস্ত নোট দিতেই হবে ফি মাসে। এক কালের সই বলে তো আর মাগনা হয় না এসব। গতর খাটানো পয়সা। গোড়ার দিকে কটা মাস কথা রেখেছিল শৈলবালা। ঘরের মাগীমদ্দা সমর্থ মানুষ চারজন, এমন কি, কচি বাচ্চাগুলি অবধি, যে-যেমন-পারে ছুটো পয়সার ধান্দায় চরকির মতো পাক খেয়ে মরছে। সোনা, সোনামণি···সোনাই ভরসা। গরিবের

ঘরে অনেকটা জোর। সোনার তিনটে বাচ্চা। সোনার দুধ সোনার বরণ। গাইগরুর দুধের চেয়েও বেশি। সোনার দুধেই সুদের টাকা

সেই সোনা এখন মহাজনী খপ্পরে

মহাজন না বাঘা। নাথি মারি অমন মহাজনের কপালে। আসলে একটা রাগ, টানটান রাগে পা থেকে মাথা অবদি শিরায় শিরায় যন্তরনার জ্বালা, সেই যন্তরনায় কুঁচিকাঠি নাড়তে নাড়তে আচমকা মাথাভাঙা খোলার কানায় ডানহাতের তিনটে আঙুলের পিঠে ছ্যাঁকা লাগতেই, শুধু ছ্যাঁকা নয়, কেটে গিয়ে রক্তও বেরোল খানিকটা, শৈলবালা আঙুলগুলি চুষতে লাগল এবং যেহেতু থমকে দাঁড়ালে চলবে না তাকে, ভেজা চালগুলি উজোনই আছে, খোলায় ফেলে ভেজে দেওয়া শুধু, দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। কাজ সেরে এক্ষুনি ঘরে ছুটতে হবে। হারামি বুড়ির সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া। এত বড়ো সাহস মাগীর। অমন দুধেল পুষ্যি কেড়ে নেয়! চাঁদি ফাটানো রোদ্দুরে যখন কাকপক্ষীর শব্দ নেই, অথবা একটা দুটো কাক ডেকে উঠলেই যখন খাঁ-খাঁ করে ওঠে দুপুরটা, নিঝুম শান্ত গাঁয়ের বাতাসে শৈলবালা যেন তার সোনামণির ডাক শুনতে পেল। পরের দোরে বাঁধা। ছোট ছোট চারটে পা পিছনের দিকে টেনে, গলায় ফাঁসে, যন্তরনায় গোঁজের দড়িটা ছিঁড়তে চেয়ে, ছিঁড়তে না পেরে ডাক-ছাড়া চিৎকার। বশ মানাতে চাইছে বুড়ি। মারছে। এবং তখনই বিষহরির লকলকে ফণাটা চাগিয়ে উঠল রক্তে। টগবগে রক্তটা ঝাঁ করে গিয়ে ঠেলা মারল মগজে। হাড়চোষা বুড়িকে চিবিয়ে খাবার একটা রোখ্। পাগলের মতো নাকে মুখে নিঃশ্বাস না-ফেলে ডাবুড়ে ডাবুড়ে খোলায় ভাজা চাল ফেলে শৈলবালা। পলকে, গরম বালিতে যন্তরনায় ফুলে ফেঁপে মুড়ি হয়ে ওঠে চালগুলি। বাবুদের জলখাবার।

কাজটা যতো ফুরিয়ে আসছে, খাই-খাই পেটের জ্বলুনিটা চাগিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। অস্থির লাগছে শরীর। শেষ খিত্তির উজোনো চালটা টেনে নেবার আগে, কি মনে হলো, শৈলবালা তাকাল এপাশ ওপাশ। এই সময়েই নাতনীটার একবার আসার কথা ছিল। গালমন্দ মার খেয়ে মেয়েটা পালায়নি ভাগ্যিস! ঠায় বসে আছে। ঝাঁঝাঁ দুপুরে বাবুদেরও কেউ জেগে বসে নেই। নাগাড়ে কিষেন গোপাল বাউরিও পড়ে পড়ে নাক ডাকছে ওদিকে মেটে ঘরের দাওয়ায়। সাহস বাড়ল। বাবুদের বাড়ি মেয়ের বিয়ে। কুটুমরা আসবে। যজ্ঞিবাড়ির কাজে দুচারদশ পালি মুড়ি…ভাবতে

ভাবতেই নিঃশব্দে অনেকখানি, শালির কোন হিসেব নেই, কাক বা চতুর বেড়ালের মতো ভাবে বাঁয়ে সামনে পিছনে সতর্ক চোখ রেখে হাতে হাতে মুঠোর মুঠোয় তুলে, বেঁধে নেবার জন্য যে গামছাটা সে সঙ্গেই এনেছিল, দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, যেখানে তৈরিই ছিল পুঁটলি, ছুটল ঘরের দিকে।

ভালোয় ভালোয় কাজটা হাসিল হয়ে যেতেই শৈলবালা নিশ্চিন্তে ফিরল আগুনের মুখোমুখি। বেলা গড়িয়ে নামছে। বিকেলের তেরচা রোদ্দুর। কাজের শেষটুকু দুহাতে গুটিয়ে তুলতে আর যেন তর সইছে না। দিবা-নিদ্রার পর গোটা গ্রাম একটু একটু করে আবার সরব হয়ে ওঠার মুহূর্তে ঝিম-ধরা গাছগুলির পাতায় পাতায় যখন বাতাসটা ফুরফুরে হয়ে উঠছে, সে তার সোনামণির জন্য আরও বেশি আকুল হলো। খোঁয়ার পাগোল নয়, ডাইনির হাত থেকে ছাড়াতেই হবে তার সোনামণিকে।

সুতরাং বাবুদের ধানে কাজের-বুঝ বুঝিয়ে দিয়ে টাকা কটা আঁচলে বেঁধে বেরিয়ে আসার পর মুক্তির স্বাদে কেমন মুষড়ে পড়ল শৈলবালা। গাঁয়ের রাস্তায় খুঁট-উপড়োন গাইবলদের মতোই ছুটতে ছুটতে মনে হতে লাগল—বড়ো একা। অবলা মেয়েমানুষ সে। ভুতোটা তার বাপের মতো, বড্ডো নরম নরম। মুরুব্বি-মাতব্বর, দশজন পড়শী বা পঞ্চায়েতের সভা কাউকে বোঝাতে পারবে না—এটা ডাকাতি। তিন মাসের সুদ শুধতে পারেনি বলে ঘরে এসে দশকথা শুনিয়ে গেছে বুড়ি। সে না-হয় হলো, কিন্তু দিনদুপুরে ঘরের পুষ্যিকে না বলে-কয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া! এ কেমনধারা কথা!

উঠোনে পা দিয়েই ধক করে উঠল বুকটা। হঠাৎ বেহুঁস। যেটেশ্বরের দাওয়ার কোণে, যেখানে বাঁধা থাকত সোনামণি, বাঁশের খুঁটিটা ফাঁকা। শুধু নিকোন দাওয়ায় ছড়ানো-ছিটোন গুটি গুটি কিছু নাদি। বুকের হাহাকারে ডুকরে উঠল কান্না এবং সেসঙ্গে শাপাশাপির চিৎকার—মরুক মাগী, মরুক-মরুক। উলউঠা হোক, মায়ের-দয়া হোক। যি হাতে আমার সুনির অঙ্গ ধইরেচে মাগী সি হাত খইসে পড়ুক, কুষ্ঠ হোক, গলায় অজ্ঞ ছুইলে মরুক...'

টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে বাঁশের খুঁটিটা আঁকড়ে ধরল শৈলবালা এবং কান্নায়, শাপান্তিতে গলাটা আরও চড়ায় উঠল। শুনুক দশজনে, আসুক সবাই। বিচার হোক, বিহিত হোক এর।

কিন্তু কেউ এলো না। নিয়মটাই এই। যেখানে টাকার জোর সেখানেই দশজনের রা। এমন কি, ঘরের মানুষও এগিয়ে আসবে না কেউ। কদিন ধরে বুড়োর গায়ে ছ্যাক ছ্যাক জর। খরার মাস। জল-ঝড় নেই ক-মাস। কাজকাম নেই ঘরের মরদদের। গায়ের জর নিয়েই বুড়ো গেছে কাজ খুঁজতে, যদি বাবুদের বাড়ি কোথাও একটু-আধটু ঘরামির কাজ জোটে, যদি পয়সা আসে দুটো। বড়ো ছেলে ভুতো সাতসকালেই বেরিয়ে গেছে সরকারের টাকায় মাটি কোপাতে। চাতরার খালধারে কোথায়। টাকা পাবে গম পাবে। আরেক ছেলে ন্যাদা গেছে ভুতোর-বৌ উষার সঙ্গে হাওড়ার পুলে আনাজ বেচতে। সবাই মিলে হন্যি হচ্ছে টাকা-টাকা করে। মিলেমিশে ধীরেসুস্থে বসে সোহাগের কথা কইবে দুটো, সময় নেই কারও। মানুষগুলি মানুষ নেই আর।

বাঁশের খুঁটি ছেড়ে শৈলবালা সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং জমাট নিঃশ্বাসটা ভিতর থেকে টেনে তুলতেই বুকের মধ্যে ঘাই মারল যন্তরনাটা। পেটে পিত্তি পড়লে এমনটা হয়। তেতো-তেতো একটা ঢেকুর উগড়ে ওঠে গলায়। বিস্বাদ লাগে। থুতুর দলায় দাঁতগলাজিভটাগরা সব মিলিয়ে বিস্বাদ। তখনই মাথাটা ঘুরতে শুরু করে। জগৎবম্মাণ্ড সব আঁধার। যদি দুটো ভাত পাওয়া যেত কোথাও। একগাল মুড়ি।

ঘরে গরম কিছু মুড়ি আছে আজ। কিন্তু শৈলবালা সে কথা ভাবল না। উঠোনের উনুনে শুকনো পাতা এনে জড়ো করেছে পুষ্প। মেটে হাঁড়িটা চড়বে। রান্নাটা একবেলাই। বিকেল-বিকেল। ঘরে ফিরে সাঁঝে-সাঁঝেই খাবে। একগাল দুগাল পান্তা থাকবে। ছেলেপুলেরা খাবে সকালবেলা। শরীরটা টেনে, এক-পা-খোঁড়া মানুষ যেমন করে হাঁটে, দাওয়া ধরে, খুঁটি ধরে গড়াতে গড়াতে শৈলবালা তার আঁধার-ঘরে ঢুকল।

ছেলেপুলের হাত-যায়-না এমন উঁচু কুলুঙ্গিতে জং ধরা টিনের কৌটো। পোড়াকপালে খুশি হবার মতো এমন কিছু নয় জেনেও অবশ দেহে কৌটোটা টেনে নিয়ে লেপটে বসল এবং আরও একবার গুনে দেখতে চাইল—রাক্কুসি মাগীর খাই মেটাতে আরও কতো বাকি! সিকি আধুলি দশ-পয়সা পাঁচ-পয়সার খুচরো এবং এক টাকার নোটও গোটাকতক…নাকেমুখে দম আটকে গুনতে গুনতে হিসেবটা যখন ফুরিয়ে এল—মাত্তর বারো টাকা তিন কুড়ি পাঁচ পয়সা, আটকে-রাখা নিঃশ্বাসটা ঠেলে উঠল ভিতর থেকে—হা ভগমান,

সুনিকে ছাইড়বেনি উরা, জোর কইরে ছিইস্তে আইনব খ্যামতা নেই। ভুতো ক্যাদা ভুতোর-বাপ মরদই নয়। বড্ডো ঠাণ্ডা মানুষ…

টিউবকলের জল তুলতে গিয়েছিল পুষ্প। কাঁখের কলসী নিয়ে দাওয়ায় উঠে বলল—'দাদু কেনে উ বাড়ি গেল গ ঠাম্মা…'

আঁচলে টাকাগুলি বাঁধতে বাঁধতে চমকে উঠল শৈলবালা—'ফিরেচে তুর দাদু? গেল কুথাকে বুড়ো?'

'উ বাড়ি। সখাখুড়োর ঘর…'

পলকে, খেটালি সাপের মতো ভড়তড়িয়ে মাথায় চড়ল রক্ত—'কেনে! উ বাড়ি কেনে যাবে বুড়ো! মড়াখেকো খান্‌কি মাগীর ঘর…'

শৈলবালার দামাল নেত্য। লাফ মেরে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ভাবা-চ্যাকা মেয়েটা নাগালের বাইরে পিছিয়ে গিয়ে তাকিয়ে রইল ভয়ে।

'শত্তুর, শত্তুর সব। বলি, বুড়ো কেনে যাবে উ বাড়ি! লাজ লেই লজ্জা লেই। চোকের কি মাথা খেয়চে! এত্ত বড় সব্বোনাশটা কলল মাগী…'

পুষ্প, জলে জলে চোখ ভাসিয়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে ছিল। চোখ মুছল আঁচলে—'সুনির জন্যি মনডা বুঝ মানে না গ ঠাম্মা। উর জন্যি…'

'আ ল আবাগী, বুড়োর জন্যি ফুট কাইটতে নেগেচিস! মনের বুঝ! লয়…' শৈলবালা ভয়ঙ্করী। ছুটে এসে হামলে পড়ল মেয়েটার উপর। চুলের মুঠি ধরল—'তাই বইলে উ বেবুশ্যা মাগীর ঘরে কেনে যাবি তুরা। কেনে যাবি!'

শিথিল অবশ হাতে মারের পর মার। যেন ধানের-আঁটি ঠেঙায় ফেলে লাঠির পিটুনিতে ধান-ঝাড়া।

মেয়েটা নিঃশব্দে মার খেলো।

কেন না, শৈলবালা উন্মাদিনী—'গতর খাইটো মচ্চি তুদের জন্য আর তুরা এখেনে রগড় মাইরতে নেগেচিস হারামজাদী। মর মর তুরা মর, মইলে হাড় জুড়োয় আমার…'

শব্দগুলির উচ্চারণে অতর্কিতে অথবা শব্দের শ্রবণে, খিদের তেষ্টায় দিশেহারা শৈলবালা, যেন এক পিশাচী ক্রোধের দাহে জ্বলতে জ্বলতে, কিলচড় লাথিতে মেয়েটাকে কুঁজো করে যখন নিজেই হতবাক এবং বেহুঁস, দাওয়া থেকে নেমে টলতে টলতে, দেহভারশূন্য বায়ুভুক প্রেতিনীরা যেমন, ছোট উঠোনে পাক খেয়ে খেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে কপাল ঠুকল শক্ত মাটিতে, ডাকাল শূন্যতায়—' ই আমি কী কল্লম গ ঠাকুর! ই আমি কী কল্লম! হা

ভগমান···সেঁয়ের বাড়ি অইলদানি ঘরে, মেইটার এলাচুল বাইরে টাইনলাম। সুদের টাকা খাবে অকচোখা হারামি মাগী আর শাপাস্তি গাইলবে আমার ঘরে। ই তুমার কেমনধারা বিধেন গ ভগমান। কেমনধারা বেচার···'

ভাখ-ভাখ করে বেলা পড়ে আসছে। পাটে বসেছেন সুয্যিঠাকুর, আঁধারের রঙ লাগছে আকাশে, গাছে গাছে পাখিদের চিল্লানি। সামন্তদের ঘরের সামনে বাচ্চাদের খেলার কলরবে গোটা গাঁয়ে যখন মানুষের হুঁশ্ শোনার মানুষ নেই, ঘরদোর ফেলে বেরিয়ে এলো শৈলবালা। পঞ্চায়েতের রাস্তায়। নিশার ডাকে বেহুঁস মেয়েমানুষ যেমন, খিদেতেষ্টা গা-গতরের ব্যথা, যেমো গায়ের জলুনি সব উবে গিয়ে এখন শুধু, মাঠ-আকাশ জুড়ে একটি সবৎস ছাগল, ছাগলের ছবি এবং ছাগল বলেই ঘরে থাকবে সুনি আর ওর বাচ্চাগুলোর দুটো মদ্দা বলেই, দুদিন বাদে বিকিয়ে যাবে কষাই-এর কাছে। সুনি কেন কষাই-এর হাতে পড়ল গ ভগমান···

রাস্তার ধারে বাবলাতলায় পেচ্ছাব সেরে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে নারান্ পাত্তর।

বলল—'কী গ ভুতুর-মা, বলি যাচ্চো কুথা হনহইন্নে···'

শৈলবালা তাকাল না। ঘেন্না, ঘেন্না বেথাক মানুষকে।

'পশশির ভালমন্দ দুটো কতা শুইনতে হয় গ, শুইনতে হয়···' খুক খুক কাশি। বুকের পাঁজরায় হাত বুলোয় নারান—'অত দেমাক ভাল লয় গ, ভাল লয়। বেপদে-আপদে সি ত পশশিরাই দেইখবে দশজনে···'

'সি বইলবেন নি। জেবন ভর তো দেইখলম আপুনেদের···ফুঁসে দাঁড়াল শৈলবালা। মনসা মায়ের ছোবলানি—'অবোলা কেষ্টর জীব। কেইড়ে নে গেল ঘরে। সি ত দেইখলেন দশজনে! বইললেন কিছু···'

'কী বইলব! আরে, বইলবটা কি। টাকা নিলে হাত পেইতো। এখন আসল দিবে নি, সুদ ছোঁয়াবে নি তো সখার-মার চইলবে কেমন কইরে! উ শুইনবে কেনে। পেটের টানটা তো তুমার একার লয় বাপু···

যুৎসই জবাব নেই শৈলবালার। গরম বালিতে খৈ-মুড়ি ফোটার মতো রক্তে রক্তে রাগ। ঝাঁটা মার, মার ঝাঁটা মুকে···বানটা মেরে সে নিজেই এবার ছুটল। ফয়সলা চাই। পঞ্চায়েতের রাস্তা থেকে বাঁয়ে নেমে, যুধিষ্ঠির ছুতোরের ঘরের পাশ কেটে একেবারে শম্ভুরের ঘর।

ওদের বাড়ির উঠোনে তখন অনেক মানুষ। এক পলকে, যেন পঞ্চায়েতের

শতা। টালটামাল অবস্থায় ঢুকে পড়েই শৈলবালা যেমন হোঁচট খেল, সচকিত মানুষগুলি চমকে ওঠে বোবা বনে গেল হঠাৎ। রা নেই কারও মুখে। আবছা আঁধারে ওদের বড়ো ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা সোনামণি। চার-পা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কেষ্টর জীব। গাঁটে গাঁটে কাঁপুনি দিয়ে সিঁধিয়ে আসছে শরীর। চোখ বোজে শৈলবালা। আরেক প্রান্তে দেয়ালে পিঠ ঠেলে ঝিম মেরে আছে ভুতোর বাপ। মুখোমুখি সখারাম এবং কাছেই উঠোনে দাঁড়িয় দুঃখীরাম। ডাকাবুকো ষণ্ডামার্কা দুই জোয়ানমরদ। যেন এক লহমায় খোলতাই বনে গেল সব—শুধু টানায় জোর নয়, শহর থেকে ছেলেরা ঘরে এসেছে বলে গায়ে রস জমেছে মাগীর। তাই এত সাহস।

'ই কেমনধারা বেচার গ আপুনেদের! কেমনধারা কতা...' শৈলবালা কথাগুলি বলল। বলেই হাঁপাতে লাগল। পেটের খিঁচুনিতে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ওদিকের আড়ালে ছিল সখার-মা। মনসার ছোবলানিতে ভয় পাবার নয়। চণ্ডীর তেজ—'কুন বেচারটা খারাপি হল শুনি! কুন কথাটা...'

'ট্যাকা খেইচি, সি তো মাইনচি গ। মিছে কতা বইল্লে ধম্মে সইবে কেনে! কিন্তুক...' হাঁপাতে হাঁপাতে মেটেঘরের ভাঙা দেয়ালটা খাবলে ধরল শৈলবালা। কান্না—'গরিবমানষের ঘর। সুদের ট্যাকা বাকি পলল বইলে ঘরের পুষ্যি নে আইসবে চুরি কইরে। বলুন না গ, বলুন না কেনে আপুনেরা দশজনে...'

চৈত্তিরমাসের গুমোট গাছপালাগুলি যেমন, পাতাগুলি নড়ছে না কোথাও। দশজনে স্থির।

শুধু ভুতোর-বাপ, নিজের অপদার্থতায় নিশ্চল বুড়ো তেলচিটচিটে ছেঁড়া গামছাটা উদোম বুকে ঘসতে ঘসতে নেমে এলো নিচে। এই-ই তো সে দেখে আসছে জীবনভর, ডালাপালায় নিজের থেকে কাঁপন না লাগলে গরিবমানুষের সাধ্যি নেই ঝড় তোলে, মেঘ বানায় আকাশে।

'ই তুমি কি বলচ গ কাকী...' সখারাম এগিয়ে এলো—'গাণ্ডাগণ্ডার ট্যাকা দিবে সি তো এতগুলান পেট চইলবে কি কইরে...'

'সুদের ট্যাকার অবস্থা! তুর মা মোরাজন...'

'সিইটে তো হল গে কতা। সি কতাই তো হচ্ছেল গ। বলচেলম সব্বাইকে...' পেন্টলুন পরা টেরিবাগানো সখারাম উঠোনের মাঝখানে।

ডাকাবুকো চেহারা—' সি সুখের দিন আর লেই গ। ক্যাকটুরি লকআউট গ। লক-আউট বোঝ?'

'আমি বাবা মুখ্যু মে'মানুষ। অত ইংজিরিমিজিরি বুইঝব কেনে।'

'সি তো হল মুশকিল। কিছু জাইনবেনি, বইয়ে বুইঝবেনি, ত্যাড়াত্যাড়া কতা কইবে হাজারটা। এও বড় ক্যাকটুরি, এত্ত লোকজন। হলে হবে কি গ, কম্প্যানি শালা এক লম্বরি হারামি। আমাদের সব্বাই তো পাম্মুনিস্ট লয় গ। শত্খানেক লোক ঠিকেয় কাজ করে। ই মাসে কাজ আচে ত উ মাসে লেই। য়ুনেন বাবুরা বইললেন বেবাক লোককে পাম্মুনিস্ট কত্তি হবে। কে শোনে কতা। খ্যাচাখেঁচি চইলল ক-মাস। শেষে য়ুনেন থিকে ধম্মোঘটের কতা হল তো কম্প্যানি বাকোৎ লকআউট বুইল্যো দেল গেটে…এখন বোঝ, মাইনে লেই, রোজগারপাতি কিচ্ছু নেই…'

'বলিস কি র‍্যা সখা; অ্যাঁ…' কালাচাঁদ সামন্ত ছিল উঠোনে। বলল—'তা তুদের শত্খানেক মানষের জন্যি মালিকের কাজকারবার বন্দো, তুদের বেবাক মানষের মাইনে লেই…'

'সি তো হবেই গ কালুদা। এক সনে আচি আমার পেট ভইরবে, তুমার ভইরবে না, সি তো হয় না গ। তুমার সুখটা তুমার দুঃখু আমায় দেইখতে হবে লাই…'

শৈলবালা শিহরণে কাঁপে। চোখ বুজে আসছে তার। সোনামণির বাচ্চাগুলি মানুষজন ভিড নতুন মনিবমানে নি। ছুটো এসেছে কোত্থেকে। পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি, পায়ের পাতায় গা ঘসছে ওরা। কাদামাটির গন্ধ যেমন, শৈলবালা ওদের গায়ের গন্ধ পেল। নিচু হয়ে ওদের গায়ে হাত বুলোবার অথবা দু-হাতে তুলে নিয়ে দুটোকে বা একই সঙ্গে তিনজনকে বুকে জড়াবার সাধ নেই আপাতত।

ইন্দ্রলের ভাই বাতাপির মতো, সেই কোনকালে যাত্রার পালা শুনেছিল শৈলবালা, মনে পড়ল, ওদিক থেকে উঠে এসেছে দুঃখীরাম—'কারখানায় তালা পলল, ইদিকে দেশগাঁয়ে তো কাজকাম লেই। বৌ-বাচ্চা নে কি পেট শুকোব ঘরে বইস্যে…'

পায়ের পাতায় গা ঘসছে, খেলছে ওরা। তিনটে ছাগলছানা। দাঁত চেপে, ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে একটু যেন খুশির আমেজ পেল শৈলবালা—

বেশ হয়েচে, খু-উ-উ-ব ভাল। উদ্রের জবাব দিয়েচে শ'রের বাবুরা। খাছারা বুঝুক এবার

'কারখ্যানা খুইলবে। বকেয়া পয়সাকড়ি না-হয় পাব একদিন। কিন্তুক...'

শৈলবালা নিঃশব্দে কেঁপে উঠল।

'কিন্তুক ইকটা দিন চইলবে কেমন কইরে...'

শৈলবালা নিচু হলো। ছানাগুলোকে আদরের সাধ জাগে।

'জোতজমির সাধ ছেল, গাই-গরু কিনব এট্টা। ট্যাকা পাঠালম মাকে। ভাবলম, ই-ট্যাকায় যা-হোক, চইলবে কটা দিন। যা-বাব্বা, কুথা ট্যাকা! বুড়ি তো ঘরে ঘরে জনে জনে সি ট্যাকা সুদে খাটাতি লেগে গেচে...'

'নজর, নজর লেগেচে গ...' হাটের মধ্যে সখার-মা ফেটে পড়ল এবার—'পরের ভালটা দেইখতে পারে নিকি কেউ। চোখ টাটায়। নিজেদের ছেইল্যেবা নুলো তো সব। হাতড়ি ধইরবে কি, নাঙলের টিপনি দিতে পারে না নুলোগুলান। দশজনেব নজর লেইগেই না ই বেপদ আমার ঘরে...'

তারিণী কুঁতি হঠাৎ ক্ষেপে গেল—'ই তুমার কেমনধারা কতা গ সখার-মা। তুমার ঘরের বেবাদ সি তুমি বোঝ। তাই বইলে পাড়াপশশীদের তুইষবে কেনে সেঁঝের বেলা...'

'তা আপুনি কেনে ফোঁস কএে লেগেচেন, বলুন দিদি। আপুনেকে ত বলা হয় নি গ। সি কতাস আচে না—সভার মাঝে পলল কথা, সি বোঝে যার আচে বেথা...যাকে বইলেচি সি ঠিক বুয়েচে গ। ঠায় দাঁইড়ে আচে দেখুন না। বইলবে কি। কতা আচে নিকি উব...'

সমবেত চোখগুলি, যেন সখার মার অনুসরণেই শৈলবালার দিকে ছুটল, যেখানে শৈলবালা চোখের জলে অথবা পিত্তিশোধের ভাবনায় দাঁত চেপে আঁচলের টাকাগুলি খুলচে—'আমার ই কটা ট্যাকা আচে বাপ্। ট্যাকা কটা রেইখ্যে আমার সুনিকে ছেইড়ে দে তুরা...'

কী বলতে, ঝাঁঝিয়ে তেড়ে এসেছিল সখার-মা, সখারাম ঝামটা মারল এবং বুড়ি পিছিয়ে যাবার পর হাত বাড়াল সামনের দিকে—'ই কটা ট্যাকায় হবেটা কি গ কাকী। এতগুলান পেট...'

ইল্বলের চেয়ে বাতাপির দাপট বেশি—'সুদক্ষুদ লয় গ। আসলি ছাড় দিদি! কারখ্যানার গেট না-খোলা তক চায়ের দোকান খুইলব ইস্টিশানে...'

গাঁ বেয়ে দিনের আলো গড়িয়ে গেছে কখন। আঁধার দেখল শৈলবালা। তাকাল পাশের বোবা মানুষটার দিকে। নরম মানুষ ভুতোর বাপ্, যেন তারই অপরাধ সব, পায়ে পায়ে সরে গেল। এবং পড়শীদের কারও মুখেই যখন রা নেই, বেচার নেই ধম্মো নেই সংসারে, পায়ের পাতায় আদুরে শিরশিরানিতে বেসামাল শৈলবালা হাঁটু ভেঙে কোমর ভেঙে টানটান হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে ওদের দুজনকে বেছে বেছে তুলে নিল দু হাতে। আরেকটা পড়ে রইল, ওদের মায়ের বাঁটের বাইরে যেমন থাকে এবং তার দু-কুড়ি-দশ বয়সের শরীরটায়, মজা বুকের মাংসের দলায় ওদের আঁকড়ে ধরে, ভ্যাপসা গন্ধে লোমের স্পর্শে নখের আঁচড়ে খিদেয় তেষ্টায় যন্তরনায় সব ভুলে ঝাপসা চোখে তাকাল আকাশের দিকে। তারা ফুটছে আকাশে। তেজী বলদের শিং-এর মতো প্রতিপদের চাঁদ। চোখের জলে তখনই ভাবনাটা দানা বাঁধে—তিনটের মধ্যে দুটো মদ্দা বাচ্চা সুনির। এখনও শিশু। দুদিন বাদে নধর হবে। হাড়মাস চর্বিতে ফুলেফেঁপে নধর। যদি এখনই আগাম কথা দেওয়া যায় হাটতলার জগাইকে। সাটিপুরের নিত্যিবাজারে মাংস বেচে জগাই।

দূরে শাঁখ বাজল কোথায়। একহাত ঘোমটা টেনে এঘর থেকে ওঘরে সন্ধে বাতি নিয়ে যাচ্ছে সখার-বৌ। দূরের দাওয়ায় সোনামণির কাছাকাছি লম্ফটা জ্বলছে। সর্বঅঙ্গ কাঁপিয়ে ঝড় উঠলে যেমন, পোয়াতী-বৌ যেমন করে কথা বলে ধাইমার সঙ্গে, দু-কুড়ি-দশ বছরের শুকনো শরীরটায় যেন নতুন করে সেই যন্তরনা—'আমার সুনিকে তুরা ছেইড়ে দে সখা, মাইরি বলচি, মায়ের দিব্যি, সব ট্যাকা শুধ দুবো তুদের...'

'ছাড়ান দে উর কতায়। অ-অ...' ওদিক থেকে আবার ঝাঁঝালো সখার-মা—'শাকচচ্চড়িও তো জোটে না পেটে। বলি, অত ট্যাকা মাগী পাবে কুথা...'

'খুব হয়েচে। আর চিল্লায়ো না ত তুমি...' সখারাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দাবড়ানি দিল মাকে—'এতগুলান ট্যাকা ত এখেনে ওখেনে দে নষ্ট কইরেচ নিজেই। আবার দাঁত কাইড়াতে নেগেচ এখন...'

সখা এগিয়ে এল কাছে—'বইলচ ত বটে কাকী, কিন্তুক দেবে কেমন কইরে...'

'দুবো বাপ্...'

'আরে দিতে ত হবেই গ। উ ট্যাকা না-হলে যে আমারও চইলবেনি...

'দুবো...' জেদে আর তেজে কাঠ-কাঠ শৈলবালার গলা—'সুনিকে ছেইড়ে দে বাপ্। উকে দেইখব শুইনব খাওয়াব আমি, দুবেলা দুধ দুইবি তুয়া। দুধের ট্যাকায় সুদের হিসেব হবে, আসলের ট্যাকাও উঠে আইসবে অনেকটা...'

'আর বাকিটা...'

'দুবো, সব দুবো...' ডানে বাঁয়ে মজা মাই-এর মাংস আঁচড়ায় দুটো ছাগলছানা। যেন ঘুমের মধ্যে চোখ বুজে কথা বলছে শৈলবালা—'আমার ধম্মো সাক্ষী বাপ্, আমার ভুতুর দিব্যি...'

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে সাঁঝের বেলা। জোনাকি জ্বলছে ঝোপঝাড়ে। আঁধারে গা লেপটে কালো-কালো মানুষগুলি অবাক—'ই কেমনধারা পেস্তাব গ। বলচ কি ভুতুর-মা। বলি, মাথাটাথা ঠিক আছে ত! ছাগী পুইষবে তুমি আর দুধ দুইবে সখা?'

'ইটাই ত নেয়ম গ। ই-ই ত হয় সংসারে...'

'নিদেন গোটা পঞ্চাশেক ট্যাকা যে চাই-ই গ কাকী...' বেথাপ্পা দুঃখীরাম —'এট্টা চায়ের দুকান বসাব ইস্টিশানে...'

'দুবো, দুবো তুদের ট্যাকা। দুটো দিন সবুর কর বাপ্...'

চোখ খুললেই সাটিপুরের নিত্যিবাজারে মানুষজনভিড়তলায় তালপাতার ছাউনি-ঢাকা চালায় ছালচামড়া-পসানো, জলে-ভেজা, তেলতেলে দুটো শরীর ঝুলছে, দুলছে বাঁশের আংটায়। কেষ্টর জীব। রক্ত চুইছে গর্দানায়। নিচে কলাপাতায় কাটামুণ্ডুর চোখজোড়া স্থির। গলায় পিত্তিরসের জ্বালা। তবু চোখ বুজে, তুলতলে নরম শাবকদুটো বুকে চেপে ভয়ঙ্কর দুস্বপ্নের ভাবনায় থরোথরো কেঁপে উঠল না শৈলবালা। হাঁসফাঁসে দম নিল।

এবং অবাক হলো। সাঁঝের আঁধারে ডুবে-থাকা ঘরবাড়ি গাছপালা মানুষজনের কালো কালো ছায়ায় দূরের দাওয়ায় লম্ফটা জ্বলছিল, লালচে আলোয় উপরে উঠে গিয়ে বাঁশের খুঁটি থেকে সোনামণির গোজের দড়ি খুলছে সখা এবং ছাড়া পেতেই, আবোলা জীব এক লহমায় উঠে দাঁড়িয়ে খাড়া পায়ে উঠোনে লাফ, ভয়ডর নেই আঁধারে, মানুষজনে পরোয়া নেই, শৈলবালাকেও চিনল না যেন, চার পায়ে লাফাতে লাফাতে দ্রুত বেরিয়ে গেল বাইরে। এবং সোনামণির ভয়ের ডাকটা দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে, বাইরে ঘুঁটঘুট্টি আঁধার, শৈলবালা দাঁড়িয়ে রইল স্থির। আঁধার রাতে

খানাখন্দে ঝোপেঝাড়ে মুখ থুবড়ে পড়বে না সোনামণি। বাছা ঘরের পথ জানে।

বরং সোনামণির বাচ্চাদুটোকে বুকে আঁকড়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকাল। কাল সকালেই এদের বুকে চেপে, ঠিক এভাবেই সে বামুনপাড়ায় কায়েতপাড়ায় যাবে, ভিন গাঁয়ের বাবুদের ঘরে ঘরে—'মানত আচে নিকি গ মা-ঠাকুরণদের! বাঁজা বৌ-এর বাচ্চা হবে, খালি খালি যে বিয়োন মায়ের ছেইলো হবে, আইবুড়ো মে'র বে হবে, মরোমরো মানুষ জেবন পাবে, মায়ের থানে যদি মানত থাকে কারুর...একেবারে কচি বাচ্চা গ, দুধের বাচ্চা। দানা দে' সোহাগ দে' এত্ত বড়টা কইরেচি...'

বুকের দীর্ঘশ্বাসে টনটন করে চোখজোড়া। বুক ঠেলে উগড়ে-ওঠা চিৎকারটা দাঁতে ঠোঁটে চেপে রাখার যন্তরনায় যখন থরথর কাঁপছে শরীর, শৈলবালা, পুকুরপাড়ে ছেরাদ্দের বৃষকাঠের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন নিঝঝুম, এমন কি দু হাতের আঙুল বুকের মধ্যে পিষে যেতে যেতে সোনামণির বাচ্চাদুটোও যখন কঁকিয়ে উঠে খসে পড়ল হাত থেকে, কোনো হুঁশ নেই, আঁধারে গা লেপটে দাঁড়িয়ে রইল স্থির।

এবং উঠোনের মানুষগুলি অবাক মানল। এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। যেন এক আশ্চয্যি মেয়েমানুষ। চোখের পলক পড়ছে কি-পড়ছে-না বোঝা যাচ্ছে না আঁধারে, নিঃশ্বেসের শব্দ নেই। মানুষগুলি ঘিরে ফেলল চারদিকে—'কী গ, কী হল গ ভুতুর-মা, কত্তা বইলচনি কেনে?'

যেন ওঝামন্তরঝাঁটায় চেতনায় ফিরে আসার পালা। কুমড়োর ফালির মতো প্রতিপদের চাঁদ। আকাশে চোখ রেখে কথা বলল শৈলবালা। যেন অনেককালের রোগভোগের পর সবে পথ্যি করা মুখ—'তুর কারখ্যানার মালিক মুনিব তুদের খেল রা। সখা, তাই বইলো ভুরা আমায় কেনে খাবি বাপ? দানা দে' বুক পেইতো এত্ত বড়টা কইরেচি উদের...'

মানুষগুলি চুপ।

খাতকের কাছে প্রণিপাতে আনত হলো মহাজন। সখারাম ধরল দুহাতে—'কী কব্ব গা কাকী! মাইনে রোজগারপাতি বন্দো, মাগ বাচ্চা নে' বাঁইচতে তো হবে। এত্তগুলান পেট...'

'বাঁইচতে হবে! বাঁইচব...' শব্দগুলি শোনাই গেল না হয়তো, মুখচোখ খিঁচিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে হাড়িকাঠে রক্তজবা দেখল শৈলবালা। তেল-সিঁদুরে লাল সুনির বাচ্চাদুটোর কপাল। ভাঙাচোরা শরীরটা টালটামাল

কেঁপে উঠতেই 'ধর ধর…' সোরগোলে পড়শীরা হাত বাড়াল এবং শৈলবালা, সমবেত হাতের ভেলায় ভেসে উঠল শূন্যে। গ্যাঁজলা উঠছে মুখে। পিত্তির রস। ছুটে লক্ষ নিয়ে এল দুঃখীরামের মেয়ে। ছুটে এল সখার-মা—'ঠাকুর, ঠাকুর, হেই ঠাকুর; ই কী হল! মরেনি ত বা! মইরবে না ত· ᐧা· বড গালমন্দ কইরেচি সাঁঝের বেলা…'

শিয়রের কাছে হামলে পড়েছে সখারাম। মাথাটাই দু হাতে ধরেছে সে—'তুমার পুষ্যি আমি ছেইড়ে দিচি গ কাকী। সুদের ট্যাকাও ছাড়ান। শুধু আসলটা…'

শৈলবালা জানে না, সে শূন্যে ভাসছে তখন। মাটি থেকে উঁচুতে, আকাশমুখী মুখ। রোগা রোগা কালো কালো খ্যাংড়াকাঠির মানুষগুলি তার ভার বইতে ঘামছে, কাতরাচ্ছে, দম নিচ্ছে ঘন ঘন। কেউ বলল—'ব্যামোর শরীল, ডাক্তারবাবুর থানে নে চল…'

কেউ বলল—'ওঝা…'

দশরথ

কার্তিক লাহিড়ী

তোমার নাম কি

আমার নাম হয় দশরথ

দশরথ কি

আমি হই দশরথ

আরে দশরথ কি মানে উপাধি কি

'___'

মানে যেমন অমুক চন্দ্র অমুক তুমি দশরথচন্দ্র কি

'___'

তুমি ঘোষ না শর্মা নাকি দ্বিবেদী না দাস নাকি সিংহ

'___'

উপাধি মনে নাই

আমি না বুঝি আপনার প্রশ্ন

বাড়ি কোথায়

আমি বাস করি ভিতরে যুগেন্দ্র নগর

যোগেন্দ্র নগর ব্রিজের কাছে

আমি বাস করি ভিতরে একটি বাসা ওপার ব্রিজের

এখান থেকে কতদূর হবে

এক মাইল কিংবা তেমন

তুমি কি বাঙালি

'—'

তোমার দেশ কোথায়

'—'

আরে কোথা থেকে এসেছো তুমি

আমি আসিয়াছি হইতে যুগেন্দ্র নগর

তোমার বাবা

আমার বাবা হন মৃত

আহা তিনি কোথা থেকে এসেছেন

তিনি আসিয়াছেন হইতে ভগবান

দূাৎ তেরি, তোমার বাবা কোন মুলুক থেকে এসেছিলেন

'—'

তোমরা এখানকার বাসিন্দা

আমরা বাস করি ভিতরে যুগেন্দ্র নগর

আহা তোমারা কি বাইরে থেকে এসেছো বিহার উড়িষ্যা অন্ধ্র না মহারাষ্ট্র

আমাদের বাড়ি ছিল ভিতরে উড়িষ্যা

উড়িষ্যার কোথায়

কটক না ভদ্রক

'—'

যা বাব্বা বলতে পারছো না বালেশ্বর নাকি

আমি শুনিয়াছি এই নাম সকল

তুমি এখানে জন্মেছো

না

তবে

আমি ছিলাম জন্মে কোথাও

সে জায়গার নাম কি

আমি ভুলিয়া গিয়াছি তাহা

কেন

তাহা আমি পারি না বলিতে

তবু

আমরা ছিলাম না এখানে আমি আসিয়াছি এখানে যখন ছিলাম একটি শিশু বটে

তাই আমার আছে নাই জ্ঞান

জ্ঞান না থাকলে জানলে কি করে এ কথা

বাবা বলিয়াছিলেন কাছে আমার

নাম নিশ্চয় বলেছিলেন

হইতে পারে

তখন তোমার বয়স কত হবে

আমি পারি না বলিতে বোধহয় মত ঐ বালকটির

ওর বয়স তো সাত যথেষ্ট জ্ঞান আছে মনেও করতে পারে সব

'—'

তোমার দেশের কথা বাড়ির কথা বলতে পারো

আমি পারি রেল-ইস্টিশন রেলগাড়ি গাড়ি টানা দিয়ে গরু রাস্তা ধানখেত নদী রাস্তা নদী সাঁতার নদীর পার ধানখেত আল আমগাছ সরু রাস্তা তাল গাছ

ঝোপঝাড়

ধানখেত সবুজ মাঠ রাস্তা বাড়ি

যাঃ ছেলে কি সব বলছো এতো যে কোনও গাঁ হতে পারে আরে তোমার

গ্রামের নাম কি

কে বলিতে পারে তাহা

তুমি বলতে পারো না

না আমি বলিয়াছে ইহা পূর্বে

মিনতি ঠিক ধরেছে আমি বুঝতেই পারি নি যে তোমার বাড়ি এখানে নয়

কে বলিয়াছে

মিনতি মানে আমার স্ত্রী মানে মানে তোমার মাসিমা

আচ্ছা ইহা হয় খুব ভালো

কত দুধ হয় তোমাদের

তিন সের

তিন সের দাও তো অনেক জায়গায়

হাঁ

ক-জায়গায় দুধ দাও

আমি সরবরাহ করি দুধ নয় স্থানে

নাকি তাহলে তো দুধে জল মেশাতে হয়

দুধে জল মেশাও নাকি

আমি

তুমি নয় মালিক

আমি ঢালি না জল ভিতরে দুধের কেন আপনি বলিতেছেন তেমন

আরে রাগ করছো কেন আমি তা বলি নি দুধটা কেমন পাতলা পাতলা ঠেকছে তাই

তাই আপনি বলিলেন আমাকে

মানে গয়লারা দুধে জল মেশায় কিনা

আমি হই না একজন গয়লা

তোমার মালিকের উপাধি তো ঘোষ সকলে তাকে ঘোষমশাই বলে ডাকে

আমি পারি না বলিতে ইহা তিনি হন আমার কর্তা

তুমি জল মেশাও না তা আমি জানি কিন্তু তোমার কর্তা মেশায় কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি

কেমনে পারি আমি তাহা বলিতে কারণ আমি দেখি না তাহাকে মিশাইতে জল সহিত দুধে

রাগ করো না ভাই তোমার বয়স কত হল

তাহা আমি পারি না বলিতে কারণ আমার পিতা মারা গিয়াছেন বহু আগে

আর মা

তিনিও হন না উপস্থিত

তোমার ক' ছেলে ক' মেয়ে

আমার আছে দুই পুত্র তিন কন্যা

বা বেশ তারা কি তোমার সঙ্গে থাকে

তবে

না মানে

তাহারা হয় আমার পুত্র সকল কন্যা সকল

তা বটে তা বটে

যদি তাহারা চায় ছাড়িতে আমাকে তাহারা পারে সহজে যাইতে

না না তা বলছি না মানে তারা তো তোমার কাছে থাকে

হাঁ তাহারা বাস করে সহিত আমার

আচ্ছা তারা বাংলা জানে

যদি আমি জানি কেন তাহারা না জানিবে

তোমার মতই তারা বলতে পারে

কেমনে পারি আমি তাহা বলিতে

না মানে তাদের জন্ম কি এখানেই হয়েছে

তারপর কোথায়

তা তো বটে

আমি বাস করি এখানে আমার স্ত্রীও বাস করে এখানে

নিশ্চয় নিশ্চয়

তাহা হইলে সন্তান হইবে ভিতরে স্বর্গ

আহা তাই কি বলছি আমি তুমি খামকা চটে যাচ্ছো অনেক সময় হয় কি জানো চিঠিতে সন্তান হয় কিনা তাই বলছিলাম তোমাকে

কি করিতেছেন আপনি মানে

মানে মানে তোমার ছেলে মেয়েরা ভালো আছে তো

হাঁ তাহারা হয় খুব ভালো

বা বেস তা বড় ছেলেটি করে কি

স টানে লাঙ্গল কর্ত্রর

আচ্ছা তোমার কর্তা

হাঁ

আর ছোটটি

সে খেলে ভিতরে মাঠে

পড়ে না

হাঁ

তাহা আমি পারি না বলিতে সে লেখে উপরে সেলেট

ইংরেজি বাংলা না হিন্দি

'—'

নিজের ভাষা মানে মাতৃভাষা জানে তোমার ছেলে মেয়েরা

তাহা হইলে কি ভাষা

মানে যে ভাষায় তোমার বাবা কথা বলতেন তুমি যে ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলতে

তুমি ওদের সঙ্গে কোন ভাষায় কথা বল
এই ভাষা যাহা আমি বলিতেছি কাছে আপনার
আর তোমার পরিবারের সঙ্গে
কি
না এই জিজ্ঞেস করছি আর কি
কি হয় আপনার প্রশ্নগুলি
না না বলছি তোমরা কি আমাদের মত খাও
তাহা হইলে মত কাহার মত পশুর
তা বলছি না ভাত ডাল খাও তো
যদি আমি পারি জোগাড় করিতে ভাত নুন
মাছ মাংস খাও কি

মেয়েদের বিয়ে দিয়েছ
তাহারা হয় খুব ছোট
আচ্ছা কোথায় বিয়ে দেবে ভেবেছো
কেন এইখানে
পাত্র পাবে তো
কি আপনি বলিতেছেন
তোমাদের জাত ভাই পাবে তো
কি
না মানে তোমার ছেলে মেয়েরা দেশে যেতে চায় না
কোথায়
দেশে
তাহারা বাস করিতেছে ভিতরে দেশের
না না সে কথা নয় তোমার দেশ যেখানে তার কথা বলছি
তারপর
তারা সেখানে যেতে চায় নাকি
কেন তাহারা যাইবে ইহা হয় তাহাদের জন্মস্থান

জন্মস্থান হলেও তো তোমাদের আসল বাড়ি এখানে নয় উড়িষ্যায়

'—'

তাই জিজ্ঞেস করছিলাম ওরা দেশে যেতে চায় কিনা

তাহারা আছে ভিতরে দেশের

আরে তোমাদের আদি বাড়ির কথা বলছি

এখানে হয় তাহাদের বাড়ি

নাকি

আমি বানাইয়াছি একটি ঘর তাহারা বাস করে সেখানে

আচ্ছা তাই বল

বাড়িটা তৈরি মাটির

'—'

'—'

তোমার দেশে যেতে ইচ্ছে করে না

'—'

তুমি নিজে দেশে যেতে চাও না

'—'

এখানে আসার পর একবারও যাও নি

'—'

একবার দেশটা দেখে এসো ভালো লাগবে

'—'

একবার ঘুরে এসো দেশ

কোথায়

কটক নাকি ভদ্রক না বালেশ্বর

হাঁ হাঁ কোথায়

ঐ যে বললে রেল-স্টেশন রেলগাড়ি তারপর গরুগাড়ি রাস্তা ধান খেত নদী রাস্তা নদী সাঁতার নদীর পার ধানখেত আল আমগাছ

হাঁ হাঁ বলুন আবার

সরু রাস্তা তাল গাছ ঝোপঝাড় ধানখেত সবুজ মাঠ রাস্তা

হাঁ হাঁ আমগাছ গরুগাড়ি ধানখেত নদী সরু রাস্তা তাল গাছ নীল আকাশ চিল সাদা মেঘ হাঁটা পথ আল তারপর তারপর

আরও আরও পথ মাঠ ঘাট তারপর রাস্তা ধানখেত সবুজ মাঠ তাল গাছ
মরা নদী

ঠিক ঠিক হুবহু তেমন তারপর তারপর

রেল-স্টেশন গরুগাড়ি নদী ধানখেত পার হয়ে হাঁটা কাদা জল ধানখেত

বাবু বাবু পারি আমি যাইতে সেখানে

নিশ্চয় কেন পারবে না

তাহা হইলে আমি পারি যাইতে সেখানে

নিশ্চয় পারবে

কেমন করিয়া যাইবো তবে

কেন এখান থেকে বাস তারপর স্টেশন সেখানে রেল-গাড়ি বদল করে আবার
ট্রেন আর একটা বদল তারপর আবার ট্রেন স্টেশনে নেমে গরুগাড়ি

তাহা হইলে আমি যাইব দিয়া বাস রেলগাড়ি

হাঁ তারপর ট্রেন স্টেশনে গিয়ে থামবে তুমি চড়বে গরুগাড়িতে

তারপর

তারপর পার হয়ে যাবে নদী নালা খানাখন্দ

দয়া করিয়া বলিয়া দিন খোলসা সব

এই তো বলছি আবার বাস ট্রেন স্টেশন গরুগাড়ি

তারপর

তারপর নদী পার হবে

তারপর

তারপর হেঁটে যাবে

কত লাগিবে তাহা জন্য যাত্রার

এই ধর তিন চার দিন হয়ত পাঁচ ছয়

আমি যাইব তাহা হইলে

কিন্তু টাকা লাগবে অনেক

কত

ধর এক শো দেড় শো নির্ঘাৎ

তাহা হইলে

জমিয়ে রাখো জমাতে হবে টাকা তারপর না হয় একদিন

আমি জমাইব টাকা

তা হলে খুব ভালো হয় কিন্তু

কিন্তু কি

ভাবছি তুমি যাবে কোথায়

কি আপনি বলিতেছেন

মানে তোমার গ্রামের নাম কি তা কোন জেলায় কোথায় তার ঠিকানা
কোথা দিয়ে যেতে হয় তা না জানলে

তাহা আপনি বলিলেন বাস রেলগাড়ি ট্রেন বদল স্টেশন গরুগাড়ি

সে তো বুঝছি কিন্তু ঠিকানা তো দরকার

তাহা আমি বুঝিয়াছি রেল-ইস্টিশন রেলগাড়ি তারপর গরুগাড়ি রাস্তা

ধানখেত নদী রাস্তা নদী সাঁতার বলুন বলুন আবার বলুন দয়া করিয়া

নদীর পার ধানখেত আল আমগাছ

হাঁ হাঁ

সরু রাস্তা তাল গাছ ঝোপঝাড়

তারপর তারপর

নদী পার হয়ে হাঁটা পথ সরু রাস্তা ধানের খেত আল

বলুন বলুন

আবার নদী হাঁটুজল তালগাছ ঝোপঝাড়

হাঁ হাঁ

ধানখেত সবুজ মাঠ আমগাছ

হাঁ হাঁ তারপর তারপর

সবুজ ক্ষেত রাস্তা নদী তালগাছ ঝোপঝাড়

তারপর তারপর

তারপর আরও পথ আরও মাঠ রাস্তা ধানখেত সবুজ মাঠ

হাঁ হাঁ

মরা নদী হাঁটুজল আলপথ ধানখেত তালগাছ

হাঁ হাঁ বুড়ি মা খড়ের ঘর কবাডি কবাডি সেখানে থাকে একটি কুমড়া
উপরে চালের টিয়াপাখি গুলতি বিরছা হাঁ হাঁ

সবুজ মাঠ রাস্তা নদী হাঁটুজল আলপথ আমগাছ

হাঁ হাঁ বুড়ি মা গুনগুনাইতেছে তলা গাছের ফকির উড়াইতেছে একটি ঘুড়ি
বিরছা খাইতেছে একটি লাড়ু পিতা চিবাইতেছে একটি পান মা উপরে
দাওয়ায় বাবু বাবু আমি পাইয়াছি তাহা আপনি বলুন আমি আসিব প্রতিদিন
কাছে আপনার আপনি বলিবেন আমি শুনিব মন দিয়া ঐ হয় আমার দেশ

রেল-স্টেশন গরুগাড়ি নদী ধানখেত নদী হাঁটুজল পার সরু রাস্তা আমগাছ বুড়ি-মা বসিয়া সেখানে থাকে একটি কুমড়া উপরে চালের টিয়াপাখি গুলতি বিরছা হাঁ হাঁ রেল-স্টেশন গরুগাড়ি নদী ধানখেত হাঁটুজল রেলগাড়ি গরুগাড়ি নদী ধানখেত হাঁটুজল……

রদাঁর আলোয় একটা দিন

পূর্ণেন্দু পত্রী

১

বিষ্ণুবাবুর 'টপ্পা-ঠুংরি'-র আরম্ভে ছিল—

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছুটানা লয়ে
পিয়াসিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ।
দিন কাটল
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে
গানের কলির অলিতে গলিতে······

আমার বেলায় পোস্টকার্ড আসেনি। এসেছিল রাজধানীর টেলিগ্রাম। প্যারিসে যাওয়ার নিমন্ত্রণ। তারপর সত্যি সত্যিই পিয়াসিকাতর আকস্মিক ঘূর্ণী ঝড় একদিন উড়িয়ে নিয়ে এল সেইখানে। এবং তারপর সত্যি সত্যিই দিন কাটতে লাগল যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে গানের কলির অলিতে গলিতে রাজপথে রেস্তোঁরায় মিউজিয়ামে মেট্রোয় বুলভারে।

উবুর-জুবুর ভরা কলসীর জলও গড়াতে গড়াতে শেষ হয় একদিন। আমার ছিল আধ-ভরা কলসী। অর্থাৎ তিরিশ দিনের মাসের ঠিক অর্ধেকটাই প্যারিসের জন্যে মঞ্জুর। গোনা-গুনতি দিন গড়াতে গড়াতে শেষ হবার মুখে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি সেজে থাকার পালা-পার্বণও চুকে গেল একদিন। বাক্‌সো-প্যাঁটরা বেঁধে-ছেঁদে নিখরচার জাপানী হোটেল নিকোর

চাকচিকন চৌখুপি ছেড়ে চলে এলাম রু জুলে লিয়ঁ-র এক গেরস্থ ফ্ল্যাটে। শিল্পী শক্তি বর্মনের অতিথি। আস্তানা তাঁর স্টুডিও-র ছোট্ট ঘরে। প্যারিসের যে-কটা আসল জিনিস দেখা বাকি, সারা হবে এইখানে থেকে। তারপর, আবার স্বদেশ।

ঊর্ধ্ব আর অধঃ বাদ দিলে শক্তি বর্মনের ঐ স্টুডিওটার চারটে দেয়াল অথবা আটটা দিক ছোট-বড়-মাঝারি মাপের পেনটিং-এ, প্রিন্টের বড় বড় কাগজে বাক্সোয়, রঙে, তুলিতে, দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা কিউরিয়ো গিজিঘন্ট। তার মধ্যেই টেনে-হিঁচড়ে ব্যবস্থা করা হল একটুখানি শোবার জায়গা, শুধু রাতটুকুর জন্যেই। এ্যাজমা-র ধাত। মেঝেয় শোওয়া শরীরের বারন। বেরিয়ে পড়ল ফোল্ডিং ক্যাম্প খাট, একলা মানুষের মাপের। চমৎকার! মানুষের আদর্শ শয্যাগৃহ এই রকমই হওয়া উচিত ছিল। দশ দিগন্ত জুড়ে ছবি। আমাদের কপালে জোটে নি বলে আমরা সাদা দেয়ালেই যৎপরোনাস্তি সুখী। তার উপর যদি দৈবক্রমে জুটে যায় একটা বাহারি ক্যালেণ্ডার অথবা যামিনী রায়, তাহলে তো রাজসুখ। বৌদ্ধ শ্রমণেরা, কি ভারতবর্ষের, কি চীনের, এটা জানতো। জানতো পৃথিবীর আদিতম মানুষেরাও। নইলে পাহাড় কেটে বসবাসের গুহা বানানোর কষ্টের সঙ্গে, সেই গুহার দেয়ালকে ছবি এঁকে সাজিয়ে তোলার আরও দুরূহ কষ্টের ঝক্কি পোয়াতে যাবে কিসের গরজে? এখনো সেই সব শিল্প-প্রাণ আদিবাসী আমাদের দেশের পাহাড়ে-প্রান্তরে রয়ে গেছে অনেক, আলপনা-বিহীন দেয়াল আর নিঃশ্বাস-হীন জীবন যাদের কাছে এক। আধুনিক স্থাপত্যের সুঠাম এবং গগনবিহারী গঠন দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু সে বড় উলঙ্গ এবং লজ্জাহীন।

ক্যাম্প-খাটটা ছিল আমার চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক ছোট। তাতেও ঘুমের গায়ে আঁচড় পড়েনি। কারণ প্যারিসে তখন শীতের মিলিটারি মেজাজ। আর শীতে আমি চিরকালই জবুথবু। বিছানায় শুলেই, ইন্টারভিউয়ারের মাইকের মত হাঁটুটা চলে আসে মুখের কাছে। তদুপরি মনটা ছিল রোমান্টিক উত্তেজনায়, অনেকটা রোঁয়া-ফুলোনো বেড়ালের মতো, গোলগাল এবং ডগোমগো, কারণ চারদিকের ছবি।

আদৌ ছবি-ছাপটার অভিজ্ঞতা না থাকলে নির্ঘাৎ শক্তিবাবুকে জিজ্ঞেস করে বসতুম—আচ্ছা, আপনি রাত্রে যে-সব স্বপ্ন দেখেন সেও কি আপনার

ছবির মত রঙীন ? ছবির মানুষেরা স্বপ্নে কথা বলে নাকি আপনার সঙ্গে ? কী ভাগ্যবান আপনি। হিংসে হয় এসব দেখে।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প বলি। গল্প নয়, সত্যি। তখন কাকার সঙ্গে থাকি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, শ্রীমানী মার্কেটের দোতলায়। পেচ্ছাপখানার পাশে একখানা ঘর। ভাড়া ১৪ টাকা ৫ আনার মত। মাসে মাসে এত টাকা দিয়ে উঠতে পারা যাবে কিনা এই নিয়ে সতেরো বার বসতে হয়েছে গভীর-গোপন কনফারেন্সে, এমন জেরবার অবস্থা তখন। ঘরে নো চেয়ার, নো টেবিল। এক কোণে স্বপাক রান্নার সরঞ্জাম। বাকি তিনভাগ জুড়ে বিছানা। ঐ বিছানাই ড্রইং রুম, ঐ বিছানাই আমার ছবি মানে মলাট আঁকার স্টুডিও। যে-ভঙ্গিতে জপ-তপ, সেই ভঙ্গিতেই সামনে কোষা-কুষি ঘট-প্রদীপের মত কালি তুলি কাগজপত্র নিয়ে কাজ। তখন রাজনীতির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। পূরবী সিনেমার উল্টো দিকের গলির একটা বাড়িতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উত্তোগে একটা প্রদর্শনী হবে। দেবুদা (দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন এক গোছা ছবির ভার। সেই বিষয়ে তাগাদা দেবার জন্যে হঠাৎ একদিন গীতাদি-র (মুখার্জি) দূত হয়ে ছুটে এলেন বিশ্বনাথবাবু। আমি তখনও ঘুমকে দুহাতে জড়িয়ে। ঘুম ভাঙল তাঁরই ডাকে। মাথার সামনে গতরাত্রের ছড়ানো-ছিটানো তুলি-কালি কাগজ। শোবার আগে গোছানো হয় নি। বিশ্বনাথবাবু কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চিরকালের প্রবল বক্তা হঠাৎ ক্ষণকালের কোমল কবি হয়ে গিয়ে আমার পিঁচুটি-মাখা চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন —তুমি এইভাবে থাকো ? রাত্রে যখন স্বপ্ন দেখো সেও কী তোমার ছবির মত রঙীন ? ভারি ভাগ্যবান হে তোমরা। দেখে হিংসে হচ্ছে।

২

রাত কেটে ভোর হতেই শক্তিবাবুকে বললুম—আজ আর অন্য কিছু নয়। ঝটপট কিছু খেয়ে নিয়ে রদাঁার মিউজিয়ামে। শক্তিবাবু রাজি। ল্যুভরেও তিনি ছিলেন সঙ্গী। সত্যিই তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম আমরা। গাড়ির কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। তাই শুরু হল পায়ে হাঁটা।

—পারবেন তো হাঁটতে ?

—কতদূর ?

—এই ধরুন বাঙুর এ্যাভিনিউ থেকে শ্যামবাজার।

—পারবো। কত হেঁটেছি।

মুখে বললুম বটে পারবো, কিন্তু ভয় হচ্ছিল নিজের পা'কে নিয়ে নয়, পায়ের জুতো নিয়ে। এই জুতোর জন্যেই ভাল করে প্যারিসটা দেখা হয় নি।

কলকাতায় ছয় ঋতু বারোমাসই চলে স্যাণ্ডেলে। যেই বিদেশে যাওয়ার ডাক আসে, তখনই জুতোর খোঁজ খোঁজ। খাটের তলা, খুপরী-খাপরা ঘেঁটে যে-জুতো বেরোয়, সেটা বেঁকে-চুরে, তুমড়ে-মুচড়ে, জেল্লা-জৌলুষ হারিয়ে এমনই কদাকার, বিদেশ তো দূরের কথা, কলকাতার চেনা মহলের চোখে পড়লেই হাসাহাসি করবে ক্লাউন বলে। অগত্যা কিনতে হয় নতুন জুতো। ৭৪-এ মস্কো অথবা তাসখন্দ-এ যাওয়ার সময়ও কিনেছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যের জোরে পরতে হয় নি বেশি। তাসখন্দের আবহাওয়া ছিল বাংলাদেশের কার্তিক-অঘ্রানের মত। বাতাসের গায়ে শীতের একটা পাতলা উড়ুনি। তাই পাজামা-পাঞ্জাবী আর স্যাণ্ডেলেই দিগ্বিজয়। এই একই ধাঁচের পোশাক ছিল আমাদের তিনজনের। বাকি দুজন, মৃণাল সেন আর গিরীশ কার্নাড। অন্যেরা সাহেবসুবো। এবেলা-ওবেলা নতুন নতুন স্যুটে-বুটে ঝকঝকে কাপ্তেন। ভেবেছিলাম মস্কোর জুতো দিয়েই প্যারিসটা চলে যাবে। কিন্তু হল না। বাঙুরে তখন বন্যা। এক বুক জল। ২১ দিন পরে বুকের জল নেমেছিল পায়ের চেটোয়। ঘর-সংসার তছনছ। অনেক খুঁজে-পেতে জুতো জোড়াটা যখন পাওয়া গেল, সর্বাঙ্গে সাদা সাঁতলা। আর কিছুদিন থাকলে, মনে হয়, সুস্বাদু মাসরুম গজাতো। তবু ঝেড়ে-মুছে পরতে গিয়ে দেখি আমার পায়ের বয়সটা বেড়ে গেছে পাঁচ বছর। আর বেচারি জুতো যত্ন-আত্তির, ঠিকমত আলো-বাতাস না পেয়ে অসুখে ভোগা মানুষের মতো বেঁটে হয়ে গেছে কিঞ্চিৎ। বহুদিন অনাহার-অত্যাচার পুইয়ে নিরীহ নড়বড়ে মানুষেরা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী, জুতোটারও ভাবভঙ্গিও সেই রকম। সে আমার পদাঘাত সইতে রাজি, কিন্তু পদানত হতে নারাজ।

অগত্যা নতুন জুতো। ৩০।৩৫ পর্যন্ত মানুষ বাড়ে স্বাস্থ্যে। তারপর বাড়ে অভিজ্ঞতায়। সোফোক্লিসের একটা উক্তি পড়েছিলাম যেন কোথায়, 'বয়স আর বিলম্ব সব কিছু শেখায়। আগের চেয়ে বয়স বেড়েছে বলে অভিজ্ঞ হয়েছি। অভিজ্ঞ হয়েছি বলে, এবারে জুতো কিনেছিলুম এক পক্ষ আগে। আসল শুভ উদ্বোধনের আগে রীতিমত ড্রেস রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া যায় হাতে।

এত সাড়ম্বর প্রস্তুতিতেও কোন কাজ হল না। ল্যুভর যে একাই একটা রাজ্য, আগে ভাবি নি! যখন সিকির সিকি ভাগও দেখা হয়নি, তখনই জুতোর কামড়ে পা একেবারে অবশ, পা তো নয়, যেন পাকা কোঁড়া।

মস্কোয় জারের প্রাসাদে ঢোকার সময় জুতো খুলতে হয়েছিল। প্রবেশ-দ্বারের মুখে এক ধরনের ফিতে-বাঁধা চ্যাপটা চটি জুতোর ডাঁই। সেটা পরে উপরে যাওয়ার নিয়ম। আমাদের দেশে তীর্থক্ষেত্রে, মন্দিরে, মসজিদে জুতো অচ্ছুৎ। শিল্পও তো পবিত্র জিনিস। পড়েছিলাম, ফরাসীরা ঈশ্বরকে দেখে আর্টিস্ট হিসেবে। তাহলে আর্ট আর ঈশ্বর অভিন্ন। তাহলে মিউজিয়ামগুলোয় জুতো পরে ঢোকা নিষেধ করতে দোষ কি? করলে ল্যুভর, যার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছিল কেবল, তার সঙ্গে শুভ পরিচয় হতে পারতো। যদিও জানি, অত সহজে, একটু দেঁতো হাসি, একটু চপল কটাক্ষ, একটু বিগলিত আবেগ দেখে কাউকে হৃদয়ের ছোঁয়া দেয় না। তাকে নিবিড় করে পেতে গেলে উৎসর্গ করতে হবে গোটা জীবন। দীর্ঘ অধ্যাবসায় না দেখলে সে কারো দিকে তাকায় না দীঘল চোখে।

আমাদের জানা আছে; সে দুর্গেশনন্দিনী। ধীরে ধীরে, অনেক শতাব্দীর সেবা যত্নে হয়ে উঠেছে আজকের তিলোত্তমা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইখানে ছিল একটা মধ্যযুগীয় দুর্গ, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে। ফিলিপ অগস্টাসের তৈরি। তখন অঞ্চলটির নাম ছিল Lupara. তার থেকেই ক্রমে ক্রমে Louvre, ল্যুভর পাকাপোক্ত মিউজিয়ামের রূপসী চেহারা নিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অবশ্য তারও ৪০ বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল প্রস্তাবনাপর্ব। তখন ফরাসী বিপ্লবের আগুনে জ্বলছে দেশ। সেই সময়ে ঝড়ের পাখির মত প্যারিসের বাতাসে উড়ে বেড়াতে লাগল এক ইস্তাহার। রচয়িতা, লাফো দ্য সেন্ট এনে। দাবি, সমস্ত রাজকীয় শিল্প-সংগ্রহকে জড়ো করতে হবে রাজপ্রাসাদের গ্যালারিতে। এবং তার দরজা খোলা থাকবে জনসাধারণের জন্যে। সমর্থন জানালেন দেশের গণ্যমান্য লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিকেরা। দিদেরো, ১৭৬৫-তে ১৭ খণ্ডের বিশ্বকোষে 'ল্যুভর' নামের প্রবন্ধে আরো জোরদার করে করে তুললেন এই দাবি। কিন্তু তখনই কিছু হয়ে উঠল না। সময় লাগল। শামুক আর সরকারি উদ্যোগের চলা-হাঁটা অধিকাংশ দেশেই ছন্দে এক।

১৭৯৩-এর ১০ আগস্ট। এইদিন থেকেই জনসাধারণের জন্যে খুলে গেল ল্যুভর-এর দরজা। নেপোলিয়নের আমলে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে মনি-মানিক্যে।

ভুরি-ভুরি শিল্প-সম্পদ এসে জমা হতে লাগল ক্রমশ। নেপোলিয়ন শুধু অন্য দেশের স্বাধীনতার উপর ডাকাতি করেই হাত গোটান নি, মহোল্লাসে ঘরে ফেরার পথে সেরে নিয়েছেন সে-সব দেশের শিল্পকলার উপর ছিনতায়ের কাজটাও।

যেতে যেতেই পথে পড়ল 'ডোম ছ ইনভ্যালদে'। নেপোলিয়নের সমাধি মন্দির, সেন্ট হেলেনার নির্জন দ্বীপে পাকস্থলীর যন্ত্রণায় নিজেকে খান খান করতে করতে মৃত্যু। তারপর সেইখানেই সমাধি।

বাইরে উইলো গাছের ছায়া পেতে রেখেছে সবুজ কার্পেট। পাশে টরবেট ঝর্ণা, যার জল ছিল সম্রাটের প্রিয় পানীয়। সেইখানে খোঁড়া হল বারো হাত গর্ত। ভিতরে ঢুকে গেল মেহগনি কাঠের কফিন পৃথিবীর এক পরাক্রান্ত যুদ্ধ-পিপাসু সম্রাটের পোস্টমর্টেমের ছুরির ঘায়ে ছিন্নভিন্ন, বিবর্ণ, বিকৃত কাঠামোকে বুকে জড়িয়ে। সেই অন্তিম মুহূর্তে অবনত অনুগমনের আপনজন বলতে উপস্থিত শুধু একজনই, শেখ, তাঁর ধূসর রঙের প্রিয় ঘোড়াটা। আশ্চর্য লাগে, এমন আর্তনাদময় মৃত্যুর মুহূর্তেও মানুষটা ছিলেন প্রেমিক। নির্দেশ ছিল, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ থেকে 'হৃদয়' অংশটাকে কেটে নিয়ে ঈগল খোদাই করা কাচের বাকসে ভরে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়, প্রিয়তমা নারী লুইজার কাছে। পাঠানো হয়েও ছিল। লুইজা ছোঁয় নি।

সেই নির্বাসিত মৃত নায়ককে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হল মৃত্যুর ৭ বছর পরে। ১৮৪০, ১৫ সেপ্টেম্বর। সকাল থেকে বরফের ঝড়। অসহ্য ঠাণ্ডা। মরা পাখির চোখের মতো আলোহীন আকাশ। সেই সঘন দুর্যোগেও সারা শহর বেরিয়ে পড়েছে পথে, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। লুই ফিলিপের ছেলে বয়ে নিয়ে আসছে নেপোলিয়নের ভস্মাধার। সেদিনকার সেই থিকথিকে ভিড়ের খুব ভিতর দিকে তাকালে দেখা যাবে তখনকার বিদ্রোহী তরুণ কবিদের। তখনও 'কবিদের কবি' হয়ে ওঠেন নি এমন একজন উঠতি কবিকেও আমরা সবান্ধবে দেখতে পেয়ে যেতাম সেই জনারণ্যে, থরথরানো শীতে হিম-হয়ে-যাওয়া হাত-পা নিয়ে, যাঁর নাম বোদলেয়ার। বোদলেয়ারের জীবনেও তারিখটা ছিল স্মরণীয়। কারণ যে মা-বাবাকে বাঘের মতো ভয়, তাদের অনুমতি ছাড়াই শোভা-যাত্রা থেকে একদল বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে চলে এসেছিলেন আড্ডা দিতে। মা মাদাম অপিক যদিও সাদরে আপ্যায়ন করেছিলেন সকলেই। কিন্তু ছেলের

ঘরের অশ্লীল-উতরোল খিস্তিসুলভ আলাপচারিতা শুনে মনে মনে আঁতকে উঠেছিলেন ভবিষ্যৎ ভেবে। আর সেইদিন থেকেই বোদলেয়ার সম্বন্ধে আরো কঠোর আরো সতর্ক হয়ে উঠলো তাঁর শাসনপ্রণালী।

সে-অভ্রের সমুদ্রতীর থেকে সেন, তারপর শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ পেরিয়ে, শাঁজেলিজে পার হয়ে ডোম্ দ্য ইনভ্যালদের দিকে। ইজিপ্টের ফারাওদের মত, নেপোলিয়নের দেহাবশেষকেও ভরা হল পরপর ৬টা কফিনে। প্রথমটা টিনের, পরেরটা মেহগনির, তৃতীয় এবং চতুর্থটা সীসের, পঞ্চমটা আবলুসের। শেষেরটা ওক কাঠের। আর সবার উপরে লাল গ্রানাইটের আধার, যার সর্বাঙ্গে ভাস্কর্যের নিপুণ কারুকাজ। আর সেই আধারটাকে রাখা হল বিখ্যাত স্থপতি ভিসকন্তির ডিজাইনে তৈরি এক গর্ভগৃহে।

ভেতরে যাই নি। দূর থেকেই এক ঝলক তাকিয়ে নেওয়া। ছাই রঙের পাথুরে স্থাপত্য। অজস্র ভাস্কর্য, বৈষ্ণবের গায়ের চরণ-ছাপের মত মাখামাখি। সামনে সাজানো বাগান। পিছনে সারিবদ্ধ কামান। উৎসুক জনতার ভিড় চতুর্দিকে। ভেতরে যাই নি, হতাশায় ক্লান্ত হওয়ার ভয়ে। তাজমহলের ভিতরে গিয়ে তার আত্মাকে দেখতে পাই নি। ঐতিহাসিক দুই নায়ক-নায়িকার পাশাপাশি দুটি পাথুরে শবাধারের চেয়ে অতিরিক্ত কোনও আবেদন নেই সেখানে। তাজমহলের শরীর, শুধু শরীরটাই জলজলে যৌবন। সেই থেকে, জীবনের কিছু ইয়ারো আনভিজিটেড থাকলেই ভাল, এই সার কথাকে সেলাম জানিয়ে আসছি।

শক্তি বর্মনের কাঁধে ঝুলছিল ক্যামেরা। নিজের নয়। ধার করা। ফলে ওটার কলকব্জা সামলাতে শক্তিবাবু নাজেহাল। ক্যামেরাটা জেরার্ড-এর। ফরাসী ছেলে। অথচ হাড়ে-মজ্জায় ভারত-প্রেমিক। বিয়ে করেছে কলকাতার শিল্পী অঞ্জু চৌধুরিকে। নিজের পেশা ফটোগ্রাফি। ভারতবর্ষ বা কলকাতাকেও কী রকম ভালবাসে তার একটা ছোট্ট নমুনা—আমরা আলোচনা করছি কলকাতার লোডশেডিং নিয়ে। অতিষ্ঠ। অসহ্য। সব শুনে জেরার্ড-এর মন্তব্য—সো হোয়াট? দেয়ার আর ক্যানডেলস্।

কোর্ট মার্শালের ভঙ্গিতে শক্তিবাবু আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঐ সারিবদ্ধ কামানের সামনে। ছবি উঠল। নিজেকেও তখন নেপোলিয়নের গ্রাণ্ড আর্মির কোন দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মত লাগছিল। লাগবে না? চামড়ার উপরে উলেন গেঞ্জী, উলেন ইন্টারলক, তার উপরে শার্ট, ট্রাউজার, তার

উপরে পুলওভার, তার উপরে গরম কোট। এবং সর্বোপরি হৃশাসই একটি ওভার কোট। ওভারকোটটা বাদশা ঠাকুরের। যেন বাদশার পোশাক নফরের গায়ে। ফলে ছোট গল্পের মত আমার ছিমছাম শরীরটা হয়ে উঠেছে ঢাউস উপন্যাস। শুনছিলুম, প্যারিসে নাকি এখনও আসল শীত খেলতেই নামে নি। দু-একদিন আকাশ একটু পাতলা সর্দির নাক ঝেড়েছে মাত্র।

কারা যেন বলাবলি করছিল, এ বছর শীত নামবে তাড়াতাড়ি। সত্যি? আমি এখানে থাকতে থাকতেই? শুনে ব্রহ্মতালু কাঠ। তাহলে আর স্বদেশে ফিরতে হবে না। রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দশা হবে আমারও।

এগোচ্ছি ছবি তুলতে তুলতে। আর প্রত্যেকবারই ছবি তোলার পর শক্তিবাবুর মুখে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া। আমি ভেবেছিলুম, ওটা শিল্পসুলভ সন্দেহ। অল্পে তুষ্ট হয় সাধারণ। অসাধারণদের, বিরাট সাফল্যেও, খুঁতখুঁতোনি ঘোচার নয়। ঐটেই তাদের বেঁচে-বর্তে থাকার মন্ত্র। কলকাতায় ফিরে নেগেটিভগুলো প্রিন্ট করা হল যখন, দেখা গেল সব ছবিতেই প্যারিস হাজির। অনুপস্থিত কেবল একজনই, সে আমি। নিজের সুররিয়ালিস্ট ফটোগ্রাফির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

৩

বির হোটেল। ওতেল বির।

পৌঁছে গেছি রদ্যাঁর মিউজিয়ামে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকার আগেই চোখ ছুটে গেল ডানদিকে, ঐ তো বিশ্ববিদিত ভাস্কর্য—'দ্য থিংকার'। ল পাঁজ। পিকাশোর আঁকা পায়রা বিশ্বশান্তির প্রতীক। রদ্যাঁর থিংকার তেমনি প্রতীক চিন্তাশীল মানবাত্মার। কিন্তু নীল কেন সর্বাঙ্গ? নীল রঙের লম্বা, রেকট্যাংগুলার পাথুরে বেদীর উপরে ব্রোঞ্জের ঘন নীল থিংকার। দুটি-একটি বাদ দিলে তাঁর আর সব ভাস্কর্য যেখানে বাংলাদেশের পদ্ম কিংবা রাজহংসের মতো সাদা, সেখানে মাত্র একটির বেলায় কেন এমন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম? আমরা নীলকণ্ঠ বলি শিবকে। কারণ অন্যের পক্ষে যা ধ্বংস অথবা মৃত্যুর মারণাস্ত্র, তাকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করে শিব জানিয়ে দেন, তোমরা নিরাপদ। সক্রেটিস, জ্ঞানী সক্রেটিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বিষ-পাত্র। জীবন অথবা প্রকৃতি অথবা

পৃথিবী সম্বন্ধে এত কেন বিরামহীন, ব্যস্ত কৌতূহল? তাই হত্যা করা হল নীল বিষে। সেই থেকেই কী দার্শনিকতার সঙ্গে, সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা প্রগতি-চিন্তার সঙ্গে অচ্ছেদ-অভেদ হয়ে গেছে নীল বিষ? তারাই মরে আগে, যারা ভাবে, যারা প্রতিবাদ করে, যারা সময়ের উজান ঠেলে রচনা করে নতুন শিল্পভাষা, অথবা জীবনবোধ। মরে বটে, কিন্তু থেকে যায় মৃত্যুহীন। বালজাক বলেছিলেন—'এ রাইটার ইজ এ মার্টার, হু নেভার ডাই'।

তখন 'গেট অব দা হেল' নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। বছরের পর বছর ধরে চলেছে অফুরান ভাঙা-গড়া। প্রেরণা তিনজনের কাছ থেকে—দান্তে, বালজাক, বোদলেয়ার। বোদলেয়ার তাঁর অনেক দিনের প্রিয় কবি। বালজাক প্রিয় লেখক। দান্তের ডিভাইন কমেডি কিনেছিলেন একখানা, পাঁচ-ফ্রাঁ সংস্করণের। কিছুদিন সেটাই ছিল তার দিনরাতের সঙ্গী।

অখণ্ড মনযোগে রু দ্য য়ুনিভার্সিটির স্টুডিয়োয় 'গেট অব হেল' সৃষ্টিতে মগ্ন যখন, যখন দ্বাররক্ষীদের উপর সুকঠিন নির্দেশ যে-কারো পক্ষে এখন প্রবেশ হবে নিষেধ, সেই সময় এক দীপ্ত যুবককে নিজের স্টুডিও-র দোরগোড়ায় উপস্থিত হতে দেখে বিরক্ত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন—

—কি করে এলে এখানে? ৫০ ফ্রাঁ ঘুষ দিয়ে বুঝি?

—আমি আপনার উপর একটা বই লিখছি, মহাশয়।

—বই? বল কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জার্মান ভাষায়: আমি একজন কবি। রাইনের মারিয়া রিলকে।

এ-নাম রদাঁ কোনদিন শোনেন নি। নামটা শুনেও বিরক্তি ঘুচল না। কিন্তু তাঁকে টানল দুটি নীল চোখের গভীর চাউনি।

—আপনার 'গেট অব হেল' লিরিক কবিতার মতো। আপনার সব কাজই তাই। আমার স্ত্রী ক্লারা ওয়েস্টহফ আপনার ছাত্রী। আপনার শিল্প...

রদাঁ যা কিছু করেছেন এযাবৎ, তার সবই যেন রিলকের মুখস্থ। গড়গড় করে বিশ্লেষণ করে চলেছেন তাদের মহত্ব। রদাঁ থামিয়ে দিয়ে বললেন—আমি অত বড় নই হে। 'আই এ্যাম নট এ হিস্টরিক মনুমেন্ট।'

—আপনি তাই হবেন।

যুবকটিকে আর তাড়ানো যায় না। অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং শিক্ষিত।

গোড়ায় বিরক্ত হয়েছিলেন যতখানি, শেষে পিতৃপ্রতিম স্নেহে অনুরক্ত হলেন ততখানিই, দরজা খুলে দিলেন যাবতীয় নিষেধের। একদিন বিকেলে কথা হচ্ছে দুজনের, 'গেট অব হেল' নিয়ে। তখনও অসমাপ্ত। রিলকে যেটুকু দেখেছিলেন সেটা ১৯০০-র প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে রদাঁর নিজস্ব স্টলে। ইতস্তত, বিচ্ছিন্ন, প্রাথমিক। কথার মাঝখানে রিলকে হঠাৎ বলে উঠলেন—গেট-এর শীর্ষে যে নগ্ন মানুষটি বসে আছে, তাকে নিয়ে আপনি একটা স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন না?

—কার কথা বলছো? কবি দান্তে?

—কবি নাকি? দেখে তো মনে হয় খুবই পাশবিক, এমন পুষ্ট আর পেশীবহুল শরীর।

—তিনি চিন্তা করছেন। দান্তের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক।

—আরও বড় করে না গড়লে, তা মনে হবে না।

রদাঁর চিন্তায় ঢেউ তুললো এই প্রস্তাব। তিনি ভাবতে লাগলেন। আর রদাঁর তখনকার সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে রিলকে বলে উঠলেন—এই তো। আপনাকে সেই রকমই লাগছে, অবিকল। আপনি চিন্তায় কঠিন। চিন্তা করছেন আপনার বিষয়। চিন্তা করছেন…

রদাঁও সেই মুহূর্তে অনুভব করলেন, চিন্তাও সংগ্রাম। মানুষ চিন্তা করে সমস্ত শরীর দিয়ে, মানুষ চিন্তার কাছে আসে সংকটের মুহূর্তে। অনেক যন্ত্রণার ইতিহাস থাকে তার পিছনে। চিন্তা করা মানেও ক্ষতবিক্ষত হওয়া। মনে মনে স্থির হয়ে গেল 'দা থিংকার'-এর পরিকল্পনা। কিন্তু তাঁর অন্য সব কাজের মতোই শেষ হতে সময় লাগল অনেক। এমন-কি জীবনের এই শেষ বেলায়, অক্ষম শরীরে, জীবনের শেষ মহান কাজটি শেষ করে যেতে পারবেন কিনা, সংশয় ছিল মনে।

শেষ করার পর, ১৯০৫-এ, প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনী। আর তারপর, যেমন ঘটে থাকে তাঁর প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টির বেলায়, এবারেও ব্যতিক্রম ঘটল না তার। কুৎসিত নিন্দাধ্বনিতে, নিশাচর শিয়াল কুকুরের সরব আক্রমণে যেমন খানখান হয় পৃথিবীর নিদ্রাতুর মধ্যরাত, সেই রকম মুখরিত হয়ে উঠল প্যারিস। তাঁর আজীবনের শত্রু হলো সরকারি শিল্পায়তনগুলো। তারা বললে, মনস্টার। এপ্‌ ম্যান। প্যারিসের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় লেখা হলো সম্পাদকীয়। মঁসিয়ে রদাঁ ইচ্ছে করেই এই মানুষকে করেছেন এমন কুৎসিত, কদর্য, অশ্রদ্ধেয় এবং ভোঁতা। অন্যান্যবারে এই সব অপমান ভোগ

করেছেন একাই। এবারে যেন বদলা নেবার মতো বিক্রমে এগিয়ে এল বন্ধুরা। গোঁড়া, পুরনো, সেকেলেদের শিক্ষা দিতে! ৫ ফ্রাঁ ১০ ফ্রাঁ করে চাঁদা তুলে ১৫ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে মূর্তিটা কিনে উপহার দিলে প্যারিসকে। বসানো হবে প্যানথেনন-এর কাছে। কিন্তু বাধা এল মিনিস্ট্রি অব ফাইন আর্ট দপ্তর থেকে। 'গেট অব হেল' এখনো শেষ হয় নি। এর জন্যে রদ্যাঁকে যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তা সুদ সমেত ফেরত দিলে, তবেই এটা মঞ্জুর হবে। রদ্যাঁ রাজি হয়ে গেলেন ২৭ হাজার ৫ শ ফ্রাঁ ফেরত দিতে। অতঃপর সময় দেওয়া হলো বছর, এর মধ্যে 'দা থিংকার'কে গড়ে দিতে হবে ব্রোঞ্জে। রদ্যাঁ তাতেও রাজী। এই প্রথম স্থাপন করা হবে প্যারিসের প্রকাশ্য উদ্যানে। এই প্রথম সরকারি কর্তৃপক্ষ এই মূর্তির আরো একটা কপি চাইলেন, ফ্রান্স বনাম আমেরিকার বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে, আমেরিকায় পাঠাতে। আজন্ম সংগ্রামের শেষে এই 'দা থিংকার'-ই তাঁকে উপহার দিলে স্বদেশের খানিকটা স্বীকৃতি।

তখন রুগ্ন। বলতে গেলে মৃত্যুশয্যায়। আছেন নিজের মেদোঁ-র বাড়িতে। যুদ্ধকালীন দুঃখ আর অসহনীয় শীতের চাপে গত রাত্রে মারা গেছে প্রিয়তমা পত্নী রুজ। সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, হোটেল বির-এ যদি তাঁর সমগ্র কাজের একটা মিউজিয়াম খোলা হয়, তিনি সব দান করে দিতে প্রস্তুত। সেই সময়ে জাঁ গ্রিদ, তাঁর বিষয়-আশয়ের রক্ষক এসে প্রশ্ন করল, রুজকে কবর দেওয়া হবে কোথায়? যেন, এইখানে। এই মেদোঁতেই। আমার পাশে না কোন এপিটাফের প্রয়োজন নেই। পাথরের গায়ে শুধু লেখা থাকবে আমাদের নাম আর তারিখ। আর কিছু নয়। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আমার পছন্দ। আমার কবরের উপর যেন স্থাপন করা হয় 'দা থিংকার'। হাজার বছর ধরে আমি ঐখানেই থাকবো। মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রথম চোখের আলাপ লুভরে বিস্ময়কর। বিউটি এবং পারফেকশনের শেষ করার মতো। কিন্তু রদ্যাঁ তা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, নোবিলিটি, গ্রেস, অথবা বিউটি নয়, বাট ম্যান।

'দা থিংকার'-এর ডান দিকে একটা গির্জার মতো বাড়ি। একতলা। ঐখানেই রদ্যাঁর যাবতীয় লেখাপত্র, কয়েক হাজার স্কেচ, সারা জীবনের যত কিছু শিল্পসংগ্রহ দেশ-বিদেশ থেকে। খোলা ছিল। কিন্তু চোখের আশা

মিটল না। কারণ তখন কাজ চলেছে যেরামুতির। যে গেট দিয়ে ঢোকা, তার কাছেই বাঁ দিকে 'বুর্জোয়া দ্য ক্যালে', আর এক বিতর্কিত সৃষ্টি এবং অবিস্মরণীয়।

সেটা ১৩৪৭। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ডের সেনাদের কাছে সেবারের যুদ্ধে খাদ্য-পানীয়ের অভাবে, দীর্ঘ একবছর প্রতিরোধের পরও, আত্ম-সমর্পণ করল ক্যালে নামের শহর। অত্যাচারে, রক্তে, হত্যায় ক্যালে তখন ধ্বংস হওয়ার মুখে। রক্ষা হবে কিসে? সে উপায় বাতলে দিলেন যিনি অত্যাচারী তিনিই। দেশের সেই রকম ৬ জন নাগরিককে তাঁর তাঁবুতে এসে পৌঁছে দিতে হবে শহরের চাবিকাঠি, যারা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। তবেই থামানো হবে নির্যাতন। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন ৬ জন নাগরিক। উস্তাথ দ্য সেন্টপেয়ী তাদের নেতা। বৃদ্ধ এবং নির্ভীক। তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে ১৮৪৫ থেকে ক্যালের নাগরিকরা উঠে-পড়ে লেগেছিল একটা বিরাট মূর্তি বানাতে। কিন্তু বাধা পড়েছিল বারে বারে। ১৮৮৫-র সেপ্টেম্বরে ক্যালের মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আমন্ত্রণ জানালো শিল্পীদের কাছে। রঁদ্যা আলোড়িত। পড়ে নিলেন ফ্রোসার্ড ক্রনিক্যাল থেকে পুরো ইতিহাস। পড়েই প্রশ্ন করলেন, মাত্র একজনকে নিয়ে কেন গড়া হবে স্ট্যাচুটা? এর আসল তাৎপর্য তো সংঘবদ্ধতা, গ্রুপ এ্যাওয়ারনেস। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন সে কথা। টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না। আমি একটার টাকাতেই ৬ জনের মূর্তি করে দেবো।

কিন্তু প্রথম খসড়াটা পছন্দ হলো না কর্তৃপক্ষের। এ কি চেহারা! আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় বীরপুরুষদের এমন ভেঙে-পড়া বিষাদমূর্তি কেন? এ তো তাদের বীরত্বের প্রতি অপমান। কারো কারো মাথা উঁচু হয়ে একটা পিরামিডের মতো আকৃতি নেবে, তা না হয়ে, এটা হয়েছে চৌকো কিউব। রঁদ্যা প্রতিবাদে জানালেন,

—আপনারা যা চান সেটা হল এমন একটা এ্যাকাডেমিক স্টাইল, যা আমার কাছে বাতিল। আমি, একমাত্র আমই, তাকে ঘৃণা করে এসেছি আজীবন।

অবশ্য দ্বিতীয় খসড়াটায় অদল-বদল ঘটালেন খানিকটা। নাওয়া-খাওয়া ভুলে এই কাজে মেতে উঠেছিলেন তিনি। ক্যামেলি, তাঁর মডেল এবং সঙ্গিনী, বন্ধুদের ডেকে ডেকে বলতো, এত পরিশ্রম করতে বারণ করনা তোমরা। হার্টের অসুখ যদি নাও হয়, মানুষটা মারা যাবে শীতে। আর সারাদিনে তো

পাখির মত খাওয়া। রঁদ্যার এসব কথায় কান নেই। কানের সামনে কেউ বেশী কথা বললে, বিরক্ত। তোমরা যদি সারাক্ষণ কথা বলো, গভীর চিন্তার স্পর্শ পাবে কি করে ?

ভাস্কর্য শেষ। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোন সাড়া নেই। তাঁরা চাঁদা তুলতে চেয়েছিল। চাঁদা ওঠেনি এখনো। স্টুডিও-র গুদাম ঘরে পড়ে রইল সেটা দীর্ঘকাল। রঁদ্যা তখন মগ্ন বালজাক আর হুগো আর গেট অব হেল নিয়ে। বেশ কিছুকাল পরে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন আর্টে'র চেষ্টায় লটারী করে তোলা হল ৪৫ হাজার ফ্রাঁ। ১৮৯৫। প্রস্তাবের ঠিক ১০ বছর পরে ক্যালে-য় প্রতিষ্ঠা করা হল ঐ ভাস্কর্যের। সেদিনের উৎসবে রঁদ্যা ছিলেন সম্মানিত অতিথি। কিন্তু মন খুলে উল্লসিত হতে পারেন নি। তিনি যা চেয়েছিলেন, এখানে ঘটেছে তার উল্টোটাই। চেয়েছিলেন, শহরের কেন্দ্রে, টাউন হলের সামনে মাত্র ১ ফুট বেদীর উপরে রাখা হবে এটাকে। যাতে মনে হবে যেন ৬ জন সাহসী নাগরিক এইমাত্র শহরের কেন্দ্র থেকে হাঁটা শুরু করলেন তৃতীয় এডোয়ার্ড-এর তাঁবুর দিকে। তাছাড়াও যেতে-আসতে শহরের মানুষের মনে হবে, এঁরা তাঁদেরই মত মানুষ, আপনজন, যেন এখনো জীবিত। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে যেন। ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, মূর্তিগুলোর চার-পাশকে গ্রীল দিয়ে মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে।

অবশ্য শিল্পীর যা ইচ্ছে, এখন সেটা ঘটেছে। ঐ মূর্তি এখন রঁদ্যার মিউজিয়ামে ঠিক এক ফুট বেদীর উপরেই, মাটি ছুঁয়ে। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ৬টি চরিত্র। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের নীরব ভঙ্গীতে ৬ রকম ভাষা। কেউ শান্ত, সম্ভ্রান্ত এবং অবনত, শুকনো ফলের মত বিবর্ণ, ভারাক্রান্ত। কেউ সুঠাম, সুন্দর। বয়সে নবীন। তাই পিছন ফিরে উৎসাহিত করছে অন্যদের। আত্মত্যাগে উদ্দীপ্ত। অপরজন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে গিয়ে দার্শনিক চিন্তায়, জীবনের শূন্যতাবোধে আক্রান্ত। হাতের উত্তোলিত ভঙ্গীর ভাষা, যেন ভারতীয় কা তব কান্তা-র মায়াবাদী দৃষ্টান্ত। অন্যজন মৃত্যু চিন্তায় জর্জর হয়ে দুই হাতে জাপটে ধরেছে নিজের মাথা। আর তারই পাশের মানুষটির হাতে শহরের চাবিকাঠি। দৃষ্টি সামনের দিকে। চোয়াল শক্ত। নিজের মুখ থেকে তিনি মুছে ফেললেন দুঃস্বপ্নের যত কিছু ছায়া।

পরাক্রমশালী বীর, অথবা দেবোপম ক্রাইস্টের আদলে নয়, রঁদ্যা এদের গড়েছেন মানুষ হিসেবে। এদের মধ্যে দিয়ে ফোটাতে চেয়েছেন জীবনের

সেই কঠিনতম সত্তা, যা কোন উত্তেজক মুহূর্তের আকস্মিক আদর্শবাদ থেকে ভূমিষ্ঠ নয়, যা ক্রমান্বয়ে বয়স্ক এবং বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংঘাত ভেদ করে, যা বিচ্ছিন্নতাকে মেলায় ঐক্যে, একথা প্রাণের কান্নাকে বদলে দেয় শক্তির উৎসে। নিয়তি বনাম স্বাধীন ইচ্ছা, নিঃসঙ্গতা বনাম সংঘবদ্ধতার এই দ্বন্দ্বময় নাটক, যেন অভিনীত হতে হতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে। বাংলায় কেউ নামকরণ করতে বললে, বলতুম, মৃত্যুতীর্থযাত্রী।

যৈবনের ঢলে রে বন্ধু…

ভাওয়াইয়া অঞ্চলের কবিদের চোখে নারীর যৌবনের রূপ

নীহার বড়ুয়া

প্রকৃতিদেবী যখন তাঁর ঐশ্বর্যের ভাণ্ডে সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ উপাদানে নারীকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলেন, সেই যৌবনের সমাগমে নারীর উদ্দাম অদম্য সমস্যা বিজড়িত আবেগগুলির চিত্র সাজিয়ে গিয়েছেন পল্লীকবিরা তাঁদের গানের মাধ্যমে। সেগুলো ব্যক্ত হয়েছে নারীর বাচনেই নারী মনের অনুভূতিগুলির সরল, নিঃসঙ্কোচ ও নিরাবরণ কথার ভেতর দিয়ে। সেখানে দর্শন মেলে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার আকুলতা, না পাওয়ার নৈরাশ্যের বেদনা, হারাবার আশঙ্কা ও সন্দেহ-সংশয়ের দংশন। আর দেখা মেলে, যৌবনের স্বভাবজাত গতিপথ যেখানে অবরুদ্ধ—সেখানে সেই সমস্যায় বিভ্রান্ত মনের চিন্তাধারার সহজ প্রকাশ। তাই যৌবন সেখানে দেখা দিয়েছে, কথা বলেছে বহুরূপে, বহুভাবের অভিব্যক্তি নিয়ে। কবিগণ তাঁদের ভাবের পটে উপমা ও রূপকের রং মিশিয়ে তার যে চিত্রগুলি এঁকে রেখে গিয়েছেন, তারই কুড়িয়ে রাখা ক্ষুদ্র একটি অংশকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধ।

দক্ষিণের 'নদী'র 'সমুদ্রের জোয়ারে' ঘটে উচ্ছল। তাই দক্ষিণ বাংলার কবিগণ 'যৌবনে' দেখেছেন 'জোয়ারে'র উচ্ছ্বাস। উত্তরাঞ্চলে 'পাহাড়ের ঢল' নেমে নদী উচ্ছল। উত্তরাঞ্চলের কবিদের চোখে পড়েছে "যৌবনে' 'ঢলে'র প্লাবন। এমনি ছোটখাট একান্ত পরিচিত বস্তু দিয়েই

গড়ে উঠেছে তাঁদের উপমার সম্ভার। তারি সংযোজনে যুবতী কন্যাকে দিয়ে তাঁরা বলিয়েছেন—

যৈবনের চলে রে বন্ধু ভাসিয়া যায় মোর গাও—
কতোদিন হইল্ বাণিজ্ যাবার—দ্যাশে ফিরান্ নাও ॥

'যৈবনের চলে' বন্ধু আমার দেহ ভেসে যাচ্ছে। কতোদিন হয়ে গিয়েছে বাণিজ্যে যাওয়ার (এবারে) দেশের দিকে নৌকো ফেরাও।

তোলা মাটির কলা যামোন হলফল্ হলফল্ করে—
ঐ মতো নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে ॥

নতুন তোলা মাটিতে কলাগাছ যেমন ঝলমলে সজীব রূপ নিয়ে বৃদ্ধিলাভ করে—'ঐ মতোই' নারীর যৌবন দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

শাক তোলং মুঞি মুটি মুটি—কোচর করোং ভারী—
ঐ মতোই দারুণ যৈবন বাইর হয় কাপর ফারি ॥

আমি শাক তুলি এক এক মুঠো (অল্প অল্প) করে—কোঁচড় করি ভারি —'ঐ মতোই' দারুণ যৌবন (অল্পে অল্পে ভারি হয়) কাপড় আর তাকে আবৃত করে রাখতে সক্ষম হয় না।

যামোন বাইস্যার নদীত্ ভরিয়া ওটে জল্—
ঐ মতো নারীর যৈবন করে টলোমল ॥

যেমন বর্ষার নদী জলে ভরে ওঠে—'ঐ মতোই' নারীর যৌবন ভরে উঠে টলমল্ করতে থাকে।

ধু-ধু চরে কাশিয়ার ফুল পুবাল হাওয়ায় ঢোলে—
মোর নারীর অন্তরটা হায় ঢোলে যৈবন কালে ॥—

ধু ধু চরে কাশফুল যেমন পুবাল হাওয়ায় দোলে—'ঐ মতোই' আমার নারীর অন্তরটা হায় যৌবনকালে দুলতে থাকে।

লোকে যামোন ময়না পোষে পিঞ্জিরায় ভরেয়া—
ঐ মতো নারীর যৈবন রাখিচোং বান্দিয়া ॥

লোকে যেমন ময়না পোষে, পিঁজরায় ভরে রাখে (পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়) 'ঐ মতোই' নারীর (আমার) যৌবনকে আমি বেঁধে রেখেছি।

যৌবন অলক্ষ্যে এসে বাসা বাঁধে দেহে, মনে। রক্তে ছড়িয়ে দেয় তার দুর্দমনীয় প্রভাব। সামনে থাকে ন্যায়-নীতির দণ্ড হাতে সমাজ, আর সমস্যায় বিভ্রান্ত যৌবনক্লিষ্টা নারী। দেখা যায়, এই বিদ্রোহী [illegible]বিরা যেন

এগিয়ে এসে সে-যুগের নারীমনের অনুভূতির চিত্রগুলিকে সেই ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখানে কাল্পনিক রাধা-কৃষ্ণকে টেনে এনে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনবোধ করেন নি বা ধর্মীয় আবরণে ঢাকারও কোনো চেষ্টা নেই। প্রকৃতির মর্মেরই নগ্ন চিত্রাবলী কেবল মাত্র তুলে ধরাই হয়েছে —বিচারকের আসনে বসে 'রায়' দেওয়ার উদ্যোগ সেখানে নেই। সেই সঙ্গে এটিও লক্ষ্য করা যায়—বিধিব্যবস্থার স্রষ্টা সমাজ থেকেও কিন্তু কোনো বাধা সৃষ্টি হয় নি। বড় জোর শিল্পী ও গায়ক গোষ্ঠীকে 'বাউদিয়া' অর্থাৎ বাউণ্ডুলে নামে অভিহিত করে বিষয়টিকে যেন সমাজ নীরবে এড়িয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—সমাজ এ-ক্ষেত্রে নীরব কেন? তা হলে কি বলা যায় এই কবি-চিত্রকারদের—যৌবনের আশা, আকাঙ্ক্ষার—দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট সেই চিত্রাবলী সমাজের অস্বচ্ছ দৃষ্টি ভেদ করে স্বচ্ছরূপে দেখা দেওয়ার ফলেই এই নীরবতা?

তবে এই প্রশ্ন এখানে প্রশ্নই থাকছে। কারণ এই প্রবন্ধের তা আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে—চিত্রকার কবিদের বিষয়বস্তুতে। যার অধিকাংশই পুরুষের রচনা বলে মনে করা হয়। তবে তাঁরা পুরুষ হয়েও নারীমনের নিভৃত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে রূপদান করে গিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকা নিয়ে—আর নারীর বাচনেই সেগুলি পরিবেশিত করে।

তাঁদের প্রথম চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে—যুবতীকন্যার নিগূঢ় সমস্যাবলী জনসাধারণে প্রকাশ করা যখন সম্ভব হয় নি, বিভ্রান্ত যৌবন তখন কঠোর মনুষ্যসমাজকে এড়িয়ে তার দুর্বহ হৃদয়ভার লাঘবের প্রত্যাশায় শরণ নিয়েছে প্রকৃতিরই নির্বাক সন্তান নদী, গাছ ইত্যাদির কাছে। এখানে নারী একটি দীর্ঘকায় বৃক্ষকে সম্বোধন করে বলছে, 'বিরিক্ষো শিমিলা রে' তোমার ডালপালা গগনে বিস্তারিত অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারিত। তুমিই বলো এই রসভারাক্রান্ত যৌবনকে আর কতোকাল ধরে রাখা যায়?

ও বিরিক্ষো শিমিলারে—গগনে ম্যালে ঠাল্।
নারী হয়্যা রসের যৈবন রাইখ্‌বো কতকাল—
বিরিক্ষো শিমিলা রে॥

পাহাড়ে কান্দে 'মাল'ঘুগ্‌রা' রে—বিরিক্ষো মন যাওংযাওং করে
পরার পুষ্প পক্ষের ফুল—সদায় মনে পড়ে শিমিলা রে॥

বালুটিল্‌টিল্ পঙ্খী* কান্দে রে—বিরিক্কো বালুতে পড়িয়া—
ভাইটাল্ ব্যাপারী কান্দে—কিসের লাগিয়া শিমিলা রে ॥

করিতুল্লা শেখ। গৌরীপুর-আসাম। (১৯৫৫)

গানের অর্থ

ও বিরিক্কো শিমিলা—গগনে (সাধারণের ঊর্ধ্বে) তোমার ডালপালা বিস্তারিত (দৃষ্টি প্রসারিত)। নারী হয়ে এই রসভারাক্রান্ত যৌবনকে আর কতকাল আমি ধরে রাখবে।

পাহাড়ে (অর্থাৎ উচ্চস্থলে—নাগালের বাইরে) মালঘুগ্‌রার গুঞ্জরণে আমার মন যাই যাই করে। পদ্মফুলের মতো সেই পরপুরুষ সর্বক্ষণই আমার মন জুড়ে আছে।

'বালুটিল্‌টিল্' পাখী ডাকাডাকি করে 'বিরিক্কো' বালুচরের উপরেই বসে (যেটা স্বাভাবিক)। কিন্তু ভাটিদেশের ব্যাপারী হা হুতাশ করে কিসের লাগিয়া শিমিলা রে (কার জন্য)?

প্রশ্নের উত্তর মেলে না। সমস্যা-সমাধানে অপারগ অন্তরে প্রশ্ন তাই থেকেই যায়। তা হলে—"কি দিয়ে আমার এই নব যৌবনকে বেঁধে রাখবো?"—

আজি কি দিয়া বান্দিয়া রাইখ্‌বো রে—
আমার এ নয়া যৈবন রে!—
সোনা না হয়, রূপা না হয় যে—মালা গরেয়া গালায় দিব।
টাকা না হয়, পইসা না হয় যে—যৈবন বাস্‌কে তুলিয়া থুইবো ॥
আর তামা না হয়, কাসা না হয় যে—ও তাক্ ঘরে সেউতি* থুইবো।
মণি না হয়, মাণিক না হয় যে—যৌবন আঞ্চলে বান্দিবো ॥
গুয়া না হয়, পান না হয় যে—ঐ তাক্ অতিথক্ পরশিবো।
আর চালেরো কুমুড়া না হয় যে—ও তাক্ পরশীক বিলাবো—
না হয় চালে তুলিয়া থুইবো ॥
হায় হায় কি দিয়া বান্দিয়া রাইখবো রে—আমার পোড়া এ
যৈবন রে ॥

মহিলা শিল্পী। যশোদা রায়। গৌরীপুর। (১৯২৮)

গানের অর্থ

আজ কি দিয়ে আমার এই নবযৌবনকে বেঁধে রাখব? 'সোনা' কিংবা 'রূপা' নয়—যে মালা গড়ে গলায় দেব / 'টাকা' বা 'পয়সা' নয়—যৌবন বাক্সে তুলে রেখে দেব / আর 'তামা' 'কাসা'ও নয়—তাকে ঘরে গুছিয়ে রেখে দেব / 'মণি' 'মানিক'ও নয়—যে যৌবন আঁচলে বেঁধে রাখব / 'সুপুরি' 'পান'ও নয়—যে অতিথিকে তাই দিয়ে আপ্যায়িত করব / আর 'চালের কুমড়ো'ও নয়—যে পাড়া-পড়শিকে বিলিয়ে দেব—নইলে চালেই তুলে রেখে দেব / হায় হায়—কী দিয়ে বেঁধে রাখব আমার এই পোড়া যৌবনটাকে?

নিরুপায় মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। 'বনজঙ্গলের পাখীরাও যেখানে জোড়া-জোড়ায় ঘোরাফেরা করে—হায় রে নিঠুর বিধি—আমি কেন তবে সঙ্গীহীন—নিঃসঙ্গ?'

প্রাণ বাঁচে না যৈবন রে জালায় মরি ॥
উড়িয়া যায় রে সল্লী রে পঙ্খী, পড়ে জোড়ে জোড়ে—
হায় রে দারুণ বিধি মুঞি এ্যাকেলায় ঘরে রে ॥
লাউফুল কুমড়ার ফুল রে—সইন্ধ্যা[৩] হইলে ফোটে—
মোর আবাগীর মনের আগুন—বিছনায় শুইলে ওটে রে ॥
ল্যাপ দিয়া ঢাকিলে নেকেন[৪] যৈবন ঢাকা যায়!
কাপরের বন্দনে কিরে যৈবন বান্দা রয় রে ॥
কোলের বালুসক রে মুঞি পুড়িয়া করিম ছাই—
যেনা দ্যাশে দোসর মিলিবে—সেই দ্যাশোতে যাই রে ॥

বয়ান শেখ। গৌরীপুর-আসাম। (১৯৩২)

গানের অর্থ

প্রাণ বাঁচে না যৌবন জ্বালায় মরি / উড়ে যায় যে 'সরালহাঁস' তারাও জোড়া জোড়ায় বসে। হায় রে নিদারুণ বিধি—আমিই একলা ঘরে / লাউ কুমড়োর ফুল (যেমন) সন্ধ্যাকালে ফোটে (নিয়ম অনুযায়ী) আমার অভাগীর মনের আগুন (তেমনি) বিছানায় শুলেই জ্বলে ওঠে / লেপ দিয়ে ঢাকলে নাকি যৌবনকে ঢাকা যায় / আর কাপড়ের বন্ধনে কি যৌবন বাঁধা রয় / কোলের বালিসকে আমি পুড়িয়ে ছাই করব—যে দেশে আমার দোসর মিলবে—সেই দেশেতেই চলে যাব।

সমাজ ব্যবস্থা যেখানে নির্মম সেখানে সমাজ নির্ভর যুবতীকন্যার বিদ্রোহের আগুন অন্তরে জলে উঠে অন্তরেই নির্বাণ লাভ করে। অসহায় কন্যা লজ্জার বন্ধন ছিন্ন করে মমতাময়ী জননীর কাছে মিনতি রাখে—'মাগো আমাকে 'ব্যাচেয়া খা' অর্থাৎ বিয়ে আমার দেও মা বিয়ে দিয়ে দেও।'

আই মোক্ ব্যাচেয়া-খা[৬] হে মা—
গাবুর[৭] হয়্যা মন বান্দিয়া—নামায় হে রওয়া ॥
ঐ একদিনা আয়না দিয়া—দেখিচং মোর দেহাটা—
পরার ছাওয়া কোলাত্ নিলে—অকুমারী[৮]কু শোবায় না।
মনটা মোর পুড়িয়া রয়—
আবাগীর দুঃখের কতা কবারে মনায় না ॥
মাও মোক ব্যাচেয়া খা হে মা—
গাবুর হয়্যা মন বান্দিয়া—নামায় হে রওয়া ॥

বয়ান শেখ। গৌরীপুর (১৯৩৯)

গানের অর্থ

মাগো দাও—আমার বিয়ে দিয়ে দেও / যৌবনকাল আসলে মনটাকে বেঁধে রাখা যায় না / একদিন আয়না দিয়ে 'আমার' দেহটা দেখেছিলাম পরের ছেলে কোলে নিলে কুমারী মেয়ের মতো দেখায় না / মনটা আমার পুড়তেই থাকে—অভাগীর এই দুঃখের কথা বলতেও তো মন চায় না / মা আমার বিয়ে দেও—যৌবন আসলে মনটাকে বেঁধে রাখা যায় না।

সে ইচ্ছাও হয়তো পূরণ হয়। তা হলেই কি সমস্যারও সমাধান হয়? অশান্ত যৌবনের বহু স্বপ্ন সেখানে স্বপ্নই থেকে যায়। তাই যৌবন তখন সমাজ-নির্দেশিত সোজা পথ ছেড়ে নিজ নির্দিষ্ট আঁকা বাঁকা পথেই চলার চেষ্টা করেছে। সমাজ-ব্যবস্থাকে তুচ্ছ করে—সমাজের গণ্ডিকে ডিঙিয়ে চলেছে।

যৌবনের সেই অসামাজিক কার্যকলাপগুলিকে দেখা যায় দরদী কবি শিল্পীগণ তাঁদের নিজ অন্তরাত্মার বিচারে অর্জিত উপলব্ধির ভিত্তিতে—তাঁদের কথার ভাবের রং মিশিয়ে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থনে নয়—যৌবনের আবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার নিরাবরণ চিত্রসম্ভারকে তাঁরা সুরের দোলায় দুলে দিয়ে গিয়েছেন।

কোন্ বা আশায় থাকোং মোর প্রাণ-সোনা রে
সোনা বাপো-রে-ভাইয়ার ছাশে।
এ হেনা যুয়ান বয়সে রে—সোনা পতি নাই মোর ঘরে॥
বোনে কান্দে বনশুয়া মোর প্রাণ সোনারে কান্দে জোড়ার টিয়া
দইখ্না বাওয়ে মোর প্রাণ সোনা রে—সোনা যৈবন যায় বাড়িয়া॥
ফুল ফুটিলে মোর প্রাণসোনারে—দুরোত্ যায় রে বাস
মধুর লোভে কত ভোমর রে সোনা—ঘোরে আশোপাস॥
শাক তোলং মুঞি মুটি মুটি রে সোনা কোচর করোং ভারি—
ঐ মতো এই দারুণ যৌবন সোনা বাইর হয় কাপোড় ফাড়ি[৮]॥
কতো দিনে গেইচেন মোর প্রাণসোনারে দূর ছাশান্তরে
আর কতোদিন ঘুরিবেন মোর প্রাণসোনারে যৈবন না পাওং রাখিবারে॥

করিতুল্লা শেখ। গৌরীপুর (১৯০০)

গানের অর্থ

কোন আশায় থাকি 'আমার প্রাণসোনা' বাপ ভাইয়ের দেশে। এ হেন যৌবনকালে পতি আমার ঘরে নেই!—বনে 'বনশুয়া' ডাকছে—'জোড়ার টিয়া'রা ডাকাডাকি করছে, আর দখিনা বায় 'সোনা' আমার যৌবনও বৃদ্ধি-লাভ করছে। ফুল ফুটলে দূরে তার বাস ছড়িয়ে যায়। মধুর লোভে কত ভোমরা তার আশেপাশে ঘোরে।—আমি শাক তুলি মুঠি মুঠি (অল্প অল্প করে) কোঁচড় ভারি করি। ঐ মতোই এই নিদারুণ যৌবন (ধীরে ধীরে ভারি হয়ে ওঠে) কাপড় আর তাকে আবৃত করে রাখতে পারে না। কত-দিন হলো গিয়েছো আমার 'প্রাণসোনা' দূর দেশান্তরে—কতদিনে ঘুরে আসবে? এই যৌবনকে আর আমি ধরে রাখতে পারছি না।

হায় বিধি মোর এই ছিলো কপালে!—
কপালের দুষকো[৯] হায় রে কায় খণ্ডেবার পারে॥
যেমন বাইষ্যার নদী ভরিয়া উটে জল
ঐ মতো নারীর যৈবন করে টলোমল্॥
শিশুতে করাইচেন বিয়াও ছারিয়া গেইলেন ঘরে
পাকিচে ডালিমের ফল[১০] রে—পারিয়া খাইবে পরে॥
তোমার রঙের ফল খাইবে বাদুলে চুষিয়া—
বিছাশে পরিয়া রইলেন কার বা নাগা[১১] পাইয়া॥

ডালিমেরো ফল রে দেখিয়া চো'রের পাকাপাকি[১২]
আর কতোকাল রাখিম ডালিম চোরক্ দিয়া ফাকি ॥

মেঘী রায়। মুর্লা-আসাম। (১৯:৮)

গানের অর্থ

হায় বিধি আমার (কি) এই ছিলো কপালে? কপালের দুঃখ হায় কে খণ্ডাতে পারে। যেমন বর্ষার নদীতে জল ভরে ওঠে ঐ রকমই নারীর যৌবন টলমল্ করতে থাকে। (সেই) শিশুকালে বিয়ে করে (আমাকে) ঘরেতে ছেড়ে গিয়েছ। এখন ডালিমফল যে পেকে উঠেছে—পরেই সে ফল (এখন) খাবে। তোমার সাধের ফল (তা) বাদুড়েই অর্থাৎ পরেই চুষে খেয়ে নেবে। বিদেশে তুমি পড়ে আছ কার সঙ্গ পেয়ে? ডালিমের ফল দেখে (এখন) চোরেরা ঘোরাফেরা করছে। আর কতোকাল এই ডালিম 'চোর'কে ফাঁকি দিয়ে আমি রাখবো?

ও মুঞি কার আশে থাকোং দয়াল্ রে—
ও দয়াল্ বাপো ভাইয়ার দ্যাশে।
বাইষ্যা-কাল্ গেইল্ কান্দি কান্দি, বন্ধু মোর না আইসে ॥
(আর) আশ্বিন্মাসে 'দুর্গা পূজা'রে, আগোণ্ মাসে 'রাস্'—
ফাগুনমাসে 'ডোল্-সোয়ারী'[১৩] চৈত্ররে মাসে 'বাশ'[১৪] ॥
(আর) 'বাশ্ পূজা'ত্ ঐ জাগের গান[১৫] রে—ঐ না 'কসি'র[১৬] বাড়ী,—
টানিয়া পিন্দ্তে[১৭] ফাড়িল সাড়ী—যৈবন্ হইল্ মোর আড়ি ॥
(আর) যৈবনের চলে রে বন্ধু ভাসিয়া যায় মোর গাও—
কতদিন হইল বাণিজে যাবার দ্যাশে ফিরান্ নাও ॥

পিসু রায়। আপমাণ-আসাম। (১৯২৮)

গানের অর্থ

আমি কার আশায় থাকি 'দয়াল' (ভগবান) বাপ ভাইয়ের দেশে। বর্ষাকাল কেঁদে কেঁদেই গেলো, বন্ধু আমার আসে না। আশ্বিন মাসে 'দুর্গাপূজা', অগ্রহায়ণ মাসে 'রাস'। ফাল্গুনমাসে 'দোলে'র মেলা, চৈত্র মাসে 'বাশ পূজা' (বন্ধু তখন এলো না)। বাশপূজায় 'কসি'র বাড়িতে (ঐ উপলক্ষে) 'জাগের গান'। (সেখানে যাবার কালে) টান করে শাড়ী পরতে গিয়ে—তা ছিঁড়ে আমার (আবৃত) যৌবন 'আড়ি' অর্থাৎ দৃষ্ট হলো। যৌবনের চলে বন্ধু (দেখি) আমার দেহ ভেসে যাচ্ছে। কতোদিন হয়ে গেল

বন্ধু তোমার বাণিজ্যে যাওয়ার—এখন দেশের দিকে তোমার নৌকো ফেরাও।

'যাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে।'—কন্যা তার আকাঙ্ক্ষিত 'শ্যাম কালিয়া'কে আহ্বান জানায়। 'যাইও-যাইও' অর্থাৎ 'অবশ্যই' যেও কালা আগুন সংগ্রহের ছলে। (তোমাকে আমি জানি) তোমার উজানে বাড়ি (আমার পরিচয়) আমি বালবিধবা নারী। এর পরে কালার দেহ সৌষ্ঠব ও সাজসজ্জার ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কন্যাও যে কোন অংশে 'খাটো' নয়, তারই ব্যখ্যা নিয়ে এই গান—

ও শাম কালিয়া রে—ওকি যাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে ॥—
তোর কালার উজানে বাড়ী, মুঞিও নারী চিটুল-রাঁড়ী[১৮] রে।
তোর কালার বাবরী রে চুল, মোরো যৈবন হলুস্থূল[১৯] রে।
তোর কালার মুকে রে হাসি, মোরো নারীর দাতে মিশি রে।
তোর কালার জোড় ভুরু, মোরো নারীর কমোর সরু রে।
তোর কালার 'সেঁওলাই ধুতি', মোরো নারীর হাতে 'মুটি' রে।
তুঁইও কালা যামোন দান্তাল হাতী, মুঞিও নারী তামোন ভরযুবতী রে।
নারীর কপালে ফুস্‌কি হানা[২০]—ভাসিচোং সাগরের পানা রে।
যাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে ॥

পেয়ারী রায়। গৌরীপুর। (১৯২৯)

গানের অর্থ

তোর কালার (সৌখীন) বাবরি চুল, আমারো যৌবন 'হলুস্থূল' (উদ্দাম-উচ্ছ্বসিত)। তোর মুখেতে যেমন হাসি আমার আবার (উপরন্তু) দাঁতে মিশি। তোর জোড়া ভুরু আমারও কোমর সরু। তোর পরণে (বাহারি) সেঁওলাই ধুতি—আমারও হাতে (বাহারি গহনা) 'মুটি' অর্থাৎ মুঠি। তুই কালা যেমন দান্তাল হাতীর মতো শক্তিমান—আমিও তেমনি ভরযুবতী (আমারও শক্তি কম নয়)॥ নারীর অদৃষ্টের বিপাকে—আজ আমি সাগরের পানার মতোই ভেসেছি।

যাইও যাইও কালা—আগুনেরো ছলে।

কয়েকটি আঞ্চলিক শব্দের অর্থ

১. মালঘুগরা=একপ্রকার পাহাড়ী ঝিঁঝিঁ **(Cicada)**।
২. বালুটিলটিল্ পঙ্খী=জলের ধারের 'বাটান' পাখী **(Sand-piper)**।

৩. সেউতি=গুছিয়ে। সেউতি থুইবো=গুছিয়ে রাখবো।

৪. সইন্ধ্যা=সন্ধ্যাকাল।

৫. নেকেন্=নাকি।

৬. ব্যাচেয়া খা—বিয়ে দিয়ে দেও। বিয়ে দেও।

৭. গাবুর=যুবতী, যুবক। গাবুর হয়া=যৌবন আসলে। যুবতী হয়ে।

৭. (ক) অকুমারী=কুমারী। ('অ' যোগে অনেক উল্টো কথা এই-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

৮. ফাড়ি=ছিঁড়ে।

৯. দুখ্কো=দুঃখ।

১০. ডালিমের ফল=রূপকরূপে 'যুবতী নারীর স্তন'। এখানে 'যৌবন' বলা যেতে পারে।

১১. নাগা=সঙ্গ।

১২. পাকাপাকি=ঘোরাঘুরি।

১৩. ডোল সোয়ারি=দোলপূজার মেলা।

১৪. বাশপূজা=আঞ্চলিক 'মদন'পূজা।

১৫. জাগের গান=বাশপূজা উপলক্ষে পালাগান।

১৬. 'কসি'=ব্যক্তিবিশেষের নাম।

১৭. পিন্দতে=পরতে।

১৮. চিটুলরাড়ী=বালবিধবা।

১৯. হলুস্থূল=উদ্দাম উচ্ছ্বসিত।

২০. ফুস্কি-হানা=বিপাক বিড়ম্বনা।

সংযোজন

এই নিবন্ধের গানগুলির সংগ্রহকাল বিশ থেকে চল্লিশ দশকের মধ্যেই। সে সময় যে গায়কদের সামনে বসে এই গান শুনেছি এবং তার অর্থ না-বোঝা অংশগুলির অর্থ বুঝে নিয়েছি, তাঁরা আজ সকলেই চলে গিয়েছেন, তাঁদের রত্নসম্ভার বিলিয়ে দিয়ে। তাঁরা ছিলেন আসামের পশ্চিম প্রান্তবর্তী 'ভাওয়াইয়া অঞ্চল'-এরই অধিবাসী। প্রতিটি গানের শেষে যে-গায়কের কাছ থেকে গানটি সংগৃহীত তাঁর নাম, বাসস্থান ও সংগ্রহের সময় উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বকালের এইসব গানের কতকগুলি

আর শোনা যায় না। আবার কিছু গানের কথা পরিবর্তিত বা যুক্ত হয়েছে, কিন্তু অর্থহীন হয় নি। আবার কিছু অমনোযোগী গায়ক সুর ও ছন্দের ধারা হয়তো বজায় রেখেছেন কিন্তু তার বাক্য ও ভাবমূর্তির প্রতি দৃষ্টি রাখেন নি। ফলে সেগুলি অর্থহীন মনোমত কথা বসিয়ে একটি বিকৃতরূপ নিয়েই পরিবেশিত হয়ে যাচ্ছে। এই ভুল বা বিকৃতির অবশ্যই কিছু কারণও আছে। এই অলিখিত গান শুনে ভুলে যাওয়া বা ভুল শোনা কিংবা মুখে-মুখে পরিবর্তিত হওয়াও বিচিত্র নয়। বর্তমানের গায়করা অধিক ক্ষেত্রে গানের সুর ও তালের প্রতিই যেন বেশি আগ্রহশীল। তার ফলেই পূর্বকালের রচিত গানগুলিতে এখন এই সামঞ্জস্যহীন কথার হয়তো এতো আধিক্য দেখা যায়।

পারভেজ শাহেদী স্মরণে

রণেশ দাশগুপ্ত

খেতে খামারে আজ চাই গোলাজাত করা আংরা,
চাষির শিরায় শিরায় রক্ত আরও গরম হওয়া চাই।

ফরহাদ কি করে খুন হলো তা যারা বুঝেছে তারা আজকে
বাদশা খসরুর মতলবগুলোকে খতম করুক।

মজুরের কপালের ঘামের বিন্দুরা আজও ঘোলাটে
খাটুনির চারিভিতে নিশির ঘোর আজ আলো নিয়ে আয়।

তোর গলার শিরাগুলোতে যৌবনের রক্তধারা, ওরে পারভেজ
শহীদদের নামের দায় মেটা।

পারভেজ শাহেদীর শেষপর্বের একটি গজলের কয়েকটি পংক্তির তর্জমা

১

স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্যে আমাদের উপমহাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের নিরন্তর লোক-অভ্যুদয় উর্দু কাব্যে শৈলী ও বিষয়বস্তুর যে রূপান্তর ঘটিয়েছে, তার পুরোধা কর্মীশিল্পীদের একজন পারভেজ শাহেদী। জন্ম ১৯১০, মৃত্যু ১৯৬৮ সাল।

তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ। প্রথমটি 'রাকসে হায়াত (জীবননৃত্য) বেরিয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। দ্বিতীয়টি 'তসলিসে হায়াত' (জীবন-ত্রয়ী) প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর কিছুদিন পরে। এই দ্বিতীয় সংকলনের ভূমিকা কবির নিজে করা। ভূমিকাতে কবির স্বাক্ষর রয়েছে ১৯৬৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে। তাঁর মৃত্যু ৫ই মে। এই বই প্রকাশের ঘটনা অনেকটা সুকান্তের 'ছাড়পত্র' কাব্য গ্রন্থের মতো। পারভেজ শাহেদী সম্ভবত সুকান্তের মতো তাঁর বইটিকে আধাঁধানো অবস্থায় দেখে গিয়েছেন।

চল্লিশের দশকে যখন পারভেজ শাহেদীর কবিতার কোন বই বেরোয় নি, তখনই তিনি এসেছেন আধুনিক উর্দু কাব্যের সামনের সারিতে। উর্দু কাব্যের বাইরেও তিনি পরিচিত ও আদৃত হয়েছেন। তবে প্রথম বই 'জীবন নৃত্য' যেমন তেমন করে প্রকাশিত হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা ছিল। সেই জন্যে কবি খুব যত্ন করে প্রধানত ১৯৫৫ সালের পরে লেখা নজ্‌ম ও গযল (কবিতা ও গান) এবং এই সঙ্গে অগেকার বই থেকে কিছু নজম ও গযল নিয়ে 'তস্‌লিসে হায়াত' সংকলনটি তৈরি করেন। প্রাণমন ঢেলে ভূমিকা লিখেছিলেন তাঁর কাব্যদৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে। 'তস্‌লিসে হায়াত'কে তাই পারভেজ শাহেদীর জীবন ও কাব্যের প্রতিভূ বলা যেতে পারে। 'তস্‌লিসে হায়াত' গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে এই নামের একটি দীর্ঘ ধ্রুপদী কবিতার নামে। এই কবিতাটি তাঁর শিশু কন্যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা পারভেজ শাহেদীর জীবনদর্শন। কন্যা এবং তার বাবা ও মাকে নিয়ে যে জীবনত্রয়ী, তার বিকাশকে কবি দেখেছেন বিশ্বভুবনের ত্রয়িত্বের অবিশ্রান্ত প্রসার ও বিকাশে। পদ্ধতির দিক থেকে এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র মিল রয়েছে। তবে মর্ম ভিন্ন।

'তস্‌লিসে হায়াত' থেকে উপাদান নিয়ে কমরেড কবি পারভেজ শাহেদীকে স্মরণ করছি।

২

'পারভেজ শাহেদী' হচ্ছে কবিতা লেখার জন্যে নিজের দেয়া নাম। পারিবারিক নাম সৈয়দ একরাম হোসেন। পাটনা নগরীতে জন্ম। পরিবারটি ছিল একদিকে অভিজাত, আবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন। পারভেজ শাহেদী ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এইজন্য আদর পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। বাড়িতেই লেখাপড়া শুরু করেন। আরবী এবং ফার্সীতে পাকা হয়ে ওঠেন। কবিতা লিখতে এবং কবি সমাজে কবিতা পড়তে ছেলেবেলা থেকেই উৎসাহ ও শিক্ষা পেয়েছিলেন ধ্রুপদী ও গযল কাব্যের ওস্তাদদের কাছে। এইভাবেই লিখতেন কবিতা। ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর পাটনার কলেজে ভর্তি হয়ে আই এ. বি এ এবং সর্বশেষে ফার্সী ও উর্দুতে এম এ পাশ করেন। আইনের পাঠও শেষ করেছিলেন। বি এ পড়বার সময়ে দেশে গণঅভ্যুত্থান এবং বিশ্বের নানা জায়গায় যে নতুন ভাবনা চিন্তার হাওয়া এনেছিল, তাতে সাড়া দিয়েছিলেন পারভেজ শাহেদী এবং এই জন্যে কবিতায় নতুন রীতির এবং বিষয়বস্তুর খোঁজ করছিলেন। লিখতেও শুরু করেছিলেন নতুন ভাবে। ১৯৩৫ সালে একটা মানসিক আঘাত পেয়ে পাটনা ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এখানে নতুন জীবন যাপন করার চেষ্টা করলেন অতীতের সবকিছু মুছে ফেলে দেবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে। একটা মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা। তারপর থেকেই শিক্ষকতার লাইনে। হেড মাস্টার হলেন। ১৯৩৮ সালে বি টি পাশ করলেন। ১৯৪১ সালে মেদিনীপুর কলেজে উর্দুর অধ্যাপক। সেখানে রইলেন ৪৬ সাল পর্যন্ত। এই মেদিনীপুরেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয়ে বক্সা বন্দী শিবিরে। দেড় বছর জেলে কাটাবার পর আবার হেড মাস্টারের চাকরি। প্রথম দুই বছর খুবই সঙ্গীন আর্থিক অবস্থা। এরপর একটা বড় রকমের হাইস্কুলে হেড মাস্টারির নিশ্চিত জীবিকা। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগে অধ্যাপক। এখানেই মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করেছেন।

৫৮ বছর বয়সে পারভেজ শাহেদী তাঁর 'জীবন-ত্রয়ী' (তস্‌লিসে হায়াত) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এই পরিচয়টি দাখিল করেছেন তাঁকে বুঝবার সুবিধা

করে দেবার জন্যে। এটা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বের দিক। এই সঙ্গেই তাঁর বিশেষ কবিচিত্তের একটা কৈফিয়ত দাখিল করেছেন। এই কৈফিয়তটি নিম্নরূপ :

"আমি কে? আমি কি? আমি নিজেই কবে নিজেকে চিনতে পেরেছি যে আমি আমার বন্ধু ও বৈরীদের কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবো?

আমি এখনও এমন একটা বিশ্বকে যাচাই করে নিজে দেখে উঠতে পারি নি যে, এই যাচাই-এ আমি অন্যকে নেমন্তন্ন করবো এবং তাতে যোগ দিতে অন্যকে পরামর্শ দেব। তবে নিজেকে চিনবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও সফল হইনি, হতাশও হইনি। আমি সেই সব ভাগ্যবানদের একজন নই, যারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষার জগতে স্বচ্ছন্দে গতায়াত করে তার অন্ধকার পাতাল কক্ষগুলোও উঁকি দিয়ে দেখে অনায়াসে স্বস্থানে ফিরে এসে সেগুলোর কথা লিখতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে আমার নিজের এমন ক্ষমতা নেই যে, নিজের অনুভবে আশ্রিত আমার অস্তিত্বকেই আমার অস্তিত্ব বলে ধরে নেব। আমি অবশ্য আমার অস্তিত্বকে প্রমাণিত করার ইচ্ছা রাখি। বলা বাহুল্য সেটা শুধু ইন্দ্রিয়বীক্ষণ দ্বারা ঘটবার নয়। আমার বাইরের যে জগৎ, তার সাহায্যেরও দরকার রয়েছে। আমি মনে করি, দুনিয়াটাকে বুঝতে না পারলে মনের রহস্যের জগৎকে নিয়ে ধ্যানধারণা সফল হতে পারে না। কম-সে-কম এটাই আমার চিন্তা।

নিজেকে চিনবার প্রচেষ্টার এই পদ্ধতি আমাকে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। এ কারণে, সমসাময়িককালে, যখন আমার বন্ধু এবং বৈরীদের কোনো কোনো মহলে 'পরহিত ব্রত' সাহিত্যের ক্ষেত্রে হানিকর বলে চিহ্নিত হচ্ছে, তখন আমি এই হিতৈষণার প্রাণ-দায়ী প্রেরণারই প্রবক্তা। চিন্তার স্বাধীনতার নামে যেসব দাবি-দাওয়া করা হয়, আমার দিক থেকে আমিও সেই স্বাধীনতা চাই।

আমার জীবন হোক কিংবা কাব্য হোক, আমি দুটোরই সাহায্যে নিজেকে চিনবার চেষ্টা করে এসেছি। যা চেয়েছি তা পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও পরাজয় স্বীকারে আমি রাজি হই নি। আমি শুধু জীবনের অপরিচিত ও অচেনা কোণা-খন্দগুলোর ব্যাখ্যার অধিকারী হতে চাই নি। বারংবার দেখা দুনিয়াটার কাছ থেকেও নতুনতর ব্যাখ্যা পাবার সন্ধানে রয়েছি।

যদি শুধু নিজের হৃদয়ের আর্শিতেই নিজেকে না দেখে অন্যের চোখে উঁকি দিয়ে নিজের চেহারাটাকে দেখতে পারি, তবে তার চাইতে আর ভাল কি হতে পারে ?"

এরপরে পারভেজ শাহেদী তাঁর কাব্যকে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করেছেন 'রিক্তের সম্পদ' বলে। তিনি বইটিকে উৎসর্গ করেছেন "সেই আওয়াম বা সাধারণ জনগণের নামে যাদের 'ঘাম' হিসেবে চিহ্নিত বিত্তবান লোকেরা তাদের দরবারে ঢুকতেই দেয় না।"

কিন্তু পারভেজ শাহেদী কি তাঁর নম্রতা ও আতিশয্য-বিরহিত কোমলতা নিয়ে শরিক হতে পেরেছেন এই বিপ্লবের শতাব্দীর জনগণের মনের বিশালতা ও গভীরতার কবি হিসাবে ?

'তস্‌লিসে-হায়াত' কাব্যের লেখাগুলি এবং এই লেখাগুলির ক্রমপ্রসারমান বপ্লবিকতা হচ্ছে এর উত্তর। এই কাব্য আজ এবং আগামীকালের কাব্য।

৩

'তস্‌লিসে হায়াত' বা জীবনত্রয়ী বইখানিতে তিনটি কালক্রমিক বিভাগ রয়েছে : (১) ১৯৫০ সালের আগে। (২) ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত। (৩) ১৯৫৫ সালের পরে। প্রত্যেকটি বিভাগে দুটি অংশ। প্রথমে গয্‌ল বা গান, তারপরে কবিতা বা নজর।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গানেরই হোক অথবা কবিতারই হোক, একটা সংযোজক সূত্র লতিয়ে উঠেছে ফুল ফুটিয়ে। সেটা হচ্ছে প্রিয়ার বিরহের দুঃখ থেকে বিশ্বের বিরহের দুঃখে উত্তরিত চেতনা। কৃষণ চন্দর উর্দু 'দোষ' গল্পেও একে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সূত্রটা হচ্ছে, 'গমে জানান সে গমে জাহান'। এ কথাটাকেই পারভেজ শাহেদী কাব্যে প্রয়োগ করেছেন, বোধকরি প্রায় একশবার। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম সাম্যবাদী সমাজ গড়ার সংগ্রামে উত্তরিত হয়েছে। এই উত্তরণে পারভেজ শাহেদীও স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী সমাজকে আলাদা আলাদা পর্ব হিসেবে দেখেন নি, যেমন প্রিয়তমার প্রেমকে এবং গণ-মানুষের জন্যে আত্মোৎসর্গের ভাবকে তিনি আলাদা করেন নি। প্রকৃতিকে মানুষ থেকে আলাদা করেন নি। বিপ্লব এনেছে এদের দুইয়েরই বিন্যাসে গুণগতভাবে নবনব উত্তরণ।

এখানে সাগরের দিকে ধেয়ে চলা একটা নদীপ্রবাহের মতো গতিময়তা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। পারভেজ শাহেদী এই

গতির স্রষ্টা ও চালয়িতা এবং এর নির্দিষ্টতার কারিগর হিসেবে সামনে চেয়েছেন মানুষকে। তাঁর কাছে আদম এবং ঈভ যে স্বর্গচ্যুত হয়েছিল সেটা ভালই হয়েছিল। মর্তে শুরু হয়েছিল গম আর যব নিয়ে আদম ও ঈভের এবং তাদের সন্তানদের সংসার। এই সংসারই মানবসমাজ। বহু বিপর্যয় কাটিয়ে সাম্যবাদী সমাজের দিকে দৃঢ়পদে মানুষ বিচক্ষণ ও কল্পনা এবং সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দুর্দমনীয় গতিতে এ ব্যাপারটা ঘটছে। এটাই হচ্ছে পারভেজ শাহেদীর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'জীবননৃত্য' এবং 'জীবনত্রয়ী'র সঞ্চালক প্রেরণা। মানুষের সর্বাত্মক মুক্তির প্রেরণা।

এখানেই পারভেজ শাহেদী কমিউনিস্ট জীবনদর্শন বা মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী গতিধারার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনকে গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন।

কবিজীবনের শুরু থেকেই মানবতার অবিশ্রান্ত যাত্রা ও তার গণ্ডী ভেঙে ভেঙে চলার এবং অচলায়তনের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত বিদ্রোহের ভাবধারা নিয়ে কাজ করার দরুন পরবর্তীকালে আপন করে নেয়া মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী গতিধারার দর্শনকে কাব্যে প্রয়োগ করেছেন তিনি একান্ত স্বচ্ছন্দে।

উর্দু ধ্রুপদী কাব্যের ইউসুফ জুলেখা এবং শিরী ফরহাদ পারভেজ শাহেদীর কাছে অতীতের প্রতীক না হয়ে এই জন্যেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতীক হয়েছে। এরা মূর্তিমন্ত বিদ্রোহ। পারভেজ শাহেদী তাঁর কবিতা, গযল-গান এবং গযল দর্শনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন মুক্তি ও সাম্যের লড়াইকে। তাঁর কবিতার কয়েকটি পংক্তি তাঁর এই নতুন রূপসৃষ্টির পরিচায়ক :

> 'আমি আমার হৃদয়ের অস্থিরতাকে
> ভরে দিয়েছি যন্ত্রশিল্পের বুকের মধ্যে।
> আমি লোহা আর ইস্পাতকে
> গজলগায়ক করেছি।'

অথবা আর দুটি পংক্তি, যেখানে তিনি বলেছেন শুধু নির্বিশেষকে নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের বিপরীত উপাদান নিয়ে তিনি কাজ করতে চান :

> 'গম আর যবের পৃথিবীতে
> আমি ফুল বুনবার কাজ নিয়েছি।'

নিবন্ধের শুরুতে পারভেজ শাহেদীর একটি গযলের যে কয়েকটি পংক্তি তর্জমা করে দাখিল করেছি, তা থেকেও বুঝতে পারা যাবে, 'তসলিসে হায়াত' এবং 'রাকুসে হায়াত'-এর কবির বিদ্রোহটা কি ধরনের।

৫০ থেকে ৫৫ সালের মধ্যে লেখা একটি গযলের দুটি পংক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ! 'কালের বিপ্লবের ঝুমুরের শব্দে যারা ভয় পায় তাদের কি করে বোঝাবো ক্রমবিকাশের নৃত্যের অর্থ কি?'

কোন কোন সময়ে অবশ্য মনে হয়, বসন্ত ঋতু, বুনো গোলাপ, সাদা গোলাপ, রাঙা ফুলের বড় বেশি ছড়াছড়ি। শেষের পর্যায়ে একটি কবিতার নাম 'ওরে কলম, ফুল ফোটা'। ফুল কিন্তু তাঁর বাস্তবতাবাদের মুখোমুখি হবার সহায়ক হয়েছে। ফুল এবং বসন্ত ঋতু তাঁর কাছে আশাবাদের প্রতীক। কিন্তু এখানেও তিনি স্বপ্নচারী নন।

'তসলিসে-হায়াত' নামের মূল কবিতাটিতে তিনি শিশুকন্যাকে সম্বোধন করে বলেছেন,

> 'ফুলের বাগান যখন আগুনে আর ধোঁয়ায় ঢেকে যায়
> তখন ফুলের মুখ থেকেও বারুদের গন্ধ আসে।'

'তস্‌লিসে হায়াত' কাব্যগ্রন্থের তিনটি পর্বেই রয়েছে মূর্ত জীবন, সংগ্রাম, জয়, পরাজয়, নব নব উপাদানের বাস্তবতা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫০ সালের আগের তিনটি কবিতা—'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ', 'হিমালয় কন্যা' (গঙ্গা) এবং 'ষড়যন্ত্র' (কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একদিন)। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বাধীনতার জন্যে আত্মোৎসর্গ ও যুক্তিনিষ্ঠার প্রতীক। 'হিমালয় কন্যা' কবিতায় গঙ্গা নদী পরাধীনতার বন্ধনে জর্জরিতা শৃঙ্খলিতা। তাই ডাক রয়েছে এ কবিতায় বিদ্রোহের। 'ষড়যন্ত্র' কবিতাতে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের যোগসাজশের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জানিয়েছেন কবি। এই পর্যায়েই আরেকটি কবিতা আছে 'জিয়াফত' বা ভোজসভা। এ কবিতায় রয়েছে গণবিমুখ আত্মবিক্রয়কারী লেখক ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ। 'আগামী বীণা' কবিতাটির তর্জমা পরিশিষ্টে গঠিত। এই ভাবেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে মূর্ত ও বাস্তব জীবন ও লড়াই-এর কথা বলেছেন কবি। দ্বিতীয় পর্বে 'দাওয়াত' (আমন্ত্রণ) কবিতাটিতে রয়েছে পাকিস্তানের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা এবং জনগণের প্রতি মমতা। এই পর্বেই রয়েছে 'তজ্জাদ' (সংঘাত)। এতে রয়েছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পদে পদে মোকাবিলার কথা। তৃতীয় পর্বের দুটি কবিতা 'আমি ও আমরা' এবং 'বন্দী গান'। এই

দুটি কবিতার তর্জমা করে পেশ করেছি পরিশিষ্টে। এই দুটি কবিতা পড়লে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, পারভেজ শাহেদী মূর্ত ও বাস্তবের কত বড় একজন প্রবক্তা। এই তৃতীয় পর্বেই রয়েছে পারভেজ শাহেদীর বিপ্লবী কাব্যের প্রধান উপাদান। ধর্মীয় গোড়ামির এবং বিভেদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও তীব্রতম ঘৃণা। এ প্রসঙ্গে 'ব্যাঙ্ক' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

> 'এই সব আরাধনার আলয়গুলো
> এরা সবই ব্যাঙ্ক। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর
> দোহাই দিয়ে বলছি।
> বাঁকে বাঁকে এদের রাষ্ট্রনীতির খবরদারি।
> এখানে আমাকে রোজ চেকের মতো ভাঙানো হয়।
> এখানে তোমাকেও রোজ তেমনি করে
> ভাঙানো হয় চেকের মতো।'

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার পারভেজ শাহেদীর সীমাহীন ক্ষোভ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মতোই জ্বালাময়। পারভেজ শাহেদী মূলত সেই গণঐক্যের কবি, যা কমিউনিজমের সাম্যবাদী মানবসমাজের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংহতির সঞ্চালক শক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তথাকথিত অস্তিত্ববাদী দর্শনের একাকিত্বের ও বিচ্ছিন্নতার কোনো আবেদন পারভেজ শাহেদীর ওপর আঁচড় কাটতে পারে নি। পারভেজ শাহেদী ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ ও স্বাধীনচেতা। কিন্তু জীবনের শুরুতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব এবং পরবর্তী পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সাহচর্য তাঁকে 'সকলের জন্যে এক এবং একের জন্যে সকলে'র আদর্শ সমাজের লক্ষ্যে নিয়োজিত করেছিল। তাঁর গযল এবং মসনদ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে বহুত্বের মধ্যে একের এবং একের মধ্যে বহুত্বের বিকাশের সার্থকতার তাগিদ। বিপ্লবের সংগ্রামীদের অনৈক্য তাঁর হৃদয়কে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে দিতো :

> 'চোখের জল থেকে বয়ে যাচ্ছে কত অসংখ্য নদী।
> কত ভালই না হতো যদি এদের কেউ বলে দিতো
> সামনে মোহানা কোথায়।'

পরিশিষ্ট

পারভেজ শাহেদীর তিনটি কবিতার তর্জমা :

আমি ও আমরা

প্রতিবেশীদের ঘরে আগুন লেগেছে
আমার ঘর ভরা তার ধোঁয়ায়।
প্রতিবেশী জানাচ্ছে আর্তি
আমার অন্তর বাহির কেঁপে উঠছে
দুঃখে জর্জরিত হয়ে।

আমার হৃদয়ের আশেপাশে এখন
কোটি কোটি হৃদয়ের বাসা
আমি একা কিংবা আমি কোটি কোটি
পৃথিবীটা আমার ঘরের আঙিনা।

দুনিয়ার দুঃখ ঠোঁট টিপে হাসছে
আমার চোখে চোখ রেখে
কোটি কোটি চোখে চোখ রেখে
আঁধার নিস্কৃতির ভোর হওয়াকে দেখছে।

আমার হৃদয়ের বিশাল বিশ্বে
আছে আমার নিজের দুঃখ
পরের দুঃখও
আমি যখন থেকে আমাকে আমরা বানিয়েছি
নিজেকে হারিয়েছি, নিজেকে পেয়েছিও।

আগামীর বীণা

কত না মূর্তি যাদের এখনও খোদাই করা হয় নি
পাথরের মধ্যে ছটফট করছে তারা।
কত না অফোটা গোলাপ ফুলের কুঁড়ি
বুলবুলকে করে তুলছে উদ্বিগ্ন।

কত না অদেখা আলোর রশ্মি
এখনও পর্দার আড়ালে মুচকি মুচকি হাসছে।
কত গীতমালাতে এখনও
হয় নি সুর তোলা
হৃদয়ের তারে তারা লেপ্‌টে রয়েছে।
কত প্রদীপ আজও জ্বালা হয় নি
রাত আসতেই যারা উঠবে ঝলমলিয়ে।
আগামীর বীণার তারে
কে ছোঁয়ালো আঙুল ?
মুহূর্তেরা তা নইলে গুনগুনিয়ে উঠছে কেন ?

বন্দী গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মাকে সম্বোধন করে

তোমার শতবার্ষিকী স্বদেশবাসীদের জন্যে শুভ হোক
এই আলোকবর্ণী ফুলমেলার উদ্যানের শুভ হোক
কুসুমকুঞ্জের জন্যে হিম ও শিলামুক্ত আকাশ শুভ হোক
বাংলার চঞ্চল স্ফুলিঙ্গদের অভ্যুদয়ের শুভ হোক।

কিন্তু হে ঠাকুর মনে রেখো তোমার প্রশস্তিবাণীও রাজনীতি
যেমন লোভ ও লালসার বরপুত্রদের ফুলের ডালিতেও রাজনীতি।
তোমার গানের তাঁবু যে দড়ি দিয়ে মাটির সঙ্গে বাঁধা
তাকে ওরা কেটে দেয়
পৃথিবীর ধুলার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটাকে
ওরা মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেয়।
তোমার গানের মাটির মর্ম থেকে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়
তোমার ঘরোয়া আলাপে ওরা অধরা রং চড়ায়
ওরা অপার্থিব রং চড়ায় বর্ণ ও গন্ধের মেঠো পৃথিবীতে।

অথচ তোমার কণ্ঠ ছিল পার্থিব
তোমার গলার স্বর ছিল পার্থিব

তোমার বীণা ছিল পার্থিব,
এই বীণায় তোমার যে আঘাত তাও পার্থিব ছিল
তোমার মেজাজও ছিল পার্থিব
তোমার কল্পনাও ছিল পার্থিব
তোমার গানও ছিল পার্থিব
তোমার আকাশে ডানা ছড়ানো ছিল পার্থিব
তোমার আকাশের জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর গর্ভ থেকে
মাটির মানুষের অভ্যুদয় ছিল
তোমার কাব্যের বিষয়বস্তু।
বিশ্বপরিচয় নিয়ে তোমার ধ্যানে
তারাদল বিঁধে-বিঁধে রয়েছে।
তোমার পায়ে এসে ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়েছে
নভোমণ্ডলের দৃশ্যমালা।
প্রকৃতি তোমাকে ইশারা দিয়েছে
মহাশূন্যের বাইরে থেকেও।
দশ দিগন্ত জুগিয়েছে তোমাকে রহস্যময় রূপকল্প।
তবু তোমার পথ চলা ছিল পার্থিব
তোমার চলার-পথ ছিল পার্থিব।

তোমার অনুভবগুলি ভরপুর ছিল
শৈশবের সারল্যে।
প্রত্যেকটি কবিতার পরতে পরতে উন্মুখর ছিল
যৌবনের অস্থিরতা।
সমস্ত গানে প্রকাশিত ছিল প্রবীণের সুষম জ্ঞান।
সমকালীন ছিল গুঞ্জরিত জীবন, চিন্তা, রূপ।
তুমি সমবয়সী ছিলে সমস্ত গোলাপের
তুমি সমবয়সী ছিলে সমস্ত ফুলবাগিচার
সমবয়সী ছিলে তুমি
মানব মনের বীণার সকল সুরের।

তুমি প্রাচ্যের বীণা হাতে তুলে নিয়ে

কী অপূর্ব 'পূরবী' বাজালে
তাতে তুললে কালের ঝঙ্কার
বাজালে আমাদের রাগিণী
আলোর নামে বাজালে
জীবনের নামে বাজালে
বাজালে সেই সুর যার প্রয়োজন ছিল
চিন্তার জন্যে দৃষ্টির জন্যে।
এইভাবে প্রাচ্যের সঙ্গীতে
ভরে দিলে প্রতীচ্যের সুর
কালের হৃদয়ের সমস্ত স্পন্দনকে যেন টেনে নিলে তুমি।

জালিয়ানওয়ালাবাগে সদর্পে অনুষ্ঠিত
ধ্বংস ও হত্যার বিরুদ্ধেই হোক
অথবা ফিরিঙ্গী ব্যাধের শিকার ধরার ছলাকলার
বিরুদ্ধেই হোক,
অথবা ফ্যাসিবাদীদের দানবীয় চালের
নির্লজ্জ জল্লাদির বিরুদ্ধেই হোক,
অথবা সামন্ত রাজসভার মাথাভারি
মন্থর পীড়নের বিরুদ্ধেই হোক,
প্রত্যেকটা লড়াইয়ে
নির্ভয় থেকেছে তোমার মানুষের প্রতি প্রীতি
তোমার বাঁশরী স্তব্ধ হয়নি ঝড়ের গর্জনের মধ্যেও।

স্বদেশের ললাটে যে দীপ্ত মহিমার নক্ষত্রপুঞ্জ,
ওরা তোমার গানের ইন্ধন
ওরা কবিতার স্ফুলিঙ্গ
ওরা আলোকিত ইশারা
ওরা আলোকিত অর্থময়তা
ওরা তোমার হৃদয়ের অংশ
ওরা তোমার ভাবনার টুকরো
যেখানেই স্বদেশের স্বাধীনতার চিন্তার উদয়

সেখানেই তোমার মুক্তা ছড়ানো ওষ্ঠপুটের উল্লেখ।

কিন্তু আজও ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
লোভ লালসার বরপুত্রেরা।
ওরা আজও পর্যন্ত দাবিয়ে রাখছে তোমার ঘন্টাধ্বনিকে।
ওদের পর্যালোচনা-গ্রন্থ তোমার গানের কারাগার।
ওদের কাছে তোমার সমসাথীরা অবাঞ্ছিত বিদ্রোহী।
আজ এটা স্বাধীনতার মৌসুম
স্বদেশকে আজ হতে হবে কর্ষিত।
তোমার গানকেও আজ বেরিয়ে আসতে হবে কারাগার থেকে

কয়েক টুকরো

শঙ্খ ঘোষ

১

ফুসফুস মৌচাকে রুদ্ধ, তাকাও চোখের দিকে স্থির
ভাবি যদি একবার বলো এ দ্যুলোক মধুময়।
বুভুক্ষু ঠোঁটের ভাঁজে ক্ষীণ নিমপাতা তবু বলে :
বোলো না প্রসন্ন মুখে মৃত্যুর দক্ষিণে চলে যেতে।

২

আজও কেন নিয়ে এলে ভ্রষ্ট এই অন্ধ মৃত্যুরূপ
তুরঙ্গ যুবারা যাকে ভালোবেসে প্রসিদ্ধ করেছে।
ধমনী শিথিল জলে ভরে দেয় ঘূর্ণমান তারা
হাজার স্লিপিং পিল মাথার ভিতরে আত্মহারা।

৩

আয়োডিন থেকে শুরু এ আদিম দীর্ঘ করিডর।
ছায়ামুখে আলামুখে জীবাশ্মপ্রহৃত ভাঙামুখে
বসে আছে সারি সারি শালকিয়া হালতু বড়িশা
শাদা অ্যাপ্রনের গন্ধে ক্লোরোফর্ম খোলে রুদ্ধ ও. টি.।

৪

ইচ্ছে তো ছিলই, কিন্তু সব ইচ্ছে গোপন করেছি।
নিশ্বাস পরিখাময়। ওই পারে লাফিয়ে চলেছে
খরগোশ বেড়ালছানা হাতে-বোনা স্নেহময় উল
তোমাদের দিকে। আজ চলে যাব। তুমি ভালো থেকো

কালবেলা

সুনীলকুমার নন্দী

কী যেন সে গানে গানে খুঁজে ফেরে : এই
বিষঢালা কালবেলা পাড়ি তোলা টানে

ঘর খুলে গান ভাসে, কাকে যে জাগায়
কাকে যে জাগাতে জাগে যা কিনা জীবন

অবেলায় ঢলে পড়া অমন কিশোর
জাগাতে বেহুলা নাচে গানের শরীরে

ফুলভাঙা কালবেলা, কুয়াশাকঠিন
কে যে কার প্রতিপক্ষ, চাঁদ-মনসার

খেলা খেলা সারাবেলা, দশদিক ছুঁয়ে
ফুটে ওঠা লালপদ্ম এরই মধ্যে কেটে

কোথায় নেমেছে সাপ এখনো জানি নে

ট্রেন

রণজিৎকুমার সেন

আমি এখন রেলওয়ে স্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে
    আপ এ্যাণ্ড ডাউন ট্রেনের গতি লক্ষ্য করছি।
আমার জীবনের ট্রেনও অবিরাম চলেছে
    চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এমনি আপ এ্যাণ্ড ডাউন।
মাঝে মাঝে ক্ষণকালের বিরতির ছলে
    এক-একটা স্টেশনে এসে প্লাটফর্ম ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে

যারা নামবার নামছে, আর—
যারা উঠবার উঠছে,
সিটি দিয়ে আবার ছুটে চলেছে ট্রেন।

কোনোদিন যারা উৎসবে অনুৎসবে
গান আর হাসি নিয়ে এসেছিল,
একদিন আবার প্রয়োজন-অবসানে নিঃশব্দে তারা চ'লে গেল।
আবার এলো নতুন প্যাসেঞ্জার
নতুন কোনো প্লাটফর্মে লাগেজ নিয়ে নামবে ব'লে।
কিছু বা তার স্মৃতি থেকে গেল, কিছু মুছে গেল অলক্ষ্যে।

এমনি ক'রেই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে সন্ধে,
তারপর আসে নিস্তব্ধ রাত্রির নিবিড় নিথর অন্ধকার,
ঘুমন্ত পুরীর বোবা কান্নার মতো সিটি বেজে ওঠে,
গড়িয়ে চলে ট্রেনের চাকা :
কখন্ শেষ স্টেশন আসবে, তবে তার ছুটি।
সেই অবকাশে অসংখ্য মানুষের ভিড় বাঁচিয়ে
আমি একবার আপ্রাণ লক্ষ্য করি ছাড়পত্রের সিগ্‌ন্যালটাকে।

তবু এসো

আবুল কাশেম রহিমউদ্‌দীন

জন্মান্ধ কাফ্রীর বুকে সমাধিস্থ অনুভবে কিংবা
প্রাচীন কালের কোনো কবরের গভীর হৃদেশে
যে-প্রতায় চিরবন্ধ্যা, তারই মতো বিবিক্ত আমার
সত্তার উঠোনে নামে অন্ধকার নিষ্ফল প্রতাপী।
আলোর লাঙলে কোনো মুক্তিবর এখানে অলীক
কৃষাণ সূর্যের ; আজ তাই
এ-পথ এড়িয়ে চলে আনন্দের নিষ্পাপ পথিক।

এখানে জটিল কাল ঘন বন অন্ধকারে কাঁপে ;
এখানে হরিণশিশু অরক্ষিত অসহায় আশা ?
অযতি বার্থতা যতো বুকে হাঁটে মনসার চর ;
পদে পদে দুঃখ-ভয়-বিপদের সহিংস মাংসাশী
কখনো গর্জন করে, কখনো বা থাকে ওত পেতে.
দুর্দৈবের প্রভাব-লাঞ্ছিত
বীভংস বিস্তার করে দৃষ্টি তার পাবক সংকেতে ।

তবু এসো যদি আসতে চাও ।
অন্ধকার বনপথে ঝরাপাতা চরণে বাজুক,
সে-শব্দে হরিণ শিশু অনরির পদশব্দ শুনে
হয় হোক নন্দনীয়, একটি কথা পাখির গলায়
প্রহর ঘোষণা ভেবে অরণ্যের, নিশি-সম্মোহন
কাঁপে যদি কাঁপুক সন্ত্রাসে ;
পার যদি সত্য হও, মুক্ত কর তৃতীয় নয়ন
সমারণ্যে অকস্মাৎ ফুল ফোটা লগ্নের মতন ।

যেন আফ্রিকা

তরুণ সান্যাল

যেখান থেকে নক্ষত্র ভাসানো হয়, যেমন প্রতিমা ভাসানোর পর কালো জলের উপরে গুঁড়ো গুঁড়ো হ্যাজাকের আলো, আর দক্ষিণের টানে ভেসে ওঠা ডাকের সাজ, সেখানে কারা ভাসিয়ে দিলো কার প্রতিমা। এসব কথা ভাবতে-ভাবতে কেবল মন আনচান, তবু এই একা বসে থাকা খবরের কাগজ মুখে ডেক-চেয়ারে। ওদিকে গুলঞ্চ মাটি থেকে রস টেনে ফুটে উঠেই মাটির কাছে ফিরে যাবার জন্যে পড়ি মরি, যেন সমুদ্রের দিকে যাবার তাগিদে নদীতে মুখ লুকানো আহ্লাদী মেয়েরা ।
তবু আমার ভুল বুঝো। আমি যে বেঁচে আছি, আমাকে নিয়ে ভুল বোঝাটাও তার প্রমাণ ।

এখন বৃষ্টি শেষ। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি, কেমন উৎসব ছিল সেদিন সন্ধ্যায়। কত রং-বেরং শাড়ি, কত হাসি-মুখ আর বুক ঢিব-ঢিব হঠাৎ সেই তার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার। যদিও সেই মুখে ইস্পাতের ছুরি কেউ তখনো শাণে ভরতে শেখায় নি. কেবলই আমার হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে নেবে বলে. চিরে দেবে বলে, তারপর কে ভাসালো ঐ নক্ষত্রগুলি যেন ডাকের কুটি কুটি সাজ ভেসে ওঠা হাল্কা অবসান, চলে যাচ্ছে কোন পুব থেকে কেবলই পশ্চিমে, সে যেন ভাবছে এমনিই আমার বয়স স্থির থেকে যাবে, যেমন ফটোগ্রাফের।

কালো বলে তোমার অহঙ্কার কম নয়। মাঝ-নদীতে আমিও একা ডিঙিতে ভেসেছি। দেখিনি কি কৃষ্ণ চতুর্দশীর চাঁদ কালো ঢেউগুলির মাথা কেবলই মুচড়ে দিতে চায়। তবু সেই ঢেউ পরম্পরায় কি-যে অহঙ্কারী সেই নদীর শুয়ে থাকা। কৃষ্ণাঙ্গিনী, তুমি কেন তার মতো, নদীর উপমায় কোনো মেয়েকে ডাকতে নাই, জানো না?

বিদ্যুৎ ঠিকরে চলে যায় পাতালে। স্তনের পালিশে চাঁদ পিছলে নেমে যায় পায়ের নখে, আর নিতম্বের ওঠা পড়ায় হরপ্পা থেকে কোমরে হাত রমণী চলে আসে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে টান টান শাদার উপর বুঁটিদার ব্লাউজে। যখন সে হাঁটে ডান কাঁধ যেন ডানা. বাঁ-হাঁটুর ভাঁজের নিচে ঝড়ের মুখে দেবদারুর উদ্দাত বাঁকা ঘাড় মনে পড়িয়ে দেয়। গোড়ালির বর্তুলতায় সবুজ মানকচুর শাদা কচি মোথা. নাকি যে ঘাসগুলি আমরা প্রথম যৌবনে মাঠে বসে দাঁতে কাটতাম কারো গান গাইবার সময়: তেমনি শিকড়ের কোল ঘেঁষা শাদাটে সবুজ। আমার বয়স কম বোলো না, দেখছি আর মাটির দিকে আশ্রয়-আকুল একটু একটু এগোয় আমার আঙুলগুলি, আমার ঝুরি। এসব তাকালে তুমি ঘাড় ফিরিয়ে. যেন আফ্রিকা। দৌড়ে চলে গেল রোদে-ভরা জল ছিটিয়ে ঐ দেহ থেকে ডুব দিয়ে উঠে আসা এক প্যান্থার। আমার ঘাড়ে এখন তার বিহনখের বাঁকা দাগ।

খুব অহঙ্কার তোমার কৃষ্ণাঙ্গিনী। সব মেয়েদের মধ্যেও তোমাকে চেনা যায় বাঙালিনী, তোমাকে নদীর উপমা দিতে ভয় হয়। আমি ঢের দিন এক ডেক চেয়ারে, নাকি ঘাসমোড়া এক কবরের নীচে শুয়ে আছি। অহল্যা. স্পর্শ করো. উদ্ধার করো আমাকে। পুরনো রামায়ণের দিন গেছে।

একটুকরো মাংস

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এক টুকরো মাংসে পড়ে বেড়ালের থাবা।
নখ বেঁধে, রক্ত পড়ে সেই মাংস থেকে ;
অথচ, জীবনী থেকে সে বিচ্ছিন্ন আছে—
যেভাবে, সংসারে থেকে সন্ন্যাসীর গায়ে
অবিষয়ী আঁচ লাগে, এ-মাংস তেমনই,
যখন সংলগ্ন ছিলো, রক্তই ছিলো না।
এই হয়, বোধ করি, তেজস্বীর কাছে
পাহাড় লোফার কষ্ট একদিন ছিলো না।
লুফে-লুফে লুফে-লুফে শিক্ষকতা পেলে—
আর শিক্ষকতা নয়—বোধ কাজ করে।
কাজ করে বটে, কিন্তু, বিবেচনা কর :
ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দিলে পড়াবো নিশ্চয়।
অলংকারো গ্রন্থ নয়, ছেঁড়া পাতা পেলে—
নামতা না দিয়ে পড়ে ভালো-মন্দ ছেলে।

অপ্রেম

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আর কতো ঘুরবো, রাখবো সমুদ্রে পাহাড়ে পা।
যে বালি পায়ের নিচে জ্বলে ওঠে
রক্তকে উথলে তোলে সে আগুন,
যার দুই চোখ থেকে নির্মম নিঃসৃত হতে থাকে
উদ্ধত ক্রোধের বাষ্প—ঠিক তখনি তো ছিল
তুমি সাদরে আমার শিরে অভিলাষী হাত,
মানুষের বাসী ব্যবহার থেকে ফিরিয়ে নির্জন
উঠানে ফুল কেড়ে নেবে তোমার নিজস্ব স্বাধীনতায় !

সেই তুমি আজ আমার একটিও সফল শব্দে
উপস্থিত নেই মুহূর্তের ভুলে
তুমি অন্যের কপালে হাত রেখে
সেই হাত আর তুলে নিতেই পারোনি।
অথচ একটু নিচেই অন্য এক চোখ ছিল
ছিল অশ্রু সাজার মতো দুর্বল জল
তুমি কি একবারো ঐ সিক্ত সন্তাপ বুঝতে পারো নি।
এখন আবার কেন অক্ষরের যক্ষরেখায়
এতদিন পর ফিরে সমস্ত শরীর মেলে
নিশ্বাসের সমান নিকটে এসে চাও
মুদ্রনযোগ্য অমরতা!
যে পুরুষ তোমাকে লিখতে পারতো
তোমাকে যে নক্ষত্রের মায়াবী প্রদেশে
তুলে নিয়ে দেখাতে পারতো পৃথিবীর স্থায়ী শ্যামলতা
সে আর লেখেনা প্রেম
প্রথমপুরুষে সে এখন লেখেনা কিছুই।

বেচারী

কবিতা সিংহ

বেচারী!
বোধহয় ওর মা কখনো ওকে নীল গাড়ি খেলতে দেয় নি
ইচ্ছে ঢোকায় নি ভিতরে
মাথায় পোঁতে নি গাড়ির টিউমার
নীল গাড়িটা ওর ভিতর ভিতর ভিতর ভিতর
বড় হয়ে ওঠে নি খেলনা থেকে সত্যি হয়ে!
ছোরা থাকলেই লোকে ঘাস চায়
লাগাম থাকলেই ঘোড়া
বেচারী!

ওই গাড়ি বড় হয়ে উঠলে তার জন্যে গ্যারেজ
গ্যারেজ সেঁটে রাখবার জন্যে বাড়ি
বাড়ি ভালো দেখাবার জন্যে বাগান
বাগানে ঘোরবার জন্য প্রমাণ সাইজ বৌ-পুতুল
চায় নি !

বোধ হয় ওর মা কখনো খেলতে দেয়নি ওকে
খেলার বাড়ি নিয়ে
মোমের পুতুল নিয়ে
পোঁতে নি ইচ্ছের ছোট ছোট টিউমার।

এখন তাই, ও—বেচারী !
কথাটা বন্ধুরা গোপনে বলে
বেচারী কেন, বোকাও !
তাই ও বুঝতে পারে না কতখানি জোর লাগে
অভাস্ত অন্ধকারের দেয়াল সরাতে
তবু ও একা ছোট ছোট হাতে চেষ্টা করে—
বন্ধুরা গাড়ি থেকে, বাড়ি থেকে, পুতুল বৌ-এর পাশ থেকে
ওর মূর্খতা দেখে হেসে ওঠে
মাথার ভিতরে ওর মা কোন ইচ্ছের টিউমার পুঁতেছিল ?
ও জানে না। ছোট ছোট হাতে
শুধু ঠেলে
শুধু দেয়ালটা ক্রমাগত ঠেলে বোকার মতন !

বেচারী !

বালকের ধ্যান

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বালকের নিঃসঙ্গতা ছোটোবড়ো উঁচুনিচু সে-একরকম।
সমবয়সী যারা, তাদের কি চোদ্দর অমন একলা নিজের ছায়াটি
দেখতে হয় ? না-দৌড়ে, কেউ কি তারা মনে মনে হয় না প্রথম ?

সব খেলা, সব প্রতিযোগিতার ভিতরে, অপরিচিত ছেলে
জানে, তার বন্ধু নেই ; নির্বান্ধব সমাদর, স্নেহ—যা-গাছের
থাকে, আছে তৈলচিক্কণ সারা কিশোরমনস্ক এই বিকেলে।

ছেলেমানুষীর ছায়া ওকে তো ঘনিয়ে উঠতে দেয়নি কক্ষণো,
তবু তো ঘনায় ; তার চোখ জুড়ে শিমূল ফুলের অকাতর
তুলো ওড়ে ; আর তারই অংশগুলি আচ্ছন্ন করেছে ঐ আকাশে
পৌঁচোনো

আলোজাগরুক তাকে, বলবো কি, ঐ তার ট্রেন আসে···আসছে
নিজ্জা।

কুয়াশাজড়িত তার ভাইবোন মা-বাবার নিভৃত সংসার,
ভালোবাসা আসে। কিন্তু এখনো হয়নি সেই ট্রেনটির প্রকৃত সময়,
যাকে ছুঁয়ে আছে বালকের ধ্যান

অশ্বমেধের ঘোড়া

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমি তাকে নদীর কথা বলি।
স্বপ্নে দেখা নদী।

আমি তাকে বাড়ির খোয়াব দেখাই
সাতমহলা বাড়ির

সারা স্বদেশ ঝেঁটিয়ে তাকে
ভরদুপুরের কাঁপানো কলকাতার
মিছিলে টেনে আনি।

সেই মানুষের শান্ত, সরল

মাথার টবে পুঁতি
সখের ফুলের অজস্র পাগলামি।

এমন তাকে তুক করেছি
ছুঃ মন্তর রুপোর কাঠি ছাড়াই,
ভেতর থেকে রস নিংড়ে
করেছি তার সমস্ত আখ-মাড়াই
দু হাত বাঁধা দু-পা জবর খোঁড়া
মানুষটি ভুল স্বপ্নে ছোটে
জোর কদমে অশ্বমেধের ঘোড়া।

পঁচিশবছর দূরে

(শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রদ্ধাস্পদেষু)

শিবশম্ভু পাল

দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে, গাণিতিক, স্থায়ীভাবে পঁচিশবছর।
পঁচিশবছর দূরে আপনার চলাচল, আশ্বস্ত কলম
কুহেলিচাতুর্য থেকে সুস্থ জনপদ খোঁজে, মানুষের মুখ
এবং আকাশ মাটি। আমাদের রুগ্‌ণ খব অভিসন্ধিময়
খণ্ডিত রাস্তার ওই স্বপ্নে-পাওয়া সম্পূরক পঁচিশবছর
দূরে। খুব দূরে নাকি? মনোরথ চিরকাল গণিতবিরোধী
দেবতারে প্রিয় করা, প্রিয়েরে দেবতা—এই আপ্তবাক্য নিয়ে
প্রায়শই আমাদের ভালোবাসাবাসি আর অপেক্ষার পালা;
দিনান্তবেলার ঘরে টেনে আনে বুকশেলফে যদি কোন চিঠি
যদি কোন আকস্মিক ভ্রমণপ্রস্তাব আনে দুঃস্থ অবসরে...
দূরত্ব মিলিয়ে যায় এভাবেই, মনোরথে, বুভুক্ষু শেকড়
নড়ে ওঠে, বক্ষ জুড়ে যদি তৃষ্ণা দাহ করে বশ্যতাপ্রবণ
পঁয়তাল্লিশ বছরের স্মৃতিসম্ভাভবিষ্যৎ, যদি একবার
চোখ যায় আপনার অপ্রমত্ত সর্জনান ব্যাপ্ত কর্মযোগে।

তার কাছে এসে বসো

বাসুদেব দেব

টলটলে দিঘির মাঝখানে খুব সাদা একটি শালুক
স্বপ্নে দেখেছিল বাঁজা মেয়ে জ্বরে তার চোখ লাল
বুকে তার বাঁকুড়ার খরা
হাঁ করা শুকনো কুয়ো
কুকুরের মতন রোদ্দুরে জিভ বের করে থাকে
চারদিকে হলুদ শূন্যতা
সেখানে বসেছে এসে নিরক্ষর চাষা
তার পাশে ছায়া পড়ে ছায়া দেখে এসেছে রমণী
রমণী আঁচলে ঢেকে এনেছিল সাদা দুটি হাঁস
তাদের পুকুর হবে পুকুরের চারদিকে লেবুর বাগান
ডাঙায় ঝুমকো জবা উঠোনে সবেদা জাম গাছ

এই সব কে দেয় পাহারা ? উশ্কুশ দামাল ছেলেটি
টলটলে দিঘি থেকে উঠে আসে বাঁজা মেয়েটির
স্বপ্নের ভিতর, আজ জ্বরে তার গনগনে চোখ
তার কাছে এসে বসো. রুক্ষ চুলে রাখো পাখী হাত

নীরদ চৌধুরীর হিন্দুধর্ম

চিত্রভানু সেন

সম্প্রতি শ্রীনীরদ চৌধুরী হিন্দুধর্ম বিষয়ে একটি বই লিখেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল যে, কোন দরিদ্র সংস্কৃত পণ্ডিতকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, এবং পরে নিজে ইংরাজির প্রলেপ দিয়েছেন। এটাকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাম দিয়েছিলেন "টুলো পণ্ডিত পাশে রেখে ভারততত্ত্ববিদ সাজা।"

শ্রীচৌধুরীর Hinduism (হিন্দুধর্ম) বইটি পড়লে সেই ভুল ধারণার অবসান মুহূর্তেই ঘটবে। এই বই আর যাই হোক কোন সংস্কৃতজ্ঞের "সাহায্যপুষ্ট" নয়। এটা তাঁর নিজস্ব কীর্তি। শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষা সম্বল করে কোনও অশীতিপর সজ্জন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হবেন তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটেছে। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করে, বহু প্রবন্ধ ও বই-এর মাধ্যমে নিজের মত বা অমত প্রচার করে শ্রীচৌধুরী অধুনা খ্যাত হয়েছেন।

স্পষ্টত: তিনি সাহস সঞ্চয় করেছেন ম্যাক্সমুলার-এর জীবনী লিখে (Scholar Extraordinary, Oxford Univ., 1974)। তাঁর বোধহয় ধারণা জন্মেছে যে, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে ও ভারততত্ত্বে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। কিন্তু এটি অনধিকারপ্রবেশ।

বহু যোগ্য ব্যক্তি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, বহু গবেষণামূলক প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত প্রায় সব সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। ফলে যিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাত্ত্বিক

আলোচনায় ব্রতী হবেন তাঁকে এই বিশাল শাস্ত্র আয়ত্তে আনতে হবে; বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, শ্রৌতগৃহ্যসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলির পর্যালোচনা করতে হবে। ঠিক যেমন ম্যাক্সমুলার-এর সংস্কৃতচর্চা তাঁর জীবনী থেকে বাদ দিয়েছেন, শ্রীচৌধুরী এই বইতেও তাই করেছেন। তবে ম্যাক্সমুলার-এর জীবনীতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সংস্কৃতচর্চা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বইতে সেরকম কোন ইঙ্গিত নেই, বরং সংস্কৃতশাস্ত্র তাঁর বিচারের বিষয়, একথাই বলা হয়েছে।

শ্রীচৌধুরী নাকি অক্সফোর্ডের বিখ্যাত গ্রন্থাগার বড্‌লিয়ান লাইব্রেরির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবুও তাঁর 'নির্বাচিত' গ্রন্থপঞ্জীতে আমাদের জ্ঞাতার্থে বলেছেন যে, ঋগবেদ সংহিতার সম্পূর্ণ ইংরাজি অনুবাদ একমাত্র গ্রিফিথ্‌ (R. T. H. Griffith) করেছিলেন ১৮৯৬-৯৭ সালে। অথচ সংস্কৃতের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, ঋগ্‌বেদের প্রথম পূর্ণ ইংরাজি অনুবাদ এর ৪৬ বছর আগে (১৮৫০ সালে) করেছিলেন উইলসন সাহেব (H. H. Wilson)।

শ্রীচৌধুরীর হিন্দুধর্ম বইটি তিন অংশে বিভক্ত: ইতিহাস, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। তাঁর 'গবেষণার' পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য কি এই বই-এর প্রথম অধ্যায় (History of Hinduism : its methodology) পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন। তিনি বলছেন যে, হিন্দুধর্মের উৎপত্তি খুব প্রাচীন হলেও, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আগে এ-বিষয়ে কিছু জানা যায় না। অতএব হিন্দুধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় (পৃ ২৭)। হিন্দু "সংস্কারপন্থীদের" এই মত তিনি খণ্ডন করেছেন যে, প্রথমে হিন্দুধর্ম ছিল বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী। তার সার্থকরূপ উপনিষদ। কিন্তু পরে বৌদ্ধদের প্রাবল্যে ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে এক বিকৃত বহুদেববাদের আবির্ভাব হয়েছিল। এই মতকে ভ্রান্ত বলে (পৃ ২৯) আবার এই মতই তিনি জোর গলায় প্রচার করেছেন (পৃ ৮৫-৮৬)।

শ্রীচৌধুরীর মতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্মের ইতিহাস রচনায় সংস্কৃতগ্রন্থের উপর নির্ভর করে বিরাট ভুল করেছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন এইজন্য যে, তা নাহলে হিন্দুধর্মের বৃহৎ অংশই বাদ পড়ে যায়। উপরন্তু হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির প্রধান দোষ এই যে, খ্রীষ্টান, ইহুদি ও ইসলাম ধর্মে যেমন এখানে তেমন ভক্তিবাদ ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের উল্লেখ নেই (পৃ ২৯)। প্রকারান্তরে শ্রীচৌধুরী একটা ছোট বই খুঁজছেন যাতে

তিনি একত্র সব পাবেন, ছাত্রদের নোট বই যেমন পাওয়া যায়—"একের ভেতর চার"।

তিনি কোন্ বইকে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করবেন সে বিচারে তিনি বিভক্ত-বাদী। ঋগ্‌বেদকে শ্রুতি বলা হলেও, তিনি একে ধর্মের উৎস বলে মানতে চান না। কারণ ঋগ্‌বেদে বর্ণনা আছে যে, ব্রাহ্মণদের সামনে ব্যাঙ্ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করছে। তিনি বলছেন যে, মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হরিবংশেও একই বর্ণনা থাকায় তাও অপবিত্র (হরিবংশের কোন্ অংশে তার নির্দেশ দেন নি)। গীতার অবস্থা আরও খারাপ। কারণ, হিন্দুরা গীতা পাঠ করেন, বিশেষ করে শ্রাদ্ধে। অথচ গীতার কোনও আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ নেই। তাই শ্রীচৌধুরীর মন্তব্য, গ্রন্থ যত শ্রদ্ধেয় তার প্রয়োগ তত কম (পৃ ২৯-৩০)।

এই মন্তব্যে শ্রীচৌধুরী নিজের অজ্ঞাতে এক ঐতিহাসিক সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন। হিন্দুধর্মের চরিত্র বিশ্লেষণ করার সাধ্য যদি তাঁর থাকত, যদি তিনি "ধর্ম" এই কথার তাৎপর্য ও বিবর্তন উপলব্ধি করতেন, যদি তিনি হিন্দুধর্মের ধারাবাহিকতার কথা জানতেন, তাহলে বুঝতেন যে সমগ্র হিন্দুধর্মে কোন একটি পুস্তক, একটি আচার, একটি পদ্ধতি ধ্রুব নয়। যুগ পরিবর্তনে মত পরিবর্তিত হয়েছে, সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানও।

প্রচলন বা অপ্রচলনের উপর যদি কোন প্রাচীন গ্রন্থের প্রামাণ্য ও মূল্য নির্ভর করে, তাহলে অপ্রচলিত এই ব্যাজযুক্তিতে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে চসারের স্থান কোথায়? শেক্‌সপীয়র কোথায়? আর প্রচলিত বলে শুধু হ্যারল্ড্ রবিন্‌স্ আর হ্যাড্‌লি চেস্-কে স্বীকৃতি দিতে হয়।

ঋগ্‌বেদ সংহিতা ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের কাল যথার্থভাবে নির্ণীত হয় নি এবং কাল সম্বন্ধে বহু সংশয় আছে এই যুক্তিতে শ্রীচৌধুরী হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এইসব গ্রন্থগুলির মূল্য স্বীকার করেন না (পৃ ৩০-৩১)।

তাঁর মতে ঋগ্‌বেদের কালনির্ণয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইরানের আধুনিকতম প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার অগ্রাহ্য করেছেন (অবশ্য সেগুলি কি তা উল্লেখ করেন নি)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা হিন্দুদের সম্মোহের শিকার হয়ে নাকি ঋগ্‌বেদ সংহিতার ১৫০০-১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ কালনির্ণয় করেছিলেন (পৃ ৩১)। তাঁর মতে হিন্দুধর্মের এক হাজার বছরের ইতিহাস সেই সব পুস্তকের উপর নির্ভরশীল যাদের কাল অজ্ঞাত (পৃ ৩০)। লৌকিক (classical) সংস্কৃত সাহিত্য তাঁর কাছে অপাংক্তেয়, কারণ ঐ সাহিত্য খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর (পৃ ৪০-৪১)।

মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানের রচিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস (History of Dharmasastra. Poona, 1930—62), যা তাঁর দীর্ঘ সাধনার ফল তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ৫য় খণ্ডে ৬৫০০ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক শ্রীচৌধুরীর মতে ইতিহাস নয়, হিন্দু আইনের সারাংশ (পৃ ৩৫)। সন্দেহ জাগে যে, শ্রীচৌধুরী এই প্রখ্যাত বই-এর চেহারাও দেখেছেন কিনা, পড়া দূরের কথা।

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কোন্‌টির কাল যথাযথ নিরূপিত হয়েছে ? কে বলতে পারেন বাইবেল কোন সালে রচিত হয়েছিল ? তাহলে কি খ্রীষ্টান ও ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে বাইবেলের আলোচনা বাদ দিতে বলবেন তিনি ?

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতগৃহ্য সূত্রগুলি অপ্রামাণ্য বলে যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে শ্রীচৌধুরীর পরিশ্রম লাঘব হবে। সবই যদি অর্বাচীন হয়, তাহলে যা খুশি তাই লেখা যায়। শ্রীচৌধুরী প্রমাণ করতে চাইছেন যে, এইসব আকর গ্রন্থগুলি বাদ দিয়েই হিন্দুধর্মের ইতিহাস রচনা সম্ভব।

সম্ভবত : শ্রীচৌধুরীর মত কৃতকবচনচতুর (তৈরি করা কথার ওস্তাদ)-দের কথা স্মরণ করে যাস্ক বলে গেছেন : যদি কোন অন্ধ পথে স্তম্ভ না দেখতে পান, তাহলে সেটা স্তম্ভের দোষ নয়, সেই লোকেরই দোষ (নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনম্ অন্ধো ন পশ্যতি, পুরুষাপরাধঃ স ভবতি)।

কেতাব বরবাদ। শ্রীচৌধুরী যেসব বস্তুর প্রামাণ্য স্বীকার করেন তার মধ্যে অন্যতম শিলালিপি। তিনি মনে করেন শিলালিপির কাল সুনিশ্চিত। আসলে শিলালিপির কাল স্থির করা হয় অশোক মৌর্যের ব্রাহ্মীলিপির সাথে তুলনা করে, ব্রাহ্মীলিপিকে মূল ধরে। তাধাও বিচার করা হয়। শিলালিপির ক্ষেত্রে এই আপেক্ষিক কাল তাঁর কাছে পবিত্র মনে হয়েছে, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থের বেলায় মনে হয় নি। দ্বিতীয়ত, শিলালিপির মূল উদ্দেশ্য রাজার মাহাত্ম্য প্রচার করা। তাই শিলালিপির সব "তথ্য" নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন শিলালিপিতে যদি এক বা একাধিক যজ্ঞের উল্লেখ থাকে তাতে স্বতঃপ্রমাণিত হয় না যে, সেই যজ্ঞগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার উপর সেই সব যজ্ঞের স্বরূপ কি তা জানতে গেলে ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতগৃহ্য সূত্রের সাহায্য নিতেই হবে। শিলালিপিতে যজ্ঞের ব্যাখ্যা নেই।

কেতাব বর্জনের যুক্তিতে শ্রীচৌধুরী যতটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন

অলৌকিক বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন শিলালিপির তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে। প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নাগনিকা নামক রাজ্ঞীর নানাঘাট গুহালিপিতে বহু যজ্ঞের উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য : D. C. Sircar : Select Inscriptions, Vol. 1 1942 পৃ ১৮৬-১৯০)। শ্রীচৌধুরী মাত্র তিনটি যজ্ঞের নাম নির্বাচন করেছেন, অন্যগুলি বাদ দিয়েছেন কেন জানা যায় নি। যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি শুদ্ধ, অন্য দুটি হাস্যকর ভুল। শ্রীচৌধুরীর পাঠে তিনটি যজ্ঞ : বৃক্ (RK), অপ্তোর্যাম ও অনারম্ভনীয় (পৃ ৪৫)। প্রথমত, বৃক্ নামে কোন যজ্ঞ ছিল না, শিলালিপিতেও নেই। দোকানের নাম পড়তে না পারার ফলে যেমন পড়া হয় : "হরেকরকম্‌বা জিরকা রখানা" (হরেক রকম বাজির কারখানা), শ্রীচৌধুরীর পাঠও সেই গোছের। শিলা-লিপিতে আছে…রিকো যঞো, সংস্কৃতে রিক: যজ্ঞ। রিক: এই বর্ণগুলির আগে একাধিক অক্ষর পড়ে গেছে। ফলে এটি কি যজ্ঞ বোঝার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, অনারম্ভনীয় শব্দও ভুল প্রাকৃত ভাষায় আছে অনারভনিয় :, যাজ্ঞিক পরিভাষায় অন্বারম্ভনীয়া (ইষ্টি)। এটি দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের প্রারম্ভিক ইষ্টি যাগ—অনু+আরম্ভনীয়া (আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র ৫ ২৩.৪-৯)। যজ্ঞের নাম শুদ্ধ ভাবে জানতে গেলেও শ্রৌতসূত্রের সাহায্য দরকার, অর্থবোধে তো বটেই। তাছাড়া এই শিলালিপিতে আর একটি যজ্ঞের নাম আছে : ে...যাম: (?)। বোধহয় শ্রীচৌধুরীর নজর এড়িয়ে গেছে।

হিন্দুধর্মের "ঐতিহাসিক" তথ্য আহরণের প্রচেষ্টায় শ্রীচৌধুরী রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু তুচ্ছ আলোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন যে, মহাভারতের ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান বৈদিক (পৃ. ৫১)। অনুবাদেও তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত পড়বেন তা আশা করা বৃথা। তবে একটু কষ্ট করে উইনটারনিটস-এর সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে পারতেন। উইন্টার নিটস বলেন যে, মহাভারত যাঁরা করতলগত করেছিলেন সেই সব ব্রাহ্মণদের বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ, এমনকি যে অংশে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য খুবই প্রকট সেখানেও। বৈদিক ঋত্বিকদের স্থান অধিকার করেছেন পুরোহিত, যিনি রাজার কর্মচারী (M. Winternitz : History of Indian Literature, New Delhi, 1972 ১ম খণ্ড, পৃ ৩১৯)।

বৈদিক যজ্ঞ—বিশেষ করে শ্রৌতযজ্ঞ সম্বন্ধে মহাভারতের লেখকদের যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় খুব বিরল। শ্রৌতযজ্ঞের বিধিতে রাজসূয় যজ্ঞে

অর্ঘদানের কোনও নির্দেশ নেই, অথচ ভীষ্ম কৃষ্ণকে অর্ঘদানের প্রস্তাব করলেন। তাই নিয়ে যজ্ঞ সমাপ্তির আগেই শিশুপাল নিহত হলেন (সভাপর্ব ৩৩—৪২ অধ্যায়, পুনা সংস্করণ)। যুধিষ্ঠির ছয় অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন (সভা ৩২.১৫)। বৈদিক যজ্ঞে তিন অগ্নির প্রয়োজন। এইরকম হাস্যকর উক্তি আছে যে, উপনিষদে নির্দিষ্ট যজ্ঞ অথর্ববেদের মন্ত্রে অনুষ্ঠিত হত (আরণ্যক ২৩১.২০)। মোটেই আশ্চর্য নয় যে, যজ্ঞের স্থান অধিকার করেছে তপ (আরণ্যক ৩.১৪)। বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর কথা বলেছেন পুলস্ত্য। তিনি বলছেন যে, এটা সত্য যে, বেদোক্ত যজ্ঞে ইহ ও পরকালে ফলপ্রাপ্তি হয়। তবে যজ্ঞে বহু উপকরণ ও সম্ভার প্রয়োজন, সেহেতু দরিদ্রের পক্ষে যজ্ঞ করা কখনো সম্ভব নয়। রাজারা পারেন, আর মাঝে মাঝে ধনীরাও পারেন। যাঁদের অর্থের, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ও সাহায্যের অভাব যজ্ঞ তাঁদের জন্য নয়। তীর্থদর্শনে যখন যজ্ঞের সমতুল্য ফল পাওয়া যায় তখন দরিদ্ররা অনায়াসে তা করতে পারেন (আরণ্যক ৮০,৩৪—৪০)।

সমগ্র বৈদিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন সনৎসুজাত। অজ্ঞতার ফলেই এক বেদ বহুধা বিভক্ত। বেদ ঋষিদের সৃষ্টি (ঋষিসর্গ এবং—প্রকারান্তরে অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকৃত)। সনৎসুজাত আরও বলছেন যে, আজ এমন কেউ নেই যিনি বেদের অর্থ বোঝেন। শুধু লোভের বশে লোকে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করে, তাঁরা সত্যচ্যুত ও তাঁদের সংকল্প নিষ্ফল। মৌন অবস্থায় তপ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা (উদ্যোগ ৪৩.২২-৩১)।

ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, বেদকে স্বীকার করে নিয়ে সম্পূর্ণ রূপে বেদ পরিপন্থী কথা বললে তা তত্ত্বের সম্মান পায়। বেদকে অস্বীকার করলে কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়—যা হয়েছিল বুদ্ধের, চার্বাকের। তত্ত্বের বিচারে সমগ্র উপনিষদ সম্পূর্ণরূপে বেদবিরোধী। উপনিষদ বেদের যজ্ঞ ও বহু দেবতার মাহাত্ম্য অস্বীকার করেছে, যদিও উপনিষদ বেদের অংশ হিসাবে প্রথাগত সম্মান পেয়েছে। বেদের বুড়ি ছুঁয়ে থেকেও মহাভারতের ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। কিন্তু এসব কথা শ্রীচৌধুরীর জানা প্রয়োজন নেই।

শ্রীচৌধুরী সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তথ্যের একান্ত অভাব। আর, পঞ্চম থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা মূলত অপরিবর্তিত আছে, কিছু খামখেয়ালি

হেরফের থাকতে পারে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার এই যে, হিন্দুধর্ম মোটেই প্রাচীন নয় (পৃ ৬০-৬১)। তিনি বলছেন যে, "পরিবর্ধিত" হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে নয় (পৃ. ৬২)। তিনি ব্যাখ্যা করেন নি এই "পরিবর্ধিত" হিন্দুধর্ম বলতে কি বোঝায়? কিসের পরিবর্ধন? সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সাপত্ন্যবিরোধ। কারণ, এই পণ্ডিতরাই ঋগ্‌বেদের উপর আশ্রয় করে হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন (পৃ ৬২)।

শ্রীচৌধুরী ভাষার প্রাচীনত্বে ও আধুনিকত্বে যে বিচার গ্রহণ করা হয় সে বিষয়ে নিঃস্পৃহ। এই নিঃস্পৃহতা কোন তাত্ত্বিক কঠোরতার পরিণতি নয়, উদ্দেশ্যমূলক। সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বলে হিন্দুধর্ম প্রাচীন নয় একথা বলার সুবিধা হয়। দেখা যাবে যে, সংস্কৃত ভাষার পূর্ব ও উত্তর কাল সম্বন্ধে অসীম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে শ্রীচৌধুরী হঠাৎ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে মহামহোপাধ্যায়ের রূপ ধারণ করেছেন। বৈদিক সংস্কৃত ও লৌকিক সংস্কৃতের ভাষাতত্ত্ব তিনি স্বীকার করেন না, কিন্তু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব স্বীকার করেন।

শ্রীচৌধুরী প্রমাণ করতে চান ভারতে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম রূপের অস্তিত্ব না থাক, ভারতের বাইরে আছে। তাঁর মতে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম রূপ হলো তার ইন্দো-ইওরোপীয় সার। এই ইন্দো-ইওরোপীয়ত্বের প্রমাণ ভাষা-তাত্ত্বিক। আসলে কয়েকটি শব্দের সমীকরণ। তাঁর যুক্তি এই যে, যেহেতু সমস্ত 'আর্য' ভাষার একটা আদিম ইন্দো-ইওরোপীয় রূপ আছে সেহেতু অন্যতম আর্যধর্ম হিসাবে হিন্দুধর্মেরও আদিম ইন্দো-ইওরোপীয় রূপ মানতে হবে। সকলে জানেন যে, ভাষার প্রাচীনতম ইন্দো ইওরোপীয় রূপ বলে যা প্রচলিত তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই—পুঁথিগত বা প্রত্নতাত্ত্বিক। সবটাই অনুমান।

এই ভাষাতাত্ত্বিক জ্যোতিস্তত্ত্বের নেপথ্যে শ্রীচৌধুরী মাত্র চারটি সংস্কৃত শব্দ নির্বাচন করেছেন—যা তাঁর ধারণায় ধর্মীয় শব্দ। প্রায় শিশুসুলভ সরলতায় এই কয়টি শব্দের সমীকরণ করে তিনি হিন্দুধর্মের ইন্দো-ইওরোপীয় রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বলছেন। হিন্দুধর্মের এই ইন্দো ইওরোপীয় রূপটি কি তা কোথাও বলছেন না। দেখা যাক তার নির্বাচিত শব্দগুলি কি (পৃ ৬৭ ৯)।

(১) রাজন্ (সংস্কৃত)=rex (লাতিন)=rix (গ্যালো-কেল্‌টিক্)=ri (হিবার্নো কেল্‌টিক্)=reg (ইন্দো ইওরোপীয়)।

(২) দেব (সংস্কৃত)—theos (গ্রীক)—deus (লাতিন)—diew (ইন্দো-ইওরোপীয়)।

(৩) শ্রাদ্ধ>শ্রদ্ধা (সংস্কৃত)—credere (লাতিন)—zrazda (আবেস্ত)। এটার ইন্দো-ইওরোপীয় রূপ কি? খুঁজে পান নি?

(৪) চতুর্থ শব্দ নির্বাচনে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, হিন্দু যজ্ঞ পরিভাষায় যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তার ইন্দো-ইওরোপীয় চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। শব্দটি হলো: হব্ (অন্) hav (an)। তার মতে এ শব্দের মানে অগ্নিতে হবিস্ নিক্ষেপ করা। বলা বাহুল্য, এমন বিচিত্র হব্ অন্ শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নেই। এটা শ্রীচৌধুরীর সৃষ্টি, বা অবদান বলা যায়। আবার শব্দটির সমীকরণও করেছেন Rhein (গ্রীক)—fundere (লাতিন)—geotan (প্রাচীন ইংরাজি)—gheu (ইন্দো-ইওরোপীয়)। তবুও ভালো যে, সমীকরণের ধাক্কায় রামাশিস্ ও রায়কে Rameses ও Ra বলে সনাক্ত করে প্রাচীন মিশরে পাঠিয়ে দেন নি।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত হু ধাতুর অর্থ অগ্নিতে হবিস্ দান করা (রূপ হয়—জুহোতি, জুহুতে, হুয়তে প্রভৃতি)। হু ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ হবিস্, যে দ্রব্য অগ্নিতে দান করা হয়। হোতৃ শব্দও হু ধাতু নিষ্পন্ন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি অগ্নিতে আহুতি দেন, প্রকৃতপক্ষে হোতৃ অন্যতম প্রধান ঋত্বিক্‌রূপে যাজ্ঞিক ক্রিয়াতে দেবতা আহ্বানের জন্য ঋগবেদ সংহিতা থেকে মন্ত্র আবৃত্তি করেন। প্রসঙ্গত, সেই সুপ্রাচীন কালেই বৈদিক যজ্ঞের কতখানি রূপপরিবর্তন হয়েছে তার অন্যতম নিদর্শন হোতৃ শব্দ। ঋগ্‌বেদ সংহিতার ঋত্বিক্, হোতৃ কোনো এককালে নিজেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতেন, কিন্তু যজ্ঞপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হওয়ার কালে তিনি শুধু নামেই হোতৃ, কাজে আবৃত্তিকারী। যজ্ঞের প্রধান পুরুষ এখন অধ্বর্যু, যজুর্বেদসংহিতার ঋত্বিক্। এই কার্যবিপর্যয়ের আরও নিদর্শন যজমান শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যজমান যিনি নিজেই নিজের যজ্ঞ করেন। কার্যতঃ যজমান নিজের যজ্ঞের খরচ যোগান দেন, ঋত্বিক নিয়োগ করে যজ্ঞ সম্পন্ন করান। যজ্ঞে যজমানের প্রায় কোনো অংশ নেই। তাঁর পত্নী যজ্ঞের অঙ্গহীন ক্রিয়াকলাপের অসহায় দর্শকমাত্র।

হব্ অন্-এর মতো শব্দের দৌরাত্ম্যে বোধহয় ব্যাকরণ পড়ার অনুরোধ করা হয়েছে মহাভাষ্যে। ব্যাকরণ পড়ে যেন ম্লেচ্ছ, অপশব্দ প্রতিহত করা হয়। তা না করলে অসুরদের দশা হবে। অসুররা যুদ্ধে "হে অরি, হে অরি" না বলে হে'লয়, হে'লয় বলতে বলতে পরাভূত হন (তে'সুরা হে'লয়ো

হে'শয় ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুঃ—মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক)। মহাভাষ্যের এই কথা সতর্কবাণী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার আগে ভাষাজ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন, তা না হলে অজন অজনে (কুকুর) পরিণত হয়ে যেতে পারে।

চারটি শব্দে ভাষাতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের ইন্দো-ইওরোপীয় রূপ "প্রতিপাদিত" করে এবার শ্রীচৌধুরী দুটি পত্রে সমগ্র মধ্যএশিয়া জয় করতে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দুদের "বিশেষ" ধর্মচেতনার স্বরূপ দুটি—অগ্নি ও জ্যোতির উপাসনা। যেহেতু এই ধর্মচেতনা দুটি, তার নিদর্শনও দুটি। উপনিষদে কত কথাই আছে, কত পত্র আছে, কিন্তু শ্রীচৌধুরী দুটি মাত্র পত্রের সন্ধান পেয়েছেন। কারণ বোধহয় এই যে, শ্রীচৌধুরী দু বা তিনের বেশি নিদর্শন কখনও আয়ত্তে আনতে পারেন না। তাঁর একটি নিদর্শন বৃহদারণ্যক উপনিষদের অংশ: অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময় (১.৩.২৮. শ্রীচৌধুরীর নির্দেশ ভুল ৩.২৮)। এতে নিহিত যে চেতনা আছে তা একান্তভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদের নয়—এটি শতপথ-ব্রাহ্মণের হুবহু নকল। এটি যদি বিশেষ ধর্মচেতনা হয় তাহলে বলতে হয় যে, যাজ্ঞিকগ্রন্থ শতপথব্রাহ্মণে তার প্রারম্ভ।

দ্বিতীয় নিদর্শন কঠ উপনিষদ্ থেকে:

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

(২.২.১৫ শ্রীচৌধুরী কোন নির্দেশ দেন নি)।

রূপকল্প হিসাবে এই দুটি অংশ অনন্যসাধারণ সন্দেহ নেই। শ্রীচৌধুরীর মতে এগুলি বিশেষ ধর্মচেতনার নিদর্শন। তিনি বলেন যে, আলোক আর অগ্নির স্তুতি, এক বিশেষ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ভারতে সম্ভব নয়, একমাত্র শীত প্রধান দেশেই সম্ভব। তাই তার উৎস সন্ধানে পাড়ি দিয়েছেন সুদূর ভল্গা ও ডানিয়ুব নদীর তীরে। ভারতের এক "রক্ষণশীল" পণ্ডিত বৈদিক আর্যদের আদিনিবাস উত্তরমেরুতে নির্দেশ করেছিলেন, সেটা শ্রীচৌধুরীর পছন্দ নয় (পৃ. ৬৯-৭০)। বোধহয় "রক্ষণশীল" বলেই বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের নাম লিখতে দ্বিধা করেছেন। শ্রীচৌধুরী আরও একটু দক্ষিণে অবতরণ করতে চান। তাঁর মনে হয়েছে যে, যে দেশে তুষারপাত হয় শুধু

সেখানেই এই জ্যোতির উপাসনা সম্ভব। এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এরপর যা বলেছেন তা শ্রী:চৌধুরী ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না। তাঁর এই অভিজ্ঞতা নিউটনের আপেল পড়তে দেখা আর ওয়াটের কেটলিতে জল ফুটতে দেখার সমতুল্য। কি সেই অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা যা না জানলে উপনিষদের কাব্যপ্রেরণা সম্যক্ উপলব্ধি হবে না?

এই বই লেখার সময়ে তিনি অক্সফোর্ডের কাছে এক গ্রামে ছিলেন। সারা রাত ধরে তুষারপাত হল। পরদিন খুব ভোরে তিনি বাইরে জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল আলো লক্ষ করলেন, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তখন তাঁর দিব্যজ্ঞান হল যে, তুষারের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে আকাশ, আর তখনই উপনিষদের এই আলোকের অনুভূতির ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন। চক্ষুর পলকে তিনি এই তত্ত্বে উপনীত হলেন যে, ইন্দো-আর্যরা দক্ষিণ রাশিয়ার অধিবাসী, এবং তাঁরা সেই তুষারাচ্ছন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষে বহন করে উপনিষদে নিবদ্ধ করেছেন (পৃ. ১০-১১)।

যে ঋষি "অসতো মা সদ্গময়" বা 'ন তত্র সূর্যো ভাতি" লিখেছিলেন তিনি অক্সফোর্ডের পাশের গ্রামের বাসিন্দা কেন নন? অভিজ্ঞতার নাম করে শ্রী.চৌধুরী যা মেলাতে চাইছেন সেই গল্প বেশ পুরাতন (দ্রষ্টব্য Ca nbridge History of India, ১ম খণ্ড)।

ঋগ্বেদ সংহিতাতে ব্যাঙের গানের উল্লেখ আছে, দীপ্তিমান সূর্য ও অন্ধকার রাত্রির অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। তাহলে কি এগুলি মধ্যরাশিয়ার ব্যাঙ, সূর্য ও রাত্রি?

শ্রীচৌধুরী ডেনিকেন (Erik Von Dániken) সাহেবের অনুকরণে আরও চমকপ্রদ কথা বলতে পারতেন। বলতে পারতেন যে, যেখানে সূর্য জ্বলে না, চন্দ্রতারকা আলো দেয় না, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নেই সে কোন্ দেশ? বহু আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রলোক। সেই নক্ষত্রলোকবাসীদের অভিজ্ঞতা বেদ, উপনিষদে নিবদ্ধ আছে। সেই অভিজ্ঞতা এত প্রাচীন যে, বেদকে শ্রুতি, অপৌরুষেয় ও শাশ্বত বলা হয়। এসব কথা অর্থহীন প্রলাপ হলেও শুনতে মজা লাগে।

শ্রীচৌধুরীর হিন্দুধর্মের 'ঐতিহাসিক গবেষণার' সমাপ্তি ঘটেছে হিন্দুযজ্ঞের ও রোমান যজ্ঞের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অংশের তুলনা করে। একই পদ্ধতিতে গ্রীক দেবদেবী আর কিছু বৈদিক ও অবৈদিক দেবদেবীর তুলনা করা হয়েছে

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সাদৃশ্যের সাহায্যে, যার প্রতিপাদ্য হলো হিন্দুধর্ম ইন্দো-ইওরোপীয় (পৃ. ৭৪-৮১)। এখানেও সেই সস্তা সমীকরণ।

Frazer-এর Golden Rough-তে দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে, বিভিন্ন দেশে ও ধর্মে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাদৃশ্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। সোমযজ্ঞে দীক্ষণীয়েষ্টিতে যজমানের পুনর্জন্ম নাটকীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১. ৩)। দীক্ষায় পুরুষ মাতৃগর্ভের ভ্রূণ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৩.৩.১২) এর সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক কালের আদিম জনগোষ্ঠীর দীক্ষা অনুষ্ঠানের (initiation) সাদৃশ্য আশ্চর্যরকমের (দ্রষ্টব্য: George Thomson: Studies in Ancient Greek Society, 1954, পৃ. ৪৫-৯)। অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনগোষ্ঠী ও সেমেটিক গোষ্ঠীর দীক্ষায় সাদৃশ্য থাকলে একদেশ থেকে অন্যদেশে রপ্তানির কথা চিন্তা করা হয় না।

সব যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এক বিশেষ সামাজিক ও চেতনা ও অভিজ্ঞতার পরিণতি। তার অর্থ এই নয় যে, ঐসব চেতনা ও অভিজ্ঞতা যুক্তিনিষ্ঠ। পৃথিবীর কোনো ধর্মই যুক্তিনিষ্ঠ নয়। তবে সব ধর্মের ও অনুষ্ঠানের একটা নিজস্ব যুক্তি থাকে। বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পারস্পরিক সাদৃশ্যের কারণ এই যে, পৃথিবীর জনসমাজ একসময়ে জনগোষ্ঠী ছিল, এবং সেই সময়কার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাদৃশ্যও ছিল। জনগোষ্ঠীর সেই যুগের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও ধারণার ফলে যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ প্রাচীন গোষ্ঠীসমাজে অনুষ্ঠিত হতো, তা পরবর্তী সমাজে সম্পূর্ণ বর্জিত হয় নি। সামাজিক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান-রূপে অশ্মীভূত (fossil) রূপগ্রহণ করে। সমাজের আমূল পরিবর্তনেও সেই প্রাচীন অভ্যাস পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান। যে সমাজ ও সভ্যতা যত প্রাচীন, পরম্পরা যত নিরবচ্ছিন্ন এই প্রবণতা তাদের তত প্রবল। দেখা যায়, দীক্ষায় (initiation) সেমেটিক্ গোষ্ঠীর পুরুষদের লিঙ্গাগ্র ছেদনের রীতি (circumcision) আজও পালিত হচ্ছে ইসলাম ও ইহুদি ধর্মে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই আচার অনুষ্ঠিত হতো এবং হয় (Encyclopaedia of Religion and Ethics; ৩ খণ্ড; পৃ. ৬৫৯-৮০)।

বৈদিক ধর্মকে 'আর্য' ধর্ম আখ্যা দিয়ে অন্য একটা কিছু কল্পনা করা হয়। সেই 'আর্য' বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলির বহু শাখা পশুর নাম বহন করছে—তৈত্তিরীয় (তিত্তির পাখি), মাণ্ডূক্য (ব্যাঙ্), শৌনক (কুকুর), পৈপ্পলাদ (পিপ্পল ফলভোজী)। এ সবই প্রাচীন পশু টোটেমের চিহ্নাবশেষ। বৈদিক যজ্ঞেও সেই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের চিহ্ন আছে। দীক্ষণীয়েষ্টি ছাড়া, সোমলতার

রস পিটিয়ে বার করে যোদ্ধদের কাছে নিজেকে গোপন রাখা (ভিজ্ বন), যজ্ঞে পশু হত্যা করে তাকে বৃদ্ধি করা (আপ্যায়ন), অবৈদিক ব্রাত্যদের যজ্ঞের মাধ্যমে বৈদিক সমাজে প্রবেশাধিকার দান (ব্রাত্য স্তোম) প্রভৃতি বহু চিহ্ন বর্তমান (দ্রষ্টব্য : A. A. Macdonell : Vedic Magic. Encyclopaedia of Religion and Ethics ; ৮ খণ্ড, পৃ. ৩১১-২১)।

যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে বলা আছে যে, অনার্যরা পরিত্যাজ্য, তাই শ্রীচৌধুরীর দৃঢ় ধারণা যে, ভারতে হিন্দুধর্মের উপর আদিম জনগোষ্ঠীর কোন প্রভাব নেই। তাঁর মতে, লিঙ্গপূজা, নরমেধযজ্ঞ ইত্যাদির প্রচলন দেখে জার্মান পণ্ডিতেরা তাঁদের ভারতীয় আর্য ভাইদের অধঃপতনের ব্যাখ্যা হিসাবে অনার্য প্রভাবের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর ইন্দো-ইওরোপীয়রা লিঙ্গ উপাসক (পৃ. ১৬-১৭)। তবে ঋগ্বেদ সংহিতায় শিশ্নদেব (লিঙ্গ উপাসক) বলে যাদের নিন্দা করা হয়েছে তারা কারা ? শ্রীচৌধুরীর মত অনুসারে ঋগ্বেদকে আর্যবিরোধী অনার্যদের গ্রন্থ বলতে হয়।

শ্রীচৌধুরীর মতে, ইন্দো-ইওরোপীয় উপনিবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করার আগেই হিন্দুধর্মের চেহারা বদলে দিলেন পারস্যে বসে। তাঁরা নিজেদের অ-নররূপী দেবতাকে নররূপ ধারণ করালেন। তবে ভারতের ক্ষেত্রে ইন্দো-ইওরোপীয়রা একটু নতুনত্ব করলেন। একধারে নররূপী বহুদেবতাবাদ প্রচারিত হলো আর সেই সঙ্গে সেই 'মূল' প্রাকৃতিক অ-নররূপী দেবতা পরিণত হলেন ব্রহ্মণ্, আত্মন্ রূপে (পৃ. ৮৫-৮৬)। এর আগে শ্রীচৌধুরী নিজেই একেশ্বরবাদ হিন্দুদের প্রাচীনতম এ তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন (পৃ. ২১)। ইন্দো-ইওরোপীয়রা মূলে একেশ্বরবাদী ছিলেন একথা তিনি কি ভাবে জানলেন ? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ? এমন প্রাচীন অভিজ্ঞ পুরুষ জগতে দুর্লভ ! শ্রীচৌধুরী ঋগ্বেদের কাল বলে কিছু স্বীকার করেন না তাহলে ভারতে 'আর্য আগমনের' কাল কি ভাবে স্থির করলেন ?

শ্রীচৌধুরীর মতে ভারতে মন্দিরে বিগ্রহ পূজার প্রচলন হয়েছে শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা সূত্রে। তাঁর মতে, শ্রুতি কি মহাভারতে মন্দির বা বিগ্রহের উল্লেখ নেই (পৃ. ৯০)। মন্দিরের উল্লেখ নেই সত্য, কিন্তু দেববিগ্রহের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদসংহিতায়। দোকানদার হাঁকছে : কে আমার এই ইন্দ্রমূর্তি দশটা গরুর বিনিময়ে কিনবে ? পরে শত্রুনিধন হলে মূর্তিটা আমাকে ফেরত দিতে পারবে (৪.২৪.১০)। পাণিনির ব্যাকরণে জানা যায় যে, দেববিগ্রহ পণ্য হিসাবে বিক্রি না করে জীবিকার

জন্ত ব্যবহার করা হত (জীবিকার্থে চাপণ্যে ৫.৩.৯৯)। এই প্রসঙ্গে মহাভাষ্যে বলা হয়েছে যে, মৌর্যরা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে দেবমূর্তি (অর্চা) নির্মাণ করতেন। কাশিকা ও টীকাকার কৈয়টের মতে এই বিগ্রহসেবীরা (দেবলক) ঘরে ঘরে দেবমূর্তি নিয়ে গিয়ে পূজা করে অর্থোপার্জন করতেন। আশ্চর্যের কথা, আজও এই সুবহ (portable) বিগ্রহ বহুলোকের জীবিকা অর্জনের উপায়। মহাভারতে মন্দির ও মূর্তির ছরেরই উল্লেখ আছে। রাজা উপরিচরকে ইন্দ্র প্রলুব্ধ করছেন: তুমি আকাশে বিমানে চড়ে বিগ্রহবান্ দেবতার মতো ঘুরে বেড়াবে (আদি ৫৭.১৩-১৪)। একলব্য দ্রোণের মাটির মূর্তি করে তাকেই আচার্যরূপে বরণ করলেন (আদি ১২৩.১২)।

সিন্ধু সভ্যতার ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের পরও শ্রীচৌধুরী বলছেন যে, মূর্তিশিল্প ও মন্দির স্থাপত্য গ্রীকরা ভারতে প্রবর্তন করেন। কারণ, কোনো সুন্দর স্থাপত্যের নাম হলেই আমরা দানবদের স্মরণ করি। তাঁর মতে, দানব মানে পারসিক (পৃ. ৯৫)।

শ্রীচৌধুরী খুবই অস্বস্তি অনুভব করেছেন হিন্দুধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই ধর্মের ইতিহাস 'পুনর্নির্মাণ (reconstruction) করার চেয়ে বর্ণনা দেওয়া অধিকতর দুষ্কর (পৃ ১০৩)। তবে তিনি মধ্যযুগের আলোচনা করবেন না, মুসলমান যুগও না, কারণ সেই একই যুক্তি- উপাদানের অভাব। অতএব এক লাফে ইংরাজ শাসনের যুগে তিনি চলে এসেছেন। এক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শ দুটি বিদেশী পাদরী (পৃ ১০৪-৫), আর তাদের অসংলগ্নভাবে উদ্ধৃত করা বক্তব্য। আর আছে অসংলগ্ন তথ্য: গীতা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস কি বলেছিলেন; কর্নেল বোডেন ১৫,০০০ পাউণ্ড দান করে অক্সফোর্ডে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেছিলেন; এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনা (কিন্তু সোসাইটির গবেষণার কোনো আলোচনা নেই) অ রও তথ্য আছে; জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক ভারতীয় খ্রীস্টান যখন আমেরিকা যান তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হিন্দু মায়েরা তাদের শিশুসন্তানদের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন কিনা (পৃ ১০৫-৯)।

তারপর হিন্দু ধ্যান-ধারণা ও দেবদেবীর বহুধা-বিভক্তরূপ ও বৈষম্যের বিষয়ে দুটি অধ্যায় আছে (Regional and Social Diversity ও Intrinisic Diversity)। শিরোনাম ছলনাময়, কারণ সবই অন্তঃসারশূন্য।

কোনখানেই তাঁর আলোচনা সংবদ্ধ নয়। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ও নিজের অসমর্থিত বক্তব্যে ভরা। ধান ভানতে শিবের গীত। হিন্দুধর্মের এই উচ্চাবচ ও প্রকীর্ণ রূপটি কি বা কেন সে বিষয়ে কোন কথা নেই।

ঠিক একইভাবে ঋত্বিকতন্ত্র ও ধর্মসম্প্রদায় (priesthood and sects) শীর্ষক অধ্যায়ে প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের ঋত্বিক্ পুরোহিত তন্ত্রের বিবর্তন ও বর্তমান কালের পরিণতির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় নি। পৃ ১৬৪-৮৫)। এই অংশে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর এক উদ্ধৃতি থেকে জানা যাবে যে, পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধবাসরে ৺স্ব গ্রহণ করছেন, পরস্পর তুচ্ছ ব্যাপারে কলহ করছেন আর শেষে হাতাহাতি করছেন (পৃ ·৬৬)। তাঁর ধারণায় পুরোহিত তন্ত্র মানেই হলো দক্ষিণাগ্রহণ, স্বৈরিকতা আর বিধবা সংসর্গ (পৃ ১৬৮-১৭১)।

হিন্দুদের খাদ্যাখাদ্য বিচারে কঠোরতার সম্বন্ধে তিনি নিজেই প্রামাণিক। নিরামিষ খাদ্য হিন্দুসমাজে কত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত তার উদাহরণস্বরূপ তিনি বলছেন যে, ভারতে ও বিলাতে আধুনিক হিন্দু মহিলারা উগ্র মদ্য পান করে বেসামাল হন, যৌন ব্যভিচারে কোনো কুণ্ঠা নেই, অথচ তারাই মাংস স্পর্শ করেন না (পৃ ১৯৩)। তাঁরা নাচেন কি? না নাচলে বলতে হবে হিন্দু মহিলারা নাচেন না। আসলে শ্রীচৌধুরী নিজেকে যেমন পাণ্ডিত্যের প্রতিভূ মনে করেন, এই সব মহিলাদেরও ঠিক তেমনই হিন্দু আচারের প্রতিনিধি মনে করেন। ঐ একই পৃষ্ঠাতে ২য় অনুচ্ছেদের পরে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, যে বাঙালিরা ছাগলের মাংস খান। শ্রীচৌধুরীর বুদ্ধি এত ক্ষুরধার যে, নিজেই নিজের বক্তব্য ছিন্ন করেন। অনেকটা সেই গল্পে কথিত হজমী লেবুর মতো। লেবু ছুরি দিয়ে কাটলে ছুরির ফলা সঙ্গে সঙ্গে হজম হয়ে যায়।

তবে কি এই তিনশ চল্লিশ পৃষ্ঠার বিলাতে ছাপা বইতে কোন কিছুই নেই? না, শ্রীচৌধুরীর অসামান্য কৃতিত্ব আছে। তিনি আগাগোড়া গল্প বলে গেছেন। শ্রীচৌধুরী মূলত সাংবাদিক। সাংবাদিকদের পক্ষে কি কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে যদি কোন আদর্শ নির্দেশক গ্রন্থ (guide book) কেউ অনুসন্ধান করেন তাহলে এই বইকে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলা যায়।

দুর্বার গল্পগ্রাহিতা আর পণ্ডিতম্মন্যতায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রাচীন গ্রন্থগুলির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হিন্দুধর্মের বিচার মননশীল বিষয়বস্তু হিসাবে

অত্যন্ত দুরূহ, এবং এই দুরূহতা সম্বন্ধে যদি শ্রীচৌধুরীর তিলমাত্র জ্ঞান থাকত তাহলে এ বিষয়ে লিখতে প্রবৃত্ত হতেন না। যেখানেই দুরূহতার সম্মুখীন হয়েছেন শ্রীচৌধুরী অজ্ঞ সাংবাদিকের মতো পাশ কাটিয়ে ভেঁদো কথা বলেছেন।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি সানুরাগ কি বীতরাগ চিন্তাশীল পাঠকের কাছে কিছু এসে যায় না। বিদ্বৎসমাজ শুধু এই বিচার করবে যে লেখক তাঁর বিষয়বস্তু যথাযথভাবে প্রতিপাদিত করেছেন কিনা।

এই বই-এর অধিকাংশে ইংরাজ শাসনের সময়ে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে, হিন্দুদের সাধারণ অধঃপতনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রতিপাদিত হয় নি। যদি সেই পশ্চাদমুখী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অধঃপাতিত সমাজের পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যসম্বলিত বিবরণ দিতে পারতেন তাহলে শ্রীচৌধুরী বিদ্বৎসমাজে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপনা করতেন। কিন্তু তা হবার নয়। শ্রীচৌধুরীর অরূপ-যোগ্যতা নেই, আছে শুধু অনধিকারপ্রবেশীর তুচ্ছ প্রাগল্ভ্য।

আফ্রিকার মানচিত্রে ভূগোলবিৎ যা করতেন শ্রীচৌধুরী তাই করেছেন:
So Geographers in Afric maps with Savage Pictures fill their Gaps; And o'er unhabitable Downs Place Elephants for want of Towns. (Jonathan Swift, On Poetry, a rapsody)

‘মুদ্রারাক্ষস’

অরুণা দেবী (হালদার)

মহাকবি কালিদাস গুপ্ত সাম্রাজ্যের আলোকিত মধ্যাহ্নে যে মহিমি প্রভাবরূপে বিরাজিত, একথা মনে রেখেও আমরা আরো যে কয়েকজনা সংস্কৃতের নাট্যকার ও কবির নাম করতে পারি তাঁদের মধ্যে কবি হিসাবে ভবভূতি এবং নাট্যকার হিসাবে ‘মৃচ্ছকটিকম’-রচয়িতা শূদ্রক এবং ‘মুদ্রারাক্ষসম্’-রচয়িতা বিশাখদত্তের কথা স্মরণীয়। কৃতী নাট্যকার হিসাবে কালিদাস তাঁর ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’-এ নিজরসের যে-উৎকর্ষ দেখিয়েছেন তাতে করে আর অন্যদের কথা সহজে মনে পড়ে না। সে হিসাবেও ‘মৃচ্ছকটিকম্’ এবং ‘মুদ্রারাক্ষসম্’ দুটি নাটকেই বাস্তবানুগতা বা রিয়ালিজমের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের সঙ্গে উপাদেয় উপভোগ্যতা যুক্ত হয়ে নাটক দুটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে এবং কালিদাসের পাশাপাশি এই দুটি নাটকের সম্ভাব্যতা ও সুসমঞ্জস বিন্যাস এতটুকুও নিম্নমানের মনে হয় না। এই দুটি নাটকের মধ্যেও আবার কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই লক্ষিত হয়। সম্ভবত শূদ্রক কালিদাসের সমসাময়িক ; আর অন্য মতে অব্যবহিত পরের নাট্যকার। শূদ্রক নিজে কিন্তু জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ‘শূদ্রক’ নাম তাঁর নিজে নেওয়া। তাঁর গ্রন্থের নায়ক চারুদত্ত জাতিতে ব্রাহ্মণ ; পেশায় বণিক ; এবং উদারচিত্ত বলেই বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত। সমাজজীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম যে তখন সর্বগ্রাসী নয় তার আভাস ‘মৃচ্ছকটিকম্’ নাটকে দেখা গেল।

বিশাখ দত্তের ‘মুদ্রারাক্ষসম্’ অষ্টম শতাব্দীর পরে তো নয়ই, বরঞ্চ কিছু আগেও হতে পারে। বিশাখ দত্তের পিতা ছিলেন মহাসামন্ত বা মহারাজ

ভাস্কর দত্ত; পিতামহের নাম সামন্ত বটেশ্বর দত্ত। নাটকের ঘটনা মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের, বিশেষ, তাঁর মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য কৌটিল্যের চক্রান্ত প্রতিচক্রান্তসূচক কার্যসমন্বিত। 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে স্ত্রী ভূমিকা আছে। 'মুদ্রারাক্ষসম্' নাটকে স্ত্রী-চরিত্র একেবারেই গৌণ। শুদ্ধ রাজনীতি এবং কুশাগ্র কূটবুদ্ধির খেলা নিয়ে এ নাটক রচিত। চন্দ্রগুপ্তের কালে (৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তার পর পর্যন্ত) সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত গুপ্তচর বৃত্তি-নির্ভর ছিল এ কথা ঐতিহাসিকরাও বলে গেছেন। চাণক্যের কৌটিল্য নাম সার্থক। তাঁর পূর্বাশ্রয়ের শত্রু নন্দরাজের মৃত্যুর পর নন্দরাজের প্রভুভক্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে ছলে-বলে-কৌশলে মৌর্য সম্রাটের হিতৈষী মন্ত্রী নিযুক্ত করাই চাণক্যের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সত্য নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার অষ্টম শতাব্দীতে চতুর্থ শতাব্দীর চরিত্রের অবতারণা করেছেন। কৌটিল্যের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক বিশাখ দত্তের সময়েও যে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত একই রকমের ছিল তা বুঝতে আমাদেরও অসুবিধা হয় না। 'মুদ্রারাক্ষসম্' নাটকের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের অত্যন্ত স্বাভাবিক স্পষ্ট চিত্র আমরা পেয়ে থাকি। নাটকটি বাস্তবভিত্তিক।

সম্ভবত উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন 'নান্দীকার'-গোষ্ঠী আজকের দিনে 'মুদ্রারাক্ষসম্' অভিনয় করার জন্ত বেছে নিয়েছেন। মানবচরিত্র মহাসমুদ্রসদৃশ। তার অজস্র ঊর্মি বিভঙ্গ একান্ত সত্য। কোনোদিনই তা পুরাতন হয় না এবং পুর্ণাঙ্গও হয় না। চাণক্যেরই পটভূমিতে চরিত্রগুলি আসে যায়, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। চাণক্যও জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করেন মহাকালের পটভূমিকায়। সত্যের এই মহৎ ও বিশিষ্ট রূপায়ণ তাই অভিনেতা এবং দর্শক সম্প্রদায় উভয়কেই আকৃষ্ট করে। যে-কোনো ক্লাসিকাল ও মহৎ রচনায় এটি একটি বিশিষ্টতা। যুগে যুগে তার নূতন নূতন অর্থবোধ না ঘটার সম্ভাবনা থাকেই। সেই কারণেই আজ বিংশ শতকের কলকাতায় 'মুদ্রারাক্ষস' অভিনীত হয়—আদৃতও হয়। আজকের মানুষজনও রাজনীতির শিকার, কূটবুদ্ধির নিষ্পেষণে নিদারুণ নিষ্পেষিত; আবার সেই অন্ধকার আলোড়নের মধ্যেই দেখা যায় মানবীয় মূল্যবোধ। গাঢ় তমিস্রার মধ্যে আলোক-শিখায় দেখা যায় রাক্ষস চরিত্রের নিষ্ঠা, পরাজিত মৃত প্রভুর প্রতি স্বার্থলেশহীন আনুগত্য এবং চাণক্যের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির জয়লাভের পরই দৃঢ়তাসহকারে অভিনিষ্ক্রমণ এবং বৈরাগ্য গ্রহণ। স্বদেশপ্রীতিকাই যে মনীষা বা বুদ্ধির সত্যরূপ আর তা যে মানুষের মধ্যে,

কর্মতোতনার মধ্যে নিয়ত প্রকাশিত এরূপ উপপাদনও এ নাটক থেকে আহরণ করা যেতে পারে। বুদ্ধি যে শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধি পরিণামিনী—মানবতাই যে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংশ্লেষ-সাধন, এ বিষয়ে ৮ম শতাব্দীর মানুষের সঙ্গে আজকের বিংশ শতকের কলিকাতার মানুষের সত্যই মতভেদ নাই।

নাটক অভিনয় করা এবং দর্শকদের কাছে তাকে সংবেদ্য করে তোলাই নাটকের কুশীলবের প্রধান ও পরম গুণ। প্রথমটি অর্থাৎ অভিনয়কলার মধ্যে থাকে এক ধরনের Transference বা অভিসংক্রামণ এই শব্দটি মনস্তত্ত্বের থেকে ধার নিয়ে কাজচলা গোছের একটা অর্থ পাওয়া যায়। কুশীলবদের নিশ্চয়ই একটা বর্তমান পরিচয় আছে। কিন্তু অভিনেতা হিসাবে তাঁদের অস্তিত্ব মূলত সম্পূর্ণ চিত্তভিত্তিক। এই চমৎকার (আচার্য) চিত্তরসায়নের নাম আমরা 'তত্তাক মূদাস্থিতি' কথাটির দ্বারা অর্থগ্রহণ করতে পারি। সহজ কথায় মানেটি হবে সেই সেই বিষয়ক আনন্দস্মৃতি পরিবহন। দ্বিতীয় কাজটি হলো অভিনয় যেন দর্শকের সংবেদ্য হয়—তা না হলে অভিনয়কুশলতা থাকে না। এর জন্য দরকার একদিকে দর্শকের কিয়ৎপরিমাণ প্রস্তুতি এবং অপরদিকে কুশলী কুশীলবের আত্ম-সংক্রামণের বা অভিক্ষেপণের (projection) অবিষ্ট প্রক্রিয়া। এ স্ব-সংবেদ্যতা এবং সহৃদয় হৃদয় সংবাদ এই দুটি যদি অভিনয়ের সার্থকতার মাপকাঠি হয় তাহলে সন্দেহাতীত ভাবে 'নান্দীকার'-এর 'মুদ্রারাক্ষস' অভিনয় রসোত্তীর্ণ হয়েছে, একথা আমার মতো অনধিকারীর পক্ষেও বলা সম্ভব।

পূর্বেই বলেছি যে অভিনয়কলা সম্পর্কে কিছু বলার অধিকারী আমি নই। কিন্তু দেখে মুগ্ধ হওয়ার বাদপক্ষে অনুরঞ্জিত হওয়ার অধিকার তো যে কোনও দর্শকেরই থাকে। সেই দিক থেকে বলা যায় আলোচ্য অভিনয় সর্বমাত্রায় সার্থক। ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত শম্ভু মিত্র সত্যিকারেরই চাণক্য, তাঁর কণ্ঠস্বর একান্তভাবে তাঁর দখলে। সাধারণতম স্বল্পতম স্বরের পরিবর্তনে প্রতিক্ষণে নূতনত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর বিপরীতে রাক্ষসের ভূমিকায় অবতীর্ণ রুদ্রপ্রসাদ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমগ্র নাটকটি পরিব্যাপ্ত করে আছে চাণক্যের কূটবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব। সেক্ষেত্রে বরং 'মুদ্রারাক্ষসম্' নামটি নিয়ে ভাবতে হয়। তৎসত্ত্বেও রাক্ষসের ভূমিকা যেমনটি হতে পারে রুদ্রপ্রসাদের অভিনয়ও সেরূপ। একটি পরাভূত গতপ্রাণ রাজার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাক্ষস অন্যপক্ষের মন্ত্রী হতে চান না। সাধারণ পর্যায়ে যেটুকু সম্ভব সেইমত আয়োজন করছেন

সামন্তরাজা মলয়কেতুর সহায়তা নিয়ে। তাঁর নিজ স্ত্রী-পুত্রকে রাক্ষস রেখে গেছেন গুপ্তচরপরিবৃত নগরে। তাঁদের আশ্রয় দেবার ফলে রাক্ষসের বন্ধু চন্দনদাস শ্রেষ্ঠীর জীবন বিপন্ন। চাণক্য বিবিধ সূত্রে চর লাগিয়ে সকল খবর সংগ্রহ করেন। ভাগ্যের ক্রীড়নকের মতো রাক্ষসপত্নীর হস্তচ্যুত রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী গুপ্তচর পেয়ে যায়। সমস্ত ঘটনাগুলির বিন্যাস আধুনিক গ্যাংগেস্টার স্টোরির চাইতে কম নয়। চাণক্য সহজ গাম্ভীর্যে ও মহিমায় এ সকল সংবাদ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা জাল বিছিয়ে চলেন। শ্রীশম্ভু মিত্র মহাশয়কে তাঁর যৌবনমধ্যাহ্নে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। কিন্তু আজকের প্রাজ্ঞ প্রৌঢ় শ্রীশম্ভু মিত্র ও চাণক্য সম্পূর্ণভাবে একাত্মীভূত বলে মনে হলো। আরও একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হলাম। চাণক্য চরিত্রের (বোধ করি সব মানুষের মধ্যেই তা বর্তমান) বহিরান্তরের বিমুখিতাকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। একই সঙ্গে চাণক্যের মন্ত্রণানিপুণ শঠতা খলতার সঙ্গে সঙ্গেই পাশাপাশি তাঁর মন চলে যাচ্ছে মানবীয় মূল্য-বোধের তৃপ্তি এবং দীপ্তিতে। তাই সমাপ্তিদৃশ্যে রাক্ষসের সম্মুখে সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত (তৎকালীন মূল্যবোধানুসারে) কুশলকামনা এবং তৎসহ তাঁর প্রব্রজ্যাগ্রহণ, দুটিই শ্রীশম্ভু মিত্রের অনায়াস সৃষ্টি। এ প্রব্রজ্যা পূর্ণ জয়ের ফলশ্রুতি। মহাভারতের পাণ্ডবদেরও রাজ্যজয় করার পর পোয়েটিক জাস্টিস-এর নিয়মমতেই মহাপ্রস্থানের পথে যেতে হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকে এই পোয়েটিক জাস্টিস, শেষের মিলনদৃশ্য প্রভৃতি যথাসাধ্য বিন্যাসে তাব বিভাব, গর্ভ সন্ধি ও উপসংহারের নিয়মানুসারে রসভঙ্গ না করেই চলতেই থাকে। এই কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও শ্রীশম্ভু মিত্র 'অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথ পুটপাক প্রতীকাশ' রসকে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে ব্যঞ্জিত করেছেন। আধুনিক কালে 'মুদ্রারাক্ষসম্'-এর ছায়ানুসারী নাটক চন্দ্রগুপ্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেখানে চাণক্যকে পুনর্ব্যবস্থিত করার জন্য একটি বালিকা কন্যা ও 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'র মতো সঙ্গীতের অবতারণা করেছেন। এখানে তার কিছুই প্রয়োজন হয় নি। শ্রীশম্ভু মিত্রের চোখ ও কণ্ঠই যথেষ্ট।

মন্ত্রী রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টা উদ্যম বারবার চাণক্যের কূট পরিচালনায় বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। তার চারপাশে জাল গুটিয়ে আসছে। সেই খাঁচাবদ্ধ সিংহ তখনও তাঁর মানবীয় মহিমাটুকু মাত্র নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অকস্মাৎ তাঁর চোখে আলো ঝলসে ওঠে। বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক সে সহ

করবে না। তাই সে বলতে পারে 'আমি বনীজীবী নই, অসিজীবী'। রাক্ষস চরিত্রের সমগ্রতা তার অসহায়তা, উত্তম যুক্তি তথা অবিচলিত ধৈর্য সহ রুদ্রপ্রসাদের অভিনয় পরিব্যক্ত হয়েছে। এক ক্ষণের জন্যও তিনি বিচলিত হন না—মিথ্যা আখাসের ভরসা তিনি করেন না। অবশেষে যখন জানেন বন্ধু চন্দনদাস বধ্যভূমিতে নীত শুধু তাঁরই জন্য—তখন তিনি তাঁর মানবমহিমা ও মানবপ্রেম অক্ষুণ্ণ রেখেই ধরা দেন। শেষ দৃশ্যে বা final-এর মধ্যে একটি বাণীই রুদ্রপ্রসাদের কণ্ঠে ধ্রুপদের মত ঘোষিত ও সামূহিকভাবে উচ্চারিত হতে থাকে 'মানুষের ভালো হোক'। এর চাইতে সহজ ও মহৎ কামনা আর নেই। এবং অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে এই বিংশশতক পর্যন্ত যতবার 'মুদ্রারাক্ষসম্' অথবা 'মুদ্রারাক্ষস' অভিনীত হয়েছে এই কথাই তার উজ্জ্বল ঘোষণা। অভিনয় দৃশ্য-কাব্য হওয়াতে এই ঘোষণা শুধু কানে বাজে না চোখের ভিতর দিয়ে মর্মেও প্রবেশ করে। সংস্কৃত নাটকের শেষে একথা সত্যই প্রার্থনা করা হয়:

> "সর্ব্বে সুখিনো সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
> সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেদ্।"

বর্তমানেও আমাদের প্রার্থনা—

> আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
> তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অমৃত জাগে।"

এ নাটক কালোত্তীর্ণ মানুষের সুখদুঃখকে তা সহনীয় করে মহনীয় করে তোলে।

এ পর্যন্ত দুইটি চরিত্রের কথা বলেছি, কিন্তু কোনো চরিত্রই নাট্যে উপেক্ষিত নয়। সামূহিকভাবে সামান্য হস্তসঞ্চালন ভঙ্গিটুকুও নাটকের পক্ষে এক সর্বার্থসাধকতার অঙ্গ। তাই চন্দনদাস, শকটদাস, গুপ্তচরেরা, রাজা মলয়কেতু, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, বধ্যভূমির জল্লাদ, চন্দনদাসের স্ত্রী-পুত্র, বধ্যভূমিতে সমাগত দর্শক যারা কতকটা ভীত ও জড়তাগ্রস্ত কেহই অর্থহীন নয়। অপরদিকে কুশীলবের সংখ্যা এ নাটকে খুবই কম। এত অল্পসংখ্যক লোক এবং এত অল্প নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা প্রমাণ করে নাটকের অভিনয়ের উৎকর্ষ কতখানি। হয় এ সব দিকে এবং আলোক সজ্জার দিকে আমাদের চোখ পড়ে না অভিনয় দেখে যাই বলেই। আর, তা নাহলে হয়ত, এসব আঙ্গিক আমাদের নিতান্ত অজানা

হলেও সেই সজ্জাগুলি যে সম্পূর্ণভাবে নিজ নিজ মাত্রায় পরিবেশিত হয়ে সামগ্রিকভাবে অভিনয় সৌকর্যকে সহায়তা করেছে সে কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সামূহিকভাবে নাটকের অভিনয় কুশলতা নির্ভর করে দলের উপর। সেই Team work এখানে খুবই সার্থক। আমরা মনে করি এই দলের প্রত্যেকটি কুশীলবই সচেতন সহায়তায় পুরো নাটকটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রস্তুতি থেকে শেষ দৃশ্য অবাধ সুগঠিত ও গতিমান করে তুলেছেন। প্রস্তাবনার দৃশ্যে নাচটি আনার কোনো বিশেষ সার্থকতা আমি বুঝতে পারি নি। সেটা আমার অজ্ঞতার ফল হতে পারে। আমার মনে হয়েছে মূল নাটকের সঙ্গে এই নাচের যোগ অর্থপরিবাহী হতে পারে নি।

পরিশেষে একটা কথা বলে এই অনধিকারীর নিবন্ধ শেষ করতে চাই। বর্তমানের সমাজে আমাদের চারিদিকে অবমূল্যায়নের চূড়ান্ত অন্ধকার। সাহিত্যে (উপন্যাস বিশেষভাবে) সিনেমায় প্রায় সকল দিকে অসম প্রেম, বিষম যৌনাচার, উৎকট আকস্মিকতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি যেন মানুষকে দিবারাত্র চাবুক মেরে জানান দিচ্ছে। সেদিক থেকে আমরা বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাই না, একটি ভালো ছবি বা মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে সূক্ষ্ম রসবোধ শ্রেয়োসচেতনা, যুক্তি ও অনুভূতির সমন্বয়ে মানবজীবনকে কতটা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। তা পারা যে সম্ভব 'মুদ্রারাক্ষস' অভিনয় তাইই প্রমাণ করে। এতে স্ত্রী-ভূমিকা প্রায় নেই। যুক্তিবদ্ধ উক্তি, একের পর এক সম্ভাব্য বাস্তবানুগ ঘটনার জাল বোনা এবং তার মধ্য দিয়ে রসকে ওঠা মানবাত্মার অধিকার এবং মানব মহিমার প্রতিষ্ঠাও যে আধুনিক নীতিভ্রষ্ট বিভ্রান্ত সমাজের কিছু সুবুদ্ধিযুক্ত লোকের কাছে আদরণীয়, এটাই আমাদের আশার এবং আশ্বাসের কথা। বলা বাহুল্য যে 'সুবুদ্ধি' বিলাস নয়, এটা মানুষের মহৎ নিয়তি, এবং 'সুবুদ্ধি' মানুষেরই থাকে। আমরা আশা করব নান্দীকার ভবিষ্যতে আমাদের এরূপ আনন্দে অবগাহনের সুযোগ আবার দেবেন। এবং আমরা শম্ভু মিত্র মহাশয়েরও এরূপ আশ্চর্য আবির্ভাব দেখতে পাব।

'মুদ্রারাক্ষসম্'-এর রচয়িতা নায়কের প্রশস্তি করেছেন। তাঁর উক্তি নিচে দেওয়া হল:

"ম্লেচ্ছৈরুদ্বেজ্যমানা ভুজযুগমধুনা সংশ্রিতা রাজমূর্তেঃ
স শ্রীমদ্বন্ধুভৃত্যশ্চিরমবতু মহীং পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ।"

আধুনিক যুগে সেই রাজ-প্রশস্তির স্থান নিয়েছে মানব মঙ্গল মহিমার জয় ঘোষণা। সেই আশ্বাস যেন আমাদের আশায় আনন্দ জেগে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। বলা প্রয়োজন যে সেটা নৈরাজ্য নয়। সংযমশীলতায়, বুদ্ধিদীপ্ত কর্মনিষ্ঠায় এবং নিরাবেগ আন্তরিকতায় দুর্মর পরিশীলনে তা সতত আনন্দময়। 'নান্দীকার' নাম সার্থক হোক।

সংবাদ-প্রবাহ ও চৈতন্যের বৈকল্য

সিদ্ধার্থ রায়

উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভেতর পারস্পরিক সংবাদ আদান-প্রদান প্রধানত পশ্চিমী সংবাদ সংস্থার* মাধ্যমে হয়ে থাকে। বৎসোয়ানার খবর জাম্বিয়ায় পৌঁছয় এ. পি. বা এ. এফ. পি-র মাধ্যমে, ক্যারিবিয়ান দেশগুলো নিজেদের খবর পায় তারা লণ্ডন রয়টার মারফৎ। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংবাদ মাধ্যমে যে খবর পায়, তা লেখা হয় এবং নির্বাচিত হয় পশ্চিমী স্বাদের দিকে তাকিয়ে। বিষয়, আঙ্গিক, পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রক্ষেপ—সমস্তই তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে পশ্চিমী ব্যক্তিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ এবং সে দেশগুলোর ব্যবহার দ্বারা নির্ধারিত।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে উন্নয়নশীল দেশের সাংবাদিক নিয়োগ করলেও প্রেরিত সংবাদে কোনো গুণগত পরিবর্তন হয় না। ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউ. পি. আই.) দাবি করেছে যে তাদের লাতিন আমেরিকান সংবাদ লাতিন আমেরিকার নাগরিকরাই লিখে থাকে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার কার্যরত উন্নয়নশীল দেশের এইসব সাংবাদিকরা সেই সেই প্রতিষ্ঠানের পরিব্যাপ্ত প্রভাবে বদলে গিয়ে পশ্চিমী পাঠককে মনে রেখেই খবর লিখতে শুরু করে। সাংবাদিক জগতের একটি অকথিত স্বতঃসিদ্ধ হলো—একজন সাংবাদিক তার সম্পাদকের পছন্দ-অপছন্দ বা

* (এ. পি., ইউ. পি. আই., রয়টারস, এ. এফ. পি.)

তার প্রতিষ্ঠানের ঝোঁক ও বাচন প্রায় কৈশোরক ক্ষিপ্রতার আয়ত্ত করে নেয়।

উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠান-গুলোর প্রচারিত খবরের ঝোঁক উত্তরায়নেই। এবং ঠিক এই কারণেই উন্নয়নশীল দেশের প্রবক্তারা একমুখী সংবাদ-প্রবাহের অভিযোগ করেন। অভিযোগ এমন নয়—যে, তৃতীয় বিশ্ব উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে কোনো খবরই পায় না। অভিযোগ হলো—পশ্চিমী শক্তিশালী আর্থনীতিক স্বার্থের প্রতিনিধি এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো কেন নিজেদের খবর নেবে। এই অসম আন্তর্জাতিক সংবাদপ্রবাহ শোধরাবার একমাত্র উপায় হলো—আন্তর্জাতিক সংবাদের প্রেক্ষিত বদল করা, তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষায় আর এক সমান্তরাল সংবাদের স্রোত সৃষ্টি করা।

পশ্চিমী সাংবাদিকেরা যে-পদ্ধতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর খাদ্য, জনসংখ্যা, অর্থনীতি, কর্মনিয়োগ নিয়ে লেখে, তাতে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষা থাকা সম্ভব না—কারণ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সমস্যা অতিক্রম করার সংগ্রাম তারা দেখে না। তাদের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত উদ্যোগকে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী ঝোঁক দেওয়া। ভূমিসংস্কার, জাতীয় অর্থনীতির ওপর থেকে গুটিকয় পারিবারিক প্রাধান্য হ্রাস, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর জায়গায় জাতীয় শিল্পের গুরুত্ব বা জাতীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবার যে-কোনো আয়োজনকেই এরা কমিউনিস্ট আক্রমণ বা সমাজতান্ত্রিক নীতিভ্রষ্টতা হিসেবে দেখে। তাদের নিজেদের দেশেই যে কোনো-না-কোনো সময় এরকম আয়োজন হয়েছে, এ সব যে মূলত জনকল্যাণকে মনে রেখেই, পশ্চিমী সাংবাদিকরা তা ভুলে যান।

ফ্রান্সের আঞ্চলিক সরকার নির্বাচনে কিছুদিন আগে বামপন্থী জোট যখন প্রায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল—আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কিন্তু ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক / কমিউনিস্ট মহামারীর কথা উচ্চারণও করে নি। আসলে, উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্পর্কে এদের 'গবেষণামূলক' প্রবন্ধ নিবন্ধের ভেতর প্রকৃত সত্য নিহিত থাকে না—কারণ মাত্র কয়েকদিনের ভ্রমণেই তারা সেই সেই দেশের বাস্তবতার ধরন সম্পর্কে 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে পড়ে।

পশ্চিমী সাংবাদিকদের ক্ষমতা নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের কোনো বলার নেই। বলার হলো—এই সংস্থাগুলোর উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে কোনো বাস্তব ধারণা নেই। খবরকে মনোহারী দ্রব্য হিসেবে সুন্দর মোড়কে ও আরও আকর্ষী ভাষায় পশ্চিমী ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়াই এদের প্রধান দায়িত্ব।

খবরের কাগজের ক্ষেত্রে স্থানাভাবে এবং টি. ভি. বা রেডিও-র ক্ষেত্রে সময়াভাবে, পশ্চিমী সাংবাদিকরা 'উত্তেজক', 'উদ্দীপক' বা 'অদ্ভুত'—এইরকম মানে সংবাদ নির্বাচন করে। এই মানে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক ও সামরিক হাঁকাহাঁকি আর্থনীতিক উন্নয়নের চাইতে বেশি আকর্ষণী। আর সংবাদের এই 'ব্যবহার' থেকেই সংবাদ সরবরাহে বিকৃতি আসে। এবং এদের প্রভাবেই আজও 'সংবাদ'-এর সংজ্ঞা 'উত্তেজক' 'অস্বাভাবিক' বা 'অভূতপূর্ব' এই সব শব্দায় ব্যাখ্যা করা হয়।

তৃতীয় বিশ্বের এই সংবাদ-প্রবাহ সমস্যা নিয়ে নানা জায়গায় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংবাদপ্রবাহের গুণগত পরিবর্তনের কথা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে, ইউনেস্কো ছাড়াও সুইডেনের ডাগ হ্যামারসজোল্ড ফাউণ্ডেশন ও পত্রিকা 'ডেভেলপমেন্ট ডায়লগ', বেলগ্রেডের 'সোস্যালিস্ট থট অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস' এবং মেক্সিকোতে চিলির বুদ্ধিজীবীজুয়ান সোমাভিয়া পরিচালিত 'লাতিন আমেরিকান ইনস্টিটুট ফর ট্রান্সন্যাশনাল স্টাডিজ' (ইলেট)-এ গবেষণামূলক প্রবন্ধে ও ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে। সংবাদপ্রবাহে ভরকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার ভেতর দিয়ে যত ব্যাপ্তি পাচ্ছে, পশ্চিমী দুনিয়ার সংস্থাগুলো ততো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সংবাদ প্রবাহের ভরকেন্দ্র পরিবর্তনে সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব হবে—এই তাদের যুক্তি। সেই কারণেই ইউনিস্কোর দ্বিবার্ষিক সভাতে সংবাদপ্রবাহ 'ব্যবহারের' নীতি পরিবর্তনের সোভিয়েত দাবি এবং ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেলের সম্মতিতে পশ্চিমী দুনিয়ার সংস্থাগুলো আমেরিকার নেতৃত্বে সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও সরকারী খবরদারির প্রশ্ন তুলছে। কিন্তু সংবাদ-প্রবাহের ভেতর পশ্চিমী দুনিয়া অতি সূক্ষ্ম প্রায়-অগোচর ভাষাগত, শব্দগত এবং কোনো ঘটনাকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃতির যে প্রয়াস চালাচ্ছে—তা ব্যাখ্যা করলে উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে তাদের সংবাদ সরবরাহের প্রকৃত চেহারা বোঝা যাবে।

উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন প্রভাবশালী শাখাপ্রশাখার প্রাধান্যে পৃথিবীতে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির স্তম্ভ গড়ে উঠেছে। ন্যাটো এবং সিয়েটো এর প্রধান জোর। এই সামরিক জোট ছাড়াও দেশ-উজানী এই শক্তিগুলোর রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, কারিগরি, শ্রমিকসংস্থা বিষয়ক দিকও রয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বে

বর্তমান কাঠামোয় তারা প্রায় অপরিবর্তিত চেহারা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশ-উজানী এই সব শক্তির আবার একটা সংযোগ-বিজ্ঞাপন-সাংস্কৃতিক দিকও আছে এবং তা আধুনিক সমাজের প্রধানতম শক্তি 'সংবাদ' নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলোর প্রধানতম উপাদান।

দেশ-উজানী এই সব ব্যবস্থায় অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ ও সামাজিক কাঠামো তৈরি করতে পশ্চিমী মূল্যবোধ ও জীবনধারা তৃতীয় বিশ্বে সুষ্ঠুভাবে রপ্তানি করবার মাধ্যম হিসেবে এই উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয়। সংযোগ মাধ্যমের ওপর এই সব দেশ-উজানী শক্তিগুলোর দখল থাওয়া মানে তাদের সব চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়া।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর গঠন ও অন্যান্য দেশ-উজানী ব্যবস্থার সঙ্গে এদের যোগাযোগ, এদের মালিকানা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল হিসেবে ক্রমাগত বিস্তার ও মুনাফাবাজী এবং 'সংবাদ' সম্পর্কে মূল্যবোধ থেকে এরা 'সংবাদ'-কে প্রধানত পণ্য এবং তার বিক্রির ভিত্তিতে দেখে থাকে। অন্য প্রতিযোগী সংস্থার চাইতে কতো সফলভাবে খবর বেচা সম্ভব, অর্থাৎ বাজারের নিয়ম তাদের কার্যপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ামক হয়ে যায়।

সংবাদের স্বাধীন প্রবাহ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের জেনেভা সম্মিলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল তাগিদে বিশেষ করে এ. পি. এবং ইউ. পি. আই মেনে নেওয়া হয়।

কিন্তু এই স্বাধীন সংবাদপ্রবাহের দাবি ছিল মূলত যুদ্ধোত্তর আমেরিকান ব্যবসায়কে একটা শক্তিশালী বহির্মুখী গতি দেওয়ার জন্য। এই দাবিতে তারা নিজেদের স্বাধীনতার দিকটিও জুড়ে দিল এবং তাদের কার্যকলাপের জন্য তাদের কারও কাছে জবাবদিহি করবার প্রয়োজন রইল না। আন্তর্জাতিক ঘটনা বিশ্লেষণে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী খুশী মতো কাজ করবার, তাদের পছন্দ মতো দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করবার অধিকারের ছাপ তারা পেয়ে গেল। ফলে, স্বাধীন সংবাদপ্রবাহের গুণগত চেহারাটাই বদলে গেল—স্বাধীন সংবাদপ্রবাহ মানে এই সংস্থাগুলো যা সরবরাহ করবে, তাই; অর্থাৎ সমসাময়িক বাস্তবতার তারাই প্রবক্তা।

এদের এই চারিত্র্যলক্ষণ থেকে এরা সংবাদ-নির্বাচনে যে মান প্রয়োগ করে তাতে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ ও সামাজিক বাস্তবতা, কোনোটিরই প্রতিফলন থাকে না।

এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কী সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ইতস্তত আপাত-সাধারণ শব্দ বদলে সম্পূর্ণ খবরের চেহারাটাই ভেতর থেকে পাল্টে দেয়, একটু লক্ষ্য করলেই তা টের পাওয়া যাবে। এমন এমন বদল—যা প্রায়শই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। তার মানে, আমরা তাদের স্বীকার করে নেই।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুদ্ধ সীমান্ত থেকে যত খবর এসেছে—তার মূল অংশই এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। সেই খবর পাঠাবার প্রক্রিয়াতে এই সংস্থাগুলো "BODYCOUNT" বলে একটা নতুন শব্দ তৈরি করেছে। শব্দটির আপাত কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু এতো শব্দ থাকতে মৃতদেহ বোঝাতে শুধুমাত্র এই শব্দটি পছন্দ করা কেন? ভিয়েতনাম যুদ্ধের মানবিক আবেদন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই ছড়িয়ে পড়বার অন্তত প্রধান মাধ্যমগুলো থেকে যদি এমন শব্দ নির্বাচনে খবর প্রচার করা যায়, যাতে খবরের ভেতর এক অমানবিক নৈর্ব্যক্তিকতা আসে তাহলে, পাঠকের ভেতরও ক্রমাগত অভ্যাসের ফল হিসেবে এই অমানবিক নৈর্ব্যক্তিকতা এনে দেওয়া যায়। শব্দের সে ক্ষমতা আছে। "BODY-COUNT"—এই বিশেষ শব্দটির ভেতর একটি অন্যায় যুদ্ধের সমস্ত অপরাধ ও অর্থহীন মৃত্যুর হাহাকার নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কে এমন চূড়ান্ত অমানবিক নৈর্ব্যক্তিক শব্দ আর কোনো ভাষায় আছে বলে মনে হয় না। এবং অন্যান্য বহু শব্দের মতো এই শব্দটিও এই সংবাদসংস্থাগুলোর অবদান। ক্রমাগত এই শব্দে জারিত হতে হতে পাঠক একসময় সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য যে—যুদ্ধটা আমেরিকার মানুষ বোধহয় কোনো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে করছে। কারণ, মৃতদেহের প্রতি ন্যূনতম সম্মানও তো শব্দটির ভেতর নেই।

'মার্কসিস্ট' প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে—কেন? এ বর্ণনাও এদেরই। এবং সমস্ত পৃথিবীই এই বাচন ব্যবহার করে। আমরা করি। 'ক্যাপিটালিস্ট' প্রেসিডেন্ট কার্টার নয় কেন তাহলে? তারা তা বলবে না। 'এক্সট্রিমিস্ট' 'রেবেল' এই সমস্ত শব্দের বিশেষ ব্যবহার এদেরই তৈরি। কেন তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিমী নেতাদের আগে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বিশেষণ বসে না? কেন তাহলে কোর্টে অভিযুক্ত ইংল্যাণ্ডের সমকামী নেতার নামের আগে 'পারভার্টেড' বলবে না? যদি ইদি আমিনের নামের আগে 'স্ট্রংম্যান' থেকে শুরু করে 'ম্যানইটার' অবধি বিশেষণ ব্যবহার করা যায়—দ্বিধের

নামের আগে 'অমানুষ' আর দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের আগে 'ফ্যাসিস্ট' ব্যবহৃত হবে না কেন?

একদিকে—খবর হবে সুসম নৈর্ব্যক্তিক—এই যুক্তিতে 'BODYCOUNT'-এর মতো শব্দ ব্যবহার; অন্যদিকে উপরোক্ত উদাহরণগুলো কী চূড়ান্ত ব্যক্তিমতের প্রকাশ। প্রায় জাতিগত ঘৃণা। নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিসর্বস্বতার এই সূক্ষ্ম মিশাল থেকে তৈরি করা হয় পশ্চিমী সংস্থার রিপোর্টাজ, দৈনিক সংবাদ, বিশেষজ্ঞ কলম।

সংবাদ-সরবরাহ সামাজিক দায়িত্ব। ব্যবসা নয়। জনকল্যাণের অব্যবহিত অন্যান্য সামাজিক দায়িত্বের মতোই এই কাজকেও গুটিকয় ক্ষমতাশালী অর্থবান সংস্থার বিচার ও সিদ্ধান্তের কাছে সমর্পণ করা যায় না। সংবাদ সরবরাহ ক্ষমতার জন্ম দেয় এবং সমাজের বুনট ও গড়ন এমন হওয়া দরকার যাতে ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিরা ক্ষমতার ব্যবহারে সামাজিক দায়িত্ববদ্ধ থাকে।

সংবাদ সরবরাহের ব্যবসায়িক ধারণা থেকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এক কৃত্রিম বিভাগ তৈরি করেছে 'সংবাদ' ও 'অ-সংবাদ'-এর ভেতর।—যা বাজারে বেচা যাবে তা 'সংবাদ', যা যাবে না তা 'অ-সংবাদ'। বাজারে বিক্রির সম্ভাবনা থেকে সংবাদ নির্বাচন করা মানেই বাস্তবতার এক বিকৃত মিথ্যে চেহারা প্রচার করা।

রয়টারস-এর জেনারেল ম্যানেজারের এক বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে—যে, তার সংস্থার আয়ের শতকরা বিশ ভাগেরও কম যোগায় ইংল্যাণ্ডের বাজার। এতেই বোঝা যাবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ কত ব্যাপক। পরিষ্কার ভাষায় এরা ঘোষণা করে—লাভ করাটাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ? 'ক'-তে লাভ করতে পারলেই তবেই 'খ'-তে তারা নিজেদের সংস্থাকে ছড়াতে পারবে। এবং লাভ করতে পারলেই তবেই সরকারি সাহায্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করা যাবে।

এই আন্তর্জাতিক সংস্থা কী ভাবে একটা দেশকে তার দেশজ মাপকাঠিতে বিচার করবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় অর্থাৎ দেশকে তার নিজের কাছেই অপরিচিত করে তোলে—একটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে।

১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর এই সংস্থাগুলো যখন সুরিনাম রিপাবলিকের জন্মক্ষণের বিবরণ সরবরাহ করছিল—সেদিন লাতিন আমেরিকার একটিও সংবাদপত্র তাদের সাংবাদিক পাঠায় নি, অনেকে এজেন্সি রিপোর্টও ব্যবহার

করা প্রয়োজন মনে করে নি। জুরিয়ানের সেদিনকার ঘটনা পরিষ্কার প্রমাণ করেছিল পশ্চিমী সংবাদ প্রভাবপুষ্ট লাতিন আমেরিকার বুদ্ধিজীবি মানস নিজের দিকে তাকাতেই অসমর্থ, আত্মবিচারে অপারগ। চিন্তার এই বৈকল্য কী অবক্ষয়ী, দেশের চৈতন্যের সম্পদেও ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

সমীক্ষাতে দেখা গেছে—এই সংবাদসংস্থাগুলোতে সি. আই. এ-র অনুপ্রবেশ। দেখা গেছে—শব্দের হিসেবে, বিষয়ের হিসেবে এরা কীভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঝোঁক দিয়ে সংবাদ সরবরাহ করে। এ সমীক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই করা হয়েছে। এবং ফলাফলে তারা যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়েছে।

ঠিক এভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ (হ্যাঁ—মার্কিন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ) ঠেকাবার জন্য সংবাদ 'ব্যবহারের' পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলে ইউনেস্কোতে সোভিয়েত রাশিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করলে এরা একজোটে তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

১৯৭৬ সালের ১২ জুলাই—কোস্টা রিকা-তে ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেল আমাদু-মাহ্‌তর ম্‌বউ (Amadou-Mahtar M'bow) বক্তৃতায় পরিষ্কার জানালেন—

> "Even today many observers find that the selection of news as most often practised by certain large international news agencies systematically stresses the phenomena of tension or violence in the countries of the third world. On the other hand, in many cases, they feel that those agencies keep silent on events of a positive nature which occur with increasing frequency in those same countries. The evil is aggravated at the level of the individual mass communication medium where a further and still more restrictive selection is made, as a result of which the user is only provided with a cericature of the day's news, sketched in a few haxty lines..."

ইউনেস্কোর এই ব্যাখ্যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত প্রভাবের পরিমাপ হিসেবে চিহ্নিত করে। আর ইউনেস্কোকে ধমকায় যে, ইউনেস্কোর

শতকরা পঁচিশ ভাগ প্রতিশ্রুত মার্কিন সাহায্য এবং বকেয়া ২০ মিলিয়ন ডলার তারা বন্ধ করে দেবে, যদি না এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা হয়।

মার্কিন ধমকানির সুরই তার চরিত্র প্রকাশ করে।

ক্ষমতা ও অর্থের শক্তিতে বলীয়ান এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে পশ্চিমী, বিশেষ করে, মার্কিন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাবার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যতক্ষণ না পাল্টা সংবাদ প্রবাহের স্রোত দানা বাঁধবে—তৃতীয় বিশ্ব তত তার চারিত্র্য ও চৈতন্যের বৈকল্যে জড় হতে থাকবে।

কলকাতার নগর বিন্যাসের মূল রূপ

সুনীল মুন্সী

"কলকাতা ভারতের মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা মনোরম শহর"

চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৯৩৫

[ক]

নগরের গঠনবিন্যাস বা কাঠামো ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা অতীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সকল শহরের গঠন বিন্যাস এক নয়, বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের দরুন তাদের গড়ে ওঠার ইতিহাসও বিভিন্ন। এমনকি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশ সমপ্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজের গঠন ও ইতিহাসকে একেবারে এক বলে কেউ মনে করবেন না। মিল এক জায়গায় অবশ্য পাওয়া যাবে, এ মিল আছে নগরের জন্ম ও বৃদ্ধির মৌলিক সূত্রে।

গ্রাম ও শহরের পার্থক্য প্রসঙ্গে মার্কস্ একাধিকবার বলেছেন, প্রথম আধুনিক শহরের আবির্ভাব ঘটেছিল যখন সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে কৃষি থেকে শিল্প ও বাণিজ্য পৃথক হয়ে সৃষ্টি হলো গিল্ডের শহর। তারপর বাণিজ্য থেকে শিল্প পৃথক হয়েছে, বাণিজ্যের ব্যাপ্তির ফলে বিচ্ছিন্ন শহরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং উৎপাদনের ক্রমবিকাশের ফলে শ্রম-বিভাগ আর এক ধাপ এগিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক এক ধরনের শিল্প উৎপাদনে পারদর্শী এক একটি শহর। অর্থাৎ গঠন ও আকৃতি যাই হোক না কেন, কোন শহরকেই উৎপাদন ব্যবস্থাজাত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা সম্ভব নয়। তবু এই অসম্ভবকেই সম্ভব বলে চালানোর চেষ্টা সমাজবিজ্ঞানে অনেক-

কাল ধরে চলে এসেছে। শহরের গঠন বা কাঠামো নিয়ে বহু জটিল তর্ক পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে শহরের সম্পর্ককে সর্বদাই কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই কারণে তৃতীয় দুনিয়ার নগর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রাক্স্বাধীনতাযুগে চাহিদা ও স্বাধীনতাউত্তর কালে নয়া উপনিবেশবাদের চাপ আলোচনায় স্থানই পায় না।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে শহরের কাঠামোর মৌলিক সম্পর্ক নিয়ে এঙ্গেল্স অন্তত পুরো দুখানা বই-এ আলোচনা করেছেন, একটি 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' ও অন্যটি 'বাসস্থানের প্রশ্ন'। প্রথম বইটিতে এঙ্গেল্স্ বলেছেন, সম্পত্তির চূড়ান্ত কেন্দ্রীকতা ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের শহরগুলিতে। সবগুলি শহর এক ধরনের নির্মম সামাজিক লড়াই-এর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। উৎপাদন ও জীবনধারণের প্রকরণ-গুলির উপর সরাসরি অথবা বকলম দখলদারী কায়েম করে মূলধনকে অস্ত্র করে এই লড়াই চলে। তাই গরীব নগরবাসী শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যা জোটে তাতে মানুষের মতো জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ম্যাঞ্চেস্টার, এডিনবরা, গ্লাসগো প্রভৃতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বড় বড় শহরগুলির কাঠামোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে এঙ্গেল্স দেখিয়েছেন, এইসব শহরগুলি তৈরিই হয়েছে উপরোক্ত সামাজিক লড়াই-এ বিত্তবানদের স্বার্থের অনুকূলে, যাতে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ ও অর্থবান সম্পদ-শালী মানুষের জীবন ধারার মধ্যে থাকে আকাশ-জমিন ফারাক। সম্পদ-শালীদের এমনই এক অনুক্ত অথচ অনমনীয় মনোভাব রূপ পেয়েছিল ম্যাঞ্চে-স্টারে। ব্যবসা, বাণিজ্য, অফিস-কাছারি ও গুদামঘর নিয়ে গড়ে উঠেছিল শহরটির কেন্দ্রস্থল। সেখান থেকে প্রশস্ত সড়ক চলে গিয়েছিল নানাদিকে, তাদের দুপাশে লাইন দেওয়া দোকান পাট। কেন্দ্রকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে চাপা ঘিঞ্জি একটি শীর্ণ বলয়ের মধ্যে ছিল শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থান। তারও বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর একটি বলয় গড়ে উঠেছিল সম্পত্তিবান মানুষের ঘরবাড়ি বাগান নিয়ে। শহরের কেন্দ্রর সঙ্গে এই বহিরাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করেছে বড় বড় সড়কগুলি। প্রতি বছরই ম্যাঞ্চেস্টারের আকৃতি একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে, পুরানো ঘরবাড়ি ভেঙে নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে, জমির দাম বেড়েছে হু হু করে, কিন্তু শহরের এই মৌলিক কাঠমাতে কোনো ব্যতিক্রম আসে নি। হয়তো প্যারিসের মতো শ্রমজীবী মানুষকে নগর উন্নয়নের নামে এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে

দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সামাজিক লড়াই শেষ হয় নি, বরঞ্চ তীব্রতর হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী লুই মামফোর্ড বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শহরকে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সংগঠন হিসাবে ভাবা শেষ হয়ে গেছে, শহরকে দেখা হয়েছে বাণিজ্যের উদ্যোগক্ষেত্র হিসাবে। শহরের কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে জমির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং শহর থেকে মুনাফা লোটা যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে জমি নিয়ে ফাটকাবাজীর মুনাফা হয়ে দাঁড়াল নগর পরিকল্পনার মূল চালিকা শক্তি।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শহরগুলি যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থেকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হতে থাকল তখন চালিকা শক্তিতেও এল পরিবর্তন। খনি, শিল্প ও রেলপথ হয়ে দাঁড়াল শহরগুলির কাঠামোর মূল ভিত্তি। ধ্বনি উঠল—শিল্পের প্রয়োজনে নগর। এই ধ্বনির সঙ্গে শিল্পের উৎপাদন সম্পর্ক যেন নগরে প্রতিফলিত হলো। এইসব শিল্পনগরগুলির নতুন পরিবেশকে মামফোর্ড অভিহিত করেছেন 'কারখানা, রেলপথ ও বস্তি' বলে। অর্থাৎ শিল্পোদ্যমের প্রয়োজনে শহর, পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সাথে রেল লাইন মারফৎ সেই শহরের গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক, এবং কারখানার প্রয়োজনে কোনক্রমে জীবন ধারণের জন্য উপযোগী গড়ে ওঠা বস্তি, যেখানে হাজার হাজার মানুষ জীবিকা উপার্জনের আশায় জড়ো হবে, কিছু সৌভাগ্যবান কলে-কারখানায় তাদের শ্রম বিক্রি করতে সমর্থ হবে আর বাকিরা থেকে যাবে বেকার বাহিনী হিসাবে। পশ্চিমের যে কোনো শিল্প-নগরীর এই ছিল মূল কাঠামো। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লণ্ডন, লিভারপুল ও হাল-এর মতো বন্দর ও ব্যবসাকেন্দ্রে অথবা ক্লাইড উপত্যকা, উত্তর-পূর্ব উপকূল, পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, পশ্চিম রাইডিং এবং পশ্চিম মিডল্যাণ্ডের মতো খনি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রথম দিকে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। সাধারণত হাল্কা শিল্প, বিশেষ করে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাঁচা মালের ভিত্তিতে যে-সব কারখানা তৈরি হয়েছিল তাদের অধিকাংশই স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিল বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে।

ফরাসী অর্থনীতিবিদ পিয়ের যোসেফ প্রুধোঁর সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে এঙ্গেল্‌স 'বাসস্থানের প্রশ্ন' বইটিতে লিখেছিলেন, শহরের ভূসম্পত্তির যারা মালিক, তারা জমি কেনে, বেচে বা বাড়ি ভাড়া দেয় একান্তই

ব্যবসায়িক স্বার্থে। জমি বা বাড়ি এখানে বেচা-কেনার বস্তু। এতে শুধু যে শ্রমিক লুণ্ঠিত হয় তাই নয়, মধ্যবিত্ত মার খায় মুনাফাখোরদের হাতে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই ফল। যতদিন এমন অবস্থা অব্যাহত থাকবে ততোদিন অতি কুখ্যাত শুকরের খোঁয়াড়ের জন্যও ভাড়াটে মিলবে এবং গৃহের মালিক হিসাবে ধনিক ও বণিকের অধিকার ও কর্তব্যই হবে তার সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ যত বেশি আয় করে নেওয়া যায় তার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

কাজেই নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা যখন আজকাল আমরা শুনি তখন শহরের কাঠামোর কথা মনে উদয় হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, যে কাঠামোতে আজও সেই সামাজিক লড়াই-এর প্রতিফলন ঘটছে। একথাও মনে রাখতে হবে, মার্কস বা এঙ্গেলস যে সব শহরের কথা লিখেছিলেন সেগুলির সবই অবস্থিত ছিল স্বাধীন শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। সাম্রাজ্য থেকে সংগৃহীত বিপুল ঐশ্বর্য তাদের শিল্পোদ্যমকে শক্তি যুগিয়েছিল, তাদের নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সাম্রাজ্য থেকে সম্পদ আহরণের আকাঙ্খায় একই সময়ে উপনিবেশগুলিতে যে আর এক ধরনের নগরের পত্তন হচ্ছিল, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল নিতান্তই ভিন্ন। এখানে নগর গঠনের মূল চালিকাশক্তি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিশেষ পদ্ধতি নগর পরিবেশে এক বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তৃতীয় দুনিয়ার নগর কাঠামোতেও এমন অনেক বিশেষত্ব থেকে গেছে যা ইংলণ্ড, ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় চোখে পড়ে না। চলতি কথায় আমরা বলি বটে যে আমাদের দেশের কোনো এক শহর ইউরোপের কোনো এক শহরের যেন প্রতিবিম্ব। কিন্তু এ শুধু কথা। আসলে আমাদের দেশের কোন শহরের পক্ষেই ঠিক ইউরোপীয় কোনো শহরের প্রতিবিম্ব হওয়া সম্ভব নয়, কলকাতার পক্ষে তো নয়ই। কলকাতার কাঠামো নিয়ে খানিকটা আলোচনা এই সূত্রেই প্রাসঙ্গিক হবে।

[খ]

ইংরাজ সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনের তাগিদে গঙ্গার ধারে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসতি ও বাজার নিয়ে কলকাতার জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত কলকাতার

একমাত্র কাজই ছিল ব্যবসা, তারতে ইংরাজ ব্যবসায়ের বৃহত্তম ঘাঁটি হিসাবে। ১৮২০ সাল থেকে ১৯০০ শতকের মধ্যে, কিছু আগে বা পরে, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় সমস্ত রাজধানী যখন শিল্পনগরীতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং 'শিল্পের প্রয়োজনেই মহানগর' এই আওয়াজ সর্বত্র পুরানো হয়ে যাচ্ছে, কলকাতায় তখনো চলছে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজত্ব।

১৮৫৪ সালে প্রথম চটকল বসলো রিষড়াতে, কলকাতা শহরের বাইরে। তারপর ১৮৬০, ১৮৭২-৭৩, ১৮৮২-৮৫ ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে চটকলের বিপুল প্রসার ঘটলেও তার অধিকাংশই স্থাপিত হলো কলকাতার বাইরে। কলকাতার নগর সীমানার মধ্যে গড়ে উঠল মাত্র তিনটি চটকল ও দুটি জুট প্রেস। অন্যদিকে ১৯০৩-৪ সালে হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে মোট চটকলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৬টি। তাতে প্রতিদিন শ্রমিক নিযুক্ত হতো গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজারের মতো। শহরের চারপাশে তখন তেলকল ছিল ৬৩টি, ২৪টি ময়দাকল, ২টি চালকল, ১৬টি ছোটখাট লোহার কারখানা, ১২টি চামড়ার কারখানা ইত্যাদি। এই সবে কাজ করত প্রায় ১৩ হাজার শ্রমিক।

১৯০১ সালে আদমসুমারীর হিসাবে দেখা গেল কলকাতার প্রায় ৪ লক্ষ ৪২ হাজার নগরবাসীর মধ্যে শতকরা ৫ জন সরকারী চাকুরে, ১৮ জন গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত, ৭ জন অদক্ষ শ্রমিক, ব্যবসায় নিযুক্ত ২৪ জন, ৩২ জন উৎপাদন ও উৎপাদিত বস্তু সরবরাহের কাজে নিযুক্ত। কলুটোলা, মুচীপাড়া, ভবানীপুর, এন্টালী ও বেনিয়াপুকুরকে চিহ্নিত করা হলো ছোটখাট হস্ত শিল্পকর্মের অঞ্চল হিসাবে, আর ব্যবসার জন্য জোড়াসাঁকো, বড়বাজার ও জোড়াবাগান অঞ্চলকে। বড়তলা ও ভবানীপুরে উকিল, মোক্তার ডাক্তার ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তির আধিক্য দেখা গেল।

চল্লিশ বছর পরে ১৯৪১ সালে, ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন কারখানার সংখ্যা কলকাতার চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার ভুক্ত এলাকায় ছিল ১৯৪টি ও সেই সব কারখানায় দৈনিক কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের গড় সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭,৪৫৮। কলকাতার পৌর এলাকার জনসংখ্যা তখন ২১ লক্ষাধিক। অর্থাৎ হিসাবপত্রে কারখানার সংখ্যা প্রায় দুশো হলেও অধিকাংশই ক্ষুদ্র। তার আবার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ছিল ছাপাখানা (৯৭টি)। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো কলকাতার

শিল্পগুলিও যেন ছিল উপনিবেশবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সরকারী ও সওদাগরী অফিস-কাছারী ও তার ছত্রছায়ায় পুষ্ট হাজার দপ্তরখানার ছাপার চাহিদা মেটাতেই কেন্দ্রীয় কলকাতার কলকারখানার শতকরা পঞ্চাশভাগ ছিল নিযুক্ত এবং তারই ভিত্তিতে কলকাতার শিল্প-নগরী আখ্যা, একথা ভাবতেও যেন অস্বস্তি লাগে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, সার্কুলার রোড বেষ্টিত কেন্দ্রীয় কলকাতার বাইরে পৌর এলাকার প্রান্তে ইতিমধ্যেই কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। যদি ধরাও যায় যে এই অঞ্চলগুলিও শহরতলীর শিল্পাঞ্চলকে কলকাতার মধ্যে গণ্য করে হিসাব করা উচিত তাহলেও দেখা যাবে হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার যে মাত্র ৮·৬ শতাংশ মানুষ ১৯৪১ সালে ফ্যাক্টরি আইনের আওতাভুক্ত কারখানাগুলিতে কাজ করতেন তাদের সঙ্গে খাস কলকাতার সম্পর্ক ছিল অতি নগণ্য। কলকাতার পৌর এলাকার সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে সযত্নে তাদের বাইরে রাখা হয়েছিল। শহরতলীর কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

স্বাধীনতার ১৩ বছর পরে ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেল কলকাতায় গৃহশিল্প বাদে অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত আছেন শহরের জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ। ১৯৭১ সালে তা থেকেও এক শতাংশ কমে গেল। এই হিসাবে ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন কারখানার বাইরেও অনেক ছোটখাট কারখানা ধরা আছে যার সংখ্যা চিরকালই কলকাতায় অসংখ্য। সার্কুলার রোড বেষ্টিত কেন্দ্রীয় কলকাতায় শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন কারখানা ও তাতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ধরলে দেখা যাবে ১৯৬০ সালে ৫৩১টি কারখানায় কাজ করতেন প্রায় ২৩ হাজার মানুষ আর ১৯৭৪ সালে ৬৪৩টি কারখানায় কাজ করতেন ১৯ হাজারের সামান্য কিছু বেশি মানুষ। আর এই ১৯ হাজারের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৭ জন ছিলেন নানাবিধ ছাপাখানা, প্রকাশনী ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজে নিযুক্ত। অর্থাৎ ১৯৪১ সালের পর ৩০ বছরের কর্মক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কলকাতার চেহারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি।

[গ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে কলকাতার বিচ্ছিন্ন বসতিগুলিতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বসতিগুলির আকারও। ফলে কিছু-

কালের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা আপাতদৃষ্টিতে ক্রমশ মুছে গেলেও একধরনের বিভেদ জন্মচিহ্ন হিসাবে রয়ে গেল। একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে লবণহ্রদ এরই মাঝে লম্বভাবে যে কলকাতা গড়ে উঠল তার কেন্দ্রে থাকল লালদীঘি, পুরানো কেল্লা ও রাইটার্স বিল্ডিংকে ভিত্তি করে ইউরোপীয় ব্যবসা, শাসন, বসতি ও সামরিক ঘাঁটি এবং সেখান থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত বহুবাজার স্ট্রীট। বহুবাজার স্ট্রীটের উত্তরে গড়ে উঠল ভারতীয় অঞ্চল, দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীট পর্যন্ত একটি মিশ্র অঞ্চল ও তারও দক্ষিণে সার্কুলার রোড অবধি ইউরোপীয় বসতি। মিশ্র অঞ্চলকে হয়তো পুরানো পর্তুগীজ, গ্রীক বা আর্মেনিয় এলাকা বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। সি. আর. উইলসনের লেখা থেকে জানা যায়, ইউরোপীয় অঞ্চলের মতো উত্তরে ভারতীয় অঞ্চলে বড় ও ভাল বাড়িগুলি ছিল নদীর ধারে। তাদের পিছনে ছিল মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের ভীড়। সার্কুলার রোডের দক্ষিণে পদ্মপুকুর ভবানীপুর অঞ্চলে আরও একটি ভারতীয় বসতি ছিল, আকারে অনেক ছোট। কিছু অবস্থাপন্ন ভারতীয় থাকতেন এখানে।

১৮৩৩ সালে কলকাতার তদানীন্তন চীফ ম্যাজিস্ট্রেট শাসন ও উন্নয়নের সুবিধার জন্য নগর কলকাতাকে চারটি মূল অঞ্চলে ভাগ করার সুপারিশ করেছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এক হলেও যে বিচ্ছিন্নতা কলকাতায় রয়ে গিয়েছিল এই সুপারিশে তার প্রমাণ মিললো। চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ম'ফারলান-এর প্রস্তাবিত চারটি বিভাগ ছিল এই রকমের : (১) **উচ্চ উত্তর ডিভিশন**—উত্তরে মারাঠা খাল ; দক্ষিণে মেছুয়াবাজার রোড, কটন স্ট্রীট থেকে মীরবাহার ঘাট ; পূর্বে সার্কুলার রোড ; পশ্চিমে হুগলী নদী। (২) **নিম্ন উত্তর ডিভিশন**—উত্তরে মেছুয়াবাজার রোড, কটন স্ট্রীট, মীরবাহার ঘাট ; দক্ষিণে বৈঠকখানা রোড, বহুবাজার স্ট্রীট এবং কেয়ার স্ট্রীট থেকে পুলিশ ঘাট ; পূর্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে হুগলী নদী। (৩) **উচ্চ দক্ষিণ ডিভিশন**—উত্তরে বৈঠকখানা রোড এবং বহুবাজার স্ট্রীট থেকে পুলিশ ঘাট ; দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীট ও এস্‌প্লানেড রো থেকে চাঁদপাল ঘাট ; পূর্বে সার্কুলার রোড ও ও পশ্চিমে হুগলী নদী। (৪) **নিম্ন দক্ষিণ ডিভিশন**—উত্তরে ধর্মতলা স্ট্রীট ও এস্‌প্লানেড রো থেকে চাঁদপাল ঘাট ; দক্ষিণে ও পূর্বে সার্কুলার রোড ; পশ্চিমে ফোর্ট উইলিয়মের মাঠ।

এই চারটি ডিভিশনের প্রথম দুটিতে ছিল মূল ভারতীয় বসতি। তৃতীয় ডিভিশনটি মিশ্র অঞ্চল, চতুর্থ ডিভিশনটি সম্পূর্ণ ভাবেই ইউরোপীয়।

ম'কারলার-এর প্রস্তাব অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সরকার গ্রহণ করলেও কাজ আরম্ভ হলো শুধুমাত্র তৃতীয় মিশ্র ডিভিশনে, অর্থাৎ ভারতীয় ও ইউরোপীয় অঞ্চলের যোগাযোগ স্থলে। ভারতীয় অঞ্চলের দুর্দশার বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই। নোংরা, অস্বাস্থ্যকর সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ এই অঞ্চল থেকেই হামেশাই নানা সংক্রামক ব্যাধি অনায়াসে ইউরোপীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। কাজেই তৃতীয় অঞ্চলের উন্নতির মানে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বসতির মধ্যে একটি 'মধ্যবর্তী বাধা'র (buffer) অঞ্চল সৃষ্টি করা। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, প্রথম ডিভিশনে সে সময় ঘরবাড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত কম, কিছু অবস্থাপন্ন ভারতীয়র বড় বড় বাগানবাড়ি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় ডিভিশনে ভীড় ছিল অনেক বেশি। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনে গঙ্গার দিকে নদীর সাথে সমান্তরাল ভাবে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় ব্যবসাদারদের মূল কর্মকেন্দ্র সুতানুটির বাজার।

এর প্রায় ৬৬ বছর পরে ১৮৯৯ সালে ম্যাকেঞ্জি আইন গৃহীত হলো। এতে বলা হলো, তিনটি স্বার্থরক্ষা কলকাতা পৌরসভার কর্তব্য: প্রথম, শহরটিকে যারা ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান হিসাবে গড়ে তুলেছে সেইসব ইউরোপীয় ব্যবসায়িক স্বার্থ; দুই, ভারত উপনিবেশের রাজধানী হিসাবে কলকাতাকে যারা বিশ্বের দরবারে বিপুল প্রতিপত্তি দিয়েছে সেই সরকারী স্বার্থ; তিন, শহরে বাড়ি ও জমির দেশী-বিদেশী মালিকের স্বার্থ।

ইতিমধ্যে আশেপাশের কিছু গ্রাম নিয়ে কলকাতার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৮৮৮ সালের আইনে উপকণ্ঠের ৭টি গ্রামকে যোগ করে শহরটিকে ভাগ করা হয়েছে ২৫টি ওয়ার্ডে। ১৮৯৯-এর আইনে শহরটিকে যে নতুন চারটি ডিভিশনে ভাগ করা হলো তার চেহারা এই রকম:

১. উত্তর ডিভিশন—১ থেকে ৬নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ২১৫,৫৫৫

২. মধ্য ডিভিশন—৭ থেকে ১১নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ১৬৪,৩২৮

৩. দক্ষিণ ডিভিশন—১২ থেকে ১৯নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ১২৪,০৫৯

৪. শহরতলী ডিভিশন—২০ থেকে ২৫নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ১৪৫,৪১৯

সমসাময়িককালে কলকাতার কাঠামো বর্ণনা প্রসঙ্গে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়র লিখল, বিশাল ময়দানবেষ্টিত ফোর্ট উইলিয়ম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর উত্তরে আছে ইউরোপীয়দের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির অফিস আর পূর্বে অবস্থিত তাদের বসতি। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে বালিগঞ্জ ও আলিপুর মূলত ইউরোপীয় উপকণ্ঠ। আলিপুরে

লেফটেনেন্ট গভর্নরের বাড়ি। ইউরোপীয় বসতিকে চতুর্দিক থেকে যেন ঘিরে রয়েছে ভারতীয় বসতি। লালদীঘির ইউরোপীয় বাবসাকেন্দ্রের ঠিক উত্তরে আছে দেশী ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র বড়বাজার। তিনটি প্রধান সড়ক ভারতীয় বসতি অঞ্চল ভেদ করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে, আর গোটা ছয়েক রাস্তা পূব থেকে পশ্চিমে গঙ্গার ধার পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করছে।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়রের এই বর্ণনার সাথে ম্যাকেঞ্জি আইনের সামঞ্জস্য আছে। ওয়ার্ড হিসাবে দেখলে বলা যায় ইউরোপীয় বসতি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ ডিভিশনের ১৬ (পার্ক স্ট্রীট), ১৭ (বামুন বস্তি) ও ১৮ (হেস্টিংস) নং ওয়ার্ডে। শহরতলী ডিভিশনের ২১ (বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ) এবং ২৩ (আলিপুর) নং ওয়ার্ডেও ছিল ইউরোপীয়দের প্রাধান্য। এর চারপাশে মধ্য ডিভিশনের ১০নং ওয়ার্ড (বহুবাজার), দক্ষিণ ডিভিশনের ১২ (ওয়াটারলু স্ট্রীট), ১৩ (ফেনউইক বাজার), ১৪ (তালতলা), ১৫ (কলিঙ্গ বা চৌরঙ্গী), ১৯ (একবালপুর) এবং শহরতলী ডিভিশনের ২৪ (একবালপুর) ও ২৫ (ওয়াটগঞ্জ) নং ওয়ার্ডের মিশ্র অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপীয় পরিবার বসবাস করত। উত্তর ও মধ্য ডিভিশনের বাকি ওয়ার্ডগুলিতে গড়ে উঠেছিল মুখ্যত ভারতীয়দের বসতি।

বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে, ভারতীয় অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল হারে এবং মিশ্র অঞ্চলে জনসংখ্যা প্রায় স্থির রয়ে গেছে। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে দশ বছরে ইউরোপীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা কমেছে প্রায় বিশ শতাংশ, ভারতীয় অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ এবং মিশ্র অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। কিন্তু তবু অতীতের বিচ্ছিন্নতা কাটে নি—অন্তত স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সালে কলকাতার নগর কাঠামোর যে চিত্র আমরা পাই তাতে দেখা যায়, ইতিমধ্যে কলকাতার চেহারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বয়ন, ইঞ্জিনীয়ারিং, যানবাহন শিল্প ও বন্দরের কাজ ভিত্তি করে। শহরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের কিছু কিছু স্থানে ঘন শ্রমিক বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এগুলি ও ডালহৌসি স্কোয়ারের কেন্দ্রীয় বণিক অঞ্চল বাদ দিলে বাকি কলকাতার সবটাই বসতি ও খুচরা বাজারের মিশ্রণ। স্বাধীনতার পরেও শহরের কাঠামোর কোন মূল পরিবর্তন হয় নি,

শুধুমাত্র ইউরোপীয় ও ভারতীয়—শহরের এই দুটি বিভাগ অপসৃত হয়ে নতুন আর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা আবির্ভূত হয়েছে।

[খ]

ইংরেজরা কলকাতায় নগর পত্তন করল, কলকাতাভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের লাভের অংক আকাশচুম্বি হলো, কিন্তু কলকাতার বন্দর, লালদীঘির ইউরোপীয় অফিস চত্বর, চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের বসতি অঞ্চল, উত্তর-দক্ষিণে বা পূর্ব-পশ্চিমে যোগাযোগ রক্ষা করে এমন কয়েকটি প্রধান রাস্তা, রেলগাড়ি চালু হলে শিয়ালদহ হাওড়ার রেল যাতায়াত ব্যবস্থা—এইগুলি ছাড়া অন্য কোনো নাগরিক সমস্যা তাদের কোনদিন বিশেষ ভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। বরং অজস্র প্রমাণ মিলবে কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন চিন্তায় তাদের কত ঘোরতর অনীহা ছিল।

বলা হয় ১৮১৭ সালে স্থাপিত লটারি কমিটি শহরে প্রথম ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য দায়ী। লটারি কমিটির উদ্যোগে যে কাজগুলি সম্পন্ন হলো তা থেকে এই উন্নয়নের চরিত্র পরিষ্কার বোঝা যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কলকাতাকে একটি পুরোদস্তুর ব্যবসাকেন্দ্রের রূপ দেবার প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল শহরের মধ্যে এবং শহরের সাথে বহির্জগতের যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকাপাকি ও সুদৃঢ় করা। কলকাতায় লটারি কমিটির প্রথম কাজই হলো তাই। হেস্টিংস থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরি হলো। এরই সমান্তরালে পার্ক স্ট্রীট থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট হয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উত্তর প্রান্তে সাত রাস্তার মোড় পর্যন্ত নির্মিত হলো দ্বিতীয় রাজপথ। এদের সাথে সমকোণ সৃষ্টি করে ম্যাংগো লেন, কাশীতলা, কলুটোলা, মির্জাপুর স্ট্রীট, স্কোয়ার স্ট্রীট প্রভৃতি তৈরি হলো। এইভাবে একদিকে উত্তর শহরতলী এবং সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের সাথে কলকাতা বন্দরের যোগসূত্র স্থাপনের একটি প্রাথমিক কর্তব্য সাধিত হলো, অন্যদিকে স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে সার্কুলার রোডের মধ্যে সমগ্র কলকাতা এসে গেল গঙ্গার উপর প্রতিষ্ঠিত বন্দরের চৌহদ্দির মধ্যে। কলকাতাকে বেঁধে ফেলা হলো কতকগুলো চৌকো খোপের মধ্যে।

সড়ক নির্মাণ বাদে লটারি কমিটির বাকি সব কাজই সীমিত থাকল ইউরোপীয় বা মিশ্র অঞ্চলে। তালিকা করে উপস্থিত করলে তার বিবরণ

নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায়: মিঃ ক্যামাকের জমি কিনে তার যথাযথ উন্নতি, সাহেব মেমসাহেব চৌরঙ্গীতে তাদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে যাতে বেড়াতে পারে তার ব্যবস্থা, ফ্রীস্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট ইত্যাদি নির্মাণ, ইউরোপীয় অঞ্চলে সব রাস্তা পাকা করা, রাস্তায় জল দিয়ে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা চালু করা, শর্ট বাজারের প্রভূত উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি।

কিন্তু কলকাতার এতটুকু উন্নতিও শহরের ইংরেজ ব্যবসাদারী স্বার্থের সামান্যতম ত্যাগ স্বীকারের ফলে সম্ভব হয়েছে একথা ভাবা নিতান্তই ভুল। ১৯০১ সালে আদমসুমারীর রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, লটারী মারফৎ অর্থ সংগ্রহ না করলে উন্নয়নের জন্য সম্ভবত কোন কাজই করা যেত না। কারণ ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নগর উন্নয়নের জন্য বর্ধিতহারে কর দিতে বারবার প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ম'ফারলান-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৩৩ সালে গঠিত কলকাতার চারটি আঞ্চলিক কমিটিতে উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে দেখা গেল ইউরোপীয়রা একেবারেই নিরাসক্ত। নগর উন্নয়নে এই অনীহা পরবর্তীকালে কলকাতা পৌরসভার কাজে অনীহা হিসাবে প্রকাশ পেল। ১৮৮৫ সালে দেখা গেল পৌরসভার ভোটদাতা হিসাবে নাম রেজিস্ট্রি করার জন্য ইউরোপীয়রা মোটেই উৎসাহী নয়, ফলে ইউরোপীয় বা মিশ্র ওয়ার্ডগুলিতে ভারতীয় অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম ভোট পড়ল। এর পর থেকে পৌরসভার প্রতিটি নির্বাচনে একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে—কলকাতা পৌরসভার কাজে দেখা গেছে ইউরোপীয়দের চরম উদাসীনতা। ক্রমেই ঘটনা এমন দাঁড়িয়ে গেল যে, পৌরসভায় ইউরোপীয়দের বক্তব্য উপস্থিত করার মূল দায়িত্ব বর্তালো বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, পোর্ট কমিশনার্স, জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, হেলথ সোসাইটি ইত্যাদি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের উপর। সি. ই. ক্যারিংটন তাঁর বই 'দি ব্রিটিশ ওভারসীজ'-এ লিখেছেন, ইংরাজদের পক্ষে ভারতবাস ছিল হয় ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণ, চাকুরীর প্রয়োজনে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জনের আশায় বাধ্যতামূলকভাবে বিদেশবাস কিংবা বনবাসের মতো একটি ঘটনা—সবটাই সাময়িক। ভারত উপনিবেশের এই শহর উন্নয়নে না ছিল তাদের অবসর, না ছিল মানসিক প্রবৃত্তি। যতটুকু না হলে চলে না তার বেশি সময়, অর্থ ও পরিশ্রম দিতে তারা ছিল নিতান্তই পরাঙ্মুখ। নিজেদের অর্থোপার্জনে কোনো গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত না হলেই তারা সন্তুষ্ট। তাই পৌরসভায় তাদের প্রতিপত্তি সব সময়ে সুরক্ষিত

থাকলেও তাতে কাজ হতো না। এমনকি অনেক সময়ে প্রতিনিধি নির্বাচনেও অনাগ্রহ প্রকাশ পেত। যেমন ১৮৮৮ সালের আইনে ইউরোপীয় ওয়ার্ডগুলিকে ১৬ জন ইউরোপীয় কমিশনার নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করার জন্য প্রার্থী পাওয়া গেল মাত্র ৯ জনকে।

লটারী কমিটির প্রায় একশত বছর পরে ১৯১১ সালে কলকাতায় প্লেগ রোগের মড়ক দেখা দিলে একটি কমিশন বসেছিল। কমিশনের প্রস্তাব ছিল, কলকাতায় মহামারী প্রতিরোধ করতে হলে কিছু কিছু জনবহুল বস্তি এলাকা ভেঙে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে, নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে, হাওয়া চলাচলের জন্য খোলা জায়গার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এরই ফলশ্রুতি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। স্বাধীনতার পরে, ১৯৫৫ সালে আইন করে ট্রাস্টকে গৃহ নির্মাণের কিছু ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। নগর সীমায় মধ্যে উন্নত জমি নীলাম মারফৎ বিক্রি করে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে তার আয়-এর মুখ্য অংশ সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। গত ৬৮ বছরে রাস্তাঘাটের উন্নতির ক্ষেত্রে কলকাতার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সি-আই-টি তার কর্মোদ্যমের পূর্ণ সাক্ষ্য রেখেছে ঠিকই, কিন্তু নগর পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন সূচনা করে নি। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কলকাতার অনেক বস্তি অঞ্চল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট পরিষ্কার করেছে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে টালিগঞ্জে নতুন বস্তি তৈরি হচ্ছে। সি-আই-টি সরকারীভাবে নীলাম চালু করে জমিতে সীমাহীন ফাটকাবাজি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে নগর সীমা থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা দ্রুততর করেছে, কলকাতার জমির উপর অর্থবান মানুষের কব্জা সুদৃঢ় করেছে। এরই 'পরিপূরক' হিসাবে স্বাধীনতার পরে মধ্যবিত্তের জন্য কিছু গৃহ নির্মিত হলেও তার সংখ্যা এতই নগণ্য যে উদ্বাস্তু-মানুষের অতি সামান্য ভগ্নাংশই এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাই লটারী কমিটির উদ্যোগের সাথে সি-আই-টি-র উদ্যোগের কোন গুণগত পার্থক্য আছে এমন কথা বলা চলে না।

অতি সম্প্রতিকালে সি. এম. ডি. এ. কলকাতা উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে যে পরিকল্পনা চালু করেছে তারও প্রধান কথা রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ও

শিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরে করব।

১৯৬১ সালে আদমসুমারীর সময় মহানগর কলকাতাকে ৩০টি ওয়ার্ডে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। বেলগাছিয়া, মানিকতলা, বেলেঘাটা কলকাতার মধ্যে চলে এসেছে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনসংখ্যায় যে ঘনত্ব আদমসুমারীতে প্রকাশ পেল, তাতে কলকাতার পুরানো কাঠামোই প্রতিবিম্বিত হলো। একরপ্রতি ঘনত্ব সবচেয়ে কম দেখা গেল বামুনবস্তি, আলীপুর, পার্ক স্ট্রীট, ওয়াটারলু স্ট্রীট, বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জে। সর্বাধিক ঘনত্ব দাঁড়াল বহুবাজার থেকে শ্যামপুকুর অঞ্চলের মধ্যে এবং দক্ষিণের প্রাক্তন ভারতীয় অঞ্চল পদ্মপুকুরে। ইতিমধ্যে কলকাতায় একমাত্র পরিবর্তন এসেছে সি আই টি-র কল্যাণে, কিছু বস্তি উচ্ছেদ করে কিছু মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর গৃহসংস্থান হয়েছে, বড়বাজার থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার ব্যবসায়ী অঞ্চলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মতো প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয়েছে, দক্ষিণের লেক অঞ্চলকে উচ্চবিত্তদের বসবাসের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই সবের ফলে তখনকার কলকাতায় একধরনের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হলো। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীরা বড়বাজার থেকে দক্ষিণে দৃষ্টি ফেরালেন। সি আই টি-র কাজের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সামাজিক কাঠামোয় পটপরিবর্তন সূচিত হলো বটে কিন্তু তাতে মহানগরের মৌলিক চরিত্রে কোন নতুনত্ব এলো না।

[৬]

শহরতলীর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে খাস কলকাতার সম্পর্কের কোনো হেরফের কোনকালেই হয়নি। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যাপক অর্থে শহরতলী গড়ে ওঠার ধারা উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একেবারে গোড়ার দিকে ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তারপরে শহরে মড়ক মহামারী লেগে গেলে মানুষ পালিয়ে শহরতলীতে বাসা বাঁধতো। মামফোর্ড বলেছেন, ইংলণ্ডে শহরতলীগুলি শুরুতে যেন ছিল শহরের গ্রামীণ isolation wards। প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে লণ্ডনে স্ট্র্যাণ্ডের দুধারে ছিল ধনী ব্যক্তিদের প্রাসাদ, তাদের বাগানবাড়ি ছিল টেমস্-এর ধারে ধারে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন শহরগুলি কারখানা ও বস্তিতে ঘিঞ্জি হয়ে উঠল তখন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা স্বভাবতই শহরতলীর দিকে ছুটলেন। পরবর্তীকালে রেলপথ এবং রাজপথ শহর থেকে শহরতলীর দিকে বড় মানুষের স্রোতকে

শক্তিশালী করেছে, শহর এবং শহরতলী দুই ক্রমে ক্রমে বহির্মুখে প্রসারিত হয়েছে। মুইফ্ অনেকপরে লিখেছেন, আমেরিকার যে মোটরগাড়ী একদিন শহর ও শহরতলী গড়েছে, আজ সেই হয়েছে কাল, শহর ও শহরতলীর নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়েছে, মানুষের পক্ষে নগরবাসই যেন অসম্ভব করে তুলেছে।

গত একশ বছরে শিল্পোৎপাদনে যত পরিবর্তন এসেছে, কারখানার আয়তন যত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন যত জটিলতর হয়ে উঠেছে ততই শহরের কেন্দ্র থেকে কারখানা সরে গেছে প্রাক্তন শহরতলীর দিকে। লণ্ডনে প্রথম শিল্প গড়ে ওঠে মূল ব্যবসা কেন্দ্রের চারপাশে মূলত ইষ্ট এণ্ড-এ। শহরের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পও ছড়িয়ে যায়, প্রথমে শহরতলীতে, পরে তারও বাইরে। খাস প্যারীসের ইষ্ট এণ্ড-এ (১১, ১২, ১৯ ও ২০ আর্রঁদাস্যঁ।) ছোট ছোট শিল্প বহুকাল ধরেই কেন্দ্রীভূত—বিশেষ করে হাল্কা যন্ত্রশিল্প, জামা-কাপড় তৈরির কারখানা বা আসবাবপত্রের কারখানা। বিংশ শতাব্দীর বৃহৎ শিল্পগুলি খানিকটা সরে গিয়ে গড়ে উঠেছে শহরতলীতে। নিউ ইয়র্ক-এর ম্যানহাটন-কে ভিত্তি করে যে মহানগর গড়ে উঠেছে তার কেন্দ্রে বণিক অঞ্চলের ঠিক উত্তরে চেম্বার্স ও হাউস্‌টন ষ্ট্রিটের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তৈরি হয়েছিল একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। বিদেশ থেকে আগত জনসংখ্যার একটি বড অংশ এখানে আকৃষ্ট হয়েছিল। পরবর্তীকালে লণ্ডন ও প্যারীসের মতই এখানে বড় নতুন শিল্প-কেন্দ্রগুলি সরে গেছে শহরতলীতে বা আরও দূরে। টোকিও কেন্দ্রস্থলের উত্তর-পূর্বে সুমিদা নদী সৃষ্ট সমভূমিতে, দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল দিয়ে কাওয়াসাকির দিকে এবং কাওয়াসাকি থেকে ইয়োকোহামার মধ্যে বিশাল শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। টোকিও মহানগরের ভারি শিল্পকেন্দ্র ইয়োকোহামা। মহানগরের উত্তর-পূর্ব অংশে হাল্কা শিল্পের প্রাধান্য। এমন কি ভারতের বোম্বাই মহানগরের ইতিহাসও অনেকটা সমপ্রকৃতির। বোম্বাই শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ভারতীয় মালিকানাধীনে কারখানা শিল্প প্রথম স্থাপিত হয় ও ধীরে ধীরে শহরতলীতে বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতার পর এখানে অন্যতম প্রথম কাজই হয় বৃহৎ বোম্বাই শিল্পাঞ্চলকে মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত করে নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলিকে শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া। কলকাতায় যা ঘটেছে তা এই সব শহরগুলির প্রায় বিপরীত। বিদেশী শাসনকালে এই প্রয়োজন ইংরাজরা একবারও বোধ করে নি, আর শিল্পে ভারতীয় স্বার্থ ছিল এতই নগণ্য যে একথা ভাববার অবকাশও ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল না।

হুগলী শহরতলীতে প্রথম কারখানা ওয়েলিংটন জুট মিল বসে হুগলী জেলার রিষড়াতে, ১৮৫৫ সালে। এর পরে ধীরে ধীরে আরও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এই জেলায়,—শ্রীরামপুরে ইণ্ডিয়া জুট মিল (১৮৬৬ সাল), চাঁপদানি জুট মিল (১৮৭৩ সাল), ভিক্টোরিয়া জুটমিল ও হেস্টিংস জুট মিল (১৮৮৮) ইত্যাদি। সুতাকল প্রধানত কেন্দ্রীভূত হয় শ্রীরামপুর মহকুমায়। হাওড়ায় আধুনিক শিল্পকারখানা আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে যখন এখানে জাহাজ সারাই-এর কাজ চালু হয়। তারপর বসে বস্ত্রবয়ন শিল্প—শিবপুর-ঘুসুরিতে ১৮২৫ সালের মধ্যে। চটশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় আরও কিছুটা পরে। হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার যে ২৮টি শহরে ১৯৫১ সালে শিল্পের প্রাধান্য ছিল, তার মধ্যে ১৯টি ছিল মূলত চটশিল্পকেন্দ্র। শিল্পের ভিত্তিতে কলকাতা থেকে প্রশাসনিক ভাবে বিচ্ছিন্ন অথচ কলকাতার সংলগ্ন যে জনবসতিগুলির জন্ম হলো, সেগুলিতে পৌর শাসনের সূচনা হলো ১৮৬৪ সাল থেকে। কিন্তু বৃহৎ কলকাতা শিল্পাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হলেও কোনদিনই এই শহরগুলি কলকাতার গুরুত্ব পেল না। কলকাতার নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে তারা বঞ্চিত থাকল। কলকাতার সঙ্গে শহরতলীর শিল্পাঞ্চলের সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র লালদীঘি বা ডালহৌসি স্কোয়ারের সওদাগরী ও বণিক সভাগুলি মারফৎ, আর ছিল কলকাতা বন্দরের সঙ্গে। সব কারখানাগুলির সদর দপ্তর স্থাপিত হলো লালদীঘির চারপাশে। শহরতলীতে কারখানার বাইরে মিল মালিকদের কোনো সংগঠনও রইল না। কাজেই কলকাতার নগরসীমা প্রায় আগাগোড়াই অপরিবর্তিত রয়ে গেল, সামান্যতম নাগরিক সুবিধাগুলি সীমিত থাকল কলকাতায় পৌর এলাকার মধ্যে। শিল্পাঞ্চলের শহরগুলি রয়ে গেল যেন লালদীঘির জমিদারীর ছিটমহল হিসাবে। কিন্তু সেখানেও কারখানা ও ইউরোপীয় মালিকদের বাসস্থান বাদ দিয়ে নগর সম্পর্কে ইউরোপীয় মিল মালিকদের চরম উদাসীনতার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

পৌর কলকাতার বাইরে চটকলেরই রাজত্ব। জুট মিল এসোসিয়েশনের ইংরাজ কর্তাব্যক্তিরা বার বার ঘোষণা করেছে, শহরতলীতে উন্নয়নের কোনো দায়-দায়িত্ব তাদের নেই, সুতরাং পৌরসভাগুলিকে উন্নয়নের জন্য অর্থসাহায্য করার কথাও ওঠে না। পৌরসভাতে বস্তির মালিক বা জমিদারের চেয়ে মিল মালিকদের বেশি খাজনা দিতে হয় বলে ইংরাজ মিল মালিকদের রাগের অন্ত ছিল না। এখানে কারখানায় কর্মরত বা তার বাইরে

শ্রমজীবী মানুষের বসবাসের চরম দুর্দশার কথা যখনই উঠেছে তখনই দায়ী করা হয়েছে হয় শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতিকে, নয়তো শহরের পৌর সংস্থা অথবা বস্তির মালিক ও জমিদারের। অধ্যাপক রণজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর একটি লেখায় এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের এক চিঠির উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৪ সালে গৃহীত ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরি আইনের ফলাফল কেমন দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে একটি রিপোর্টের উত্তরে চিঠিটি তদানীন্তন বঙ্গ সরকারের কাছে লেখা। লেখায় ছত্রে ছত্রে কারখানার বাইরে নগর ও নগরবাসী সম্পর্কে চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই একদিকে কলকাতা উন্নয়ন চিন্তা ও পরিকল্পনা সব সময়েই থেকে গেছে কলকাতা পৌর অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে শহরতলীতে কারখানাগুলির সঙ্গে বাকি শহরের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই কোনদিন গড়ে ওঠে নি।

কলকাতা শিল্পাঞ্চলের গোড়াপত্তন হয় গঙ্গার অপর পারে হাওড়া ও হুগলীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে হুগলী নদীর উপর একটি রেল সেতু নির্মাণের সময় ভেঙে পড়ায় প্রথম চেষ্টা পণ্ড হয়। পরে ১৮৭৫ সালে সারবাঁধা নৌকার উপর একটি পনটুন সেতু চালু করা হয়। পনটুন সেতুর স্থলে রবীন্দ্রসেতু নির্মিত হয় ১৯৪৫ সালে। বালীতে বিবেকানন্দ সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হয় ১৯২৭-২৮ সালে। অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম ত্রিশবছর পর্যন্ত মাত্র একটি পনটুন সেতু দুইপারের মধ্যে কোনক্রমে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। অন্যদিকে বৃহৎ কলকাতার মতো নদীর দু-ধারে অবস্থিত মহানগর পৃথিবীতে যতগুলি আছে সবখানেই একাধিক সেতু নদীর উভয় তীরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে। লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, বুদাপেস্ত প্রভৃতি শহরগুলির উল্লেখ এই সূত্রে করা যেতে পারে। তবে কোন ক্ষেত্রেই নদীগুলি হুগলী নদীর মতো প্রশস্ত নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। কলকাতার কাছে হুগলী নদীতে সেতু নির্মাণ অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। তবু একথা মনে হতেই পারে যে ভারতে বহু ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যয়বহুল কাজ একই সময়ে যখন করা গিয়েছে তখন কলকাতার সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ যথাযোগ্য গুরুত্ব পেলে এখানেও একাধিক সেতু নির্মাণ অসম্ভব ছিল না। ব্রিটেনে ফোর্থ নদীর উপরে এক মাইল দীর্ঘ ক্যান্‌টিলিভার সেতু ১৮৯০ সালেই নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল।

[৮]

১৯৬১ সালে কলকাতার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় সি এম পি ও তৈরি করে এই মহানগরের ভূমি ব্যবহারে 'আমূল পরিবর্তন' আনার পরিকল্পনা রচনার নবপ্রয়াস শুরু হয়। সি এম পি ও ঘোষণা করল, অতীতের দু'শো বছরে কলকাতার সমস্যা নিয়ে অনেক বোর্ড, কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে, অনেক রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে সামান্য যেটুকু উন্নতি হয়েছে তার চরিত্র থেকে গেছে অসংলগ্ন ও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। সুতরাং সি এম পি ও-র লক্ষ্য হলো কলকাতার জন্য এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করা মহানগরের ভূমি ব্যবহারে যা গুণগত পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।

পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনা নানা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে আলোচনার পূর্বে কলকাতার যে কাঠামোতে সি এম পি-ও আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে সে সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। যে বছর সি এম পি ও গঠিত হয় সে বছর কলকাতার জনংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ। এর মধ্যে ১০ লক্ষ বাস করত বস্তিতে ও আরও দশ লক্ষর বাসস্থান ছিল নামে বস্তি না হলেও কাজে বস্তিরই মতো ঘরবাড়িতে। এর মধ্যে কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী ১০ কাঠার কম জমিতে গড়ে ওঠার ফলে বস্তি হিসাবে স্বীকৃত নয় এমন অনেক বসতি ধরা আছে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করত একেবারেই ফুটপাথে। মহানগরের একেবারে কেন্দ্রস্থলের পাঁচটি অয়ার্ড বাদ দিলে আর সব ওয়ার্ডগুলির '৫০ শতাংশ থেকে ৩০'৫ শতাংশ স্থান দখল করে বস্তিগুলি ছড়িয়ে ছিল। কলকাতা পৌর অঞ্চলের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে জমাট বেঁধে উঠেছিল সবচেয়ে বড় বড় বস্তিগুলি। অন্যদিকে কলকাতা ময়দানকে ঘিরে বড়বাজার থেকে প্রায় সার্কুলার রোড পর্যন্ত একটি দীর্ঘ এলাকায় ছিল কলকাতার কেন্দ্রীয় ব্যবসা অঞ্চল প্রসারিত। বাকি কলকাতার সবটাই ছিল নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তদের বাসস্থান অথবা খুচরা বাজার।

বৃহৎ কলকাতার ভূমি ব্যবহারে যে পরিবর্তন সি এম পি-ও প্রস্তাব করল তার মূলকথা উন্নততর অর্থনৈতিক কাজের জন্য কলকাতার জমির পুনর্বিন্যাস। পুনর্বিন্যাসের সরল অর্থ অবশ্য ছিল কলকাতা থেকে বস্তি উচ্ছেদ করতে হবে। সি এম পি ও-র কলকাতার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বলা হলো,

বেসরকারী প্রচেষ্টায় কিছু কিছু বস্তি পরিষ্কার করে সেখানে অফিস বা বসবাসের জন্য বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে বটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা চলছে অত্যন্ত শ্লথগতিতে ও বিচ্ছিন্নভাবে। কলকাতার বস্তিগুলিকে উচ্ছেদ করা বিশেষভাবে দরকার, কারণ এখানে জমির দাম খুব চড়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদাকে খানিকটা মদত দিতে হলে জমি ব্যবহারে একমাত্র এইভাবেই পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাই দ্রুত ও সুসংবদ্ধ কাজের তাগিদে সরকারী হস্তক্ষেপ আশু প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা বলতে আসলে কি ভাবা হয়েছিল ৯টি বাছাই করা এলাকার অবস্থা বর্ণনায় তা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, বলা হলো, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কাজের ফলে পূর্বের বস্তি অধ্যুষিত উল্টাডাঙ্গা-বেলেঘাটা-মানিকতলা এলাকা মধ্য ও উচ্চ বিত্তদের বাসস্থানের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চান্ন গ্রাম বাদে টালিগঞ্জ ইতিমধ্যেই বসতি এলাকা হিসাবে বেশ খানিকটা অভিজাততা অর্জন করেছে, বসতির ভাল অঞ্চল হিসাবে সাউথ সুবার্বন এলাকাটি ক্রমশই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ বেসরকারী প্রচেষ্টায় অথবা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে এবং ধীরে ধীরে বস্তি উচ্ছেদ করে সেইসব জমিতে বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করে যে ভাবে কলকাতার জমির উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবহার শ্লথগতিতে চালু হচ্ছিল, তাকে দ্রুততালে এগিয়ে নেবার জন্য, কলকাতাকে বস্তিশূন্য করে নোংরামির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই সি এম পি ও-র পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার সঙ্গে দেড়শ' বছরের আগেকার লটারী কমিটির পরিকল্পনার খুব বেশি প্রভেদ নেই। পার্থক্য এক জায়গায় অবশ্য আছে। লটারী কমিটি ইউরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই কলকাতার অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী ধরে নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের বসবাস ও অর্থোপার্জনের পরিবেশকে খানিকটা উন্নত করার প্রয়াস করেছিল। ইউরোপীয়রা সশরীরে এখন আর কলকাতায় বিশেষ নেই। কিন্তু দুই কলকাতা এক হয় নি। দুই-তৃতীয়াংশ বস্তি ও ফুটপাথবাসী কলকাতার নোংরা, অভাব-অভিযোগ এবং বিক্ষোভ থেকে এক তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ কলকাতাকে রক্ষা করে, তার বসবাস ও অর্থোপার্জনের পরিবেশে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে সচেষ্ট হয়েছে সি এম পি ও। এমন কি এই কাজে দুই-তৃতীয়াংশ নগরবাসীকে শহরতলীতে হটিয়ে দিয়ে খাস মহানগরের সবটাই বিত্তবানদের জন্য সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যও নানাভাবে ঘোষিত হয়েছে।

অন্যদিকে বৃহৎ কলকাতার শ্রমিক অঞ্চলের সঙ্গে পৌর কলকাতার সম্পর্কে গত একশ বছরে যে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে তার একটি হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানা কাজে শহরতলী ও কলকাতার মূল ব্যবসাকেন্দ্রের মধ্যে দৈনিক যাত্রী সংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পর শহরতলীর কারখানাগুলি হস্তান্তরিত হয়ে মূলত অবাঙালী মালিকাধীন হয়েছে। ফলে শিল্পাঞ্চলের পক্ষে পৌর কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হবার স্বপক্ষে কোন নতুন তাগিদ সৃষ্টি হয় নি এবং শিল্পাঞ্চল ও পৌর কলকাতা এই দুইয়ের মধ্যে বিভেদের 'ইউরোপীয়' প্রাচীরও অপসারিত হয়নি, যদিও অতি সম্প্রতিকালে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সি এম পি ও বলেছে, সমগ্র শিল্পাঞ্চল নিয়ে কলকাতার উন্নয়নের কথা এখনও বলবার সময় আসে নি। তাই উন্নয়নের প্রায় সব কাজই পৌর কলকাতার সীমিত, কয়েকটি মূল রাজপথ নির্মাণ এবং পানীয় জল সরবরাহের কিছু ব্যবস্থা বাদে। ভবিষ্যতে জমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে পূব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ কলকাতায় নতুন শিল্প এলাকা গঠনের যে প্রস্তাব সি এম পি ও করেছিল, তা কাগজে কলমেই রয়ে গিয়েছে, কারণ ইদানিং কালে নতুন শিল্প কলকাতায় প্রায় একেবারেই স্থাপিত হয়নি। আধুনিক অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শহরগুলিতে ভূমিব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও তার ভিত্তিতে অঞ্চল বিভাজন প্রবর্তিত হয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রণের মূল কথা ছিল শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার তাগিদে শহরের ভূমিকায় প্রয়োজনীয় শৃংখলা ও কর্মকুশলতা নিয়ে আসা। স্বভাবতই এতে শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থান, তাদের যাতায়াত ও অন্যান্য সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলি কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ব্যবসার স্বার্থে শহরের জমির মূল্যমান এক উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখাও ছিল এই সব পরিকল্পনার মুখ্য চেষ্টা। আমাদের কলকাতায় নগর পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কাজে পরিণত হচ্ছে, যদিও প্রথমটি অনুপস্থিত। কাজেই সব মিলিয়ে কলকাতার জমি ব্যবহারে বিশেষ নতুন কোনো ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত নেই। মামফোর্ড যাকে বলেছিলেন শিল্পের জন্যই নগর তার আভাষও কলকাতার ক্ষেত্রে পাওয়া দুষ্কর। কলকাতা যেন থেকে গেছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বহিরাঙ্গের কিছু আধুনিক অলংকরণ বাদে।

কলকাতাকে ভারতের মহানগর আখ্যা দিয়ে যাঁরা ভেবেছিলেন হয়তো বা তার ফলে এই মহানগরের উন্নয়নের জন্য সারা দেশে উদ্যোগের খানিকটা

মানসিকতা সৃষ্টি হবে, হয়তো বা বিদেশী বণিকদের সৃষ্ট নগর কাঠামোয় অন্তত আধুনিক ধনতন্ত্রের হাওয়া লাগবে, তাঁদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। উচ্চবিত্তদের হাসপাতাল, গুটিকয়েক নার্সিং হোম, স্কুল-কলেজ, শিল্পপ্রদর্শনীর স্থান, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নাটকের মঞ্চ, কৃত্রিম বরফে খেলার ঘর, মন্দির, ইনডোর স্টেডিয়াম ইত্যাদি কোন শহরে ধনতান্ত্রিক আবহাওয়া এনে দেয় না। কিছু প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করলে গাড়ি চেপে শহরের মধ্যে বা শহরের বাইরে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু দু-পাশে পায়ে-চলা পথ সংকুচিত হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে গাড়ি ছাড়া যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। চওড়া রাজপথ এলেই কলকাতার পক্ষে নিউইয়র্ক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পায়ে-চলা পথ তুলে দিয়ে কলকাতাকে নিজের মতো করে আধুনিক হবার সুযোগও দেওয়া হবে না। অদূর ভবিষ্যতে প্রশস্ত রাজপথ, মেট্রো রেল এবং বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি···ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার এই বহিরাভরণ কলকাতার অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যেন লোলচর্মা বৃদ্ধার গায়ে বেনারসী শাড়ির শোভা।

শিশুবর্ষ ঃ শিশুশ্রম

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারি তথ্য থেকেই জানা যায় ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগই শিশু। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ভারতবর্ষেই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শিশুদের স্বার্থে সরকারি আইন কানুন এখনও পর্যন্ত কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। শিশু শ্রমিকদের বয়সের সীমারেখা, নিয়োগ পদ্ধতি, কাজের সময় ও নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সুযোগ—কোনো বিষয়েই সরকারি আইনের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ লক্ষিত হয় না। শতকরা ৮০ ভাগ শিশু শ্রমিকই সরকারি আইনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ন্যূনতম মজুরি দূরের কথা—শ্রমের সময়ের (working hour) অর্ধেক মজুরিও তারা পায় না। তার ফলে নিয়োগকারীরা শিশুদের কম বয়স, সরলতা আর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ শোষণ চালিয়ে যায়। নিয়োগকারীদের নানা প্রকারের অনাচার দুর্নীতির ঘটনা সরকারের কাছে অজানা নয়। কেবল ব্যাপকতা কতখানি সরকার সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। একটি সুপরিকল্পিত সমীক্ষার মাধ্যমেই জানা সম্ভব সামাজিক অন্যায় ও শোষণের শিকার শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা কত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামান্য চোখ খোলা রাখলেই দেখা যায় অসংখ্য শ্রমিক যুক্ত আছে খেত-খামারে, শহরের ছোট কলকারখানা আর নানাপ্রকার নিম্নমানের উপার্জনের কাজে। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে বিরাট সংখ্যক

শিশুরা যুক্ত আছে বাড়ির গৃহকর্মে। তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি নারী শিশু।

কোনো সমীক্ষা ছাড়া সমগ্র শিশু শ্রমিকদের অবস্থার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব না। দু-একটি গ্রাম থেকে কর্মরত শিশুদের যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি, বর্তমান লেখাতে তাদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এক

বাঁকুড়া জেলায় বেলিয়াতোড় থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে ভট্টপাড়া গ্রাম। এখানে ব্যাপকভাবে আলু-লঙ্কার চাষ হয়। বছরে ন-মাসই লঙ্কার চাষ চলে। কুইন্টল-কুইন্টল লঙ্কা চালান যায় বাঁকুড়া শহর আর দুর্গাপুরে। গাছ থেকে ফসল তুললে তাদের 'তুলুনি' বলা হয়। এই 'তুলুনি'র কাজ করে ছোট শিশুরা। জমির মালিক তুলুনির কাজে শিশুদের নিয়োগ করা পছন্দ করে। শিশুরা যেমন উৎসাহ নিয়ে কাজ করে, তাদের হাতও তেমন খুব দ্রুত চলে। বড়দের মতন গল্প করে না, ফাঁকি দেয় না, মজুরি বৃদ্ধির জন্য ঝামেলা করে না। এদের খুব কম মজুরি দিলে চলে। এক কিলো লঙ্কা তুললে ১০ পয়সা মজুরি। এই শিশু 'তুলুনি'রা দিনে ১৫ থেকে ২০ কিলো পর্যন্ত লঙ্কা তুলতে পারে। সাত বছরের উলঙ্গ শিশু থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েরা ব্যাপকভাবে 'তুলুনি'র কাজ করে।

ধানচাষের মরশুমেও সম্প্রতিকালে শিশু শ্রমিকদের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ধানের চারাগাছ তোলার কাজ করে এরা। পুরুষদের মজুরি থেকে মেয়েদের মজুরি ৫০ থেকে ৭৫ পয়সা কম। আবার একই কাজের জন্য শিশুরা পায় মেয়েদের অর্ধেক মজুরি। 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—যেটুকু পয়সা ঘরে আসছে সেটুকুই লাভ। শোষণের পরিমাপ জানতে চায় না এসব শিশুরা বা বাপ-মায়েরা।

আর-এক ধরনের শিশু-কর্মী গ্রামে আছে, তাদের বলা হয় 'বাগাল'—অর্থাৎ রাখাল বাগালদের বয়স সাত থেকে চৌদ্দ বছর। কোনো একজন চাষির গরু-মোষ চরালে তাদের বলা হয় 'বাঁধা বাগাল' অথবা 'বারমেস্তে বাগাল'। সকালে মুড়ি বা পান্তা—দুবার ভাত। বছরে ২০ টাকা নগদ, দুটো প্যান্ট-জামা। একটা গামছা আর একটা শীতের চাদর। কেউ-কেউ নগদ টাকার বদলে ধান দেয়। আর-এক ধরনের বাগাল আছে তাদের বলা হয় 'গ্রুপ বাগাল'। একাধিক চাষির গরু-মোষ নিয়ে দলবদ্ধভাবে

কিছু বাগাল মাঠে যায়। দিনে প্রতি গরু বা মোষ পিছু ১ টাকা থেকে ১·৫০ টাকা পাওয়া যায়। দিনে গুনতি করে যে-টাকা হয় সকলে ভাগ করে নেয়। আর কিছু প্রাপ্য থাকে না এদের।

দুই

বেলিয়াঘোড় অঞ্চলে রাধাবাজারে অসংখ্য ছোট-বড় দোকান, ব্যবসাকেন্দ্র আছে। একটা কাঁসা-পেতলের দোকান। এখানে পুরনো কাঁসা-পেতলের বাসন পরিষ্কার করা, ঝালাই করা আর নতুন নক্সা কাটার কাজ করা হয়। একখানা চালা ঘরের দাওয়ায় মাটিতে বড় গর্তে খানিকটা আগুনের ওপরে বসানো একটা যন্ত্র। নাম 'কুন'। যন্ত্রটার গায়ে মোটা চামড়ার বেল্ট জড়ানো। মালিক একটা দিকে বসে পুরনো কাঁসার গ্লাস ধরে আছে যন্ত্রটার ধারালো মুখে। অপর প্রান্তে ন-বছরের হরেন (চেহারা দেখলেই মনে হয় বয়স আরো কম) বেল্টের দুটো প্রান্ত ধরে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে টানতে থাকে। মালিক পাত্রটাকে যন্ত্রের মুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে, নতুন নকশা কাটে। যন্ত্রটার গায়ে দুটো পা ঠেকিয়ে হরেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে শুয়ে বসে বেল্টটাকে টানতে থাকে। মাসটা ফেব্রুয়ারির শুরু—তখনও ঠাণ্ডার আমেজ আছে। হরেনের গায়ে আবরণ বলতে কিছু নেই। গা থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। পরনে আছে পেছনে পুরু করে তালি দেওয়া হাফ প্যান্ট। এত পুরু করে তালি দেবার কারণ জানতে চাইলে বলে, মাটির ওপরে বসে বেল্ট টানাটানি করতে গিয়ে প্যান্টের পেছনটায় ঘষা খেতে খেতে ছিঁড়ে যায় বলে মা পুরু করে তালি লাগিয়ে দিয়েছে। সকাল ৮টায় কাজে আসে—বেলা ১টায় ছুটি। মজুরি মেলে মাসে ১৭ টাকা। কাছেই একটা ছোট্ট ঝুপরিতে বাস করে। বাবা দিন মজুর। মা নানা টুকিটাকি কাজ করে। চার-পাঁচজন ভাই-বোন। হরেনের হাড় জিরজিরে চেহারা—দুই কনুইয়ে পুরনো ঘা। বেল্ট টানার কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে কনুই মাটির সঙ্গে ঘষা খেয়ে ঘা হয়ে যায়। প্রথম প্রথম ব্যথা লাগতো—এখন আর লাগে না। মুখে হাসি নেই, কোনোরকম অভিব্যক্তি নেই। যান্ত্রিকভাবে বেল্ট টেনে চলে হরেন।

তিন

বাঁকুড়াতে নানা রকমের কুটিরশিল্প আছে। তার মধ্যে মালা শিল্প একটি অর্থকরী কুটিরশিল্প। সামান্য মূলধন লাগে। কাঁচামাল হিসেবে

লাগে বেলের খোলা, তুলসী কাঠ, কুরচি কাঠ, বাঁশ কাঠ ও অড়হর কাঠ। পূর্বে এই কাঁচামাল সংগৃহীত হতো বিভিন্ন জঙ্গল, গৃহস্থের বাগান থেকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে কাঁচামাল সংগ্রহ করে আনত ঝুড়ি ভর্তি করে। পরিবারসুদ্ধ মালা তৈরি করত। বর্তমানে আর সেভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় না। আগে মালা তৈরির যে ব্যবসা ছিল স্বাধীন—সেই ব্যবসা এখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহাজন ও ব্যবসায়ীর কুক্ষিগত।

হরি নামের এইসব মালার কদর দেশে-বিদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালার চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে যে মালা-তৈরির পেশা সীমাবদ্ধ ছিল বৈষ্ণবদের মধ্যে, তা বিস্তারলাভ করেছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও। জেলার বহু গ্রামে এই মালা তৈরি হয়। একমাত্র বিষ্ণুপুর মহকুমার বারো-তেরোটি গ্রাম থেকে মহাজনরা ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকার বেলের খোলা সংগ্রহ করে মজুত করে রেখে সুযোগমতো চড়া দামে বাজারে ছাড়ে। বেলিয়াতোড়ের একজন অত্যন্ত সাধারণ লোক এই মালার কারবার করে দোতলা পাকাবাড়ি করেছে। বর্তমানে সে একজন বড় মহাজন।

বেলিয়াতোড়ের বীরপাড়ায় ১৫ ঘর বৈষ্ণবের বাস। প্রধান জীবিকা বেলের খোলার মালা তৈরি। আর একটি জাত-পেশা হচ্ছে ভিক্ষা। তাতে পেট চলে না বলে মালা তৈরির কাজই প্রধানত করে। কাঁচামাল তো এখন আর জঙ্গল থেকে স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করতে পারে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকাল হলেই ছোট ছোট ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গৃহস্থদের বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথায় কারা বেল খেয়ে খোলা ফেলে দিয়েছে তার খোঁজে। কিছু কিছু মেলে, কিন্তু বেশির ভাগ খোলাই সংগ্রহ করতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে।

বীরেন দাসের বাড়ি। ভেতরে ঢুকে দেখি শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বসে গেছে মালা তৈরির কাজে। দশ বছরের মালতী আর বারো বছরের মাধব হাত লাগিয়েছে বাবা-মার সাথে। কি অমানুষিক পরিশ্রম করে মালা তৈরি করে তার নমুনা দিচ্ছি।

বেল সেদ্ধ করে বাটালি আর কুরুনি দিয়ে ভেতরের শাঁসটা ফেলে দেয়। তারপর বাটালির সাহায্যে ভেতরটা মসৃণ করে। দু-মুখো সুঁচের মতন ইস্পাতের ফলা একটা বাঁশের কঞ্চির মধ্যে ঢোকানো থাকে।

সুচের একটা মাথা ছোট, একটা তার থেকে একটুখানি বড়। তাকে 'ছুক' বলে এরা। তার সাহায্যে খোলার ভেতরে অনেকগুলি গোলাকার ছক করে নেয়। বড় সুচের কাজ হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করা। আর ছোট সুচের কাজ হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে বৃত্ত তৈরি করা। এভাবে খোলার ভেতরে অনেকগুলো ছক তৈরি হয়। তারপর খোলার পিঠের দিকটা বাটালির সাহায্যে চেঁছে সাদা করে ফেলা হয়। খোলার দু-পিঠই সাদা এবং হালকা হয়ে যায়। তখন আর-একটি ছকের গায়ে ছোট ধনুকের দড়ি পেঁচিয়ে ফুটো করা নারকেলের মালার সঙ্গে আটকে পায়ের পাতার ওপরে বসিয়ে ছোট ছোট বৃত্তাকার ছকগুলোকে ছাড়িয়ে নেয়। অসংখ্য মালার দানা বেরিয়ে আসে। পরবর্তী কাজ হচ্ছে একটা সরু তামার তারের মধ্যে দানাগুলোকে গেঁথে ফেলা। তারটার একটা মুখে সূক্ষ্ম হুক আছে, তার সাথে লাগানো থাকে কস্বো পাতার ফাইবার থেকে তৈরি সুতোর টুকরো (কস্বো একপ্রকার সিসল জাতীয় গাছ)। কস্বো সুতোর সঙ্গে মালা গাঁথার লম্বা সুতো জড়ানো থাকে। তারের থেকে মালার দানাগুলো সুতোয় স্থানান্তরিত হয় কস্বো সুতোর মাধ্যমে। কস্বো পাতা থেকে সুতো বের করাও এক এলাহি ব্যাপার। পাতাকে দু-তিন দিন ভিজিয়ে রেখে টিনের ওপরে ধারালো জিনিসের সাহায্যে চেঁছে ফাইবার বের করতে হয়। সেই ফাইবার রোদে শুকিয়ে সুতো বের করে। মালা তৈরি করতে গিয়ে ধনুকের দড়ির ঘষা খেয়ে পায়ের পাতার ওপরে ঘা হয়ে যায়। সেই ঘা শুকিয়ে চামড়া মোটা হয়ে যায়। অনেক সময়ে ছক এবং বাটালি পিছলে হাতে পায়ে জখম হয়ে সেপটিক হয়ে যায়।

এই মালা তৈরি হয় পরিবার-ভিত্তিতে। ছোট ছেলেমেয়েরা আলাদা মজুরি পায় না। সকলেই ফুরনে কাজ করে। কিছুদিন আগেও এক কুড়ি মালার দাম ছিল ছ' টাকা। 'মালার বাজার মন্দা'—অজুহাত দেখিয়ে মহাজনরা মালা কেনা বন্ধ করে দেয়। এইসব শিল্পীদের পক্ষে পয়সা খরচা করে দেশ-বিদেশে মালা চালান দেওয়া সম্ভব না। এরা বাধ্য হয় ছ' টাকার মালা তিন টাকায় বেচতে। মহাজন সেই সুযোগে সমস্ত মালা কিনে মজুত করে চড়া দামে বিক্রি করে। দেশী বাজারে যেখানে এক কিলো মালার দাম ৩৫ টাকা—এই ব্যবসায়ীরা সেই মালা বিদেশী সন্ন্যাসী ও হিপ্পিদের কাছে বেচে একটি মালা ১০০ টাকায়। অনেক মহাজন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে ফুরনে মালা তৈরি করায়। তারা এক কিলো মালা তৈরি করে পায় ১'৫০ থেকে ২

টাকা। বৈষ্ণবদের অপর বৃত্তি ভিক্ষা। সেই বৃত্তিতেও অংশ গ্রহণ করে শিশুরা। কিন্তু ভিক্ষের রোজগারে কিছুই হয় না—প্রধানত নির্ভর করতে হয় মালার ওপরে। সেই মালার চাহিদা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মালা শিল্পীদের নাভিশ্বাস উঠেছে আজ।

সরকার যদি এই শিল্পে যুক্ত কর্মী, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের দিকে নজর দেন, কারণ নারী ও শিশুরাই সংখ্যায় অধিক, তাহলে এই অমানুষিক শোষণ ও অন্যায়ের হাত থেকে এরা রক্ষা পেতে পারে। শিল্পটি এমন যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে গড়ে তুললে সরকারি ভাণ্ডারে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আমদানি হবে—অপরদিকে বঞ্চিত নারী ও শিশুরা দু পয়সা রোজগার করতে পারবে। অন্যথায় শত শত নারী ও শিশু-শিল্পীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে—খিদের জালায় অন্যত্র চলে যাবে দিন মজুরির কাজের খোঁজে। এমন অনেক শিল্পী চলেও গেছে।

চার

বেলিয়াতোড় থেকে কয়েক মাইল দূরে দামোদরপুর নামে গ্রামের তাঁতিদের অবস্থাও শোচনীয়। এখানে প্রায় ৬০/৭০ ঘর তাঁতির বসবাস ছিল। তাঁত শিল্পে আর পেট চলছে না বলে অনেক তাঁতি গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। বর্তমানে ৩০/৩৫ ঘর তাঁতি কোনোরকমে টিকে আছে। তাঁতিদের সাধারণ অবস্থার কথা এখানে বলছি না। এই ৩০/৩৫ ঘরের তাঁতিদের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে উল্লেখ করছি।

তাঁতিদের পরিবারের আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েরা সকলেই কাপড় তৈরির কাজে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। মহাজনদের কাছ থেকে সুতো সংগ্রহ করে আনার পর বাড়ির মেয়ে, বৌ ও শিশুদের কাজ হচ্ছে সেই সুতো জলে ভিজিয়ে ভাতের মাড়ে সুতো চিটানো, টানা দেওয়া, সুতো গুটিয়ে আঁটি বাঁধা। কাপড় তৈরির জন্য তাঁতে সুতো ফিটিঙের আগে পর্যন্ত যাবতীয় কাজে অংশগ্রহণ করে মেয়ে ও শিশুরা। একখানা ৬০ সুতোর কাপড়ে মজুরি মেলে ৪ টাকা থেকে ৪·৫০ টাকা। ৮০ সুতোর কাপড়ে পায় ৪·৫০ থেকে ৫ টাকা। সমস্ত দিনে দেড়খানার বেশি শাড়ি হয় না। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাত্রিতেও তাঁতের কাজ চালান যেত। তাতে উৎপাদন একটু বাড়তো। সন্ধের পর থেকে আলোর অভাবে তাঁতের কোনো কাজ হয় না। যেসব শিশুরা সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে, তারা

আলোর অভাবে ঘরে বসে পড়াশুনাও করতে পারে না। গ্রামে কেরোসিনের অভাব প্রকট। সন্ধে হতে না হতেই খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে।

বয়স্কদের আক্ষেপ—তাদের ছেলেমেয়েদের যদি একটু লেখাপড়া শেখার সুযোগ থাকত, আর একটু পেট চলার মতন আয়—তাহলে এইসব ছেলে-মেয়েদের জাতব্যবসায় যুক্ত করত না। সারাদিন পরিশ্রম করে যে-মজুরি পাওয়া যায় তা পরিবারভিত্তিক। ছেলেমেয়েরা কোনোরকমে দু-বেলা দুটি খেয়ে যে-অমানুষিক পরিশ্রম করে তার কোন দাম এরা আলাদা করে পায় না। প্রায় প্রতিটি তাঁতিই বিশ্বাস করে তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য যেকোন দিন-মজুরির কাজ করলে তাদের ছেলেমেয়েরা বেশি রোজগার করতে পারবে। তাই যৌবনে পা দিলেই ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে কলে-কারখানায় বা মাঠে-ঘাটে কাজের সন্ধানে। জাত ব্যবসায় তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মহাজনদের কাছে অত্যন্ত নগণ্য মজুরির বিনিময়ে বাঁধা মজুর হিসেবে কাজ করতে হয়।

পাঁচ

বেলিয়াতোড় বীরপাড়ায় আর একটি পেশা আছে—তারা নিজেদের চিত্রকর বলে পরিচয় দেয়। ৫/৬ ঘর চিত্রকর আছে। মনসামঙ্গল, ধর্মরাজের বিধান, কৃষ্ণলীলা নানা আখ্যানের ওপরে পট তৈরি করে। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, বিভিন্ন উৎসব পুজা-পার্বণে পট দেখিয়ে ছড়া কাটে, গান গায়। সুধীর চিত্রকরের দশ বছরের নাতি অভিরাম বাপ-ঠাকুর্দার পেশায় যোগ দিয়েছে। সুধীর চিত্রকরের বয়স হয়েছে। সে আর দীর্ঘ সময় ধরে ছড়া কাটতে পারে না। গান করতে গেলে দম আটকে আসে। অভিরামকে সমস্ত ছড়া, গান শিখিয়ে দিয়েছে। অভিরামের ভাল লাগে না এ সব। পট-গুলি সব মান্ধাতা আমলের। রং চটে গেছে—জরাজীর্ণ তেলচিটচিটে চেহারা। পটের দুরবস্থা দেখে দর্শকরা হাসাহাসি করে, নানা বিদ্রূপ করে। অভিরামের লজ্জা করে। গ্রামে-গঞ্জে সমাজের রূপ বদলে যাচ্ছে। মানুষের রুচি পাল্টাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এইসব চিত্রকর বা পটুয়ারা তাদের শিল্পকে পরিবর্তন করতে পারছে না। একদিকে মূলধনের অভাব, অপরদিকে শিক্ষার অভাব। নতুন করে পট তৈরি করতে হলে কাগজ, নতুন কাপড়ের টুকরো, রং, তুলি লাগে। কম করে এককালীন ৪০/৫০ টাকার প্রয়োজন। ৪০ পয়সাই রোজগার হয় না। কোনো কোনোদিন চার-ছ-

আনা—কিছুটা তরি-তরকারি জোটে। আবার কোনোদিন কিছুই জোটে না।

ঘরের বৌ-ঝিরা বেরিয়ে পড়েছে রোজগারের চেষ্টায়। কয়েকবছর ধরে সংসার আর চলছে না দেখে বাড়ির বৌ-মেয়েরা কাচের চুড়ি, আলতা-সিঁদুর ও নানা প্রসাধনের জিনিস মাথায় করে গ্রামের দোরে দোরে বিক্রি করে। ভিন গাঁয়েও যায়। এদের রোজগারেই চিত্রকরদের সংসার চলে। যুবক ছেলেরা খেতমজুর বা দিন মজুরের কাজ করে। জাত-ব্যবসাটুকু চালিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ ও শিশুরা। মেয়েরা বাঁকুড়া শহরে মহাজনদের কাছে ১০ টাকা অথবা ঘটি-বাটি জমা রেখে প্রসাধনের জিনিস নিয়ে আসে। দিনে আয় হয় ৪ থেকে ৫ টাকা। মহাজনের ঋণ পুরো শোধ করতে পারে না। আর-একটু বেশি টাকা মূলধন থাকলে আয় একটু বাড়তো।

সুধীর চিত্রকরের পুত্রবধূ রাধা আজ পাঁচ বছর যাবৎ এই কেনাবেচার কারবারে নেমেছে। পঙ্গু শাশুড়ী, বৃদ্ধ শ্বশুর, ওরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাড়তি আট জন খাওয়ার লোক। রাধার দুটি ছোট ছোট ছেলে বেলিয়াতোড়ের হোটেলে কাজ করে। নয় বছরের মেয়ে সবিতাকে লাগিয়েছে গাঁয়ের বড়লোক রায়বাড়িতে ঝিয়ের কাজে। খাওয়া-পরা বাদে মাস-মাইনে প্রায় ১৫ টাকা। খাওয়া পরা বাদে নগদ ১৫ টাকা আর গ্রামে গর্ব করার মতন। যে দেয় তার যেমন গর্ব—যে পায় তারও তেমনি। রাধার স্বামী আর দেওর চাষের মরশুমে মাঠে কাজ করে। বাকি সময়ে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে দিন মজুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। আফশোষ করে সুধীর চিত্রকর বলে, 'পটুয়াদের জাতব্যবসা তো উঠেই গেল। ই আর চলবেক নাই। সকলকেই দিনমজুরির উপর নির্ভর করতি হবেক।' মেয়েদের কেনা-বেচার রোজগারটা মোটামুটি স্থায়ী। গ্রামে-গ্রামে প্রসাধনী জিনিসের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। রাধার বক্তব্য, আর একটু বেশি মূলধন থাকলে চাহিদা অনুযায়ী আরো রকমারি প্রসাধনের জিনিস মহাজনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারত।

ছয়

বেলিয়াতোড়ের বাস স্ট্যাণ্ডের মোড় থেকে আর একটি বাস রাস্তা চলে গেছে সোজা সোনামুখীর দিকে। দিনটা হাটবার। রাস্তা জুড়ে বসে গেছে সবজি, নানা রঙের জামা-প্যান্ট ও নানাবিধ জিনিসের ব্যাপারিরা। একটু এগিয়ে যেতেই নজর পড়লো একটি মহিলার দিকে। হাতে ঝুলো

চালনি আর ছোট ছেলের মাথায় ছটো ছোট মোড়া। মহিলাটির নাম বিলাসি বাস্কর। ছেলেটির বয়স ১০/১১ হবে। নাম মধু। বিলাসির সঙ্গে ওদের ঘরে গেলাম। বড় রাস্তার পাশে ছোট্ট একটু মাটির ঘর। দাওয়ায় বসে ১৩ বছরের সতবিবাহিতা মেয়ে বাঁশের কুলো তৈরি করছে। বিলাসির স্বামী নগেন্দ্র বাস্কর চেরা বাঁশের টুকরো চেঁছে মসৃণ করছে। মোট ১৩ ঘর বাস্কর চার পুরুষ ধরে এ-অঞ্চলে বাস করছে। বিলাসির আরো ছ'টি ছেলেমেয়ে বাঁশের কাজে হাত লাগিয়েছে।

পেশা হিসেবে এরা বাস্কর। বছরের নানা পূজা-পার্বণ, বিয়ে উপলক্ষে এদের ডাক কখনো এককভাবে কখনো দলবদ্ধভাবে। সারাবছর বাজনা বাজিয়ে প্রতিটি পরিবারের গড় আয় হয় বছরে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা। তার মানে মাসে ৫০ টাকারও কম। অপর পেশা হচ্ছে বাঁশ, তাল বেতি ও তালপাতা থেকে মোড়া, কুলো, তরকারির ঝুড়ি, চালনি, টোকা বা ধুচুনি, পাখা, চাটাই, পলুই, বেড়া তৈরি করা। প্রতিটি পরিবারের ছোট থেকে বড়—প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু বাঁশের কাজ জানে। এদেরও একই সমস্যা—মূলধন নেই, বাজার নেই।

বাঁশের এসব জিনিস তৈরি করে বিক্রি করলে কি রকম আয় হয় জিজ্ঞাসা করলে নগেন্দ্র বাস্কর বলে, 'বুইলে বারো বইসে তেরো'। অর্থাৎ বসে বসে বাজারে বিক্রি করলে (push sale) যে জিনিসের দাম বারো টাকা পাওয়া যায়—সেই জিনিস ক্রেতা ঘরে এসে অর্ডার দিলে দাম পাওয়া যায় তেরো টাকা।

নগেন্দ্র আক্ষেপ করে—সরকার যদি আমাদেরকে মূইলধন বাবদ কিছু টাকা দিত তাহলে মহাজনদের কাছে ঋণ করতে হতো না। বেশি করে বাঁশের জিনিস তৈরি করে মজুত করা যেত—দোকান দেয়া যেত। এখন যেটুকু জিনিস তৈরি হয় মহাজনের ঋণ শোধ করলে খাওয়া জোটে না। 'খেইতে তো হবে—না খেইয়ে কদ্দিন থাকব? মহাজনকে হাতে-পায়ে ধইরে কিছু কম টাকা দিই। আপনারা একটু সরকারকে বলুন না কেনে—আমাদের বন্যা লোন দিতে। আমাদের অঞ্চলে অনেকে পেয়েছে। আমার ঘরখানাও জলে পইড়ে গিইছিল। সরকারের কাছে আমরা লোন চেয়েছিলাম। আমাদেরকে দেয় নাই।' বিলাসি বলে ওঠে, 'আমাদের যে কি কষ্ট দিদি বইল্লে বুইবেক নাই। মহাজনের ধার শুধতে পারিনি বইলে

বাঁশের কাজ করিয়ে দিতে হয়—আমি নিজে মহাজনের বাড়িতে বেগার খেটেটে দিই। আমার ছোট ছেইলেটা বাগানের কাজ করে।'

বিলাসির মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়েছে দু-মাস হলো। ১০০০ টাকা বরপণ দিতে হয়েছে। সেই টাকা শুধতে হবে। লক্ষ্মী মাথা নিচু করে একমনে কুলো তৈরি করছে। যুবতী না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়ি থাকবে। লক্ষ্মী তার বিয়ের ধার থেকে বাবাকে মুক্ত করার জন্ত একমনে কাজ করে যায়। ছোট ভাই-বোনেরাও দিদির বিয়ের ঋণ শোধ করার জন্ত কেউ বাঁশের কাজ করছে, কেউ বাগানের কাজ করছে। এদের ঋণ বোধহয় কোনদিনই শোধ হবে না।

এগুলো তো শুধু তথ্য। তা-ও মাত্র কয়েকটি গ্রামের, মাত্র কয়েকটি পেশার, কয়েকটি মাত্র পরিবারের। এমন কত তথ্যই তো সংগ্রহ করা যায়, প্রকাশ করা যায়। অঙ্ক কষে হয়তো বলে দেওয়া যায় আমাদের জাতীয় শ্রমের ভেতরে শিশু শ্রমের অংশ কতটা।

কিন্তু সে-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চাইতেও তো বেশি দরকার, আশু দরকার, অবস্থাটাকে পাল্টানো। আইন করে এ-অবস্থা তো বদলানো যাবে না। আন্দোলনই একমাত্র পথ।

বর্তমান কিশোর সাহিত্য : কিছু দৃষ্টান্ত, কিছু সমস্যা

রুশতী সেন

বর্তমানে বাংলা কিশোর সাহিত্যের দৈন্য চোখে পড়বার মতো। অবন ঠাকুর, সুকুমার রায়ের পরে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। তখন বাংলার ছেলেমেয়েরা পাড়ি দিয়েছিল ভূতপত্রীর দেশে। দুষ্টু ছেলে রিদয় স্বপ্নে হাঁসের পিঠে চড়ে আকাশে উড়ত। উপর থেকে বাংলাদেশকে মনে হতো দাবার ছক—আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত একটা শতরঞ্চি বিছানো রয়েছে। লীলা মজুমদার তাঁর 'মাকু' অথবা 'টংলিং' উপন্যাসে যে চেষ্টা করেছিলেন, লেখিকার সাম্প্রতিক রচনায় সে প্রয়াস দেখি না। পেরিস্তানে বসে বালক চাঁদ কল্পনা করত শক্তিশালী বন্ধু বিশে আর বাঘা কুকুরের অস্তিত্ব। দুর্বল ছেলেটি কল্পনার মানুষগুলোর আশ্রয়ে জোর খুঁজত। মাকু পুতুলের সন্ধানে সোনাটিয়া পালিয়েছিল কালিঝার জঙ্গলে। কিন্তু বর্তমান লেখায় একটা রহস্য রোমাঞ্চে লেখিকা পাঠককে মাতিয়ে রাখেন। গুপি, মেজোমামা আর তাদের রহস্যময় অভিজ্ঞতা তাঁর ধরাবাঁধা বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। যে কাহিনী রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলে পাঠক। কিন্তু গল্পের শেষে খুব কিছু ভাবার থাকে না, ভুলতেও সময় লাগে খুব কম।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সংক্রান্ত গোয়েন্দা উপন্যাসগুলিকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। দারুণ মজাদার আর জটিল সমস্যা নিয়ে কাহিনী শুরু হয়। ঘটনায় ঘটনায় এসে পড়ে আরো অনেক চরিত্র, অনেক প্রশ্ন, গল্পটি যখন শেষ

হয়, বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জবাব আবছা থেকে যায়। প্রদোষ মিত্তির যে কেমন করে গোটা রহস্য ভেদ করলেন, তার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে পুরোপুরি যুক্ত হয় না। উপরন্তু কাহিনীগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চ-রহস্যের ভিতর দিয়ে কোন মানবিক অর্থের সন্ধান দিতে পারে। যেমন পারতেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; অথবা ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, হাস্যকৌতুক আর রোমাঞ্চের মাধ্যমে যাঁরা পাঠককে জীবনের সামগ্রিক অর্থের সামনে দাঁড় করাতেন; তাকে দিতেন চিন্তা করবার অবকাশ।* সত্যজিৎবাবুর আরেক নায়ক প্রফেসর শঙ্কু তাঁর অসাধারণ যন্ত্রপাতি, নানান দেশের বৈজ্ঞানিক বন্ধু আর সাংঘাতিক সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটা অচেনা জগতের সন্ধান দেন। সে জগতও লোমহর্ষক রোমাঞ্চের সীমায় ফুরিয়ে যায়।

দেশের বালক অথবা কিশোর মনের সঙ্গে যোগাযোগ হলে একটা কথা মনে আসে। এমন কিছু কিশোর সাহিত্য রচনার প্রয়োজন, যা পড়ার ক্ষমতা, স্মরণশক্তি আর রহস্যভেদ করার বুদ্ধি থাকলেও বালকের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে না, যদি সে পাঠকের কল্পনা না থাকে; মানবিকতার প্রস্তুতি যদি তার মনে শুরু না হয়। একসময় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবির বন্ধু' উপন্যাসে কৈশোরের মানসিক বিস্তার দেখেছিলাম। কিন্তু কালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে লেখিকা সে জগৎকে বাঁচিয়ে রাখলেন না। শঙ্খ ঘোষের 'সকালবেলার আলোয়' অনেক আশা ছিল। অনেকদিন আগে, দুই বাংলা যখন এক ছিল, পদ্মানদীর ধারে বেড়ে উঠেছে এক কিশোর। তার চারিদিকে ভারি সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু এরই মধ্যে সে অল্পে অল্পে বুঝে নিচ্ছে যে তাকে চলতে হবে একেবারে একা। কিন্তু শিশুসাহিত্যের কথা নিয়মিত ভাবে শঙ্খ ঘোষও ভাবেন নি।

এ-প্রসঙ্গে 'এক জন গপ্‌পো' এবং 'আরো এক জনের' কিছু ছোট গল্প অথবা 'ফটিকচাঁদ'-এর মতো বড় গল্প উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি গল্পের মধ্যে যে বিশ্বের সন্ধান লেখক দেন, বাংলা কিশোর সাহিত্যে তা বিরল; অথচ নিঃসন্দেহে তার উপস্থিতি খুবই জরুরী। 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্পটিতে কৌতুক আর মানবিকতা একাকার হয়েছিল। সাদাসিধে ইস্কুল মাস্টার বঙ্কুবিহারী

* সুকুমার রায়ের অসাধারণ ক্ষমতার কথাও মনে হয়। রূপকের স্বচ্ছন্দ কিন্তু অর্থপূর্ণ বিন্যাসে সর্বকালের সব মানুষের জন্য তিনি 'হ-য-ব-র-ল' রেখে গেছেন।

মত; বন্ধুদের আড্ডায় চরম কৌতুকের বস্তু তিনি। একদিন অন্য গ্রহের প্রাণীর আগমন নিয়ে কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু হঠাৎ বলে বসেন যে আশ্চর্য প্রাণী এই অজ-পাড়াগাঁয়েই আসতে পারে। বিদ্রূপে তাঁকে জর্জরিত করে তোলে বন্ধুরা। ক্লান্ত বঙ্কুবিহারী বাড়ি ফেরার পথে অন্যগ্রহের বিচিত্র প্রাণীর সঙ্গে কথা বলেন, নিজের কল্পনায়। ক্রেনিয়াস গ্রহের প্রাণী অ্যাং পৃথিবীতে এসে তাঁকে কথা বলার সুযোগ্য মানুষ হিসাবে বেছে নিয়েছে। কাল্পনিক অভিজ্ঞতায় শক্তিশালী মানুষটি পরদিন আবার আড্ডায় যায়। চিরকালের অপ্রতিভ, গোবেচারী লোকটা আজ কিসের জোরে সবাইকে হতভম্ব করে দেয়; তারপর সদর্পে আড্ডা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এতদিন কর্মক্ষেত্রে, বন্ধুসমাজে উপেক্ষিত ছিল যে, কল্পনার জোরে আজ সে মনের ইচ্ছে পূরণ করে।

'পটলবাবু ফিল্মস্টার' কাহিনীটি মনে পড়ে। এককালে অভিনয়ের বাতিক ছিল পটলবাবুর। বাঁচার ধান্দায় ছুটতে ছুটতে চাকরী, সংসার সব সামলে সে সব আজ স্বপ্ন মনে হয়। হঠাৎ একদিন, খুব সম্ভব লোকাভাবের দরুন এক বিখ্যাত পরিচালকের ছবিতে একটা ছোট্ট অভিনয়ের সুযোগ এল। একজন পথচারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নায়ক খুব ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ভদ্রলোককে ধাক্কা দেয়—লোকটি বিরক্তভাবে বলে 'আঃ'। এইটুকু পটলবাবুর ভূমিকা। তিনি বলেন, পথচারী যদি একটা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তারপর ধাক্কার ব্যাপারটা হয়, ঘটনাটি বাস্তবধর্মী হবে। যথাসম্ভব নৈপুণ্যের সঙ্গে পথচারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। তারপর নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানীটি তার প্রাপ্য টাকা না নিয়ে চলে যায়। 'তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায় নি। গগন পাকড়াশী আজ তাঁকে দেখলে খুশী হতেন।... কিন্তু পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন?...এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস।...টাকার অভাব তাঁর ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কি?'

ম্যাজিশিয়ান সুরপতি মণ্ডলের এখন নাম হয়েছে। কিন্তু শিল্পী সুরপতি মরে গেছে। সুরপতির গুরু ত্রিপুরাবাবু চিরকাল ম্যাজিকের শিল্পী ছিলেন। নাম, যশ, প্রতিপত্তি তাঁর কোনদিন হয় নি। এরা হলেন 'দুই ম্যাজিশিয়ান'। মনের অবচেতনে সুরপতি জানে—নামকরা ম্যাজিশিয়ান হলেও ত্রিপুরাবাবুর আদর্শ ছাত্র সে হতে পারে নি। বাংলার বাইরে প্রথম 'শো' করতে লক্ষ্ণৌ

যাওয়ার পথে তার মনে পড়ে কোন শিশুকালে এক মেলায় একজন বুড়ো ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিল। স্বপ্নে আসেন ত্রিপুরাচরণ মল্লিক, বলেন: 'গর্ব আমার হয়েছিল তোমার সেদিনের সাকসেস দেখে। কিন্তু তার সঙ্গে আপসোসও ছিল।...তুমি যে রাস্তা বেছে নিয়েছ, সেটা খাঁটি ম্যাজিকের রাস্তা নয়। অনেকখানি লোক ভুলোনো রঙতামাশা, অনেকখানি যন্ত্রের কৌশল। তোমার নিজের কৌশল নয়।' ত্রিপুরাবাবু বলেন সুরপতি যদি তার বাংলার বাইরে প্রথম অনুষ্ঠানে নিজের পরিবর্তে তার গুরুকে খেলা দেখাতে দেয়, তবে সেই চোখের দৃষ্টিতে আঙটি দিয়ে দূরের আধুলিকে কাছে টেনে আনার খেলা তিনি সুরপতিকে শিখিয়ে দেবেন। সুরপতি রাজি হয়। আঙটি আর আধুলির খেলা শেখে সে। অ্যাসিস্ট্যান্ট অনিলের ডাকে ঘুম ভাঙে। ত্রিপুরাবাবুর বহুকাল আগে মারা যাওয়ার খবরটা সত্যি; কিন্তু এও ঠিক যে এতদিনের আয়ত্তাতীত সেই আঙটি-আধুলির খেলা আজ সে শিখে গেছে। মনে পড়ে স্বপ্নে ত্রিপুরাবাবু বলেছিলেন টাকা তাঁর বড় দরকার; আর শেষ বয়সের ইচ্ছে খেলাগুলো সবার সামনে দেখানো: 'যদি সত্যিই বুঝতে পারতে আসল ম্যাজিক কী জিনিস তাহলে তুমি নকলের পিছনে ধাওয়া করতে না।' যাদু প্রদর্শনীতে সুরপতি স্বর্গত গুরু ত্রিপুরাচরণ মল্লিকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে খেলা শুরু করে। শেষে দেখায় খাঁটি দেশী ম্যাজিক-আঙটি ও আধুলির খেলা।

কলকাতা শহরে নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানীদের একজন বদনবাবু। দশটা-পাঁচটা আপিসের পর বাড়ি ফেরার আগে মানুষটা একটু নিরিবিলি চায়, একসঙ্গে একটু আকাশ, সবুজ আর নৈঃশব্দ। বাড়িতে আছে পঙ্গু ছেলে বিলটু—বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না সে। বই-এর গল্প তার সব শোনা হয়ে গেছে। ছেলের জন্য গল্প বানায় বদন। কার্জন পার্কে বসে বানানো গল্পগুলো বিলটুকে তেমন খুশী করতে পারে নি। কোলাহলের মধ্যে কল্পনার পরিসর কম ছিল। আজ লালদীঘিতে এসে দেখা হল একটি লোকের সঙ্গে। কাল থেকে কালে ঘোরা যার নেশা। একটি যন্ত্র চোখে লাগিয়ে সে গেছে আদিম বন্য মানুষদের কাছে, টেরোড্যাকটিল, টিরেনোসরাস, ব্রন্টোসরাসদের রাজত্বে। বদনবাবুকে দেখায় সে-যুগের বকের পালক, 'টেরোড্যাকটিলের ডিম'। অনেক আশা নিয়ে যন্ত্রটা চোখে লাগান বদনবাবু, কিছু দেখতে পান না। আগন্তুকের মাথার চুলের সংখ্যা যদি তার মাথার চুলের সমান সমান হত—তাহলে নাকি পেতেন। বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে উঠেই নেমে

পড়তে হয় তাঁকে। পাশটি পকেটে নেই—পঞ্চাশ টাকা বত্রিশ পয়সা। সেদিন মাইনে পেয়েছিলেন। মনে পড়ে যন্ত্র লাগিয়ে যখন চোখ বন্ধ করেছিলেন, আগন্তুক পাল্স দেখার জন্য হাত ধরেছিল। কিন্তু বিলটুকে সেদিন অনেক নতুন গল্প বলতে পারেন মদনবাবু। ছেলের খুশির খোরাক সেদিন যত পেয়েছিলেন, তার দাম পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশি।

ইনসিওরেন্স অফিসের চাকুরে অরুণরতন সরকার পুরীতে এসেছিলেন বেড়াতে। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক অমরেশ মৌলিকের সঙ্গে তাঁর চেহারার নাকি হুবহু মিল। কথাটা ভদ্রলোকের জানা ছিল না। প্রসঙ্গত এও জানা ছিল না যে অমরেশ মৌলিকেরও পুরীতে আসার কথা। নরম মনের মানুষ অরুণবাবুকে কোনো আপত্তির সুযোগ না দিয়ে ছেলেবুড়ো সবাই ধরে নেয় যে তিনিই অমরেশ মৌলিক। বাধ্য হয়েই তিনি দোকান থেকে উক্ত লেখকের যে-কটা বই পাওয়া যায়, কিনে এনে পড়েন। অমরেশ মৌলিক হিসাবে একটা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে হয় তাঁকে। পুরীতে বেড়াতে আসা ছেলেমেয়েরা যখন তাঁরা অমরেশ মৌলিক রচিত বই দিয়ে বলে নামসই করতে, অরুণবাবু বলেন সই তিনি কখনো কোন বইতে করেন না; কিন্তু প্রতিটি বইতে ছবি এঁকে দেবেন। সাহিত্যের সঙ্গে অরুণরতন সরকারের যোগাযোগ নেই বহুদিন। তবু যখন তিনি প্রতিটি বইতে পুরীতে দেখা দৃশ্যের এক-একটি ছবি এঁকে চলেন, ব্যাপারটার কৌতুক আর মানবিকতা আমাদের স্পর্শ করে। যেদিন সত্যি অমরেশ মৌলিকের আসার কথা, অরুণবাবু স্টেশনে গিয়ে দেখেন ভদ্রলোক তোৎলা, কথায় অপটু। যে শিশুর দল তাদের পরম আদরের লেখককে মনের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দ পেয়েছিল, তাদের ভুল ভেঙে কষ্ট দিতে চান না অরুণবাবু। বোঝেন যে এই অমরেশ মৌলিক বাচ্চাগুলোকে আনন্দ দিতে পারবে না। ভদ্রলোককে গোঁফটা কামিয়ে আর পুরীতে থাকার জায়গাটা পাল্টে ফেলতে, বলেন অরুণরতন সরকার। তারপর নিজের কেনা বইগুলোয় অমরেশ মৌলিককে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

"বঙ্কুবাবুর বন্ধু", "পটলবাবু ফিল্মস্টার", "দুই ম্যাজেশিয়ান, "টেরোড্যাক-টিলের ডিম" আর "ভক্ত" গল্পে একটা প্রয়াস বারবার চোখে পড়ে। লেখক দেখাতে চান, নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বাঁচার তাড়নায় ছুটছে যে মানুষগুলো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরাজিত, মিশে গেছে মানুষের ভিড়ে। কেউ বা সাফল্যের শিখরে উঠতে প্রথম জীবনের আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে। তবু এদের সকলের একটা মন এখনো বেঁচে আছে। সামান্য সুযোগ এলে, সেই

পুরনো খপ্নে আবার তারা ফিরে যেতে পারে। সাফল্য কিংবা পরাজয়ের ভিড়ে হারিয়ে গেলেও, সময়ে সময়ে কল্পনা, মানবিকতা সবকিছু নিয়ে তারা জীবন্ত মানুষ হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে "ফটিকচাঁদ" গল্পের হারুনদাকে। তারুণ্যের জোর আছে তার। দৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে রাস্তাঘাটে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায় হারুন। বড়লোকের ছেলে বাবলুকে স্মৃতিভ্রান্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছিল সে। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাবলু তখন না মনে করতে পারে নিজের নাম বা পরিচয়, না সেই ঘটনা যে কীভাবে কারা তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল। হারুনদার প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে সে বলে ফেলে তার নাম ফটিকচন্দ্র পাল, হঠাৎই একটা সাইনবোর্ড দেখে। ফটিকের ওপর মায়া পড়ে যায় হারুনের। পুলিশের হাতে তাকে দিতে পারে না। একটা চায়ের দোকানে চাকরি হয় বাবলুর। সারাদিন কাজ, কোনদিন বিকেলে হারুনদার সঙ্গে মাঠে ময়দানে, রাস্তায় তার খেলা দেখতে যাওয়া। বাবলু পুরোপুরি ফটিক হয়ে গিয়েছিল। এদিকে বাবলুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিছু ছেলেধরা, বাবলুর বাপ শরদিন্দু সান্যালকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায়ের মতলবে। ছেলেটা মরে গেছে ভেবে তাকে ফেলে পালিয়েছিল তারা; কিন্তু ক্রমে টের পেল যে বাবলু বেঁচে আছে। ময়দানে একদিন হারুনের খেলার সময় তারা আবার বাবলুকে ধরার চেষ্টা করে। একটা ট্যাক্সিতে ফটিককে তুলে হারুন তাকে লোকগুলোর নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। পিছনে আসে ডাকাতদের গাড়ি; বাইরে বৃষ্টি নামে। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে ফটিকের মনে পড়ে যায় যে সে বাবলু। মনে হয় বাবা, দাদা, ঠাকুরমার কথা, পুরনো কাজের লোক হরিনাথের কথা। কিন্তু হারুনদাকে ছেড়ে যেতে হবে। হারুনকে সে বলে, "আমাদের বাড়ির একতলায় একটা ঘর আছে, কেউ থাকে না হারুনদা। খালি একটা পুরনো আলমারি আর একটা ভাঙা টেবিল রয়েছে।"

কাগজে বাবলুর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া আর বাবলুর স্মৃতি ফিরে আসা—অদ্ভুত ভাবে এ দুটো ঘটনা প্রায় একদিনে হওয়ায় বাবলুর স্মৃতিভ্রমের ব্যাপারটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না শরদিন্দুবাবুর কাছে। ছেলেকে খুঁজে দেওয়ার পাঁচহাজার টাকা তিনি হারুনকে দেন না। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে হারুন শরদিন্দুবাবুকে বলে, "ওর মাথার একটা জায়গায় দেখবেন একটু ফোলা আছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। যদি ডাক্তার

ফাক্তার দেখান, তাই জানিয়ে দিলুম।...চলি রে ফটকে।" হারুন সেই ছেলেধরাদের ডেরার খোঁজটাও পুলিশকে দিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে বাবলু জানতে পারে তার মূল্য এখন পাঁচহাজার টাকা। হারুনদা খবরের কাগজ দেখে নি—তাই টাকাটা না নিয়ে চলে গেছে। টাকা পেলে নতুন খেলার জন্ম নতুন জিনিস কিনতে পারত সে; ছোটঘর ছেড়ে বড়ঘরে গিয়ে থাকতে পারত। বাবলু বেরিয়ে পড়ে হারুনের বাসার উদ্দেশ্যে; গিয়ে শোনে মাদ্রাজের ট্রেন ধরতে গেছে হারুন, সার্কাস কোম্পানি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। হাওড়া স্টেশনে হারুনদা আর ফটকের দেখা হয়। টাকার কথাটা বলতে পারে না বাবলু; হারুনদার নতুন কাজে হয়তো বেশি রোজগার হবে। হারুনদা বলে, "ফট্‌কেটা আসছে, তাই তো? হারুনদা কতরকম খেলা দেখাত, কলকাতার রাস্তা দিয়ে কেমন হেঁটে বেড়াতাম দুজনে...?" ট্রেন প্রায় ছেড়ে যায় দেখে বাবলু হঠাৎ বলে, "বাবা তোমায় টাকা দেয়নি হারুনদা। পাঁচহাজার টাকা! তুমি না নিয়েই চলে যাবে?" হারুন কাগজ দেখেছে, সে জানে টাকার কথা। বলে, "তোর বাবাকে বলিস, হারুনদা বলেছে ওঁর ছেলেকে ফেরত দিয়ে পাঁচহাজার টাকা নিতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয়?" গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। হারুনদা চেঁচিয়ে বলে গ্রেট ডায়মণ্ড সার্কাস কলকাতায় এলে বাবলু যেন দেখতে যায়—একচাকার সাইকেলে চোখ বেঁধে বলের খেলা। সবুজ আলোয় লাইন ক্লিয়ার করে হারুনদা মিলিয়ে গেল। ফটিকচন্দ্র পালকে নিজের একান্ত সঙ্গী করে কান্না চেপে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় বাবলু।

'ফটিকচাঁদ' গল্পটি একদিকে ঘর-পালানো ম্যাজিক পাগল হারুনের লড়াই, অন্যদিকে কিশোর বাবলুর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। লাইন ক্লিয়ার করে হারুনদা চলে গেলেও ফটিকচাঁদ বাবলুর জীবনে মিশে থাকে। আজন্ম যত্নপালিত ছেলেটি চায়ের দোকানে কাজ করা, রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো, ময়লা জামাকাপড় পরার কষ্ট অনুভব করে না, হারুনদার ভালোবাসার ছোঁয়ায়। শরদিন্দু সান্যাল, পুলিশের লোকজন, তপেনের চায়ের দোকান, ছেলেধরা লোকগুলোকে নিয়ে একটা গোটা কলকাতার ছবি ফুটে ওঠে। এই শহর আর সমাজের চরম বৈপরীত্যে হারুন আর বাবলুর সম্পর্কে গল্পটি বিশেষ জোর পায়।

যে-সব বাবলুরা কোনদিন হারুনদার দেখা পায় নি, যাদের বাবা ছেলেকে

টেরোড্যাকটিলের গল্প শোনাতে অক্ষম, তারা নিজেদের জগৎ নিজেরা তৈরি করে। কল্পনাপ্রবণ শিশুমন তার একাকীত্ব আর গভীরতা নিয়ে "সদানন্দর খুদে জগৎ" রচনা করে। তেরো বছরের ছেলে সদানন্দ চক্রবর্তী আশেপাশের লোকদের বুঝিয়ে পারে না যে সবরকম আনন্দে হাসা সম্ভব নয়। একবার জ্বরের সময় ওষুধ খেয়ে মুখ ধুয়েছে সদু। কুলকুচোর কিছুটা জল পড়ল জানলার উপরে, একটা পিঁপড়ে তাতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। "দেখতে দেখতে হঠাৎ (সদুর) কীরকম জানি মনে হল যে পিঁপড়েটা আর পিঁপড়ে নয়, সেটা মানুষ।...সেটা যেন ঝন্টুর জামাইবাবু, মাছ ধরতে গিয়ে কাদায় পিছলে পুকুরে পড়ে গেছেন, আর ভালো সাঁতার জানেন না বলে খাবি খাচ্ছেন আর হাত পা ছুঁড়ছেন। মনে পড়ল ঝন্টুর জামাইবাবুকে বাঁচিয়েছিল ঝন্টুর বড়দা আর ওদের চাকর নরহরি।"

বাবার রাইটিং প্যাড থেকে খানিকটা ব্লটিংপেপার ছিঁড়ে নিয়ে সেটা জলে ঠেকিয়ে রেখেছিল সে-জলটুকু উঠে এলে কাগজে, পিঁপড়েটা বেঁচে গেল। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নর্দমার দিকে চলে গেল পিঁপড়েটা। সেই থেকে সদানন্দের খুদে জগতের জন্ম। তার দেওয়া চিনির দানা পিঁপড়ের দল টানতে টানতে নর্দমার দিকে নিয়ে চলে। সদানন্দ ভাবে পিঁপড়ে হলে সে ওদের কথা শুনতে পেত: "মারো জোয়ান হেঁইও। আউর ভি থোড়া হেঁইও।" নিজের ঘরের জানলা আর সারিবাঁধা পিঁপড়ে নিয়ে সদুর আপন-বিশ্ব; ইতিহাসের ক্লাসে হ্যানিবলের সৈন্যবাহিনীকে হঠাৎ খুব কাছের প্রাণী মনে হয়। পেছনের দেয়ালে চোখ পড়লে দেখে সারি বাঁধা পিঁপড়ে চলেছে একটা ফাটলের দিকে। দেয়ালের বাইরে সেই ফাটলটাকে মনে হয় সেনাবাহিনীর দুর্গ। বন্ধু শ্রীকুমার লাল-পিঁপড়ের ঢিবি পা দিয়ে ভেঙে একবার অনেক পিঁপড়ে মেরেছিল। সদু ভাবে সাহেবগঞ্জের কাছে দুটো রেলগাড়ির কলিশনে প্রায় তিনশ লোক মরেছে। রেগে শ্রীকুমারের মাথা ফাটিয়ে দেয় সে। বলে, যে পিঁপড়ের বাসা ভাঙবে, তাকেই সে এমন করবে। এসব শুনে বাবা তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখেন। সদানন্দ ভাবতে থাকে বন্ধু পিঁপড়ের কি নাম দেওয়া যায়—কালী, কেষ্ট, কালাচাঁদ! সে রাত্রে জ্বর আসে তার। পরদিন ডাক্তার এলে মা বলেন সদু সারারাত কান্নাকাটি করেছে। ডাক্তার যখন তাকে পরীক্ষা করেছিলেন, সদানন্দ পিঁপড়ের গান শুনতে পাচ্ছিল। পিঁপড়ের উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে সদুর অঙ্কের খাতা দিয়েই পিঁপড়ে টাকে মেরে ফেলেন। ছেলেটার জ্বর কমে না। পরদিন সকালে সে শোনে কারা যেন বলছে: "বাঁচাও"

বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও।" জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল পিঁপড়ের দল শশব্যস্ত। অসুখ-বিসুখ ভুলে বারান্দায় গিয়ে কলসী ভেঙে ফেলে সদানন্দ; তারপর হাতের কাছে যা পায়, ভাঙতে থাকে। পিঁপড়ে মারা বন্ধ হল, সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দর ঘরের দরজাও। জানলায় পিঁপড়েগুলো বন্ধুর তারিফ করতে করতে চলে গেল।

চিকিৎসার জন্য সদানন্দ এল হাসপাতালে। ছোট কামরাটায় সবই এত পরিষ্কার, যে পিঁপড়ে থাকার সুযোগ খুব কম। জানলার কাছে আমগাছের ডালগুলোকে পিঁপড়ের বাসস্থান মনে হল সদানন্দর। একদিন নার্স যখন ঘরের কোণে ঘুমিয়ে পড়েছে, জানলায় উঠে হাত বাড়িয়ে গাছের ডাল ধরতে চাইল সে। ডান পা-টা খড়খড়ি থেকে হড়কে গিয়ে শব্দ হল। ঘুম ভেঙে নার্স ভাবলে ছেলেটা বুঝি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায়। ঘুমের ইনজেকশান দিল ডাক্তার। ঘুম আসতে আসতে শোনে সদু "সিপাহী হাজির।" ওষুধের টেবিলে দাঁড়িয়ে দুটো লাল পিঁপড়ে লালবাহাদুর সিং আর লালচাঁদ পাঁড়ে। ওদের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

একদিন বিকেলে লালবাহাদুর আর লালচাঁদের কুস্তি দেখছিল সদানন্দ। ডাক্তার ঘরে আসতে আসতে লালবাহাদুর লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু লালচাঁদ জখম হয় ডাক্তারের হাতে। তার আর্তনাদ শুনতে পায় সদু। কিন্তু তখন তার কিছু করার নেই। ডাক্তার আর নার্স দুজনে তাকে আগলে ধরে পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষার শেষে হঠাৎ ডাক্তারবাবু আর্তনাদ করে ওঠেন, হাতের চারপাশে জিনিস ছড়িয়ে পড়ে। সদানন্দর লালবাহাদুর ডাক্তারের আস্তিন বেয়ে উঠে কামড়ে বন্ধুর জখমের প্রতিশোধ নিয়েছে।

এক পরিণত জগতের সামনে অসহায় বালক তার সব ক্রোধ, উচ্ছ্বাস, অভিব্যক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পায় পিঁপড়ে বন্ধুদের মাধ্যমে। বালকের একাকীত্ব, খুদে জগতের রচনা—যা তাকে সাধারণের চোখে অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার বিন্যাসে লেখক একটি অসাধারণ প্রতীকী গল্পের সৃষ্টি করেন। সম্পূর্ণ কাহিনীটি সদানন্দ যেন সবার অলক্ষ্যে চুপিচুপি আমাদের বলে যায়। তার চোখেই তার বিশ্বকে দেখি; সদানন্দর খুদে জগৎ তাই আমাদের এত নাড়া দেয়, বিচলিত করে।

এরই পাশাপাশি "বাদুড়-বিভীষিকা" অথবা "বাতিকবাবু"র মতো গল্প লিখেছেন সত্যজিৎ রায়, যা পরিণত মনের বিকৃতির কাছে নিয়ে যায় পাঠককে। জগদীশ মুখুয্যের পাগলামি হল বাদুড়ের মতো গাছে ঝুলে থাকা।

লেখকের ছিল প্রচণ্ড বাদুড়-ভীতি। নতুন জায়গায় গিয়ে, প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরের দেয়ালে একটা বাদুড়ের উপস্থিতি তাকে যন্ত্রণা দিত। শেষে জানলা বন্ধ করে শুলেন রাত্রে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখেন জানলা খুলে গেছে—বাদুড়টা দেয়াল থেকে বোঁ বোঁ করে নেমে আসছে তাঁর দিকে লেখার খাতাটা খুব জোরে ছুঁড়ে মারেন লেখক, পালায় পাখিটা। পরদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেন তাঁ'র পরিচিত বাদুড়-প্রিয় মানুষটি-সেই জগদীশবাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে কয়েকটি স্থানীয় লোক। ভদ্রলোক অজ্ঞান, মাথায় চাপচাপ রক্তের দাগ ; সবার ধারণা বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকতে থাকতে গাছের নীচে পড়ে গেছেন ভদ্রলোক। লেখকের বাদুড়-ভীতির সুযোগ নিয়ে জগদীশ মুখুয্যে তার পুরনো পাগলামিকে কাজে লাগাতে, একটা মানুষের অস্বস্তির রসদ জোগাতে, আজ নিজেই অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

অন্যদিকে দার্জিলিঙের "বাতিকবাবু" এমন সব জিনিস সংগ্রহ করে বেড়ায়, যার সঙ্গে বিশেষ কোনো ঘটনা মূলত কোনো অপঘাত মৃত্যু জড়িয়ে আছে। জিনিসগুলো খুবই সাধারণ ; কিন্তু সেগুলো চোখে পড়লেই ভদ্রলোক বুঝতে পারেন, তার সঙ্গে কোন ঘটনা কী ভাবে যুক্ত। মিস্টার নস্কর নামে একটি নতুন লোক এল দার্জিলিঙে। তার হাতে হাত মিলাতে গিয়ে আঙুলের রূপোর আঙটির স্পর্শ পান বাতিকবাবু। বোঝেন, এই আঙটি পরা হাতে লোকটা কোনো এক অবাঙালিকে খুন করেছিল। আঙটিটা পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক। পরদিন সত্যিই জানা গেল একটা সাস্‌পেক্টেড ক্রিমিন্যাল দার্জিলিঙে এসে মিস্টার নস্কর বলে পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু লোকটা সকাল থেকে উধাও। বিকেল নাগাদ পাওয়া গেল তার মৃতদেহ ; খাদের তলায়, মাথা থ্যাৎলানো অবস্থায়। আঙটিটা বাতিকবাবু পেয়ে গেছেন, জোর করেই নিয়েছেন তিনি। কিন্তু নিজের লাঠিটাকে এখন আর সহ্য করতে পারছেন না। লাঠির গায়ে জমাট শুকনো মানুষের রক্ত। একটা অপঘাতের সাক্ষী হয়ে বাতিকবাবুর আলমারিতে জমা পড়তে চায় লাঠিটা। কিন্তু আজ তাঁর বারবার জ্বর আসছে ওটাকে দেখে।

মানুষের বিকৃতির কয়েকটা অদ্ভুত রূপ সত্যজিৎবাবু তাঁর জোরদার অথচ স্বচ্ছন্দ লেখনী দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু যে মন ধীরে ধীরে পরিণতির জন্য তৈরি হচ্ছে, তাকে খুব নিশ্চিত কিছু দিতে পারে না এ-সব গল্প। বালক যা পড়ে, তাকে নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে মেলাতে চায়। তাই দু-একটা অসাধারণ, কিছুটা অবিশ্বাস্য ঘটনা এত লোমহর্ষক করে তার সামনে তুলে

ধরলে, গ্রহণ বর্জনের প্রশ্নে বালকের কাঁচা মনে একটা অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা থেকে যায়। সাহিত্য হিসাবে এ-সব কাহিনীকে মেনে নিতে কোনো অসুবিধে ছিল না; কিন্তু কিশোর সাহিত্যের দায় একদিক থেকে অনেক বেশি।

"রতনবাবু আর সেই লোকটা"-র মতো অসাধারণ ছোট গল্পকে এই কারণে শিশু অথবা কিশোর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। চেহারা, চরিত্র, পেশা, নেশা সবকিছুতেই নিজের দ্বিতীয় সংস্করণ মণিলালকে দেখে রতনলালের মনে অস্বস্তি, অস্থিরতা দেখা দেয়। মনে প্রাণে একাকী মানুষ রতনলাল কোনো এক অনিশ্চিতের প্রচণ্ড তাড়নায় তাঁর সদৃশ মানুষটিকে ট্রেনের তলায় ফেলে দিয়ে নিজেও একই উপায়ে আত্মহত্যা করে। মানবমনের এই সমস্যাকে জানার জন্য বাল্য কিংবা কৈশোর খুব উপযুক্ত সময় নয়।

দুটি ক্লেপ্টোম্যানিয়াক রোগীর ট্রেনের এক কামরায় এক ভাবে দু-দুবার ভ্রমণের গল্প আছে "বারীন ভৌমিকের ব্যারামে"। প্রথমবার ভ্রমণের সময় বারীন ভৌমিক, পুলক চক্রবর্তীর ঘড়ি চুরি করেন। দ্বিতীয়বার যখন তাঁরা একই ট্রেনে একই কামরায় যাচ্ছেন, বারীনবাবু বহুদিন হল সে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বারীনবাবুর চেহারা অনেক পাল্টেছে, পুলক তাঁকে চিনতে পারেন না। বারীন নিজেই পুরো ঘটনা বলে ঘড়িটি ফেরত দেন। কাহিনীটি এখানে শেষ হতে পারত। কিন্তু লেখক পুলক চক্রবর্তীকেও ক্লেপ্টোম্যানিয়াক বানান। সেবার দিল্লী গিয়ে বারীন তাঁর সুটকেসের বেশ কয়েকটি মূল্যবান জিনিস সহ পাঁচশ-টাকা সমেত মানিব্যাগটি খুঁজে পান না।

"অনাথবাবুর ভয়", "নীল আতঙ্ক" অথবা "ফ্রিৎস" ভূতের গল্প হিসাবে বাঙলাসাহিত্য অনবদ্য। অনাথবন্ধু মিত্র, ভূত সম্বন্ধে তার কৌতূহল আছে, ভয় নেই। আজ পর্যন্ত বহু নামকরা ভূতের বাড়িতে তিনি একলা রাত কাটিয়েছেন, ভূতের দেখা পান নি। রঘুনাথপুরে হালদারবাড়ি নামক কয়েকশ' বছরের পুরোনো প্রাসাদটি নামকরা ভূতের বাড়ি বলে খ্যাত। সেখানে রাত কাটিয়ে নাকি কেউ ফেরে না। সে বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে অনাথবাবু নিজেই ভূত হয়ে গেলেন। "ফ্রিৎস" গল্পে জয়ন্ত বহুকাল পরে এসেছে বুন্দিতে —সঙ্গে এক বাল্যবন্ধু। এ-দেশে ছোটবেলায় একবার এসেছিল জয়ন্ত। এখানেই তার সাধের পুতুল সুইসদেশীয় ফ্রিৎস নষ্ট হয়ে যায়। একদিন বাগানে ফ্রিৎসকে রেখে জয়ন্ত বাঙলোর ভিতরে এসেছিল; ফিরে গিয়ে দেখে দুটো রাস্তার কুকুর ফ্রিৎসকে নিয়ে টাগ-অফ ওয়ার খেলছে। পুতুলটার মুখ দেহ ক্ষতবিক্ষত, জামাকাপড় ছেঁড়া; জয়ন্তর চোখে ফ্রিৎস মরে যায়। সাহেব-

পুতুলকে একটা দেবদারু গাছের তলায় কবর দেয় সে। বহুদিন পরে বুদ্ধিতে এসে রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর মনে হয়, তার ঘরে স্ক্রিৎস এসেছে। পরদিন সেই দেবদারু গাছের তলাটা খোঁড়া হল। বেরলো ঠিক স্ক্রিৎসের মাপের দশবারো ইঞ্চি লম্বা সাদা নিখুঁৎ একটা নরকঙ্কাল।

কলকাতাবাসী একটি যুবক গাড়ি চালিয়ে দুমকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। পথে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়িটি গেল সম্পূর্ণ বিকল হয়ে। বীরভূমের এক নীলকুঠীতে তাকে আশ্রয় নিতে হল। এখন কুঠীটা বাঙলো বলে পরিচিত। সে-রাতটা ছিল বীরভূমের এক অত্যাচারী নীলকর সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী। মাঝরাতে যুবক এক ভুতুড়ে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। চেহারায়, পোষাকে, চলায়, বলায় সে সেই সাহেবে পরিণত হয় রাত্রের জন্য। বাঙলো জুড়ে বসে তিনশো বছরের পুরনো সাহেবের সব জিনিস পত্র, তার আদরের কুকুর রেক্স। সকালবেলা উঠে দেখে যুবক যে চৌকিদার তার জন্য চায়ের বন্দোবস্ত করেছে— খবর পায় তার গাড়িও সারানো হয়ে গেছে। এই হল "নীল আতঙ্কের কাহিনী।" "ব্রাউন সাহেবের বাড়ি"তে একশো তেরো বছর আগে বজ্রাঘাতে মরে যাওয়া সাহেবের প্রিয় কালো বিড়াল সাইমন একাধিক নাস্তিক লোককে দেখা দেয়। অশরীরী আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিতেই হয়।

ভরতপুর অঞ্চলে ইমলিবাবা নামক এক সাধুর পোষা কেউটে নাকি বাবার হাত থেকে দুধ খেত রোজ সূর্যাস্তের সময়। ধূর্জটিপ্রসাদ বসু বেড়াতে এসেছেন ভরতপুরে; সাধু বাবাদের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ইমলিবাবার বালকিষণ কেউটেকে মাটির ঢেলা ছুঁড়ে গর্তের বাইরে আনেন ধূর্জটিবাবু। তারপর পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেন সাপটাকে। বাবা বলেন, একটা বালকিষণ গেছে, আর-একটা আসবে। একরাত্রির মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মানুষ থেকে সাপ হয়ে যায়। সাপটা চলে যায় বালকিষণের গর্তে। কেউটের ডেরার কাছে পড়ে থাকে সর্বাঙ্গে কালো কালো রুহিতন নক্সাকাটা সাপ হয়ে যাওয়া মানুষের খোলস। গল্পটির নাম "খসম"।

প্রতিটি কাহিনীর সমাপ্তি এমনই বিন্দুতে, যে ভূত প্রেতের অস্তিত্ব, সাধুবাবা জাতীয় লোকেদের অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদি স্বীকার করতে হয়। অথচ সুযোগ ছিল গোটা গল্পে রহস্যটাকে বাঁচিয়ে রেখে, শেষপর্যন্ত একটা স্বাভাবিক কৌতুকময় পরিণতি আনার। কিন্তু পুরনো কুসংস্কারের আশ্রয়ে রহস্যকে রক্ষা করে, বীভৎসতায় কাহিনী শেষ করেন লেখক। "বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম" গল্পটিতে ব্যতিক্রম দেখেছিলাম। বিপিন চৌধুরীর মনে হচ্ছিল যে

তার সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। পরিচিত দু-একজন লোক যে-সব তথ্য বলছিল, তাতেও তার কালের বোধ হারিয়ে যাওয়াটাই প্রমাণ হয়। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধু চিঠি লিখে জানায় যে বিপিনকে একটু অস্বস্তিতে ফেলবার জন্য সে পুরো ব্যাপারটা গড়ে তুলেছিল। মানবিকতা আর কৌতুকে মিলিয়ে রহস্য-ভেদের যে পথ লেখক বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রমে খুঁজে দিয়েছিলেন, সে-প্রয়াস বিভিন্ন কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি লোমহর্ষক গল্পকে বাস্তবতার সন্ধান দিতে পারত। বুঝি না, কল্পনা, মানবিকতা আর কৌতুকে একাকার করে দেওয়ার ক্ষমতা যে-লেখকের আছে, তাঁর বহু গল্প অস্বাভাবিক, অবাস্তব আর বিকৃতিতে আশ্রয় খোঁজে কেন?

'অপরাজিত' উপন্যাসের শেষে অপু ছেলে কাজলকে বাল্যসঙ্গিনী রাণীর কাছে রেখে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিল। অপু জানত ছেলে তার বড় কল্পনাপ্রবণ তাই রাণীকে বলে যায়, "ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ-নেই তা-নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা কর না।...যা বোঝে বুঝুক, সেই ভালো।" অপুর এই বক্তব্য আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু শিশুর সারল্য আর ভাবুকতার সুযোগ নিয়ে যদি অতি-প্রাকৃতিক অথবা অপার্থিবের উপস্থিতিকে রহস্যময় করে বানিয়ে তোলা হয়, তবে বালক কোনো নিশ্চিত মানবিকতার পথে এগোতে পারবে না। সত্যজিৎবাবুর অনবদ্য ভূতের গল্পগুলি অথবা "খগম" "বাতিকবাবু" কিংবা "বাদুড় বিভীষিকা"-র মতো গল্প কাজলের মতো কল্পনা-প্রবণ, ভাবুক বালককে একটা অহেতুক ভয়ের জগতে নিয়ে যাবে। আর কল্পনা যাদের নেই তাদের একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের জোগান দেবে।

বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েরা আজকাল এ-সব গল্প চায়, পড়ে। কিন্তু পাঠক-দের পছন্দ তৈরি করার দায়িত্ব অনেকখানি লেখকের : বিশেষত যে লেখক প্রকৃত কিশোর-সাহিত্য রচনা করতে পারেন। 'বুড়ো আংলা,' ভূত-পত্রীর দেশের পরে অনেকদিন কেটে গেছে। 'মাকু', 'টংলিং'ও পুরোনো হয়ে এল। নতুন শিশুর নতুন চোখ, নতুন কল্পনা দিয়ে বিশ্বকে চেনা—এ-যেন ফুরিয়ে আসছে বাঙলাসাহিত্যে। বালক পাঠকের দল এখন টেনিদা, ঘনাদা কিংবা ফেলুদা-তপেশকে নিয়ে মেতে যায়। তাদের এ ভালো লাগায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু এর বাইরে আর-একটা মজার জগৎ আছে, যে মজাটা পুরো চোখে দেখার নয়, মনে ভাবার। উপকরণ প্রচুর থাকলে, মনটা যে কুঁড়ে হয়ে পড়ে। বাইরের ওপর সম্পূর্ণ বরাত দিয়ে বসে থাকে বালক; ভুলে যায় আনন্দের ভোজে বাইরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। বাল্যকালে

মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটা এই। কুলুঙ্গির গণেশ আর তার বাহন ইঁদুরের হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠা থেকে শৈশবের কল্পনা শুরু হয়েছিল। এ কল্পনা কোনো নিশ্চিত পরিণতি পাবে না, যদি কিশোর-সাহিত্যিকের দল তাঁদের রচনায় উপরোক্ত শিক্ষাটা দেশের শৈশব ও বাল্যের কাছে পৌঁছে দিতে না পারেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর কয়েকটি গল্পে এ-শিক্ষা নির্মাণ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সদানন্দর মধ্যে আমরা টংলিঙের চাঁদকে আর-একবার দেখেছি। আশা করি শিশুর মন নিয়ে, জীবন নিয়ে তিনি আবার এমন গল্প লিখবেন, যা পড়ে পাঠক অনেক ভিড়ের মধ্যে পটলবাবু, বঙ্কুবিহারী দত্ত, বদনবাবু, অরূপরতন সরকার অথবা ত্রিপুরাচরণ মল্লিককে মমতা দিয়ে, সম্মান দিয়ে চিনে নেবে; মানবিকতার পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হবে। সব চৈতন্য আর বিজ্ঞানবোধ নিয়েও দেশের শৈশব এবং কৈশোর যেন স্বপ্ন দেখতে ভুলে না যায়। কিশোর-সাহিত্যের এর থেকে বড় দায়িত্ব আর কিছু নেই।

[প্রবন্ধটি শ্রীসত্যজিৎ রায় রচিত "এক ডজন গপ্পো", "আরো এক ডজন" ও "ফটিকচাঁদের" আংশিক সমালোচনার ভিত্তিতে লিখিত।—লেখক]

পাতাল-জরিপ

শঙ্কর বসু

অজিতকে ঝোলভাতের দামটা কাল দিতেই হবে, এদিকে টাকাটা পাওয়া গেল না, অবশ্য কাল পেয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল কথাটা অজিতকে বোঝানো, বোঝানো যে একদিনে কী-আর এসে যায়, একটা দিন কত সামান্য, তুচ্ছ···

বাস স্টপ এমন কিছু দূরে নয়. কয়েক পা হাঁটলেই সে কংক্রিটের ছাতাটি পেয়ে যাবে, শেডিং সমেত। তিন-চার ঘণ্টা ঠায় বসে থাকার পর এই সামান্য হাঁটায় ভাল লাগার কথা, সে-রকম বাতাস-ও আছে। আর সে একা, কিছু খুচরো দৈনন্দিন সমস্যা ছিল শুধু, ফলে কোনো অবসাদ আসার কথা নয়। তবু অবসাদ, ঢিলে : আস্তে আস্তে সে জড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার আলোটি, ম্লান দেখে, হলুদ দেখে। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে সে এগোচ্ছে. হাঁটছে, মণ্ডলদা বলল. 'কাল আসছ তো।' জানাই সে আসবে, তবু বলল।

অথচ এই 'কাল' কী চমৎকার! অবশ্য তা একটি চাকা. সে, তারা, ঐ চাকাটিতে নিজেদের নিক্ষেপ করেছে বলে অনায়াসে পৌঁছে যায় 'কাল'-এ। যেমন শ্রীচন্দ্র এবং আচার্যরা। আসেন, আসেন অপেক্ষা করেন, অপেক্ষা করেন ঘড়ি দেখেন···

ওয়েটার জল রেখে যায়, তখন তারা সবাই, কেউ না কেউ. একবার পার্টিশনের বার্নিশ কাঠটি দেখে, তাদের চোখ কিছু একটা খুঁজতে থাকে :

চাপা নাক, কাটা থুতনি আর কোঁকড়া চুল, হাওয়াই সার্ট ও পাৎলুন। তারা খুব জানা একটি প্রোফাইল খোঁজে, নার্ভাস হয়ে পড়ে খুঁজতে খুঁজতে। তারপর তাদের মুখে মেঘ ও রোদ, একপাশ শাদা ও একপাশ কালো।

হর্ষ বিষাদ।

কেউ এল কি? কেউ এল বলে হর্ষ, যে এল সে এবং নিজেদের জন্যে, নিজেদের কারণে বিষাদ। যদি-ও হাত উঠে যাবে, মুখে ধ্বনি: এই যে, এদিকে···

কতক্ষণ?

চেয়ার টানা হয়, বসার আগে চারপাশ ঝটপট দেখে নেবে। আর কেউ নেই তো, যাকে ডাকা যায় এবং যাকে ডাকা উচিত। তারা অনেকক্ষণ থাকবে, কয়েকবার চেয়ার টানা ও ঠেলার শব্দ হবে বলে পাৎলুন ও কুর্তা বদলাবে, প্রসঙ্গ-ও। রুমাল, চশমা, পার্স ও সাইড-ব্যাগ থাকবে তাদের সঙ্গে। মণিবন্ধে সূক্ষ্ম কাঁটা ঘুরে যেতে থাকে। ক্রমে কেউ কারও প্রতি আকৃষ্ট থাকে না আর, কোনো আকর্ষণ থাকে না। শব্দ চলনও হ্রাস পাচ্ছে তখন।

একটা কাজ ছিল···

উ···ঠি···

অথচ শুরুতে তীব্র টান ছিল আহ্বান, প্রত্যাশাও। যেজন্যে অপেক্ষায় রোমাঞ্চ থাকত। ব্যস্ততা। উৎকণ্ঠা। জরুরি সংবাদ পাবে যেন: বেঁচে আছে! কার যেন বাঁচার কথা নয়, কে যেন মরে যাচ্ছিল—তারা কুশল-সংবাদ চায়। টেলিগ্রাম ছুটে আসছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ সমেত। পূর্ণিয়া জেলায়, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে কিছু একটা ঘটেছে···গত তিরিশ বছরের মধ্যে এরকম ভূমিকম্প, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত হয়নি···তখন ভয়, শিহরণ। পোষাক ছিঁড়ে গেছে, খাদ্য নেই, কোথাও আশ্রয় নেই শরীর ভেঙে তারা হাঁটছে, চোখের পাতায় আঠালি ঘুম, লাল চোখ জলের সন্ধান নিচ্ছে। তাদের কণ্ঠনালী শুষ্ক, অন্ত্র ও পাকস্থলী মৃত পশুর চামড়া—এরকম অনুমান অনিমেষের এরকম মনে হত। অথচ তখন বাজেট নিয়ে কথা হচ্ছে, স্বৈর-তন্ত্রের পুনরুত্থান বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্লেষণ, কেউ প্রমাণ করে দিচ্ছে সেই কালো ছায়াটির বিকট ডানা তার সামাজিক-ভিত্তি কী দৃঢ়! এসব কথা, শঙ্কা এক সময় না একসময় তুচ্ছ হয়, তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন শুরুর সেই অভ্যাস নেই,

অপেক্ষা নেই। কেউ আশা করছে না সাহস, দুর্গম-অভিযান, আবিষ্কার, আলোড়ন…কোথাও ঘনিষ্ঠ তাপ নেই। সমস্তই ভেজা, স্যাঁৎসেতে…

কাল আসছ?

কিংবা 'আসছ' এই শব্দ চিৎপাত পড়ে থাকবে টেবিলে, যেমন প্লেটটি থাকে, বা শূন্য গ্লাশ।

পাৎলুনের ধুলো ঝাড়ল অনিমেষ।

রাস্তার হোর্ডিঙের শীর্ণ হাতে আলো বড় মলিন, 'বাঁচার আশা ছাড়া এদের আর কিছুই নেই', হোর্ডিঙে বন্যা-জল উঠে এসেছে। সেখানে গবাদি পশু ও মানুষ পচে যাচ্ছে, ঐ পচনে কালো জল-স্রোত, যে হাতটি আঁকা হয়েছে সেখানে কী অনুভব! কী তীব্র আকর্ষণ বাঁচার!

'কলকাতায় কিন্তু বন্যা পীড়িত মানুষ ভেসে আসেনি…'

সরকারের সাফল্যে সবাই খুশি, আমরা খুশি, আমরা আনন্দিত যে তাঁরা উৎখাত হয়নি…আমরা যুথবদ্ধভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে গেছি…'সে কী জল! কী স্রোত!' কিছু মজার গল্প-ও আছে যেমন গৃহস্থ বধূর পতিত্বের দুজন দাবিদার, মৃতার শরীরে অলঙ্কার ছিল যা বন্যায় ভেসে যায়নি।

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু, রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার ও যোধপুর পার্কের সামনে এই হাত পেতে রাখা হয়েছে শূন্যে, নীল জমির ওপর কালো রঙে। ইউ. বি. আই.-র সৌজন্যে। অনিমেষ এখন এরকম একটি হাতের তলায়, নীচে।

দামোদর বাঁধ।

মেঘনাদ সা বলেছিলেন…

প্ল্যানিং কমিশনে…

ডি ভি সি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও রেল লাইন পাতার সঙ্গে…

এ-সব কিছুর সঙ্গে কী গভীর ভাবে ঐ শীর্ণ হাত টি যুক্ত আছে, যুক্ত থেকে গেছে, যেন পাঁচটি আঙুলের অন্তর্বর্তী ফাঁকে অনন্ত সময় ধরা আছে সরু সরু শিকড়ে। অনিমেষ হাতটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাস স্ট্যাণ্ডের মাথার ওপর ইউ. বি. আই. ঐ হোর্ডিংটি টানিয়ে দিয়েছে যাতে কোনো নাগরিক ভুলে না যায় বিধ্বংসী বন্যা…আবার নীল এবং কালো বর্ণে ঐ অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্র আমাদের সৌন্দর্যবোধ, আবার যেহেতু তা কলকাতায়…

কলকাতা তাতে-ও তিলোত্তমা, উর্বশী...

অনিমেষ বেতো ঘোড়া নয়, ন্যাকা নয়, মধ্য তিরিশে-ও মাইনে-চুকি ও অফিস-ফেরতা বাড়ি আসা নেই। তিনটি বুলেট-ক্ষত ছিল তার, ঐ ক্ষত যখন দগদগে তখন সে জানত না গেরিলা-গ্র্যামার। তখন এই শহর দেশলাই খোল ভেঙে পড়ছে, উড়ে যাচ্ছে, নিউজপ্রিন্টে পোড়া দাগ থাকত, বারুদ গন্ধ। সমস্ত জোববা ও পাৎলুনের পকেটে তখন ভয়, সন্দেহ ; শহর তখন ছাড়ানো মোরগ, ফেয়ারলি-প্লেসে লম্বা লাইন : আমরা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখতে চাই... কলকাতায় দমবন্ধ হয়ে আসছে...আমরা পাহাড়ের কাছে যাব...নদীতে স্নান করব...অরণ্যে হারিয়ে যাব...ছেলেবেলায় একবার বনে গিয়েছিলাম, রক্তে কেমন একটা বনের টান...

অনিমেষ তখন একটা টুলের ওপর বসেছিল।

এই দেখুন ভুলের ফর্দ,

কত ভুল...ভুল-পর্বত...ভুলের পাহাড়

অ্যানার্কিস্টরা-ও এককালে...

দেখুন পরিবর্তন আমরা-ও চাই...

চাকরি করে খেতে হয়...

এইসব লজিকে তারা চার্টটি বের করে, সেখানে যা যা লেখা ছিল পরপর সেসব করা হয়। ছুঁচ-ফোটানো হয় নখের ভেতর...কপালে ও বুকে আগুন ছোঁয়ানো হয়, মন্ত্র পড়া হয়, তিনবার গুলি করা হয়, আর বারবার বলা হয় : আপনাদের স্যাক্রিফাইস...কিন্তু বুঝলেন না চাকরি, সমগ্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি নিরুত্তেজ ঠাণ্ডা মুখে তারা শেষ করল।

সেই অমায়িক-খচ্চরটি এখন কোথায়, সে-কি বাস-ট্রাম-পার্ক-রাস্তা-মনুমেন্টের তলায় এখনও ওত পেতে বসে আছে গোপন নখ সমেত ? এখন-ও কি সে অনিমেষের পেছনে লেগে আছে ? নোট করছে সে কখন, কোথায়, কার সঙ্গে...চেষ্টা করছে অনিমেষের মস্তিষ্কের মৃদু-কম্পন-স্রোত অনুধাবন করতে। গত দশ বছরে আর কোনো ভুল করেনি সে, সম্ভবত আর কোনো দিন ভুল করবে না, ভুল করার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত। ভুলে অপচয়, ক্ষয়। ধর্ষণ ও ক্ষয়। এখন এই ক্ষয়, অপচয় বড় মর্মান্তিক—আমরা ক্ষয় হতে দেব-না...আমাদের অপচয় নেই...

সত্যি !

কী বিস্ময় !

ফলে দিন ও রাত জমে উঠেছে, জমে যেতে থাকে, যা-জমে তা-ই কি জঞ্জাল? ঈষৎ হলুদ বর্ণ ট্রাক তখন পূরবী সিনেমার পেছনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে খুলে ফেলছে হুড: কলকাতার সেবায় কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান। কী-করে এখন অনিমেষ ঐ জঞ্জাল, ট্রাক ও গুটিকয় চিহ্নিত মুখ, বলি রেখা ও জলদ-কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে যুক্ত করে? যাঁরা বললেন: ভুল! প্রমাদ!

আস্তে আস্তে ভুলের গেরো, শেকড়, এসব ছাড়াতে ছাড়াতে তারা এগোচ্ছে। জট খুলে ফেলছিল, লতানে গাছের সেই শেকড় সুতো, ঝাঁজি সরিয়ে নেমে যেতে হচ্ছিল আরও তলায়. ঠাণ্ডা স্রোত জমাট সেখানে, ভুলের উৎস। কত ভুল...নীতিগত, কৌশলগত অনভিজ্ঞতা ও অতীত-অন্ধকার... এসবে সেই ডি. সি. এস. বি. হাসি, তাতে চামড়া কুঁচকে যায়, চোখে ভাঁজ: দেখুন আমরা-ও চাই...দেশপ্রেম...সত্যিতো সংকটে আছি।

এই কি যক্ষ? বিশাল-উদর দ্বারপাল? হায় বুর্জোয়া কুবের নয়! সবকিছু ঠিকঠাক আছে, একেবারে স্বাভাবিক, নিয়মমাফিক। যেমন এই ডি. সি. এস. বি. যে কোনো একজন, ভদ্রজন। যেমন তুমি বুলেট বিদ্ধ হলে, শুশ্রূষা-ও হল, সামান্য আন্দোলন, তারপর বৈধ মুক্তিলাভ। যারা বুলেট হজম করতে পারেনি তাদের জন্যে শহিদস্তম্ভ হয়েছে। চৌ-রাস্তায় ট্রাফিক বহাল আছে। মন্ত্রী বদলে গেছে। আর সুকোমল আই. এ. এস. হয়েছে।

তেমন চোতাপত্তর না-থাকায় অনিমেষ-কে জীবিকার খোঁজে একবার যেতে হল এক কবি-প্রাবন্ধিক-সমাজতাত্ত্বিক মহিলার কাছে।

কী খাবেন?

মহিলা আঁচল টেনে নেন, অনিমেষ আড়ষ্ট ছিল। তিনি বললেন, 'জানি, আমার কাছে এটা পরিষ্কার...আমরা এঁদের সম্পর্কে লিখেছি, আরও লিখব।' আর যা যা বললেন তাতে বোঝায়—আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, থাকব, গার্হস্থ্য সব নয়, আমাদের কাছে দেশের মানচিত্র আছে। মহিলার স্বামী ভিন্ন দলে আছেন, তিনি তাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। স্বামীটি বললেন 'পার্লামেন্টে আমরাই প্রথম আপনাদের বিষয়ে বলেছি।'

'অনিমেষ, পারলে তোমরাই...'

'আফটার অল আপনাদের মধ্যে এখনও করাপশন আসেনি...'

তারা শুদ্ধ, যেন বা শিশু, দেবশিশু। দীর্ঘ ও গাঢ় পর্দা তখন তরঙ্গ, মহিলার স্বামী...স্বামীদের স্ত্রী, স্বামী-স্ত্রী বলে যান, ভায়োলেন্স কত জরুরি, অনিবার্য, একমাত্র...। তাতে কোথাও উত্তেজনা থাকে না, এতখানি

আরম্ভ, এতখানি দার্শনিক। তখন দ্রুত বদলে যায় গৃহ সমূহ, জাদুকরী দক্ষতায় উত্তর কলকাতা থেকে ঐ গৃহ চলে আসে দক্ষিণে, মুক্ত নাট্য রীতিতে কুশীলব বদলে ফেলে কাঠের পার্টিশন, টি-পয়, টব ও বইয়ের র‍্যাক, বদলে যায় ত্বক ও সজ্জা, উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর।

ল্যাট্রিন-টা কোনদিকে?

সোজা / বাঁ-দিকে / আসুন এই-যে সামনে…

অনিমেষ ভার-মুক্ত হয়, নেমে যায় ক্লেদ ও গ্লানি।

ক্রমে ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছে সে। তন্তুজাল, ধোঁয়া ও গন্ধ। আঁকাড়া রাজনীতি কী সংগীত লহরী? ছন্দ-মাধুর্য? সমস্তই শিল্প তখন, জীবন-শিল্প। এই যাঁরা নিয়মিত বিদ্যাস্থানে যান তাদের কী কলহ আছে, কটূক্তি, স্টাফ কলহ? বা যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি তাতে কী ঈর্ষা, হীনমন্যতা এসব থাকে? না-কি সমস্তই ঘটে যায় দার্শনিক স্তরে? বড় বেশি নিবেদিত তারা, মতাদর্শগত কত-না সংগ্রাম! এঁদের কী কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থাকে? ইনস্যুরেন্স-নিরাপত্তা? অনিমেষ বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করে না। বিপ্লব থেকে সামান্য দূরত্বে এইসব গেরস্থালি থাকে বলে। সে বরং বিশ্বাস করত 'রিক্রুট লার্জ নাম্বার অব ইনটেলেকচুয়ালস'।

আসুন!

কেউ তার পিঠে হাত রেখেছে, আর এখনও পিঠে হাত দিলে অনিমেষ শিহরিত হয়। তোমরা পারবে।

যে বলল অনিমেষ তার কণ্ঠস্বর শোনে, কিন্তু অবস্থান জানে না, সে কোথায় কতদূরে? তখন আবার ঐ স্বর: শুভায় ভবতু! এরা কারা? যারা বলল,—'সবই ঠিক…সামান্য ভুলের জন্যে'…'বুঝলে এই একটা জায়গায় আমি সেলাম করছি, তাছাড়া রাবিশ'…। টানছে, দূরে নিকটে। অনিমেষ চিৎকার করে ওঠে: আচ্ছা কী চান বলুন তো! ঐ চিৎকার মৌন, তাতে কোনো ধ্বনি থাকে না। অ্যাসফল্ট রাস্তায় তখন ধোঁয়া নেই। শেষ বাস কতদূর? এমন কিছু তাড়া নেই, না পরিবহন সংস্থার, না অনিমেষের। কারণ উভয়েই শুধুমাত্র পরিবহন, বহনে বিশ্বাসী। কিছু একটা বয়ে নিয়ে যেতে হয়, সব সময় সবাই কিছু না কিছু বইছে, সম্পদ কিংবা সম্মান…ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা ও গ্লানি।

ভদ্র-অভ্যাস গড়ে উঠেছে হাসি ও সম্মতির। আর যা ভাঙছে তা একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, তার শরীরস্থ মন, ঐ দুর্গ, প্রাসাদ, আস্তাবল। বাদামি অশ্ব বেতো

ঘোড়া হয়ে গেছে, অঙ্কুশ প্রহার কিংবা কেশর-আপ্যায়ন বোঝে না বলে আর শ্রম নেই। গতি নেই। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়ার এডুকেশন্যাল ট্যুর ছাত্র জীবনে রুটিন-বদ্ধ থাকে, তা তাকে ভবিষ্যৎ দেখায়, বোঝায় মানুষও ধ্বংসাবশেষ হতে পারে। অনিমেষ বড় বেশি স্মৃতি-নির্ভর এখন, যেন বর্তমানে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সেখানে সে শরীর-ওজন রাখেনি। না-কি স্মৃতি-প্রহারে সে এখন প্রাচীন স্তম্ভ বিশেষ। সেখানে কাটল, শ্যাওলা, বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর নাম প্রকীর্ণ আছে, আছে বুলেট-ক্ষত। যে-জন্যে সে গলা-বন্ধ গেঞ্জি পরে।

আমার একটা ফিলজফি আছে···

আমি বিশ্বাস করি···

ও-ভাবে ঠিক কিছু বিশ্বাস করি না

মানি···।

জানি···

বিশ্বাস···

অবিশ্বাস···

সন্দেহ! ঘৃণা সন্দেহ, সন্দেহে ঘৃণা থাকে। এরা কারা যারা বিশ্বাস করে, যাদের নিরাপদ বিশ্বাস আছে পবিত্রগ্রন্থ, শুদ্ধ বস্ত্র-আচ্ছাদিত? আর যারা বিশ্বাস করে না? যাদের ভ্রম হয় তারা অবিশ্বাসী এবং ঐ অবস্থান তাদের স্থির রাখে বলে কখনও নড়ে ওঠে না ভিত্তিভূমি সমেত? যাদের ভূমিকম্প নেই?

তখন একটি স্টেটমেন্ট, ফোন, সাক্ষাৎকার :

'আসলে ওভাবে কিছুই শুদ্ধ নয়, একটা টোটাল করাপশনের মধ্যে ইনডিভিজুয়ালের বিশুদ্ধ থাকার কথাটা ইললজিক্যাল্···আমরা বড় জোর ভাবতে পারি জীবিকা অর্জন মানুষের খুব প্রাইমারি ব্যাপার···কলমপিষে রোজগার করি বলেই মাসান্তে মাইনের সঙ্গে কিছুটা গিল্ট, কিছুটা পাপের ভাগী হতে হবে এটা কেমন কথা···ক্যাপিটালিজম এই সর্বনাশ-টি করেছে···'

সিগারেট জলে ওঠে তখন, ধোঁয়া প্যাঁচাতে থাকে।

কোথাও তখন বজ্রপাত নেই, নেই বন্যার ধ্বংস-স্রোত। এই বন্যা, এই বজ্রপাতের মধ্যে, বৃষ্টির অন্ধকারে, বিষণ্ণ শ্মশান যাত্রা নেই। সর্বনাশ হয়ে যাওয়া মানুষটির আয়ত্তাধীন চর্চিত ক্রোধ, শোক, বিরহ সবই অকেজো করে

ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে। তাতে প্রমাণ তাঁর আর সর্বনাশ নেই, বিনাশ নেই। সে উর্ধে, অনেক উর্ধে, বেলুন, বেলুন-মানুষ।

অথচ সততা আছে, আমাদের লজিকাল সেন্সে, আমরা অনুধাবন করতে পারি তার্কিক উত্তরণ : নাচ্ কিন্তু সমস্যা হল স্নোবিশ ভদ্র-জীবন তার অভ্যাস ও সংস্কারের কাছে কোথাও একটা মেনে নেওয়া আছে···এভাবে ক্রমে আমরা পরিণত গজঃ।

এই বিচার, এই বিবেচনার স্রোত-টি ধারাবাহিক চলতে থাকে, যখন প্রজ্জ্বলিত নরক প্রবিষ্ট হচ্ছে গর্ভে উড়ে যাচ্ছে মন্ত্রীর টুপি, মস্তক। একেকটা গ্রাম হরিজন নির্যাতন, বন্যা, অনাহার-অপুষ্টির শূন্য উদর। চামড়ার বাদামি রঙ মরু-স্রোত।

কোথাও কি প্রতিপক্ষ বুর্জোয়া ছিল, বিষ্ঠা থেকে সুবর্ণ মুদ্রা ঠোঁটে করে তুলে নেয় যে, ওষুধে ভেজাল দেয়, শিশুর খাদ্যে বিষ মেশায়? বুর্জোয়ার নিখুঁত বর্ণনা চাই, ঠিকানা চাই (উই হ্যাভ টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্য বুর্জোয়াজি)। আমরা তাকে হাতে-নাতে ধরতে চাই।

শাদা রিসিভার বেজে যাচ্ছে। এখন বোলপুরে বর্ষা···বর্ষার গান ও কবিতা হোক···। সিটিজেন, পলিটি আর রোম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কেমন গোয়েন্দা গল্প, এখন সব গল্পই গোয়েন্দা গল্প···সাসপেন্স, থ্রীল··· ডি. সি. এস. বি···

হু আর দা ডিশিসান মেকার?

কারা?

আবার সন্দেহ, ঘিনঘিনে সন্দেহ। সন্দেহের গায়ে লোম নেই, চামড়া ফেটে গেছে, মরামাস উড়ছে, সে চুলকোচ্ছে। কেন, কিছুতেই সে পারে না এই ঘেন্না থেকে বেরিয়ে আসতে, কেন তাকে হাসতে হয় 'ভা···ল···ও!'

অনিমেষ দ্বারভাঙা হলের উল্টোদিকে, খাঁচা-বন্ধ বিদ্যাসাগরের চারদিকে রেলিং-নক্সা খুঁজল···কবে যেন ছিল প্রাচীন সেই নক্সা···লোহার শিকে অদ্ভূ- ছাঁচ আর নেই। দু বেলা নিয়মিত যাতায়াতে তার স্মরণ থাকার কথা সেখানে এখন সার সার দেশলাই খোল চলে গেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাতা-পেনসিল আর বেকার টাইপিস্টের খোলা মেশিন, অন্তিম ঘন্টি। আগে মেশিনের সামনে বসিয়ে রাখা কাটা-মুণ্ডটি মাঝে মাঝে বদলে যেত, এখন একটি দশক যাবৎ সে দেখল লোকটির দাড়ি পেকে যেতে, মুদ্রা-দোষ আর দু-

চোখে লো-ভোল্টেজ ফিকে-হলুদ ডুম সমেত অনড়। এই এক দশকে আর কী কী পরিবর্তন? কোথায়? কোথাও কী বদলেছে কিছু?

এলা রঙে কেমন এক অনুভব আছে, শূন্য-অনুভব। যে-শূন্যতা এখন এই প্রায় মধ্যরাতে দ্বারভাঙা হল ও নতুন বিল্ডিং-সমেত চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটিতে কোনো ছায়াও রাখেনি। কেমন ধারণা গড়ে ওঠে ঐ শূন্যতাই স্থায়ী, কেবল অজস্র বেঞ্চ, প্ল্যাটফর্ম, ডেস্ক ও ছাত্র-ছাত্রীতে এই অনুভব গুপ্ত থেকে যায়। অথচ চোখ বোজালেই কল-ধ্বনি, শব্দ-স্রোত। কী যেন গড়িয়ে যাচ্ছে…একটি বেণী, চশমা ও সাইডব্যাগ।

বন্যা-উত্তর গুমোটভাব অনেক কেটেছে, বরং ট্রাম-তার ও ছাতের অ্যান্টেনায় বিবাগী বাতাস। ফিকে অন্ধকার আর ধোঁয়াও আছে। ধোঁয়া আর অন্ধকার মিশে যাচ্ছে সুস্পষ্ট, সূক্ষ্ম-জালে, ফাঁদে। মেডিকেল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ফাঁদটি বিস্তৃত, খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটি মধ্য-কলকাতা মজবুত রেখেছে যেন, সটান ভূগর্ভ থেকে উঠে এসেছে। যেন বহুদূর, গভীরে প্রোথিত। মৃত্তিকার ক্ষয়-রোধের প্রয়াসও আছে কী? একটি রিক্সা কিংবা ট্যাক্সি ডেকে পিতামাতা, শিশু ও বার্থ-সার্টিফিকেট সমেত কারা যেন ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে, তাদের হলুদ চোখে রক্তাল্পতা। তারা ঐসব কাগজপত্র সমেত শিশুদের আগলে রাখছে।

কোথাও কী গোপন আততায়ী আছে? বজ্রনির্ঘোষ? কেউ কী বিদীর্ণ করেছে অতি ক্ষীণ শ্বাস-যন্ত্রটি: হ্যাণ্ডস আপ। যার পর সমস্ত কাগজপত্র-দলিল মেলে দিতে হয়—এই দেখুন আমি শ্রী ক.। গ্র্যাজুয়েশন ৬৬-৬৭… ২ নম্বরের জন্যে ফার্স্টক্লাশ পাইনি…কলকাতা-৯।

তখন সেই মুহূর্তে, অনুশাসন থাকে, 'এবার একটু রেসপনসিবল হওয়া উচিত অনিমেষ!'

'দেখো অনিমেষ একটা দায়িত্ব থেকে যায় তবু।'

এ সব কথায়, ভাবে, ভঙ্গিতে সেই গোয়েন্দা পুলিশ। তিনিই সব, তিনিই কার্য, তিনিই কারণ। যদিও মৃদুলদা শুধু 'দায়িত্ব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, মুখে মুখে সর্বদা যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাতে এ শব্দটির আগে সামাজিক চাকা থাকে। তবেই জুড়ি গাড়িটিতে বাহার, বা ঐ দুয়ে মিলেই অশ্ব-খুর ধুলো স্রোত গড়ে তোলে মস্তিষ্কে: হ্যাণ্ডস আপ! অনিমেষ সেই গোয়েন্দাকে নাকি গোয়েন্দাটি অনুসরণ করছে অনিমেষকে…

অথচ শাদা-পোষাকের সেই সব লোক, কাকা-বাবা-মামা, কেরানি কিংবা মাস্টার মশাইর মতো দেখতে, কখনও তাদের হাতে ফোলিও ব্যাগ, বা রিপ্রেজেন্টেটিভদের পেট-মোটা ব্যাগ, ছাতা, এ সব থাকত…তখন রাত আর দিনের মাঝে আগুন-সেতু ছিল, ফলে তা একটিমাত্র দিন…অনিমেষ বাস বদলে ফেলল এক স্টপ পরেই, আশ্চর্য ঐ কোণের লোকটার নাকে তিল কেন? সে নেমে পড়ল, চলতিতে, মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে জামার খুটে চশমা পুঁচছে যে-লোকটা…সে-ও কী!

এখন ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনের মুখে সেই গাছটা নেই, ওখানে গাছের গুঁড়ি ধরে রেখেছিল ভারি জমাট ধোঁয়া, ঘন লাল রঙ ছিল শূন্যে, আগুনের। লাল রঙ আগুন, প্রবীর ছুটছিল, অনিমেষ ছুটছিল…তাদের ক্ষিপ্র গতিতে লগ্ন ছিল আগুন…খবরের কাগজ পুড়ে যায় ঐ-রকম কালো, মৃত্যু-যন্ত্রণায়, ফুটপাতে। এখন সে-সবই নবেলের থীম্…সমাজতাত্ত্বিকতার তথ্য…পরিসংখ্যান…গা ছম ছম বীরত্বের গপ্পো, কী থ্রীল…এখন তুমি হাঁফাচ্ছ…অনিমেষ সন্দেহ করছ…নিন্দে করছ…ভুলে যাচ্ছ…অথচ…তুমি মরতে পারতে…এখনও মরতে পার…চিরদিন…যে-কোনো দিন…মানুষ মরতে পারে…মানুষের স্বেচ্ছামৃত্যু আছে, শিকলে বাঁধা কুকুর।

কটা বাজল দাদা?

সোওয়া দশটা…নাঃ, দশটা কুড়ি…

বাসের ত পাত্তা নেই দেকছি।

লাস্ট বাস কা চলে গেছে?

কখন থেকে বলছি চল, চল…

কী করব?

এখন দশ টাকা ট্যাক্সি-গচ্চা দিতে হবে মাসের শেষে…

ভারি ত…ন-মাসে ছ-মাসে একদিন…বিয়ে হয়ে অবধি…তোমাকে বলিচি…

আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই।

চ, হাঁটা যাক।

তখন অনিমেষের চারপাশে, অনিমেষকে ঘিরে গুঞ্জন। জিজ্ঞাসা, কলহ, বিশ্বাস। স্রোত। কল্লোলিত…কল্লোলিনী…

'থেকে যা অনিমেষ', শিশির বলেছিল, দ্বারভাঙা হলের মুখোমুখি সে শিশিরকে ভাবে। এত করেও ফুটপাথে শিশিরকে দাঁড় করানো যায় না। বরং সে, অনিমেষ বিষাদযুক্ত মহালটিই দেখতে পায়। এতক্ষণে শিশির ঢাকা তুলে খেতে বসেছে, একটু পরে শোবে, ছটফট করতে করতে একসময় সে হারিয়ে যাবে পরের দিন সন্ধের অপেক্ষায়, যখন তর্ক-জাল, শিকার-উদ্যোগ।

দুজন যুবক কাঁধে হাত রেখে হেঁটে গেল, শ্বশুর বাড়ি ফেরতা ভদ্রলোক বৌ-বাচ্ছা সমেত ঝগড়া করছে, ভদ্রলোক ওডবড়ে, বৌ-টা ধীর-স্থির, নিস্তেজ। ছাড়া ছাড়া হেঁটে আসছে এক-আধটা মানুষের ছায়া, এক ছোকড়া ট্রানজিস্টারের নব্ ঘোরাতেই 'জয় হিন্দ' শোনা গেল।

এই ঘোষণায় বয়স বেড়ে যায়, ঘুমের নির্দেশ থাকে। তখন ভারি রাত বয়ে শেষ-বাস টলতে টলতে এসেছে। অনিমেষ বাসের নম্বর দেখে নি, দেখার চেষ্টাও করে না, ভাঙা মাড-গার্ড, নীল রঙ, ধোঁয়া ও কম্পনে এই বাস, প্রাত্যহিক বাসটি, তাকে চেনে, তুলে নেয়।

'দাদা লেডিজ', 'আরে পা-টা রাখতে দেবেন তো না-কি', 'আমি দেওয়ার কে দাদা!'

স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা, শব্দ, স্টার্ট নিচ্ছে না। তখনও দু-চারজন ওঠার কসরৎ করছে। অনিমেষ পেছনে ছিল, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিতে সে ভেতরে ঢুকে যায় স্বয়ংক্রিয়। তখন পোড়া-মবিলের গন্ধ, ধোঁয়া, ঝাঁকুনি চলতেই থাকে। ঐ-গন্ধে, ধোঁয়ায় খিদে পায়, ঘাম হয়…

গলগল করে আরও খানিক ধোঁয়া বেরিয়ে এল ফাটা পাইপ থেকে, একপাশে কাত হয়ে বাস ছুটতে লাগল। এই ছোটায় আতঙ্ক ছিল, সামনে জালের ওপাশে খাকি উর্দিতে ঢাকা পাতলা যে পিঠটি দেখা যাচ্ছে, এই ছোটায় তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। 'একটা কুড়ি…সরি আমি ভেবেছিলাম…' ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে যান, জনৈক যাত্রী-কে তিনি কনডাকটর ভেবেছিলেন। কিছু কিছু লোকের চেহারায় ও-রকম কনডাকটর বর্ণনা থাকে। এই একটু রোগা-রোগা ঘেমো, ক্লান্ত মুখ, ভাঙা চোয়াল—ভদ্রলোক যিনি কনডাকটর নন, হঠাৎ বেজায় ঠাণ্ডা হয়ে যান। অসম্মান হল কী? কে জানে! কিন্তু কনডাকটর গেল কোথায়?

নেই না-কি! যাঃ বাবাহ। তখন হঠাৎ 'সামনে কী মধু আছে! যান-না পেছনে জায়গা আছে', এই তো কনডাকটর, এই বর, বাকা কনডাকটারের হওয়ার কথা। কিন্তু নাহ্ আবারও ভ্রম!

সামনে বিশ হাত দূরে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের শহিদ-স্মৃতি, কলকাতার একমাত্র স্মৃতিস্তম্ভ যাতে শিল্প-প্রয়াস আছে, সেখানে কে-একজন রুমাল নাড়ছে। লোকটা তরঙ্গায়িত, দুলছে, ভাসছে, আর রুমাল নাড়ছে। জাহাজডুবির পর একমাত্র এই লোকটাই বেঁচে আছে, সে-রকম বিপন্ন, আবার এই বাস তার মুখে বিদ্যুৎঝলক এনেছে. চকচক করছে, লোকটা বেঁচে যাবে, মরবে না। আহ্ বাঁচায় কী সুখ…ঘুম।

আর্ত মানুষটির জন্য বাস থামে। যাত্রীদের মধ্যে কেউ এল-বাসের লজিক উত্থাপন করল না। বড় ঘামছিল। ঘন্টির রশিটি রডের সঙ্গে চেপে ধরেছিল অনেকে, তারা মরীয়া, কোথাও চিৎকার: আরে দড়িটা ছাড়ুন…। তখন প্রকৃত ভাঙা চোয়াল উদ্ঘাটিত, উর্দিও আছে, সে-বেচারা দোতলার সিঁড়ি সংলগ্ন জাল-ঘুপচিতে আটকা পড়ে গেছে। একগুচ্ছ টিকিট হাতে এগোতে চেষ্টা করে, ঐ চেষ্টা কর্তব্য, সে কর্তব্যে অটল। যদিও পরিস্থিতি জটিল, শেষ-বাসটি স্বয়ংক্রিয়। এই ভিড়ের বাস-কনডাকটরের তোয়াক্কা করে না, এমন-কি দৃশ্যত ড্রাইভারও নেই. স্টিয়ারিঙের সামনে যে ভিজে পিঠটি ছিল তা-ও অন্তর্হিত। ভারি ট্রাক চলে যাচ্ছে সাঁ সাঁ তেরপল উড়িয়ে, ট্রাফিক পুলিশ সিগারেট টানছে. অপেক্ষা করছে নীল ভ্যানের…তারপর আর নিয়ন্ত্রণ নেই। কেবল হোর্ডিং, নিওন-আলো, স্খলিত মাতাল রক্ত. বোধিলাভের পূর্বে অভুক্ত তথাগত. পিঞ্জর-বক্ষ থাকবে ফুটপাতে…। বুকের খাঁচা ভেঙে কোথাও বা উড়ে যাবে পাখি…বিষয়-রূপ-বিষ তারা পান করে নি…পান করা অনুচিত বলে কী…এই বুক, হাড় ও চামড়ায়. ক্ষীণ রক্তস্রোতে কী বোধি প্রবাহিত… দিন যাচ্ছে…মাস ও বছর…বছরের পর বছর ঐ বুদ্ধ পাঁজর এখন পঞ্জর—ফলে ইতিহাস প্রসঙ্গটি প্রাকৃতিক হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।…ভূমিকম্প ও আগ্নেয় বিস্ফোরণের পেছনে যা যা কারণ থাকে সে-সব আমাদের জানা আছে… আসলে আমরা যা জানি, মানি, বিশ্বাস করি, আমরা তা-ই।

এইসব বলাবলি থাকছে. এ-তে টেবিল ঘিরে খুলিরা উর্বর। সেখানে ধূম্রজাল, জটা…তারা বিশ্বনাথ যেখানে গঙ্গা-আবদ্ধ। হায় গঙ্গা! এই সং-হাহাকারও মূর্ত থাকে শিশিরের গোল মুখে, মৃদুলদার কাটা থুতনি আর

অনিমেষের দুটো হাত দ্রুত মাথার পেছনে চলে যাওয়ায়। তখন শুক্ত-অনুভব। তাতে প্রকাশ তারা কেউ ত্রাতা নয়, সামান্য মানুষ, বড় নাজেহাল অক্ষর-ক্যাসাদে। শিকারিরা বনে, বড় বেশি অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে, সেখানে সবুজের ঘনত্ব কালো হয়ে আছে, কোনো পরিত্রাণ নেই, নির্গম রাস্তা জানা নেই, সুবর্ণ-মারীচ বড় দক্ষ। ফোলিও ব্যাগটি সমেত ব্যাধ বরং ফাঁদে পড়েছে, মত্ত-হাতি শিকার কতদূর? এজন্যে জরুরি সংগঠন, সারল্য কোথায়? বড় প্যাঁচ, জটিল গোলকধাঁধা নরকে নির্বাসন দিচ্ছে। অথচ আধুনিকতা গদ্যেপদ্যে সটান সারল্য চাইছে···আমরা সরল হয়ে যাব··এসো সরল হই অকপট হই

বসুন দাদু, বুড়ো মানুষ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন!

এই জন্যে, বুঝলেন দাদা এই জন্যে বাঙালির ছেলেরা আজকে অল ইণ্ডিয়া লেভেলে চাকরির কম্পিটিশনে গো-হারা হারছে···দেখুন আপনি আই. এ. এস. থেকে···এ-পর্যন্ত কোথাও বাঙালি আছে! বিলেতে কেমন ঠ্যাঙাচ্ছে দেখেছেন···এই সেদিন···

অপারেশন বর্গা বন্যায় মারা গেল···

বর্গাদারের ক্লাশ-পজিশন অনেক বদলেছে···

কী বদলেছে?

ক্লাশ···শ্রেণী···তারা এখন মজুর রেখে কাজ তুলছে···

সে যাই বলুন, এরকম বন্যা অনেকদিন হয়নি···

সেই যুদ্ধের টাইমে···

দূর মশাই যুদ্ধের টাইমে আবার বন্যা হল কবে। আপনাদের এই এক স্বভাব, কিছু হলেই···

আশ্চর্য ব্যাপার হল, এমন ভয়ঙ্কর বন্যার পর কলকাতার কাতারে কাতারে মানুষআছড়ে পড়ার কথা···গভর্ণমেন্ট সে-টা অন্তত ঠেকাতে পেরেছে··· কোথাও মহামারী লাগেনি···

ইংরেজি না-কি তুলে দেবে।

হাঁা সে-রকমই শুনছি।

সাউথ পয়েন্টওয়ালারা ত চালিয়ে যাবে।

হাঁা, তা ত যাবেই।

মানে গরিবগুর্বোর ছেলের লেকাপড়া হবে না এই ত···বড় চাকরি ওনাদের পকেটে থাকবে। ভালো বন্দোবস্ত।

জাহাজে করে কোথাও চালান দিক না! বেঁচে যাই!

অনিমেষ এদের কতখানি চেনে এই যাদের বাৎসল্য আছে, অসূয়া আর দেশপ্রেম। যে, যারা বিশেষ মুহূর্তে কর্পদকহীন, খরচ করে ফেলতে পারে, হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলে গভীর সামাজিক মত্তাসত্তা, বাঁচায় বিশ্বাসী এই জনসমষ্টির কেউ না কেউ খাদ্য আন্দোলনের শহিদ হয় অতর্কিতে। তা-কি চেতনাহীন, সমষ্টি-চেতনা থাকে না-কি! এখন বড় অনিশ্চিত তারা, চোয়াল ভেঙে উঠে আসছে হাই। তাতে লম্বা হনু ক্রমে আরও লম্বা। অনিমেষ জানত, যা কিছু স্ফুলিঙ্গ প্রতিবাদ সে-সবই এই জনস্রোতে ওতপ্রোত আছে।

যদিও সে ভেবে পায় না নিজ-সম্পর্ক, যেমন থাকে সমুদ্রের সঙ্গে তরঙ্গের। ফলে সমুদ্র তরঙ্গ নেই। এ কেবল প্রবাহ, নিস্তরঙ্গ।

অথচ সমুদ্রে তরঙ্গ থাকে। জন-সমুদ্রে? জন-সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার··· কোথায়? ঘোড়-সওয়ার? কবির সত্তর বৎসর পূর্তিতে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কী? না-কি অনিমেষ বড় বেশি ভুল বোঝে, প্রতীক-মায়া বোঝে না, নির্ভরতা বোঝে না···ইতিহাস-সূত্র বোঝে না···ব্যক্তির গৌণতা। আহা গৌণ, গৌণতা! জব্বর ভাষা, যে-মুহূর্তে সাফসুফ জানতে চাওয়া হয়, 'হ্যাঁ মশাই এ-সব কী? এর কী মানে হয়?'—তখনই উপনিষদ গাম্ভীর্য। তখন ধ্বনি, সুর ও উচ্চারণে একটি ছেদ টানা যায়, দুর্দান্ত মানুষও তাতে স্থির। সে বেচারা ফ্যালফ্যাল—হবে হয়ত···অত ত পড়িনি···জানি না। এখন, এই জানার মরণশীলতা, এই জ্ঞান-ধর্ম সেখানে কী-ই বা করা! তোমাকে মরতে হবে, জানতে হবে। ফলে কখনও কখনও ব্রণের দাগ সমেত কয়েকটা মুখ ভেসে ওঠে, চিৎকার ফেটে যায় কোথাও। তখন ঐতিহ্য সংস্কার মাত্র। তাহলে কী আর থাকে! যারা কারণ জানতে চাই, কারণ সমূহ জেনে যাওয়ার পর সেই তৃপ্ত উদ্গার থাকে যাদের, এমন-কি কর্মসূচীও দফা দফা। এই সব রূপায়িত লোক, এরকম হওয়া উচিত, আমাদের আশু-কর্মসূচী···

দাদা ল্যান্সডাউন হয়ে যাবে ত?

হাঁ।

ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন, দ্রুতগামী বাসটি নির্ঘাৎ ল্যান্সডাউন হয়ে যাবে। সুতরাং সংশয় নেই। ট্রাফিক আছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ শিথিল। কনডাকটার অযথা ঘণ্টি দেয়, কেউ চিৎকার করে, কেউ অন্য কারও পা মাড়িয়ে দিয়েছে। কলহ। মীমাংসা।

অনির্বাণ কী অবতার? এরকম কিছু সে বিশ্বাস করে বলে জানা নেই।

যদিও তার অস্বাভাবিক সারল্য ও অগাধ পাণ্ডিত্যে ও-রকম ব্যঞ্জনা ধরা থাকে। বন্ধুগণ, সচেষ্ট আছে অনির্বাণকে অবতার বানাতে। অনির্বাণ বিদেশ যাওয়ার নেমন্তন্ন রিফিউজ করেছে, তিন-তিনবার। ওর বায়োডাটা ঈর্ষণীয়, তাতে কোথাও কোনো স্খলন নেই, তদুপরি পণ্ডিত হওয়ার সাধারণ্যে পূরিত। অনির্বাণ কী ঐ পুজো এনজয় করে? এই এক ফ্যাসাদ সামান্য নড়াচড়া উদ্যোগ কোথাও কারও মধ্যে একবার দেখা দিলে আর রেহাই নেই··· তখন ঐ পুজো কিংবা ঘেন্না গড়ে ওঠে···এভাবে নির্বাসন···। অনিমেষ এই সব কথা অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা-রহিত, স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলায় বোঝা সহজ হয়েছে যে সে পোলারাইজেশনটি অনুধাবন করতে পারেনি। তার শ্রেণী চেতনা নেই, অর্থাৎ পতন। সে নেমে আসছে মসৃণ। কাঁটাবন ছুঁয়ে যাচ্ছে, চিরে যাচ্ছে শরীর। বা জিজ্ঞাসা: ধাক্কা-টা কী? অনিমেষের ধাক্কা! এ ত অবিশ্বাস্য যে কোনো ধাক্কা নেই, কোনো গতি-মুখ নেই, এত পরিবর্তনশীলতায় অনিমেষ কী করে স্ট্যাটিক থাকে?

সত্যি!

অনিমেষ বিদ্যুৎ-তাড়িত, সেই বাসে, জবজবে ঘামে। জানতে চায়, তার গতিমুখ, কোথায় যাচ্ছে, যাবে। মাঝেমাঝে মনে হয়েছে মানুষ বড় অভ্যাস-নির্ভর, তার মধ্যে সংশয় ছিল, সংশয় আছে, সে সংশয়ে থেকে গেল··· আবার এতে নিজের সম্পর্কে উচ্চমার্গ-ধারণাও থেকে যাচ্ছে। কোথাও কোনো রেয়াৎ নেই, রেহাই নেই। এজন্যেই আমরা ততখানি লজিক্যাল হতে পারি না, ততখানি রোম্যান্টিক···কিংবা অ্যানার্কিক।

'আতসবাজি দেখেছ।'

বলাবাহুল্য সে দেখেছে, কিন্তু বোঝেনি কেন অত দীর্ঘ জীবন কামনা করব। আতসবাজীর বিরোধিতায় আমরা যযাতি, যক্ষ, হাইপার টেনশনে আমাদের মৃত্যু বহু প্রাচীন, মর-দেহ লাল শালু আচ্ছাদিত। বোঝেনি চল্লিশের শেষ ধাপে মুদ্রুলদা কয়েকটি বিদেশী পত্রিকা, সাহেব পণ্ডিতের বাহবা ও পুরস্কার সম্ভাবনা ছাড়া আর কী অর্জন করেছে যেখানে ঐ তিনটি 'স' আছে···

সয়েল···সোসাইটি...সোস্যালিজম...

'আসলে···আমরা হিপোক্রিট'

ইনি সৎ, কোথাও পটপট শব্দে খুলে যাচ্ছে সার্টের বোতাম তাতে কী আত্মাও হিপোক্রিট!

সদন্ত-সিগারেট ব্যক্তিত্ব তখন, তাতে এমন কি প্রকাশিত যে ইতিপূর্বে

মহাপুরুষেরা এতখানি মোহমুক্ত ছিলেন না। সেই ভদ্রজন কোমল, হাস-ছিলেন। অনর্গল বলে যান আরও কেচ্ছা, 'পাওয়ারের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ···আমরা সাহেব-চাটা, আমরা কনজুমার্স···সিম্পলি কনজুমার্স···মধ্যবিত্ত নকল দোষদুষ্ট···যাকে বলে মাখানো···অথচ অনিমেষ দেখো এই সব বামুন কায়েতরাই সব···কেন আমি যে কোনো একজন (তৃণাদপি···) হয়ে···লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন হয়ে জাস্ট বেঁচে থাকা···কোনো ইভিলপাওয়ারের সঙ্গে যুক্ত না থাকা···

এভাবে ক্রমে সে বাউল দর্শন আনে, আরও বেশি ভারত-আত্মা পেতে চেষ্টা করে, রবিবার সকালে তার গৃহ তখন আনন্দ-আশ্রম, শ্রোতারা, বন্ধুরা মুগ্ধ হওয়ার নিপুণ ভঙ্গিমায় সমাধিস্থ। পরে একটি হুল শূন্যে বিদ্ধ করে তারই প্রতিক্রিয়া : শালা কী খচ্চর হয়েছে···

বাসটা ভালো রান করছে, তাতে ঢুলুনু, বালোর ঘুম। কোণে একটি নির্বোধ মুখে ক্রমাগত লালার ক্ষরণ। যথেষ্ট হৃষ্ট নয় সে, পরিণত নয়। এই অপুষ্টি, মস্তিষ্কের জড়তা কী জেনেটিক? কেন এমন হয়? লোকজন, যাত্রী ও কনডাকটরের সংলাপ শোনার অপেক্ষায় নেই যে, ওসব সে অনুধাবন করতে পারে না, জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কেন এত মানুষ? বাস? তারা কোথায় যাচ্ছে? কোথাও কী যাচ্ছে?

অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বর্তুল মাথাটি কাত হয়ে আছে, থেকে থেকে হাসছিল? স্ত্রী-পুরুষ সমেত সমস্ত যাত্রীর চোখ একবার না একবার তার মুখে আটকে যাচ্ছে। তখন কেউ মুখ মুছে নেয়, চুল সরায়। যেন সেই নির্বোধ মুখটি দর্পণ, ঐ দর্পণে সমস্তই কুশ্রী, তাতে প্রকাশ পাচ্ছে নিবিড় মালিণ্য ও যেখানে যত গুপ্ত অন্ধকার ছিল। ভয়ও। যে জন্যে সাময়িক বন্ধ আছে কথা, খেজুরি-আলাপ, এমন কি ভাবনাও। তারা কেউ তখন কিছুই ভাবতে পারে না। ফলে গালের দু পাশে পেশী ঝুলে যায়, ঠোঁটে ঝি ঝি ধরে, চোখে না-নিদ্রা, না-জাগরণ। তখন ঐ জনসমষ্টি বড় বিপন্ন, চোখটি ভাবা অর্থহীন। বড় সমর্পিত তারা। হাসপাতালের বড় ডাক্তারের সামনে ছা পোষা কাকা-বাবা-দাদারা যেমন, যেমনটি ঘটে সেন্ট লরেন্স স্কুলের রেক্টরের সামনে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কেরাণী পিতার, পুলিশ অফিসার কিংবা পূর্ত বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে হাউস বিল্ডিং লোনের তদ্বির করতে গিয়ে একজন মানুষ যেমন নিছক দরখাস্ত হয়ে যায়। আর আর ডিরেক্টার··· চিফ···যাদের সামনে এই জনসমষ্টি বাক-রহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিড়ম্বনা এবং

শামুকখোল সন্ধানরত তারা…সেই নির্ভরতা যা এককালে ঈশ্বরে প্রদত্ত ছিল…সেই বেতসবৃত্তি…

কোথাও কি করুণা ছিল! টু-বি বাসে!

হাদা গোবা মানুষটির এক হাত উর্ধ্বে তুলে ধরা, এবার দেখা যায় সে হাসছে না, বা সে যে হাসছে আসলে তা কষ্ট। ভিন্ন প্রকাশ। তার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু প্রকাশ বিভ্রাটে তা ওরকম হাসি হাসি দেখাচ্ছে।

হাড়টা জুড়বে না…হাড় জোড়ে না…ভেঙে গেছে ত…

সে প্রত্যাশা করেছিল কেউ না কেউ কথা বলবে, জানতে চাইবে কোথায়, কীভাবে ভাঙল, কেউ না কেউ জানে কীভাবে হাড় জোড়া লাগে। আবার তার এই ব্যবহার অস্বস্তির, ওরকম ভনিতাবিহীন কথা, জিজ্ঞাসা। সামান্য একটা রাস্তার, ঠিকানার খোঁজ করতে হলে প্রথমে বলা উচিত: দাদা শুনছেন। বা, শুনছেন। তখন সে বলবে: আমাকে বলছেন। বা বলুন। তারপর সব ঠিকঠাক ঘটে যাবে। মানুষটির এসব কৌশল আয়ত্তে নেই, সে ভাবে, 'আজ আমার ভেঙেছে কিন্তু কাল যে আপনার ভাঙবে না…' সে যথার্থ-ই বলে ফেলে তা। এমন কি ভবিষ্যৎবাণী করে বসে:

সবার ভাঙবে, কারও হাত থাকবে না।

হাড-জোড়া পাতা লাগান, একেবারে ধন্বন্তরি…

বললেন এক মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু সম্মতি মতামতও চিরঞ্জীব বনৌষধি, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে দীর্ঘ, খণ্ডিত সংলাপ বয়ে গেল বেমালুম। তাতে অসুখ বিষয়ে সাধারণে যা-যা দুর্বলতা, প্রতিষেধক প্রতিরোধক যে মনোবৃত্তি সে-সবই যথার্থ প্রকাশ পাচ্ছে। যন্ত্রণা লাঘবের ভবিষ্যৎ কল্পনায় নরম মুখটি তখন আনন্দময়, যেন সে ফিরিয়ে নিচ্ছে ঐ অভিশাপ যদিও যাত্রীরা নিশ্চিত নয়, ঐ জনসমষ্টি তখন স্ব স্ব হাত পরখ করে নিতে চাইছে: অথচ তাতে কুণ্ঠা, লজ্জাও।

ঝটতি বাতাস কিছু ঘাম শুষে নেয়, স্বস্তি শ্বাস ওঠে এবং পড়ে, তাতে ক্রমে সকলেই গন্তব্য-বিস্মৃত যেন। যদিও সেজন্যে কোনো খেদ-টেদ নেই। হয়ত বা বিস্মৃতি আরও গভীর, তারা যথার্থ শূন্য হয়েছে।

তারা জানে না বাসটা কোথায়, কতদূর যাবে! শুধু জানে বাসে গতি আছে, তাতে যাওয়া অব্যাহত। কোথাও একটা যাচ্ছে, যাবে। কনডাকটর জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি এখনও, ফলে টিকিট কাটার ঝক্কাট নেই। আশ্চর্য সেই টু-বি বাস তখন নির্জন রাস্তা ফেলে যাচ্ছে হরিণগতিতে।

দূরে ময়দান, প্ল্যানেটরিয়াম, সেখানে তীব্র আলো পুড়ে যাচ্ছে. আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে কারাল-দ্রংস্টা কেলিগ্রাব। তাতে শব্দ ছিল, ঐ শব্দই হরিণ, সে রকম মায়া গড়ে উঠছে। আবার ঐ হরিণ কলকাতার বিজ্ঞাপন।

সোনার হরিণ!

তুমি কোন বনেতে থাক!

কে যেন বলে উঠল, হাত-ভাঙা মানুষটা কী? আবার কোথাও সেমিনার, চীৎকার 'কলকাতা নিয়ে অদ্যাবধি কোনো সিরিয়াস উপন্যাস লেখা হয়নি' এই বাক্যে নাগরিক খেদ জ্বলে উঠছে প্রজ্জ্বলিত মোম।

কিছু কিছু কারণ জানা যাচ্ছে তখন:

'খিদিরপুর ডকে বোমা পড়ল যখন, সেই যুদ্ধের সময়, ঠিক ডকে নয় বোমাটা পড়ল খিদিরপুর বস্তিতে তখন আমি চারশো টাকা মাইনের বার্ড কোম্পানিতে ঢুকি...আজকের কথা!'

ভদ্রলোক হাসেন, তাতে নিকেল চশমা ও বাঁধানো দাঁত চকচক করে ওঠে, নাকের ডগায় ধরা থাকে আলোক বিন্দু, দ্যুতি।

'রাতের টিপে বায়োস্কোপ ফিরতে কত যে মজা ডিঙোতে হয়েছে, সে যে দুর্ভিক্ষ তোমরা দেখনি, রুমালে সেন্ট মাখিয়ে নিতুম, হাতে টর্চ থাকত. অকশনে কেনা মিলিটারি টর্চ...'

গোল দিঘি, জোড়া গীর্জা, নাখোদা মসজিদ, ঠনঠনিয়ার কালী বাড়ি ও মারহাট্টা ডিচ সমেত এই নগরের সঙ্গে মিশ্রিত নাগরিক স্রোতের সম্পর্ক তেল জল। প্রাচীন সার্কুলার রোডের লক্ষ্মণ গণ্ডী এখন বহুদূর বিস্তৃত. কলকাতা—১০...১৫...২৫...৫০। আরও কত?

অনুচ্চারিত এই সব সংলাপ অনিমেষ শুনে যাচ্ছে, শেষ বাস ভুতুড়ে; ক্রমে বাসটি ছুটে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর কেলিগ্রাবের দিকে, যেখানে বমন, গর্ভ... শরীরের মল-মূত্র-ঘাম-স্রাব ফেলে যাচ্ছে, ধারাবাহিক মৃত্যু ও বমন ফেলে বাসটি ছুটে যাচ্ছে, যেখানে কলকাতা নেই, যা কলকাতা নয়।

সংকেত

কেশব দাশ

এক

দু নম্বর গেট দিয়ে কারখানায় ঢুকেই খবরটা শোনেন ব্রজ সেন, কাল এক নম্বর গেটে ঠিকা শ্রমিকদের সঙ্গে বেশ একটা জবরদস্ত গণ্ডগোল হয়েছে—ভাঙচুরও হয়েছে কিছু।

বেলা এগারোটার সময় ইউনিয়নের সম্পাদক রথিন হাজরা ফোন করেন, 'সেন, শুনেছেন ব্যাপারটা, কন্ট্রাক্ট লেবারদের—সিরিয়াস। আজ মিটিং ডাকছি. তিনটেয়, রিক্রিয়েশন রুমে—আপনার আপত্তি নেই তো?' 'না না ডেকে দাও...'

টিফিনের পর বেলা একটার সময় হাতের কাজ মোটামুটি সেরে ব্রজ সেন বেরিয়ে পড়েন। পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য। কারখানার সেডের ভিতর দিয়ে হাঁটা দেন। নিজের ডিপার্টমেন্ট অতিক্রম করে, ঢোকেন মেলটিং শপে। এখানে বিশাল সেডের মাঝখানে দুটি প্রকাণ্ড ফার্নেসের ভেতর থেকে অবিরাম নির্গত গলিত লৌহস্রাব ডাইসে আদল পেয়ে কনভেয়ার বেল্ট হয়ে চলে যাচ্ছে রোলিং মিলে। ফার্নেসের উত্তাপে এখানকার বাতাস সর্বদা গরম এবং বিচিত্র শব্দমালায়—ফার্নেসের শব্দ, কয়েক শত হর্স পাওয়ারে চালিত কনভেয়ার বেল্টের চাকাগুলির ঘরঘরধ্বনি এবং আরো বিচিত্র যান্ত্রিক শব্দে এখানকার পরিমণ্ডল ভার

হয়ে আছে। সেডের গা-ঘেঁষে আপার ডেকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ব্রজ সেন দূরে ফার্নেসের হাঁ-করা অগ্নিকাণ্ডে, যেখান থেকে লোহিত লৌহস্রাব বেরিয়ে আসছে, সেদিকে তাকান—চোখ যেন ঝলসে যায় উত্তাপ আর গলা লোহার আলোকছটায়।

মেলটিং শপ পার হয়ে ঢোকেন স্টোরে। দু পাশে থাকে থাকে সাজানো দীর্ঘ লোহার বারগুলি, মাঝখানে সরু প্যাসেজটা দিয়ে হেঁটে যান। সেডের চালার নিচে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলন্ত ওভার হেড ক্রেনটা ব্রজ সেনের মাথার ওপর এসে থেমে যায়। ড্রাইভার কেবিনের জানলা থেকে একটা মুখ নিচে ঝুঁকে পড়ে। 'সেনদা, দাঁড়ান এক মিনিট—' বলেই কেবিনের দরজা খুলে একটা মানুষ ঝুলন্ত মই বেয়ে নেমে আসে নিচে। মানুষটিকে চেনেন ব্রজ সেন—দুলাল মণ্ডল, যুবক, ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী। যুবকটি ওর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'সেনদা, ঐ কেসটা কি হল?' 'কোন্ কেসটা বলতো?' 'ঐ যে মেন্টেনেন্সের—ফোর-ফর্টিতে শক খেয়ে—লোকটা আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার ছিল—ওর ওয়াইফ এসেছিল আজকেও—কেসটা তো কিছু করতে হয়!' 'ও:, ঐটা, নাসিরউদ্দীন না কি নাম যেন—ঐ কেসটা তো! আরে ভাই, ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার খান্নার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, এক্সিডেন্ট বেনিফিট মিলিয়ে ওর পাওনা লাম-সাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হবে। কিন্তু টাকাটা পাবে কে?' 'কেন, ওর বৌ।' 'ওর বৌ তো তিনটে, কোন্‌টা পাবে?' 'নাসিরউদ্দিন মারা যাবার আগে থার্ড ওয়াইফের সঙ্গে ঘর করত, সে সে দিক থেকে—' 'সে বললে তো হবে না। আগের দুটো বৌও কোম্পানির কাছে অ্যাপিল করেছে। আর তাছাড়া নাসিরউদ্দিন আগের দুটোকে ফর্মাল ডিভোর্সও করে নি। সুতরাং এখন আইনের প্যাঁচে—বুঝলে তো। কোম্পানি এখন কাকে লিগাল ওয়াইফ বলে মেনে নেবে।' 'তাহলে কি করা যায় সেনদা?' 'কিছু একটা করতে হবে। ফর নাথিং টাকাগুলো তো আর কোম্পানির ক্যাপিটাল হয়ে যেতে পারে না। দেখা যাক।' 'দেখবেন সেনদা ব্যাপারটা—' বলে যুবকটি আবার মই বেয়ে ওপরে উঠে নিজের কেবিনে ঢোকে।

স্টোর অতিক্রম করতেই সামনে কারখানার একনম্বর গেট সংলগ্ন বিশাল চত্বর। চত্বরের মাঝখানে ডেসপ্যাচের অপ্রশস্ত চৌকোণা বুথ,

ও-প্রান্তে রিসেপশন। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মে যারা এখানে আসেন, প্রথম চোটেই তাদের মনে যাতে কোম্পানির আভিজাত্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়, তার জন্য রিসেপশন রুমটি অত্যন্ত সজ্জিত ও পরিপাটী—সম্মুখে পাশাপাশি পার্কিং প্লেস, এক টুকরো সবুজ ঘাসের লন এবং তার মধ্যস্থলে জলের ফোয়ারা বুকে নিয়ে শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছোট্ট একটি জলাধার; রিসেপশনের সামনে প্রায় দশ বাই সাত ফুট কাচের দেওয়াল, যার বাধাহীন স্বচ্ছতা ভেদ করে অন্তর্ভাগ দৃশ্যমান: মেঝেতে রঙিন ফরাশ, বিপরীত দেওয়ালের গা-ঘেঁষে কয়েকটি সোফা সেট এবং তার সামনে একটি অনুচ্চ টেবিলে দেশী-বিদেশী অনেকগুলি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগাজিন, দেওয়ালের গায়ে কারখানায় তৈরি সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রডাক্টের ফ্রেমে-আঁটা ডিজাইন।

এখন সেই রিসেপশন রুমটির লণ্ডভণ্ড ছত্রাকার অবস্থা—কাচের দেওয়াল ভেঙে টুকরো টুকরো, ভেতরে সোফা সেট, টেবিল, ম্যাগাজিনের পাতা ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ানো, দেওয়াল ও দেওয়ালের গায়ে ছবিগুলিতে কাদা লেপান···

'সেন যে, কি খবর, ইনভেস্টিগেশনে এসেছ—ভালো!' সেন বাঁয়ে ঘাড় কাত করেন—নিখিল দত্ত। '...আরে ভাই তোমার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, এদিকে আসোই না একেবারে, চলো আমার অফিসে—' বলে নিখিল দত্ত ডেসপ্যাচ সেকশনে নিজের চেম্বারে জোর করে টেনে নিয়ে যান ব্রজ সেনকে। একটা সেক্রিটারিয়েট টেবিলে নিখিল দত্তের বিপরীতে, মুখোমুখি বসেন ব্রজেন সেন।

ব্রজ সেন এবং নিখিল দত্ত প্রায় একই সঙ্গে এই এস. আর. সি. কারখানায় ঢুকেছিলেন, সাধারণ শ্রমিক হিসাবে। তারপর পদোন্নতি হতে হতে নিখিল দত্ত এখন একটা ডিপার্টমেন্টাল সুপারভাইজার।

'অবস্থাটা দেখলে তো সেন···'নিখিল দত্ত বলেন, 'কন্ট্রাক্ট লেবার, ক্যাজুয়াল লেবারে কারখানা ছেয়ে যাচ্ছে। আর প্রত্যেকদিন কুট ঝামেলা মারপিট—'

'কি হয়েছিল?'

'আর ভাই, আর বলো কেন···বেকার ছেলেগুলোকে সারাদিন খাটাবি, দিবি তো ছ-সাত টাকা রোজ, তাও পেমেন্ট নিয়ে ধানাইপানাই, আজ নয় কাল। তা ওরা সে সব শুনবে কেন, বলো। এই নিয়ে গণ্ডগোল-বচসা।

তারপর কোম্পানির সিকিউরিটি কোর্স বোধ হয় সরিয়ে দিতে গেছিল, ব্যস্ হিতে বিপরীত, ভাঙচুর এইসব...'

'কোন্ কন্ট্রাক্ট মালিকের সঙ্গে গণ্ডগোলটা হল ?'

'ঐ যে সিংজী, ওর পে-মাস্টারের সঙ্গে। সিং-ই তো এখন লর্ড।'

সিংজী...অর্থাৎ প্রেমজিৎ সিং...অর্থাৎ—

ব্রজ সেনের চোখের সামনে একটা আসুরিক চেহারা ভেসে ওঠে—গাল ভর্তি চর্বনরত পানের সঙ্গে শক্ত দুটি চোয়ালের ওঠানামা, এক জোড়া মোটা দীর্ঘ গোঁফ চিবুকের দুই প্রান্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টিতে এক রকম অর্থপূর্ণ ধূর্তামি।

সিংজী—অর্থাৎ সেই ব্যক্তিটি, ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য নয়, একজন সাধারণ শ্রমিকও নয়, যার কোম্পানির দশ টাকার একটা শেয়ার হোল্ডারও নয়, তবু তার জিপটি যখন বেপরোয়া গতিতে কারখানার গেট অতিক্রম করে. তখন গেটের দারোয়ান ত্বরিত তৎপরতায় গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে ঠকাস করে সেলাম ঠোকে।

সিংজীকে ব্রজ সেন চেনেন, ভালো ভাবেই। উত্তর প্রদেশের জাঠ বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তিটি যৌবনকালে একদা হাওড়ার এই শিল্পাঞ্চলে এসে উঠেছিলেন সুদের ব্যবসা করতে। এম. আর. সি তখন এতো বড় ছিল না, এতো শ্রমিক কাজ করতো না। সপ্তাহান্তে মঙ্গলবার শ্রমিকদের যেদিন বেতন হতো, সেদিন ছুটির সময় কারখানার গেটের সামনে সারি দিয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে থাকত শ্রমিক-বৌরা আর অন্য দিকে কুসীদজীবীরা। শ্রমিকদের বৌরা দাঁড়াত যাতে তাদের স্বামী সপ্তাহের টাকাটি চোলাই মদ আর জুয়ার আড্ডায় ঢেলে দিয়ে আসতে না পারে. আর কুসীদজীবীরা অপেক্ষা করত তাদের খাতকটিকে পাকড়াও করতে। দিগন্ত কাঁপিয়ে কারখানায় ছুটির সাইরেন বাজত, আর ছোট্ট গেটটা দিয়ে বাঁধভাঙা বন্যার মতো কালিঝুল মাখা শ্রমিকরা বেরিয়ে আসত পিল পিল করে। অপেক্ষমান সিংজী মানুষের চলমান স্রোতের মধ্য থেকে হঠাৎ তার প্রার্থিত ব্যক্তিটিকে যথার্থ ঠাওর করে চিলের মতো ছোঁ মেরে টেনে আনত, 'নিকালো রূপেয়া—।'

সময়টা তখন বোধ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি। হুগলী নদীর ওপারে কলকাতা বন্দরে বোমা পড়ল। এপারে নদী-সংলগ্ন অসংখ্য ছোট-বড় কারখানা আর কারখানা-সংলগ্ন শ্রমিক বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ল ত্রাস, 'হায়

ভগওয়ান ক্যা হোগি।' দলে দলে শ্রমিকরা চাকরি ছাড়ল, চাকরি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পাড়ি দিল দেহাতে। বস্তি ফাঁকা। বস্তি মালিকরাও বস্তি বেচে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। এগিয়ে এলো সিংজী। সিংজী বুঝল যুদ্ধ চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং এই মওকা। শ-শ খপড়ি সমেত এক-একটা মহল্লা, মহিষের খাটাল কিনে নিল জলের দরে। সিংজী হিসেবী মানুষ, ঘাঁটঘোঁট বোঝে, ঠিকমতো সুযোগ আসলে ওর হাত ফসকায় না। বস্তি ভাড়া, খাটাল আর ঠিকা ব্যবসা ছাড়া সিংজী এখন দুটো সিনেমা হল এবং খানকয়েক বাসের মালিক। আগে চোলাই মদের কারবার ছিল, এখন তুলে দিয়েছে। 'উসমে ঝামেলা বহুত, নাফা কম—।' এখন শহরে দুটো বিলাতি মদের দোকান খুলেছে। ইতিহাসের অশ্বারোহী কোন হানাদারের মতো সিংজীর গাড়ি যখন অরোধ্য গতিতে শহরের ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যায়, তখন রাস্তায় লোকমুখে গুঞ্জন ওঠে, 'সিংজী! সিংজী!'

নিখিল দত্ত বলেন, 'আরে ভাই, সেলস্, পারচেস্, ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার সকলে সিংজীর হাতের মুঠোয়। কারখানায় টোটাল কনট্রাক্ট লেবের ফিপটি পার্সেন্ট সিংজীর বাঁধা। তা বলে ভেবো না সব কাজটা সিংজী নিজে করে, বেশির ভাগটাই তুলে দেয় সাব-কন্ট্রাক্টরের হাতে। ধরো একটা কাজে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট, টেন পার্সেন্ট সিংজী আর ফিফ্‌টিন পার্সেন্ট সাব-কনট্রাক্টর। সিংজী শুধু টেণ্ডার হস্তান্তর করেই খালাস। সবই গুঁড়োর মহিমা সেন! আমাদের পারচেসের কাপুর—প্রত্যেক শনিবার রেস গ্রাউণ্ডের সামনে দাঁড়াবে— দেখবে, সিংজীর সঙ্গে গাড়ি থেকে নামছে। আমি তো ভাবি, কবে হয়তো শুনবো সিংজী এম আর সি কারখানাটাই অকসনে ডেকে নিয়েছে।'

দত্ত বেল টেপেন। দরজা ঠেলে বেয়ারা ঢোকে। 'চা খাবে?' দত্ত জিজ্ঞাসা করেন। মৃদু হেসে ব্রজ সেন, 'এতো দিন বাদে এলাম—' 'দো চা লেয়াও।' ড্রয়ার টেনে সিগারেট বের করেন। ব্রজ সেনের দিকে বাড়িয়ে দেন, নিজে একটা নেন। প্যাকেট রাখেন টেবিলে।

'এবারের এম. আর. সি. নিউজ ম্যাগাজিন দেখেছ?' নিখিল দত্ত বলেন, 'ফ্রাংকফুর্টে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ফেয়ারে এম আর সি প্যাভিলিয়ন, ছবি বেরিয়েছে। এম. আর. সি-র এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। মিডিল ইস্ট, আফ্রিকা, এশিয়ার আদার কান্ট্রিতে বাজার এখন রমরমা। চায়নার মার্কেটে এক্সপোর্ট

করার কথাও নাকি পাকা। ফরেন আর কমার্স মিনিস্ট্রি থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই ব্যস্—'

'ভালোই তো। আমরা দেশকে ফরেন এক্সচেঞ্জ কন্ট্রিবিউট করছি।' হাসতে হাসতে বলেন ব্রজ সেন।

'তা ঠিক। আর ফরেন এক্সচেঞ্জের সুবাদে কোম্পানি সরকারের শুভ বুকে আসছে। গভ্‌মেন্ট ডিউটি ছাড় পাচ্ছে। র' মেটিরিয়েলসে প্রেফারেন্স পাচ্ছে। আর ইন্টারন্যাল মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে শ্রেফ ট্রেড মার্ক আর গুড উইল। ধরো, যে রেলওয়ে অর্ডারে কোম্পানির এতো বাড়বাড়ন্ত, তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফিনিসিং জব এখন বাইরের ছোট ছোট ইউনিট-গুলোকে দিয়ে করানো হয়। কোম্পানি শ্রেফ ট্রেড মার্ক মেরে ছেড়ে দিচ্ছে

দুই

ডিউটি আওয়ার্সে মিটিং ডাকলে এই একটা সুবিধা, সকলে হাজির হয়। যেমন এখন, ইউনিয়নের নয়জন কর্মকর্তার মধ্যে আটজন উপস্থিত—এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই।

সভার শুরুতে রথিন হাজরা গতকালের ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দেন: '...এ ব্যাপারটা হল এই...কোম্পানি এখন এসট্যাবলিসমেন্টের কাজও কনট্রাক্ট দিয়ে করাচ্ছে। সোজা পলিসি, টেণ্ডার কল করো—যত কমেই হোক, কম্পিটিশন মার্কেট, ঠিকাদার ঠিক পাওয়া যাবে। তারপর তারা খাটাক না ছ-সাত টাকা রোজে—নো ওয়ার্ক নো পে—সবকিছুর ঘাটতি হলেও দেশে তো আর বেকারের ঘাটতি নেই...'

ব্রজ সেনের ডান দিকে, জাকির বলেন, 'কারখানায় ঠিকে শ্রমিক কি হারে বাড়ছে সেটা দেখুন—মেসিন সপের তিন নম্বর সেডে ক্রেন থেকে মাল খালাস করার জন্য পাঁচজন লেবার ছিল। দুজন প্রমোশন নিয়ে অন্য ডিপার্টে চলে যাবার পর কোম্পানি সেখানে নতুন রিক্রুটমেন্ট দেয় নি, দুজন ঠিকে শ্রমিক নিয়োগ করেছে। লাস্ট ছ বছরে, আমার মনে হয়, কারখানায় সুইপার-ক্লিনার কমেছে, কিন্তু বাড়ে নি। নতুন যে-সব সেড তৈরি হচ্ছে, বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, সেগুলো পরিষ্কার করার জন্যও কন্ট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে...'

ব্রজ সেনের বাঁয়ে রাজেন সামন্ত, 'ব্যাপারটা বুঝলাম, কিন্তু করণীয় কি। কন্ট্রাক্ট লেবারদের নিয়ে তো কোনো মুভমেন্ট আশা করা যায় না। তারা আজ আছে কাল নেই...'

রথিন হাজরা, 'এ ক্ষেত্রে করণীয় একটাই, তা হল প্রপার রিক্রুটমেন্টের দাবিতে মুভমেন্ট গড়ে তোলা...'

সুধীর অধিকারী, 'কিন্তু আপনি যদি সমস্ত ক্যাকিজিতে প্রপার রিক্রুটমেন্টের দাবি তোলেন, তাহলে হয়তো দেখবেন শ্রমিকরাই আপনার বিরোধিতা করছে। কারণ এটা ইমপ্লিমেন্ট হলে শ্রমিকদের ওভার টাইম বন্ধ হবে—দিস ইজ ফ্যাক্ট! আপনি চাইলেই তো আর শ্রমিকরা মুভমেন্টে নেমে পড়বে না...'

'শোনো, শোনো, ব্যাপারটাকে ওভাবে ভাবলে চলবে না—' ব্রজ সেন বলেন, 'এটাকে একটা সমস্যা হিসাবে ধরতে হবে। 'এই যে ক্যাজুয়াল ওয়ারকারদের দিয়ে ইণ্ডাসট্রিতে একটা নতুন নেগলেকটেড সেমি-ওয়ার্কিং ক্লাস তৈরি হচ্ছে। এরা টোট্যাল ওয়ার্কিং ক্লাসের বিরুদ্ধেও তো চলে যেতে পারে। আমার কথা হল, এ-বিষয়ে ওয়ার্কিং ক্লাসকেই সতর্ক হতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনান্তে স্থির হয় পরে শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা ডাকা হবে এবং সেখান থেকে কি করা যায়, না-যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিন

সভা শেষ হয়, ব্রজ সেন ঘড়ি দেখেন—সাড়ে পাঁচ, অর্থাৎ ছুটির সময় উতরে গেছে, এবার বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া।

রিক্রিয়েশন রুম থেকে বেরোতেই ক্যান্টিন। ব্রজ সেন ক্যান্টিনের বিশাল হলটি আড়াআড়ি অতিক্রম করে বাইরে আসেন। কারখানার চৌহদ্দির অন্তর্গত এ দিকটা আপাতত কারখানার পশ্চাৎভাগ। ডানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের দাপটে অতীতের ধোপা পাড়া, বস্তি, দোকান ধূলিসাৎ—অনুচ্চ চড়াই-উৎরাইয়ের মতো শূন্য ধূ ধূ প্রান্তর এবং সেই বিশাল প্রান্তরের ওপর দিয়ে মাটি ফেলা ট্রাকের খাপছাড়া যাতায়াত, এতো দূর থেকে যা দৃশ্যত পিপীলিকার মতো। ক্যান্টিনের বাঁ-হাতি নির্মীয়মান সেডের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ওয়েল্ডিং-এর চোখ ধাঁধানো ফ্লাস, থেমে থেমে গ্রাইণ্ডিং এবং বোরিং-এর 'ক্রা-আ-আ...' শব্দ। নির্মীয়মান সেডটি পার হবেন ঠিক সে সময় ডাকটা কানে আসে, 'সেনদা—'

ব্রজ সেন দাঁড়িয়ে পড়েন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান পেছনের দিকে—

অ্যাসবেসটাসের উঁচু সারি-সারি সেডের গা দিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে এবং এখান থেকে দৃষ্টির দূরাতিগম্যে রাস্তাটা ক্রমশ সরু ও অস্পষ্ট হতে হতে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে কারখানার শেষ সীমায়। শূন্য রাস্তার ওপর একটা মানুষও চোখে পড়ে না। একটু আগে, ডানদিকে, রাস্তার পাশে উঁচু সারি সারি শাল খুঁটির মাথায় বাঁধা ফ্লাড লাইটের নিচে একটা নতুন সেড নির্মাণের কাজ চলছে। একটি সীমাবদ্ধ পরিসীমায় কয়েকজন মিস্ত্রি আর অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ মজুর মাটির ওপর কংক্রিটের স্লাব আর বিম তৈরির কাজে ব্যস্ত। ওদের কাজ দিবারাত্র অবিরাম—দিনে উন্মুক্ত সূর্যালোকে, রাত্রে ফ্লাড লাইটে। কর্মব্যস্ত ঐ মানুষগুলোর মধ্য থেকে কেউ ওকে ডাকতে পারে, এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান না-করতে পেরে ব্রজ সেন সামনে হাঁটা দেন। কয়েক পা গেছেন, আবার 'সেনদা-আ—'

ব্রজ সেন এবার ঘাড় উঁচু করে শূন্যে তাকান এবং ওর দৃষ্টি বাঁ-দিকে নির্মীয়মান সেডের চালার ওপর থেকে আকাশের দিকে খাড়াখাড়ি উঠে যাওয়া চিমনির মাঝখানে এসে স্থির হয়। ব্রজ সেন দেখেন, চিমনির চার-দিকে চৌ কোণা করে বাঁধা বাঁশের ভারার ওপর দাঁড়িয়ে একটা মানুষ চিমনির গায়ে রঙ লাগাচ্ছে। 'সেনদা চিনতে পারছেন···' শূন্যে ঝুলন্ত মানুষটা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে। প্রৌঢ় ব্রজ সেনের দৃষ্টি এমনিতেই এখন একটু ক্ষীয়মান, তারপর মানুষটা যেখানে ঝুলে রয়েছে মাটি থেকে তার দূরত্ব ন্যূনপক্ষে চল্লিশ ফুট এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই আলো-ছায়ায় মানুষটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারেন না। কিন্তু মানুষটা ব্রজ সেনের উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার চিৎকার করে বলে, 'চিনতে পারলেন না তো সেনদা, আমি সুখেন্দু, আপনার বাড়ির পাশে···'

ও, সুখেন্দু, সুখেন···অনেকটা সে-রকমই মনে হচ্ছিল বটে। তবু এতটা উঁচু থেকে ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। আর তাছাড়া ছেলেটাকে এ অবস্থায়, মানে হঠাৎ কারখানার মধ্যে চিমনিতে রঙ লাগাতে দেখবেন, ব্রজ সেনের কাছে অভাবনীয়। ছেলেটাকে চেনেন ব্রজ সেন, যেমন একজন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না-থাকা সত্ত্বেও অনেকবার দেখার মধ্য দিয়ে চেনা হয়ে যায়, সে রকম। অফিসে যাওয়া-আসার পথে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ছেলেটা একটু লাজুক হেসে বিনীত স্বরে বলত, 'সেনদা, ভালো আছেন?' প্রত্যুত্তরে ব্রজ সেনকে একটু হেসে সংক্ষেপে সারতে হয়, 'হাঁ ভাই, ভালো আছি।'

কিছুদিন আগে ওর বাবা এসেছিলেন ব্রজ সেনের বাড়ি। বসা চোখ,

বসা গাল, চর্মসার দেহে ঢলঢলে ময়লা পাঞ্জাবি আর কাপড়—খর্বাকৃতি লোকটির মুখের হাবভাবে কেমন যেন সংকোচ ও জড়তা,—'স্যার আইলাম আপনার কাছে একটা দরকারে। আমার পোলাটারে চেনন তো আপনি, সুখেন্দু। দু বছর হইল বি-এ পাশ কইরা বইয়া আছে। তাই স্যার, আপনার কাছে, আপনে অরে যদি আপনার কারখানায়…'

ব্রজ সেন জানেন, এ ক্ষেত্রে সরাসরি পারব না বলে নিরস্ত করা অসম্ভব। সুতরাং একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়, 'জানেন তো আজকাল আর সে দিন নেই। এখন একটা ভ্যাকেন্সি হলে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, ইন্টারভিউ নিতে হয়, তারপর চাকরি…'

'আপনে দেখলে হইব স্যার, ঠিক হইব…' বলে গদগদ ভাব প্রকাশ করে তখনকার মতো ব্রজ সেনকে রেহাই দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

তারপর আজ, এখন, মাটি থেকে চল্লিশ ফুট ঊর্ধ্বে ঝুলন্ত সুখেনের সঙ্গে ব্রজ সেনের দেখা, 'সুখেন ওখানে কি করছ?'

'কাজ করছি সেনদা—কাজ, কন্ট্রাক্টরের আণ্ডারে, সাত টাকা রোজ…'

সেই কন্ট্রাক্টরের আণ্ডারে…কাজ…সাত টাকা রোজ…'সুখেন, অতো ওপরে কাজ করছ, সেফটি বেল্ট কোথায়?'

শূন্য থেকে একটা হাসির তরঙ্গ ভেসে আসে, 'সেফটি বেল্ট! কাজটাই জোগাড় করেছি অনেক কষ্টে, তারপর সেফটি বেল্ট চাইলে এক্ষুনি গেটের বাইরে—বুঝলেন তো!'

আশ্চর্য, এত ওপরে একটা মানুষ কাজ করছে, সেফটি বেল্ট নেই! পড়লে তো সঙ্গে সঙ্গে শেষ, কি ভয়ঙ্কর। এদিকে ডিপার্টে-ডিপার্টে সরকারের লেবার দপ্তর লেবার সেফটির ওপর গাদা গাদা পোস্টার সেঁটে দিয়ে যাচ্ছে।

'সুখেন, তুমি কোন্ কন্ট্রাক্টরের আণ্ডারে কাজ করছ?'

'সিংজীর আণ্ডারে…'

ব্রজ সেনের চোখের সামনে আবার একটা পরিচিত মুখচ্ছবি—একটা আসুরিক চেহারা…এক জোড়া পুরু বিসদৃশ গোঁফ…শক্ত চোয়ালের অবিরাম ওঠানামা…নিষ্করুণ দুটি চোখের দৃষ্টিতে ধূর্তামি…

এতক্ষণ এক-নাগাড়ে শূন্যে তাকিয়ে থাকার জন্য ব্রজ সেনের কপাল টনটন করে। ঘাড় নামিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ মুছে নেন এবং অতঃপর আবার শূন্যে তাকিয়ে 'সুখেন, সাবধানে কাজ করো' বলে সম্মুখে হাঁটা দেন।

চার

সুখেনকে এ অবস্থায় কাজ করতে দেখে ব্রজ সেনের বাজে লাগে, যতই হোক ছেলেটাকে তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন। আর তাছাড়া একটা বি-এ পাশ ছেলে, একটা শ্রমিকের কাজও নয়, কন্ট্রাক্টরের আণ্ডারে, সাত টাকা রোজ। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকান, দূর থেকে সুখেনের দেহটা দুর্বোধ্য। এমন কি একটা মানবদেহ বলেও মনে হয় না, যেন একটা ছোট পুঁটলি চল্লিশ ফুট ওপরে চিমনির গায়ে ঝুলছে। এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ফ্লাড লাইটগুলো জ্বলে উঠছে এক এক করে। সুখেন ঐ ফ্লাড লাইটের আলোয়, রাত্রে, ঐ চিমনির ওপর কাজ করবে নাকি? কে জানে।

কারখানার পেছনের এই সরু রাস্তাটা বাঁ-হাতে সারি সারি নির্মীয়মান সেড এবং ডান হাতে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যেখানে বাঁ দিকে মেন গেট বরাবর চলে যাওয়া একটা সুন্দর সুপ্রশস্ত ঢালাই করা রাস্তার সঙ্গে মিলেছে, সেখানে এসে বাঁক নেন। ডান দিকে সেই মেল্‌টিং সপের যোড এবং সেডের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত ফার্নেসের উদ্‌গার এবং যান্ত্রিক শব্দে এখানকার পরিবেশ ভারি, জায়গাটা পেরিয়ে যাবার আগেই কারখানায় ছড়ানো-ছিটানো হাজার হাজার আলো এক মুহূর্তে টপ করে নিভে যায়, গায়ে গায়ে দাঁড়ানো সেডগুলোর অভ্যন্তরে অসংখ্য যন্ত্রের বিরামহীন চলমানতা স্তব্ধ হয়···লোড শেডিং! অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এলাকা গভীর থেকে গভীরতর নৈঃশব্দ্যে ডুবে যায়। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জেনারেটর চালু হয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট আলো জ্বলে। তাতে নিকষ অন্ধকার একটু ঘোচে বটে কিন্তু যন্ত্রের শব্দ ফিরে আসে না। এতক্ষণ সে-সমস্ত শ্রমিক আলোর অপেক্ষায় অন্ধকার মেশিনের পাশে হাত গুটিয়ে বসেছিল তারা একে একে বেরিয়ে আসে।

ব্রজ সেন বাড়ি যাওয়ার পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য মেন গেট দিয়ে না বেরিয়ে পশ্চিমে গঙ্গা নদীর পাড় ধরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান। ডিজাইনিং সেকশনের বিশাল হল ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাজানো শূন্য টেবিলগুলোর মাঝখান বরাবর দীর্ঘ প্যাসেজটা অতিক্রম করে ব্রজ সেন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। সামনেই গঙ্গা নদীর পাড, ভূগোলে যার নাম হুগলী নদী। এই উঁচু জায়গাটা এমনই যে, এখানে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকালে চোখে পড়ে হাওড়ার বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল—পাট, সুতা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অসংখ্য চিমনি শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা। ওপারে কলকাতা—

নদীর পাড়-ঘেঁষে দীর্ঘ নৌ-বন্দর এবং বন্দরের ওপর জিরাপের গলার মতো অসংখ্য ক্রেন এবং তারও পেছনে খিদিরপুর, বজবজ, মেটিয়াবুরুজে শতাব্দী-ব্যাপী গড়ে ওঠা ছোট-বড় মাঝারি নানা শিল্প। এই নদী এবং নদী সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল নিয়ে যে-বিশাল পরিমণ্ডল, তার বাতাসে সর্বদা ভেসে বেড়ায় লোহা-লক্কড়, হামার, যন্ত্র, জাহাজের সিটি এবং নোঙর ফেলা ইত্যাদির ধাতব ও যান্ত্রিক শব্দ। সন্ধ্যার পর ওপারে বন্দরের অসংখ্য আলোকচ্ছটায় নদীর জলে কম্পমান দীঘল আলোকবিম্ব—যেন দীপাবলীর রাত, যেন নদীর ওপারে ঝলমল চুমকি বসানো একখানা বিশাল কাপড় মেলে ধরেছে কেউ। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রবহমান জলস্রোতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। সমগ্র তল্লাট নিথর, নিস্তব্ধ এবং গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারকে দেখা যায় না, উপলব্ধি করা যায় না। এই বিশাল শিল্প নগরীর প্রাণ-ভোমরা যেন হঠাৎ উড়ে গেছে…

*

অন্ধকারে গঙ্গার শান-বাঁধানো ঘাটের দিকে পা বাড়ান ব্রজ সেন।

সুখেন কি এখনো চিমনির গায়ে ঝুলে আছে, অন্ধকারে, সেফটি-বেল্ট ছাড়া, চল্লিশ ফুট ওপরে, অন্ধকারে, ঝুলবে, ঝুলতে থাকবে…

কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গ

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

এই বছরের একেবারে গোড়ার দিকে কাম্‌পুচিয়াতে পল পট সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি ও সেই স্থানে হেং সামরিণের নেতৃত্বে নতুন বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া সংঘাতের প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক মহলে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে। আর ঠিক সুযোগ বুঝে, একেবারে প্রায় অঙ্কের হিসেবের মত, আসরে নেমে পড়েছেন চরম প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী ও সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন খনামধন্য বুদ্ধিজীবীবৃন্দ, যাঁরা প্রায় সমস্বরে কাম্পুচিয়ার নতুন সরকারের প্রতি কটূক্তি, ধিক্কার ও গালিগালাজ বর্ষণ করে চলেছেন, কারণ এই সরকার নাকি ভিয়েতনাম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মদতপুষ্ট একটি তাঁবেদার সরকার যার পিছনে আদৌ কোনো গণসমর্থন নেই ও এই সরকার নাকি কতকগুলি অত্যন্ত ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট ধরনের বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা পরিচালিত; সর্বোপরি ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী কাম্পুচিয়াতে প্রবেশ করে মুক্তি ফ্রন্টের সহযোগিতায় পল পট সরকারের উচ্ছেদ সাধনে সে ভূমিকা পালন করেছে, তা নাকি ঘোর নিন্দনীয় এবং এর ফলে নাকি ভিয়েতনামের বিপ্লবী ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। অনেকে গত বছরেই, যখন কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল বড় হয়ে ক্রমশঃ এক সংকটজনক পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছিল, তখনই ভিয়েতনামের কার্যকলাপকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও নৃশংসতার সাথে তুলনা করতে কসুর করছিলেন না। এই ধরনের প্রতিবেদন পাঠ

করে উগ্র বামপন্থীরা স্বভাবতই খুব খুশি হবেন, কারণ হো-চি-মিনের দেশ ভিয়েতনাম সম্পর্কে বর্তমানে তাঁদের যা মূল্যায়ন, ঠিক সেই মনোভাবটিই ব্যক্ত করেছেন সি-আই-এ পরিচালিত 'রেডিও লিবার্টি'র সাথে যুক্ত এক গবেষক। তবে এঁরা বোধহয় আরও অনেক বেশি উল্লসিত হয়েছেন কাম্পুচিয়ার নতুন সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইএর 'অনমনীয় দৃঢ়তা' প্রদর্শনে ; কাম্পুচিয়া প্রশ্নে মোরারজীভাইএর হাত শক্ত করতে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে দালালরা যে এত চমৎকার সমর্থন পাবেন তা বোধ হয় তাঁরা নিজেরাও কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি।

এই প্রেক্ষাপট ও ইতিমধ্যেই কাম্পুচিয়া প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট জল ঘোলা হয়েছে একথা মনে রেখেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। সমগ্র বিষয়টিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া বিরোধের পটভূমিকা, সে ব্যাপারে অনেকের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছেন চরম সুবিধাবাদী দক্ষিণপন্থী ও উগ্রবামপন্থীরা। ২. পল পটের নেতৃত্বাধীন কাম্পুচিয়াতে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়া, সেটিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নানা ধরনের রোম্যান্টিক চিন্তাভাবনা অনেকের মনে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। ৩. এই দুই-এর সংযোগ-সম্পর্ক ও সে-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত।

বর্তমানে আমরা প্রথম বিষয়টিই শুধু আলোচনা করব।

ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া বিরোধের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করতে গেলে মূলতঃ তিনটি প্রশ্ন পর্যালোচনা করার দায়িত্ব এসে পড়ে। প্রথমতঃ, কাম্পুচিয়া ভিয়েতনামের সীমান্ত বিরোধ ; দ্বিতীয়তঃ, পলপটের নেতৃত্বাধীন কাম্পুচিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের উগ্র, উন্মত্ত ভিয়েতনাম বিরোধিতা, যা বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট পাননল সরকারের পতনের পর নমপেন্-এ পল পটের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। তৃতীয়তঃ, পলপট সরকারের উগ্র ভিয়েতনাম বিদ্বেষের পিছনে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরোত্তর মদত দান এবং যার ফলে পলপট সরকারের পতনের পর তেং শিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টির একাংশ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সরাসরি ভিয়েতনামের আক্রমণ করাই স্থির করে ফেললেন।

কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের পারস্পরিক সীমানা লঙ্ঘনের প্রশ্নটির বিস্তৃত আলোচনায় যাব না, কারণ এই নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক মন্তব্য

বহু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কে কার সীমানা কত গরিখে লঙ্ঘন করেছিল বা কে আগে লঙ্ঘন করেছিল এই প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক আইন বিশারদেরা করবেন। কিন্তু সে-কথাটা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন তা হল এই যে, ভিয়েতনামের অতি বড় শত্রুও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে নানা অজুহাতে নির্বিচারে ভিয়েতনামের সীমানা লঙ্ঘন ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নির্দ্বিধায় গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করা, সন্ত্রাস, হত্যা ও অরাজকতার সৃষ্টি করার দায়িত্ব বহন করতে হবে পলপটের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত বিপ্লবী সরকারকে। এই প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। প্রথমত, ভিয়েতনামের বিদেশমন্ত্রক এই সীমানা বিরোধের প্রশ্নটির বিশদ ব্যাখ্যা করে সে অজস্র ঐতিহাসিক নথিপত্র, দলিল প্রভৃতি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন ও যার মাধ্যমে এটা খুব স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮-এর অক্টোবরের মধ্যে অন্তত ৬,১৮৬ বার ভিয়েতনামের সীমানা পল পট সরকার কতৃক আক্রান্ত হয়. সেগুলিকে খণ্ডন করার মতো কোনো যুক্তি পল পট ও তাঁর সমর্থকবৃন্দ দাঁড় করাতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে অজস্রবার অভিযোগ করা হয়েছে সে পলপটের খ্মের রুজ্ বাহিনী ভিয়েতনামের সীমানা লঙ্ঘন করে চূড়ান্ত নাশকতামূলক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়েছে, যদিও ভিয়েতনাম এই নিকৃষ্ট ধরনের প্ররোচনা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য ও আশ্চর্য সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমানা বিরোধের প্রশ্নটির মীমাংসা করা সম্ভব হয়; অপরদিকে পলপট সরকারের পক্ষ থেকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সীমানা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে কিছু এলোমেলো অভিযোগ করা ছাড়া একথা একবারও বলা সম্ভব হয় নি যে ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী কাম্পুচিয়াতে প্রবেশ করে কাম্পুচিয়ার অভ্যন্তরে অত্যাচার চালিয়েছে। সেই সালে পলপট সরকারের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম নাশকতামূলক কার্যকলাপের যে মারাত্মক অভিযোগ এনেছে, তাকে কোনোভাবেই মিথ্যা বা অসত্য বলে পলপট গোষ্ঠী অস্বীকার করতে পারে নি।[২]

হ্যানয়ের বিদেশমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত এই ঐতিহাসিক দলিল ও নথিপত্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে একের পর এক প্ররোচনামূলক কাজ প্রকৃতপক্ষে এক উগ্র ভিয়েতনাম বিদ্বেষ ও এক ধরনের অন্ধ খ্মের জাতীয়তাবাদের ফলশ্রুতি; এই জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি

মতাদর্শগত ভিত্তি হল পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা, যার উপরে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের মহামন্ত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কামপুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে চীনের মতো এখানেও জন্মলগ্ন থেকে দুটি ধারার মধ্যে এক সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়: একটি হলো আন্তর্জাতিকতাদের প্রতিনিধি সুস্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা, অপরটি হল সংকীর্ণ, পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাদের মতাদর্শ যা থেকে জন্ম নেয় চরম বামপন্থী, রোমান্টিক পথে রাতারাতি 'সাচ্চা সমাজতন্ত্র' কায়েম করার চিন্তা। ১৯৫১ সালে ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির কংগ্রেসের পর ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে আলোচনা করে এই দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে তিনটি স্বাধীন ফ্রন্ট গড়ে তোলে ও তা থেকেই ওই ১৯৫৩ সালে জন্ম নেয় বিপ্লবী কাম্পুচিয়ার জনগণের পার্টি। ১৯৬০ সালে এই পার্টিরই নতুন নামকরণ হয় কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ১৯৭৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কাম্পুচিয়ার পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পল পট যে দীর্ঘ ভাষণ দেন তাতে তিনি একবারের জন্যও এই পার্টির পূর্বসূরী ১৯৫১ সালের বিপ্লবী কাম্পুচিয়ার জনগণের পার্টির কথা উল্লেখ করেন নি; তাঁর ভাষণে কোনখানেই ৫০ এর দশকে কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এই পার্টির অত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্থান পায় নি। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ৭০-এর দশকে লন্ নল্ বিরোধী সংগ্রামের ক্রটি বিশেষ পর্যায়ে পল পট গোষ্ঠীর হাতে নেতৃত্ব আসার আগে পর্যন্ত কাম্পুচিয়ার জনগণের সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের সাথে প্রত্যক্ষ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল ভিয়েতনামের অকুতোভয়, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ প্রতিরোধ সংগ্রামীদের।* বছরের পর বছর ধরে ভিয়েতনামের বিপ্লবীবাহিনীর অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের প্রতিরোধ সংগ্রামীদের মধ্যে এর ফলে এক সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্পাতকঠিন মৈত্রীর 'পরে ভিত্তি করেই কাম্পুচিয়ার বিপ্লববাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষা দেবার গুরুদায়িত্ব ঐতিহাসিক কারণে অনেকটা এককভাবেই এসে পড়ে ভিয়েতনামের 'পরে। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গেল যে লন্ নল্ সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ সংগ্রামে ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার প্রতিরোধ সংগ্রামীদের মধ্যে রণক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই বিপ্লবী মৈত্রী আরও সুদৃঢ়-

ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।[৩] ভিয়েতনামের এই সহযোগিতার মূল ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিকতা; কোনও সংকীর্ণ স্বার্থের খাতিরে ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়াকে তার অভিজ্ঞতার শরিক হতে দেয় নি। প্রয়াত ম্যালকলম কলড্‌ওয়েল, যাঁর সাম্প্রতিককালের কিছু লেখাকে পল পটের সমর্থনে উগ্র বামপন্থী বুদ্ধিজীবীমহল ব্যবহার করছেন, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীনতায় তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ভিয়েতনামের বীর যোদ্ধারা প্রতিবার বিশেষ করে ১৯৭০ সালের মে-জুন মাসে, যখন তাঁদের নিজেদেরই অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় সংগ্রাম করতে হচ্ছিল, সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকতা-বাদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাম্পুচিয়ার সংগ্রামে সমস্ত রকমের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে।[৪] আর এর ফলে ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার বিপ্লবীবাহিনী এমনই ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সাথে মিশে গিয়েছিল যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী লন্ নলের পুতুল সরকার কাম্পুচিয়াতে বসবাসকারী প্রতিটি ভিয়েতনামীকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের গেরিলা সন্দেহ করত আর তার ফল হিসেবে তাঁদের ভাগ্যে জোটে অমানুষিক অত্যাচার।[৫]

এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে হচ্ছে অত্যন্ত বিশেষ কারণে। ১৯৭৫ সালে লন্ নল্ সরকারের উচ্ছেদের পর কাম্পুচিয়াতে পল পটের নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পর থেকেই ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা শুরু হয় যে কাম্পুচিয়ার মুক্তিসংগ্রামকে ভিয়েতনাম তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, অর্থাৎ ভিয়েতনাম হলো পররাজ্যলোভী, আগ্রাসী একটি দেশ; আর ঠিক একই সময়ে শুরু হয় ভিয়েতনাম—কাম্পুচিয়া সীমান্তে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ। সব কিছু মিলিয়ে একটা কথাই ক্রমান্বয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হতে থাকে যে কাম্পুচিয়ার প্রতিরোধ সংগ্রামে ভিয়েতনামের আদৌ কোনো ভূমিকা ছিল না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিজেদের সীমিত শক্তির 'পর ভিত্তি করেই কাম্পুচিয়াতে বিপ্লবের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয়েছিল; বরং কাম্পুচিয়ার ভূখণ্ডকে ভিয়েতনামই ব্যবহার করেছিল তাঁদের নিজেদের প্রতিরোধ সংগ্রামের স্বার্থে।[৬] আর এই যুক্তির পাশাপাশি আরও একটি বক্তব্যকে পল পট সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে শুরু করেন। সেটি হলো এই যে কাম্পুচিয়ার প্রতি ভিয়েতনামের তথাকথিত সৌভ্রাত্রমূলক মনোভাব হলো প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে গ্রাস করার এক হীন চক্রান্ত, অর্থাৎ

ভিয়েতনামের মূল লক্ষ্য হলো লাওস ও কাম্পুচিয়ার স্বাধীন, সার্বভৌম সত্তার বিলুপ্তি ঘটান, ও এদেরকে গ্রাস করে ভিয়েতনামের নেতৃত্বে একটি ইন্দোচীন ফেডারেশন গড়ে তোলা। ভিয়েতনামকে পররাজ্যলোভী, আগ্রাসী ও কাম্পুচিয়ার পয়লা নম্বরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার এর চেয়ে ভাল আর কি পথ থাকতে পারে! আর এই অজুহাতে, লন্ নল্-এর আমলে যেমন, পল পটের রাজত্বেও তেমনি, কাম্পুচিয়ায় বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে চালান হল নিরন্তর অভিযান, কারণ এই যুক্তিতে ভিয়েতনামই হয়ে দাঁড়ায় কাম্পুচিয়ার জনগণের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ইতিহাসের দিকে একবার নজর দিলেই দেখা যাবে যে এই ধরনের কদর্য অপপ্রচার কী-জাতীয় তথ্যবিকৃতির ফল হতে পারে। ১৯৩০ সালে, যখন ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া তিনটি দেশই ছিল ফরাসী-অধিকৃত ও যখন পৃথক পৃথক কমিউনিস্ট পার্টির কোনো অস্তিত্বই এই সব দেশে ছিল না, তখন হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়; এই একটি পার্টিই তখন তিনটি দেশের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। এই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে সুস্পস্টভাবেই পার্টির তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এই তিনটি দেশ ইচ্ছা করলে একটি ইন্দোচীন ফেডারেশন গঠন করতে পারে অথবা তিনটি পৃথক পৃথক সার্বভৌম রাস্ট্র হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে, এই নীতিটিই পুনর্বার ঘোষিত হয় ১৯৪১ সালে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টির প্লেনাম অধিবেশনে, অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রেই ইন্দোচীন ফেডারেশন গঠন করাটাই একমাত্র পথ একথা বলা হয় নি। আর ফেডারেশন গঠনের প্রশ্নটির ভিয়েতনামের তরফ থেকেই সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি ঘটান হয় যখন ১৯৫১ সালে কাম্পুচিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামে তিনটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম পার্টির প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করে নেওয়া হল। তারপর থেকে কোন সময়েই ইন্দোচীন ফেডারেশন গঠনের প্রশ্নটি উত্থাপনে স্বভাবতই আর কোনো প্রয়োজন হয় নি, তার কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই তিনটি সার্বভৌম রাস্ট্রের অভ্যুদয়ের পর প্রশ্নটাই এখন সম্পূর্ণ অবান্তর। তাই পল পট নেতৃত্ব যখন ভিয়েতনামকে কাম্পুচিয়ার প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসে অত্যাশ্চর্যভাবে এই ফেডারেশন প্রসঙ্গকে বারবার টেনে আনেন, তখন তাদের প্রকৃত মতলব বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। এই প্রশ্নটিকে

উত্থাপন করে পল পট নেতৃত্ব জল ঘোলা করায় যে চেষ্টা করেছিল, তার জবাবে ভিয়েতনামের তরফ থেকে সে অমূল্য দলিলগুলি উপস্থাপনা করা হয়েছে, সেগুলির দিকে তাকালেই কাম্পুচিয়ার প্রাক্তন শাসকবৃন্দের কতকগুলো ধোঁয়াটে বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্টই ধরা পড়ে যায়।[৭]

কাম্পুচিয়ার পূর্বতন সরকার ও নেতৃবৃন্দের এই তীব্র এবং অন্ধ ভিয়েতনাম বিরোধিতায় বিশেষভাবে মদত যোগায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে চীনা পার্টির নেতৃত্ব চিলি, এ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া প্রভৃতি একটির পর একটি দেশে যে কদর্য ভূমিকা পালন করেছে, তারই সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে চীনা নেতৃত্ব পল পট সরকারের ভিয়েতনাম বিরোধী জেহাদকে আন্তরিকভাবেই স্বাগত জানালেন,[৮] কারণ চীনের সাথে ভিয়েতনামের সম্পর্কে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই ধীরে ধীরে ফাটল ধরছিল।

১৯৭৭ সালের অক্টোবরে পল পট তাঁর চীন সফরের সময় ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রথম প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন ; এর পরেই ডিসেম্বরে চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী কামপুচিয়া সফরে আসেন ও কামপুচিয়ার প্রতি চীনের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পিকিংএ কামপুচিয়ার রাষ্ট্রদূতকে চীন কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিজস্ব সেন্টারটি ব্যবহার করার সুযোগ দেন, সেখানে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সরাসরি জনসমক্ষে বিষোদ্গার করা হয়। যদিও চীনা নেতৃত্ব তখনও পর্যন্ত সরাসরি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন নি, কিন্তু চীনের সংবাদপত্রগুলিতে কামপুচিয়ার নতুন প্রশাসনের পক্ষে ও ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রবন্ধ ফলাও করে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী রেমন বারেকে চীনের জাতীয় কংগ্রেসের উপাধ্যক্ষ তেং ইং-চাও সরাসরি জানান যে চীন মনে করে সে কাম্পুচিয়া ভিয়েতনামের দ্বারা আক্রান্ত। অথচ এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ভিয়েতনামের তরফ থেকে একটি ৩-দফা প্রস্তাব দেওয়া হয় কাম্পুচিয়ার সাথে বিরোধ মীমাংসার জন্য। পল পট নেতৃত্ব সে প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে নতুন উদ্যমে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক আক্রমণ চালাতে থাকে এবং বিপুল দম্ভোক্তির সাথে নম্ পেন্ রেডিও থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হয়। ইতিমধ্যে পিকিং থেকে বিপুল পরিমাণে সামরিকসম্ভার ও চীনা সমরবিশারদেরা কাম্পুচিয়াতে আসতে শুরু করেন। ১৯৭৮ সালের ১লা জুলাই পল পট চীনা নেতৃত্বের কাছে প্রেরিত

এক বক্তব্যে পুনর্বার চীনা নেতৃত্বের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। অবশেষে ১২ই জুলাই তারিখে পিপল্‌স ডেইলির সম্পাদকীয়তে চীন সরাসরি ভিয়েতনামকে কাম্পুচিয়ার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে আক্রমণ চালায়। যেটি সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হল ইন্দোচীন ফেডারেশন-এর প্রশ্নটিকে আবার এই সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।[৯]

এই ঘটনাগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, কাম্পুচিয়াতে পল পটের নেতৃত্বে যে গোষ্ঠী শাসনভার গ্রহণ করলেন, মানসিকতার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা-বাদের বিরোধী ; দ্বিতীয়ত, এঁদের চিন্তার প্রধান ভিত্তি ছিল এক অত্যন্ত উগ্র, খ্মের জাতীয়তাবাদ। এই দুই-এর সংমিশ্রণ থেকে জন্ম নেয় অন্ধ ভিয়েতনাম বিরোধিতা এবং পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পথ ধরে 'সাচ্চা সমাজতন্ত্র' কায়েম করার এক উদ্ভট কল্পনাপবিলাস। পল পট গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকেই যে ছিলেন পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, এটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।[১০] যেমন, পল পট, ইয়েং সারি প্রভৃতি ব্যক্তিদের কোনদিনই উপনিবেশবাদ বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না ; বরং পুরনো ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞ যে ব্যক্তিরা পরে কাম্পুচিয়ার পার্টিতে যোগদান করেন, তাঁদের পল পট গোষ্ঠী সবসময়েই সন্দেহ করেছে ভিয়েতনামের সমর্থক মনে করে ; তাছাড়া এই গোষ্ঠীর প্রায় নেতৃস্থানীয় সকলেই আসেন শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এবং এঁদের বেশির ভাগেরই শিক্ষাদীক্ষা সবই বিদেশে ; সর্বোপরি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে ধারণার মধ্যে ছিল অস্পষ্টতা ও এক অদ্ভুত ধরনের কৃষক (নারদনিক?) মানসিকতা। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খিউ সামপানের (যিনি প্রিসিডিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন) চিন্তাভাবনা। এই ধরনের পেটিবুর্জোয়া ভাবনাচিন্তা দানা বাঁধতে পারে আরও এই কারণে যে ভিয়েতনামের সমর্থক এই সন্দেহে কাম্পুচিয়ার পার্টির পুরনো নেতৃত্বের অনেককেই এই পল পট ইয়েং সেরি গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে বর্জন অথবা বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের এই উগ্র রসের জাতীয়তাবাদ ও গভীর ভিয়েতনাম-বিদ্বেষকে স্বভাবতই গোটা পার্টি মেনে নিতে পারে নি ; বিশেষ করে এটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে যে পল পট-ইয়েং সারি গোষ্ঠীর কল্পিত 'বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্রের' মডেলের চরিত্র যতই বিপন্ন হয়ে

উঠেছিল, তত বেশি করে নিজেদের অপকীর্তি ঢাকার ও বিপ্লবী বলে প্রতিপন্ন করতে হীন প্রয়াসে প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল ভিয়েতনামকে মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে গোটা দেশে এক ঘৃণ্য সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের জিগির জাগিয়ে তোলা।[১১] আর তারই ফল হিসেবে কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন শুরু হয়; আন্তর্জাতিকতাবাদের ঐতিহ্যবাহী, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী সুস্থ রাজনৈতিক ধারাটির সাথে পল পট নেতৃত্বের আচরণের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৭৮ সালের মে মাসে পলপট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান হেং সামারিণ এবং চিয়া সিম; প্রায় একই সময়ে পল পটের জল্লাদদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি সো ফিম তাঁর সমর্থক বাহিনীকে নিয়ে চলে আসেন ভিয়েতনামে; পল পট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত; তার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গেল যখন পল পট বিরোধী নতুন নেতৃত্ব কয়েকমাসের মধ্যেই কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করল। স্বাভাবিক ভাবেই হেং সামরিনের নেতৃত্বে এই ফ্রন্ট প্রথম থেকেই চেষ্টা চালিয়েছিল ভিয়েতনামের সাথে ইতিহাসের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে; এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পল পটের উগ্র খ্মেের জাতীয়তাবাদ ও অন্ধ ভিয়েতনাম বিদ্বেষকে এই নতুন নের্তৃত্ব কোনদিনই সমর্থন করে নি; দ্বিতীয়ত, জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একেবারে প্রথম থেকেই ছিলেন কাম্পুচিয়া-ভিয়েতনামের যুক্ত সংগ্রামের শরিক।[১২] ভিয়েতনাম স্বাভাবিক ভাবেই এই নতুন ফ্রন্ট গঠনকে স্বাগত জানায় এবং পল পট গোষ্ঠীর উচ্ছেদের জন্য হেং সামরিন নেতৃত্ব যে অঙ্গীকার করেন, তাকে সর্বদিক থেকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি জানায়। এই ফ্রন্ট গঠনের কয়েকমাসের মধ্যেই পলপট সরকারের উচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তার পিছনে অন্যতম একটি প্রধান কারণ ছিল এক 'খাঁটি সমাজতন্ত্রের' মডেল কায়েম করতে গিয়ে এই সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও হঠকারিতা। এর ফলে পল পট নেতৃত্ব মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠী ছাড়া দেশের জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ভিয়েতনাম বিদ্বেষ দিয়ে এই বিচ্ছিন্নতাকে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। আর তারই ফলে কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট দুর্বার গতিকে প্রতিরোধ করা পল পট ও তাঁর চীন সমরবিদদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাসের ঘরের মতোই পল পটের সরকার ভেঙে পড়ে। তাই পল পট নেতৃত্বের

মস্তিষ্কপ্রসূত সমাজতন্ত্রের এই নির্ভেজাল ও 'খাটি' মডেলটির পর্যালোচনা প্রয়োজন।

টীকানির্দেশ

১. M. K. Leighton, 'Perspectives on the Vietnam—Cambodia Border Conflict, *Asian Survey*, মে ১৯৭৮, পৃ: ৪৪৮-৪৫৭। এই সুরে সুর মিলিয়েছেন তরুণ রায়, 'ইন্দোচীন প্রসঙ্গে', অনীক, মে, ১৯৭৯, পৃ: ১৬-১৭। উগ্র বামপন্থী মহল কাম্পুচিয়া প্রশ্নে কি ভাবছেন, তার জন্য আরও দেখুন, Debabrata Panda, Vietnam and Cambodia, *Frontier*, ১০ মে, ১৯৭৯, পৃ: ৩-৬ এবং **কাম্পুচিয়া: বিশ্ব রাজনীতির ঝড়ের কেন্দ্র** (কলিকাতা: সন্ধিক্ষণ)।

২. *Kampuchea Dossier, I* (Hanoi, 1978), পৃ: ৫৭-৭৬, ৭৯-৮৫, ১১৯-১৪৩ এবং *Kampuchea Dossier, II* (Hanoi 1978), পৃ: ১০৩-১০৯, ১৪০-১৪৯।

৩. ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব পার্টির ২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করে (অর্থাৎ ১৯৫১ সালেই এই পার্টির মূল গোড়াপত্তন হয় এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল); কিন্তু এর পরই ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয় এবং তখন বলা হয় যে পার্টির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬০ সালে। কাম্পুচিয়ার পার্টির অভ্যন্তরীন ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বর ও ১৯৭৭-এর ডিসেম্বর মাসের অন্তর্বর্তী সময়টা ছিল প্রকৃতপক্ষে তীব্র মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বে জর্জরিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এ কাম্পুচিয়ার পার্টির যুব কমিউনিস্ট সংস্থা 'Red Flag' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ১৯৫১ সালকেই পার্টির প্রতিষ্ঠাবর্ষ বলে মেনে নেবার দাবি জানায় এবং এই ঘটনার পিছনে ভিয়েতনামের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথাও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করা হয়! এর পরেই পল পট নেতৃত্ব 'Revolutionary Flag' পত্রিকায় দাবি জানায় যে ১৯৬০ সালকেই পার্টির জন্মবর্ষ বলে গ্রহণ করা হোক কারণ সেই সময় থেকেই খাঁটি খ্মেরে চিন্তা-ভাবনায় পার্টি পুষ্ট হতে শুরু করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই (অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে) পল পট নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটি 'Service 870' কোডে গোপন নির্দেশ পাঠায় যে কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সি. আই. এ, কে. জি. বি. ও ভিয়েতনামী সংশোধনবাদী ও সম্প্রসারণবাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালাতে হবে, যাতে গোটা পার্টি বিশুদ্ধ খ্মের জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণায় দীক্ষিত হতে পারে। *Kampuchea Dossier*, I, পৃ: ৩৭-৩৮, ৫৭, পাদটীকা ১।

৪. Malcolm Caldevell and Lek Tan. *Cambodia in the South-east-Asian War* (New York : Monthly Review Press, 1973), পৃ: ৩২০ ।

৫. ঐ, পৃ: ২৯৯-৩০০ ।

৬. The Awkward Truth about Vietnams Leaders *Broadsheet*, মে, ১৯৭৯ ।

৭. *Kampuchea Dossier*, I, পৃ: ৯৪-১১৮ ।

৮. পরবর্তী অনুচ্ছেদে যে ঘটনাগুলি বিবৃত করা হয়েছে, তার বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, *Kampuchea Dossier* II, পৃ: ৭-২৩ ।

৯. পিপল্‌স ডেইলির সম্পাদকীয়র জন্য দেখুন, ঐ, পৃ: ১৪০-১৪৯ ।

১০. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য J. J. Zasloff and M. Brown, 'The Passion of Kampuchea', *Problems of Communism*. জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ: ৩০-৩৬ ।

১১. ভিয়েতনাম বিদ্বেষের নমুনা হিসেবে পল পট সরকার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; সেটির পর্যালোচনার জন্য দেখুন *Far Eastern Economic Review* (FEER), ১৯ জানুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ: ১৯-২২ ; ধৃত কাম্পুচীয় অনেক সৈনিকও এই অভিযোগ করেন যে তাঁদের মনে এই অন্ধ ভিয়েতনাম বিদ্বেষ দিনের পর দিন জাগিয়ে তোলা হয়েছে, যার অর্থ যুক্তিতর্ক দিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন নি। বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য *Kampuchea Dossier*, II, পৃ: ৭১-৭৭ ।

১২. কাম্পুচীয় জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের গঠন, তার নেপথ্যকাহিনী, ফ্রন্টের কর্মসূচি ও নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক পরিচয়ের জন্য দেখুন, FEER, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৮, পৃ: ৩৪-৩৫, 'Declaration of Kampuchea National United Front for National Salvation', *Mainstream*, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ: ২৯-৩২ এবং Harish Chandola. 'Kampuchea's New Leaders', *Mainstream*. ১৯ মে, ১৯৭৯. পৃ: ১৪-১৫ ।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল

কালীকৃষ্ণ গুহ

গ্রীষ্মের দিনগুলি অতিক্রম ক'রে এসে মনে হয় সবকিছু আমাকে
নতুন ক'রে ভেবে দেখতে হবে।

মনে হয়, স্মৃতিফলকের পাশে যে স্তব্ধতা র'য়েছে, যে স্থবিরতা,
যে অবলুপ্ত সময়
তার কাছে যেতে হবে আমাকে।
বাংলোর নির্জন দিনগুলির কথা ভুলে গিয়ে, নদীর কথা ভুলে গিয়ে,
সারি সারি নারকেল-গাছের কথা ভুলে গিয়ে,
অন্ধকার পাথরের কথা ভুলে গিয়ে,
আমাকে ধীরে ধীরে স্মৃতি-ফলকের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

তুমি আমাকে চিনতে পারছো, অরুণেশ? আমাকে চিনতে পারছো
শ্যামশ্রী? দীপা?
অন্ধকার পাথরের কথা তোমরা কি মনে রেখেছো আজো?
অসুস্থতার কথা?

সমস্ত গ্রীষ্মকাল একা একা শুয়ে থেকেছি আমি, আর, ভেবেছি শুধুই
এক স্মৃতিফলকের কথা, যা
রোদ-জলে, হাওয়ায়, অন্ধকারে, ঘৃণা ও পাণ্ডুলিপির পাশে
স্থির হ'য়ে রয়েছে।

কেন, সে কী চায়?

তুলসী মুখোপাধ্যায়

ভীরুতা ত্রস্তে এসে অতিঘোর ভয়ে
সাহসের চরণ ছুঁয়ে বসে থাকে চুপে
কেন থাকে? গন্ধ খালি পুড়ে যায় ধূপে
বিষম বিস্ময়ে
সাহস তার সুবিমল হাত রাখে গায়
খাড়া পাহাড় বেয়ে দয়া নামে প্রগাঢ় মায়ায়।

ভীরুতা হঠাৎ এসে সাহসের চরণে বসে থাকে
কেন, সে কী চায়?
তক্ষুনি গাছের ডালে এক অমাবস্যা ঝুঁকে পড়ে ডাকে
অসম্ভব তান্ত্রিক গলায়
ভূতগ্রস্ত বিপুল আঁধারে
সেই ডাক হা-হা করে দশ লক্ষ সাপের ফণায়।
ভীরুতা লোভীর মতো ছুটে যায় আদিম খোঁয়াড়ে
বসে থাকে দুই চোখ অতিশয় সুন্দর ক্ষমায়।

বরফ ব্যস্ত হয় হয়ে উঠতে নদী

সত্য গুহ

সকাল সমুদ্র হোলো
ডালে ডালে হুলুধ্বনি হয়, পাখি সব
মঙ্গল গায়, নদী কত্থক নাচে
বিভিন্ন মুদ্রায়
বিবাদ-বিসম্বাদ, মোচ্ছব, তুমুল আওয়াজ
তেমন মাদল বাজে
চারদিকে উৎসাহের অজস্র ব্যঞ্জনা

জীবন সংগ্রাম
জীবনের জন্যে জীবনের

শাঁখ বাজে
শাঁখের করাতও বাজে
যা জোয়ার, ভাঁটা তার সমান মাত্রায়
দুঃখকে দস্তুর মতো সুমধুর করে তবু
মাছেরা লবণকেই লাবণ্য বানায়

গাঙচিল উড়ে ওঠে অনেক উঁচুতে
কাকে খোঁজ করা
গভীর সমুদ্রে রুয়ে ছায়ার শিকড়
কাকে খুঁজে একা হয়ে যাওয়া
বস্তুর ভেতর দিয়ে চলাফেরা, তণ্ডুল কুড়োনো
অথচ সন্ন্যাসী
কোলাহল কৌতূহল জয়পরাজয়
কিছুই কিছু না, বাঃ
চারদিকে শূন্যতায় বেঁকে ওঠা হাসি

সকাল সমুদ্র হয়, জমাট বরফ ব্যস্ত হয়ে উঠতে নদী ॥

বিবর্তনে

অনন্ত দাশ

আশ্চর্য অনেক কিছু রয়ে গেছে এই পৃথিবীতে
আমি তার কতটুকু জানি !

ড্রায়োপেথিকাস কেন গাছ থেকে নেমেছে মাটিতে
নীলনদে কারা এসে গড়েছিল মমির উপরে পিরামিড

পরমাণু কেন্দ্রকের কণভাগ বিভাজনে সূর্যের ভিতরে জমে

লক্ষগুণ তাপ

সভ্যতার কবে শুরু ?

দ্বান্দ্বিকের কোন সূত্রে মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে ?

আমি শুধু জানি—

বিবর্তনে এখনও সমাজ সম্পূর্ণ ভাঙেনি

গরিলাস্বভাবে তাই মানুষের হিংস্র হাত

কেড়ে নেয় সম্পদের সিংহভাগটুকু।

সখি, সে গেলো কোথায়

(অজিত ও গায়ত্রী পান্ডে-কে)

দেবী রায়

প্রথমে, মধ্যবিত্ত-কে উচ্চবিত্তের যৌন-কেচ্ছা—

উচ্চ-বিত্ত-কে, শেষমেশ—সর্বহারার-লাল ঝাণ্ডার

রাস্তায় নেমে আসার ভয়—

না—তাতে-ও নয়—

আকাশে, সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে

এমন জম্পেশ লিখেও

যখন, আর পাঠকের পাওয়া গেলো না—

মন,

লেখক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তখন—

নানান প্যাঁচ-পয়জার কষে, নিয়ে যাওয়া

সুললিত ভাষায়-বাথরুমে, ভাখো হে

বাহাধন—

মাসিকের গম্ভীর-রক্তছাপ থেকে, গা ছমছম—
রহস্য

এরপর—যাবতীয় বিছানার কেলি—
চৌষট্টি কলায়—একে একে
বিস্তারিত দেখিয়েও, পাঠক-কে—

কিছুতে-ই আর আনা যাচ্ছে না—বাগে—
কোনোমতে-ই ভুলছে না ভবি।
অল্প একটু দূরে—দরজায় জানালায় বাহিরে
থিরথিরিয়ে, মুখ টিপে হাসছে—
আমন ধানের সম্ভার নিয়ে—

এক অত্যাশ্চর্য-পৃথিবী !!

আমার কেবলি ভুল হয়ে যায়

শুভাশিস্ গোস্বামী

আমার কেবলি ভুল হয়ে যায়।
মাটি, খড়, বাঁশ, পাট, ঘামতেল
জোগাড় করেছি সবই তবু
কিছুতে হয় না সেই বাঞ্ছিত প্রতিমা নির্মাণ।
দুই হাতে চুল ছিঁড়ি,
শিরায় শিরায় ক্ষোভ ফুঁসে ফুঁসে ওঠে।
ধ্যানের ভিতরে কিছু ভুল ছিল? তবে?
ভেঙেচুরে বারবার গড়ে তুলি তবু
কেন ভুল হয়ে যায়, ভুল নাকি?
নাকি এই ঠিক? এই-ই স্বতোৎসার।
তা নাহলে কেন
আমি যত তার চোখে এঁকে দিতে চাই প্রসন্নতা,

ততই তা কান্না হয়ে ওঠে?
যতবার গড়ে তুলতে চাই
ঐ দশাস্ত্রধারিণী অসুরঘ্ন মূর্তিখানি, তত
অসহায় ধর্ষিতা সাশ্রুনয়না হয়ে ওঠে,
আর চালচিত্রময় শুধু অসুরবিক্রম

আমার কেবলি ভুল হয়ে যায়।
ভুল নাকি? নাকি এই ঠিক?
এই-ই স্বতোৎসার?

অর্জুন

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

স্বপ্নে বড়ো ক্রুদ্ধ ছিলো
এখন সকাল, সব ক্রোধ ভুলিয়েছে তার
স্বপ্নের ভিতরে ছিলো পুষ্পবন
ছিলো নম্র মেঘের হুঙ্কার
মন্দারের মালা উড়ে এসেছিলো
কণ্ঠের বড়ো বেশি কাছে।

খর রৌদ্রে তার সব ক্রোধের নির্বাণ
কারণ সে স্বপ্নের লেফাফা ছিঁড়ে
বেরিয়ে এসেছে
হত্যা কিম্বা সম্ভোগের অধিকার
এ মুহূর্তে করায়ত্ত তার
নির্বোধ ফুলের মালা সে এখন
পিষ্ট করে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিতে পারে
স্বপ্ন ডেকে তুলেছিলো ক্লীব ইচ্ছাগুলি
তখন সে সূর্যতেজে ক্লৈব্য থেকে

নির্বাসন নিতে পারে
সে এখন স্বপ্নরথে সারথ্যের অহংকার নিয়ে
পৃথিবীকে হেঁকে বলতে পারে
মোহ-জাল ছিঁড়ে ফেলে এই ছাখো আমি
পুনর্বার অর্জুন হয়েছি।

শেয়ালদা স্টেশন

শুভ বসু

ঝকঝকে একজন টেকনোক্র্যাটের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।
স্মার্ট, ছিমছাম আর যে যায় সে যায় খুব দারুণ সম্ভ্রমে
একটু কুর্নিশ করে, রোগাপাতলা ট্রাম
রুপোলী পিঁপড়ে ব'নে দুইখণ্ড শরীরের জাঁক
ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চলে যায়—ঠাট্টায়?

জবরদস্তভাবে তার জাঁদরেল দাঁড়ানো—আনকোরা।
একটু দূরত্ব রেখে দোকান রেস্তরাঁ আর হোটেলবাড়ীর
লাল, রঙচটা কিছু তোবড়ানো দোমড়ানো বয়স্কতা
ঝাঁকবেঁধে ড্যাবড্যাব ক'রে ছাখে, উন্নাসিকতায়
চালফ্যাসনের দারুণ জৌলুষ
মার্কারী ঠিকরে হাসে, জমকালো ডবলডেকারও
থাবড়ে গিয়ে অকস্মাৎই পোড়ানো ডিজেলে
গরগর ক'রে ওঠে শিকারীর সামনে যেন বাঘ।

প্রত্যেকদিন সকালসন্ধ্যা হাজারগণ্ডা মানুষ তার
পায়ের নিচ দিয়ে ধুঁকে ও ঝুঁকে যায়, দ্রুত ও মৃদু ধায়
নানান জীবিকায়, সে তার গম্ভীর
মুরুব্বিয়ানায় প্রায় কিছুই ছাখে না।

কখনো অনেক রাতে যখন বেশ্যারা প্রায় ঘুমচোখে
খদ্দের ছাড়াই ফেরে, হকারের শেষ ক্লান্ত হাঁকও
থেমে আসে, কনস্টেবলের কাছে তাড়া খেয়ে
ভাড়া দিতে অক্ষম কোনো খুব বিপন্ন বাউণ্ডুলে
দাঁতে দাঁত চেপে 'টাকার শ্রাদ্ধ যত !
কী দরকার এই সব বিলাতি ফ্যাটের
আমাদের মত সব গরীবগুর্বের যদি কাজেই না লাগে ?'

দুটি ছবি

আনন্দ ঘোষ হাজরা

ধ্বনির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কিছু মানুষ
ময়দানের দিকে হেঁটে যাচ্ছে :
হাওড়া ব্রিজের ওপর নবগ্রহ শান্তিমূল বিক্রী করা বুড়ো
আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো মেঘের কোনো গন্ধ নেই :
বৈশাখের শরীরী দুপুরে জড়ো হচ্ছে কিছু শব্দ থেকো মানুষ
ওদের চোখে মুখে নির্লিপ্ততা
জিজ্ঞাসার চিহ্ন মাত্র নেই—
যূথবদ্ধ ইঁদুরের পদাঘাতে খামারের শস্যকণার মতো
কিছু পরে ওরা কলকাতার বাতাসে ভেসে বেড়াবে ।

নবমীর সকালে চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছে
কতিপয় গ্রামীণ মানুষ :
পুরোহিত আহুতি দিয়ে প্রত্যেকের কপালে দেন যজ্ঞতিলক
তখন ওদের মনে পড়লো, 'আমরা ভস্মের মধ্যে জন্মেছি' :
সুতরাং চোখে মুখে নির্লিপ্ততা
জিজ্ঞাসার চিহ্ন মাত্র নেই—
পুতুলের মতো ওরা সম্মোহিত ব'সে থাকে
বহতা নদীর নীচে শক্ত খোলের মধ্যে যেমন কচ্ছপের বুক
আতপ্ত দুপুরে গাছের নীচে ঘুঘুর ডানার ছায়ায়
যেমন ক্লান্ত পিঁপড়ের দল ।

কথাকলি নয় হস্তকলি

শংকর দে

যদি বলি বিরুদ্ধে যেও না
তাহলে কি? তুমি মেনে নেবে
শাসনের এই অভিমান
অস্ত্রের বিরুদ্ধে যদি বলি

এই মায়া কবিতার কলি
যদি বলি নিভিয়ে যেও না।
আগুনে অঞ্জলি স্বাধীনতা
ভালোবেসে ফিরিয়ে দেবে না।

যদি বলি মৃত্যুকে চেয়ো না
লেখনী মানো না হস্তকলি
যদি বলি নিজেকে জানো না
তোমার বিরুদ্ধে যদি বলি।

নির্বাচন

অরুণাভ দাশগুপ্ত

যারা হাত বাড়িয়ে ছিল বাড়িয়েই আছে···
আমরা
কোন হাতটা ধরবো আর কোনটা ধরবো না
ভাবতে ভাবতে
অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছি—
হাতের ফাঁকে গলে যাচ্ছে সময়
সময়ের দাগ বসে যাচ্ছে হাতে।
বত্রিশ বছরের এই জমা দাগগুলো একেক সময়
কিলবিল করে ওঠে·

জাতের আগুনে যখন জ্বলে ওঠে   বেলচির
অচ্ছুতের ছায়া সুনিবিড় গ্রাম
ধর্মের নামে মোহান্তের বারুদে
পুড়ে খাক হয়ে যায়
            মাজোর সবুজ গেরস্থালি
চলমানকে ব্যঙ্গ করে
            মড়ার খুলি এবং ত্রিশূলের প্রেতনৃত্য·
তখনও   ভাবতে ভাবতে
            জমে জমে
                পাথর হয় সময়—
আমরা কোনটা ধরবো আর কোনটা ধরবো না।

অনুভব

আশিস সান্যাল

অন্ধকারের পেশল বুকে
মাথা রেখে
সমস্ত রাত ঘুমিয়েছিলাম।
আমার চারপাশে
কেবলই ছড়িয়ে পড়ছিলো
কোটি বছর আগের
এক অরণ্য থেকে
উড়ে আসা
হরিয়াল পাখির নির্জন পালক।

কেমন করে বেঁচে থাকবো
কয়েকটা দিন—
এই সব ভাবনায় ঝট্‌পট্‌ করতে করতে
এক দুঃখ থেকে

গভীরতর দুঃখের দিকে
ছুটে চলছিলো আমার হৃদয়।

ক্রমে ইতিহাস
ছায়া ফেলতে থাকে আমার চেতনায়।
চোখের সামনে
ছড়িয়ে পড়তে থাকে
চাপ চাপ ছিট্‌কে পড়া রক্তের দাগ।

অন্ধকারের বুকে মাথা রেখে
এক গভীর স্তব্ধতায়
আর আমি শুনতে থাকলাম
রক্তস্নাত বসুন্ধরার
সেই প্রাগৈতিহাসিক গান—

বেঁচে থাকার অন্য নাম জীবন
জীবন মানে সংগ্রাম।

সময় এবং আলোকবর্তিকাবিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

উদ্যানে লেগেছে আগুন—পোড়ামাটি ঘোড়ার বাগার বারান্দায়—

যে শিশু সারারাত নিকটে ছিল আমার আত্মজ
যার জন্য আমার ডানহাতে চন্দ্রচিহ্ন এবং সদরদরোজায় ফুলগন্ধ
উদ্যানে আগুন লেগেছে ব'লে সে কেন চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে পুড়ে যাবে
মাঝে মাঝে প্রত্যূষে অত্যন্ত ভয়ের ভিতরে ঘুম ভেঙে গেলে
হে পিতা আমার তোমাকে মনে পড়ে, মনে হয়, কেবলি মনে হয়,
সে শিশু আত্মজ ঘুমের গভীর রাত্রে উদ্যানে নেমেছে বুঝি একা

না কি অন্ত শিশুরা র'য়েছে জানি না, পৃথিবীর শিশুরা সকল

উত্থানে লেগেছে আগুন, হেসিডির শালের জঙ্গলে, খর্সাঙ এর
চায়ের বাগানে, নিংস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় চন্দ্রজয় আমাদের নিরাপদ
গৃহ পরিপাটি উঠে যায় আকাশের দিকে, পোড়ামাটি ঘোড়ার বাহার,
বারান্দায়, শো-কেসে সাজানো ফুল গ্রন্থনিলয়, সে ফুল স্থির চন্দ্রমল্লিকাও

সদর দরোজায় ফুলগন্ধ শুষে নিতে চায় কেউ, পোড়ামাটি ঘোড়ার
বাহার ভেঙে ফেলে, শিশুদের ডান হাত থেকে চন্দ্রচিহ্ন কুরে
কুরে তুলে ফেলে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় কারও যেন আনার সংকেত

অভিনব'

পারম্পরিক

সর্বজিৎ সেন

চোখের কোণে জটিল ভালবাসার
বাড়া ভাতেই ছাই পড়েছে। আশা
ক্ষিপ্ত ধুলোয়, একলা তুরঙ্গম।

এই সনাতন, মহতী রাজসভায়
সেসব হবেই যা সব ছিল হবার।
তবুও বাজে বিদ্রোহ দুর্মম!

বাজুক, তবু কান দেবনা তাতে।
রাজার যদি ঘা লেগে যায় আঁতে?
হাসলে পড়ে নিষাদী যন্ত্রণা?
মূর্খসুলভ সাহস নিয়ে তবু
বাহিরপথে তোমরা যদি কভু
চেঁচিয়ে বল: এ রাত্রি মানবনা-

অদ্বিতীয় পথ হিসেবে বাঁচার
আমরা হব শান্ত এবং নাচার।
বলব : মহারাজন্ মহত্তম।

ভরাচাঁদ

সুস্মিত নন্দী

ভরাচাঁদ, আমাদের কিশোরবেলায় দেখাশোনা
রক্তের জোয়ারে তুলতো মাদলের রোল,
আজ গুমরায়, অন্ধকার শান দেওয়া রাতের ভিতর—

হয়তো কোথাও জ্যোৎস্না
এখনো ছড়ায় সোনা, উড়ো-উড়ো কানে আসে
ভোর ভেবে ডেকে-ওঠা পাখিদের স্বর।

এক পৃথিবীর দিকেই

দিলীপ সেন

আলোক স্তম্ভের ওপর আমি এখন দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছি :
আর আমার সামনে
সমুদ্রের বালির ওপর একটা হাওয়ার শকুন
ক্রমাগত খবর দিচ্ছে
কে এখন কোথায়!

পেছনে
অবিশ্রান্ত ধস্ নামা কালো কালো রাত্রির কি ভীষণ অন্ধকারে
কোটি কোটি বছরের এক সূর্যের ছড়ানো সাম্রাজ্য

যেখানে আলোর উষ্ণীষ পরা অরণ্যের ইশারাতে
বাড়বাড়ন্ত পৃথিবী !
তারপর অজস্র শব্দের সমুদ্রপ্রবাহে
এক একটা অন্তহীন কালের জীবন-মৃত্যুকে ঘিরে
আমিও ঘুরে ফিরে বেড়াতাম
দিনরাত্রির দুরন্ত ঘোড়সওয়ারের মতো !
অথচ কি এক দুর্নিবার ভালবাসায়
পৃথিবীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে জড়াতে কখন
অফুরন্ত সাধ-আহ্লাদের বিস্তীর্ণ জীবনের প্রত্যেকটি কোণে
আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম
আমার দুহাতের দশআঙুল !
প্রমিথিউসের মতো আমিও সূর্যের হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়ে
পাথরে পাথরে
বারবার ঝাঁকানি দিয়ে কান পেতে শুনতাম
স্পন্দমান মাটির শিকড়ে
ধরিত্রীর হৃদয় !

এখন আমার সামনে
সমুদ্রের বালির ওপর উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়ার শকুন
অন্ধকারকে ছিঁড়ে খুঁড়ে
ক্রমাগত খবর দিচ্ছে
ফুল ফোটা আকাশের আসন্ন আলোর বোধন :
অন্য এক পৃথিবীর দিকেই মৃত্যুর বাতাস ভাঙছে-
সময়ের সমুদ্রপোত,
নীল নীল চোখের সঙ্কেতে
আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছি ।

শারদীয়া

শুভকামনাসহ---

নিকোলাস অব ইণ্ডিয়া

মাইক্রোফাইন্‌ড্‌ অ্যাসপ্রো প্রস্তুতকারী

PARICHAYA

Saradiya 79
Aug—Oct. 79

WB/NC—17

দাম : দশ টাকা

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় — ৬.০০

মস্তক বিনিময় (Thomas Mann-এর Transposed Heads-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—ক্ষিতীশ রায় — ৪.০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস — ১৫.০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকেভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—নৃপেন ভট্টাচার্য — ৪.০০

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য — ৪.০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় — ৩০.০০

গোবিন্দ সামন্ত (লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants' Life'-এর বঙ্গানুবাদ) — সাধারণ ৪.৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক — ৪.৫০

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পরিচয়

নভেম্বর ১৯৭৯

মার্কসবাদ ও শিল্প-সাহিত্য

শিল্প-সংস্কৃতি

সমকালীন ইতিহাস

ভ্রমণ-কথা

গল্প

কবিতাগুচ্ছ

পুস্তক-পরিচয়

৪৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা

পাঠকগোষ্ঠী

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয় প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক—গুপ্তপ্রেস, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

'পরিচয়' নিয়ে প্রায়ই আমরা চিঠি পাই—নতুন পাঠকদের কাছ থেকে কম, পুরনো পাঠকদের কাছ থেকে বেশি। কিছু চিঠিতে যেমন নিখাদ প্রশংসা জোটে কখনো, কিছু চিঠিতে নিন্দাও জোটে খাদহীন। কিন্তু সব চিঠিতেই থাকে 'পরিচয়' সম্পর্কে সম্রদ্ধ আগ্রহ—সেখান থেকেই নিন্দা বা প্রশংসা। এই সব চিঠিই তো পাঠকদের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। 'পরিচয়' কেমন হচ্ছে, পাঠকরা কেমন পড়ছেন, যে-সব লেখা বেরচ্ছে পাঠকরা সেগুলি কি ভাবে নিচ্ছেন—এই সব নেহাত দরকারি খবর জানার আমাদের আর-কোনো উপায় নেই।

একটি অভিযোগ প্রায়ই আমাদের শুনতে হয়—'পুস্তক-পরিচয়' আগের মতো হচ্ছে না। অভিযোগটা হয়তো আংশিক সত্য, তুলনাটি হয়তো একটু অসঙ্গত। দেড় বছরেরও বেশি হলো 'পরিচয়'-এ 'পুস্তক-পরিচয়'-এর ওপর একটু অতিরিক্ত জোরই দেয়া হচ্ছে। প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্তও আমরা এই কারণে দিতে প্রস্তুত থাকি। 'বিশেষ সংখ্যা'-র ধারাবাহিকতা একটু নষ্ট হয়ে যায় বলেই কি পাঠকদের ঠিক নজরে পড়ে না।

'বিশেষ সংখ্যা' আমাদের কিছু কৃতিত্ব হয়তো, কিন্তু খানিকটা সমস্যাও বটে। কারো-কারো কাছে বিশেষ সংখ্যাগুলিই যেন 'পরিচয়'-এর প্রধান ব্যাপার। আবার, এমন পাঠকও তো আছেন যিনি হয়তো মাসিকপত্রের ধারাবাহিকতায় খুব বেশি বিশেষ সংখ্যার 'বাধা' পছন্দ করেন না গ্রাহক-দের অবশ্য এতে আর্থিক কোনো ক্ষতি হয় না। বছরে তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ তো আমাদের ঘোষিত সূচি। এবার, এই ৭৯-বর্ষে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের আচার্য গোপাল হালদার-এর ৭৮ বর্ষ পূর্তিতে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ তাঁর সম্মাননায় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে—৮০-র ফেব্রুয়ারিতে। এটা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি যুগ্ম-সংখ্যা, তাই, জানুয়ারিতে কোনো সংখ্যা বেরবে না। আর মে-জুন সংখ্যা জুনে বেরবে সমালোচনা সংখ্যা। প্রকাশ-সূচির গোলমালে সমালোচনা সংখ্যা গত বছর বেরয় নি।

এবারের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু রচনার পরবর্তী অংশ এই সংখ্যায় বেরোল—পূর্ণেন্দু পত্রীর ভ্রমণ-কথা ও নীহাররঞ্জন রায়-এর প্রবন্ধের অনুবাদ। এই সংখ্যা থেকে আমরা 'মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য'—এই বিষয়ে রচনা সংকলন শুরু করেছি। এই সংখ্যার রচনাটিতে পাওয়া যাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাহিত্য-আলোচনার পুরনো ফর্মালিস্ট ধারার সঙ্গে বর্তমান ধারার সংযোগটি। ডিসেম্বর সংখ্যায় মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে লুসিঐ গোল্ডমান-এর প্রবন্ধের অনুবাদ বেরবে।

মার্ক্সবাদ ও শিল্পসাহিত্য আলোচনা সংকলন

সম্পাদকীয়-ভূমিকা

ষাটের দশক থেকে মার্ক্সবাদ-চর্চায়, বিশেষত মার্ক্সবাদ ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়ে, বিভিন্ন দেশে নানারকম নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটছে। এদের সবগুলোই যে নতুন তা নয়। কিন্তু অনেক লেখাই ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হলো এই সময়েই। তার ভেতর সবচেয়ে প্রধান নিশ্চয়ই লুকাচ ও ব্রেখট-এর রচনাবলি। আবার, যেমন সার্ত্রে ও ব্রেখট সম্পর্কে থিওডোর অ্যাডরনো'র লেখায়, মার্ক্সবাদ ও শিল্প-সাহিত্যিকদের দায় সম্পর্কে নতুনতর প্রশ্ন উঠছে। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক লুসিঁয়্যাঁ গোল্ডমান মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনার ভেতরকার অন্তর্লীন সম্পর্কের ডায়ালেকটিককে তাত্ত্বিক স্পষ্টতা দেন মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর 'পাওয়ার অ্যাণ্ড হিউম্যানইজম' গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের ভেতরে। পোল্যাণ্ডের দার্শনিক স্টিফান মোরাভস্কি মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে এই দশকের গোড়ায় নতুন আলোচনা করেছেন। এ-ছাড়াও, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্ক্সবাদ ও নন্দন সম্পর্কে আরো নানা ধরনের নতুন নতুন কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এই সব কারণেই মার্ক্সবাদী সাহিত্য-তাত্ত্বিক রেমণ্ড উইলিয়ামস তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই, 'মার্ক্সইজম এ্যাণ্ড লিটারেচার'-এর ভূমিকায় এই ষাটের দশক থেকে সময়কে মার্ক্সবাদ ও শিল্প-সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে 'এ পিরিয়ড অব অ্যাকটিভ ডেভেলপমেন্ট' বলেছেন।

এই সক্রিয়তার কারণ নিশ্চয়ই নানাবিধ—কতকগুলি হয়ত নির্দিষ্ট করা যায়।

১. স্তালিনের নেতৃত্বকালে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের সরলীকরণ মার্ক্সবাদ-চর্চার ভেতর ঢুকে যায়। তা থেকে বেরিয়ে এসে শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক জিজ্ঞাসা-উত্থাপন ও সেই জিজ্ঞাসার কিছু উত্তর-সন্ধান এখন সম্ভব হয়ে উঠছে। এই চেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়নেও নতুন ধরনের শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার ধারা সৃষ্টি করছে, সম্প্রতি প্রকাশিত 'রাশিয়ান ক্লাসিকস সিরিজ'-এর গল্প-উপন্যাসগুলির ভূমিকা-নিবন্ধে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।

২. আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকেই এক মতাদর্শগত বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। সেই বিতর্কের বাস্তব-

রাজনীতিক প্রকাশ অনেক সময় ঘটেছে চীনের সোভিয়েত-সীমান্ত বিরোধিতায় বা ভিয়েতনাম আক্রমণে। কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে ইতালি, ফ্রান্স, কিউবা, পর্তুগাল-এর কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযাত্রীরা এই বিতর্কের অংশীদার। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সার্বভৌম অধিকারে সুস্থ বিতর্কের এই লেনিনীয় ঐতিহ্যও স্তালিন-পর্বে ব্যাহত হয়েছিল।

৩. 'ষাটের দশক আমাদের শতাব্দীর ইতিহাসে ধনতন্ত্রবিরোধী দশক হিসেবে চিহ্নিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন আদর্শগত ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের অন্তর্গত হলেও এই আন্দোলনের কেন্দ্র পরিচালনা করেছে নিউ লেফ্‌ট'। 'The New Left openly chellenged bourgeous Society, the all powerful Military Industrial Complex, the aggresive foreign policy pursued by the imperialists, the economic preseres and political repression to which the working people were exposed, together with bourgeouis 'mass culture' and all pervasive ideology. Yet at the same time the New Left rejected the ideological and political leadership of the working class and Marxist-Leninist parties as insufficiently revolutionary'. (E. Batalov The Philosophy of Revolt, pp 7-8, Progress Publishers, Moscow, 1975)

স্তালিনোত্তর পৃথিবীতে মার্ক্সবাদের নতুন চর্চা, মতাদর্শগত বিতর্ক ও নিউলেফ্‌টের অভ্যুদয় আমাদের দেশেও কিছু-কিছু ঘটেছে কিন্তু নানারকম ঘোর-প্যাঁচের ভেতর দিয়ে।

মতাদর্শগত বিতর্ক অনেকসময়ই মিশে গেছে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন বামপন্থী দলের বাস্তব-রাজনীতির কূট-কচালিতে। নিউ লেফটের দেশীয় কর্মসূচির প্রকাশ দেখা যায়—রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্ব-নিরপেক্ষ সব পরিস্থিতিরই বিপ্লবী কর্তব্যের সর্বজ্ঞতায়। রাজনৈতিক দল-বহির্ভূত এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের 'নিউ লেফ্‌ট'-তির্যকতা ভারতবর্ষের বাঁয়ে-হেলা কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির প্রশ্রয়ই পেয়েছে। আবার আর-এক ধরনের আশ্রয়ও পায় ভারতের কোনো কোনো রাজ্যের জনসমর্থিত বামপন্থায়। কোনো একটি বিষয়েও তাঁরা কোনো স্বতন্ত্রভাবে প্রতিবাদ সংগঠন করেন নি

অথচ এই প্রতিবাদ-সংগঠনই ইয়োরোপ ও আমেরিকার নিউ লেফ্‌টকে নৈতিক মর্যাদা দিয়েছে।

ফলে, মার্কসবাদ, শিল্প-সাহিত্য ও এ-দুইয়ের অন্তর্সম্পর্ক নিয়ে সারা পৃথিবীর নতুন ভাবনা-চিন্তাও বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে এখনো প্রতিফলিত হয় নি। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের একমাত্র সংযোগ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বলেই হয়ত, যতক্ষণ ইংরেজি ভাষায় অনূদিত না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এই নতুন চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতেই পারি না। তাই, মার্কসবাদের দার্শনিক চিন্তা ও নন্দনচর্চার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে যে-সব লেখা পত্র ষাটের দশকের আগে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এসেছে, তাতেও এই নতুন চিন্তাভাবনার আঁচ মেলে নি।

চল্লিশের পঞ্চাশের দশক জুড়ে সমাজ-অর্থনীতির শ্রেণী বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের মার্কসবাদী বিচার নিয়ন্ত্রিত হত। চল্লিশের দশকের বিখ্যাত আরাগঁ-গারদি বিতর্কের মূলও প্রোথিত ছিল শিল্পের শ্রেণী-চরিত্রে ও শিল্পীর শ্রেণী-ভূমিকায়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এরেনবুর্গ-এর 'দি রাইটার অ্যাণ্ড হিজ ক্র্যাফ্‌ট' ও হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচার'-এ দু জন সৃষ্টিশীল লেখকের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য আলোচনার সূত্র নির্ধারিত হতো কডওয়েল-এর 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি' ও 'স্টাডিজ ইন ডায়িং কালচার' থেকেই। আর সেই সময় এই ধ্যান-ধারণা দিয়ে যখন বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে তখন অর্থনীতির শ্রেণী-নির্ণয়ের প্রায়-বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তায় শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণী নির্ণয় সাব্যস্ত হয়েছে; মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও নিহিত থেকেছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিশেষ ধারণা, যা হয়তো সেই দলগুলির বিশেষ মার্কসবাদ থেকেই জন্মেছে। যেন, শিল্প-সাহিত্য, রাজনৈতিক কর্মসূচির একটি প্রয়োগক্ষেত্র মাত্র। যেন, মানব সভ্যতার এক নিগূঢ় ব্যক্তিগত দায় মেনে নিয়েই শিল্প-সাহিত্য রচনার ব্যক্তিগত কুরুক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক অবতীর্ণ নন।

এমনটি যে শুধু চল্লিশ-পঞ্চাশেই ঘটেছে, এখন আর ঘটছে না—তা নয়। প্রায় যেন অঙ্কের নিয়মেই দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশে যে-সব লেখককে যে-সব 'মার্কসবাদী-ব্যত্যয়ের' জন্য যে-সব গালি-গালাজ করা হয়েছে, আবার সত্তরে সেই সব লেখককে সেই সব 'ব্যত্যয়ের' জন্য সেইএকই গালাগাল দেয়া হচ্ছে। তফাৎ শুধু এই, প্রথম ও পরবর্তী আলোচকের মধ্যবর্তী বয়সের

ব্যবধান প্রায় পিতা-পুত্রের। পঞ্চাশের মুখের 'মার্কসবাদী' সাহিত্য-সমালোচনার এক সংকলনের আলোচনায় উনআশির এক তরুণ বুদ্ধিজীবী যাকারই করেছেন এ-গুলি আগে পড়া থাকলে তাঁদের আর লেখার দরকার হত না। পিতার যৌবন দিয়ে পুত্রের যৌবনের এই দায় মেটানো জীববিজ্ঞানের রীতিবিরুদ্ধ।

'পরিচয়'-এ আমরা আমাদের দেশের ও ভাষার সাহিত্য-আলোচনাকে তার নির্দিষ্টতার ভেতরও, বিশ্ব-পরিস্থিতিতে প্রসারিত দেখতে চাই। সেই কারণে, গত দুই দশকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক তাৎপর্য-সমন্বিত কিছু-এমন রচনা আমরা পুনঃপ্রকাশ করব, যার বিষয়—মার্কসবাদ ও শিল্প-সাহিত্য। এই পুনঃপ্রকাশের ধরন বিভিন্ন হতে পারে—কখনো মূল প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ, আবার, কখনো হয়ত একজনের সাহিত্য-চিন্তার ওপর অপরের কোনো নিবন্ধ। একজন সাহিত্য-তত্ত্ববিদের মূল প্রতিপাদ্যটির জন্য কখনো তাঁর বিভিন্ন রচনার আংশিক অনুবাদের সমাবেশও ঘটতে পারে বা সাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণও থাকতে পারে।

বলা বাহুল্য—এই প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশিত নানা মতামতের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর মতামত এক নয়, এক হতেও পারে না। প্রগতিশীল চিন্তার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠককে যুক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই শতকের বিশের দশকের গোড়ায় ফর্মালইজমের ধারণার সঙ্গে সোভিয়েত-সমালোচকরা কি ভাবে নিজেদের মিলিয়েছিলেন ও আধুনিক-কালে সাহিত্য-বিচারের নিরিখ কি এই নিয়ে বর্তমান সংখ্যার রচনাটিতে আলোচনা করেছেন সোভিয়েতের প্রখ্যাত সাহিত্যতত্ত্ববিদ্। সম্পাদক

সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সাহিত্য-বিচারের স্থান

লিদিয়া গিনজবার্গ

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভোপ্রসি লিতারাতুরি (সাহিত্যের প্রশ্ন)-পত্রের ১৯৭৮-এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত

লাতিনিনা:

আজকাল প্রশ্ন উঠেছে সাহিত্য-বিচার (Literary Study) কি একটি বিজ্ঞান? নাকি বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা থেকে আলাদা একটা বিশেষ বিষয়?

শিশিরকুমার

সাহিত্য-বিচার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত, বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। সাংস্কৃতিক কাঠামোতে সাহিত্য-বিচারের ভূমিকাও বিচিত্র। পরন্তু, সাহিত্যের ছাত্রকে ত একটা বিশেষ ধরনের গুণ অর্জন করতে হয়। ব্যাকটিরিয়া নিয়ে যাঁদের গবেষণা তাঁদের ব্যাকটিরিয়াগুলোকে ভালো না বাসলেও চলে। বোটানিস্টেরও চলে ফুল ভালো না বাসলেও। তাঁদের শুধু বিষয়টিকে ভালোবাসা আগে দরকার। কিন্তু আমাদের আনন্দ তো শুধু জ্ঞানে নয়, গবেষণাতেও নয়। সাহিত্য-বিচারের আগে, পরে, সবসময়, থাকে এক নান্দনিক আকাঙ্ক্ষা। তাই সাহিত্যের গবেষকের সঙ্গে তাঁর বিষয়ের এমন এক সম্বন্ধ থেকে যায়—যা অন্য কোনো বিষয়ে দরকার হয় না। ফলে সাহিত্য কেমন লেখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে সাহিত্য-বিচার কেমন হবে। সাহিত্য যদি সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতার আধার হয়ে উঠতে না পারে, সাহিত্য-বিচারও তা হলে দুর্বল হয়ে পড়ে।

নাট্যানন্দ

'সাহিত্যে প্রতিফলিত সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা'—এর ওপর তো সমালোচনাও (criticism) নির্ভরশীল। সমালোচনা ও সাহিত্য-বিচার study) সাধারণত তো এ-দুটোকে খুব কাছাকাছির ভাবা হয়। ভাবা হয় —সমকালীন সাহিত্যই সাহিত্য-সমালোচনার (criticism) লক্ষ্য। আর সাহিত্য-বিচারের (study) লক্ষ্য অতীত সাহিত্য। সাহিত্য-বিচার সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

শিশিরকুমার

সমালোচনার লক্ষ্য যে সমকালীন সাহিত্য সে তো পরিষ্কার। সমালোচনার কাজও তাই। সমকালীন সাহিত্যের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা থেকে আমরা একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতীত ইতিহাসের বিচার করি। বড় সাহিত্য-সমালোচক যে বড় সাহিত্য-ঐতিহাসিকও হয়ে ওঠেন—এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৮৪০-এর রুশ সাহিত্যের নতুন বাস্তবতাচর্চার সঙ্গে মিলিয়েই বেলিনস্কি রুশ সাহিত্যের ইতিহাস ভাবেন। বা, তাঁর সমকালীন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই Sainte-Beuve প্রাচীন ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ভেতর এই পার্থক্য খুব

সাম্প্রতিক কালের। উনিশ শতকে এই ধরনের পার্থক্য ও বিশেষজ্ঞতা অজ্ঞাত ছিল।

অতীত সাহিত্য বুঝতে সমালোচকের অভিজ্ঞতা ও লেখকের অভিজ্ঞতা—এই দুইই খুব দরকার। টি. এস. এলিয়ট তো এতদূর বলেছেন যে শুধু একজন লেখকই পারেন আরেকজন লেখক সম্পর্কে লিখতে। এটাও চরম কথা, খানিকটা স্ববিরোধীও, পরে এলিয়টও নিজেকে শুধরেছেন। কিন্তু তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল—একজন লেখক লেখাটিকে ভেতর থেকে দেখতে পারেন—কেমন করে বিভিন্ন জিনিস জোড়া হয়েছে, কেমন করে এই নির্মাণটি গড়ে উঠেছে। একজন লেখকের মতামত অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিগত (subjective)। অতীত থেকে একজন লেখক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মতোই সংগ্রহ করেন, অন্যদের কাছে তা হয়তো অপ্রত্যাশিত। একজন লেখক যখন আর-একজন লেখক সম্পর্কে বলছেন—তখন তিনি আসলে নিজের সম্পর্কেই বলছেন, নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে।

সাভিনিনা

তা হলে তোমার মতে সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সাহিত্য-বিচারের স্থান নির্ধারিত হবে বিষয়ের সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা? বা, বলা যায়, সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের জৈব-সম্বন্ধ (organic link) দ্বারা।

গিনজবার্গ

বটেই তো। কিন্তু এই স্থান সাহিত্যের প্রকৃতির ওপরও কম নির্ভরশীল নয়। সাহিত্য তো জীবনের বহুমুখী প্রতিফলন, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা। জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তো আর এমন সীমাহীন সমগ্রতা নেই।

মানব অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বিচিত্র পর্যায় সাহিত্যে ধরা পড়ে। ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে ও এই বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের সম্বন্ধ।...এতটা বহুমুখী-প্রকৃতির বলেই সাহিত্য-বিচারের কর্মও বিচিত্র। 'লিটারারি স্টাডি' শব্দটিই তো হালের। তোমার মনে থাকতে পারে,'বিশের দশকে আমরা 'লিটারারি স্টাডি' বলতাম না! বলতাম—'থিয়োরি অব লিটারেচার' আর 'হিস্ট্রি অব লিটারেচার'।

জার্মানদের নানারকম শব্দ আছে—*Kunstwissenschaft* আর *Literaturwissenschaft*। আমেরিকানদের এমন কোনো শব্দ নেই। রেনে ওয়েলেক ও অসটিন ওয়ারেন তাঁদের 'থিয়োরি অব লিটারেচার' বইটিতে বলেছেন 'সায়েন্স অব লিটারেচার' বোঝাতে তেমন কোনো 'বিশেষ শব্দ'

না থাকায় কি কি অসুবিধে হয়। তাঁরা ভাগ করেছেন—ইতিহাস, তত্ত্ব ও সমালোচনা।

সাহিত্য-বিচার (Literary Study) শব্দটি ব্যবহারের সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে—এর সীমানার অদল-বদল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মের সঙ্গে এর নানা ধরনের সম্বন্ধ। এই ধরনের বহুমুখী পারস্পরিক সংলগ্নতার জন্যই সাহিত্য-গবেষককে খুব সাবধানে নির্দিষ্ট ভাবে তার বিষয় বেছে নিতে হয়। সব কথা বলে ফেলা বা একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবটুকু দেখা—খুব ভালো সাহিত্য-গবেষণা নয়।

সাতিনিনা

একটু বেখাপ্পা শোনালো না? আজকাল তো বেশি-বেশি শুনতে পাই—'সমগ্রতার দৃষ্টিভঙ্গি', 'সিসটেম অ্যাপ্রোচ', 'গবেষণার বিষয়-রূপ'।

গিরজবার্গ

বিষয় যদি খুব নির্দিষ্ট হয় তা হলে তো আর 'সামগ্রিকতা' আটকায় না বা বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত ব্যবহারও আটকায় না। সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস, মনোতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব তাদের নির্দিষ্ট ধরনের কাজটুকু দিয়েই তো সাহিত্য-বিচারকে পুষ্ট করে। তারা সাহিত্যকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চৌহদ্দিতে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সংস্কৃতির সেই চৌহদ্দিগুলি যদি সাহিত্য-বিচারকে গ্রাস না করে ফেলে তবেই তাকে উন্নত করতে পারে। সাহিত্য-বিচারে গবেষণার নির্দিষ্টতা সাহিত্য-বহির্ভূত বিষয়ের দ্বারা যেন নষ্ট না হয়।

সাতিনিনা

যাই হোক, সাহিত্য-বিচারের তো প্রায়ই চেষ্টা থাকে সঠিক বিজ্ঞান—exact science—হয়ে ওঠার দিকে। তখন গবেষণার নির্দিষ্ট (exact) পদ্ধতির ওপর জোর পড়ে, যেমন ধর, স্ট্রাকচারাল মেথড।

গিরজবার্গ

ঠিকই, আমাদের সময় হিউম্যানিটিজ-কে গণিতের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটা ঝোঁক উঠেছে। যে-কোনো বিষয় সম্বন্ধে গবেষণাতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই ব্যবহার করা উচিত। কখনো-কখনো তাতে বেশ ফল পাওয়া যায়, কখনো আবার পাওয়া যায় না। কোনো-কোনো বিষয়ে স্ট্রাকচারাল মেথডে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়—বিশেষত, লোককথা, পুরাণ, মধ্যযুগের সাহিত্য-কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে, যে-আঙ্গিকে বর্ণনার কোনো কোনো বিষয়ের নিয়মমাফিক পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে। ভি. প্রপ-এর মৌলিক

কাজ আছে এ-বিষয়ে—'মরফলজি অব টেল।' সোভিয়েতের আধুনিক সাহিত্য-তাত্ত্বিক, ই. মেলেতিনস্কি, ভি. আইভানভ ও ভি. তপোরভ-এর কাজও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আলাদা আলাদা লেখকের সাহিত্য বিশ্লেষণে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বিতর্ক-সাপেক্ষ। এসব ক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ধরে পৌঁছতে হয় একেবারে খাপছাড়া সিদ্ধান্তে।

লাভিনিনা

একটু উল্টো-পাল্টা শোনাচ্ছে না?

গিনজবার্গ

বোধহয়। আমি একটু ব্যাখ্যা করছি। সাহিত্যে ব্যবহৃত উপকরণ-গুলিকে বিধিবদ্ধ (formalisation) করতে হলে, সেই উপকরণগুলিকে আগে নির্দিষ্টভাবে আলাদা করতে হবে—আলাদা করা বলতে যা বোঝায় সেই নির্দিষ্ট অর্থেই আলাদা করতে হবে। কিন্তু শিল্পের শব্দ-প্রতিমা আর কল্পনার বাণী তো অনিবার্যতই বহু-অর্থ-অন্বিত, প্রতীকী, অনুষঙ্গ-প্রধান। তাকে তো এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভবই নয় যেন সেই শব্দের মাত্র একটিই অর্থ, তার বেশি কিছু নয়। সাহিত্যের যে-কোনো ব্যাখ্যায় যে-অনিবার্য ব্যক্তিগত থাকে (subjectivity), তা দিয়েই সাহিত্যের ব্যাখ্যা চলে। তারই ফলে, একই পদ্ধতিগত অবস্থান (methodological position) থেকে একই লেখার নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। লিরিক কবিতার বিশ্লেষণে এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। ব্যাপারটা এ-রকম নয় যে একটা বর্ণনার বদলে আর-একটা বর্ণনাকে মেনে নেয়া। আসলে বিবরণের কোনো একমাত্রিক নির্দিষ্টতায় কাব্যভাষার অর্থবৈচিত্র্য ধরা পড়ে না।

লাভিনিনা

কিন্তু সাহিত্যের কত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে তার দ্বারা সাহিত্যের আলোচনা তো চালিত নয়, 'সত্য' ব্যাখ্যাটি কি সেটাই সে খোঁজে। এর ভেতর অবশ্যই একটা দ্বন্দ্ব নিহিত আছে—গবেষণা-আলোচনার লক্ষ্য আর সাহিত্যের বস্তুগত (objective) অর্থের ভেতর। 'লিতারাতুরনায়া গেজেটা'-তে প্রকাশিত এক আলোচনায় এই প্রশ্নটি উঠেছিল—সাহিত্য-আলোচনার কতটা অবজেকটিভ, বস্তুগত, হওয়া সম্ভব। 'ভেপ্রোসি লিতারা-তুরি'-তেও এক প্রশ্নমালায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'সাহিত্য-বিচারে

কি অনুমানের (hypothesis) প্রয়োজন আছে?' আমার মনে আছে, জবাবে তুমি লিখেছিলে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অনুমান একটি স্বীকৃত পদ্ধতি কিন্তু মানব-বিদ্যায় অনুমেয় ও অননুমেয় এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক করা মুশকিল।

পিনস্কবার্গ

আমার মনে হয়, মানব-বিদ্যায়ও 'সত্য' (accuracies) আছে। কিন্তু সেটা মানব-বিদ্যাতেই খাটে। এটা ভুলে গেলে সর্বনাশা ভুল হবে। এই 'সত্যের' নানা স্তর। সবচেয়ে আগে তথ্যের, প্রমাণের 'সত্য', গবেষণা-প্রক্রিয়ার 'সত্য'। তথ্য ও টেক্সট-এর প্রতি মনোযোগ, তথ্য ও টেক্সট ব্যবহারে সতর্কতা—এগুলো তো সবাইকেই আয়ত্ত করতে হয়। যদিও আমরা অনেকেই করি না।

এই যাকে বলা যায় টেকনিক্যাল যাথার্থ (accuracy), তার পরেই আসে, যুক্তি-উত্থাপনে সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবহার। আর সর্বশেষে, একটি ধারণা (conception) তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর সত্য ও তাকে যথাযথ শব্দে প্রকাশ।

মানব-বিদ্যায় 'সত্যের' এই হল নানা স্তর-পরম্পরা। কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞানের (exact science) মানদণ্ড মানব-বিদ্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়। যথার্থ বিজ্ঞানে ভুল মানে ভুল আর প্রমাণ মানে প্রমাণ। একজন বৈজ্ঞানিকের ভুল আর-একজন ধরতে পারে। একজনের প্রমাণ আর-একজন যাচাই করতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে আমরা 'সত্য' বলতে কি বুঝব? বাখতিন-এর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচকের লেখাই ধরা যাক। দস্তয়েভ্স্কির গদ্যে বহুস্বর, (polyphony) সম্পর্কে তাঁর ধারণা, 'শেষ পর্যন্তও সংলাপ-এর ওপর নির্ভরশীলতা তাঁর নিজের মত প্রকাশের অবকাশ আর দেয় না'। কিন্তু অনেকেই এর সঙ্গে এক মত নন। অনেকেই মনে করেন না যে দস্তয়েভ্স্কির লেখায় তাঁর মত শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে নি। কার্নিভাল-গোছের লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে বাখতিন যে বিভিন্ন সাহিত্যরূপকে এক করে দেখিয়েছেন তার সঙ্গেও সবাই একমত নন। আমিও বাখতিন-এর সব ধ্যান-ধারণা মানি না (তাঁর নকল-নবিশদের কথা বাদই দিচ্ছি যাঁরা বাখতিন-এর ধ্যান-ধারণার একেবারে যান্ত্রিক প্রয়োগ করেন)।

কিন্তু গবেষক ও সমালোচক হিশেবে বাখতিন-এর কৃতিত্ব এই নয় যে

তিনি কতকগুলি নিঃসংশয় সত্য বলেছেন। তাঁর প্রবল মনন-শক্তি, নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর কৌতূহল, নতুন-নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের ক্ষমতা, অন্যেরা যে-সমস্যার ভেতর ঢোকেন নি সেই সব সমস্যার সন্ধান—এতেই তাঁর কৃতিত্ব। লেখকের লেখার ভেতরে কি-সব চিন্তা-ভাবনা আছে চিরকালই সে-সব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দস্তয়েভ্স্কির ওপর বাখতিনের কাজে বাখতিন দেখিয়েছেন কল্পনার ও শিল্পের বুনটের ভেতরে কি-ভাবে চিন্তা-ভাবনা অনুস্যূত থাকে। একটি বিশেষ চিন্তার (idea) অত্যন্ত সাধারণ রেখাচিত্র থেকে শুরু করে শব্দে-শব্দে তার কঠিন নির্মাণ পর্যন্ত দেখিয়েছেন।

সাভিনিন

এতে মনে হতে পারে, একটা ধারণা যথেষ্ট 'ফলপ্রসূ' হওয়া সত্ত্বেও 'সত্য' নাও হতে পারে। এই বিশেষ উদাহরণে, পরস্পরবিরোধী কিছু ধারণাও একসঙ্গে থাকতে পারে কিন্তু তারা পরস্পরকে বাতিল করে না—শিল্পের মতোই, যেখানে নতুন একটি আবিষ্কার পুরাতনকে বাতিল করে না। এই যে নানা রকম 'সত্য' একসঙ্গে থাকতে পারে, অথবা, আরো নির্দিষ্টভাবে, একটি কোনো 'চরম সত্য'-এর অভাব—এতে তোমার কোনো অসুবিধে হয় না?

গিনজবার্গ

তেমন সম্ভাবনা তো আছেই। আমরা তো আর দ্ব্যর্থহীন ফরমুলা দিতে পারি না। আমাদের কারবার এমন বিষয় নিয়ে যার নান্দনিক প্রকৃতিই বহু-অর্থ-সমন্বিত। সেই কারণেই এই বিষয়টি একই সঙ্গে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার মানে কখনোই নয় যে দৃষ্টিকোণ একটা নিলেই হল আর তার সংখ্যারও কোনো মাপজোক নেই! একটা সাহিত্যকর্মের বাস্তব গঠনের সীমা দিয়েই তো আমরা তাকে বুঝতে পারি। এক ভুল-বোঝারই তো কোনো সীমা নেই।

সাভিনিনা

কিন্তু তুমি তো এখনো বলছ—'বৈজ্ঞানিক চিন্তা', 'সাহিত্য-বিচারে আবিষ্কার'। এখানে বোধহয় শিল্পগত আবিষ্কারের বাইরের কোনো ধারণা তোমার মনে কাজ করছে। তাহলে সাহিত্য-বিচারে আবিষ্কার বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? আমি নতুন তথ্যের কথা বলছি না—সে তো নতুন বটেই। কিন্তু জ্ঞাত তথ্যের কি নতুন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তৈরি হতে পারে না?

শিবকুমার

সাহিত্য-বিচারে আবিষ্কার বলতে দুই-ই বোঝায়—নতুন তথ্য ও নতুন চিন্তা। কখনো এর দ্বারা বোঝা যায় আগে অজ্ঞাত কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা। অথবা জ্ঞাত তথ্যের নতুন ব্যাখ্যাও বোঝাতে পারে। অথবা, সেই সব তথ্যের নতুন বিন্যাস ও সম্পর্কও বোঝাতে পারে।...

লাভিনিনা

সাহিত্য-বিচারকে শিল্পের সন্নিহিত ধরে নিলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভুলে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায় না? এমন সমালোচনা আমাদের প্রায়ই চোখে পড়ে যেখানে আলোচকের ব্যক্তিত্ব আলোচ্য বিষয়ের চাইতে প্রধান হয়ে ওঠে। ক্ষমতাশালী লেখকদের বেলায় এ দোষ না-হয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু একটা সাহিত্য-কর্মকে আলোচকের আত্মপ্রকাশের ছুতো হিশেবে ব্যবহার করা হচ্ছে—এটা কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সাহিত্য-বিচার তো আর রচনা-লেখা নয়।

শিবকুমার

রচনা-লেখাতে আমার আপত্তি নেই—রচনাটি যদি ভালো হয়। আগে আমি Sainte Beuve-এর নাম করেছি। তিনি তো খুব সুন্দর রচনা লিখতেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি তিনি তো ফরাসী দেশকে ফিরিয়ে দেন রঁসার (Ronsard) ও তার সহ-কবিদের। তাঁদের তো চিরকাল রুচি-হীন ভাবা হতো। Sainte-Beuve যা করেছিলেন তাকে বলা যায় পুনর্নির্মাণ। আর সে-কাজ করতে শিল্পের উপকরণ দরকার। আর দরকার ফরাসী রেনাসাঁস-সংস্কৃতি—যা সবাই প্রায় ভুলতে বসেছে।...

আমাদের আজকের কথাবার্তায় সাহিত্য-গবেষণার নানা দিক আর তাদের উপযুক্ততার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। সমস্ত রকম গবেষণা-পদ্ধতিরই তো সীমাবদ্ধতা আছে। তার নিজস্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপকরণেরও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এটাও তো স্বাভাবিক। কারণ বিচিত্র বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই তো সাহিত্য-বিচার তার শক্তি সংগ্রহ করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই বৈচিত্র্যই পশ্চিমি সাহিত্যের বিশেষত্ব। সাহিত্যের নানারকম প্রবণতা ছিল—এক ঝোঁক আর-এক ঝোঁককে বাতিল করছে। মার্কসবাদ-প্রভাবিত ঝোঁক ছিল, আবার বিহেভিয়ারিস্ট ও

ফাংশনাল সোসিওলজি দ্বারা প্রভাবিত ঝোঁকও ছিল। মনোতাত্ত্বিক ঝোঁক (মনোবিকলনসহ) যেমন ছিল, তেমনি ছিল ভাষা-স্টাইলগত ঝোঁক। বিভিন্ন দার্শনিক ঝোঁক তো ছিলই। যেমন, ফরাসী এক্সিস্টেনসিয়ালিস্ট স্কুল অতীত ও সমকালীন ফরাসী সাহিত্যের পুনর্বিবেচনার ওপর বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিল। সার্ত্রে এই স্কুলের একজন খুব বড় লেখক।

লাভিনিন:

তুমি তো এইমাত্র বললে—বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে সাহিত্য-বিচার তার প্রয়োজন-সাধনের উপাদান নিতে পারে। তুমি কি 'ভাষাতত্ত্ব'-কে তার ভেতর অন্যতম প্রধান বলে মনে কর? অনেক সময় তো মনে করা হয়েছে যে সাহিত্যের ওপর ভাষাতত্ত্বের প্রভাব সাহিত্যকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বর্তমান সাহিত্য-বিচারে ভাষাতত্ত্বের প্রভাব কি বলে তুমি মনে কর?

গিনজবার্গ

বিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্বের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। নানা দার্শনিক আলোচনায় ভাষাই হয়ে উঠছে প্রাথমিক উপাদান। আবার অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গেও ভাষাতত্ত্বের সংযোগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে—গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব, সাইকোলিঙ্গুয়িস্টিকস, সোসিওলিঙ্গুয়িস্টিকস।

সুতরাং সাহিত্য-বিচার, যা কি না শব্দ-নির্মিত শিল্পের বিচার, তাতে ভাষা ও স্টাইলের ওপর জোর পড়বে—এটাই তো স্বাভাবিক। এ-সম্পর্কে নানা মত আছে। স্ট্রাকচারালইজম ছাড়াও, ফ্রান্সে ও ইউনাইটেড স্টেটসে 'নিউ ক্রিটিসিজম' চলছে। এরা টি. এস. এলিয়টের সংস্কৃতি-সম্পর্কিত ধারণা দ্বারা চালিত—যার প্রাথমিক উপাদান হলো ভাষা। এলিয়টের মতে কবিতা ভাষার সীমা পার হয়ে যায় আর সেই প্রক্রিয়ায় মানুষের কাছে তার নিজেরও অজ্ঞাত আন্তর-অভিজ্ঞতা উন্মোচন করে। 'নিউ ক্রিটিসিজম' যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের অনেকেই এলিয়টের দার্শনিক ধারণা সমর্থন করেন না কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে তারা কবিতার পাঠ (text) খুব নিবিড়ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর 'কনসেপ্টস অব ক্রিটিসিজম' বইটিতে ওয়েলেক এই প্রবণতাকে বলেছেন, 'জৈব ও প্রতীকী নির্মিতিবাদ' ('organic and symbolic formalism')।

লিও স্পিৎসার কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা আমার কাছে বেশ ফলপ্রসূ বলে মনে হয়। স্পিৎসার একজন অস্ট্রীয় ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-ঐতিহাসিক।

পরে আমেরিকায় কাজ করেন। স্পিৎসার-এর চেষ্টা ছিল ভাষাতত্ত্বকে সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে মেলানোর। সাহিত্য-কর্মের ঐতিহাসিক ও মনোতাত্ত্বিক অর্থের গভীরতায় প্রবেশের জন্য স্পিৎসার স্টাইলের উপাদানকে ব্যবহার করতেন। স্পিৎসার অনেক পাঠের (text) অনুব্যাখ্যা (micro-analysis) করেছেন। তার বেশির ভাগই ফরাসী। প্রতিটি আলাদা ছোট অংশ বৃহত্তর কাজের নকশারই অন্তর্গত ও লেখকের বিশ্বদৃষ্টির প্রকাশ।

এই একই পদ্ধতি অয়েরবাক ব্যবহার করেন—পরিকল্পনার সঙ্গে বিন্যস্ত বিষয়ের ওপর। ১৯৪৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'মাইমেসিস' বেরয়।

'রাশিয়াতে এই শতকের গোড়ার দিকে সমালোচনার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বকে মেলানোর চেষ্টা হয়েছিল। দশের দশকের শেষদিকে 'কাব্যভাষা পঠন-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—ওপোইয়াজ (OPOYAZ)।

কিন্তু শিগগিরই দেখা গেল, সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সংগঠন উন্মোচনের পদ্ধতি নিয়ে ওপোইয়াজ-এর গবেষণায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের সমস্যাকে ধরা যায় না। বিশের দশকেই অপোইয়াজ-এর কোনো-কোনো সদস্য—তাঁদের মূল মতবাদের কিছু কিছু অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন।...

বিশের দশকের গোড়ায়, আমি যখন পূর্বতন অপোইয়াজ গবেষকদের সঙ্গে কাজ করছি, তাঁরা কেউই আমাদের কখনো বলেন নি, যে, বিষয় থেকে আঙ্গিককে আলাদা করে দেখতে হবে বা বিষয়কে তুচ্ছ করতে হবে। প্রশ্নটি খুবই জটিল। আঙ্গিক আর 'বস্তু'র পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এটা নির্ভরশীল। ১৯২৩ সালের গোড়ায় তাইনিয়ানভের 'প্রবলেমস অব পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ' বেরয়। তার ভূমিকায় তাইনিয়ানভ বলেন, কবিতার স্টাইল-বিচারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা কবিতার পদের (poetic word) অর্থ ও তাৎপর্য।

আইকেনবম একবার আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'নিজেদের আঙ্গিকবাদী (formalist) না বলে, আমাদের নির্দিষ্টবাদী (specifist) বলা উচিত ছিল।'

আমাদের দেশের পরবর্তী সাহিত্য-বিচারে ভাষাতাত্ত্বিক ও স্টাইলের আলোচনা থেকে লেখকের বিশ্বদৃষ্টি-ভঙ্গি বিচারের ধারা গড়ে ওঠে।...

সাভিবিনা

তা হলে কি বলা যায় সাহিত্য-গবেষক হিসেবে তুমি সাহিত্য-বিচারের

সেই ধারার সংলগ্ন, যে-ধারায় ভাবাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে মেলানোর চেষ্টা হয়?

শিবজবার্গ

মেলানো, মানে, জীবনের সমন্বয় (organic combination)—কোনো মতেই যান্ত্রিক মিশ্রণ নয়। সমকালীন সাহিত্য-বিচারের অন্যতম মূল কাজ হলো—একটি সাহিত্য-কর্মের ঐতিহাসিক বিচার ও গঠন-বিচারের সমন্বয় সাধন। একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমরা এখনো সাহিত্য-কর্মের গঠন (structure) বিচার বলতে স্থূল-ভাবে স্ট্রাকচারাল মেথড ব্যবহারের কথা বুঝে থাকি। যাঁরা স্ট্রাকচারালিজম মানেন না, তাঁরাও স্ট্রাকচার বা সাহিত্য-কর্মের গঠন-বিচারের প্রয়োজন স্বীকার করেন—সেই বিশ সাল থেকেই।

সাতিনিনা

সাধারণত তো সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার আর গাঠনিক বিচারকে পরস্পরবিরোধী ধরা হয়—

শিবজবার্গ

কিন্তু সে বিরোধিতা তো মিটে যাচ্ছে, যদিও আপাতত মনে হতে পারে এদের মধ্যে বিরোধ আছে। জ্ঞানের সব শাখাতেই তো বিষয়কে নানা অংশে ভাগ করা হয়। হয়তো কৃত্রিম ভাবেই ভাগ করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো গবেষণার জন্য, বিশ্লেষণের জন্য একটা অংশ বেছে নেয়া। কিন্তু একটি কাজের সমগ্র অর্থ বোঝার সময় এই দুই পদ্ধতি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। ইতিহাসের দিক থেকে কেউ যদি শুরু করে তাহলে দেখা যায় একটি কাজের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়—কাজটির শিল্পগুণের বিচার। আবার কেউ যদি শিল্প-কর্মটির বিশেষ গঠনটির ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করে তাকে এসে পড়তে হয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।...

আর-একটি গভীর সমস্যার সামনে পড়তে হয় আমাদের। আমরা শিল্প-কর্মটির কোন্ নির্দিষ্ট গঠনটিকে খুঁজছি? যে-অর্থ ও তাৎপর্যের কল্পনার গর্ভ থেকে লেখকের কাজটি জন্ম নিয়েছে, সেই প্রাক্-জন্ম অর্থ বা তাৎপর্য-টিকেই কি আমরা ফিরিয়ে দিতে চাই কাজটিতে? নাকি, পরবর্তী বংশধরদের চেতনার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে কাজটিতে যে অর্থ ও তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে—সেটাকেই আমরা ফিরে ফিরে বুঝতে চাই? এই সব

অর্থ বাদ দিয়ে সাহিত্যের আলোচক বা গবেষক যে-অর্থটি আবিষ্কার করেছেন, জাতে বা অজাতে সেটাই কি কাজটির অর্থ বলে আরোপিত হয়ে যেতে পারে না ?

এই সব কথার উত্তর নানারকম হয়, পরস্পর বিপরীতও হয়। খুব সম্ভবত আমরা এখানে শিল্পকর্মের মূল্য-নিরূপণের একটা মিশ্র পদ্ধতির ভেতর ঢুকে যাই—একটি কাজের মৌলিক কাঠামো ও ইতিহাস-ক্রমে তার যৌগিক গঠন আবার আলোচক-গবেষকের নিজের সমকালীন ব্যাখ্যা।

সান্তিনিকা

তুমি যে বলছিলে বংশক্রমে শিল্পের অর্থও বদলে বদলে যায়।

শিমজবার্গ

আমি কিন্তু অগণিত পাঠকের ব্যক্তিগত সাহিত্য-চেতনার কথা বলছি না। আমি বলছি একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক চেতনার কথা। এই সামগ্রিক ঐতিহাসিক চেতনাই সাহিত্য বলে একটা ব্যাপারের টিঁকে থাকার বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি রেখেছে। পাঠকদের ব্যক্তিগত গ্রহণ-প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই সাহিত্য-বিচারের বিষয় হতে পারে—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণই একটা আলাদা বিষয়।

আসল কথা, সাহিত্যের গবেষককে খুব পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে, কি সে খুঁজছে, কি সে চায়।...বস্তুজগৎ ও অন্তর্জগতের কাঁচা উপাদান সাহিত্যকর্মের পরিণতিতে পৌঁছবার আগে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। যখন যায়, তখন তার একটা নির্দিষ্ট গঠন হয়ে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই গঠনের বিশ্লেষণ ছাড়া বিষয়টিকে বোঝা যাবে না, অংশত বোঝা যাবে মাত্র। অথবা বিষয়টি হয়তো নানা রকম ঝোঁকে ঝোঁকে বেরিয়ে আসে, প্রতীকে-রূপকে সৃষ্টিক্রিয়ার ভেতরে কোথাও এই গঠনটি নিহিত হয়ে যেতে পারে। এই দুই ভাবেই সাহিত্যবিচার করা যায়। কিন্তু দুটোর ভেতর কোনো পদ্ধতিগত জট যেন না থাকে।

দস্তয়েভ্স্কির ওপর বাখতিন-এর কাজে দেখা যায়—লেখকের ব্যক্তিত্বের আলোচনায় না গিয়েও তার লেখা কি রকম বিশ্লেষণ করা যায়। এবং শুধু দার্শনিক-নৈতিক দিকই নয়, তার নান্দনিক দিকও দেখা যায়।

সান্তিনিকা

তুমি তোমার নিজের পদ্ধতিটি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে—যে-পদ্ধতি তুমি তোমার বইয়ে নিয়েছ—'অন লিরিকস' আর 'সাইকোলজিক্যাল প্রোজ'?...

গিরজবার্গ

আমি তো আর শিল্প-রচনা করছি না। আমার পক্ষে এগুলো 'গল্প লেখা'। আমার বরাবরই এই 'ইন্টারমিডিয়েট'—মধ্যবর্তী ধরনের লেখা পছন্দ—স্মৃতিকথা গোছের লেখা।

সার্তিনিন

তুমি তো এই মধ্যবর্তী ধরনের লেখাগুলোকেও তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করছ। তোমার বইয়ে তুমি চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, ডায়েরি এই সবের ওপর জোর দিয়েছ—এ-গুলোতে বাস্তবতার সিধে প্রতিফলন ঘটে—তুমি বল। 'সাইকোলজিক্যাল নভেল' এই ধরনেরই আরো সংগঠিত লেখা বলে তুমি মনে কর। কিন্তু সারা দুনিয়াতেই এখন এই 'উন্নত সংগঠিত নির্মাণের' লেখার কদর কমছে ও ঐ মধ্যবর্তী ধরনের লেখার কদর বাড়ছে। এর কারণ তোমার কি মনে হয়?

গিনজবার্গ

প্রথমে ধরা যাক নভেলকে 'মোর অর্গানাইজড স্ট্রাকচার' বলতে কি বুঝিয়েছি। এ-কথাটির ভেতর ভালো-মন্দের কোনো বিচার নেই। স্মৃতি-কথার চাইতে নভেল উন্নততর—এ-কথা বলতে চাই না। বলতে চাই—দুটোর সংগঠন দু-রকম।

সাহিত্য কখনো-কখনো নিজের চৌহদ্দির ভেতর থাকে, আবার কখনো-কখনো যাকে বলে 'হিউম্যান ডকুমেন্ট' তার কাছাকাছি চলে আসে। আগেও এ রকম ঘটেছে। যেমন, হেরজেন দেখেছিলেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্রান্সে। ফ্লবেয়ারের আবির্ভাবের আগে কিছুদিন অপেক্ষা-প্রতীক্ষায় কেটেছে—রাশিয়ায় তুর্গেনেভের আগে। সেই সময় এই মাঝামাঝি ধরনের লেখার খুব চাহিদা হয়েছিল। আইকেনবাম তাঁর তলস্তয়-এর ওপর বইটিতে এ-বিষয়ে লিখেছেন। সম্ভবত সাহিত্যের পুরনো ধাঁচের জনপ্রিয়তা হ্রাসের সঙ্গেও এর একটা যোগ আছে।

সার্তিনিন

একে কি তাহলে বলব শক্তি সংগ্রহ? নতুন ভাবে শুরু করার আগে?

গিনজবার্গ

এ ভাবে তো কিছু বলা যায় না।... এ-কথা সত্যি যে এখন এই 'মাঝামাঝি' ধরনের লেখার প্রতি আগ্রহ খুব বেশি—সারা দুনিয়া জুড়েই। পাশ্চাত্যের 'উপন্যাসের সঙ্কট' নিয়ে যে কথা উঠেছে—সেটাও কিছু এমন

আকস্মিক নয়। এই শতকের প্রথমার্ধের কথাই ধর—প্রুস্ত, জয়েস, কাফকা, মান, ফকনার, হেমিংওয়ে—এঁদের সমতুল্য কেউ এখন পাশ্চাত্য সাহিত্যে নেই।

তবে এই স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে আগ্রহের আরো-একটা কারণ আছে। আমাদের এই সময়ে তো নানারকম ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটছে। সংখ্যাতেও প্রচুর, ধাক্কাও বেশি। একদিকে বাস্তব অবস্থা তো সবসময় একেবারে টনটন করছে উত্তেজনায়, অপরদিকে এই বাস্তবতার যোগ্য মহৎ শিল্পের আধার নেই—যদিও আমাদের দেশে ও পশ্চিমে অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক আছেন।

সাভিনিনা

তাহলে তুমি মনে কর যে মহৎ সাহিত্য-কর্ম সম্পূর্ণ নতুন কোনো অর্থে ঘটতে পারে?

গিনজবার্গ

হাঁ।কিন্তু কর্ম বলতে আমি বোঝাই তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ, অর্থময় কর্ম।

সাভিনিনা

...সাহিত্য প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক অনুধাবন থেকে কি কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায় যে কোন্ ধরনের সাহিত্য থেকে এমন মহৎ শিল্পকর্ম নির্মিত হতে পারে?

গিনজবার্গ

একটি মহৎ সাহিত্যকর্ম কী রকম হবে সেটা আবিষ্কার করতে পারা মানে তো সেটা লিখে ফেলতে পারা। আবিষ্কার মানেই তো যা আগে ছিল না। আর, এমন প্রায়ই ঘটে যে তেমন আবিষ্কারের ফলে পাঠক খুশি হয় না, বিরক্ত হয়।

ধর, তলস্তয়-এর 'ওঅর অ্যাণ্ড পিস'। বেরবার পর এ-বই নিয়ে কি-ই-না লেখা হয়েছে। আমি সাংবাদিকদের খিস্তি-খাস্তার কথা বলছি না। আসলে সমালোচকরা বুঝতেই পারেন নি উপন্যাসটিতে নতুন কি আছে? যেন নতুন কিছুই ঘটে নি: একটা আজেবাজে ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস বেরিয়েছে, বাস!

অন্ধ সাহিত্য-সমালোচকরা একটা সাহিত্যকর্মে তাই শুধু দেখতে পান, যা তাঁদের জানা। ভালো সমালোচক হতে হলে, বিস্মিত হতে জানতে হয়, আর, অন্যদের দেখাতে জানতে হয়—তারা নিজেদের সম্পর্কে যা জানে

না লেখক সে-কথাগুলি ওদের কি ভাবে জানাচ্ছেন। ওলস্তয়-এর মতে, এটাই তো লেখকের কাজ।

নাতিনিনা

তা হলে নতুন মানুষকে বোঝার চেষ্টা থেকেই সমসাময়িক সাহিত্যে নতুন আবিষ্কার ঘটবে?

পিসকুনোভ

নিশ্চয়ই। কারণ মানুষই তো চিরকাল বিষয়। চিরকালই তাই থাকবে। তৃতীয় নয়নে মানুষকে বোঝার এক-একটি চেষ্টাই তো সাহিত্যেরও এক-একটি দিকচিহ্ন। যদি কোনো মহৎ নবীন লেখক আবির্ভূত হন, তিনি তাঁর সমকালীন মানুষকে দেখিয়ে দেবেন সেই মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা, দিব্য (spiritual) অভিজ্ঞতা, যা তখন পর্যন্ত উচ্চারিত হয় নি। আর তিনি সে কাজ করবেন শিল্পের এমন উপদান দিয়ে, যা আমাদের জানা নেই।

আমরা বরং আশা করব, এই 'মাঝামাঝি ধাঁচের লেখার' প্রতি আগ্রহ আসলে 'উপন্যাসের সঙ্কটের' জন্য নয়—এ-ও প্রতীক্ষা, আকাঙ্ক্ষা। আমরা তো জানি, এমন আগে অনেক ঘটেছে।

অনুবাদ— প্রমীলা মেহ্‌তা

পুরুলিয়া

নন্দদুলাল আচার্য

'উঠ্‌ ছুঁড়ি তুর বিয়া।'
ই কইরে কাজ হয় কি বড় মিঞা?
আগু পাছু ভাইবতে হবেক,
বেকুব পুরুলিয়া।

তুর লেগেই ডকা ডকি,
কাঁইদছে আমার হিয়া।
সনায় মুইড়ে দিব তুখে,
দুঃখী পুরুলিয়া।

জুইতের উঠোন না হইলে হেই,
কেমন কইরে নাচি।
যেই কইরব শুরু সাঙাৎ,
অমনি বেঙের হাঁচি।

'উঠ্‌ ছুঁড়ি তুর বিয়া।'
ই কইরে কাজ হয় কি বড় মিঞা?
আগু পাছু ভাইবতে হবেক
বেকুব পুরুলিয়া……

কথা ছিল

ভাস্কর রায়

কথা ছিল আজ হাঁটা হবে পথ
কাছের পাড়ায় দূরে বহুদূরে
হেরে গিয়ে তবু জয়ে সম্মত
সুর বেজে ওঠে ঘোড়ার ক্ষুরে

হাঁটা হবে পথ—এই ছিল কথা
ক্রুদ্ধ মানুষ আবেগে গভীর
কোলাহল ভাঙে মৃত নীরবতা
গাণ্ডীব থাকে হাতে স্থবির।

তব্‌লা লহর

সলিল আচার্য

তব্‌লায় মেরে চাঁটি
বোল তোলে পরিপাটি
কুব্‌লাই খাঁ।

বাঁয়া কয়: সব মাটি:
দেখ আমি কত খাঁটি—
কাত্‌রাই না।

খাঁ সাহেব মৃদু হেসে
দুহাতে বাজালো ঠেসে
তব্‌লা লহর।

ক্রম ঘাম পড়ে শমে,
দুভায়ের চোখে বামে
মৃত্যু প্রহর॥

খুন

দীপক রায়

পরিত্যক্ত এরোড্রামের মধ্যে দাঁড়িয়েছি
হাস্কিং মেসিনের ব্রিপ্ ব্রিপ্ ব্রিপ্ ব্রিপ্ শব্দ কাশের জঙ্গলের
ভেতর দিয়ে দুপুর থেকে বিকেলের দিকে টেনে নিচ্ছে আমার
মতিলাল এই জঙ্গলে দু বছর আগে খুন হয়েছিলো
হাস্কিং মেসিনের শব্দ কাশের জঙ্গল দাপিয়ে বেড়ায়

আর একমাত্র মতিলালই দেখতে পাচ্ছে
বিকেলের পাখি নদীর জলে ঠোঁট ডুবিয়ে নেবার
আগেই
রক্তপাতহীন আর একজন খুন হ'ল

এবার মাঝির কথা

কজল নন্দী

ঘাটে নৌকা ছিল না তাই নৌকার কথা বলেছি
আমি এবার মাঝির কথা বলবো

অর্ধেক নদী দখল করেছে শ্যামল ক্ষেত
আর অর্ধেকে কোমল কুয়াশা
ভোরের সোনালী আলোয় সবুজ ঘাস গলছে
পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা নদীতে
ঘাসের নাম না জানা সবুজাভ ফলে প্রজাপতি বসছে না
ফুলগুলো তাই ঝরে পড়ছে নদীর তলায়

বাঁকানো সড়ক পেরিয়ে এসেছি
এখন অনিবার্য এ নদী—তার মন্থর প্রবাহ

আর রোদ ও হাওয়ার বদলে

পড়ে থাকা প্রকৃতির মতো এ নৌকা

আসন্ন পারাপারে

এতদিন নৌকার কথা বলেছি

আমি এবার মাঝির কথা বলবো

অথচ ভাবেনি কেউ

পূর্ণচন্দ্র মুনিরান

সারাজীবন খুঁজলেও ঠিকঠাক হিসেব মতো

সব কিছু কখনো মেলে না

নিমন্ত্রণ খেতে যারা এসেছিলো ঘরে, কেউ কেউ

রাগ করে ফিরে গেছে সকাল সকাল

অথচ ভাবে নি কেউ ডাকবাক্সে চিঠি এলে দেবে না পিয়ন !

তবুও আসে না হাওয়া, কুকুরের শীত নেই

সারারাত হাঁকডাকে শরীর গরম, নীলমুখ ভিখিরী বালক

এদিক ওদিক. কুড়িয়েছে এঁটোকাঁটা. বাসিভাত

অতিরিক্ত, চন্দন সুবাস মাখা একটি গোলাপ

কে এখন কোনদিকে আছে, জানলায় ভাঙা ছাইদানী

একটুও হাওয়া নেই, শুকনো গোলাপের দিকে তাকাতে তাকাতে

বালকের দুটি চোখে প্রেম এসে যায়

অথচ ভাবে নি কেউ, সমুদ্রের শ্যামলিমা নদীটি দেখে না !

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

ঝিরঝিরে হাত ঝিরঝিরে পা
        আয়নায় তার স্বাস্থ্য দেখে
মুখের গালে ঘাস লেগেছে ?
নাকি শুধুই চৈন প্রাচীর তুলছে মাথা
শরীরটা কি চিমড়ে পোড়া
            আবলুস কাঠ
জেল্লা জলুস একটুও নেই ?
শিরার মধ্যে রক্ত কি লাল শুকিয়ে গেছে
                        জাগছে চরা !

এসব ভেবে বিক্ষত মন
    গ্রহ শান্তির কবচ খোঁজে
    ডাকিয়ে আনে পুরুত ঠাকুর
বুকের মধ্যে অবিরতই
    কামারশালার হাপর পড়ে
ঘুমন্ত সেই ঝিরঝিরে হাত
    ঝাপটে ধরে লক্ষ্মীর পা।

যৌথ প্রেমে, সাহসে

গৌতম ভট্টাচার্য

শহরে নেই শান্তি
এবং গ্রামেও নেই ক্ষমা—
ডাকবে কাকে ?
সবার বুক এখন বন্ধ বাড়ি
পথ ঢেকেছে শ্যাওলা আর আগাছা : ভুলভ্রান্তি

বাঁকে বাঁকে জমেছে ঘোর অন্ধ—
ক্লান্তি এসে নেমেছে কোন বাঁকে।

চাতাল জুড়ে দীর্ঘছায়া শুয়েছে আড়াআড়ি
নষ্ট স্মৃতি মুছেছে পদরেখা
বাতাসে বিষ
নদীতে চোরা টান—
হিংস্র জল গোপনে কাটে মাটি—
যথা রাতে স্বপ্ন ভেঙে শোনো
সাপের মতো হাওয়ার চাপা শিস্!

মানবিক এক ভালবাসার প্রাণ
পাতবে কী ফের দাওয়ায় শীতল পাটি!
দেবে কী জল? আনবে কি আর কোনো
কোমল ছায়া—দূর হবে সব ক্লান্তি?
রাত্রি হবে নিবিড় আর সুস্থ হবে সকাল!

প্রেমে,সাহসে পার হবে কি সংক্রান্তি

বদলে যাওয়া দিন

অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই হিরণ্ময় বৃক্ষটির কথা কেউ বলে না আজকাল
কিংবা অলীক গাঁ-বুড়োর গালগল্প
উড়োজাহাজ দেখে ছুটে আসে না ছেলেরা;
এ বছর শীতের দাঁত নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই।

মানুষের চাষযোগ্য জমি কতোখানি, কতোখানি অধিকার
এ নিয়ে আওয়াজ তুলেছে বহেরু সাঁওতাল
আজকাল তার মাদলে নাকি সর্বনাশা লহরা বাজে।

বহেরু, আমাদের বহেরু কতো বদলে গেছে
তার সাঁওতালী হাঁক শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়
খপ্পরে পড়েন মহান বি-ডি-ও সাব—

মজলিশে ডাক পড়ে বহেরুর,
নিমাই মুর্মুর সাথে ডুব্‌রির বিয়ে হবে কিনা সেই ঠিক করে দেয়
বয়সের সন্ধি মনে পড়ে বহেরুর ?
মনে পড়ে ঋতুর ভেতর থেকে ঋতুর বিস্তার
বনবাসী শিকড়ের উন্মোচন ?

বোঝা যায় বদল হয়েছে।
খেতে রাত হয়, ধুতি শার্ট কাচা হয় প্রায়
ছাঁচতলায় অপেক্ষা করে ক্যাম্বিশের জুতো
ঘুমের বদলে বিড়ির বাণ্ডিল পুড়ে যায় রোজ।
বয়সের সন্ধি মনে পড়ে বহেরুর, মনে পড়ে—

তার বৌ এর পিঠ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে চাবুকের দাগ।

দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বাধীনতা দেবী

মঞ্জুভাষ মিত্র

সারারাত্রি দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বাধীনতাদেবী
আমার মনোযোগ দাবী করে

যেন সাগরউত্থিত ভেনাস : এমনি সুন্দর
মসৃণ অবয়ব, হাজার বাতাসের ফুল ঝরে যায়

হাত রেখে দেখি আমার গলায় সুখের শিকলের দাগ

অরণ্যের ভিতর ব্লাডহাউণ্ডের আদিম পিতৃপুরুষ উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে

ঘুমের মধ্যে দ্বিতীয় এক ঘুমে প্রবেশ করি
এবার আমার বুকের ভিতর স্বাধীনতাদেবী
এবার আমার বুকের ভিতর দর্পণ
আমার চুম্বনে ফুটন্ত মুক্ত উপত্যকার একহাজার রক্তফুল

মিথ্যে হারমোনিয়ম

মবিনুল হক

মিথ্যে হারমোনিয়ম সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে

আস্‌সালামো আলেয়কুম। ওয়ালেয়কুম আস্‌সালাম
একজন এপারে আয়নার অন্যজন স্থাপিত ওপারে
ছেনি-কোঁদা মূর্তি তো নয় ভাই—মানুষের নাম
পেরেক-বিধ্বস্ত মুখ, ভাঙাচোরা, চাপা-পড়ে যুদ্ধ মাঠে
আস্‌সালামো আলেয়কুম। ওয়ালেয়কুম আস্‌সালাম

মিথ্যে হারমোনিয়ম সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে

কয়েকটি অরাজনৈতিক কবিতা

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

এক

জঙ্গল মহালের গাছগাছালি
যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে
পাতা শুধু আরো ঝরে গেছে দু-চারটি
স্বপ্নের পাতা নোৎসুক সব গাছ থেকেই।

দুই

বিপন্ন বন্ধুকে আরো বিপন্নতা দিলে
শব্দেরও অর্শায়ে শৌর্য, তাও
আগুন ছুঁয়েছে চুল, তখন সুধিকে
শব্দ ছাড়া চোখ দিতে মৃৎশিল্পী কোথায় ?

তিন

প্রার্থিত যা দাও তাকে, অত্যন্ত বিনয়
তার বাচ্ঞা, প্রতিশ্রুতি। বিশাল বভূমি
তোমাকে দিয়েছে সে যে, কররেখা খুঁজে
মলিনতা ক্লান্তি কষ্ট ঘাম ও পূর্ণতা
শিক্ষার ও জীবনের, তার অধিকারে
ন্যস্ত কর আয়ুবীজ, কাজ দাও, কাজ, শুধু কাজ
যা খুব সহজবর্গ—অনায়াস, স্থিত প্রজ্ঞা দিলে।

তোমারই জন্যে শুধু

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

তোমাকে গল্পের বুকে রেখেছি কখন
সমস্ত সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে !
চরাচর সমগ্রতা, সতর্ককিরণ
তুখোড় চাকচিক্য যত, স্পর্শ-দুষ্ট নদী রাজধানী
ফুলে ফুলে অবিরোধী নিত্যকাল সমুদ্র মন্থন
সমস্ত উদ্যোগ থেকে খুঁজি কত শেষের পারানি

অনেক গড়ার ছিল, সাদৃশ্যও মিলতো সহজে—
যখন সন্তুষ্ট স্নানে কুসুমিত যাও পদব্রজে
জ্যোৎস্নার মবারে পথ—জনপদ আত্মীয়প্রতিম।
উচ্ছিষ্ট স্নায়ুতে নখে প্রতিবেশী সন্ত্রাস্ত মগজে,
ক্রমশো তোমারই শুধু স্থির দিবা দাক্ষিণ্য অসীম।

গন্ধে স্নিগ্ধ জলস্তম্ভে—নিরুদ্বিগ্ন পূর্ণিমার শীতে
তোমার সংসার নাকি ?   চৈতন্যের উড্ডীন মন্দিরে
বাঘের সোনাটা স্রোতে সচকিত সব জানাজানি,
কেবল আমাকে টানে সুখহীন প্রেমের গভীরে—
প্রখর গন্ধের মোহে হৃত কড়ি শেষের পারানি।

পর্যটন

শুভ মুখোপাধ্যায়

ছিল একটি নদীর কাছে
দীর্ঘ মৌনী গাছের দগ্ধ যন্ত্রণার কথামালা,
বিলাসিনীর হাতে তখন তেমন স্বপ্নসাধের বাতাস নেই,
তেমন আলুথালু শিশু নেই আমাদের ঘরে—
বহুদিন মলিন জামায় অহংকার ওঠে না আমাদের,
কি অঞ্জন কাঠিতে—
        তুমি বিনাশ করেছো আমাদের মনোবাঞ্ছারাশি !

সমস্ত জোড় খুলে এবার নতুন পর্যটনে যাবো আমরা,
পুরুষ্টু বীজ ছড়িয়ে দেব আনাচ কানাচ,
                    বিলাসিনীর স্বপ্নসাধ গন্ধবনে—
বদলে নেব মেঘের ওপরকার মেঘ,
হাওয়ার ওপরকার সনির্বন্ধ হাওয়া,
স্বপ্নের ওপরকার স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুমটুকু।

একদিন ভরা আতিথ্যে
মলিন জামার আলুথালু শিশুদের কি অহংকার,
দেখাবো তোমাদের।

তখন সমস্ত জোড় খুলে
সপ্তসাধ বিলাসিনীর গন্ধ বনে
নতুন পর্যটনে আছি আমরা

স্বদেশ

শোভন মহাপাত্র

নদীর মরা স্রোতের মতো নিঃশব্দ দেশ
কোথায় সুতোটি বাঁধা, কার্পাশ রঙের নীল স্বাধীনতা।
কোথায় মজ্জা ও মনীষা
খড়ের আগুনে বাষবন্দী দেশ
শেষ দুঃখের খেয়া ভেসে যায় রক্তের ভিতরে
বন্যায় বাঁশপাতা ভেসে আসে
জ্যোৎস্নায় লুকোচুরি খেলে ক্ষুধার্ত মানুষ
গলিত শবের ভিতর বসে থেকে ভাবে
স্বদেশে পাতার ঘরে,
মরা নদীর স্রোতে বেঁধে রাখবো স্বাধীনতা

জ্যোৎস্নায় এইভাবে গুহাবন্দী খেলা হয়
মানুষ ফ্লুট বাঁশী বাজাতে বাজাতে
পোড়াতে যায় স্বজনের শেষ
সারারাত মায়াহীন নীরব উৎসব
সারারাত আদিম যন্ত্রণায় ডুবে থাকে
সকালে নুনের খোঁজে বাজারে যায়
উলঙ্গ মানুষ।

শেষ দৃশ্যে

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সে তার অমল হাতে সৌখীন ভাস্কর্য ভাঙে
পাথরের বুকে রাখে মাথা :

দুঃস্বপ্ন সাপের মতো রোজ তাকে গিলে খায়
সে খোঁজে না বাঁচার সিদ্ধি মন্ত্র কিংবা বিষ পাথর
বিশ্বাসঘাতক লোভ সর্বাঙ্গে লেপ্টে থাকে
নিজেকে নিজে জানতেই পারে না : অথচ
সে তার পথ পাল্টিয়ে নেয় না তবু
পুরানো পোষাক খুলে হ্যাঙারে টাঙায় না।

সে রোজ নিজেকে ছিঁড়ে আগুনে আহুতি দেয়
বিদ্ধ হয় তীক্ষ্ণতম ঘৃণার শায়কে
পুরোহিত হতে গিয়ে শেষ দৃশ্যে চণ্ডাল জাতক
দাসত্ব শিকল বেড়ি পায়ে পরে শব ব্যবচ্ছেদ করে
জঘন্য ঘাতক।

আগুনে পুড়তে থাকে, পায় না সে আগুনের ফুল
তাকে ব্যঙ্গ করে যায় হেসে হেসে কালের পুতুল।

অর্জুনের দিন

শ্যামল পুরকায়স্থ

সাঁতার না জেনেও মেয়েটি জলপদ্ম তুলতে গেল—ছলাৎ-ছলাৎ-ছল—
জলজ উদ্ভিদ আর পাঁকে জড়িয়ে ডুবে যেতে যেতে
ঘোরের মধ্যে নিজেকে ভাবলো জলপরী।
ভাবলো সরোবরে প্রস্ফুটিত ফুল ব্রহ্মার নাভিপদ্মের রূপক ;
হাতছানি দিচ্ছে তাকে

এইবার বেযে বেযে বাজবে অলৌকিক জলতরঙ্গ।
আজ তার অর্জনের দিন
আজ তার উৎসবের দিন।

তাকে তুলছি টেনে—সে এখন এলিয়ে রয়েছে ঘাসের ওপর।
ভিজে সপসপে শরীর থেকে উঁকি দিচ্ছে বিশ্বমোহিনী ভাস্কর্য—
হলোই বা জলঢোঁড়ার বিষ, তবু মানবীর চেতনা ও মগ্ন-চেতনাজাত
নীল ঠোঁট থেকে বিষাদ-বিবর্ণতা শুষে নিচ্ছি যেই
অসীম দূরত্ব অতিক্রম করে মেয়েটি মেললো চোখ—
ভ্রূ-পল্লব শোভিত ওই চোখ দুটি নীলপদ্ম হলো।
আজ তবে অর্জনের দিন
আজ তবে উৎসবের দিন।

এই রৌদ্র-জাগরণ

আশিস চক্রবর্ত্তী

সুস্থতায় লেগেছিল সব ঋতু মানুষের, প্রকৃতির
জেনেছিল শুধু যেই নগ্নতার পোষাকের ক্ষণ—
সে কবে কখন?

স্মৃতির শরীরে সুখ, নিরবচ্ছিন্ন ভাললাগা থেকে
মুছে গেছে স্বতঃস্ফূর্ত শরীরের শ্রম,
তৃষ্ণাহীন জলপানে কেটে যাচ্ছে রৌদ্র-জাগরণ।

সুস্থতায় মিশেছিল স্বতঃস্ফূর্ত শরীরের শ্রম।
সঙ্গীত শেষ হলে ঘুম নিয়ে যেত শ্রমে
আগামীকালের,
শারীরিক বোধ থেকে দূরে নীল মুখ—মূক,
সঙ্গীতের শেষে
ঘুমের বদলে মেধা মুছে ফেলতে চায় অপমান।

স্মৃতির শরীরে সুখ, নিরবচ্ছিন্ন ভাললাগা থেকে
মুছে গেছে স্বতঃস্ফূর্ত শরীরের শ্রম,

তৃষ্ণাহীন জলপানে কেটে যাচ্ছে রৌদ্রজাগরণ।

রদাঁর আলোয় একটা দিন

পূর্ণেন্দু পত্রী

পাঁচ

গেট অব হেল। স্কুলের নীল-সাদা ইউনিফর্ম-পরা এক ঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্রীর ভিড় তখন সেখানে। সঙ্গে শিক্ষিকা, গাইডের ভূমিকায়, অনর্গল ফরাসীর একবর্ণও মগজে ঢুকবে না জেনেই দূরে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেয়েগুলি বড় চকচকে। যেন প্রাচীন পরীদের আধুনিক শহর সংস্করণ। ওরা দেখছিল নরক। আমি দেখতে লাগলুম ওদের।

চল্লিশ বছর আগে এক অজ পাড়াগাঁ থেকে অজগর কলকাতায় এসে ঢুকে পড়েছিলুম আর্ট স্কুলের অন্ধকার খুপরিতে। তখন দিনরাত ঘাঁটাঘাঁটি ছিল এ্যানাটমির বই। এক-একটা লম্বা-চওড়া বইয়ের পাতায় ছাপা থাকত বড় বড় সব শিল্পীদের স্কেচ-খাতার হুবহু প্রতিচ্ছবি। কোনোটা হয়তো দেলাক্রেয়া, কোনোটা দা ভিঞ্চি, কোনোটা মাইকেল এঞ্জেলোর। এইখানে একটা পা। তার ডানদিকেই হয়তো বৃবভুক্ষ কোনো কোনো শরীরের ছাতির খানিকটা। তারই উপরে বা নীচে উত্তেজক অভিশাপের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসা একটা হাত। তার পাশেই, মরব তবু মাথা নোয়াব না, এমনই মরীয়া ভঙ্গির একখানা মাথা। মানুষের পাশেই হয়তো ঘোড়ার তেজস্বী শরীরের টুকরো-টাকরা, আবার হয়তো তারই পাশে রূপসী মডেলের ছিন্নভিন্ন শরীর, সতীর বাহান্ন টুকরোর মতো। নরকের দরজার সামনে দাঁড়াতেই ফর্ ফর্ করে চোখের সামনে খুলে গেল চল্লিশ বছর আগের সেই ভুলে-যাওয়া বইয়ের পাতাগুলো।

নরকের দরজায় শুধু মানুষ। আর্ত, অসহায়, আতুর, অনুতপ্ত, লজ্জিত শিথিল, দুর্বল, দুর্দান্ত, ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, ব্যগ্র, বিপন্ন, বিধ্বস্ত মানুষ, যেন গোনা-গুনতি করলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে। তাদের সামনে প্লাবন। আর, এই প্লাবনের পরেই নতুন জীবন, রেজারেকশন, রেনেশাঁস।

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-র সঙ্গে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ফাদার এমার-এর মারফতে। রদাঁ তখন মনাস্টারি অব দ্য ফাদার অব হোলি

স্যাক্রামেন্ট-এ। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছোটদিদি মারী আশ্রয় নিয়েছিল চার্চে। তবুও সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না চরম ধ্বংস থেকে। রদ্যাঁর চোখের সামনে, রদ্যাঁর হাতে হাত রেখে, তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে গেল সেই প্রাণবন্ত যৌবন। মারীর জন্যেই তার ছবি আঁকার যা কিছু অগ্রগতি। মারীই ছিল তার প্রেরণা, তার শক্তি-সাহসের উৎস। মারীকে হারিয়ে রদ্যাঁও হারিয়ে ফেললেন নিজের উপর বিশ্বাস। বেছে নিলেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন এই চার্চে—শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে রোমাঞ্চিত আড্ডা, নর-মডেলের সামনে ছবি-আঁকা, ব্যু-আর্টস-এ ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন সব কিছুকে মন থেকে মুছে ফেলে।

মনাস্ট্রির অধিনায়ক ফাদার এমার মারীর কাছ থেকে জেনেছিলেন রদ্যাঁর স্বপ্ন ভাস্কর হওয়া। একদিন সরাসরি প্রশ্ন করলেন ভাস্করকে

—তুমি তো ভাস্কর, তাই না ?

—ছাত্র ছিলাম, তার বেশি কিছু নয়।

—শেখা শেষ ?

—না। তাতে কিছু যায় আসে না আর।

—মাই সন, অত বেশি বিনীত হওয়া ভাল নয়। ওটাও এক ধরনের পাপ। যদি কেউ ঈশ্বরের আশীর্বাদে শিল্পের ক্ষমতা পেয়ে থাকে, সেটাকে হাল্কাভাবে দেখা ঠিক নয়। ঈশ্বর এবং শিল্প কেউ কারো বিরোধী নয়।

—আমার আর ভাস্কর্যের উপর টান নেই।

—অস্থির হোয়ো না। ঈশ্বরের যা অভিপ্রায়, সেটাই ঘটবে। তবে মনে রেখো আমাদের এই জায়গাটা কারো পালিয়ে বাঁচার জন্যে নয়। এটা সার্থকতার সন্ধান দেবার জন্যেই···তুমি দান্তে পড়েছ ?

—অল্প-সল্প।

—আমরা কেউ শিল্পের শত্রু নই, যেমন দান্তেও চার্চের শত্রু ছিলেন না। তিনি শুধু ঘৃণা করতেন এর পাপাচার। আমার কাছে ডিভাইন কমেডির একটা অসামান্য সংস্করণ আছে, যা গুস্তভ ডোরের এচিং দিয়ে অলঙ্কৃত, দেখতে চাও ?

খ্যাতিমান পণ্ডিত ফাদার এমার নিজেই অনুবাদ করেছিলেন দান্তে আর পেত্রার্ক। সে অনুবাদের জন্যে প্রচুর সম্মান-সুখ্যাতিও পেয়েছেন বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। ফাদার বইটা তুলে দিলেন রদ্যাঁর হাতে।

রদ্যাঁর বয়স তখন ২২।

১৮৮০-তে রদাঁর পা ৪০-এ। সেই সময়ে, বলতে গেলে আজীবনের প্রতিকূল হাওয়া ঠেলে, সেই প্রথম, সরকারি মহলের সাগ্রহ আমন্ত্রণ এসে হাজির হল তাঁর জীবনে। মিউজিয়াম অব ডেকরেটিভ আর্ট-এর দরজার জন্যে গড়ে দিতে হবে বড় রকমের কিছু একটা কাজ। রদাঁ জানিয়ে দিলেন, রাজী। দান্তের ইনফার্নোকে মনে রেখে গড়বেন, নরকের দরজা। চলতে-ফিরতে, খেতে-ঘুমোতে আমি এই নিয়েই ভাবছি। আবার নতুন করে পড়ছি দান্তে, বোদলেয়ার, হুগো, বালজাক। দান্তে এবং বোদলেয়ারের মানবিকবোধের সঙ্গে আমার ভাবনার মিলটাই সবচেয়ে বেশি। আমার নরকের দরজা হবে, শক্তি এবং সৌন্দর্যের এক অভাবনীয় সমন্বয়, স্পর্শাতুর এবং ভয়ংকর। সেখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে উদ্মত্ত আবেগ আর উদ্দাম গতি। মূর্ত হয়ে উঠবে সেই 'volupté', যা কেবল পারে ভাস্কর্যই। মানুষ যে-রকম চেয়েছিল, পৃথিবী সে-রকম হয় নি। ক্ষয়ে চলেছে কেবলই। মানুষ আর সত্য এবং সৌন্দর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাকে ঘিরে রয়েছে দুর্ভাবনা, সন্দেহ, পাপ। এমনকি মানুষের শরীর, যা কিনা সৌন্দর্য আর উদ্দীপনার উৎস, মানুষের সেই শরীরকেও, কুরে কুরে খেয়ে চলেছে অবারিত লোভ, লালসা, কামনা-বাসনা, অহংকার। ভালবাসা হয়ে উঠেছে ক্ষতিকারক উন্মাদনা। আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে উৎপীড়নের নামান্তর। আমার নরকের দরজায় একালের মানুষ মুখোমুখি হবে নিজের আত্মার অবক্ষয়ের সঙ্গে।

সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি ছিল, কাজ শেষ করে দেবেন তিন বছরে। কিন্তু পার হয়ে গেল বছরের পর বছর। একের পর এক নতুন ধ্যান উলটে-পালটে দিতে লাগল পুরনো সিদ্ধান্ত, হাজার হাজার হাত, পা, বুক, পেট, মুখাবয়ব নিয়ে চলল এক অন্তহীন ভাঙা গড়া। তিনি চেয়েছিলেন সংখ্যাতীত মানুষ এসে সমবেত হবে তাঁর এই আশ্চর্য সৃষ্টির দোরগোড়ায়। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের আত্মার ভিতরকার যত কিছু বিচ্ছুরণ, সব ঘনীভূত হবে এইখানে। এত বড় করে ভাবতে গিয়েই দশ বছরেও শেষ হল না মূল কাঠামো। সরকারি হুমকি এসে হানা দেয় তাঁর স্টুডিয়োয়। আরও দেরি হলে অগ্রিম হিসেবে দেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে।

বছর তিনেক পার হয়ে গেল।

ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তোমাকেই।

রদাঁর উত্তর

—সে ক্ষতি আমার নয়। ফ্রান্সের। কাজটা শেষ করতে আমার সময় লাগবে আরও বছর তিনেক।

কিন্তু কাজ শেষ আর হয় না। অথচ এই বিশাল কাজের খসড়া থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে জন্ম নিল অসংখ্য নতুন কাজ, পূর্ণাঙ্গ চেহারায়। তার মধ্যে আছে 'দি কিস', 'দি ওল্ড কোর্টিজান', 'পাওলো এ্যাণ্ড ফ্রানসেসকা', 'ফুজি আমুর', 'দি প্রডিগাল সন', 'উগোলিনো', 'আদম', 'ইভ', 'দি থ্রি স্যাডোজ' আর 'দি থিংকার'।

শেষ পর্যন্ত নরকের দরজায় জুড়ে বসল ১৮৬টা মূর্তি। শেষ পর্যন্ত নরকের দরজা' ডিভাইন কমেডি'র ইলাসট্রেশন না হয়ে, লাস্ট জাজমেন্টের গতানুগতিক বা বদ্ধমূল ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, হয়ে উঠল ভাস্কর্যের ভাষায় লেখা এক মহত্তম কবিতা। এখানেও ট্র্যাজেডি, কিন্তু তা মাইকেল এঞ্জেলোর ট্র্যাজেডির থেকে ভিন্ন ট্র্যাজেডি বলতেই আমরা বুঝি ঈশ্বর অথবা নিয়তি বনাম মানুষের সংঘর্ষ। রদাঁর ভাস্কর্যে ঈশ্বর অনুপস্থিত। নিয়তি নির্বাসিত। রয়েছে শুধু মানুষ। যে-যার নিজের আত্মদহনের আগুনে পুড়তে পুড়তে এখানে এসে জমায়েত হয়েছে, যে-যার নিজেকে চিনে নিতে।

গেট অব হেল-এর সব চরিত্রই নগ্ন। ভাস্কর্যের ইতিহাসে এটা অভিনব কোনো ঘটনা নয়। চিত্রকলার নগ্নতা আমাদের সহজেই উত্তেজিত করে তোলে সংস্কৃতির সুস্থতায় ঘুণ ধরবার আশঙ্কায়। সমাজ দূষিত হয়ে ওঠার উদ্বেগে নিভে যায় আমাদের চোখের স্বচ্ছন্দ নিদ্রা। অথচ ভাস্কর্যের বেলায় সুন্দরকান্তি নগ্নতার আপাদমস্তক এ্যানাটমিই আমাদের কাছে চোখের তৃপ্তি, চিত্তের সন্তোষ, তৃষ্ণার শান্তি, ইংরেজিতে এই নগ্নতার নাম ন্যুড। নেকেড নয়। আধুনিক শিল্পভাষ্যকারদের মতে নেকেড হল, সেই বসনহীন দেহ যা বসনের অনটনে লজ্জিত, সঙ্কুচিত, এ্যামবারাসড, আর ন্যুড হল, 'এ ব্যালানসড, প্রসপারাস এ্যাণ্ড কনফিডেন্ট বডি, দি বডি রি-ফর্মড।'

বডি রি-ফর্মড অর্থাৎ শরীরের নবজীবন বলতে কি বুঝব, তার দৃষ্টান্ত রঁদার কাছে পৌঁছবার আগেই দেখে নিয়েছিলাম দু-চোখ ভরে, প্রাণভরে। মাইকেল এঞ্জেলোর দুটি অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য রয়েছে সেখানে। এই প্রথম মাইকেল এঞ্জেলোর মুখোমুখি। শরীরে, শিরায়, রক্তে সে এক টান টান উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্তে অবিশ্বাস। সত্যিই আমি এইখানে? সাদা

পাথরের দুটি পূর্ণাবয়ব ক্রীতদাস। একজনের নাম 'ক্যাপটিভ স্লেভ'। অন্য জনের নাম 'ডাইং স্লেভ'। বলিষ্ঠ, পেশীবহুল, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, শিশু অথবা যীশুর মতো নিষ্পাপ মুখমণ্ডলে ভোরের আকাশের মতো স্বচ্ছ আলোর আভা। মনে পড়িয়ে দেয় স্পার্টাকাসকে। বলা বাহুল্য, দুটি মূর্তিই আপাদমস্তক নগ্ন।

৭৪-এ তাসখন্দ থেকে ৫।৬ দিনের জন্যে গিয়েছিলাম আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। নীল ক্যাসপিয়ানের তীরে এক ছিমছাম, প্রাণবন্ত শহর। শহরের মাঝ-বরাবর অনেকখানি এলাকা জুড়ে শহিদ স্মৃতির প্যানথিঅন। ছাদহীন গোলাকার দেয়াল। মাঝখানে একটি মানুষের প্রসারিত হাত। হাতে আগুনের পাত্র। জ্বলছে অহোরাত্র, অনির্বাণ। ২৬ জন কমিশার, যারা বিপ্লব এবং শান্তি এবং শ্রমের মর্যাদার জন্যে উৎসর্গ করেছিল নিজেদের প্রাণ, তাদের আত্মবিসর্জন এখানে সম্মানিত হয়ে উঠেছে শিল্পের মহিমায়। অপূর্ব পরিবেশ, গোল বেদির চারপাশে সবুজ বাগান। শান্ত, নিভৃত, উত্তেজনাহীন। এ যেন সেই জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করা যায় 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্র। অথবা উচ্চকণ্ঠে গাওয়া যায়, 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'।

পাশেই মাঝারি মাপের বেদির উপরে চৌকো পাথরের একটা বড় ফালি। সেখানে ফুটে আছে ঐ ২৬ জন কমিশারের আত্মত্যাগের আরেক শিল্পরূপ। ২৬টি মানুষ, তারা কেউ বাস্তবের ২৬ জন কমিশারের পোশাক বা প্রতিকৃতিকে আঁকড়ে নেই। তারা হয়ে উঠেছে ২৬টি চিরকালের মানুষ। আর সম্ভবত সেই কারণেই নগ্ন।

ভাস্করের নাম মনে পড়ছে না। ও-দেশের একটি সম্মানিত নাম। শুনেছি এই নগ্নতার অপরাধেই হঠাৎ মাঝপথে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল এই অসাধারণ শিল্পকর্মটিকে, তারপর দীর্ঘ বাকবিতণ্ডা, শিল্পী বনাম সরকারি কর্তৃপক্ষ। অবশেষে শিল্পীরই জয়। আবার ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে নেমে পড়লেন কাজে। কিন্তু কাজটা শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুর ছেনি-হাতুড়ির ঘা পড়ল শিল্পীর জীবনে। তবুও আমূল কোনো ক্ষতি ঘটে নি। অসমাপ্ত হয়েও কাজটা সার্থক। রদাঁর 'বুর্জোয়া অ ক্যালে'-র সঙ্গে, প্রকরণগত নয়, ভাবের ঘরে কোথায় যেন মিল। এখানে ২৬ জন বিপ্লবী প্রথমত ২৬ জন মানুষ। তারা যেন ধাপে-ধাপে ব্যক্তিগত আশা-নিরাশাকে ঠেলে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে সমষ্টিগত বীরত্বের চরম উৎকর্ষে।

দুর

সামনে ছড়ানো বাগান, বাগানের খোপে খোপে রোদ্দে-ছায়ায় সাদা পাথরের অসংখ্য মূর্তি। দূর থেকে কাউকে কাউকে মনে হয়, যেন জীবন্ত। যেন কাছে গেলেই মাথা নুইয়ে বলবে, বঁজুর ম'সিয়। বাগানের দিকে পা বাড়ানোর মুখেই বালজাক, রদাঁর আর-এক বিখ্যাত এবং বিতর্কিত সৃষ্টি। অন্যান্য বড় কাজের বেলায় যেমন ঘটেছে, এখানেও সেই ঝাঁঝালো তর্ক, শানানো বিদ্রূপ, চিৎকৃত সমালোচনা এবং কুৎসিত আক্রমণের পুনরাবৃত্তি। মনে পড়ে যায় আনাতোল ফ্রান্সের উক্তি,

—'ইনসাল্ট এ্যাণ্ড আউটরেজ আর দি ওয়েজেস অব জিনিয়াস এ্যাণ্ড রদাঁ আকটার অল ওন্‌লি গট হিজ ফেয়ার শেয়ার।'

বালজাকের আগে হুগো। হুগো নিয়েও অপমানের চূড়ান্ত। একসময়, মনের জ্বালা জুড়োতে না পেরে বলে উঠেছিলেন, এই হুগোর মূর্তিটা—'ডেসট্রয়িং এভরিথিং অব মাই লাইফ।' আর এর পরই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় নারী, বান্ধবী, সখী, সচিব ক্যামেলির কাছে কোনও এক সময় বলেছিলেন, আর পাবলিক কমিশনের কাজে হাত দিচ্ছি না কোনোমতেই। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও একবার ঠিক এই রকমই নিন্দা-অপমান-বিধ্বস্ত মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন্—সাময়িক পত্রের জন্যে আর কলম ধরছি না কোনোদিন। কিন্তু তাঁকে ধরতে হয়েছিল, এবং বেশ বাগিয়েই, শক্ত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী উদ্দীপনায়, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' থেকে ডাক আসার সঙ্গে সঙ্গেই। রদাঁকেও তেমনি জানাতে হল, হ্যাঁ, 'সোসাইটি দ্য জেনস দ্য লেটারস দ্য ফ্রান্স'-এর সভাপতি হিসেবে স্বয়ং জোলা যেদিন অনুরোধ জানালেন, বালজাকের একটা মূর্তি গড়ে দিতে হবে আমাদের সোসাইটির জন্যে। তাঁর আসন্ন জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে প্রতিষ্ঠা করা হবে সেটি। বালজাক-এর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদনের এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন কী করে?

'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লেখক তো তিনিই। হুগো নয়, ফ্লবেয়ার নয়, জোলা নয়, বোদে নয়। 'দা হিউম্যান কমেডি' আমার বাইবেল।' কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনার ঝনঝনানি থেমে যাওয়ার পরই নেমে এল অবসাদের ঝিঁ ঝিঁ সুর। তাঁর কপালকে ঘিরে ফেলল দুশ্চিন্তার সরু মোটা অজস্র রেখা।

'আমি যেমনটা চাইব, তেমনটা কি করতে দেবে ওরা? বালজাক

ঠিক যা, আমি চাইব সেটাকেই ফোটাতে। অস্বাভাবিক রকমের মোটা, ফুলে-ওঠা ভুঁড়ি, ছোটখাট গোঁতকা পা, পুরু ভারি ঠোঁট, বলতে গেলে বেমানান কুৎসিত চেহারার মানুষ। কিন্তু সংবেদনশীলতায় ভরপুর। রয়্যালিস্ট, তবু রিপাবলিকানদের কথা তাঁর চেয়ে গভীর করে আর কে বলেছে? তাঁর মুখখানা যেন প্রাকৃতিক। প্রকাণ্ড মাথা। কোনোদিন কাঁচির ছোঁয়া পায় নি এমন অফুরন্ত চুল জড়িয়ে আছে তাঁর কাঁধ ও গলা। আগুনের শিখার মতো জলজলে চোখ। অমন পুরু, ভারি, চৌকো শরীর অথবা ভিতরের আত্মাটা এমন যেন কত না হালকা, হয়তো বা এই ভারটাই তাঁকে দিয়েছে দুরন্ত গতিবেগ।'

প্রথমে কাগজে কলমে অগুনতি স্কেচ। তারপর কাদার মডেল। একটা-আধটা নয়। ১৭টা। সোসাইটিকে কথা দিয়েছিলেন ১৮-মাস-এর মধ্যে শেষ করে দেবেন কাজটা। কিন্তু রদাঁ কোনোদিনই সময়ের মাপের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারতেন না। তাই ১৮-মাস পরে সোসাইটির সদস্যরা যখন তাঁর স্টুডিও-য় এসে দেখল যে শুধু একটা হাতির শুঁড়ের মতো নগ্ন কাঠামো ছাড়া আর কিছুই এগোয় নি, শুরু হল সংঘাত।

—আপনার বালজাককে দেখে মনে হচ্ছে যেন গাবদা-গোবদা স্যাটার-এর মতো!

স্যাটার হল গ্রীক বনদেবতা। আধখানা মানুষ আর আধখানা পশু।

রদাঁর উত্তর,

—দেখা মাত্রই ভালো লেগে যায়, এমন মূর্তি শিল্প হিসেবে কদাচিৎ সার্থক।

—বালজাককে দেখতে হবে এমন কুৎসিত?

রদাঁ ঘুরে তাকালেন জোলার দিকে।

—আপনি কি জানেন, মানুষের শরীর দেখে কিছু কিছু মানুষ এমন লজ্জা পায় কেন, যেখানে গ্রীকরা এটাকে নিয়েছিল কত সহজভাবে।

—কারণ হয়তো তারা নিজেদের নিয়েই লজ্জিত।

জনৈক সদস্য যখন জোলাকে প্রশ্ন করলেন, এরকম একটা মূর্তি আমাদের সোসাইটির নামে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? রদাঁও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন জোলাকে—আমার কাজটা এখনো শেষ হয় নি। আগে শরীরের কাঠামো। তারপরে হাত দেব পোশাকে। আপনি কি আপনার কোনো আধখানা উপন্যাসের বিচার করতে এই কমিটিকে ডাকবেন? রদাঁ

চেয়েছিলেন আরও একবছর সময়। কিন্তু তার মধ্যেও শেষ হল না। সোসাইটি মিটিং ডেকে প্রস্তাব দিলে, চুক্তিটা নাকচ করে দেওয়া হোক। প্রতিবাদ জানালেন চেয়ারম্যান। কিন্তু পরাজিত হলেন ভোটে। সুতরাং পদত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক সদস্যও পা বাড়ালেন ঐ একই রাস্তায়। দেশের একজন প্রতিভাধর শিল্পী সম্পর্কে এমন অসম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে। সোসাইটি বনাম রদাঁর সংঘর্ষ হয়ে উঠল দৈনিক সংবাদপত্রের মুখরোচক শিরোনাম। রদাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হল, ইনি মনুমেন্টাল কাজের অযোগ্য, অক্ষম। তাই বালজাককে বানিয়েছেন একজন মল্লযোদ্ধা, কিংবা তার চেয়েও বিকৃত, বীভৎস, দানবিক।

বাইরে যখন নিন্দের এমন এলোপাতাড়ি হাওয়া, রদাঁ তখন তাঁর স্টুডিওর নির্জন কোণে তপের আসনে। আর তৈরি করে চলেছেন এক, দুই, তিন, চার, ছয়, দশ, বারো অথবা তার চেয়েও সংখ্যাধিক বালজাকের মডেল। তাঁর অন্বেষা বালজাকের শরীর নয়, সত্তা।

আজীবনই তিনি কর্মতৎপর। আলস্যহীন তাঁর উদ্যম। অপরিসীম তাঁর ধৈর্য। উদ্দীপনায় অস্থির তিনি নিয়ত। 'Il faut toujours 'travailler'-এই তাঁর মন্ত্র, গোটের মতো, চেকভের মতো। 'নিরন্তর কাজ করো', রিলকে যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তখন চোখের সামনে দেখেছেন এই মানুষটির বিশ্রামহীন তৎপরতা। এই দেখেছেন মডেলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এই আঁকছেন রেখাচিত্র। এই নিচ্ছেন নোট, কি ভাবে গড়বেন একেবারে গোড়ায় ছাঁচ, এই ঘাঁটছেন প্লাস্টার, আবার এই তুলে নিলেন শক্ত মুঠোয় ছেনি-হাতুড়ি। শুকনো পাথরকে বদলে দেবেন প্রাণময়তায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা এইভাবে তিনি ঘর্মাক্ত অথচ পরিশ্রান্ত নন। প্রফুল্ল, সজীব, যদিও পরিতৃপ্ত নন তবুও প্রদীপ্ত। রিলকে দেখতেন আর মুগ্ধ হতেন আর তাঁর দিনের মধ্যে সংক্রামিত হতো একটা অসহায় আর্তি। একজন কবিকে কি করুণভাবে নির্ভর করতে হয় প্রেরণার উপর। অনুভূতির্ ভিতরে যতক্ষণ না বাজছে সেই অনুরণনময় ঘণ্টাধ্বনি ততক্ষণ একজন কবি যেন তাঁর নিজের ভাগ্যের কাছে ভিক্ষুক। অথচ একজন ভাস্কর তার হাতের অবিরাম আন্দোলনে অথবা শ্রমে প্রতিমুহূর্তে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

তাঁর এই নিরন্তর শ্রম আর সৃষ্টির উৎসাহ মুগ্ধ করেছিল আর-এক দুর্ধর্ষ বুদ্ধিজীবীকেও। তিনি বার্নার্ড শ। চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন

কী ভাবে ক্রমাগত অদল-বদল হতে হতে রদাঁর হাতে জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর নিজের মুখাবয়ব। অবশেষে মন্তব্য,

'The hand of Rodin worked not as the hand of a sculptor work, but as the work of Elan Vital. The Hand of God is his own hand.'

কিছুদিনের থমথমে স্তব্ধতার পর আবার জেগে উঠল সেই ঘূর্ণি-ঝড়, সোসাইটি বনাম রদাঁর সংঘর্ষ। রদাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা যাঁদের কাছে অসহ্য, তাঁরা তাঁর শক্ত ঘাড়টাকে পায়ের দিকে নুইয়ে দেওয়ার জন্যে দাবি তুললে, ফেরত চাওয়া হোক অগ্রিম হিসেবে দেওয়া টাকা। রদাঁ বললেন, রাজি কিন্তু সেটা সোসাইটির হাতে নয়, সরকারের হাতে। কারণ আমি তো কাজ বন্ধ করি নি, করে যাচ্ছি। সরকার সে প্রস্তাব শুনে জানালে, সোসাইটির টাকা আমরা আইনত গচ্ছিত রাখতে পারি না। তাহলে? অনেক মাথা ঘামিয়ে উপায় বেরলো, টাকাটা জমা থাকবে সোসাইটির আইনজীবীর কাছে। সেই সঙ্গে তুলে নেওয়া হল কাজটা শেষ করার জন্যে সময়ের জোর-জবরদস্তি, রদাঁর উপরই দায়িত্ব চাপানো হল যথাসময়ে কাজটা শেষ করে দেওয়ার।

এই নতুন চুক্তির পরও পার হয়ে গেল ১৮ মাস। সোসাইটির একদল সদস্য এবার দাবি তুললে, মূর্তি আর চাই না। টাকাটা ফেরৎ চাই। আমরা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডানার ঝাপটায় নড়েচড়ে উঠল সংবাদপত্রের পাতাগুলো। রদাঁর পক্ষে এবং বিপক্ষে বেরোতে লাগল অবিরল মন্তব্য। আর ঠিক এই সময়েই সমালোচক অকটেভ মিরবু 'লে জুর্নল'-এর পাতায় ফাঁস করে দিলেন কর্তৃপক্ষের আসল মতলব।

'ওঁরা আসলে চান কাজটা মিঃ মারকুতকে দিয়ে করাতে। এইটের জন্যেই থেকে থেকে খবরের কাগজে রদাঁর বিরুদ্ধে এমন কুৎসার অভিযান'। আনাতোল মারকুত দা ভাসেলো সোসাইটির একজন সদস্য। আগে বালজাকের একটা মূর্তিও গড়েছেন, বই লিখলেন একটা। নাম 'হিস্ট্রি অব দ্য পোর্ট্রেট ইন ফ্রান্স।' খবরের কাগজ ছাড়াও সরকারি মহলে তাঁর খুবই দহরম-মহরম। খুঁটির জোরে রদাঁর হাত থেকে কাজটা ছিনিয়ে নেওয়া যায় কিনা, তারই তৎপরতা। শেষ পর্যন্ত বালজাক-এর প্লাস্টার-ছাঁচ শেষ হলো সাত বছরের মাথায়। জনসাধারণের জন্যে প্রদর্শনী করা হলো **Salon de la Société Nationale des Beux-Arts**-এ, সঙ্গে

সঙ্গে সারা প্যারিস ফেটে পড়ল নিন্দায়, কুৎসিৎ বিদ্রূপে, আক্রোশে। কোনো শিল্পসামগ্রীকে নিয়ে এমন তুমুল অগ্নিকাণ্ড আগে কখনো ঘটে নি। জনসাধারণকে প্ররোচিত করা হলো, এখুনি কুড়োল দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক এই হত-কুচ্ছিৎ মূর্তিটাকে, যা শুধু প্লাস্টারের পিণ্ড ছাড়া আর-কিছু নয়। সোসাইটি বিবৃতি দিয়ে জানালে, এই মূর্তিকে বালজাক বলে স্বীকার করতে আমরা শুধু লজ্জিত নই, এরকম জঘন্য সৃষ্টির জন্যে আমরা বাধ্য হচ্ছি প্রতিবাদ জানাতে।

রদাঁর অনুরাগীরা এমন বিষিয়ে-ওঠা পরিবেশে চুপ করে থাকতে পারলেন না আর। তাঁরাও ছড়িয়ে দিলেন তাঁদের প্রতিবাদ। তাঁরাও ধিক্কারসহ জানালেন, রদাঁর প্রতি এই অপমান গোটা ফ্রান্সের সমস্ত ভাস্করের প্রতি অপমান। অসংখ্য শিল্পী, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, ভাস্কর এবং রাজনীতি-বিদ সাহিত্যিক স্বাক্ষর দিলেন এই প্রতিবাদ-পত্রে। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো জনগণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে এই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হবে কোনো উন্মুক্ত পার্কে। আপত্তি জানালেন স্বয়ং রদাঁ।

—না। এখন থেকে এটা একমাত্র আমারই ব্যক্তিগত অধিকার।

এরপর রদাঁর বদলে নতুন করে সোসাইটি মূর্তিটা বানাতে দিলে ফ্লাগুয়ের-কে। মৃত্যুর সময় সেই ফ্লাগুয়ের স্বীকার করেছিলেন,

—ভুল করেছি আমিই। চিরকালই ভুল করে এলাম। তিনিই সঠিক।

সাত

দোতলায় আরও অনেক বালজাক! কোনোটা মুখাবয়ব। কোনোটা পূর্ণাঙ্গ আকৃতি। এসব হল প্রাথমিক পর্বের খসড়া। যেমন আছে হুগোর প্রতিকৃতিরও প্রাথমিক খসড়া! যা পছন্দ হয় নি কর্তৃপক্ষের।

দোতলায় উঠে প্রথম ছুটে গিয়েছিলাম সেই হাত দুটির কাছে যার প্রিন্ট দেখেছি অজস্র এবং 'ক্যাথিড্রেল' নামে যে-কাজ বিশ্ববিদিত। রাজহংসীর গ্রীবার মতো দুটি বাঁকানো হাত মিলেমিশে উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

রদাঁর ৪০০ বছর আগে পাথরে নয়, কাগজে-কলমে এমনি 'প্রার্থনার হাত' রচনা করেছিলেন জার্মানীর ড্যুরার। সেও এক অবিস্মরণীয় হাত। তার সর্বাঙ্গে গাছের ডালপালা, ফাটা বল্কল, শিকড়-বাকড়-এর দাগ। ভ্যান গগের,

আলু চাষীর হাতের মতো, জীবনের দুঃখ-দুর্দশার অভিজ্ঞ। ভ্যুয়ারের হাত গন্ত। রদাঁর হাত কবিতা।

হাতের উপর কবি, ভাস্কর, চিত্রকর, সাহিত্যিক সকলেরই যেন কেমন এক মমতাময় টান। শেষের কবিতায় অমিত লাবণ্যকে বলেছিল

'সবচেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে কথা কইছে। কোন কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।'

জীবনানন্দে পাচ্ছি

'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।'

এলুয়ার লেখেন

'আমাকে ঘিরে থাকে তোমার বাহুর পথরেখা
যেন এক বিজয় চিহ্নের মশাল।'

আরাগঁ ঐ একই হাতের বন্দনায়

'হেমন্তরূপ মখমল হাত তার
সে যে এক গান অক্লান্ত সে গাওয়া
সে গান দেয় যে দোঁহার প্রেমে দোহার।'

চতুরঙ্গে শচীশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ কৃপণের মতো বেছে বেছে ব্যয় করলেন মাত্র কয়েকটি মূল্যবান বাক্য,

'শচীশকে দেখিলে মনে হয় একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা।'

তাঁর গানে কত যে হাতের কথা, তার হদিশ নেই।

আর এই কারণেই টলস্টয়কে গড়তে গিয়ে গর্কী যখন প্রথমেই লিখে বসলেন হাতের কথা, সেটা আমাদের নতুন করে বিস্মিত করে না।

'হাত দুটি তাঁর অপূর্ব, কুৎসিত। শিরা-উপশিরায় জটিলতায় বিধৃত কিন্তু অসাধারণ, অভিব্যক্তিময়, সৃজনশক্তিতে ভরপুর। সম্ভবত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির হাত ছিল এই রকম। পৃথিবীর যে কোনো কাজ করা যায় এই রকম হাত দিয়ে।'

রদাঁ বুঝি মানুষের হাতকে নিয়ে রচনা করতে চেয়েছিলেন মোৎসার্ট-বেঠোফেনের মতো উত্থান-পতনে উর্বর সঙ্গীতের এক সৌরলোক। যখন

হাত দিয়েছেন 'বুর্জোয়া দা ক্যালে'-র, তখন সকলের আগে হাত লাগিয়েছেন হাতে।

'হি স্পেণ্ট মোস্ট অব হিজ টাইম অব দি হ্যাণ্ডস। দেয়ার আর হ্যাণ্ডস দ্যাট প্রে, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডস দ্যাট উইপ। হ্যাণ্ডস দ্যাট কোশ্চেন, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডস দ্যাট গিভ ইন। হ্যাণ্ডস দ্যাট ব্লেস, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ড দ্যাট ব্লাসফেমি। ভায়েলেট হ্যাণ্ডস এ্যাণ্ড টেণ্ডার হ্যাণ্ডস। ক্লীনচ্‌ড হ্যাণ্ডস এ্যাণ্ড রিজাইনড হ্যাণ্ড। আইজ এ্যাণ্ড লিপস্‌ মে ডিসিভ। হ্যাণ্ডস ক্যাননট লাই। হি সেপ্‌ড ইনিউমারেবল হ্যাণ্ডস এক্‌সপ্রেসিং দা হোল গ্যামোট অব হিউম্যান সাফারিং এ্যাণ্ড এ্যাংসাইটি।'

দোতলার হাত বলতে শুধু একটা 'ক্যাথিড্রেল' নয়। আরও অজস্র। দুটি ঊর্ধমুখী হাতের মাঝখানে একটা ছোট্ট কৌটো যেন। নাম সিক্রেট। এইসব ছোটখাটো হাতের পাশেই 'ঈশ্বরের হাত'। ছড়ানো হাতের পাঁচ আঙুল আর তালুর মধ্যে ঈশ্বর ধরে রেখেছেন দুটি নরনারীকে। নরনারী দুটি যেন জলের ভিতরে মাছের মতো চঞ্চল, আঁকাবাঁকা, পরস্পরে গাঁথা। দেখতে দেখতে প্রশ্ন হানা দেয়, এরা কি কোনদিন অতিক্রম করে যেতে পারবে ঈশ্বরের হাতে সীমাবদ্ধতাকে?

ছেনির আঁচড় লাগা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই। তার মাঝখানে কোথাও পাড়াগাঁয়ে শালুকফুলের মতো ফুটে উঠেছে একটুখানি মুখ, চিবুক যেন জলের তলায়। নাম—চিন্তা। এমনই অসমাপ্ত অথচ পরিপূর্ণ কাজ অজস্র। মোৎসার্ট-এর দিকে তাকালে মনে হয় যেন আসন্ন-সম্ভব কোনো সোনালি তন্তুজালের ভিতরে জড়িয়ে আছেন তিনি। একটু পরেই মুখের উপর থেকে সরে যাবে স্বপ্নের কুয়াশা। জেগে উঠবেন উচ্ছ্বসিত স্পন্দনে নবীন কোনো স্বরলিপির গুঞ্জরনে। ওদিকে 'চুম্বন'। এদিকে 'বেদনা'। ওদিকে চুল এলিয়ে, পিঠে শিরদাঁড়াসহ উপুড় হওয়া নারী 'দানেদ'। যেন আছড়ে পড়েছে জীবনের শক্ত পাথরে। সেও অপরূপা, কিছুতেই মনে হয় না পাথর দেখছি। চতুর্দিকে যৌবন, ভালবাসার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, জীবন, জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, মহিমা, সৌন্দর্য, ব্যর্থতা, উল্লাস, শান্তি, জীবনের জয়-পরাজয় এবং জীবনের অন্ধকারকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে আসা সোনালি আভায় আলো।

কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গ

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পল পটের তথাকথিত "বিশুদ্ধ" বা "নির্ভেজাল" সমাজতন্ত্রের মডেলের মূল ভিত্তি ছিল দুটি : উগ্র, খ্মের জাতীয়তাবাদ যার পরিণতি হল অন্ধ ভিয়েতনাম বিদ্বেষ এবং কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ। এই জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বলা হয় যে কাম্পুচিয়া যে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করবে তা হবে সমস্ত দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর, অর্থাৎ একদিকে তা হবে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের ধ্যানধারণার কলঙ্কময় ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; অপরদিকে নতুন কাম্পুচিয়ার ভিত্তি হবে তার একান্ত নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা। আপাতদৃষ্টিতে এই স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি উঠবে না। বস্তুতপক্ষে একেবারে গোড়ার দিকে যখন পল পট সরকার লন্ নল্ শাসনমুক্ত নতুন কাম্পুচিয়ার নেতৃত্বে আসলেন, তখন এই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো আপত্তিও ওঠে নি। কিন্তু এই স্বাদেশিকতাই এর অতি ভয়ংকর বিকৃত রূপ নিতে শুরু করল যখন পল পট নেতৃত্ব কাম্পুচীয় সমাজতন্ত্র নির্মাণের নামে এই মতাদর্শকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী এক সংকীর্ণ, উগ্র খ্মের জাতীয়তাবাদে পরিণত করলেন। এক কথায়, স্বনির্ভরতার স্লোগান পর্যবসিত হতে শুরু করল সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই বিরোধিতায়, আর তারই পরিণতি হল তীব্র ভিয়েতনাম বিরোধিতা। এর ফল দাঁড়াল এই যে গোটা কাম্পুচিয়াকে এই নতুন নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমেই সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সুস্থ মতাদর্শকে বর্জন করে স্বনির্ভরতার নামে এক অন্ধ, উগ্র খ্মের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। এর পরিণতিও হয়ে দাঁড়াল মারাত্মক। একদিকে কাম্পুচিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল স্বনির্ভরতার নামে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী উগ্র জাতিদম্ভ ও জাতিবিদ্বেষ; দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যাঁরাই প্রতিবাদ জানালেন তাঁদেরকে কাম্পুচিয়ার জনগণের শত্রু ভিয়েতনামের চর

মনে করা হতে লাগল ও এঁদের বিরুদ্ধে শুরু হল চূড়ান্ত দমন-পীড়ন ; আর তারই পরিণতি পরবর্তীকালে পল পট নেতৃত্বে ভাঙন ও অবশেষে তাঁর পতন। তৃতীয়ত, এই পেটি বুর্জোয়া সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম নিল ঔপনিবেশিক শাসনে ও লন্ নল সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত কাম্পুচিয়াতে রাতারাতি সমাজতন্ত্র কায়েম করার এক রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস।

স্বনির্ভরতার ও সমাজতান্ত্রিক জগত থেকে (গোড়ার দিকে চীন সম্পর্কেও এই নতুন নেতৃত্ব একই মনোভাব পোষণ করতেন, যদিও পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত চীনের সাথে তাঁদের গভীর সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়) বিচ্ছিন্নতার নামে কাম্পুচীয় মডেলের সাচ্চা সমাজতন্ত্র নির্মাণপর্বে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে প্রথম থেকেই, বলা যায়, অস্বীকার করা হল। কাম্পুচিয়ার মতো সমস্যাজর্জরিত ও পশ্চাদপদ একটি দেশে অন্তত কৃষির উন্নতির জন্যও প্রয়োজন ছিল শিল্পোৎপাদন এবং ঐতিহাসিক কারণেই উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত দেশগুলির পক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয় ; কিন্তু তথাকথিত স্বয়ংনির্ভরতার স্লোগান দিয়ে কাম্পুচিয়ার নতুন নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই এই সম্ভাবনা বাতিল করে দিলেন ও তার ফল দাঁড়াল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ মুলতুবি রেখে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে অস্বীকার করে এক ধরনের পেটি বুর্জোয়া কৃষক সাম্যবাদ কায়েম করার উদ্ভট ও হাস্যকর প্রয়াস, আর মূল্য দিতে হল কাম্পুচিয়ার জনগণকেই। একটা কথা এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভিয়েতনাম বা পরবর্তীকালে এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া বা দক্ষিণ ইয়েমেনের মতো দেশগুলির প্রায় একই ধরনের সমস্যা সমাধানের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে কাম্পুচিয়ার নতুন নেতৃত্ব কোনো কাজেই লাগাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কৃষক-কেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার এই উল্লম্ফন পদ্ধতি অচিরেই কাম্পুচিয়ার গোটা সমাজ ও অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি করল আর এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে পল পট নেতৃত্ব যে পথ অনুসরণ করলেন তা তাঁদেরকে আরও এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের পথে নিয়ে গেল। শোষণে ও অত্যাচারে কাম্পুচিয়ার অর্থনীতির মেরুদণ্ড প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে গিয়েছিল। তাই অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল উৎপাদন বাড়ানো ; কিন্তু শিল্পোৎপাদনের পথে না যাওয়ার ফলে পল পট নেতৃত্বের সামনে একটি পথই খোলা ছিল ; তা হল কৃষিখাতে

যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা ; কিন্তু যেহেতু শিল্পোৎপাদনকে বাদ দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব নয়, তাই এই সমস্যা মেটাতে গোটা কাম্পুচিয়ার জনসাধারণকে বলা হল শহর ত্যাগ করে গ্রামে চলে আসতে এবং সেখানে কমিউন-ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে ; একেবারে গোড়ার দিকে এই জাতীয় আহ্বান অনেকের কাছেই হয়ত বা যথেষ্ট রোম্যান্টিক বলে মনে হয়েছিল ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে এর পরিণতিস্বরূপ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে অর্থনীতিকে বাঁচাবার জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হতে হচ্ছে প্রায় প্রতিটি নাগরিককে, তখনই পল পটের সমাজতন্ত্র নির্মাণের মডেলটির অন্তঃসারশূণ্যতা ধীরে ধীরে প্রকট হতে শুরু করল। এই চূড়ান্ত হঠকারিতার পরিণতিও হল মারাত্মক। উৎপাদন বৃদ্ধির নামে কমিউনগুলিকে কতকগুলি যান্ত্রিক কেন্দ্রে পরিণত করা হল, যেখানে পারিবারিক বন্ধন, মূল্যবোধ প্রভৃতি হল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। শহরগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ায় ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল ; শিক্ষাব্যবস্থারও একই হাল ; তার উপরে মুদ্রাব্যবস্থা বাতিল করে বিনিময় ব্যবস্থা চালু করে পল পট নেতৃত্ব দেশের সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুললেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে এই ধরনের একটি মডেলের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার বা জনসাধারণের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কোনো মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক শিক্ষা বা প্রচারের কথা এই নেতৃত্ব একবারও ভাবলেন না। ফলে গোটা ব্যাপারটা অচিরেই হয়ে দাঁড়াল এক আতঙ্কিত, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, যার প্রাণকেন্দ্র হল 'আংকর' (অর্থাৎ সর্বোচ্চ কর্তৃমণ্ডলী, যাকে স্পষ্ট করে না বললেও কাম্পুচিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতার কর্ণধারদের সাথে এক করে দেখতে অসুবিধে হয় না) ; এই 'আংকরে'র নির্দেশ পালন করার জন্য নিযুক্ত করা হল অত্যুৎসাহী তরুণের দল, যারা চীনের তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর পথ ধরে সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই মহাযজ্ঞে নিজেদেরকে নিয়োজিত করল ; প্রকৃতপক্ষে চীনের 'রেড গার্ড'দের মতো এঁরাই হয়ে দাঁড়াল কাম্পুচিয়ার ভাগ্য বিধাতা আর এঁদের নির্দেশ অমান্য করার অর্থ দাঁড়াল নৃশংসভাবে মৃত্যুকে বরণ করা। আর যতই দিন যেতে লাগল, তত বেশি ভয়ংকর আকার ধারণ করল এই হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড। তার কারণ, এই অবাস্তব ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে যাঁরাই অপারগ হলেন বা যাঁরাই সামান্যতম প্রতিবাদ করতে প্রয়াসী

হলেন, তাঁদেরকে আখ্যা দেওয়া হল কাম্পুচিয়ার জনগণের শত্রু অথবা ভিয়েতনামের চর, যাঁরা উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে বা উৎপাদননীতির সমালোচনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভাঙন ধরাচ্ছেন। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই আজব ব্যবস্থায় বিরোধী কোন ব্যক্তিকেই রেহাই দেওয়া হল না; আর এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল কাম্পুচিয়া থেকে দেশত্যাগের হিড়িক; ফলে অর্থনীতিতে সংকট আরও ঘনীভূত হতে শুরু করল; এই নীতির প্রতিবাদে পল পট নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও কাম্পুচিয়ার পার্টির অভ্যন্তরেও তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিল; উপায়ান্তর না দেখে পল পট নেতৃত্ব একদিকে শুরু করল পাইকারি গণহত্যা আর অপরদিকে জাগিয়ে তুলতে শুরু করল তীব্র ভিয়েতনামবিরোধী জেহাদ। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হতে পারল না। কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যখন পল পট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তুলল, তখন দেখা গেল যে পল পটের অনুগামী কিছু সমর্থক ছাড়া আর প্রায় গোটা দেশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হেং সামরিনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে; আর তাই পল পটের নেতৃত্বও গণসমর্থনের অভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। আর হেং সামরিনের নেতৃত্বে নতুন সরকারকেও তাই পল পটের অনুগামী ভিন্ন আর অন্য কোনো শক্তিই বাধা দানের চেষ্টা করে নি। কাম্পুচিয়ার শাসকবৃন্দের এই সর্বনাশানীতি গোটা কাম্পুচিয়াকে যে কি এক ভয়ংকর ধ্বংস ও অরাজকতার পথে নিয়ে চলেছিল, তার অতি করুণ, মর্মন্তুদ চিত্র পরবর্তীকালে অজস্র সাংবাদিক রিপোর্টে ছাপ আছে,[১৩] যদিও কোনো কোনো ব্যক্তি এই গণহত্যার বিষয়টিকে স্বাভাবিক মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু বা অতিরঞ্জিত বলে পল পট নেতৃত্বের প্রতি তাদের নির্লজ্জ স্তাবকতা প্রমাণ করার হাস্যকর প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন।[১৪] তথ্যাভিজ্ঞ মহলের রিপোর্টে জানা যায় যে কাম্পুচিয়ার নেতৃবৃন্দের এমন যে পরম সুহৃদ্ চীন তার নেতৃত্বেও শেষ পর্যন্ত পল পটের এই উদ্ভট, অবাস্তব নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে ও জনরোষ এবং গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন এই সরকারকে সম্ভাব্য ও প্রায় আবশ্যম্ভাবী পতনের হাত থেকে উদ্ধারের ব্যাপারেও কোন আশ্বাসদানে বিরত থাকে,[১৫] যদিও এ কথাও অবশ্যই ঠিক যে শেষ দিন পর্যন্তও কাম্পুচিয়াতে চৈনিক সমরসম্ভারের যোগান অব্যাহত ছিল।

উপসংহারে কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সাফল্যের পিছনে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা এবং কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর প্রবেশের প্রশ্নটি আলোচনা করা প্রয়োজন। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে কাম্পুচিয়ার মাটিতে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর এই উপস্থিতির প্রশ্নটি আজও পর্যন্ত কিন্তু হ্যানয় সরকার কখনও অস্বীকার করে নি। চীন যেমন ভিয়েতনামকে আক্রমণ করে তার অপকীর্তি ঢাকবার জন্য ভিয়েতনামকেই আক্রমণকারী আখ্যা দিল, ভিয়েতনাম কিন্তু একবারের জন্যও তার সেনাবাহিনী পাঠানর প্রশ্নটিকে বা কাম্পুচিয়ার মুক্তি ফ্রন্টের সাথে ভিয়েতনামের যোগসাজসের বিষয়টিকে ধামা চাপা দিয়ে তথ্যবিকৃতি বা ইতিহাসবিকৃতির পথে যায় নি। এর প্রধান কারণ হলো যে ভিয়েতনামের তরফ থেকে এই সক্রিয় সাহায্যদানের প্রশ্নটি ছিল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের সুস্থ নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে নীতি ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় অনুসৃত হচ্ছে অ্যাঙ্গোলায়, ইথিওপিয়ায়, আফগানিস্থানে বা দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামে। যাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব বা তথ্য কোনোটিতেই আগ্রহী নন, তাঁরা ঘটনাটিকে ভিয়েতনামের কাম্পুচিয়া আক্রমণ ভেবে বসবেন; আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত চতুর, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বলবেন সে "জনপ্রিয়" পলপট সরকারকে উচ্ছেদের জন্য ও কাম্পুচিয়াকে নিজেদের দখলে আনার জন্য ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর মদতে হেং সামরিনের পুতুল সরকার বর্তমানে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অর্থাৎ ভিয়েতনাম মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তার পছন্দমত মডেলের বিপ্লব রপ্তানী করার হঠকারিতার নীতিতে সে বিশ্বাসী; আর এই যুক্তিতে ভিয়েতনামকে খুব সহজেই পররাজ্যলোভী, আগ্রাসী প্রভৃতি মুখরোচক বিশেষণে বিভূষিত করতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার। প্রথমত, দিনের পর দিন তীব্র ভিয়েতনাম বিদ্বেষকে মদত দিয়ে কাম্পুচিয়াতে বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের উপরে এবং ভিয়েতনামী চর সন্দেহে কাম্পুচিয়ার জনসাধারণের একটা যথেষ্ট বড় অংশের উপরে পল পট সরকার যে দমনপীড়ন শুরু করেছিলেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় ভিয়েতনাম ও পার্শ্ববর্তী থাইল্যাণ্ডে স্রোতের মতো এই নির্যাতিত শরণার্থীদের প্রবেশ যাঁদের মধ্যে, বলা বাহুল্য, অনেকেই কিন্তু ছিলেন

কাম্পুচীয়। ভিয়েতনাম যখন তার যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় কাম্পুচীয় নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে এই ধরনের নীতি অনুসৃত হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা ভিয়েতনামের উপর এক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ; সেই সাথে চলে যথেচ্ছভাবে ভিয়েতনামের সীমানা লঙ্ঘন ও ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যত্রতত্র অত্যাচার চালান। কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সরকারের পক্ষেই এই ধরনের ঘটনাবলীকে মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে কাম্পুচিয়ার অভ্যন্তরে ভিয়েতনামের পাল্টা অভিযান কিন্তু তখনই শুরু হয় যখন ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দের কাছে এটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পল পট সরকার কাম্পুচীয় জনগণের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ও হেং সামরিনের নেতৃত্বে কাম্পুচীয় জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের পিছনে ব্যাপক গণ-সমর্থন আছে, অর্থাৎ আইনত স্বীকৃত না হলেও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট যে কাম্পুচীয় জনগণের এক ব্যাপক ও বৃহৎ অংশের প্রতিনিধি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই হেং সামরিন নেতৃত্ব ও ভিয়েতনামী বাহিনী পলপটের প্রায় ভেঙে পড়া সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযান চালায়। হেং সামরিন নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ভিয়েতনাম-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ বর্জন করা এবং এই সুস্থ চিন্তার পিছনে যে ব্যাপক গণসমর্থন ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিয়েতনামবাহিনী যখন নম্ পেন্-এ প্রবেশ করে, তখন বা তার পরে আজও পর্যন্ত সেখানে ভিয়েতনামের কয়েক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন আছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের গণবিক্ষোভ দেখা দেয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রতিরোধবাহিনী-গুলির প্রত্যক্ষ সহায়তায় যেমন সোভিয়েত লাল ফৌজ সমাজতন্ত্রের বিজয়-কেতন ওড়াতে সাহায্য করে এক পবিত্র আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছিল, এ ক্ষেত্রেও অনেকাংশেই ভিয়েতনামী ফৌজের ভূমিকা ছিল অনেকটাই সেইরকম। পল পট নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতিকে যে ভগ্নস্তূপে পরিণত করে-ছিলেন, তা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধারকল্পে আজ কাম্পুচিয়াতে সে দেশের শ্রমিক-কৃষকের সাথে হাত মিলিয়েছেন দক্ষ ভিয়েতনামী কুশলীরা।[১০] পলপট নেতৃত্ব অবসানের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন একটি খবরও পাওয়া যায় নি যা থেকে বলা যায় যে হেং সামরিনের পুতুল সর-কারের বিরুদ্ধে কাম্পুচিয়াতে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে বা ভিয়েতনামী বাহিনীর উপস্থিতিতে কাম্পুচিয়ার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। বরং ঠিক উল্টোটাই

সেখানে ঘটছে; ভিয়েতনামের ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদেশগুলির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পলপটের অবাস্তব কাণ্ডজ্ঞানহীন নীতিকে বিসর্জন দিয়ে সেখানে আজ প্রকৃত সমাজতন্ত্র গঠন করার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে চলেছে। অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘেও একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ক্ষমতাচ্যুত পলপট ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা হেং সামরিনের সরকারকে উৎখাত করার জন্য যত কদর্য অপচেষ্টাই চালাক না কেন, সমগ্র কাম্পুচিয়াতে আজ নতুন সরকারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে কোনোভাবেই ভিয়েতনাম পরিচালিত তাঁবেদার সরকার বলে আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের উগ্রভাবপন্থী মহলের বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা প্রতিমুহূর্তেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুলি আওড়ান, ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর কাম্পুচিয়াতে প্রবেশকে সরাসরি বোম্বেটেগিরি বা দস্যুতা বলে আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন; আর তাই কাম্পুচিয়ার নতুন সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নেও তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের চিন্তার শরিক হতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কাম্পুচিয়ার নতুন সরকার (যেখানে ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী এখনও মোতায়েন আছে) সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই এঁরা যুগপৎ আতঙ্কিত ও মর্মাহত হবেন।

কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামী বাহিনীর উপস্থিতির প্রশ্নটি আরও একটি দিক থেকে আলোচনা করা প্রয়োজন। পলপট নেতৃত্ব মুখে স্বনির্ভরতার নাম করলেও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তার ঘনিষ্ঠতম দোসর ছিল চীন। প্রত্যক্ষ চৈনিক সমর্থন ও ব্যাপক চীনা সমরসম্ভার ও চীনা সমরবিশারদদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করেই পলপট সরকার দীর্ঘদিন ধরে একদিকে ভিয়েতনাম ও অপরদিকে পলপটবিরোধী প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁদের হিসেবের ভুল ধরা পড়ে যখন পলপটের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। এর ফলে পল পটের মতো চীনের পার্টির নেতৃত্বেও তেং শিয়াও পিং গোষ্ঠী আতঙ্কগ্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে পল পট সরকারের উচ্ছেদের পরমুহূর্তেই ভিয়েতনামের উপর বর্বর হানাদারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে; চীন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ হল কাম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামীবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ভিয়েতনামের উপরে চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া মৈত্রী অটুটই রইল; বরং

চীনের নির্লজ্জ আক্রমণে কাম্পুচিয়ার মানুষের কাছে আরও একবার প্রমাণিত হল যে কাম্পুচিয়ার অগণিত খেটেখাওয়া মানুষের স্বার্থে, কাম্পুচিয়াতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে, চীনের যোগসাজশে পল পট নেতৃত্বের পুনরাগমনকে প্রতিহত করার স্বার্থেই কাম্পুচিয়ার মাটিতে ভিয়েতনামের অস্তের বাহিনীর উপস্থিতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে ভিয়েতনামবিদ্বেষ ও উগ্র খ্মেরের জাতিদম্ভকে পরিহার করে কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রামী মৈত্রীকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করার। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সরকার যদি মনে করে থাকে শুধুমাত্র চীনা সমরবিশারদদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে যেন তেন প্রকারেণ তার টিঁকে থাকার অধিকার আছে, তাহলে কাম্পুচিয়ার ব্যাপক গণসমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট যদি ভিয়েতনামী বাহিনীর সহযোগিতায় তথাকথিত 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রের' ধ্বজাধারী এই সরকারকে উচ্ছেদ করার ব্রত নেয়, তবে তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও বোধহয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবার মতো একটা ভয়ঙ্কর অন্যায় ব্যাপার হয়ে যায় নি বা তাতে ভিয়েতনামের সংগ্রামী ঐতিহ্যও ভূলুণ্ঠিত হয় নি। বরং, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাথে মৈত্রীতে বদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম লাওস ও কাম্পুচিয়াসহ গোটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলির আজ সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল।

ভিয়েতনামের কাম্পুচিয়া প্রশ্নে যাঁরা এখনও শাপশাপান্ত করছেন, তাঁরা কিন্তু উটপাখীর মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে কয়েকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে একেবারেই নারাজ। শেষদিন পর্যন্ত পল পট সরকারকে চীনা সমরযন্ত্র যে প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে গেছে ও যার সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই নেতৃত্ব গোটা কাম্পুচিয়াতে এক অমানুষিক ও জঘন্য হত্যালীলা চালিয়েছিল,[১৭] সে সম্পর্কে এঁরা একটি কথাও বলতে রাজি নন। তবে তার চেয়েও কলঙ্কজনক ঘটনা হলো যে ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া মৈত্রী ধ্বংস করার জন্য জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পল পটের তথাকথিত গেরিলাবাহিনীকে চীন আজ মদত দিচ্ছে থাইল্যাণ্ডে আশ্রিত সি. আই. এর প্রত্যক্ষ সমর্থনপুষ্ট খ্মের সেরেই বাহিনীর সাথে হাত মেলাবার জন্য, যারা একসময়ে ছিল লন্ নলের পক্ষাশ্রয়ী পেশাদার ঘাতকবাহিনী; শুধু তাই নয়, গোটা ভিয়েতনাম ও লাওসে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাবার জন্য চীন আজ প্রত্যক্ষ সমর্থন জানাচ্ছে সি. আই. এর অর্থপুষ্ট তথাকথিত বিদ্রোহী মেও পার্বত্য উপজাতিদের;

উদ্দেশ্য এঁদের সহায়তায় ভিয়েতনাম ও লাওসে এক অস্থিতিকর অবস্থা সৃষ্টি করা। চীনা নেতৃত্বের সাথে সি. আই. এর এই প্রত্যক্ষ যোগসাজসের কথা স্বয়ং নরোদম সিহানুকই পৃথিবীকে জানিয়েছেন।[১৮] যাঁরা এ্যাঙ্গোলাতে সি. আই. এ সমর্থিত এফ. এন. এল. এর সাথে বা আফগানিস্থান, মোজাম্বিক, চিলি, ইথিওপিয়াতে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী দল ও শক্তিগুলির সাথে চীনা নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা এতদিন অস্বীকার করে এসেছেন, তাঁদেরকে অনুরোধ যেন আরও একবার কাম্পুচিয়ার ঘটনা-বলীর দিকে তাকিয়ে গোটা বিষয়টা ভেবে দেখে চীনের খাঁটি বিপ্লবী নেতৃত্বের মূল্যায়ন করেন।

কাম্পুচিয়ার মাটিতে আজ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে চলেছে। ভিয়েতনাম ও লাওসের সাথে মৈত্রী বন্ধনে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অকৃত্রিম সহযোগিতায় আফগানিস্থান, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়ার মতো বিপ্লবী সরকারগুলির দৃঢ় সমর্থনে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নতুন কাম্পুচিয়ার অভ্যুদয় আজ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতির মুখে পল পট নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে; যাঁরা এখনও এই নেতৃত্বের পুনরুত্থানের অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন তাঁদের প্রতি দু-এক ফোঁটা করুণাবর্ষণ ছাড়া সত্যিই আর কিছু করার নেই।

১৩. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য Harish Chandola, 'Eyewitness at Phnom Penh' *Mainstream*, ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃঃ ১১-১৩ এবং Wieslaw Gornicki, 'Genocide in Kampuchea: Prelude to aggression on Vietnam', *New wave*, ৩ জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৮-১০ / ; সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটের প্রতিবেদনের জন্য দেখুন, *The Guardian*, ২০ মে, ১৯৭৯, পৃঃ ৮।

১৪. David Boggett, 'Democratic Kampuchea and Human Rights', *Economic and Political Weekly*, ৫ মে, ১৯৭৯, পৃঃ ৮১৩-৮২১।

১৫. এই রিপোর্টের জন্য দেখুন *FEER*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃঃ ১০-১২, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৯, পৃঃ ১০।

১৬. এই বিষয়ে নম্ পেন্ থেকে প্রেরিত প্রখ্যাত সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটের রিপোর্ট দেখুন, *The Guardian*, ৩ জুন, ১৯৭৯, পৃঃ ৯।

১৭. চীন নেতৃত্ব পল পট নেতৃত্বকে এই গণহত্যা সংগঠিত করতে ও ভিয়েতনাম বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলতে কি ধরনের কদর্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তার জন্য দেখুন *Kampuchea Dossier II*, পৃঃ ৭৮-১০২, ১১৩-১২২।

১৮. *Mainstream*, ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃঃ ৩১-৩২, এবং *FEER*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ৮-১১।

জনস্রোত, জলস্রোত

আফসার আমেদ

সেই সব জন্মাবধি অবোধের সূত্র নিয়ে তাদের ওপর পুতুল নাচায়। সে নাচছে। বেঁকেচুরে যাচ্ছে। আরো অনেকে নাচছে বাঁকছে চুরছে। সে তার জন্মাবধি অবোধের কাছে ঘুরে ফিরে আয়নায় প্রতিবিম্বিত। বউটা প্রতিবিম্বিত। সে। এবং কচিটা আঙুল চুষে প্রথম সামাল দিচ্ছে। সঞ্চয় করছে উত্তরকালের জন্য অভিজ্ঞান। সে, কচির বাবা, নুরুর সাবেক সহ্যশক্তির পরীক্ষা। অবাক অমিত ক্রীড়া-নৈপুণ্য। তো বাঁকাটারা হোচ্ছে নেহারে পেটানো লৌহযন্ত্রণায়। ঘুরে-ফিরে একই বৃত্তে আবর্তিত। টানাপোড়েনের যন্ত্রবোধ, সেই সব সাদামাঠা সুতিশিল্প, কর্মকৌশলে বিঁধে যাচ্ছে, বন্দী হচ্ছে তৃপ্ততা উপভোগ সচ্ছলতা। নুরুর ভাঁজকাগজ মনন, আশা-ভরসা, বাস্তব প্রতিকূল অবস্থায় অদ্ভুত ভগ্নাংশ। নুরু ভাঙছে। বউ ভাঙছে। কচি ভাঙছে। অনেকে ভাঙছে। হৃদয় ভাঙছে। মন ভাঙছে। বাড়ি ভাঙছে। প্রাচীনতা ভাঙছে। প্রাচুর্য ভাঙছে। সেই সব ভাঙনের সামনে উঁচুতে দাঁড়িয়ে নুরু এবং বউ-ছেলে, এবং আরো নুরু বউ-ছেলে দুর্যোগে ক্ষত-বিক্ষত। বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড় এল। কল্পিত ঈশ্বরবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া চলছে। নুরু দেখছে প্রকৃতিকে। নুরু দেখছে নিজেকে। চমকাচ্ছে। দুর্যোগের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছেগুলোকে নিক্ষেপ করছে। যেখানে বউ আছে, ছেলে আছে, আবার কেউ নেই এই বোধ ঘনীভূত। বউ দূরে নেই। কাছে আছে। অমন বউটাকে আমার, পর পুরুষের সামনে দাঁড় করালে। লতাপাতা জড়ানো কাচের চুড়ির ঘনিষ্ঠ ইশারা যার বাহুতে উঠে আসে অবলীলায়, যার নির্ভুল আত্মীয়তা পৃথিবীর যন্ত্রণা থেকে অমর্ত আবহাওয়ায় দাঁড় করায়, তার চোখে কালি পড়ছে। তার শিশু-জিজ্ঞাসা ঠোঁটে নিঃশব্দে দৌড়ঝাঁপ করছে। সে, শিশুকে জ্ঞাতা দেবার মতো করস্পর্শে প্রতুল সান্ত্বনা তুলে দেয়।

'কিছু আনোনি?'

'নাহ্!'

'হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল?'

'নাহ্!'

'কচির বাল্লিকের ডিবে, হাঁড়িটা আনলেনি। অ্যাঁ! কচি খাবে কি? তুমি কি লোক বলতো?'

'স্রোত ঠেলে যেতে পারিনি বউ।'

বউ নিজের কপাল-মুখের বাঁকচোরের ছায়াপড়া অব্যক্ত বিন্যাস কোথায় বুকের চৌহদ্দিতে ঠেলেঠুলে দেয়। নিম্ন স্বরে বলা উচিত কথা কাউকে শুনতে দেয় না। খোকাকে জড়িয়ে ধরে। ভাবনাজাত ক্লান্তিবিন্দু স্বেদ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। কচির বাবা সেই সাক্ষী-সাবুদ সালিসীর মধ্যে জেগে হঠাৎ দৃশ্যমান হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। পায়ে পা ঠেকছে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি খেয়ে যাচ্ছে। হাঁটা যায় না। চারদিকে তাকাচ্ছে। দৌড়নো যায় না। ক্রমশ ভিড়ের খোলসে শ্বাসরুদ্ধ। ভিজে শরীরে থেকে-থেকে কেঁপে যাওয়া। গুর গুর। সেই ভেতরের অলিগলি, রক্তলিপ্ত শরীরী অনুভূতি, চেতনায় কর্ষিত হচ্ছে। কচির মায়ের কাছ থেকে সরে থাকতে পারছে না। ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে বরং।

'হিমানীর কৌটোতে লুকনো সাতটা টেকা ছিল।'

'লুকনো টেকা হকে এল না।'

'তোমার টেকা নাকি?'

'তবে—'

'ও আমার, খুঁটে বেচে জমিয়েচি।'

'ভারি তো সাতটা টেকা!'

'এক গলা মাটি খুঁড়লে এক পাই পাওয়া যায়?'

'হার মানছি।'

এই সবের মধ্যেও বউ-এর হাসি পায়! নুরু একা কেমন বোকা বনে যায়। সবাই হাসতে পারে কাঁদতে পারে নুরু পারে না। সে ভাবল এই সবের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আচরণ, নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার হারটা নাও হতে পারে। মুক্তকণ্ঠে যেমন হাসবে তেমন কাঁদবে অনর্গল। সে স্রোতের মুখে কুটি ফেলল, সে বলল জীবনটাই এরকম। নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ। শিশুর মতো সে ঘুরে ফিরে মজা দেখছে। লাল পানির প্রতুল অণু-সমগ্র কিভাবে মানুষের সুখকে ভেঙে ফেলে মাটির বাড়ির মতো। ভেঙে ফেলে একফালি বিছানা। ভেঙে ফেলে একটুকরো আয়না, ক্ষেতের স্নেহস্পর্শ, ভাতঘুম, ঝিঁ-ঝিঁ মধুর রাত। এই সব সুখের কোনো বিকল্প নেই। এই সব ঘটনার বিস্মরণ হয় না।

'কচিকে ধরো তো একবার।'

সে শুনতে পেল না।

'কি বলচি—'

'কি?'

'তুমি শুনতে পাওনি সত্যি?'

'না।'

'কি ভাবতেচ?'

'কিচ্ছু না।'

'আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে তুমি নিজের খেয়ালে আছো, ধরো একবার খোকাকে।'

সে কচিকে টিপটিপি বৃষ্টির মধ্যে গামছা আড়াল করে রাখে। তার খাঁদা নাক সিধ করার চেষ্টা করে। শরীর নাড়া দিয়ে দুলোয়। 'ওই দ্যাখ্ বান, সাঁতার দিবি, সাঁতার দিবি? উঁহু তা হবে না, তোর চোদ্দ পুরুষ পারবে না। কি খাবি কি? আসমানের পানি খাবি? হুঁ হচ্ছে। চোপ্। প্যাদানি খাবি। ও বাব্বা ঠোঁট ফুলোস! আঙুল চুষ আঙুল চুষ। এই তো কুঁড়েঘরে থাকার ছেলে, আবার কান্না? ধরো তোমার ছেলেকে।'

'বাবারে একবার নিয়ে ওর সয় না। বলে কি না তোমার ছেলে। তোমার ছেলে নয়?'

'আমারই তো। দেখবি বড় হয়ে বাঘ শিকার করবে।'

'ছাই। ইট সাজাবে।'

'কেন মিস্ত্রীর ব্যাটা বাবু হয় নি?'

'ওই সুখে থাকো।'

'বেশ।'

'এই, কচি ক্যানো সদাই আঙুল চুষছে জানো?'

'ওসব বাজে কথা।'

'ফেরেস্তা ছেলে, কিছু আলামত পাচ্ছে বুঝি!'

'ধ্যাৎ!'

'নাগো, আমরা বুঝি সব না খেতে পেয়ে মরে যাব।'

'তা হয় না।'

'আঙুল চোষার মানে তো আকাল!'

কচিটা বজ্জাত। নিজের সুখে আঙুল চুষছে। আর সকলকে ভয়

ধরাচ্ছে। ফেই, ওসব মিছে। মুরুর হঠাৎ কুচিন্তার প্রকট জুজুবুড়ি মস্তিষ্ক-প্রাচীর খাড়া হচ্ছে। প্রতিষেধক না থাকা এই সব সংক্রমিত আকাল রোগ দেহের বোধানুভূতিতে সঞ্চারমান। সে কেমন জড়সড়, সে কেমন বিলম্বিত, সে কেমন রক্তশূন্য, সে কেমন ছায়াহীন, সে কেমন পরাভূত। কচিটা ভাবত বানভাসি মানুষদের তর্জনী তুলে শাসায়।

'ওগো তুমি কুথাগো—'

'এই মাগী চুপ মার।'

'ওগো তুমি যে ঘরে ছিলে গো।'

'চুপ মার! ভাতারের জন্যে জান হু হু করছে, ছেনালি হচ্ছে!'

শোকরজানের কান্না থামছে না। কার্নিসে পা ঝুলিয়ে উদোম-পাদাম শরীরে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইনোচ্ছে বিনোচ্ছে।

জিকরিয়া তার চুল টেনে ধরে—'সোহাগ, সোহাগ! ধ্যুৎতোর, সোহাগের কাঁতায় আগুন। মড়াকান্না কাঁদচে। সুখে থাকতে দিবেনি।'

'সুখ!' মুরুর মাথায় কথাটা কেমন ঘুরপাক খায়।

'শালা নতুন বে বলে ভাতারের জন্যে আঁকপাঁক! তোদের জন্যে দুনিয়াটা জাহান্নামে গেল।'

কাসেম জিকরিয়ার সিনাতে ঝাঁকানি দেয়—'আবে তোর বউ হাতছানি দিচ্চে বে।'

'সব শালির ঘরের শালিদের ছুঁড়ে ফেলে দোব।'

'আবে শুকনো চাল খাবার তরে তোর ছেলেদের মারামারি লেগে গেছে বে।'

জিকরিয়া চিৎকার করে কাঁচা খিস্তি করল। কাছে গিয়ে ছেলেদুটোর চুল ধরে বেশ ঠোকাঠুকি করে দিল। বেপাড়ার কুকুরের মতো অবলীলায় কার্নিসের বিপদরেখা ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে লাগল।

মুরু পড়ে গেল। না পড়েনি। ওহো ওই জিকরিয়া কার্নিস ধরে সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো হাঁটতে লাগল। সে পড়লে মুরুও বুঝি পড়ে যেত।

একটা ছানিপড়া বুড়ি কাকে যেন বলল—'ও বাপ্, মোরা ঘর যাব কখন?'

সে, বিলাত বকস, লাল ছোপ দেড়োর হুক্কিন কাশি জড়িত হা হা হাসে। 'যাবি, তোর আসল ঘরে যাবি। একটুকুনি বাদে। থির হয়ে আল্লা রসুলকে

ডাক।' সেও কার্নিস ধরে সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো হাঁটতে লাগল।

'ও সবুরনের মা, জ্বালা, তোর মুরগি, একমুঠো গম এনেচি তাও খেয়ে নিল?'

সবুরনের মা-র কপালে রেললাইনের রেখা এঁকেবেঁকে গেল। 'একমুঠো গমের জন্যে তোর নিদ ধরচে না মাজলি?'

'ধরবে কেন? এখন মানুষের মাথা মানুষ খাবে। এই মুরগি যদি খাস, শূয়োর খাবি।'

'এই খানকি মাগী আমরা হারাম খাই?'

'যে ব্যাটাখাকিদের মুরগি আমার ছেলের মুখের আহার খায় তাদের ব্যাটাদের জরকেশে হোক!'

'ওলো ওই সাতভাতারি।'

'ওলো সতীন কপালী।'

'ওলো তোর ঘরের মড়া বেরোক।'

'ওলো ব্যাটার ভাতার মাথা খা।'

সবুরনের মা মাজলি কার্নিসের দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

ওহো নুরু ধাঁধা চোখে সার্কাস দেখছে। নাচ দেখছে। সবুরনের মা মাজলির 'যুদ্ধং দেহি' ভাবমূর্তি এক বাস্তব জনজীবনের সাময়িক সময়োপযোগী নব সংস্করণ। হাতে তাদের কোনো মারণাস্ত্র নেই। মুখের অস্ত্র বুকের যন্ত্রণা বিকর্ষিত খেদোক্তি। বেদের হাতে দু সতীনের লড়াই। বেদের অঙ্গুলি সংকোচন প্রসারণে ইত্যাকার নাট্যামোদীদের মনোরঞ্জন সুখ।

ফিসফিসিনি বৃষ্টির হাওয়ায় বেনোজলের বারুদগন্ধ নাকে মুখে চোখে ইন্দ্রিয়ে বুভুক্ষায়। সেই সব কামানের গর্জন-পাথার উদ্ধত শক্তি-সমগ্র পাঁজর চুরমার হা হা তে মেয়েপুরুষের যুগ্ম নৃত্যমুদ্রায় অখণ্ড সৃজনী গ্রামবাংলার মেটে বাড়ির মড়মড়ররর···লাল পানির মধ্যে এই রক্ত আপ্লুত হা হা তে কোন প্রাণ পাওয়া যন্ত্রণা বিদেহী হয়ে মিশে যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্। ঘুটঘুটে আঁধারে আর্ত-নির্ভর মানুষের মধ্যে নুরুও একটা মানুষ হয়ে মিশে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচল ফুটো হয়ে খোকার মাথায় পানি পড়ছে। খোকা কাঁদে না। সেই হানাদারদের ব্যাণ্ডপার্টি ছলাত ছলাত ছলাত ছলাত কর্ণে বুকের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে বিঁধছে। বউ-এর অনেক কাছে সরে এসেছে নুরু। বউকে অনিবার্য স্বরে বলল—'আমাদের ঘরটা পড়ল বুলু।' এই তার বাম ধরল প্রথম।

'আহ্ কলজেটা ছাঁদা হয়ে গেল।'

'দ্যাখ্ বুকটায় মোর কে যেন পেরেক সাঁটচে।' বউ-এর হাতটা গুরু নিজের বুকে ছোঁয়ায়।

'মড়মড়মড়ররর…'

মাজলি বুক চাপড়াল। 'ওগো ওই মোদের ঘর পড়লো গো।'

সবুরনের মা চ্যাঁচাল—'না গো উ যে মোদের ঘর গো, দখিন দিক থিকে আওয়াজ এল গো, কলজে মড়মড় করে গো।'

'মড়মড়মড়ররর…'

'শালার ব্যাটা শালা ঘর রে তুই চোখের সামনে পড়ে গেলি।' জিকরিয়া বুক চাপড়ায়।

'মড়মড়মড় র র র…'

'আবে শালার ঘরও সোঁদর মাগের মতন বেহাত হল।' কাসেম চুল ছেঁড়ার মতো রাগে দুঃখে কার্নিসে আছড়ে পড়ে।

গুরুর বউ ফুলু আবেগ প্রেম মথিত শব্দের স্বতোৎসারিত আন্তরিকতায় ইনোয় বিনোয় 'ওগো কলার কাঁদির মতো মড মড় করে কলজে ফাটানো ঘর পড়ছে গো।'

এই সব শব্দে শরীর কাটাছেঁড়ার অর্থে গুরুর অস্ত্রোপচারের অন্তর্ঘাত রূপায়িত। ফুলু কাঁদছে। সে কেবল ফুলুর কাছে নড়ে সরে যায়। সমবেত সংগীতে তার অংশগ্রহণ নেই, সেই সোনাবাহী নারীর গিঁট খুলে সে ছড়ের আঘাতে সংগীত জানে না। শুধু ফুলুর কাছে সরে সরে যায়। ফুলুর কোনো সম্বিত নেই। সে তার সংগীতে মেতে আছে। সে যেন স্বামীর স্পর্শ জানে না। তার ত্বক ইন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শকে ছাড়িয়ে চলে গেছে কোন্ এক কিন্নরীকণ্ঠের মানবীয় যন্ত্রনায়।

'ও বউ বউ, বউ?'

বউ-এর কোনো সাড়া নেই।

'ও ফুলু ফুলু, ফুলু?'

ফুলুর কোনো সাড়া নেই।

'ও ফুলু বউ?'

'য়্যা!'

'তুই কাঁদচিস ক্যানো?'

'কান্না যে বুক ছেঁড়াছিঁড়ি করচে গো।'

'আমি তো আছি তোর ভয় কি?'

বউ-এর ভিজে চুলের সুতো নুরুর গলায় সিরসিরিয়ে যায়। কচি দুধ খাচ্ছে আরামে। ফুলু আঁচল নিংড়োয়। সে যেন নুরুর বুকে নিংড়োবে। সেই সব চারদিক প্রচণ্ড শব্দের হা হা তে নুরুর কানে ভালো লাগে। বাড়ি পড়ার মড়মড়ানি, মোচড়। অন্ধকারে বেঁচে থাকা কোনো মানুষ-চোখ নিরুদ্দেশ, শুধু কণ্ঠশব্দ বিলম্বিত গতিবেগে প্রাণের পতনের শব্দ দীর্ঘায়িত করছে। এই সব চিন্তার মধ্যে নুরুর অবস্থান, বউ-এর অবস্থান, কচির অবস্থান, আর সকলের অবস্থান ক্ষণস্থায়ী হচ্ছে। বউ-এর অন্তরের মধ্যে সে ঢুকে পড়ছে। কলজে হাতড়াচ্ছে। 'এই বউ তোর কলজেটা মোর মতো কেমন কাটাছেঁড়া দেখি।' বউ-এর অতি নিকটে সূচের মতো প্রবেশ করে চলে সে। তার সংকুচিত জুজু-ভয়ে জড়সড় অন্তর্দাহ। সে আঙুল ছুঁইয়ে বউ-এর দাবদাহ জরিপ করে। 'এই বউ তোর বুক অংরা হয়ে জলে পুড়ে যাচ্ছে।' সে মুক্ত নয়। ফাঁদে পড়া জন্তু হয়ে ছটফটায়। পা হাতের মুদ্রায় নৃত্যসুখ আনে। নুরু নাচছে। বউ নাচছে। 'এই এই এই এই, এই বউ, বউ বউ বউ।'

'এই নুরু নুরু নুরু?' জিকরিয়া নুরুর কাছে সরে আসে।

'কি?'

'তুই একবার আজান দে নুরু।'

'না। অন্য কাউকে দিতে বল।'

'তুই জানিস, আর কেউ জানে নি।'

'আমি আমি—'

'দে ভাই একবার, এ আল্লার গজব।'

কানে আঙুল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তো বাঁকছে চুরছে। 'আল্লাহ-হু আকবর আল্লাহ্...' এই প্রথম যেন তার কান্না এল। সবাই শুনে ফেলছে নুরুর কান্না। বুড়ো ছেলেটা কেঁদে আকুল।

ফুলুর হলদি মাজা শরীর। মিস্ত্রী ঘরের বউ-এর রূপ এরকম হয় না গো। চোখের কোলে কালি। শরীরে কালো কালো ছোপ। কোমর ভেঙে রয়েছে। ভিজে শাড়ি। কোলটুকুকে সুরক্ষিত রাখছে। খোকা মাই চুষছে। ফুলু যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। খোকার মুখটা সরিয়ে দিচ্ছে। খোকা কেঁদে ভাসাচ্ছে। সব সহ্য হয় খোকার কান্না সহ্য হয় না। ফের খোকাকে দুধ দিতে চুপ। নুরুর ইত্যাকার আবর্তিত খানির কাঁচ কাঁচ

শালকাটা-কৌটা ব্যথা হয়ে বেরিয়ে এল। হাত দিয়ে বউকে ছুঁচ্ছে। তার যন্ত্রণাকে ছুঁচ্ছে। কচি হাত-পা ছুঁড়ে খেলছে। আঙুল চুষছে। ফুলুর সঙ্গে অসম্ভব দুর্ঘটনার চোখাচোখি হল। ফুলু বেরিয়ে এল খোলস থেকে। ফুলুর স্বরূপ জেনে ফেলেছে নুরু। চোখাচোখি হলে ফুলুর ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেদনার চকচকে দাঁত বেরিয়ে এল। সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ছে ঠোঁটের সব শাসনকে ভেঙেচুরে। ফুলুর চকচকে সাদা দাঁত দেখছে নুরু। দাঁত বেরুলে হাসে মানুষ। ফুলু কি হাসছে! ফুলুর দিকে আরো সরে যাচ্ছে নুরু। ফুলুকে স্পর্শ করল। ফুলু নুরুর মাথায় হাত বুলোল। চুল টেনে টেনে পানি নিংড়োতে লাগল। তার কাঁকে ফুলু নুরুর থুতনি স্পর্শ করে দুরন্ত ব্যবধানের স্বরে বলল 'বড্ড খিদা লেগেছে।'

নুরু দুর্ঘটনার মতো বলল—'আমরাও।'

'হায় আল্লা মোরা ভিখিরি হনু গো।'

'সকাল হলে জান যাক ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

'না না না। মোর পাঙুলের জন্যি তোমাকে বানে ভাসাব? হায় আল্লা! মেয়েদের জেবন একটা জেবন!'

'ফুলু বুক ফেটে যাচ্ছে, হাত দিয়ে ভাখ্।'

ফুলু নুরুর বুকে হাত দেয়। 'হ্যাঁ, সব দেখে বুকের ভিতরি হাত-পা ঢুকে যাচ্ছে গো।'

'ফুলু কাঁদিসনি যেন, সবাই জেগে রয়েচে, মোর খারাপ লাগবে।'

'জোরে কাঁদতে পারচি কই। চোখ দিয়ে পানি ঝরচে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে বুক হালকা হোতক।'

তার শৈশবের 'জলকের সিলেট জলকে যায়' কিন্তু এ জল যায় না। যেন আরশিনগরের বসত। পীরিত করছে। ভেসে যাচ্ছে মানুষের সবকিছু। যেমন নুরুর হাত-পা বাঁধা। যেমন খোকা আঙুল চুষছে। যেমন ফুলু বলছে তার খিদা পেয়েছে। যেমন মাজলি সবুরণের মা ঝগড়া করছে। যেমন জিকরিয়ার ছেলেদের শুকনো চালের কণা চিবোবার জন্য খুনোখুনি। হেই এসব মানুষে করতে পারে। এ তো কুকুরছানাদের কাজ। মানুষ কুকুর হয়ে গেল গো। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে! মানুষ কাঁদে। এইসব মানুষের জন্মাবধি অভ্যেসের সূত্র নিয়ে তারের ওপর পুতুল নাচায়, পুতুল নাচছে। বেদের আঙুলের সংকোচন প্রসারণ। বেদে বলছে ব্যাটা ভাতারের মাথা খেয়ে হাত নাচিয়ে গালাগাল দে। এক

সতীন তাই করল। অন্য সতীনও আঙুলের ইসারায় মাছের ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষকে হারাতে লাগল। এই সব নৃত্যের মঞ্চ গড়া হয়ে থাকে।

জিকরিয়া চিৎকার করল—'দ্যাখ্ রে কাসেম!'

'কি?'

'একটা গরু ভেসে আসছে রে।'

'হাঁ বেশ মোটাসোটা।'

'চল শালাকে জবাই করি।'

'ধ্যাৎ মরে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে যে।'

'দেখবি ছুরি চালালে ছটফট করবে খন।'

'মরা গরুর গোস্ত খাবি জিকরি?'

'শালা নিজেরাই মরে ভূত!'

জিকরিয়া ছাদ থেকে লাফ দিল লাল পানিতে।

সবুরনের মা কাসেমের কাছে সরে আসে। 'ও কাসেম?'

'কি গো সবুর মা?'

'তোরা মরদরা থাকতে মোরা কচি ছেলে বুকে নিয়ে মরে যাব?'

'মর না, ভাসিয়ে দেব লাশ লাল পানিতে।'

সবুরনের মার চোখ ছল ছল করে ওঠে—'আজ চাদ্দিন চার র‍্যাত হ্যাণ্ড-গুলোনকে একমুঠো খেতে দিতে পারি নি।'

কাসেম ছোপঅলা দাঁত বার করে বলে—'তোর খুব খিদা পেয়েচে বল না।'

'হাঁ, কলজেটা ছেঁড়াছিঁড়ি করচে।

'এই নূরু তোদের ভাতের হাঁড়ি থেকে এক থালা ভাত আর এক পেয়ালা পোনামাছের ঝোল দে তো, সবুরনের মাকে খুব খিদা পেয়েচে।'

'কেন ঠাট্টা করচিস কাসেম। বাছুরগুলোন আমার শুকিয়ে।' সবুরনের মায়ের ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে চোপ দেওয়া শিশুর মতো।

নূরু বেঁকে যাচ্ছে। শরীরে ভাঁজ পড়ছে। শরীরের নানা জায়গায় জখম। দাঁড়াতে গেলে বেঁকে যায়। সারা বুক জোড়া তার নদী। সারা চোখ জুড়ে নদী। তো বাঁকাট্যারা হচ্ছে নেহায়ে পেটানো লৌহ-যন্ত্রণায়। একটা লম্বাটে মানুষ রোগাটে হয়ে আরো লম্বা হয়ে গেল। সে তার শরীরে আর-এক শরীর খোঁজে। তার রক্তে হিমের অণু জড়িয়ে থাকে। তার না বলা কথার বীজ চারা হয়ে জেগে উঠছে। সে চিৎকার করছে। তার কোনো

স্বর বেরুচ্ছে না। এমনিতেই যে চ্যাঙা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে রক্ত কণিকার তপ্ততা বায়ুতে নিষ্ফল ছড়িয়ে দিচ্ছে মনে মনে। তার এই সব বিভিন্ন রঙে ছোবানো রক্তিম কাগজের ছায়াছবি বোধ হয়ে বস্তুত বেরিয়ে আসে অভিজ্ঞতা-সমগ্র। বউ-এর কাছে সরে সরে যায়। বউ-এর দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। বউ-এর নরম বুকের মাংসপিণ্ডের ত্বক-ছিদ্র দিয়ে যে খানিক শ্বেত-রুধির বেরিয়ে আসে তা অল্প স্নেহের অবহেলায় খোকার শরীরী প্রয়োজনকে উদ্দীপ্ত করে, জঠরে প্রাণের কণিকাগুলোকে শান্ত করে। এই সব স্নেহলব্ধ সাংগঠনিক মমতায় বউ খিদা পাওয়া বুকে পরিমিতি আনে না। ওহো ওহো ওহো! মুরু অবাক হলো! ফুলু তোর বুকে এত প্রাণ। সে ভাবল খোকার মতো শিশু হয়ে ফুলুর বুকের শ্বেত-পানীয় কিছু পান করে নিই।

'ফুলু ফুলু ফুলু।'

'কিগো।'—

'তোর বুকের দুধ খোকাই শুধু খাচ্ছে, খায়?'

'নাগো আমিও খাই, খাচ্ছি।'

'তোর দুধ তুই কি করে খাস?'

'বোকা!'

'বোকা হয়ে যাচ্ছি না?'

'হাঁ গো।'

'বোধহয় খিদা পাচ্ছে বলেই এ কথা জিগেস করচি।'

'মোর বুক শুকিয়ে গেছে।'

'তবে খোকা চুষচে?'

'অবোস হয়ে গেছে তাই। ভাবচে পেলেও পেতে পারি।'

'ফুলু?'

'কি বলচ?'

'কিছু না।'

'ফুলু?'

'কি বলচ?'

'কিছু না।'

'ফুলু?'

'কি বলচ?'

'কিছু না।'

কারো পায়ের ফাঁকে সামান্ত জায়গায় ফুলু শুয়ে আছে। খোকাটিকে পুঁটুলির মতো আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করছে দৃষ্টি। নুরু ফুলুর এই সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বোধ যন্ত্রণার মধ্যে বাঁধা টানটান। নুরু নজরবন্দী। ছাদের সব জায়গায় ফুলুর চোখ যায়। নুরু সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো ছুটে যায় ছাদের শেষ প্রান্তে। চোখের মণি খসিয়ে বান মাপে। আবার ছুটে আসে। আবার যায়। আবার ফিরে আসে ফুলুর কাছে। ফুলুর শরীরে যেন তার নাক-মুখচোখ ঘষে দিতে চায়। বান কমছে। 'ও ফুলু তুই ঘুমোচ্ছিস? বান কমে গেল।' ফুলুর শরীরের বিশেষ বিশেষ উপত্যকায় নুরুর ইচ্ছে করে নাকমুখচোখ ঘষতে। বুকের সুখগুলোকে একটা একটা করে গহনার মতো খুলে রেখেছিল পরে ফেলতে চায় সে। বান কমছে বান কমছে। আবার সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো কার্নিস দিয়ে ছুটে ছাদের শেষপ্রান্তে গিয়ে বান মাপে। নুরু ছুটোছুটি করছে, ফের ফিরে আসছে ফুলুর কাছে।

জিকরিয়া বান-পানিতে সাঁতার দিয়ে তরতরিয়ে চলে গেল। বাঁধে লাইন দিয়ে রুটির প্যাকেট আনল। কাসেম গেল, সেও আনল। বিলাত বকস আনল। আরো অনেকে আনছে। নুরুও গেল সাঁতরে। ফিরে এল হাতে রুটির ভিজে প্যাকেট নিয়ে। সকলে রুটি খাচ্ছে। সকলে হাসছে। খেলছে। নাচছে। সকলে জড়াজড়ি করছে। বান কমছে বান কমছে। পোঁটলা বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। মাজলি, সবুরনের মা কার্নিস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দুজনের চোখাচুখি হলো। দুজনে গলা জড়িয়ে ধরল।

সবুরনের মা ইনোচ্ছে—'ওগো মাজলি কুথায় যাব গো।'

মাজলি আরো জোরে সবুরনের মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে যায়। 'ওগো মাথা গুঁজবার খোপটাও চলে গেল গো।'

বেদে দু' সতীনের গলা জড়াজড়ি করে থলেয় পুরছে।

নুরু ফুলুর কাছে চলে যায়।—'ফুলু খা।'

ফুলু উঠে খেতে লাগল।

জিকরিয়ার ছেলে ছুটো হঠাৎ, নাটকের বিশেষ জায়গায় হাততালি দেবার মতো, হাততালি দিল। নুরু ফুলু চমকাল। দেখল আকাশে পায়রা উড়ছে। পায়রা উড়ছে পায়রা উড়ছে। ওহো হেলিকপ্টার উড়ছে। নুরু ফুলুর শরীরের

আরো কাছে সরে সরে থাকছে। মুক আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গড়াচ্ছে দু-জনে। মাথার ওপর হেলিকপ্টার। মুক ঝুনু দৌড়োদৌড়ি করছে। ঝুনুর পা পিছলোল। মাদুরে পা দিয়ে বসে পড়ল ঝুনু। মুক ঝুনুর পা স্পর্শ করছে। ঝুনু পায়ের আঙুল ভেঙে যাওয়া যন্ত্রণায় প্রথম জোরে কাঁদল—'ওগো আমাদের কি হল গো!'

গিরগিটি

প্রবীর নন্দী

ওরা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। রসুল আর ছিদাম। রসুলই প্রথম টের পায়। তারপর দেখাদেখি ছিদাম। অনেক ভাঙাকলমি আর কালকাসুন্দি ঝোপের মধ্যে ব্যাপার-স্যাপার। অদূরে চলটা ওঠা ভাঙা কালভার্টের পায়ের কাছে দামবাধা ঝোপ, উপুড় করা। অনায়াসে ধাঙড়দের শুয়োরের বাথান হতে পারে সেখানে। আর তার দু পাশে তড়বড়িয়ে বয়ে গেছে আই-আর-এইট ধানের ক্ষেত, ভূ-বিস্তৃত সুখের মতন। মধ্যিখানে এই সরু লম্বা জায়গাটা আবাদহীন। যাতায়াতের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য। সবাই জানে, ৭৯নং নিশিন্দা মৌজার এই পথটা এখন ভূগোল।

পলকা হাওয়ায় দুলছিল ডালপালা। রসুল আখুটে চোখে ইতিউতি করতে থাকে। ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন একটা খসখস শব্দ বিঁধে আছে, কাঁটার মতন। রসুল খরগোশের মতন কান পাতে বাতাসে। ফালাফালা করে দেখে নেয় ভিতরটা। চকিতে হৈ-হৈ করে ওঠে রসুল। দূরে সরে আসে। বাপস! উলটোদিকে ভাবলেশহীন বড় একা তাকিয়েছিল ছিদাম। শালার ছিদামটা যেন কী! চোখ ঘুরিয়ে তড়িঘড়ি নিজের শরীরের দিকে তাকায়। হাতের রগগুলো কেমন কেঁচোর মতন জড়িয়ে ওম দিচ্ছে, বিশ্রীরকম। দু চোখ উসকে তৎক্ষণাৎ রগের উপর আলতো চাপ দেয় সে। চিনচিন করে ওঠে হাতটা। ক্ষীণরক্তধারা টের পায় রসুল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ হয়।

'এ্যাই ছিদাম, উই ছাখ—'

'তিনবার বুকের ভেতর থুতু দে রসুল।'

ভয়ডর পেলে শালা ছিদামটা ওইরকম বলে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। হাতের তালুতে খানিকটা ধুলো নিয়ে ফুঁ দেয়। ফুঁ ফুঁ ফুঁ—। ব্যস, তাতেই ভয়ের নিকেশ সারা। পারার মতন ভয় শরীর থেকে হস্‌ করে নেমে যায় যেন। রসুলের গা-পিত্তি জ্বলে ওঠে তখন। মাথার মধ্যে চিড়িক দিয়ে আগুনের হল্‌কা বয়ে যায়। মনে হয়, গদাম করে একখানা লাথি কষিয়ে ইস্তক পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দেয়। কিন্তু আদপে তার ভাবগতিক

অন্যরকম। যা ভাবে তা করতে মন সরে না। ছিদামের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তখন হাতেপায়ে কেমন খিল ধরে আসে। ধীরে ধীরে শম্বুকগতিতে ভয়টা ভর করে যেন। ছিদাম সেই ভয় নামানোর মন্ত্র জানে। ভয় তার বশ, রসুল শুনেছে।

'এ্যাই ছিদাম—'

কি?

'উই হ্যাখ—'

'তিনবার মন্ত্রটা আওড়ে যা—'

'ওতে শালার কি হয়?'

'ভয় শরীল থেকে নেমে যায়।'

'চোপ্ কর শালা! ভয়ের মুখে মুতে দেই তোর, বুঝলি।'

রসুল হঠাৎ-ই ফটাস করে রেগে যায়। ছিদাম রোদ পোহানোর ভঙ্গিতে ভাঙা কালভার্টটার উপর বসে রকম-সকম লক্ষ্য করে। ট্যাঁকে গোঁজা কৌটো থেকে একখানা বিড়ি বের করে ধরায়। ভুক ভুক করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। রসুল দূরে দাঁড়িয়ে আতিপাতি করে খুঁজতে থাকে। নাড়িয়ে নাড়িয়ে জঙ্গল ঘোলা করে। আশেপাশে কোথাও মটকা মেরে পড়ে আছে দেখ। রসুল খু-উ-ব সাবধানে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেখে নেয় ভিতরটা। গাছ-গাছড়ার ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়। নাহ্, শালা কোথাও নেই।

'এ্যাই রসুল—'

'হুঁ।'

'বিড়ি খাবি একটা?'

'আছে?'

ছিদাম আরো একখানা বিড়ি বের করে রসুলকে ডাকে, 'তো এদিকে আয়। ও শালার খুঁজে পাবি না।'

রসুল খুঁটির মতন মেরুদণ্ড সোজা করে তৎক্ষণাৎ ছিদামের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'কেন? খুঁজে পাব না কেন—যাবে কোথায়?'

'ওরা রঙ পালটায় রসুল।'

রসুল ছিদামের পাশে এসে বসে। হাত-পা ছড়িয়ে বিড়ি খেতে লাগে। এতক্ষণ শালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের কলজে শুদ্ধ ব্যথা ধরে গেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে কোমরের হাড়খানা মটাস করে ফাটায় রসুল। বেশ আরাম লাগে। ছিদাম ইস্তক মন খারাপ করে বসে আছে। কী ভাবছে কে জানে।

রসুল আরো একবার লম্বা টান দিয়ে আধপোড়া বিড়িখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জিভটা শুধুমুদু তেতো হয়ে গেল। বিশ্রি! হঠাৎই রসুলের সারা শরীরটা কেমন ঘ ঘ করে গুলিয়ে উঠে। জিভের তগায় একগাদা থুতু জমে যায়। রসুল হুট্ করে সেটা গিলে ফেলে।

মুখ ব্যাদান করে রসুল বলে, 'মাটির মতন রঙ, চটচটে গা—কেমন টিকটিকির মতন দেখতে নাহ্?'

'হুঁ।'

'ওরা কিন্তু রক্ত খায় ছিদাম!'

'জানি।'

আর তৎক্ষণাৎ কেমন আশ্চর্য বোধ হয় রসুলের। শালা ছিদামটার তবু ভ্রূক্ষেপ নেই এতটুকু। মরণ-বাঁচন নেই যেন। গা-গতরে রক্ত না থাকলে মানুষ মরে, একা রসুল কেন—গাঁয়ের সবাই জানে এ কথা। হালিম মিঞার সারা শরীর গাঁদা ফুলের মতন হলুদ হয়ে পটাশ করে মরে গেল একদিন রসুল দেখেছে। আর তখনই ভিতরের ঘর-গেরস্থালি সব শিরশির করে দুলে উঠে। কাঁপন ধরায়। বারেক হাতের উপর আলতো চাপ দেয় সে। চিন্‌চিন্ করে ওঠে হাতটা। চোখ ঘুরিয়ে পরক্ষণেই আবার ছিদামকে লক্ষ্য করে। ইচ্ছা হয়, পাঁচ-আঙুলে ছুঁয়ে দেখে একবার। আলতো চাপ দেয়। হাত বাড়িয়ে ফের কেন জানি আবার হাত গুটিয়ে নেয় রসুল।

'ছিদাম—'

'হুঁ।'

'খালি হুঁ হুঁ করছিস যে! কি ভাবছিস?'

'একটা গন্ধ টের পাচ্ছিস রসুল?' রসুল অবাক হয়ে ছিদামের মুখের দিকে তাকায়। নাক টানে। বাতাস শোঁকে।

'পাচ্ছিস?'

রসুল আরো জোরে বাতাস টানে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। আবার ছেড়ে দেয়। ফের আবার বাতাস টানে। আবার হুড়মুড় করে ছেড়ে দেয়। রেচক কুম্ভক খেলতে থাকে।

'কি মনে হচ্ছে তোর?'

'ধানের গন্ধ—নাহ্!'

'হুঁ। কলমার গায়ের গন্ধ—' বলেই ছিদাম উদাসভরে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে?

'বটে। খেতের কাছে এলেই তুই যে বড় ধানের গন্ধ পাস—আমি কিছুই বুঝি না, নাহ্—? এই যে আমারে মাঝেমধ্যেই শুনিয়ে শুনিয়ে জয়া পদ্মা কলমা রত্না ঝিঙেশালের কথা বলিস সে কিসের জন্য?'

'মেলা ফটর ফটর করিস নে রসুল। আর তুই বড় স্যাঙা সাজাছিস! নিজেরটা চেপে গেলেই হল! দিন নেই রাত নেই এসে এসে এই যে খালের পাড়ের জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুরুৎ ফারুৎ বাতাস টানিস—ছাড়িস, ভরন্ত ধানের পেটে হাত বুলিয়ে একা একা বিড়বিড় করিস—সে তোর কিসের জন্য, বল্?'

রসুলের বুকজোড়া রাগ আলগা হয়ে পড়ে তখন। নিজের কথা নিজে বলতে পারে না। হড়কে যায়। ছিদাম রসুলের কথা না-বলার মানে বোঝে।

'বল্ না—সে কিসের জন্য?' ছিদাম আবার চাঁওড দেয়।

'জানিস যখন তুই-ই বল?' রসুল উত্তর করে।

'আমি কেন বলব, তুই বল—'

রসুল তবু কিছুই বলে না। ছিদামের মুখ থেকে কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করে যেন।

'বটে। তখন তোর ভাতের কথা মনে পড়ে জানি।'

'ছিদাম—' রসুল ভীষণ গর্জে উঠে আবার পরক্ষণই শান্ত হয়। ৭৯নং নিশিন্দা মৌজার তৌজি নম্বর ১২। বারো। দাগ নম্বর ৩৩২, ।।০ (আট) আনায় ৩১ শতক। অত্র খতের দখলকার রায়ত শ্রীছিদাম মণ্ডল পিং মৃত হরিকৃষ্ণ মণ্ডল সাং নিজ। রসুল জানে, আজ বছর চারেক জমিটা বাঁধা পড়ে আছে গাঁয়ের রামদুলাল মশায়ের কাছে। সে-ই ৩৩২-এর ৩১ শতক ফসল ঘরে তোলে। দেনার দায়ে এখন ছিদামের মানুষ বাঁধা দেওয়ার উপক্রম। সুদে-আসলে দুশো ছুঁইছুঁই। তবু রামদুলাল মানুষটা ভালোয়-মন্দয় কেমন যেন। ছিদাম ঠিক বোঝে না।

দেখা-সাক্ষাৎ হলেই বাবু বলেন, 'ছেদাম—মনে আছে নাকি ভুলে গেছিস, র‍্যা?'

'নাহ্ মনে আছে।' ছিদাম জবাব দেয়।

'তোর জমিটার দাগ নম্বর কত হে যেন?'

আর তৎক্ষণাৎ ছিদামের যেন সব গুলিয়ে যায়। এলোপাথাড়ি চিন্তার জট পাকাতে থাকে মাথার মধ্যে। সারা শরীরে মুক্তোর মতন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠে। আলজিভে তেষ্টা পায়। বারবার ঢোক গিলতে ইচ্ছা করে।

মনে করে বলে, '৩৪২'।

'৩৪২!'

'নাহ্‌ ৩২২।'

'২২!'

'৩৩২।' ছিদাম পাঁশুটে মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

'কত শতক?'

'বিঘাটেক হবে বাবু।'

'বড বাড়িয়ে বললি যে ছেদাম!'

ছিদাম লজ্জা পায়। ফের মুখ নিচু করে বলে, 'না বাবু বাড়াব কেন—সীমানা তো আছে।'

'জানি। তবু শুনতে চাইছি কত শতক?'

ছিদাম বলে, 'এ্যাই ধরুন গে ৩০ শতক।'

'তিরিশ!' রামদুলাল ফিকফিক করে হাসেন। মজা পান।

ছিদাম দ্রুত শুধরে নেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে, '৩১ শতক।'

'এই তো পারলি। নেয়ে-ঘেমে একাকার, বোকা!' একটু থেমে রামদুলাল মশাই আবার যোগ করেন, 'তো অনেকদিন তো হল। আর কদ্দিন এভাবে পরের কাছে ফেলে রাখবি? পরের জিনিস গচ্ছিত রাখা সে কি কম ঝক্কি নাকি, অ্যাঁ! এই ভাবি নতুন কিছু আইন পাশ হল, সব ধান বুঝি ছোটলোকেরা কেটে নিয়ে গেল···ভাবতে ভাবতে দিন কাটে, রাত কেটে যায় আমার। এখন হাই ব্লাডপ্রেশার। তোর জমি তুই ফিরিয়ে নে আমাকে রেহাই দে।' বলেই রামদুলাল ছিদামের ভ্রূযুগলের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন। 'অত টাকা কোথায় পাব বাবু?' কেমন আর্তের মতন শোনায় ছিদামের কণ্ঠস্বর।

'অত কোথায়! দু শোর মতন তো।'

'দু-শো'! ছিদামের চোখদুটো চিকচিক করে জ্বলে উঠে। আবার

পরক্ষণেই তা নিভে যায়। বলে, 'জমি ছাড়ানোর মতন আমার যে আর কিছুই নেই বাবু—'

'নেই বললেই নেই, হাঁরে। ঘরে তু দুটো মানুষ মাত্তর—তুই আর তোর বউ। ছেলেপুলেও তোদের হয় নি কিছু। নিজে অন্ধ বলে জগৎটাও অন্ধ ঠাওরালি নাকি, অ্যাঁ!'

'বাবু কি যে বলেন—'

'ছেদাম, মিথ্যে বলিস নে—ঘরে জমি ছাড়ানোর মতন তোর মূলধন আছে, আমি জানি!'

'বা-ব-উ—'

'চোপ্ কর হারামজাদা। খোঁজ, খুঁজে ভাখ—' বলেই রামদুলাল হনহন করে চলে যান। ছিদাম বসে-বসে উথাল-পাতাল ভাবতে থাকে।

'এ্যাই ছিদাম—'

'বল্!'

'জমিটা এবার ছাড়িয়ে নে—'

'বাবুটাও তাই বলে।'

'আমি বাবুর কথা বলছি নে, আমি আমার কথা বলছি। ছাড়িয়ে নে—'

'হুঁ।'

ছিদাম ভাঙা কালভার্টটা ছেড়ে একসময় উঠে দাঁড়ায়। রসুলও। ওরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। ডাজা-কলমি আর কালকাসুন্দি ঝোপের ভিতর ঘন অন্ধকার। রসুল আর ছিদাম দু জনই নজর ফেলে ঝোপটা দেখে একবার। নাহ্, শালার কোথাও নেই। ছিদাম একটা ঢিল কুড়িয়ে আলতোভাবে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। ঢিলটা শব্দ করে মাটিতে পড়ে। ততক্ষণে রসুল সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় আরো খানিকটা। ছিদাম পা চালিয়ে ওকে ধরে।

ডাকে, 'রসুল—'

'হুঁ।'

'মনে পড়ে সে বছর ধান হল গে বাইশ মণ। সারা বছর খেয়ে-দেয়ে আরো বিক্রি বাট্টা হলো—'

রসুল মাথা ঝাঁকায়। বলে, 'সে বছর আমিও ফসল পেলাম হারাহারি। জয়া আর পদ্মা—'

'বটে। বউ দু খানা ছুয়ে শাড়ি কিনল একসঙ্গে। লাল।' খুশিতে ঝলমল করে উঠল ছিদাম।

'আর আমার বউ বিয়োল সেবার। দু বেলাই তখন ভাত চাপল হাঁড়িতে। হা-হা।' আনন্দে রসুলও ডগমগ হয়ে বলল।

'সে বছরটাই ছিল আলাদা।'

'হুঁ। ভাত-কাপড়ের কোনো চিন্তাই ছিল না।'

'বটে। তারপরই সব ওলটপালট হয়ে গেল যেন—'

'হুঁ। পরপর দু সন অজন্মা গেল। কিছুই হলো না।'

হঠাৎই ওরা নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ভীষণ। চোখমুখের হাবভাব দ্রুত পাল্টে যায়। ভুরু কুঁচকে উঠে। থমথম করে হাওয়া।

চলতে চলতে রসুল আবার একসময় সবাক হয়, 'এ্যাই ছিদাম—'

'বল্?' ভারি বিমর্ষ শোনায় ওর কণ্ঠস্বর।

'তোর জমিটা যাহোক এবার ছাড়িয়ে নে—'

ছিদাম আড়-চোখে রসুলকে লক্ষ্য করে। কেমন অবাক হয়। বলে, 'আর তুই? নিজে ভাগী থেকে উচ্ছেদ হলি সে যে—'

চমকে রসুল সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। টান টান ধনুকের ছিলার মতন। ছিদামও দাঁড়িয়ে পড়ে কখন। চোখে চোখ রেখে বলে, 'উচ্ছেদ করলেই হলো যেন, হ্যাঁ! গাঁয়ের সবাই জানে তেরো বছর বাবুমশায়ের খালপাড়ের জমির বর্গা আমি—আর এখন উচ্ছেদ করলেই হলো। মগের মুলুক? তুই ছাখে নিস ছিদাম, ও জমির পরচা আমি নিবই—' বলেই ও আবার হাঁটতে থাকে। পিছনে পিছনে ছিদামও। মাঠ পেরিয়ে দূরে তখন দেখা যায় একফালি ছোট ওদের নিশ্চিন্দাপুর গ্রাম।

ভারতীয় জীবনে ও মননে শিল্পের স্থান

নীহাররঞ্জন রায়

দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে যে-সব শাস্ত্রগ্রন্থ, যেমন ভট্ট লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত—প্রভৃতি পণ্ডিতদের রচনা, তার কালসীমা ৭০০ থেকে ১০০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এঁরা সকলেই লিখেছেন কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে এবং এঁদের রচনাতেই প্রথম গুরুত্বের সঙ্গে কাব্যের আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ও উত্তর সন্ধান করা হয়েছে। এই আলঙ্কারিক-দের তত্ত্ব সম্প্রসারিত করে দৃশ্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রয়োগ করা যায়। এরা শিল্পের মর্মবস্তু, শিল্প-অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এবং শিল্পের প্রয়োজন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেন। এই পণ্ডিতেরাই, বিশেষ করে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এ-যাবৎ শিল্পের অবয়ব সংক্রান্ত এবং অকাদেমিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনার ধারাকে প্রায় একটা দার্শনিক প্রস্থানে উন্নীত করেন। তবুও স্বীকার করতে হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের পণ্ডিতরা যে তত্ত্বসৌধ নির্মাণ করলেন তার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল বহুশতাব্দী আগে ভরতের হাতে। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, শিল্প-অভিজ্ঞতা একটি বাস্তব আনন্দানুভূতি। শৃঙ্খলাময় শিল্পরূপের প্রভাবে জাত এক মানসিক-শারীরিক উপলব্ধি। এ আনন্দানুভূতি শিল্পবস্তুর কোনো গুণ নয় এবং শিল্পরূপ বিশ্লেষণ ও বোঝার চেষ্টা সফল হলেও শিল্প আস্বাদনের অভিজ্ঞতা কখনো বিশ্লেষণ করা যায় না, সে বিষয়ে কোনো ধারণা গঠন করাও যায় না। পরবর্তী পণ্ডিতদের সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়েছে এখান থেকে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্-এর উপরে লেখা যশোধরের টীকা—যাতে প্রথম শিল্পের ষড়ঙ্গ, নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা হয় এবং দৃশ্য-শিল্পের ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়—তারও রচনাকাল দশম শতাব্দী।

আনন্দবর্ধনের বক্তব্য ছিল, শিক্ষিত নৈপুণ্য বা উপস্থাপনার দক্ষতা শিল্পের মর্মবস্তু নয়, শিল্পের মর্ম নিহিত 'ধ্বনি'-তে, ভাবাবহ জাগাবার শক্তিতে। তাঁকে অনুসরণ করে অভিনবগুপ্ত নৈয়ায়িক-ব্যবহারিক বিচার-পদ্ধতির পথ বর্জন করে 'ভাব' সম্পর্কে একটি সুষম তত্ত্ব গড়ে তুললেন। ফলে শিল্প ও শিল্প-অভিজ্ঞতা মানবিক অনুভূতির বিষয় রূপে স্বীকৃতি পেল। শিল্পবস্তুর

রূপগত বৈশিষ্ট্য বিচারের পরিবর্তে শিল্পী ও সামাজিকের সৃজনবৃত্তি, পরাদৃষ্টি ও কল্পনাবৃত্তির দিক থেকে শিল্পের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা শুরু হল। তখন থেকে বক্তব্য দাঁড়ালো নৈপুণ্য ও ছন্দোবোধ থেকে সম্ভব হয় শিল্পের শরীরগত বা রূপগত বৈশিষ্ট্য সম্পাদন কিন্তু শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করে শিল্পীর প্রতিভা বা সৃজনশক্তি, তার পরাদৃষ্টি ও কল্পনা। নৈপুণ্য ও ছন্দোবোধ, প্রকৃতপক্ষে প্রকরণিক দক্ষতা ও উপকরণের সহায়ে কাজটি নিষ্পন্ন করার ক্ষমতা—কাব্যের উপকরণ শব্দ, সংগীতের উপকরণ ধ্বনি, নৃত্যের উপকরণ দেহের গতিভঙ্গি, ভাস্কর্যের উপকরণ পাথর।

প্রাচীন ও নবীন শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যে সাধারণভাবে যে পার্থক্য দেখা গেল তা থেকে এবং আমাদের কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মতো মূর্ত শিল্পের বিকাশধারার দৃষ্টান্তে কখনো কখনো আমার মনে হয়, প্রাচীন ও নবীন তত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কি অংশত হলেও আমাদের শিল্প-সাহিত্য বিকাশের ইতিহাসের দ্বারাই, তাঁদের সাক্ষাৎ শিল্প-অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়নি? উচ্চাঙ্গের মূর্তশিল্পের মধ্যে প্রাচীন তত্ত্ববিদ্‌দের সামনে ছিল মৌর্য-রাজসভার পরিপোষণে জাত শিল্প, পাঁচ শতাব্দী ধরে তৈরি পাথরে খোদাই করা বৌদ্ধ কাহিনী, অগণিত পোড়া মাটির কাজ এবং গুপ্ত যুগের সূচনা কালের শিল্পবস্তু। শেষোক্ত অংশ মোটামুটিভাবে প্রাচীন তত্ত্ববিদ্‌দের সমসাময়িক হওয়ায় হয়তো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি বা পরিপূর্ণ ও যথার্থভাবে বুঝবার চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু বিপুল পরিমাণ পাথরে খোদাই প্রতিরূপ ও কাহিনী বর্ণনাত্মক ভাস্কর্য, পোড়ামাটির কাজ এবং চরণচিত্র বা নানা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আঁকা জড়ানো পট তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল মনে হয়। সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁদের সামনে নিশ্চয়ই ছিল বীররসের কাহিনী বা প্রেম কাহিনী নিয়ে রচিত লৌকিক 'গাথা' এবং পরিশীলিত নাগরিক স্তরের নাটক, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ও ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা। প্রাকৃতে লেখা চতুর্ভাণ জাতীয় ছোট আকারের প্রহসনধর্মী রচনার কথাও হয়তো জানা ছিল। ভামহ ও দণ্ডীর মতো পণ্ডিত নিশ্চয়ই কালিদাসের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এসব রচনার কাব্যিক উৎকর্ষ ও নাট্যগুণ সম্পর্কে ধারণা হয়তো খুব ছোট পরিশীলিত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তখনো এগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের কাজ শুরু হয়নি। স্থাপত্য ও চিত্রকলায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের সৃষ্টি সম্পর্কেও এই একই কথা সত্য মনে হয়, অর্থাৎ তখনকার

শিল্পতাত্ত্বিকদের চেতনায় সমসাময়িক উচ্চাদ শিল্পের কোনো গভীর প্রভাব ছিল না। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ও প্রাচীন পণ্ডিতদের শাস্ত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হবে বর্ণনাত্মক ও প্রতিরূপ শিল্পের দিকেই এঁদের মনোযোগ একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে খুব সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্ণনাধর্মিতা ও প্রতিরূপধর্মিতাই ছিল পঞ্চম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য ও মূর্তশিল্পের বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের শিল্পে প্রধান অর্জনীয় বিষয় ছিল স্পষ্টতা ও অর্থবোধ, মানপরিমাণ ছন্দ ও সাযুজ্যের যথাযথ প্রতিরূপ সৃজন এবং পর্যাপ্ত প্রকরণিক দক্ষতা। এ থেকে বুঝতে পারা যায় কেন প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দ ও অর্থ, ব্যাকরণ ও অন্বয়, ছন্দ ও অলংকার—অর্থাৎ কাব্য বা নাটকের রূপগত গঠনের উপরে এত গুরুত্ব আরোপ করতেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্-এও সাধারণভাবে শিল্পের এই রূপগত শরীরগত বৈশিষ্ট্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃত হয়েছে দেখা যায়।

কিন্তু নবীন আলঙ্কারিকেরা, বিশেষভাবে ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত যখন কাব্য ও নাটক বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করেন, তাঁদের শিল্প-অভিজ্ঞতার পশ্চাৎপটে ছিল সমগ্র ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ বা মেঘদূতের মতো রচনার দৃষ্টান্তে তাঁদের মনে হয়েছে, শুধু প্রকরণিক দক্ষতার এবং রূপগঠনের গুণাগুণ বিশ্লেষণে এসব সৃষ্টির আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না ; এ ভিন্ন বস্তু, এ ক্ষেত্রে রূপ-গঠনের নিপুণতা জাগিয়ে তোলে এক ভাবানুভূতির আবহ। মূর্তশিল্প বিষয়ে যশোধরও মোটামুটিভাবে একই সিদ্ধান্ত করেছেন।

> রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
> সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্ ॥

চিত্রের এই যে ছয়টি অঙ্গ তিনি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে চারটি,—রূপ-ভেদ-প্রমাণ-সাদৃশ্য-বর্ণিকাভঙ্গ রূপগঠন সংক্রান্ত, যা শিল্পবস্তুর শরীরগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে। কিন্তু অপর দুটি, ভাব ও লাবণ্য—শিল্পের আত্মারই ধর্ম। সারনাথ বা মথুরার ভাস্কর্য, বাঘ ও অজন্তার চিত্রকলা, এলোরা ও এলিফ্যান্টার উৎকীর্ণ শিল্প—অর্থাৎ ভারতীয় মূর্তশিল্পের মহত্তম ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যশোধর তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন মনে করা যায়।

এতক্ষণ যেসব শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে সবই রীতিবদ্ধ, ছকে ফেলা আলোচনা। লেখক বা সংকলকেরা শিল্প ও শিল্পবৃত্তিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছেন। তারপরে বিষয় ও উদ্দেশ্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গুণাগুণ, প্রকৃতি ও মর্মের দিক থেকে তার উপকরণ ও প্রকরণ, প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোনো শিল্পবস্তুর সামনে এলে আরও মৌলিক প্রশ্ন মনে আসতে পারে। যেমন কোনো প্রস্তর-ভাস্কর্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে

> এই বস্তুটি আমায় আনন্দ দিচ্ছে এবং একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা জোগাচ্ছে। কিন্তু মূলে এটি ছিল একখণ্ড পাথর, জড়বস্তু; এতে প্রাণ সঞ্চারিত হল কী ভাবে? কী করে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু হয়ে উঠল?

যদি শিল্পী এই রূপান্তর সাধন করে থাকেন তবে তিনি কীভাবে তা করেছেন? শিল্পী যদি নির্মাতা বা বিষয়ী হন এবং নির্মিত শিল্পবস্তুটি যদি শিল্প-বিষয় হয়, তাহলে শিল্পবিষয়টি কি পাথরের টুকরোর মধ্যেই নিহিত ছিল অথবা শিল্পীর মনে ও কল্পনায় বিধৃত ছিল? অথবা উভয়ত্রই বিদ্যমান ছিল এবং পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় আকার ও রূপ পেয়েছে?

> শিল্পবস্তু একটি নির্মিত রূপ। রূপহীন পাথরের টুকরো যা জড়বস্তু মাত্র, তা থেকে এই শিল্পরূপটি উদ্ভবের বিকাশ পদ্ধতি কী? অর্থাৎ রূপ ও বস্তুর সম্পর্ক কী?

এসব প্রশ্ন সৃজনপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত এমন সব সমস্যা সূচিত করে যা আমাদের শিল্পশাস্ত্রে-অলংকারশাস্ত্রে উত্থাপিত হয় নি, তাই সেখানে এর কোনো উত্তরও পাওয়া যায় না।

এ রকম আরও প্রশ্ন উঠতে পারে

> শিল্প 'নাম' ও 'রূপ'-এর জগতের বিষয়, যা 'কাম' বা সৃজনবাসনার এলাকার ব্যাপার। ভারতীয় ঐতিহ্যে মোক্ষ ও নির্বাণকে অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে বাসনা নির্বাপনকে, 'নাম' ও 'রূপ'-এর অতীত কোনো লোকে পৌঁছনোকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে আশা হয়েছে। তাহলে ভারতের সমস্ত ধর্মমতে শিল্পকলাকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপায়

হিশাবে ব্যবহার করা হয়েছে কী করে? মোক্ষ ও নির্বাণ যে প্রত্যাশা করে তার পক্ষে শিল্পের উপযোগিতা কী?

যদি ধরে নেওয়া যায়, ব্যবহারিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে শিল্পের উপযোগিতা স্বীকৃতি ছিল—তাহলে শিল্পের ভূমিকা কী ছিল এবং কী ধরনের দৃষ্টিতে শিল্পকে দেখা হত?

এ জাতীয় সাধারণ প্রশ্নেও পূর্বোক্ত শিল্পশাস্ত্র থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

এর কারণ সন্ধানে বেশি দূর যেতে হয় না। রূপ ও উপকরণ, বিষয়ী ও বিষয়, শিল্পী ও শিল্পসামগ্রী, সৃজন-প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ক প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসামূলক এবং দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত। মনে হয়, খৃস্টীয় অব্দের সূচনা অবধি এই দুই ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল তা মেনে নিয়ে পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় আলোচনা চালানো হয়েছে। ভারতীয় শিল্প বিষয়ে কোনো পর্যালোচনায় সেইসব সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, এখানে আমি সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করব।

যারা মোক্ষ প্রত্যাশী বা মোক্ষলাভ করেছিল তাদের পক্ষে শিল্পের কোনো উপযোগিতা ছিল কিনা—প্রথমে এই প্রশ্নটির মীমাংসা করা যেতে পারে। সকলেই জানেন অন্তত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে ভারতে 'মোক্ষ' বা বৌদ্ধ পরিভাষায় 'নির্বাণ' ছিল মানব অস্তিত্বের চরম আদর্শগত লক্ষ্য। শিল্পের জগৎ যে 'নাম' ও 'রূপ'-এর সীমায়, মোক্ষদশার অবস্থান তার বিপরীতে 'নাম'-হীন অ-রূপ কোনো লোকে। মোক্ষপথের পথিকদের তাই শিল্পের প্রতি সাক্ষাৎ বা দূরতম কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। বস্তুত কোনো কোনো প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় শিল্পকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বাধাই মনে করা হয়েছে। যতদূর জানা যায়, মতবাদের দিক থেকে আদি বৌদ্ধধর্মের ও জৈনধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি এই ধরনের ছিল। দুই ধর্মেই সঙ্গীতকে মনে করা হত মোহ সঞ্চারী, 'মুহূর্ত-সুখ' প্রদায়ী; অন্যান্য শিল্পকেও ইন্দ্রিয় সুখের উৎস ও বাসনা তৃপ্তিকর মাত্র মনে করা হয়েছে। হয়তো এই ধারণার জন্যই বুদ্ধদেব তাঁর আবাস চিত্রালঙ্কারে সাজানোয় আপত্তি করেন। অনেক পরবর্তীকালে বুদ্ধঘোষের উল্লেখ থেকে মনে হয়, জীবনের কোনো একটা পর্বে বুদ্ধদেবের মত পরিবর্তিত

হয়েছিল, চরণচিত্র বা জড়ানো পট সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং চিত্র বা ভাস্কর্যকে মনন ফল বলে বিবেচনা করেছিলেন। তবুও একথা সত্য যে সন্ন্যাস আশ্রিত আদি বৌদ্ধধর্ম সাধারণভাবে শিল্পের প্রতি বিরূপ ছিল। এই একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল শংকরভাষ্য নির্ভর বেদান্ত দর্শনে। এই মত অনুযায়ী 'নাম' ও 'রূপ'-এর এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া মাত্র, ভ্রমত্তার কারণ। শিল্প যেহেতু 'নাম' ও 'রূপ'-এর এলাকার ব্যাপার তাই পরামুক্তি যারা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের পক্ষে শিল্প পাশস্বরূপ।

কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে বৌদ্ধ ও জৈন এবং বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আশ্রিত জীবনধারা থেকে বিপুল পরিমাণ শিল্পসামগ্রীর উদ্ভব হয়েছে, যার একটা বড়ো অংশ উচ্চতম নান্দনিক শর্ত পূরণ করে। এটা কী করে সম্ভব হল?

আমার বিশ্বাস এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যেও বেশি দূর যাবার প্রয়োজন হয় না।

বৌদ্ধ ও জৈন দুটি ধর্মই ছিল সন্ন্যাস আশ্রিত এবং উভয় ধর্মে যে সংযমবিধি নির্দিষ্ট হয়েছিল সে শুধু উভয় সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয়, বৃহত্তর বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচরণবিধি মোটের উপর অনেক বড়ো ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ গ্রামীণ-সমাজ ও উপজাতীয় সমাজ থেকে কিছু পৃথক ছিল না। তাছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ, জৈনদের চেয়ে বৌদ্ধরাই বেশি,—ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের আকৃষ্ট করার দিক থেকে এবং নিজেদের পুরাণ-উপকথা, প্রতীক-প্রতিমা প্রচারের পক্ষে শিল্পকে একটা প্রত্যক্ষ ও কার্যকর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মতো মূর্ত শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষার চিরাচরিত উপায় ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষু নেতৃবৃন্দ এক সময়ের মতবাদগত বাধা সরিয়ে রেখে এই সব পদ্ধতির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন।

আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মতাদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরামুক্তিবাদের মোকাবিলা করা হয়েছিল। উপনিষদে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে, যেমন কঠোপনিষদে, যেখানে বলা হয়েছে যে ইহলোকে জীবৎকালেই 'মুক্তি' অর্জন সম্ভব। পরলোক সম্পর্কে পুরনো বিশ্বাসের জের যা মানুষকে ইহজীবনের বাস্তবতা বিষয়ে নিরুৎসুক ও অতত্ত্বাপরায়ণ

করে তোলে এবং নানা ধরনের ও নানা মাত্রার তপশ্চর্যার পোষকতা করে—কখনোই ভারতীয় মানস সম্পূর্ণভাবে তার প্রভাব মুক্ত হতে পারে নি ঠিকই। তবুও মানা হয়েছে এবং বেশ জোর দিয়েই বলা হয়েছে যে-কোনো নিষ্ঠাবান মানুষের পক্ষে বাস্তব জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতার বাধা পেরিয়ে এই জগতেই, এখানেই মোক্ষ অর্জন সম্ভব। বস্তুত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ ব্রাহ্মণ্য নীতিবিদ্যা ও মনোবিদ্যায় এ আদর্শ উচ্চতম জীবনাদর্শ রূপে স্বীকৃত হয় এবং সাধারণভাবে ভারতীয় জীবনদৃষ্টিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। একে বলা হত জীবন্মুক্তির আদর্শ,—কোনো লোকান্তরে নয়, এই জীবনেই মুক্তি অর্জন।

ভারতীয় জীবনে, বিশেষ করে নৈতিক ও শিল্প বিষয়ক ধারণা গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে জীবন্মুক্তির আদর্শের প্রভাব সুগভীর। এ বিষয়ে হিরিয়ান্না বলেছেন, 'এই আদর্শ ভারতীয় মানুষের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি রূপান্তরিত করেছে এবং নৈতিক আদর্শ নতুন ছাঁদে গড়ে তুলেছে।...জীবনের লক্ষ্য আর ইহলোকের পরপারের অভিষ্ট বলে ধারণা করার প্রয়োজন রইল না, ইহলোকে, চাইলে বর্তমানেই উপলব্ধি সম্ভব মনে করা হলো। স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি দমন করে নয়, তাদের পরিশুদ্ধ ও পরিস্রুত করে সামঞ্জস্যময় জীবন অর্জন করাই এই নতুন আদর্শ।...এ আদর্শ সাধনের জন্য অনুভূতির পরিশীলন প্রাথমিক প্রয়োজন এবং ফলত জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য হিশাবে বুদ্ধিচর্চা বা ইচ্ছাশক্তি বিকাশের দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হলো না, যতটা দেওয়া হলো অনুভূতি কর্ষিত করে তোলার উপরে।' (M. Hiriyanna, *Art Experience*, Mysore, 1954, P 4 অনূদিত)। শিল্প-বৃত্তি ভিন্ন আর কোন্ মানবিক বৃত্তির সাহায্যে সার্থকভাবে অনুভূতির পরিশীলন সম্ভব? তাই আমাদের শিল্পশাস্ত্রে 'ভাব' ও 'রস' সম্পর্কে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের দিকে এবং শিল্পের মাধ্যমে ভাব ও রস সুষ্ঠুভাবে জাগানো ও নিয়মন-সংযমনের দিকে এত যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তা আদৌ অযৌক্তিক নয়। আমাদের ইতিহাসের আদিতম পর্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছিল শিল্প আত্মসংস্কৃতির উপায়। প্রধানত অনুভূতি ও আবেগের দিক থেকে আত্মোৎকর্ষ সাধন, গৌণত বুদ্ধির দিক থেকে।

ইরান জার্নাল : তাব্রিজে

দরবেশ

প্রকাণ্ড জানলার ধারে বিছানায় শুয়ে আরাম করে প্রভাতি চা খাচ্ছি। আকাশছোঁ ফাইভ-স্টার হোটেল। আকাশেরই যার মধ্যিখানে আমার ঘর। কাচে ঢাকা বিরাট জানলা। হাত বাড়িয়ে জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে দিই। আকাশে ম্লান একখানি চাঁদ। জানলার বাইরে রাজপথে বরফ পড়ছে। বরফ পড়ছে তো পড়ছেই। উষাকালের আলোয় তাই দেখছি। একটু পরেই আকাশের নিচু দিয়ে শব্দ করে উড়বে ব্রাউন-নীল সেই সব পাখিরা যাদের নাম আমি জানি নে। রাস্তা গড়িয়ে দৈত্যাকার একটা ট্যাঙ্ক যাচ্ছে। মুখে যেন মোটা একটা অশ্লীল চুরুট। অটোমেটিক মেশিনগান্।

হামাগুড়ি দিচ্ছে মিলিটারি ট্যাঙ্ক। মেড ইন ইংল্যাণ্ড।

জানলার পাল্লা খুললেই শুনতে পাব ফজরের নমাজ পড়ার ডাক। শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে।

কালকে একজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু। বয়েস বছর চল্লিশের কাছাকাছি। তার একটা ছাপাখানা ছিল। পৈতৃক কারবার। বন্ধুবান্ধবদের কথায় ফেরে পড়ে সে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিল। মাত্রই সাহিত্য পত্রিকা। সেইটেই হয়েছিল তার কাল। পত্রিকায় 'হেমলেট' 'মেকবেথ', আর 'রিচার্ড থার্ড' বিষয়ে একটি নিবন্ধ ছেপেছিল সে। সে নাকি জানত না শেকস্‌পীয়ারের এই বই তিনটি শাহেনশাহি আইনের এদেশে বাজেয়াপ্ত বই। বাজেয়াপ্ত, কারণ, এই তিনটি গ্রন্থে নাকি রাজাকে হত্যা করার উসকানি আছে। বন্ধুবরের কাগজে নিবন্ধটি ছেপে বেরোনো-মাত্র পত্রিকার দপ্তরে সাভাক-পুলিশ হানা দেয়। সাপ্তাহিকটার অপমৃত্যু কেন ঘটল সেটা যেন বোঝা গেল; কেন আমার বন্ধুকে এক বছরের মেয়াদে কয়েদখানায় রাখা হলো তাও বুঝলাম। কিন্তু প্রেসটাও তুলে দিতে বাধ্য হয় আমার বন্ধু। জীবনে এমন একটি অবসর আসবে ভাবতেও পারে নি সে। ফার্সীভাষায় যাকে নজরবন্দ বলে, সে এখন তা-ই। আন্-অফিশিয়েলি।

যাই হোক, প্রেস-ট্রেস তুলে দিয়ে বন্ধুটি বর্তমানে একটি বাতিক নিয়ে

বাস্ত। বাতিকটা হলো, কোথায় কোন শহরে কোন জেলায় কি ধরনের আড্ডা বসে তার প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা। রীসার্চ ওয়র্ক। বাতিকটা নিয়ে সুখেই আছে সে। অন্তত একজন সম্পাদকের চাইতে যে সুখী তার আর বলার কী।

কালকে যখন তার ডেরায় হাজির হয়েছি, ইয়ার-বকশীয়ের নিয়ে তখন সেখানে একটা মিনি আড্ডা চলছিল। বিষয়: আড্ডার ধরন। গোটা ইরানে এখন নাকি আড্ডাগুলো আগেকার চেয়ে মজাদার হয়ে উঠেছে। আগেকার চেয়ে আরো বাক্‌প্রবণ। আড্ডাবাজদের মানসিক গঠনভঙ্গিই নাকি আমূল পালটে গেছে। ট্র্যাজেডিকেও এখন নাকি কমিক করে দেখতে শিখছে আড্ডাবাজরা। সংবাদ টিপ্পনি যাই পরিবেশিত হোক না কেন আড্ডায়, বাগবৈদগ্ধের দরুন সবেতেই মেজাজি রূপক ব্যবহার হয়। ফলে ট্র্যাজেডিও ব্যঙ্গের উপাদান হয়ে যায়।

আড্ডার আকর্ষণ এদেশের সর্বত্রই একটা জবর টান। জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলে তবেই বোধ হয় আড্ডাবাজ হওয়া সম্ভব। বন্ধুর ওখানে বসে জমিয়ে আমিও আড্ডা দিচ্ছিলাম, একসময় বন্ধুটি আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গম্ভীরস্বরে বলল, দরবেশ, বলতে পারো আমাদের কী দশা হবে? তোমাকে সত্যি বলছি, বড়লোকেরা এদেশে এখন শাহেনশার দেখাদেখি সোনা দিয়ে গড়ছে তাদের পায়খানা; অথচ পাকা পায়খানার অভাবে আমরা এখনো মাঠেঘাটে গিয়ে প্রাতঃক্রিয়া করে আসছি! জানো, আমার পেছনে আবার শাহেনশার সিক্রেট পুলিশ পড়েছে? যাই হোক, হয়ত দু-এক দিনের মধ্যেই আমি হাওয়া হয়ে যেতে বাধ্য হব। তখন আমার খোঁজ কোরো না কিন্তু। তাহলে তুমিও খামোকা ক্যাসাদে পড়বে। বুঝলে?

ক্যাসাদে পড়া বন্ধুর আড্ডা থেকে চলে এসেছিলাম শিন্টুদের মুসাফির-খানায়। যা বুঝেছি, তাব্রিজে শিগ্‌গিরি একটা কিছু হাঙ্গামা ঘটতে যাচ্ছে। হিচ্‌হাইকের শিন্টুরা পথের মাঝে যদি কোনো বিপদে পড়ে? শিন্টু তো আর একা নয়, সঙ্গে রয়েছে একটি বাঙালি মেয়ে।

শুয়ে শুয়ে চা খেতে খেতে দেখছি জানলার বাইরের দৃশ্যটা। দিগন্তে আকাশ-ছোঁয়া বরফ-শাদা পাহাড়ের তরঙ্গ। শাদার ওপর আছড়ে পড়ছে রক্তিম আভার বন্যা।

বাইরে এখন আর বরফ পড়ছে না। আজ তাহলে রোদ উঠবে।

ফাঁকা রাস্তা। গাধার পিঠে একটি তরুণী যাচ্ছে। এরই মধ্যে ডিঙিরিক্সাও রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এই শীতের মধ্যে ঠাণ্ডায়। খবরের কাগজের বাণ্ডিল ঘাড়ে ছুটছে হকাররা।

নাঃ, আর শুয়ে থাকা নয়। এবার উঠে পড়ি।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলাম। গমগম করছে ডাইনিং রুম। বিজনেস্ রিপ্রেসেনটেটিভ, কোম্পানীর মালিক, ইউরোপীয় কারবারী। তাব্রিজে আধুনিক কলকারখানা বসেছে। আর সেকেলে পাথুরে গুমজ-টুমজের তাব্রিজ এখন নয়; লোহালক্কড় কংক্রীটের বানানো হাই-লাইফের তাব্রিজ: ইয়া লম্বা-লম্বা পাইপ লাইন দিয়ে এই পথে কোটি কোটি টাকার গ্যাস যাচ্ছে রাশিয়ায়।

হোটেলে মার্কিনী স্টাইলের স্বাচ্ছন্দ্য নিখুঁত। বেশির ভাগ বাসিন্দেই আমেরিকান। কি জানি, এই হোটেলের মালিকও বোধহয় রাজপরিবারেরই কেউ। সম্ভবত শাহেনশা স্বয়ং। দেশে-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ওঁদের কোটি কোটি টাকার পেল্লায় পেল্লায় সম্পত্তি। এত সম্পত্তি দিয়ে কী করবে ওরা? মরবার দিন সঙ্গে নিয়ে যাবে সব সম্পত্তি?

ওদিকের টেবিলে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে মার্কিন ব্যাবসায়ীরা। ওদেরই পাশে ভারতীয় একজন রাজপুরুষ। কালকে আমি ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়েছিলুম। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যদি জানত আমি সাংবাদিক তাহলে বোধকরি মুখ ফেরাত না।

কি ছিল আর দেখতে দেখতে কী হয়ে গেল তাব্রিজ। শাহেনশাহি আধুনিকতার হুজুগে পড়ে এখানেও ক্যাবারে পর্যন্ত খোলা হয়েছে। তাতে ইজিপ্ট থেকে আনানো নাচনে-ওয়ালিদের বেলি ডান্স হয়। কাপড় খোলা নাচ।

শহরের যত্রতত্র মার্কিনি স্টাইলের পানশালা, ডিস্কোথ। স্পোকন্ ইংরেজি শেখার ইস্কুল। বুকস্টলে 'প্লে-বয়' ম্যাগাজিন। সিনেমা হলে সেক্সি ছবি।

তাব্রিজি ছেলেমেয়েরাও আর আগের মতো পিছিয়ে নেই। মার্কিনি সভ্যতার সঙ্গে দ্রুত পাল্লা দিচ্ছে। পারছে কী পাল্লা দিতে? এদেরই তো একজন কালকে আমাকে বলল, দেখছেন, দেশের কি রকম হোলসেল কালচুরাল বাস্টার্ডাইজেশন?

বাস্তবিকই, দিনকাল দ্রুত বদলাচ্ছে। কোন দিকে?

উটকো একটা মন্তব্য আস্তে করে উচ্চারিত হলেও আমার কানে সেটা ধাঁ করে এসে লাগল। আমার পাশের টেবিলে এরা ইরানী। বয়েস কম। স্থানীয় দৈনিকপত্র 'মাহে আজাদি'-র প্রথম পৃষ্ঠায় শাহেনশার প্রকাণ্ড ছবি। ছবিটা দেখতে দেখতে একজন ছোকরা মন্তব্য করল, 'এঁর বাপেরই মতো এঁরও দিন ফুরিয়ে আসছে। অতি-বাড়ের ফল সব দেশেই এক।'

ছেলেটার কী কোনো ভয়ডর নেই? গুপ্ত পুলিশের কেউ শুনতে পেলে জন্মের মতো শেষ এই ব্রেকফাস্ট খাওয়া।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি বাইরে বেরুচ্ছি, রিশেপশনের স্মার্ট এবং 'মড' মেয়েটি কেক-পেস্ট্রির সুন্দর একটা বাক্স আর দুখানা টিকিট দিল আমাকে। সিনেমা যাওয়ার টিকিট নয়; এরজুরুম যাওয়ার ইনটারন্যাশনাল বাস টিকিট। আগামী কালকের ডেট। শিলটুদের জন্যে বলে রেখেছিলুম। ঝটপট এই রিশেপশন-মেয়েদের কাজ। লক্ষ্মী মেয়ে।

রাস্তায় রুপোলি রোদের ফুলঝুরি। দালানকোঠাগুলো যেন আলোর ঢেউয়ের ওপর ভাসছে। দোকানপাটের ঝাঁপি এখনো খোলে নি। কালকে এমন সময় শিলটুরা চলে যাবে ককেশাস পাহাড়ের ঐতিহাসিক রাস্তা বেয়ে, যে রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে পরম সাহসী কিন্তু চরম উদ্ধত আর্যরা এসেছিল ভারতে; ধর্মে দর্শনে বিজ্ঞানে আলোকিত করেছিল ভূমণ্ডল।

এই বিশ্বের যত ঔদ্ধত্যতারও প্রপিতামহ কি তাঁরাই?

শিলটুদের মুসাফিরখানায় এসে দেখি ছোট্ট একটি স্টোভে ওরা চায়ের জল চাপিয়েছে। আমাকে দেখে বেজায় খুশি। ফুটন্ত জলে আরেক মগ জল ঝট ঢেলে দিল।

খোঁপা খুলে পিঠে চুল ছড়ানো স্বাতীর মুখখানি ভারি মিষ্টি।

বিদেশে স্বজাতিকে পেলে এত ভাল লাগে। তাও আবার কুরুপাণ্ডবের পূর্বপুরুষের এই তাব্রিজে।

চা পেস্ট্রি খেতে খেতে শিলটু বললে, 'দরবেশদা, এত করে তো দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ফিরে গিয়ে চাকরি-বাকরি না পেলে সমস্ত প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে।'

শুনে বুকটা কেমন করে উঠল। জানি তো, আমাদের দেশে চাকরি পাওয়াটা নিতান্তই একটা লটারি। বললাম, 'কেন পাবে না চাকরি। নিশ্চয়ই পাবে।'

'আপনি বলছেন, কিন্তু ভরসা মোটেই পাচ্ছিনে। পুরো তিনটে বছর

কষ্টে একেবারে মরে যাচ্ছিলাম ; তবু চাকরির টিকি দেখি নি। কি করে যে বন্দর-আব্বাস পর্যন্ত জাহাজের মাস্তুল জুগিয়েছি আমিই জানি।'

মনটা কেমন অসাড় হয়ে গেল। এই মুসাফিরখানায় একবার আমিও আস্তানা নিয়েছিলাম। সামনের ফুটপাতে ফুলের দোকানটার মালিক আমার চেনা। এই মালিকের বন্ধু একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে আমারও ভাবসাব হয়েছিল। বড়ই সরল ছিল তার মন। তেমনি ছিল সে দিল-দরাজ। জাতে আরমানি। স্বেচ্ছায় আমার দোভাষী হয়েছিল। আজারবাইজানের ভাষাটা রাষ্ট্রভাষা ফার্সী থেকে কিছুটা ভিন্ন। যেমন হিন্দির সঙ্গে বাংলার প্রভেদ, তেমনি। পরের বারে এখানে এসে শুনেছিলাম আমার আরমানি বন্ধুটি তার বইয়ের কালেকশান আর কারপেট বেচেবুচে বিবিবাচ্চা সমেত আরমেনিয়ান প্রজাতন্ত্রে চলে গেছে।

আসলে আরমেনিয়ান প্রজাতন্ত্রে চলে যাওয়ার খবরটাই ছিল নিছক একটি পুলিশি গুজব। সাভাক-গুপ্তপুলিশ এই গুজবটির জন্মদাতা। তাব্রিজে এখন আর কারো অজানা নয়, সাভাক-পুলিশ যন্ত্রণা দিয়ে মেরে সাবাড় করেছিল এই পরিবারটিকে। পুলিশের গুজব অনুসারে আমার এই বন্ধুটি ছিল নাকি 'ছুপে রুস্তম'—লুকিয়ে লুকিয়ে কমিউনিস্ট।

কিন্তু তিন বছরের তার সন্তানটি তো আর রাজনীতি বুঝতো না ; বুঝতো না কেন রাজপরিবারের সকলে এদেশে সোনার পায়খানায় হাগে আর সাধারণ মানুষের ভাগ্যে পাকা একটি পায়খানাও জোটে না। তাকে কেন রাজরাজেশ্বর শাহেনশার পেয়ারের গুণ্ডারা মেরে ফেলল? আর আমার বন্ধুর অন্ধ স্ত্রী? তাকে কেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করান হল?

দূর ছাই, মনটা মুষড়ে গেল।

তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম। শিল্পীদের দেখিয়ে আনলাম ঐতিহাসিক আর্ক, যেখানে শুরু হয়েছিল এদেশে শাহেনশার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। দেখিয়ে আনলাম নীলা মসজিদ। বাজার। বিখ্যাত সেই বাজার যা হাজার বছর আগেও রমরম করত দিশি-বিদেশি কারবারিদের কেনাকাটায়।

চার-চারটে দেশের মিলনতীর্থ এই তাব্রিজে বোধহয় বাজার শব্দটার জন্ম। শব্দটা তারপর গিয়ে ঠাঁই পেয়েছে আমাদেরও অভিধানে। বাজার মানে মেলা। সবার সাথে সবার যেখানে মিলন হয়।

সব দেখেটেখে দু'পাশে দোকানঘরের সার দেওয়া বড় রাস্তার একটা

গলিতে ঢুকে কলের গানে হিন্দী গীত শুনতে শুনতে দুপুরের আহার। মৌটুলি-ভাজা দিয়ে ফুলো-ফুলো নানরুটি। কচি ভেড়ার মাংস দিয়ে দুধের মতো শাদা ভাত। দুধার ভালনা মাখিয়ে পাতলা-পাতলা রুমালি রুটি। কাবাব তাফতান। গজ-মিষ্টি। মোরব্বা। আঙুরের পায়েশ। আর দই।

আজারবাইজানিরা দই খেতে এত ভালোও বাসে। নাস্তায় দই, দুপুরের খাওয়ায় দই, বিকেলে শুধু মুখে দই, রাত্তিরে দই। দই চাই এদের ঘড়ি-ঘড়ি। এই দইয়ের দরুন এদের নাকি এত লম্বা আয়ু। আর মেয়েরা দেখতে কেমন স্বাস্থ্যবতী ?

এক ঝিলিক হাসল স্বাতী, 'এমন পেট পুরে যে কবে খেয়েছিলাম ভুলেও গেছি। ক'দিন ধরে যা খেলাম। পরশু রাত্তিরে, কালকে দু'বেলা। আর এই আজ এখন।'

শুনে ভারি কষ্ট হল। আবার এও ভাবলাম, ভরপেট খেয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ইট-পাথরে গড়া দেশ দেখায় বাহাদুরি আছে : তবে সেটা ফরেন এক্সচেঞ্জ হাতানোর কারসাজি। আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে মুসাফিরি করার সঙ্গে নিজস্ব একটা হয়ে ওঠা আছে। সেই হয়ে ওঠায় যে আনন্দ যে অভিজ্ঞতা যে সার্থকতা তার তুলনা কই ?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাস্তায় নেমে বললাম, 'এবার তোমরা দু'জনে একা একা একটু বেড়াবে, না এই বুড়োকেও সঙ্গে চাই ?' আমার কথায় কুলকুল করে হেসে ফেলল দু'জনাতে। স্বাতী বলল, 'আপনি বললেন, আর অমনি সখের বুড়ো মানুষকে ছেড়ে দিলাম ?'

সাধারণ একটা সুতির শাড়ি-পরা মেয়েকে সকলে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। এমনটি এরা দেখেনি কখনো।

কাজ আমারও আছে। দু-একজন পরিচিতদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে। তাদের একজন সাংবাদিক। অতঃপর সরকারি কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাত করার আছে। জীবিকার তাগিদে।

ঠিক হ্যায়। আজও আমার ছুটি। ওটা নয়, এটাই আমার জীবন।

খানিকটা পথ এগিয়ে স্বাতী বলে, 'বড় মজা তো, এখানে দই ছাড়া দোকান দেখিনে।'

বাস্তবিক, তাব্রিজের দই দেখলে তাক লাগে। দই-অন্ত প্রাণীদের জন্যে

কনফেকশনারদের শো-উইণ্ডোয় মিলবে রকমারি খই। খই আর মুড়কি-চিঁড়ে ভাজা, পেস্তা ভাজা, খোবানি কিসমিস মনাক্কা।

সোনার গয়নার দোকানে বসে একজন খদ্দের দাবা খেলছে দোকানদারের সঙ্গে। মাদুলি-তাবিজের দোকানদার গুড়ুক-গুড়ুক হুক্কা টানছে। পুরনো হাঁড়ি-কলসির দোকানে বেজায় ভিড়। পাশ দিয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তায় লাঠি ঠুকে ঠুকে যাচ্ছে অন্ধ এক ভিখিরি বুড়ি। 'ইয়া আল্লা, মেহেরবান!' গায়ে ছেঁড়াকোঁড়া একটা চট জড়ানো। খালি পা।

শীতকাল। ককেশাস পাহাড়ের শীতল পথ। তার ওপর খালি একজোড়া পা। ফেটে-ফুটে চৌচির। যেন আমারই মায়ের পা। মা। তুমি তো দেখো নি তাব্রিজ।

সঙ্গে এখন পরভিন থাকলে হয়ত সে এখন নিজের মনে ভাবত, বিবেকের গলা যদি না টিপে ধরি, তাহলে প্রশ্ন করতেই হয়, জাতীয় সম্পদ পেট্রোল থেকে মাথা পিছু প্রত্যেক ইরানী মানুষের যে সাড়ে চার হাজার টাকা আয়; এই বুড়ির পাওনা টাকা প্রাপ্য টাকাটুকু হাতে পেলেই তো অন্ধ এই থুথ্‌থুড়ে বুড়ি পায়ের ওপর পা রেখে দিব্যি আরাম—সে ঘরে থাকতে পারে!

যাই বলো, পরভিনের সঙ্গে বেশ মজার মজার কথা হয় এই বাজারে। বেশি কথা বলে না পরভিন। অথচ না বলেও যেন অনেক কিছু বলে ফেলে সে। তেলের দরুন দেশে তো এখন অগাধ টাকা। সেই টাকার বেশ কিছুটা শাহেনশা নিজের ব্যক্তিগত একাউন্টে পাচার করছেন, কোটি কোটি টাকার পেল্লায়-পেল্লায় সম্পত্তি কিনছেন আমেরিকায়, বিলেতে, ফ্রান্সে, দক্ষিণ আমেরিকায়, সুইজারল্যাণ্ডে, এমন কি স্পেন দেশেও; এমন কোনো ইরানী কারবার ব্যবসাই নেই, যাতে শাহেনশার মোটারকম শেয়ার নেই। শাহেনশাহি লোলুপতার এই উদাহরণটা পরভিন সুন্দর একটি তুলনার মধ্যে ফুটিয়ে ছিল। তুলনাটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

কথা বলার ধরনটাই পরভিনের অমনি। যা বলার বড়ই সংক্ষেপে হঠাৎ করে বলে। যেমন, আমি এবার যেদিন তেহরান থেকে রওনা হই, সে বলল, ফিরে আসুন, দেরীউশ শায়েগাম পড়াবো আপনাকে।

দেরীউশ শায়েগাম? তিনি আবার কে? তেহরানবাসী তিনি একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। তাঁর বক্তব্য, ইন দি ইরানীয়ান ক্যারেক্টার মিরাকল্ অলওয়েজ হ্যাপন্‌স্ অ্যাট দি লাস্ট মোমেন্ট। শেষ মুহূর্তেই ইরানী চরিত্রে মিরাকল্ ঘটে যায়।

ঘোরো ব্যাপার। বেরীউশ সায়েবের ওই একটি কোটেশন দিলেই তো ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারতাম। তাঁর সমগ্র রচনা আমাকে অত করে পড়তে হবে কেন? কি জানি, পরভিন সম্ভবত কোনো নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আছে।

স্বাতী শুধোলো, 'বাটা কোম্পানি এখানেও নাকি একটা নতুন শো রুম খুলবে?'

'তার শো রুমেও দুই থাকবে।' দুষ্টুমুখে শিলটু বলল।

'ধ্যাৎ!' ঠোঁটের কোণে হেসে স্বাতী টুপির দোকানটা ছাড়িয়ে চলে গেল যেখানে দোকানপাটের ফাঁকে ফাঁকে বরফ-ছাওয়া ককেশাস পাহাড়ে রোদ পড়ে সূর্যের সাত রঙ ঝিকমিক করছে। আবার তখুনি আমাদের পিছিয়ে থাকতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল। দুই কানে শাদা পাথরের সাধারণ দুটি দুল—আই.এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে জেনেও স্থির করল বড় ঘরের কেরানী না হয়ে দেশ দেখবে, বিশ্বের মানুষ দেখবে, যদি পারে তো হাতে-কলমে কিছু কাজ শিখবে। বাড়ির ছোট মেয়ে। আগুপিছু না ভেবে চোখ কান বুজে বেরিয়ে পড়েছে কারুর কথা না শুনে।

পশমের একটা টুপি কিনলাম! কালকে দেখেছিলাম, শিলটুর কান দুটো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে কালচে ধরে গিয়েছিল। শিলটু কিছুতেই নেবে না আমার কেনা টুপিটা—শিলটু এম. এস. সি. পাশ করে দাদার সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকত। পাসপোর্ট আপিশে গিয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। চাকরি খোঁজে; যে কোনো চাকরি। দেখল অচেনা একটি মেয়ে পাস-পোর্ট নিতে এসেছে। স্বাতী।

বিস্তর ঝোলাঝুলি করতে হল, তবে টুপিটা নিয়ে কাঁধের ঝুলিতে যত্ন করে রাখল শিলটু। সূর্যের আলোয় মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। স্বাতীর বেলাতেও তা-ই। কান ঢাকার চামড়ার ওড়না ও নেবে না। কিছুতেই না! কখখনো না। কেন মিছিমিছি খরচ। এত দামী জিনিস। বাব্বা, কী দরকার?

দরকারটা আমার।

বললাম, রাস্তায় যে কেমন ঠাণ্ডা পড়ে মালুম হবে। এরজুরুমকে সাধে কি আর বলা হয় এদিককার সাইবেরিয়া?

সেও এক বিচিত্র দেশ।

খোজা নসরুদ্দিন না কার যেন জবানায়। শীতকালে একবার নাকি

জেকেন্দুঁতে বরফের কনকনে ঠাণ্ডায় কার হাবেলির ছাতে, কি কুক্ষণে একটা মিনিবেড়াল উঠেছিল। এক পা খাড়া করে যেমনভাবে কার্নিশে উঠে দাঁড়িয়েছিল অবিকল তেমনিভাবেই ঠাণ্ডায় বিলকুল জমে গিয়ে একদম কুলফি হয়ে গিয়েছিল বেড়ালটা। যেতে যেতে শীতের পর যখন বসন্ত এল, সেই হাবেলির রাস্তায় যাচ্ছিল গোঁফে তা দিয়ে একটা হলো বেড়াল। তার ডাক শুনে মিনি বেড়ালটা আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে ম্যাঁও বলে এক লাফ দিতে পেড়েছিল।

গল্পটা শুনে শিলটুরা খলখলিয়ে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে স্বাতী বললে, 'আপনার বন্ধু, যার হাবেলিতে গিয়ে ওখানে আমরা উঠবো, তিনিই তো আপনাকে গল্পটা বলেছেন? তা আপনার বন্ধুমশাই কী করেন নিরিবিলি ওই সাইবেরিয়ান শীতে?'

মেয়েটি সমঝদার। বললাম, 'করবে আবার কী। আপন মনে থাকে, আর মাঝেমধ্যে কবিতা-টবিতা না কি যেন লেখে-টেখে।'

'যা ভেবেছিলাম। কিন্তু মাঝে মধ্যে পেটে তো কিছু দিতে-টিতে হয়? চলে কী করে?'

'ওর স্ত্রী কবি নয়। সে ঠিকেদার। আমেরিকান আর্মিকে পনির মাখন মাখন দই সাপ্লাইয়ের ঠিকেদারি।'

ঝকঝকে রোদের মধ্যেই চামড়ার ওড়নাটা মাথায় পরে নিয়েছে স্বাতী। ওর চোখের পাতা ভিজে ভিজে।

বিকেলের দিকে বটানিক্‌সের পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় কাচুমাচু মুখে স্বাতী জিগেস করলে, 'আচ্ছা দরবেশদা, আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?'

কিছুই না ভেবে বলি, 'পোস্তো চচ্চড়ি, সোনামুগের ডাল আর গরমা-গরম ভাত। তার সঙ্গে যদি আলুভাজা জোটে তাহলে আর কথা কী।'

মনে পড়ল আমার দুঃখী মাকে। দুঃখী এবং সুখী মায়ের হাতের রান্না। স্বাতী বললে, 'এই সেরেছে, পোস্তো, সোনামুগের ডাল—বলুন ওসব এখানে পাই কোথায়?'

'এখানে সব পাওয়া যায়। তেলের টাকায় সুন্দরবনের বাঘের দুধও।'

ট্যাক্সি করে গেলাম বিখ্যাত বাজারে। কারো ওজর আপত্তিতে কোন কর্ণপাত না করে কিনলাম ভাকব্যাক দু জোড়া গামবুট। দেখলাম ভ্রাম্যমান ভারতীয় রাজকর্মচারী মশাই বাজার উজাড় করে কিনছে রাজ্যের লাক্সারি

গুড্‌স্, আমাকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে বললে, 'শুনলাম আপনি নাকি জর্নালিস্ট'— দেঁতো হাসি হেসে আমি কাট মারলাম।

পেস্তা কিনল স্বাতী। মুগের ডাল কিনল। দেরাদুনের ফাইন রাইস। বেছে বেছে নৈনিতালের আলু কিনল স্বাতী।

রাত্তিরে যা খেলাম তার স্বাদ আমার জিভে লেগে থাকবে। আঃ, মায়ের হাতের রান্না যেন। কোথায় লাগে ইরানী কাবাব কোর্মা।

কালকে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর স্বাতী আমাকে বলেছিল, তেহরানে থাকবার সময় একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করেছি, এদেশের মেয়েরা পলিটি-ক্যালি দারুন কনশাস্।

এই কথা বলেই পরক্ষণে নিচুমুখে বলেছিল, 'যখন দেশে ফিরে যাবো, ফিরে তো একদিন যাবোই, লোকেরা তখন আমার যাচ্ছেতাই নিন্দে করবে।'

—'নিন্দে? নিন্দে কেন? কিসের নিন্দে?'

—'এই যে একা একা এভাবে বেরিয়েছি, ঘুরছি ৮-জনে মিলে।'

অনেক যে দেখেছে শুনেছে সেই আবদেল হলে এর জবাব দিত, লোকে নিন্দে করে—নিন্দে করতে ভালোবাসে বলে; অনিন্দনীয় কিছু যে একটা চায় তা নয়। আমিও ওই কথাই স্বাতীকে বললাম।

আজকে এখন খেয়েদেয়ে একটু গল্পসল্প করে রাত দশটা নাগাদ মুসাফির-খানায় ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝুরঝুরে তুষারপাতের মধ্যে যখন ফিরছি, বলা তো যায় না পরভিন হয়ত আজই হুট করে এসে গেছে, সামনের ফুটপাতে ফুলের দোকানের এদিকে এসে হঠাৎ চমকে উঠলুম।

রাস্তাটাকে একদম ঘেরাও করে ফেলেছে সশস্ত্র মিলিটারি ব্যাটেলিয়ন; আমার হোটেলের পথ বন্ধ!

সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা—গোপাল হালদার অয়ন, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০০০৯ মূল্য ৮'০০।

সতীনাথ ভাদুড়ী আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি পাঠক ও সমালোচকের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতাধন্য একথা বহুবিদিত এবং সতীনাথের প্রতিষ্ঠার ভূমিকে যারা প্রশস্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপাল হালদার প্রথম না হলেও, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ রায়ের পরই অনিবার্যভাবে তাঁর নাম উচ্চারিত। সতীনাথ বিষয়ে গোপাল হালদারের আকর্ষণ-উৎসাহ-অনুসন্ধিৎসা প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানেই আত্মক্লান্ত হয়ে পড়ে নি বরং বরাবরই সক্রিয়। এবং এই বর্ষীয়ান্ সমালোচকের অগ্রণীশোভন অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর বহন করছে 'সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও সাধনা' নামক গ্রন্থটি। সম্ভবত সতীনাথ বিষয়ক গোটা বই লেখার দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য; যতদূর জানি, অন্যতম অগ্রগণ্য গোপাল হালদারই এ বিষয়ে প্রথমতম।

গোপাল হালদারের এই বইটি সতীনাথ সম্পর্কিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই বলে আমাদের সপ্রশংস মনোযোগ দাবি করবে নিঃসন্দেহে; কিন্তু সুদক্ষ ভঙ্গী বইটির সূচিপত্রের দিকে তাকালেই আমরা তাঁর আলোচনার পরিধিপ্রবণতাবোধ চিন্তার ধারণা করতে পারি অনায়াসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম 'সতীনাথ বক্তৃতামালা'-য় প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা অবলম্বনে প্রাগুক্ত বইটি রচিত। সতীনাথের জীবনের আবশ্যিক তথ্যগুলি, কালের মাত্রা ও সংঘাত, পরিজন-পরিবেশ কথা, সতীনাথের উপন্যাসের ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের ভাববস্তু-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যের রূপকল্প ও প্রযুক্তির তাৎপর্যান্বেষণ, জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা ইত্যাদির যৌগপদ্যে মানুষ ও সাহিত্যিক সতীনাথের সামগ্রিক কাঠামোটিই গোপাল হালদারের অভিষ্ট। আর এই কাঠামোর 'তাঁর কালের তাঁর দেশের বিশেষ মানবআধারে সকল কালের সকল দেশের জীবনসত্যের ও মানব সত্যের' (সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, পৃঃ ১১) প্রতি সতীনাথের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সজীবতাই আত্যন্তিক গুরুত্ব পায়।

সতীনাথের ব্যক্তিত্বগঠনে পরিজন-পরিবার-পরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁদের ঠাকুরমা, রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই পরিবারের শিক্ষা ও রুচি একদা উৎসাহিত। সতীনাথের পারিবারিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের ভূমিকে ভাদুড়ী পরিবারের আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা দুর্দমনীয়ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। সতীনাথের ব্যক্তিস্বরূপ (personality) গঠনে তাঁর একাগ্র পাঠনিষ্ঠাও যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কয়েক বছরের অমানুষিক নিত্যপরিশ্রম ও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি চর্চা সতীনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এক নতুন এবং অভূতপূর্ব দিককে উন্মোচিত করে। সতীনাথ যথার্থতই 'কায়মনোবাক্যে' দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। এবং অনায়াসে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বৃত হন। লক্ষ্য করবার বিষয়, সতীনাথ রাজনীতির কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেন—তাঁর প্রবল আদর্শবাদের সঙ্গে কোনোরূপ আপোস রফায় সম্ভবত সতীনাথ রাজি ছিলেন না, আর গোপাল হালদার যাকে বলেছেন 'Revolution Betrayed' হবার যন্ত্রণাও হয়ত তাতে অনুস্যূত ছিল কোনোভাবে। গোপাল হালদার একদা সেই রণক্ষেত্রের বেশ কাছাকাছি মানুষ ছিলেন বলে সতীনাথের জীবনের এই পর্বটার উপর সন্ধানী আলোকপাত করতে পারতেন। কিন্তু তথ্যান্বেষী গবেষণা বোধহয় তাঁর লক্ষ্য নয়, তাই তিনি জায়গায়-জায়গায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন কিছু ইঙ্গিত, যা পাঠককে আশাহত অপ্রাপ্তির বেদনায় যতই ব্যথিত করে। এবং গোপাল হালদার সতীনাথের ব্যক্তিচরিত্রের রেখাচিত্রকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন,

> দাদামশায়ের সত্যপ্রিয় পাঠপ্রিয় সতীনাথ আপন স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে সর্বপ্রিয় সকলের তিনি আত্মীয়, সকল কর্মে আগ্রহবান ; মিতভাষী, মৃদুভাষী, সতীনাথ বক্তৃতায় সুপটু ; বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, সংকল্পে সুদৃঢ় সতীনাথ আন্দোলনের গোঁড়ামি অপেক্ষা সংগ্রামের লক্ষ্যানুযায়ী কর্মপদ্ধতিকে সংহত করতেও নিপুণ। সভাই পূর্ণিয়ার কেন, আজ আমরা জানি দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন স্থিরচিত্ত সাধক সর্বদাই দুর্লভ। (ঐ, পৃ ১৮)

তাতেই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হয় আপাতত।

অবশ্য রাজনীতি চর্চার তুঙ্গ মুহূর্তেও বইয়ের জগতের সঙ্গে সানুরাগ

বলিষ্ঠতা সতীনাথ বজায় রেখেছেন বরাবরই—নিজেকে দীক্ষিত করার এক বৃহৎ পন্থা হিসাবেই একে গ্রহণ করেন সতীনাথ। এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের আঙিনায় স্থায়ী আসর জমান। গোপাল হালদার প্রতিভা বিমুখ সতীনাথের সাহিত্য কৃতিকে মুখ্য ও বিস্তৃত আলোচনার বিষয় করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বস্তুত লেখকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো প্রবল হয় যখন দেখি লেখক কদাচিৎ কেতাবি বিদ্যা জাহির করেছেন বরং অন্তরঙ্গ ভঙ্গি ও মেজাজে সতীনাথের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধনেই তিনি তৎপর। ফলে বইটিতে গোপাল হালদারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ছাপ নেই, তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার প্রতিও লেখক উদাসীন। অথচ বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে মার্জিত বৈদগ্ধ্য ও মনীষার বিচিত্র কলালাপ। আর সমালোচনার ক্ষেত্রে লেখক কথকতার রীতিকে ('আমি ইচ্ছা করেই কথার রীতি ও ভঙ্গি মুদ্রণকালে পরিবর্তিত করতে চাই নি—মুখের আলাপে যে নৈকট্য সৃষ্টি হয় ; ছাপার আকারে তা অক্ষুণ্ণ আছে কিনা জানি না।' নিবেদন, ঐ) আমদানি করে অন্তরঙ্গতার নিবিড় আবহাওয়াটাকেই করে তোলেন অমোঘ।

অত্যোল্লকালের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এলেও সতীনাথের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিধাটি প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর উপন্যাস এবং গল্পেরও একটা মোটা অংশ রাজনীতির কবলিত, অবশ্য একন্যই কেউ তাঁকে রাজনৈতিক লেখক (political writer) বলে আখ্যায়িত করবেন না। সতীনাথ সৌখিন রাজনীতিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না, যদিচ সন্ত্রাসবাদের রোমান্টিক আবেগপ্রেরণাও তাঁকে যথেষ্ট উদ্দীপিত করে। কিন্তু প্রবাসী বাঙালি (পূর্ণিয়ার অধিবাসী) বলে গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলনে তাঁর ছিল সরাসরি লব্ধ অভিজ্ঞতা যা সতীনাথের উপন্যাসকে অনবদ্য করে তোলে। সতীনাথের প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'র উৎসর্গ-পত্রটি লেখকের অঙ্গীকারের সংহত দলিল—নিবিড় অন্তরঙ্গ সংবেদনায় ইতিহাসের অলিখিত মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন সতীনাথ। অগাস্ট বিক্ষোভের আবেগতরঙ্গ আমাদের পারিবারিক জীবনকেও উথালপাতাল করেছে আর একে তন্নিষ্ঠভাবে ব্যবহার করে সতীনাথ বিদগ্ধ পাঠকের ('বাংলা সাহিত্যের এই নবীন শক্তিমান লেখককে অভিবাদন জানাচ্ছি।'—অতুলচন্দ্র গুপ্ত) অভিবাদনও আদায় করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ রায় 'জাগরী' আলোচনা শেষে মন্তব্য করেছিলেন 'গুণী

লেখক সর্বদাই নিজের অতীত কীর্তিকে অতিক্রম করিতে সচেষ্ট থাকেন।' সতীনাথের পরবর্তী সাহিত্যকর্মে এই প্রত্যাশা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। সতীনাথের 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' অন্তত তাঁর কীর্তিপতাকায় নতুন তারকা হিসাবেই গণ্য হবে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ প্রথম দেখা গেল রাজনৈতিক আন্দোলনের বেনোজলে নয় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের যথার্থ শক্তি এবং প্রগতিশীলতাকে লেখক পরিস্ফুট করতে যত্নবান। ভারতের আধুনিককালের রাজনীতি গান্ধীজির প্রবর্তনায় বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে জনজীবনকে স্পর্শ করে। গোপাল হালদার যথার্থতই বলেছেন—'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' সেই অখ্যাত anonymous India-র ঘুম ভাঙা নতুন জাগরণের ও বাধাজড়িত পদযাত্রার প্রধান মহাকাব্য—ঠিক এই মহিমা দ্বিতীয় কোনো বাঙলা উপন্যাসের নেই। জনজীবনের এই অভিজ্ঞতা, ভারতীয় জনসমাজের মূল সত্যাকে, অখ্যাত মানুষের সহজ মানবতাকে ক্ষুদ্র মহৎ বহুদিকের রসরূপে মূর্ত করার কৃতিত্ব, যুগ-যুগব্যাপী ভারতের ঢোঁড়াই রামদের ট্র্যাজিডির উচ্ছ্বাসহীন সুস্থ সার্থক এই বাংলা সাহিত্যে রূপায়ণ—কখনো আর হয় নাই।' (ঐ, পৃ ১১৬)।

সতীনাথের প্রায় সব কটি উপন্যাসে 'নবজীবনের গান' রচিত। গোপাল হালদারের ৬৫ পৃষ্ঠার আলোচনার পরিসরে সতীনাথ-সাহিত্যের 'মীড়গমকমূর্ছনা' ধরার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে (সৃষ্টি-প্রতিভার কথা) গোপাল হালদার সতীনাথের সাহিত্যের মর্মমূলে পৌঁছাবার চাবিকাঠিটি পাঠকের হাতে সোজাসুজি তুলে দিয়েছেন। 'সতীনাথ ভাদুড়ী: সাহিত্য ও সাধনা' বইটি এমনই প্রাণবান সমগ্রতায় পরিপূর্ণ যে গ্রন্থ-শেষে গোপাল হালদারের ঈষৎ ভাবাতিশয্যযুক্ত মন্তব্যও—'সত্তার সততায় ও জীবন শিল্পীর সরলতায়, অকৃত্রিম শিল্পসাধনায় এবং সুস্থ সহৃদয় মানবতায় তিনি সেখানে শান্ত অনন্যশ্রীতে অধিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের এই পরিচয় সর্বস্বীকার্য —তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা সচেতন শিল্পী, সর্বাপেক্ষা বিবেকবান স্রষ্টা' (ঐ, পৃ ২২৫)—ইত্যাদি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

প্রতিষ্ঠা-বিমুখ স্বেচ্ছানির্বাসিত সতীনাথ-সাহিত্যের সারাৎসার পাঠক-মানসে ছড়িয়ে দেবার কাজে গোপাল হালদারের এই ক্ষীণতনু বইটি দীর্ঘকাল অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

রমেন্দ্র বর্মন

* Tradition, Modernity and Development—S. N. Ganguly. The Macmillan Company of India Limited, 1977, Rs. 45·00

দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতীয় লেখকদের রচনাবলির অধিকাংশই আমাদের বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত—বিরল ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, ইংরেজি শিক্ষিত এই লেখক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ শূন্যচারী পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী বিশেষ। সেক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথের গ্রন্থটির প্রবল ইতিহাসচেতনা, পটচেতনা, প্রতিভায় অবাক করে দেবার মত।

শচীন্দ্রনাথের অন্য দুটি গ্রন্থ বর্তমান আলোচকের পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে নড়বড়ে, লজিক্যাল-পজিটিভিজম সম্পর্কে আকাট এই আলোচক তাঁর প্রথম গ্রন্থটি পড়ে অশেষ উপকৃত হয়েছিল, যার অন্যতম কারণ শচীন্দ্রনাথের ঈর্ষণীয় প্রাঞ্জলতা। 'রবীন্দ্র দর্শন'—শীর্ষক গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ অংশটুকু তিনিই লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের বহুধাবিভক্ত, নানাভাবে ছড়িয়ে পড়া রচনাবলির মধ্যে দর্শন-প্রস্থান আছে কিনা সেটির দর্শনশাস্ত্র সম্মত বিচার শচীন্দ্রনাথই প্রথম করলেন।

কিন্তু উক্ত দুটি গ্রন্থই (হ্বিট গেন স্টেইনের ওপর আর একটি বইও তিনি লিখেছিলেন) শচীন্দ্রনাথের মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা অর্জনের পূর্বের ঘটনা। সেই কারণেই প্রাঞ্জলতা পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, প্রথমটির অনবদ্য কার্য-কারিতায় মন ভরে নি, দ্বিতীয় গ্রন্থটি আদৌ খুশি করতে পারে নি। এই সর্বশেষ গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথের উত্তরণ শ্রদ্ধা জাগায় এই কারণেই যে তিনি এক দার্শনিকভূমি ছেড়ে অন্যভূমিতে ঝাঁপ দেওয়ার বিরল সাহস দেখিয়েছেন। যেোক্ত ভারতীয় বাস্তব থেকেই এখানে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন—তাৎক্ষণিককে সরিয়ে, সত্তার বহুজীর্ণ আবরণকে ছিঁড়ে ফেলে, পৌঁছতে চেয়েছেন সত্তার অভিজ্ঞান যারা ভারতীয় সঙ্কটের কেন্দ্রে, নগ্ন সত্যে। এই যন্ত্রণার আবেগে বইটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ দর্শনালোচনা—অবশ্যই, মার্কস দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যেমন ভাবতেন, দার্শনিকদের প্রধান কাজ জগৎ পরিবর্তন, সেই অর্থেই।

শচীন্দ্রনাথ শব্দ ধরে, পদ ধরে এগিয়েছেন—আর যেহেতু তাঁর সবরকম চিন্তার কেন্দ্রস্থলে আছে কমিউনিকেশন বা সংযোগের প্রবৃত্তি, সেহেতু এই পদ্ধতি তাঁর আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডেভেলপমেন্ট ও গ্রোথ, আনডেভেলপমেন্ট ও আণ্ডার ডেভেলপমেন্ট, ট্র্যাডিশনাল বা এগ্রিকালচারাল ও ব্যাকওয়ার্ড—ইত্যাদির যে-বিরোধ প্রচলিত ধারণানুযায়ী করা হয় এবং যার

দাপট শিক্ষিত মহলে প্রচণ্ড, তার বিরুদ্ধেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর জিজ্ঞাসাকে তীক্ষ্ণ করেন। মার্কস তাঁর ভারতশাসনবিষয়ক প্রবন্ধে পুরনো জগৎ হারিয়ে, নতুন জগৎ অর্জন না করে যে বিষাদে 'হিন্দুরা' আক্রান্ত হয়েছিল বলেছিলেন, তারই সাংস্কৃতিক স্তর শচীন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয়। বস্তুত শচীন্দ্রনাথ দৃষ্টি মূলত আবদ্ধ রাখেন সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোয়। বাইরের ঔপনিবেশিক আঘাতে যে সাংস্কৃতিক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে যে-গাঠনিক আঘাত এসেছে সেটিই তাঁর বিশ্লেষণের বস্তু। সেই কারণে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন তাঁর কাছে রস্টীয় চেক-অঙ্কে ধরা দেয় না, উন্নতি-অনুন্নতি ইত্যাদির আলোচনায় তিনি আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ককে স্মরণ করেন, পল বারানকে সাক্ষী মানেন। ফ্রাঙ্ক ও বারানের মতামত এখন খুবই পরিচিত—কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে অচ্ছ্যুৎ, ভারতবর্ষ বিষয়ক আলোচনায় সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারাও বিরল ব্যবহৃত। হবেই বা না কেন? ডাকসাইটে সমাজতাত্ত্বিক এম এন শ্রীনিবাসও মনে করেন, টেবিল-চেয়ারে খাওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা। এঁদের সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়া ন্যায্য ও সুস্থ। আর ঐতিহ্য বা ঐতিহ্যিক নিয়ে ভ্রান্তিবিলাস এতই ব্যাপক, যে, যে-কোনো রকম কুসংস্কারকেই আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য বলে চালাই, আধুনিকীকরণের শত্রু ভাবি—যেন ইয়োরোপে কোনো কুসংস্কার নেই, ধর্মযুদ্ধ ছিল না। আসলে এ কথা আমলেই আনা হয় না, ইয়োরোপা-মেরিকার মর্ডানাইজেশন-এর ধারণা আমাদের মতো দুর্গত দেশে শোষণ বজায় রাখারই একটি উপায়—ইতিহাসের লজ্জাকর ঔপনিবেশিক পর্যায়কে 'মানবিক' করার, আবার চাপা দেবার বদ্ প্রচেষ্টা। এরই মায়ায় শ্রীনিবাসরা ভোলেন, যাকে ব্যঙ্গ করে শচীন্দ্রনাথ লেখেন : fact-Indepndent lyric in graise of the British empire.

বইটির প্রথমে চারটি অধ্যায় তো বটেই, পঞ্চমটিও এই সমালোচনায় গভীরভাবে চিন্তা-উদ্দীপক। শচীন্দ্রনাথ খুব নিপুণভাবে ছিঁড়ে দেন আধুনিকীকরণ-পশ্চিমীকরণের সমীকরণটি। এই ব্যবচ্ছেদ মনে করিয়ে দেয় ফ্রানজ ফ্যানসকে—বোঝা যায় লেখক এখানে হিমশীতল অ্যাকাডেমিক পাণ্ডিত্যের মিনারবাসী নয়, নিজেও এই ঔপনিবেশিক বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যন্ত্রণাদগ্ধ, যে যন্ত্রণা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে আত্মহননে প্রচণ্ড বিষাদে, আবার কর্মিষ্ঠ উজ্জীবনেও। শচীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনো সময়ই মন্ময়ী বিষয়ে ঢোকেন না—মার্কসীয় পদ্ধতি ও প্রজ্ঞাকে অর্জন করতে চান। এই

যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগই শিক্ষিত ভারতীয়রা করে ইংরেজিতে। (যে-'বন্দেমাতরম' মুখে ভারতীয়রা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে, প্রতিবাদ করেছে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে, সেই 'বন্দেমাতরম'-এর স্রষ্টাই চিঠিতে লেখেন, তিনি ইংরেজিতে বলতে ও লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।) ফলে প্রধান সাধনা বা উপায়ের মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রকাশ করতে বা উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ার কিছু উৎপাদন করতে ব্যর্থ হই। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই বোঝা যাবে, আধুনিকীকরণ কেবল কালগত ধারণা নয়। ইয়োরোপামেরিকার 'আধুনিক' দেশগুলো তাদের 'আধুনিকতা' বাড়াচ্ছে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার দেশদের শোষণ করেই। আধুনিকীকরণ কেবল শিল্পায়ন-নগরায়ণ নয়—আধুনিকতা একটি রাজনৈতিক ধারণাও। জাপান অর্থনৈতিকভাবে আধুনিক, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ। সমাজের গাঠনিক পরিবর্তন বা উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া যথার্থ আধুনিকতা আসতে পারে না ; এ পরিবর্তনের রূপ বিভিন্ন, প্রক্রিয়া নানাবিধ, পশ্চিমি দেশগুলোর আঁদরাই একমাত্র আঁদরা নয়। অবশ্য মডার্নিটি সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

> there is a great difference between modernisation and modernity. By modernity, I mean the superstructural incorporation of a partial life-style of the modern metropolis and then percholating such culture or commodity orientation to the less fortunate sector. But all this happens without any significant structural change or changes in productor factors or production relations.

আবার ৫২ পৃষ্ঠায় লেখেন,

> Modernity consists in modifying the existing traditions and creating room for new and better traditions for a different terminology, modernity helps to enrich our existing value-orientation in terms of new values that assure as of a smooth-progress tow ards an image fulfilment.

দুটো উক্তি কি পরস্পর বিরোধী নয় ?

ভারতীয় ঐতিহ্যে আধুনিক চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই, মডার্নাইজেশন ও মডার্নিটির পার্থক্য দেখিয়েই শচীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়ের কেন্দ্র স্পর্শ করেন, যেখান ম্যাক্স হেবারের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কল্পনাবিলাসকে। ইদানীং ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় ম্যাক্স হেবার নানাভাবে আসছেন। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতিতে হিন্দুধর্মের প্রভাব মূলত নঞর্থক, হেবার এমন মত প্রকাশ করেন। এমন কি তাঁর এ ধারণাও ছিল, প্যাক্স-ব্রিটানিকার অপসারণে ভারতবর্ষে প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক দস্যু রোমান্টিকতার পুনরাগমন ঘটবে। মোক্ষ, ধর্ম, কর্মের ধারণা মানবিক উৎসাহ উদ্দীপনাকে ভোঁতা করে দেয়, নিষ্ক্রিয় গ্রহণকেই বড় করে কঠোর সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দুঃখ দুর্দশা দূর করতে দেয় না। বলাই বাহুল্য, পশ্চিমী আধুনিকীকরণবাদীরা এমন কথাই বলে থাকে। এর থেকেই এই সব সিদ্ধান্ত আসে ভারতবাসীরা আবিষ্কারে ভয় পায়, প্রযুক্তি বিদ্যা আয়ত্ত করতে জানে না, ভারতীয় চাষীরা অলস ইত্যাদি—হয়তো ভারত ইতিহাসের চর্চায় ম্যাক্স হেবারকে ব্যবহারের পেছনে এই ঔপনিবেশিক ঘোর-প্যাঁচই আছে। বস্তুত ভারতীয় সব ভাল, জাতিবর্ণ ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ইত্যাদি উৎকট জাতীয়তা ও বস্তুতাই আরেক জের হেবারীয় তথা পশ্চিমাবাদী উন্নাসিক আধুনিকীকরণের জের। শচীন্দ্রনাথ ন্যায্যতই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন, আসেন কৃষক-প্রসঙ্গে। তিনি আধুনিকতার কেন্দ্রে স্থাপন করেন কৃষককে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের মোকাবেলা করা, রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রক কৃষকদের সঙ্গে শ্রেণীজোট গঠন করা, জাতি বর্ণব্যবস্থাকে ভেঙে শ্রেণীচেতনা নিয়ে আসাই আসল ভারতীয় আধুনিকীকরণ। কৃষক সমাজ, কৃষি রাজনীতি ও কৃষি অর্থনীতি এখানে মূল প্রসঙ্গ। কৃষক-কেন্দ্রিক পুনরুজ্জীবন না ঘটার দরুনই, রেলপথ প্রবর্তনে যে-বৈপ্লবিক রূপান্তর ভারতবর্ষে ঘটবে বলে মার্কস আশা করেছিলেন, তা ঘটে নি। উপনিবেশের কৃষকরাই সেই জীবনচর্যা যাপন করেন যেখানে ঐতিহ্যিক ধারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবহমান। আধুনিকতার লড়াই, নতুন দিগন্ত সেখানেই। আধুনিকতা ও ঐতিহ্য—দুটি বিরোধী ধারণা নয়, পরিপূরক। আর, এক্ষেত্রে রামমোহনদের লিবারেল মডেল ও রাধাকান্ত দেবদের অর্থডক্স মডেল—শেষ বিচারে একই। আমাদের সংস্কৃতির বিশৃঙ্খলার মূলে ঐতিহ্য—আধুনিকতার সংঘর্ষ নয়, ঐতিহ্যের অভাবই—ঔপনিবেশিক ভাড়নে শিক্ষিতশ্রেণী মূল বিচ্ছিন্ন হয়ে ভ্রান্ত-অভিজ্ঞানের শিকার হয়। এই বিচ্ছিন্নতা ভাঙতে পারে সংযোগের স্রোতস্বিনীতে : শচীন্দ্রনাথের ভাষায় এখন

প্রয়োজন কমিউনিকেশনাল বা সায়েন্টিফিক মডেলের, যা আবার প্রেসক্রিপটিক-ডেসক্রিপটিভ। বইটির শেষ অংশে নানাবিধ মডেলের প্রসঙ্গই মূলত আলোচিত।

আর এ অংশটিই বইটির দুর্বল অংশ। বইটির প্রথম অর্ধাংশ ভারতীয় বাস্তবে স্থিত এক দর্শনশাস্ত্রজ্ঞর যন্ত্রণাস্পৃষ্ট বোধে উজ্জ্বল—সেখানে মডেলের স্থাণুতে কিছু তিনি ধরতে চান নি, জীবনের প্রবহমানতাতেই প্রাণময় করেছেন তাঁর বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ করেছেন তাঁর আক্রমণ। কিন্তু যে বিশ্ববীক্ষার আলোকে তিনি এটি করেন, সেটি যে এখনও তাঁর সত্তায় সমন্বিত নয়, তা বোঝা যায় বইটির শেষ অংশে—বিশেষত শিক্ষা-বিষয়ক তাঁর আলোচনাগুলিতে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি শচীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু ভাষা ও সংযোগ শচীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে থাকে, সেহেতু শিক্ষা-প্রসঙ্গের যাথার্থতা আলোচনায় স্বীকার্য। কিন্তু এই শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্য তাঁর যে-সব মডেল বা পরিকল্পনা তার সঙ্গে বইটির প্রথম অংশের কৃষক কেন্দ্রিক উজ্জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।

আসলে, 'ট্র্যাডিশন, মডার্নিটি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' শচীন্দ্রনাথের নতুন জগতে উত্তরণের, পরিবৃত্তিকালের গ্রন্থ—পুরনো জগৎ ছেড়ে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার মুক্তিতে তিনি যখন আসছেন, তখনকার প্রবল আন্দোলিত চিন্তা-ভাবনার সাক্ষী এই বই। তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা হতো আরও পরিণত, তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মৃত্যু তা হতে দিল না। আমাদের জন্য রইল শুধু পরিতাপ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু টলস্টয়ের শয়তান অনুবাদক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুঁথিপত্র ৯, এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ পৃষ্ঠা ১০+১১০ দাম দশ টাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

তলস্তয়-এর জন্মের দেড়শ বছর গেল গত বছর। উপলক্ষটিকে মনে রেখে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অনুবাদ-গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। অনুবাদটি অনেক আগের। একটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। এতদিন পর বই আকারে বেরল।

বিমলাপ্রসাদ বাবু অনেক কারণেই ধন্যবাদার্হ। সাধারণভাবে প্রবন্ধ-গোছের কিছু রচনায় কয়েকটি জানা কথার পুনরাবৃত্তিতেই তিনি তলস্তয়-এর জন্মের এই সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের দায়িত্ব চুকিয়ে দেন নি। যে-কথা-সাহিত্যের সৃষ্টিতে তলস্তয় অবিনশ্বর, তারই একটি অল্প পরিচিত রচনা তিনি বেছে নিয়েছেন অনুবাদের জন্য। এই গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ, 'দি ডেভিল'-ও খুব সুলভ নয়। বস্তুত, তলস্তয়-এর প্রচলিত কোনো সংকলনেই গল্পটি সচরাচর দেখা যায় না। ফলে তলস্তয়-এর সৃষ্টির এক বিশেষ ধরনের উদাহরণ বাঙালি পাঠকদের কাছে আসতে পারল এই অনুবাদে। এমন আরো একটি আপাত-দুর্লভ বড় গল্পের বাংলা অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন মস্কোর প্রগতি প্রকাশন—ফাদার সের্গিউস। এই দুটি গল্প একত্রে পাঠ করলে তলস্তয়ের বাস্তবতাসন্ধানে যৌন-সঙ্কটের ব্যবহার সম্পর্কে পাঠক ধারণা করতে পারবেন।

তলস্তয়-এর গল্পের প্রায় অনিবারণীয় টান কোনো একটি জায়গাতেও অনুবাদে ব্যাহত হয় না—অনুবাদকেরও সেটাই প্রাথমিক দায়। গল্পের গতিকে এই অব্যাহত রাখতে তিনি কোনো কৃত্রিম উপাদানের সাহায্য নেন নি। বাংলা ভাষায় সরল গল্প বলার যে-রীতি স্বাভাবিক, তাকেই আশ্রয় করেছেন। ফলে, পাঠকের সরাসরি লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই গল্প, ঘটনা ও এই দুইয়ের দ্বারা চিহ্নিত চরিত্রগুলি।

হয়তো কিছু ঘাটতিও হয়ে যায়। তলস্তয়ের জটিল বাক্যবিন্যাসে ঘটনা আর চরিত্র একত্র মিলেমিশে থাকে। তাতে ঘটনার বিবরণ আর চরিত্রের নির্মাণ একত্রেই সাধিত হয়। আখ্যায়ন (ন্যারেশন) আর চরিত্র-নির্মাণ হয়ে ওঠে একই প্রক্রিয়া। কাহিনীর সরল বিবরণ চরিত্রের জটিল উপস্থাপনের আনুষঙ্গিকতায় নতুনতর তাৎপর্য পায়। কিন্তু এই ধরনের অনুবাদে তলস্তয়-এর গদ্যের এই কাজ বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তলস্তয়-এর রচনায় জটিলতম দায় ও দক্ষতম নিষ্পত্তিকে অনুবাদে, অভিজ্ঞ ও সতর্ক পাঠকের কাছে, একটু সরলীকৃত মনে হয়ে যেতে পারে। যেমন এই লেখাটির প্রায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি—স্টিপানিডার সঙ্গে পুনর্সাক্ষাত,

> 'তবু না তাকিয়ে পারে নি ইউজিন। উপায় ছিল না। দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছিল স্টিপানিডার সতেজ, জীবন্ত শরীরটার ওপরে। কোমরের নিচেকার অংশটা ঈষৎ দুলে দুলে উঠছিল নৃত্যের

> স্বাভাবিক ছন্দে, কটিদেশ কম্পিত হচ্ছিল তার দৃঢ় অথচ লঘু পদক্ষেপ। ইউজিন চোখ সরিয়ে নিতে পারে নি, তাকাতে বাধ্য হয়েছিল তার সুঠাম বাহুর দিকে। তার সুডৌল কাঁধের শুভ্র কমনীয়তা, ব্লাউজের নরম পড়ন্ত ভাঁজগুলো, গাউনের আঁটসাঁট ছাঁদের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত দেহ-রেখার নম্র বঙ্কনী আর মাংসল পায়ের গোছের সুঠাম গড়নটুকু ইউজিনের চোখ দুটিকে যেন জাদু-মন্ত্রে স্তব্ধ, আবদ্ধ করে রেখেছিল। (পৃ ৫৫)

যে সঘন ইন্দ্রিয়তার এই দেখা, ইউজিনের পক্ষে শেষ হয় এই কৃষক-মেয়েটির পায়ের গোছের নরম পিচ্ছল বর্তুলতায়—তা এই অনুবাদে ব্যাহত হয় এতগুলো তৎসম শব্দের ব্যবহারে। এই তৎসম শব্দগুলির অনুষঙ্গে তো বাস্তব ইন্দ্রিয়তা নেই, আছে বাস্তবের বিমূর্তিসাধনের দীর্ঘ প্রয়াস। আবার বাক্যের বিরতিহীন প্রবাহে ইউজিনের চোখের চাঞ্চল্য ও মনের এক অস্থিরতা ধরা পড়ে যায় আপাত কার্য-কারণ-সম্পর্কহীন যে-এক বিশৃঙ্খলায় —প্রথমেই কোমরের নীচেকার অংশ, তার পর কোমর, তার পর বাহু, কাঁধ, আবার ব্লাউজ, গাউন ও শেষে পা—তা এই পৃথক্-পৃথক্ বাক্যে যেন এক ধরনের শৃঙ্খলা পেয়ে যায়। ইউজিনকে অভিসন্ধির সংঘাতে কাতর মনে হয় না, মনে হয় অভিসন্ধিতেই স্থির।

কিন্তু তলস্তয়-এর স্টাইলের এই গূঢ় গঠনের প্রতি আনুগত্যের দায় যে অনুবাদক নেন নি—এতে সাধারণভাবে কোনো ক্ষতি হয় নি। বাংলা ভাষার পাঠক তলস্তয়-এর রচনার সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণই অপরিচিত। এ-কথা গল্প উপন্যাসের সাধারণ পাঠকদের পক্ষেই প্রযোজ্য নয় শুধু, যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের পক্ষেও সমান সত্য। তাই, তলস্তয়-এর লেখাগুলিকে বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে সরাসরি উপস্থিত করাটাই খুব বড় দায়িত্ব। তাতেই বাংলা ভাষার পাঠক গল্প-উপন্যাসের কাহিনী-ঘটনার-বিবরণের এক নতুন অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। এই ধরনের অনুবাদের উদাহরণ বাংলা ভাষায় সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এমন অনুবাদের বেশ সমৃদ্ধ প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই অনূদিত লেখকের স্টাইলানুগত্যের প্রশ্নাদি ওঠানো যায়, পরে।

কাহিনীর দিক থেকেও এই বিশেষ রচনাটির একটা অন্যতর মূল্য বাংলা গল্প-উপন্যাসের চর্চায় থাকতে পারে। গত পনের-বিশ বছরে বাংলা ভাষার গল্প-উপন্যাসে নরনারীর শরীর-সম্পর্ক বিষয় হিশেবে এক নতুনতর তাৎপর্য

পেয়েছে। যতদূর জানি, ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এমন ঘটেছে। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আমাদের বাণিজ্যিক অর্থনীতির দ্রুত বিস্তারের ভেতর নিহিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্যতায় আমাদের সামগ্রিক সমাজই একটি পণ্য সমাজে পরিণত হয়েছে। এতে ভালো-মন্দের কোনো প্রশ্ন জড়িত নেই, ব্যক্তিপুঁজির সমাজে যেমন ঘটায় তেমনি ঘটেছে। ফলে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি এখন বিজ্ঞাপনের স্লোগান, একান্ত হাসিটুকুও এখন বিজ্ঞাপনের ছবি (উইলস ফিল্টার সিগারেট-নির্মাতাদের মতো বিজ্ঞাপন-দাতারা তো তাঁদের মেড-ফর-ইচ আদার স্লোগানের জন্য দম্পতিদের একান্ত ছবিই আহ্বান করেন—মডেল দিয়ে তাঁদের কাজ ভালোভাবে হবে না ধরে নিয়েই)। নারী-শরীর, পুরুষ-শরীর ও নর-নারীর শরীর-সম্পর্ক পণ্য-বাজারের যে নিয়মে পণ্য হয়ে উঠেছে সেই নিয়মেই সাহিত্যেরও বিষয় হয়েছে।

কিন্তু আবার আমাদের দেশে এর একটা অন্য ধরনের অর্থও আছে। এই ভারতীয় হিন্দু সমাজে নরনারীর যৌন সম্পর্ক সবসময়ই তো সংস্কারে নিষিদ্ধ, ব্যক্তি-সম্পর্কের স্ফূর্তি তো সর্বদাই অপরাধ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের বহুকৌণিক বাস্তবতা তো অস্বীকৃত। নরনারীর শরীর-সম্পর্ককে সাহিত্যের প্রকাশ্যতায় আনার ভেতর নিষেধ ভেঙে ফেলার চেষ্টা, অস্বীকৃতিকে না-মেনে অপরাধ-বোধ থেকে মুক্তির এক ধরনের প্রয়াস নিহিত থেকে যায়—সে-প্রয়াস এই পণ্য-সমাজে যতোই আপাত বিকৃত হোক না-কেন।

ঐতিহাসিক তুলনার দিক থেকে—এই রচনা, শয়তান-এর ঘটনাকাল, আমাদের বর্তমান অবস্থার সমতুল। আজ থেকে প্রায় শ-খানেক বছর আগে রুশদেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দাস-প্রথার অবলোপ, জুরি-প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি সংস্কারের ভেতর দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো সামান্য প্রভাবিত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রথম অভিঘাত কেটে যাওয়ার পর, এক-পুরুষ অনুপস্থিত-জমিদারির টাকা ফুঁকে যাওয়ার পর, রুশী ধনতন্ত্রের জমিদার-পুত্র ক্রমবর্ধমান বেকারির মুখে, গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছিল বাপের রাজধানী-বাসের ঋণ মিটিয়ে বাকি ভূ-সম্পত্তি দিয়ে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা সংস্থান করা যায় কিনা দেখতে। এ উপন্যাসের নায়ক ইউজিন আর্তেনিভ—এই জাতেরই লোক।

'জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে যে-যে উপকরণের প্রয়োজন তাঁর

কিছুরই অভাব ছিল না', 'আইনের ডিগ্রী নিয়ে…উত্তীর্ণ হয়েছিল', কোনো এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর আনুকূল্যে ইতিমধ্যেই সে এক রাজদপ্তরে সরকারি কাজ যোগাড় করে নিয়েছে।' কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর দেখা গেল বিস্তর দেনার দায়, সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। পরে আর-এক ভূস্বামীর পরামর্শে সম্পত্তির কিছু অংশ রেখে, বাকি অংশ বেচে, ইউজিন সাব্যস্ত করে, 'সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে মাকে নিয়ে জমিদারিতেই বাস করবে আর নিজে হাতে জমিদারী চালাবে।' 'গ্রামে এসে…তার লক্ষ্য হলো পুরানো দিনের জীবন-প্রণালীকে আবার ফিরিয়ে আনা।'

সমগ্র উপন্যাসটিই এই আয়রনির কাহিনী—মাঝখানে এক পুরুষের (ইউজিনের বাবা) ধনতান্ত্রিক নগর-বাসের অভিজ্ঞতা টপকে আর-এক পুরুষের গ্রামীণ জমিদারি জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়ার আয়রনি। এই আয়রনিটি প্রায় কার্টুনের ভঙ্গিতে তলস্তয় দু-একটি উল্লেখেই দেখিয়ে দেন—ইউজিনের 'দেহের একমাত্র ত্রুটি তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা,' 'এখন একটা প্যাঁস-নে ছাড়া সে চলতেই পারে না।…নাকের ওপর বরাবরের মতো একটা দাগ বসে গিয়েছে।' এই প্যাঁস-নে আবার ফিরে আসে স্টিপানিডার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের আগে,

> 'জোরে যেতে যেতে কাঁটাগুলো পায়ে ফুটতে লাগল ইউজিনের। মাঝপথে নাক থেকে খসে পড়ল প্যাঁস-নে চশমাটা।…প্রায় মিনিট পনের-কুড়ি পরে হলো ছাড়াছাড়ি। এদিক ওদিক নজর করে খুঁজতেই পাওয়া গেল প্যাঁস-নে চশমা জোড়াটা।'

যে-ঠাকুর্দার জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চাইছে ইউজিন তাঁর নারী সম্পর্কের ভেতর বেপরোয়া গা-আলগা ব্যাপার ছিল। বুড়ো চাকর দানিয়েল বলে, একবার শিকারে ক্লান্ত হয়ে দূরের গ্রামের পাদরি-গিন্নির কাঠের ঘরে আশ্রয় নিতে হয় 'ঐ খানেই ফাদার জাখারিচ প্রিয়ানিশনিকভের জন্যে একটি মেয়ে-মানুষ জোগাড় করে আনি।'

কিন্তু ইউজিন তো এক-পুরুষ শহর-ফেরতা, ওকালতি পাশ, আধুনিক। নারী-ব্যাপারে তার গা-আলগা আধুনিকতা আর তার ঠাকুর্দার গা-আলগা গ্রামীণতার মাঝখানে তো রুশী ধনতন্ত্রের প্রেতচ্ছায়া। তাই ইউজিন সমস্ত কিছুকেই বিচার করতে চায় ব্যক্তি-সম্পর্কহীন নিরপেক্ষতায়। পণ্য-সমাজে নগদ ক্রেয়-বিক্রয়ের নীতি তার ব্যক্তিচরিত্রকে গঠন করেছে। তাই

তার সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত নারী সম্বন্ধেও সে স্বচ্ছন্দেই ভাবে

> ব্যক্তিগত জীবনে, এই গোপন প্রণয় আর দৈহিক সম্পর্ক যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এই চিন্তা কোনদিনই ইউজিনের মাথায় উদয় হয় নি। স্টীপানিডার সম্বন্ধে সে কোন কিছুই ভাবত না। মানে, ভাবনার কোন অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করত না। টাকা দিত তাকে এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। পৃ ২৩
>
> শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের খাতিরে ওর প্রয়োজন ঘটেছিল একদিন। টাকা দিয়ে ইউজিন মিটিয়ে ফেলেছে যখন, তখন পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। (পৃঃ ৩৮)

এই টাকা দেওয়াটাই যেন সমস্ত ব্যক্তি-সম্পর্ককে নিয়ে যেতে পারে ব্যক্তি নিরপেক্ষতায়! ধনতন্ত্রেরই তো প্রায় অবিচ্ছেদ্য দর্শন র‍্যাশনালিজম, বিজ্ঞান সেই র‍্যাশনালিজকে সাহায্যও করে। তাই ইউজিন তার ঠাকুর্দার মতো শিকারের শারীরিক উন্মাদনায় কোনো এক 'মেয়েমানুষ'-এর সঙ্গে শরীরের প্রয়োজনটুকু সেরে আবার বেরিয়ে পড়তে পারে না—ইউজিন-এর তো দরকার তার শারীরিক প্রয়োজনেরও 'র‍্যাশনালাইজেশন'।

> স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে, আর তার নিজের ধারণা—মনটাকে খোলা ও পরিষ্কার রাখতে হলে স্ত্রীলোকের দৈহিক সম্পর্ক অপরিহার্য পুরুষের পক্ষে। (পৃ ৬)
>
> কিন্তু ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক আত্মদমনের ফলে শরীর ও মনের ওপর টান পড়তে শুরু হয়েছে। তা হলে কি করা যায়?" শেষ পর্যন্ত কি তা হলে দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে শহরেই ছুটতে হবে? (পৃ ৭)
>
> ইউজিন এই ভেবে মনকে বোঝালে যে, বর্তমানে তার এ ধরনের চেষ্টা মোটেই অন্যায় নয় কেননা, সে তো কামপ্রবৃত্তির দাস হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করতে যাচ্ছে না। যা কিছু করতে যাচ্ছে, যেটা স্বাস্থ্যেরই খাতিরে, নিছক শরীর-ধর্ম পালনের জন্যে। (পৃ ৮)

র‍্যাশনালাইজেশনের এই তাড়ায় ইউজিন স্বচ্ছন্দেই এত দূর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হতে পারে যে, ব্যাপারটা যেন দুটো মানুষের মধ্যে নয়, দুটো

শরীরের মধ্যেও নয়, যেন আমিবা, যেন হাজার হাজার বছরের শ্রমে মানুষ তার শারীরিক অনুভূতির স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্ক নির্মাণ করে নি। তাই সে যখন বুড়ো দানিয়েলকে প্রস্তাব দেয় তখন এটাই বারবার বোঝাতে চায়, একটা মেয়ে হলেই হল, 'আমার কাছে সবই সমান, কানা-কুৎসিত না হলেই হল', 'এমন যদি কেউ থাকে যার শরীরে রোগের বালাই নেই।'

এবং, হায়, যুক্তি! এই হতভাগা যুবা শরীরসঙ্গমের পরবর্তী অবস্থাকেও কেমন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ করে তুলতে পারে অমানবিক র‍্যাশনালাইজেশনের জোরে, 'ব্যাপারটা বেশ সহজেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল।...বর্তমানে ইউজিন বেশ সুস্থ বোধ করছে...আর মেয়েটি? তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবে নি ইউজিন।'

কিন্তু ব্যক্তির দায় তো ব্যক্তিকে মেটাতেই হয়। এই নেহাত যুক্তিবাদী যুবাটির যুক্তি উপে যায় ব্যক্তির সেই প্রবল আসক্তিতে। তাতেও যেন কার্টুনেরই আমেজ আসে। যখন দানিয়েল তাকে আশ্বাস দেয়, দিন ঠিক করে, তাকে আপনমনে ভাবতেই হয়, ভবিষ্যতের এই মেয়েটি কেমন হবে? আবার, প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী দিনগুলিতে মেয়েটি তার স্মৃতির সঙ্গিনী হয়ে পড়ে, 'সেই উজ্জ্বল কালো চোখের চঞ্চল তারা দুটি, সেই ভরাট গলায় ঈষৎ কম্পমান আওয়াজ'—

এই ব্যক্তি আর যুক্তির এমনই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যে, স্টিপানিডার স্বামী শহর থেকে গ্রামে এলে দানিয়েল আর-কোনো মেয়ের প্রস্তাব দিলে ইউজিন কিছুতেই রাজি হয় না। আর, স্টিপানিডার কাছ থেকে ইউজিন জানতে চায় সে কেন ইউনিকের কাছে আসতে রাজি হল, তার স্বামী থাকা সত্ত্বেও? ইউজিনের বিস্ময় সমস্ত যুক্তি ছাড়িয়ে যায় যখন স্বামীগর্বে 'তৃপ্ত, গর্বিত সুরে জবাব দেয় স্টিপানিডা—'সারা গ্রামে ওর জুড়ি নেই।''

আইজিন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক মানে না, মানে শুধু যুক্তির সম্পর্ক। অথচ কোনো কিছুই নেহাত ব্যক্তিগতভাবে পাওয়া না হলে তার পাওয়া হয় না, সমস্ত কিছুকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ দখল না করার যুক্তি সে কোথাও পায় না!

আইজিনের সঙ্গে স্টিপানিডার সম্পর্কের প্রথম পর্যায়ের পর আসে আইজিনের প্রেমে পড়া ও বিয়ে করার প্রসঙ্গ। সেখানে আইজিনের স্ত্রী লিজাতে তলস্তয় তার নারী-প্রতিকল্প আবিষ্কার করেন, শিক্ষিতা, আধুনিকা, নাগরিকতায় অভিজ্ঞা অথচ এখন গ্রামে মায়ের ওপরেই আছে। 'লিজা

যখন ইনস্টিটিউটের ছাত্রী হিসেবে বোর্ডিং স্কুলে থাকত, বয়েস আন্দাজ পনেরো—তখন থেকেই সে ক্রমাগত প্রেমে পড়ছে।' আর, 'লিজাকে ইউজিন যে পছন্দ করল, তার প্রধান কারণ হল এই—লিজার সঙ্গে তার আলাপ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল এমন একটা সময়ে যখন্ ইউজিন বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।'

তাদের প্রেম, পরস্পরকে পছন্দ করার অনিবার্যতা, সবটাই খুব ঠাণ্ডা হিসেব-নিকেশের ব্যাপার—সুযোগ সুবিধের ব্যাপার। এরা প্রেমে না পড়ে বিয়ে করে না আর বিয়ে সাবাস্ত করে শেষ প্রেমটিতে পড়ে। উনিশ শতকের শেষার্ধই হোক আর বিশ শতকের শেষার্ধই হোক, রাশিয়াই হোক আর ভারতই হোক এরা এভাবেই প্রেমে পড়ে।

বিয়ের মধ্য দিয়ে 'শুরু হলো—নতুন জীবনের প্রথম পর্ব'—অথবা পুরনো জীবনের শেষ পর্ব।

কারণ, এর পর ইউজিন-লিজার দাম্পত্য-জীবন ও ইউজিনের সম্পত্তিরক্ষায় নানা বিবরণের শেষে আখ্যান এসে পড়ে ইউজিন-স্টিপানিডার কাহিনীতেই। ইউজিন আবার এসে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়ে স্টিপানিডার—ইউজিনের শোয়ার ঘরেরই চৌকাঠে। সেই সহসা সাক্ষাতের পর থেকে শুরু হয়ে যায় ইউজিনের দ্বিতীয় জীবন। ব্যক্তি বলে যাকে সে গ্রহণ করে নি, টাকা দিয়ে যার সঙ্গের পণ্য খরিদ করেছে, যুক্তি দিয়ে যে-সঙ্গের দার্শনিক সমর্থন জুগিয়েছে, সেই মেয়েটি একটি বিশেষ ব্যক্তিগত মেয়ে বলেই, তার মাথার রুমাল থেকে পায়ের বাটি পর্যন্ত সেই মেয়েটি বলেই, ইউজিনের তাকে পাওয়ার তাড়না। আর কোনো মেয়েতেই ইউজিনের চলে না। আর এই সম্পূর্ণ আবেগগ্রস্ত ইউজিনের চোখের সামনে দিয়ে জীবনের রকমারি কর্মের পরিশিষ্ট চলচ্চিত্রে স্টিপানিডা ঘুরে ঘুরে আসে, সরে-সরে যায়। তার খামার বাড়ির অত মেয়ের ভেতর বা খানের অত কৃষক-রমণীর ভেতর ইউজিন একমাত্র স্টিপানিডাকেই চায়।

অথচ এই চাওয়া, এই ভূতগ্রস্তের চাওয়া ঘটে যেতে থাকে দৈনন্দিনের কর্মবৃত্তেই। ইউজিন দেওয়ানা হয়ে যেতে পারে না তো, তাই তার প্রতিদিন আর প্রতিটি কাজ এই তাড়নার বিপরীতে থেকেই যায়। ইউজিন, একপুরুষের ধনতন্ত্রের শহুরে আধুনিক শিক্ষিত বাবু ইউজিনকে, ঋণ শোধ করতে হবে তো—মানুষকে ব্যক্তির মর্যাদা না-দেয়ার ঋণ-শোধ!

সেই ঋণ-শোধের ঘটনাটি তলস্তয় লিখেছিলেন তাঁর খ্রীষ্টীয় মনুষ্যত্বের

আবেগে—অনুতাপ, স্বীকারোক্তি ও আত্মহত্যা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টিপানিডার সঙ্গ ইউজিন একবারও পায় নি—অথচ সেই সময়ই সে এমন তাড়িত! তলস্তয় কেন দুটো খশড়া করেছিলেন—গল্পের শেষাংশের? পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে এই কাহিনী একটি ব্যক্তির জীবনের বাস্তব হয়ে ওঠে। সিমফনির স্বর-বৈচিত্র্যের অলঙ্ঘনীয় লজিকে ইউজিনের প্রতিটি কাজ ও ভাবনা যুক্তিতে বাঁধা থাকে। তাতে, এই যুবাটির আত্মহত্যার অধিকার আছে কিনা এ-বিষয়ে কোনো সংশয় এসেছিল তলস্তয়ের? 'তার' মা বরাবরই তাকে বেশি স্নেহ দিয়ে এসেছেন', স্কুল-কলেজের বন্ধু-সঙ্গীরা এমনকি টাকা ধার দেয়ার মহাজনও তো তাকে সমর্থনের প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছে। তাই জীবনের এমন সঙ্কটে তার পক্ষে তো স্বাভাবিকই ভাবা যে এর কারণ সে নয়, স্টিপানিডাই। যেন, স্টিপানিডা আছে বলেই তার এমন কামনা জন্মেছে। 'ও আমায় পেয়ে বসেছে—আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জয় করে আমায় বশীভূত করে ফেলেছে···' হায়, র‍্যানালাইজেশন! সেই কারণেই স্টিপানিডাকে হত্যা করে সে নিজেকে মুক্তি দিতে চাইবে—এটাই কি ছিল তলস্তয়-এর দ্বিতীয় মত, পরিণততর সিদ্ধান্ত, যাতে তিনি পৌঁছেছিলেন ঘটনা ও চরিত্রের যুক্তির ধাপে ধাপে? উপসংহারের অংশে আসার আগে ইউজিন তার কর্ম ও চিন্তার সার-সংক্ষেপ করেছে ও নিজের সামনে একটি বিকল্প উপস্থিত করেছে—লিজার মৃত্যু বা স্টিপানিডার মৃত্যু। বিকল্প এমন হলে তো উকিল-ভূস্বামী আধুনিক বাবুর হাতে স্টিপানিডাকেই মরতে হয়। আর সেই বাবুর জন্য নানা বিকল্পই খোলা থাকে। স্বল্প জেলবাস, দায়িত্বহীন নেশাগ্রস্ত দীর্ঘ জীবন তারই একটি বাছাই।

সব সমালোচনাই তো আসলে আর একবার পড়া। কিন্তু কোনো সমালোচনাতেই তো আর তলস্তয়ের বাস্তব যুক্তি পরম্পরার অনিবার্যতা বলে ওঠা যাবে না। তবু, পাঠক হিশেবে, প্রায় শিশুর অসহায়তায় আবিষ্কার করতে হয়, পুনর্সাক্ষাতের পর স্টিপানিডার সঙ্গে সামান্য বাক্য-বিনিময়ের ঘটনা না-থাকা সত্ত্বেও (একবার একটি মাত্র বাক্য বলেছে স্টিপানিডা) ইউজিনের একার দিক থেকেই সম্পর্কটি কেমন যুক্তি-নিশ্ছিদ্র হয়ে যায়। গল্প উপন্যাসের আঙ্গিকে এ প্রায় অসম্ভব দায়। স্টিপানিডার সঙ্গে পুনর্সাক্ষাতের পর লিজা-ইউজিনের কফির টেবিলে কেমন অন্যমনস্কতা এসে যায়। কৃষক মেয়েদের সমবেত নৃত্যের ভেতর থেকে স্পষ্ট

হয়ে ওঠে শুধু টিপানিডা। সকলের কাছ থেকে সরে দোতলার জানলা দিয়ে একা-একা টিপানিডাকে দেখায় যেন ঘটে যায় নতুন সম্পর্ক। তারপর টিপানিডার অনিশ্চিত সন্ধানে বনপথে। আবার অনুতাপ। টিপানিডাকে গ্রাম থেকে সরিয়ে দেয়ার ক্ষীণ চেষ্টা। লিজার পা মচকানো। অসুস্থ লিজার বিছানার পাশে স্বামী-স্ত্রীর নতুন ধরনের সম্পর্ক যেন প্রতিষ্ঠা পেয়েই যায়। কিন্তু সে-ও যেন পুরনো হয়ে যায়, আবার খামারে। আবার টিপানিডা। ঋতু বদলে যায়। বর্ষার রুক্ষতা। মনের অবসন্নতা। আবার টিপানিডা। সন্তান-জন্ম ও পালনে লিজার ব্যস্ততা। একটু ক্রিমিয়ার বেরিয়ে আসা। একটু বিস্মরণ। আবার টিপানিডা। আর এই হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিজের বন্দী হিসেবেই ইউজিন নিজেকে আবিষ্কার করে ফেলে। আর কোনো পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু থাক। এভাবে তো কোনো আলোচনা কখনো শেষ হয় না। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তিনি বাংলা-পাঠককে তলস্তয়-পড়ার একটি সুযোগ অন্তত করে দিলেন।

বাবু বৃত্তান্ত সমর সেন আশা প্রকাশনী ৭৪ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৭০০০০৯ দাম দশ টাকা পৃ ১৪৫ ১৯৭৮

বাঙালির আত্মজীবনী অতি ভয়ঙ্কর বস্তু। লেখার এই ধরনটির প্রতি বাঙালি মাত্রেরই দুর্বলতা—স্নায়বিক। ষাট পার হয়েছে অথচ কোনো-এক-রকমে আত্মকথন শুরু করেন নি এমন বাঙালি দুর্লভ। যদিও ভরা যৌবন থেকেই ছদ্মবেশী আত্মকথন অভ্যাসে আসে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশী ও স্নায়ুর শৈথিল্য যেন আর কোনো আড় মানে না। একটু শহরে, একটু বুদ্ধিজীবী ও একটু সাহিত্যিক বাঙালির স্নায়ুশৈথিল্য প্রথম ঘটে জিহ্বায় কলম তো জিহ্বারই বকলম।

সমর সেন-এর প্রায়-কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর এই লেখাটির অনেক দূর পর্যন্ত একটি সেয়ানা চাল রাখতে পেরেছেন—যাতে তাঁর একটু বখে যাওয়া, একটু দায়িত্বজ্ঞানহীন, একটু 'ডিলাটাক্ট' ব্যক্তিত্ব বেশ ধরা পড়ে।

বাল্য আর কৈশোরের স্মৃতিতেও তাঁর হা-হুতাশ নেই—এ বড় সচরাচর

দেখা যায় না, ঠাকুরদার পূর্বপুরুষে বা মায়ের দাদামশাইয়ের বংশলতিকায় একটু-আধটু উঁকিঝুঁকি সত্ত্বেও। বেশ একটা ছবি জোটে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কলকাতার, বাগবাজারের রকের আড্ডার। বয়স-নিরপেক্ষ মেলা-মেশায় একটা সামাজিকতার আভাসও মেলে। জানলা দিয়ে গোপন দৃশ্য দেখা সেখানে বালকের দিন-যাপনের অপরিহার্য অংশ বা, স্কুল পালিয়ে গঙ্গার ঘাটে কাটানো। 'শিবমন্দিরে গাঁজার আড্ডা, অনেক ব্যায়াম সমিতি, বোসবাড়ির বিরাট মাঠে বারোয়ারি দুর্গা পুজো, প্রদর্শনী, মেলা ও ব্যায়াম-বীরদের কসরৎ; পাড়ায় পাড়ায় সিদ্ধির কুলপি, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের দোকান; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কাছেই যামিনী রায়ের বাড়ি। সকালে গঙ্গাতীরে নানা বিচিত্র দৃশ্য—নিতম্বিনীদের মুক্তকেশ, স্নান ও চলানি। আবহাওয়া ভালো থাকলে আকাশ ভরে যেত ঘুড়ি ও নানা ধরনের পায়রাতে। চৌরঙ্গীতে যাওয়া নিরাপদ ছিল না, গোরাদের অত্যাচারে। দক্ষিণ কলকাতা এখনো গজিয়ে ওঠে নি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বসতি হিসেবে।... একটা বাগবাজারী বখাটে ভাব কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

প্রথম পৃষ্ঠাতেই ঠাকুর্দাকে পুরুষাঙ্গ দেখানো— 'দাদু, পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বিলেত যাব না', আর তার পর বাবার বিয়ে দেখানোয় (২০ পৃষ্ঠা), সমরবাবু সেই বাগবাজারী বখাটেপনাকে বাংলা ভাষায় বেশ সরেস এনে দিয়েছেন মনে হতে পারে। কিন্তু এও বোধহয় সম্ভব হয়েছে তাঁর চিরকালের ইংরেজি-চর্চার গুণেই। বাংলা গদ্যের সঙ্গে চিৎপুরি যাত্রার একটা বিশেষ সম্পর্ক—দুটোই তো কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে পদ্য-আওড়ানো। সমরবাবুদের মতো ইংরেজি-দক্ষ 'বাগবাজারী বখাটে'-রা আর-একটু বেশি লিখলে হয়তো বাংলা গদ্যের উপকারই হত— অন্তত এমন ধরণের হাল্কা গদ্যের। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে—বাগবাজারী বখাটেপনাও সমরবাবুদের মতো 'সাহেবদের' হাত-ফেরতা না হয়ে আমরা পাই না।

সে বিষয়ে সমরবাবুও সেয়ানা। তাই, তাঁর কবিত্বের সূত্র-উল্লেখে একটু রসিকতা করে যান, 'আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ—ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম'। আবার, এই ইংরেজি জানা-না-জানার কথা আনেন 'ফ্রন্টিয়ার'-এর প্রিসেপ্টরশিপ প্রসঙ্গেও, 'এখানে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলা-চামুণ্ডারা ইংরেজিতে ওয়াকিবহাল নয় বলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কিছুটা সুবিধে হয়।' ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলা হওয়া মার্জনীয়, হয়তো, কিন্তু তাদের ইংরেজি না-জানাটা ক্ষমার অযোগ্য! আর ফ্রন্টিয়ারের 'সুবিধে'টা একটু গবের!

বলা অবান্তর, নিজের ইংরেজিজ্ঞান সমরবাবু নিশ্চয়ই কখনো জাহির করতে চান না, এমন-কি তাঁর বি. এ-তে প্রথম হওয়ার খবরও চেপে গিয়েছেন। '১৯৩৬-এ যে-বছর আমরা বি এ. দিই, স্কটিশ দর্শন, অর্থনীতি ও ইংরেজিতে প্রথম হয়। দর্শনে শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্তী ঈশান স্কলারশিপ পান, অর্থনীতিতে প্রথম হন অনিলা (আইলিন) বনার্জি…'।

নীরবতার এমন অ্যাংলো-স্যাকসনি ব্যবহারে সমরবাবু প্রায় নিঃসংশয় করে দেন—তিনি 'বখাটে' হলেও, 'সাহেব'।

এ সাহেবিআনা সমরবাবুর প্রায় স্বভাবগতই যেন। ফলে, বাঙালি-ভারতীয় পরিবেশের অনেক কিছুই তিনি সইতে পারেন না। কিন্তু তাঁর সহ্য-করতে-না-পারার ভেতরও একটা পশ্চিমি সভ্যতা-সম্মত সীমা আছে। 'শান্তিনিকেতনের পরচর্চার আবহাওয়া দেখে বলতাম ব্রাহ্ম-পল্লীসমাজ', 'কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করবো কিনা গম্ভীরভাবে চিন্তা করে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না', 'ছোট কলেজে দলাদলি ছিল খুব। এ-সবে নাক না গলিয়ে…', '১৯৫৬-এ স্তালিনের কেচ্ছা শুরু হল। ব্যাপারটা অত্যন্ত কদর্য ঠেকেছিল…', ইত্যাদি আরো অনেক জায়গায় এই চারপাশ নিয়ে সমরবাবু খুব বিব্রত—বিব্রত তাঁর রুচি ও ইচ্ছের সঙ্গে চারপাশটা মেলে না বলে, আর সেই না-মেলার জন্য তাঁকে মনে মনে বিরক্ত হয়েও একটা গা-আলগা ভাব রাখতে হয় বলে।

কিন্তু এই রোগা বইটির শেষ দিকে এই সেয়ানা চাল সমরবাবু আর রাখতে পারেন নি। কারণ, তাঁর সারা জীবনে সেই প্রথম তিনি একটি সংগঠিত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন—'নাও' প্রকাশ ও সম্পাদনা। এই কাজটি তাঁকে একটা বিশেষ রাজনীতি ও সামাজিক কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আর, এমন ভাবে যুক্ত হওয়ার দায়ে তাঁকে কিছু সমর্থন আর কিছু বিরোধিতা উশকোতে হয়েছে, এটুকু করাও সম্ভব হয়ে উঠত না যদি আমাদের দেশে তখন তাঁর রাজনীতির ও সামাজিক কর্তব্যবোধের সমর্থক একটা মত ও হয়তো কিছুটা আলগা সংগঠন তৈরি না-হত।

৮-এর পরিচ্ছেদের শেষাংশ থেকেই তিনি একটু অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁর তিন বছরের রুশ-প্রবাসে সোভিয়েত জনগণের সামাজিক ব্যবহারের অধোগতি দেখে ফেলেন। 'রাশিয়া বিরাট দেশ, পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ। জারেরা পারদেশ দখলে বেশ তৎপর ছিলেন। সেগুলি ধরে রাখা উত্তরাধিকারীদের মহান কর্তব্য'—এমন মন্তব্য করে ফেলেন প্রায়

কমিউনিস্ট বিদ্বেষীদের ভাষাতেই ! '...এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার কথা লিখব না। আমরা অনুবাদ করে জীবনধারণ করতাম, ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মতো অতিথি হিসেবে রাজকীয় ভাবে থাকি নি—ভালো হোটেল, গাড়ি, দোভাষিনী ইত্যাদি ইত্যাদি'। সেজন্য মুখ বন্ধ রাখার বাধ্য-বাধকতা আমার নেই'—প্রায় চান ঠিকে-ঝিদের ভাষায় ঘরের হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেয়ার হুমকি দিয়ে ফেলেন ! সেই গা-আলগা ভাব আর রাখতে পারেন না। ১৯৬৮ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন, ভারতের রাজনীতি আর বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়েও। শেষের দিকে সমরবাবুকে তো বেশ বিচলিত দেখায়। এবং গম্ভীরও বটে।

পাঠ্য একটি বই হিসেবে তাতে তো 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর ক্ষতিই হল। তাঁর জীবৎকালের ঘটনা ও একটি ব্যক্তিত্বের বিকাশের আখ্যান হিশেবে তো আর এ-বই কেউ পড়বে না। পড়বে লেখার গুণেই, পড়ার আনন্দেই। তাঁর বিষয়ের সঙ্গে অর্থাৎ নিজের সঙ্গে এত বেশি জড়িত হয়ে পড়ায়, এই বইটির শেষাংশে সমরবাবুর লেখার চাল্‌টাই গেল নষ্ট হয়ে—বাড়িতে আগুন লাগলেও যে চাল নষ্ট করতে নেই। যে 'বিপ্লব'পন্থী তরুণ এক্সিকিউটিভ শ্রেণী প্রথমে 'নাও' ও পরে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর স্থায়ী পাঠক-সমর্থক হয়ে ওঠেন, ভালো ইংরেজিতে রাজনীতি পড়তে পারা যাঁদের স্বল্প পারিবারিক সময়ের, ততো-স্বল্প নয়-সামাজিক সময়ের ও চাকরির দীর্ঘ সময়ের প্রায় একমাত্র 'হবি', তাঁদের তো আমরা সমরবাবুর লেখার লক্ষ হয়ে উঠতে দেখতে পেলাম না ! কৃষক মুক্তি, সংগ্রামের পক্ষেও পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার বিপক্ষে পরিচালিত ইংরেজি সাপ্তাহিকটি শুধুমাত্র ইংরেজির সুবাদে হয়ে ওঠে সরকারি-বেসরকারি ব্যুরোক্রাসির ব্যসন—এই ঘটনায় সমরবাবুর নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার রঙ্গ-রস আমরা পেলাম না। নিজেকে নিয়ে হাসিঠাট্টা সাহেবদের তেমন আসেও না।

এ বইয়ের প্রথম-আর দ্বিতীয়াংশে তাই এক মজার স্ববিরোধিতা। প্রথমাংশে সমরবাবু শুধুই বক্তা—কিছু ঘটনার, কিছু কিছু ব্যক্তির। কিন্তু কোনো সময়েই সমরবাবু কর্তা নন। দ্বিতীয়াংশে তিনিই কর্তা—তাই তিনি আর বক্তা নন। বক্তা আর কর্তা তাঁদের হিউমারে আর কর্মে এক হলেন না।

হওয়া সম্ভবও কি ? সমরবাবুরা নিজেদের জন্য একটা ভূমিকা

ভেবেছিলেন। যা বলা উচিত, সৎ আবেগেই তাঁরা চেয়েছিলেন এই দেশকালে সমষ্টির কোনো যোগ্য ভূমিকা তাঁরা দেখতে পাবেন। কর্ম্মের ভূমিকা তাঁদের থাক আর না থাক, দর্শক, একটু লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা তাঁদের আছে বলে তাঁরা ভাবতেনও হয়তো। হয়তো ভাবতেনও না, কিন্তু সবসময়ই কোথাও একটা বিচ্ছিন্নতার ব্যথা তো বোধ করতেই পারেন, ব্যথাই আবার আরেক অর্থে তাঁদের রুজি-রোজগার, সামাজিক মর্যাদা, এমনকি দর্শক হলেও সাক্রিয়তার মর্যাদাও এনে দিত। ফলে কোথায় তাঁদের অবস্থান তাঁরা জানতেন না—কখনো কবিতায়, কখনো মিছিলে। সমরবাবুরা তো কোনো ব্যক্তি নন, একটা লক্ষণ—গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরেই একটা লক্ষণ। উনিশ শতকের বাঙালি কবির দাম্ভিক শিরোনাম, 'আমার জীবন' আর বিশ শতকের বাঙালি কবির আত্মশ্লেষ 'বাবুবৃত্তান্ত' যেন সেই লক্ষণেরই একশ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস। তফাৎ এই—প্রথমটি মূঢ়, দ্বিতীয়টি চালাক।

আজকাল ইংরেজ সংসর্গজাত এই প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন সেয়ানাগিরি, 'বাবু' এই বিশেষণ নিয়ে নিজেদের বাঙালি প্রমাণের মতলবে মেতেছে। কিন্তু 'বাঙালি বাবু'-রও তো একটি জাতি-পরিচয় আছে। সমরবাবুদের তা নেই। সমরবাবুরা বাবু নন—সাহেব।

দেবেশ রায়

সবিনয় নিবেদন,

'পরিচয়' পূজা সংখ্যায় (১৯৭৮) নীহার বড়ুয়ার লেখা 'ছাড়িয়া না যান মোর মইষাল বন্ধুরে', প্রবন্ধটি গভীর আগ্রহের সাথে পড়েছি। লেখিকা ঐ অঞ্চলের, স্বভাবতই তিনি তাঁর আবেগ নিয়েই লিখেছেন। কিন্তু প্রবন্ধে কিছু গুরুতর বক্তব্য আছে যার প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

প্রখ্যাত অসমীয়া সাংস্কৃতিক নেতা প্রয়াত বিষ্ণু রাভা ব্রহ্মপুত্রের নামকরণ বিষয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বুল্লং বুথুর থেকে (শ্রীরাভার মতে ঐ শব্দ বড়ো ভাষায় ওর্থ কলকলনাদিনী) এই নাম এসেছে। 'কিরাত জনকৃতি' বইয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার সে বিষয় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তথাপি কিছু কিন্তু তিনি রেখেছেন। কিন্তু বড়ুয়া মহাশয়া কোচরাজবংশীভাষী বা বাহেভাষী পরে 'বাহেভাষী অঞ্চল' ইত্যাদি লিখে এক বালতি জলে চোনা ঢেলেছেন। এই বাহেভাষী কথাটির কে জন্ম দিয়েছে জানি না। কিন্তু শ্রীমতী বড়ুয়া কি জানেন না যে রাজবংশী এবং কোচরা নিজেদের বাহেভাষী বলেন না, বললে তাঁদের ক্ষোভ হয়? এ প্রসঙ্গে আমি 'বাহে' শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় ৪ অগাস্ট, ১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'বাহে' শব্দের প্রকৃত অর্থ (লেখক দীনেশ ডাকুয়া—লেখক কোচবিহার জেলার রাজবংশী এবং এম. এস. এ.) দেখতে বলব। দীনেশবাবুর বক্তব্য: "'বাহে' কথাটির প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ না জেনে হয়তো রাজবংশীদের নিজেদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে 'বাহে' বলে সম্বোধন করতে শুনে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আগত কেউ কেউ গোটা রাজবংশী সম্প্রদায়টাকেই 'বাহে' সম্প্রদায় ভেবে বসলেন এবং যাকে-তাকে 'বাহে'

বলে ডেকে অথচ বিন্দুমাত্র সম্মান না করে রাজবংশী ও স্থানীয় মুসলমানদের বিরক্তির উদ্রেক করেছেন। প্রথমদিকে অজ্ঞতাবশত হলেও পরবর্তীকালে তাচ্ছিল্যভরে 'বাহে' শব্দটির অপপ্রয়োগ হয়ে আসছে। সেজন্য 'বাহে' শব্দটির সঠিক প্রয়োগে যেখানে রেগে যাওয়া মানুষও অপত্যস্নেহে বিগলিত হওয়ার কথা, এর অপপ্রয়োগে শান্ত ও নম্র রাজবংশী সমাজ ও স্থানীয় মুসলমানেরাও ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত বোধ করেন।" প্রাক্তন রাজ্যসভা এম. পি শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালী' পুস্তকে এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "প্রসঙ্গত 'বাহে' শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা প্রয়োজন। ইহা 'বাবাহে' শব্দের সংক্ষেপ প্রয়োগ। দুইটি ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতাপুত্র খুড়াভাই ভাইপো অর্থাৎ যেখানে এক ডিগ্রির উঁচু নিচু সম্পর্ক আছে এবং ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত নিঃসম্পর্কিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। যেখানে পিতা, পিতৃবৎ বা বন্ধু। মিত্র বা সম সম্পর্ক সেখানে কখনো ব্যবহার হয় না বা হতে পারে না। এ শব্দ সম্বোধনবাচক। অজ্ঞতাবশত অপপ্রয়োগে বিরক্তি ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে।" কাজেই বড়ুয়া মহাশয়ার বক্তব্য 'বাহেভাষী' আমাদের বিশেষ বিরক্তি ও বিক্ষোভের কারণ হয়েছে।

তাঁর অপর বক্তব্য আসামের পশ্চিম পাড়ে 'ব্রহ্মপুত্র' লৌকিক ভদ্র নাম নিল 'বরমপুত্তোর'—আদৌ সঠিক নয়। ব্রহ্মপুত্র আসল নাম এবং সেটার উৎপত্তি বরমপুত্তোর থেকে হয়েছে একথা মানা যায় না যদি না আমরা জানতাম এটা এসেছে তিব্বতের মানস সরোবর থেকে।

গোয়ালপাড়া বা রাজবংশী এলাকায় মহিষের লালন পালনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে "তার জন্য ফিরে যেতে হবে অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীতে"। হাতি ধরা, বশ করার জন্য বনের মোষের বাচ্চা ধরার ইতিহাসও বড় পুরাতন। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্বপুরুষদেরও বাথান ছিল, বাঘের উৎপাতে এ অঞ্চলে গরু থেকে মোষ পালন করা সুবিধাজনক ছিল। বিশ্ব সিংহ (কোচরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) সম্বন্ধে জানা যায়:

"During his adolescence a boy from each or the families of the hill had attended the kine with him, He raised each of the Companies of his childhood to an office of dignify... The whole management of the principality was entrusted

to the twelve karzees". (*An Account of Assam*, by Dr. John Peter Wade, written in 1800, 2nd Impresion Page 201).

কাজেই মোষ-চড়ান এর আগেও হতো। মইষাল গান ভাওয়াইয়ার অন্তর্ভুক্ত। শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাল 'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি'-র (ভাওয়াইয়া খণ্ড) নিবেদন-এ লিখেছেন :

"আঞ্চলিক নামকরণ অনুসারে ভাওয়াইয়া গানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) চিতান ভাওয়াইয়া

(২) ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া

(৩) দরীয়া ও দীঘল নাসা ভাওয়াইয়া

(৪) গড়ান ভাওয়াইয়া

(৫) মইষালী ভাওয়াইয়া :—এই গান অন্যান্য গানের মতো কিন্তু চাল ভিন্ন ধরনের। এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোন কিছুর সোয়ার (সওয়ার) হয়ে চলেছে এবং চলার ছন্দ গানের ছন্দে প্রকাশ পায় এই চালকে সোয়ারী চাল বা মইষালী চাল বলে।"

মইষাল অথবা গাড়ীর মাহুত এদের দুঃসহ দুঃখময়, নারী বঞ্চিত জীবন গানের বক্তব্যকে ঘিরে রেখেছে। একই গানে বিভিন্ন জায়গায় কথান্তর ঘটেছে। গোয়ালপাড়া থেকে কুচবিহার আবার উত্তর থেকেই জলপাইগুড়ির, এই গান সুরে ও বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্ন হলেও মূল বক্তব্য সেই বিরহ, প্রেম নিবেদন অথবা কাতর প্রার্থনা।

শ্রীনীহার বড়ুয়া কতকগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ব্যাখ্যাও করেছেন কিন্তু গোড়ায় তিনি বেশ বিভ্রান্তির পরিচয়ও দিয়েছেন। লেখিকা প্রবীণা, দীর্ঘদিন রাজবংশীদের সাথে ওঠবস করেও তাঁদের বিষয়ে ভুল করতে পারেন তার প্রকাশ অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

তথাপি এই প্রবন্ধের জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা পাবেন। আমরা আশা করব ঐ উপরোক্ত বিভ্রান্তিগুলো তিনি ভবিষ্যতে সংশোধন করবেন।

পরিতোষ দত্ত

দেবেশ বাবু,

'পরিচয়'-এর বিষ্ণু-দের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি সংখ্যা পড়ে শেষ করলাম। খুব ভাল হয়েছে। এত উপকারে লাগবে যে বলা যায় না। অনেক পুরনো লেখা একসঙ্গে পাওয়া গেল। এত সুন্দর সংকলনের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিচয় বেশ অনিয়মিত। সাধারণ সংখ্যাগুলি আজকাল আর ভাল লাগে না। সে রকম কিছু থাকে না। বিশেষ করে প্রবন্ধ আর পুস্তক-পরিচয়, যা কিনা পরিচয়-এর এতদিনের গর্ব তা, বলতে গেলে, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকাংশই প্রবন্ধই অধ্যাপকদের অনার্স অথবা এম. এ. ক্লাশের ছাত্রদের নোট দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অবশ্য, সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের যা হাল এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। আর অত আজেবাজে কবিতা ছাপান কেন বুঝি না।

জানি, আপনাদের সংগঠন দুর্বল, আর্থিক সঙ্গতি প্রায় নেই। নানারকম ঝাপড়ে তো আপনারা পড়েছেন। এটা বুঝতে পারছি, কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা যাক, তবে, যা বললাম, একটু দেখবেন কতদূর কি করা যায়। বিক্রি কেমন হয় জানিনে, তবে 'পরিচয়'-এর প্রতি একটা মমতা তো অনেকেরই আছে। যেমন আমি। সেই ১৯৩৮।৩৯ সাল থেকে পড়ে আসছি। না পেলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এতদিনের অভ্যাস তো।

শান্তিকুমার সান্যাল

মাদার থেরেসা

এই কলকাতারই মাদার থেরেসা এবার শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন এ তো আনন্দেরই কথা আমাদের। শিয়ালদা স্টেশনের মতো আমাদের দৈনন্দিন আসা-যাওয়ায় বা ট্র্যাফিক জ্যামের মৌলালির মতো রোজকার বিকেলে, টিনের লম্বা চালায় বা পাকাপোক্ত বাড়িতে, তাঁর কাজ আমরা দেখে আসছি বেশ কয়েক বছর। খবরের কাগজে বা রেডিওতে তাঁর খবর শোনাও তো আমাদের অভ্যেস। আত্মহত্যার দুঃখ মানছেন এমন হতাশ্বাস মানুষও তাঁর শেষ সম্বল গচ্ছিত রেখে যান তাঁর কাছে বা সংসারের যন্ত্রণায় নিরুপায় মা তাঁর শিশুটিকে দিয়ে যান তাঁর দুয়ারে—এমন খবরও আমাদের চেনাজানাই হয়ে গেছে। নানা দেশের নানা মানুষের নানা রকম ভিড়ের এই কলকাতায় মাদার থেরেসা কোনো এক অস্পষ্ট শূন্যতা পূরণ করে ফেলেছেন বোধহয়। তিনি যেন আমাদের এই নাগরিক জীবনের এক ধরনের ভরসা হয়ে উঠেছেন—সে বিষয়ে আমরা খুব সচেতন না হলেও নোবেল পুরস্কারের ঐতিহ্য ও স্বীকৃতি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে একজন যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন তাঁর কর্মের পরিধি ও গভীরতায় নতুন এক তাৎপর্য আসে। আমাদের দৈনন্দিনে-সামাজিকে এমন জড়িত কেউ যখন পান, তখন কোনো-এক-ভাবে আমাদেরও তা স্পর্শ করে। এই স্বীকৃতি তাঁর ভবিষ্যৎ-কর্মকে প্রভাবিত করবে—তাতেও আমরা হয়তো প্রভাবিত হবো। মাদার থেরেসার এই পুরস্কারের সঙ্গে তাই কলকাতাবাসী আমাদের যোগ অনিবার্যতই বড় ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীর কাছে তাঁর পরিচয়ও তো কলকাতার মাদার থেরেসা বলে।

এ পুরস্কারে উল্লাসের যে বাঙালি কলকাতাই বিস্ফোরণ ঘটতে পারত, তা কিন্তু ঘটে নি। বামফ্রন্ট সরকার জনসংবর্ধনা দিয়েছেন, সামাজিকভাবে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাঙ্গণে, রবীন্দ্র সদনে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা

প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিম। তবু যেন মনে হলো, কলকাতা তত উচ্ছ্বসিত হলো না—আনন্দিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

তার কারণ কি নিহিত আছে—খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসেরই ভেতর, গত প্রায় তিনশ-সাড়ে তিনশ বৎসরে সে ইতিহাস তো উচ্চতর-নিম্নতর সংস্কৃতির মহাজন আর গ্রহীতার। আজও ভারতবর্ষের আদিবাসীদের ভেতর মিশনারীদের কাজকর্ম আমাদের জাতীয়তা-বোধকে নিয়তই অপমান করে চলে।

তার কারণ কি নিহিত আছে—মাদার থেরেসার সেবাকর্মের এই প্রয়োজনের মধ্যে আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের গত তিরিশ বছরের নিদারুণ ব্যর্থতাই যে প্রমাণিত হয়ে থাকে তার ভেতর। এখনো আমাদের দেশের মানুষ মরবার ঠাঁই পায় রাজপথে। এখনো আমাদের দেশের শিশু তার বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

তার কারণ কি নিহিত আছে—নোবেল পুরস্কার ইত্যাদি গোছের স্বীকৃতিতে এক জাতিগত হীনমন্যতাবোধে যে আমাদের বারবারই ভুগতে হয় তার ভেতর। এক মার্কিন সাপ্তাহিকে দেখা গেল—কোন দেশ কোন বিষয়ে কতবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তার গর্বিত তালিকা। তাই আমাদের দেশের ছেলে. খোরানা, বিদেশে গিয়ে নোবেল বিজয়ী হলে আমরা উল্লসিত হতে পারি না—কোথায় এক পরাজয় আমাদের আঘাত দেয়। আবার, বিদেশিনী আমাদের দেশের মানুষ হয়ে উঠে নোবেল বিজয়ী হলেও আমরা উল্লসিত হতে পারি না—কোথায় এক ব্যর্থতাবোধ আমাদের পীড়ন করে।

কেমন অনুমান করতে ইচ্ছে হয়—মাদার থেরেসা বোধহয় আমাদের এই মনটাকে চেনেন। নইলে, কেন তিনি বেছে নেবেন কলকাতা শহরকেই—সাম্রাজ্যের প্রথম শহরকেই। কেন তিনি সাম্রাজ্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত চার্চের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলির বাইরে তাঁর একাকী কাজ শুরু করলেন? তাঁর কর্মিনীদের জন্য নেবেন কলকাতার জমাদারনির পোশাক?

তাঁর কাজগুলোতেও ঘটে যায় কি এই কল্পনারই সম্প্রসারণ। অনাকাঙ্ক্ষিত জন্ম আর উপেক্ষিত মৃত্যু—এই তো তাঁর কাজের প্রধান দুটি জায়গা। সব জন্মের জন্য অপেক্ষিত হাসি আর সব মৃত্যুর জন্য অপেক্ষিত চোখের জল—এই তো তাঁর ব্রত। তাঁর কাজ যেন কবিতা হয়ে ওঠে ব্রতের এই কল্পনায়।

আমাদের পক্ষে এ কবিতা তো শোকেরই কবিতা। আমাদের এই

দেশ আর এই সমাজ এখনো বদলানো যায় নি বলেই তো তাঁর মতো মহিয়সীর এমন দুঃখব্রত! আমাদের তো তিনি শ্মশানবন্ধু—চোখের জল, শোক আর উপায়হীন পরাজয়ে সে বন্ধু আমাদের কত ভরসা! কিন্তু শ্মশানে তো উল্লাস আসে না।

মাদার থেরেসা তাঁর কর্মের কবিতা দিয়ে আমাদের এই অনুভবকেও নিশ্চয় স্পর্শ করতে পারবেন।

দেবেশ রায়

বরেণ্য কবি মুহম্মদ ইকবালের জন্মশতবার্ষিকী

আমাদের উপমহাদেশের বিশিষ্ট বরেণ্য কবি ইকবালের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে আমরা শরিক।

কবি ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথকে একসময়ে ভারতমাতার দুইচোখ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। কবি ইকবালের জন্ম গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষে এবং মৃত্যু বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের মাঝামাঝি সময়ে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মতোই, কবি ইকবালকেও, উপমহাদেশের নিপীড়িত মানুষের মহাজাগরণের বাণীবাহী হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত এবং অবনত ও অপমানিত শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের অধিকারের সনদ নিয়ে সটান পেয়েছিল। আমরা কবি ইকবালের মৃত্যুর চারদশক পরেও তাঁকে প্রাণবন্ত করেই পাচ্ছি, কারণ, ১৯২১ সালের গণ অভ্যুত্থানের মুখে ইকবাল যে শ্রমজীবীদের 'খিজর-ই-রাহ' কবিতায় স্বাগত জানিয়েছিলেন নতুন পৃথিবী গড়ার জন্যে, তারা আজ গত চল্লিশ বছরের নানারকম বিভ্রান্তি 'কাটিয়ে সমাজতন্ত্রের অবস্থান নিতে যাচ্ছে। সেই সময়ে ইকবাল একটি কবিতাতে লিখেছিলেন।

> 'জনগণের জাগরণের গান প্রচুরপ্রচুর আনন্দের।
> আলেকজাণ্ডার আর জারের স্বপ্নার্ত কাহিনী নিয়ে—
> আর কতকাল চলবে?
> পৃথিবী থেকে একটা নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে।
> হে স্বর্গ, যে সব তারা অস্ত গিয়েছে
> তাদের জন্যে আর কান্না কেন?
> মানুষের স্বভাব ভেঙে ফেলেছে
> সমস্ত বন্ধন ও শৃঙ্খলকে।

যে স্বর্গ হারিয়ে গেছে তার জন্যে
আদম আর কতকাল কাঁদতে পারতো ?
হে আমার পৃথিবীর দরিদ্রেরা
ওঠো, জাগো
অভিজাতদের প্রাসাদের তোরণ
আর দেয়ালকে কাঁপিয়ে দাও।
জ্বলন্ত বিশ্বাসে
ক্রীতদাসের রক্তে জাগে অগ্নিশিখা।

(কুরবত্‌উল আইনের ইংরেজী অনুবাদ থেকে)

ইকবাল ছিলেন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী অধিবিদ্যা ও দর্শনের স্নাতক ও শিক্ষক। সুতরাং উচ্চমার্গের ভাববাদী জ্ঞান ও দর্শন তাঁর কাব্যেও প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে প্রাচ্যের নিপীড়িত বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষের দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। দরিদ্র ও রিক্তের বস্তুর দুঃখই তাঁকে দেশপ্রেমিক ও বিদ্রোহী করেছিল। তাঁর কবিতায় ও গানে নানাভাবে নানাসময়ে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন দেশপ্রেম ও বিদ্রোহকে। পরাধীনতা, ক্লৈব্য ও দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণ অনৈক্য ও ভেদবিভেদকে দূর করে নিজেদের গলদগুলোকে দূর করার জন্যেই তিনি লিখেছিলেন 'নয়া শিবালয়'। সঙ্গে সঙ্গেই জুলুমবাজ ইউরোপীয়-সাম্রাজ্যবাদীদের বা ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। রুশ বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা মার খেয়েছিল বলে ইকবাল লেনিনকে এবং শ্রমজীবীদের অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর ভাববাদী দর্শনে এক্ষেত্রে বাধা হয় নি। অবনত প্রাচ্যের জনগণের প্রতি মমতার সূত্রেই ইকবাল অবনত মুসলমান সমাজের জন্যে গভীর বেদনা অনুভব করতেন। এই বেদনার কাব্যিক রূপ 'শোকোয়া' বা অভিযোগ।

এই 'শেকোয়া' কাব্যে ইকবাল খোদার কাছে মুসলিমসমাজের দুরবস্থার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন বলে রক্ষণশীলরা ইকবালকে দারুণভাবে আক্রমণ করেছিল। ইকবাল এরপরে 'জবাবে শেকোয়া' লিখে অবনতির দায়িত্বটা নিজেই গ্রহণ করেন।

এরপরে লোকায়ত ব্যাপার ছেড়ে ইকবাল 'আত্ম' ও 'অনাত্ম'তত্ত্বের সন্ধানে ও নির্ণয়ে নিমগ্ন হন। উর্দু ছেড়ে ফার্সীতে 'আসরারে খুদী' এবং 'রমুজে বেখুদী' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে ইকবালের

'খুদী' বা 'অহং'তত্ত্ব। এখানে রয়েছে মানুষের অতি-মানুষ হতে পারার সম্ভাব্যতার দর্শন।

এই তত্ত্বে অবস্থান করেও ইকবাল আবার লোকায়ত কাব্যের ধারার কাজ করতে পরাঙ্মুখ হন নি। বস্তুতপক্ষে, বিশের দশক এবং তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইকবাল উর্দু কাব্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'বালে জিব্রিল' বা 'জিব্রাইলের ডানার' সমস্ত কবিতাই মানবতার নতুন রং-এ রাঙানো। সে রং সমাজতন্ত্র।

উপরোক্ত দুটো অবস্থান নিয়েই ইকবালের কাব্যসমগ্র। যাঁরা ইকবালকে সমাজবিপ্লব থেকে আলাদা করে দেখতে চেয়েছেন তাঁরা ইকবালের 'খুদী' দর্শনকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রাচ্যের ক্রন্দন ও বিদ্রোহ এবং সমাজতন্ত্র ও শ্রমজীবীদের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইকবালের কবিতাকে গৌণ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ইকবাল যে শেষের দিকে লোকায়তে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেই ঘটনাটাকেই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে রক্ষণশীলেরা। সামগ্রিকভাবে ইকবাল কাব্যের যে-লোকমুখিতা, তাকে এই জন্যেই যথাযোগ্য ভাবে সামনে আনা দরকার।

ইকবালের উচ্চ অধ্যাত্ম দার্শনিক চিন্তার দিকটাকে তাঁর কাব্যের অন্যতম উপাদান বলে ধরে নিয়েই আমরা তাঁর বিদ্রোহাত্মক ও বিপ্লবাত্মক লোকায়ত দিকটাকে বড় করে দেখব।

উর্দু কাব্যের আধুনিক বিদ্রোহী শিল্পীরা তাঁকে এইভাবেই দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন।

মখদুম মহিউদ্দীন ইকবালকে তাঁর একটি কবিতায় 'প্রাচ্যের জাগরণের অগ্নিকণ্ঠ কবি' বলে অভিহিত করেছিলেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তাঁর 'ইকবাল' প্রশস্তিতে লিখেছেন:

> আমাদের দেশে এসেছিল
> সুকণ্ঠ দরবেশ এক, তারপর
> চলে গিয়েছিল আপনার
> সুরে গড়া গজলের মালা রেখে।
> যেখানে দাঁড়িয়েছিল দরবেশ
> সেইখানে
> কচিৎ কারুর চোখ পৌঁছেছিল,

কিন্তু তার গানগুলি
প্রবাহিনী হয়ে নেমেছিল
হৃদয়ে সবার।
এসব গানের
উদ্গাতা চিরঞ্জীব।
এইসব গান
যেন অগ্নিশিখা।

কবি শামসুর রাহমান পঞ্চাশৎ বর্ষে

বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবি শামসুর রাহমান পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। তাঁর কাছ থেকে আমাদের আরও অনেক পাওনা রয়েছে। আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রগতির ধারার একজন অক্লান্ত শিল্পী হিসেবে তিনি দুই বাংলারই প্রিয়।

১৯৪৮ সালে ১৯ বছর বয়সে, চমক লাগানো প্রেমের কবিতা 'রূপালি স্নান' লিখে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তের ছোঁয়ায় বিদ্রোহী ও আশাময়ী হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। এরপরে দুই দশক ধরে বিশ্বের আধুনিকতম কাব্যের এবং বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন একটি নিজস্ব কাব্যকক্ষে। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় একদল তরুণ কবির একজন হিসেবেও একটা ধারা নিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি। ইংরাজী সাহিত্যের স্নাতক শামসুর রাহমান আধুনিক ইংরাজী কবিতার প্রতি আকৃষ্ট। তবে ক্রমে ক্রমে পল এলুয়ার প্রভৃতির আকর্ষণ তাঁর কাছে বেড়ে গেছে। বাংলা কবিতার শিল্পী হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িককে তিনি বস্তু ও ভাবের দিক থেকে জোরের সঙ্গেই সামনে এনেছেন। মাটিতে পা আছে তাঁর শামসুর রাহমান যে ঢাকা নগরীর বাসিন্দা, সেকথা উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। ৬৮-৬৯ সালের বাংলাদেশের গণঅভ্যুদয় শামসুর রাহমানের কাছ থেকে আদায় করেছে 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' এবং ফেব্রুয়ারী

ঊনসত্তর'-এর মতো গণবিপ্লবাত্মক কবিতা। তাঁর 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' কবিতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই কবিতাটি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলির একটি।

অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী শামসুর রাহমান অন্তর ও বাহিরের, স্বদেশ ও বিশ্বের, বিমূর্ত ও মূর্ত এবং ব্যক্তি ও জনতার টানাপোড়েন ও আকর্ষণ-বিকর্ষণে সাড়া দিয়ে আসছেন গত তিরিশ বছর ধরে। ষাটের দশকের শুরুতে প্রকাশিত তাঁর কবিতা-সংগ্রহ 'রৌদ্র করোটিতে' থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' পর্যন্ত তাঁর সমস্ত বইতে এই জন্যেই রয়েছে বৈচিত্র্য। এর মধ্যে অন্তর্বিরোধ রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। ধ্রুপদী এবং আধুনিক বাংলাকাব্যের কাঠামোকে ভাঙচুর না করে তার মধ্যে অভিনব শব্দ ভরে দেবার ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়. আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত তৎসম এবং ইংরেজী শব্দের সঙ্গে মাঝেমাঝেই অতর্কিতে সাক্ষাৎ হয় তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে। তবে সমস্ত ব্যাপারেই আতিশয্য পরিহারের পন্থী শামসুর রাহমান এই ধরনের শব্দ ব্যবহারকে একটা শৈলীতে পরিণত করেন নি। এই জন্যে সাধারণভাবে তাঁর কবিতা রীতিমতো আটপৌরে। তাঁর অধিকাংশ বইএর নাম বিমূর্ত ধরনের হলেও বিষয়বস্তু এবং বাণী একান্তভাবেই মূর্ত। সর্বোপরি শামসুর রাহমান মানবতাবাদী। লোকজনের কাছ থেকে সরে যেতে চাইলেও সরতে পারেন না। তাঁকে আমরা এইভাবেই আরও প্রসারিত ও ঘনিষ্ঠ এবং হৃদয়গ্রাহী দেখতে চাই।

শামসুর রাহমান বছর কয়েক আগে একটি কবিতাতে লিখেছেন :

> 'তারা ক'টি যুবা হিংস্র যুদ্ধে
> ভাবে না কখনো জিৎকার, হার কার?
> দেয়ালে দেয়ালে শুধু সেঁটে দেয়
> লাল গোলাপের নতুন ইস্তাহার।'

কবির কাছে আমাদের ফরমায়েস রইলো অজস্র লালগোলাপের—আগামীতে দুর্দিনে—সুদিনে। প্রগতিবাদীদের অবশ্যই জিততে হবে লালগোলাপ তারই প্রতীক।

রণেশ দাশগুপ্ত

পরিচয়

নভেম্বর ১৯৭৯

৪৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা

পরিচয় প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক—গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

'পরিচয়' নিয়ে প্রায়ই আমরা চিঠি পাই—নতুন পাঠকদের কাছ থেকে কম, পুরনো পাঠকদের কাছ থেকে বেশি। কিছু চিঠিতে যেমন নিখাদ প্রশংসা জোটে কখনো, কিছু চিঠিতে নিন্দাও জোটে খাদহীন। কিন্তু সব চিঠিতেই থাকে 'পরিচয়' সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আগ্রহ—সেখান থেকেই নিন্দা বা প্রশংসা। এই সব চিঠিই তো পাঠকদের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। 'পরিচয়' কেমন হচ্ছে, পাঠকরা কেমন পড়ছেন, যে-সব লেখা বেরচ্ছে পাঠকরা সেগুলি কি ভাবে নিচ্ছেন—এই সব নেহাত দরকারি খবর জানার আমাদের আর-কোনো উপায় নেই।

একটি অভিযোগ প্রায়ই আমাদের শুনতে হয়—'পুস্তক-পরিচয়' আগের মতো হচ্ছে না। অভিযোগটা হয়তো আংশিক সত্য, তুলনাটি হয়তো একটু অসঙ্গত। দেড় বছরেরও বেশি হলো 'পরিচয়'-এ 'পুস্তক-পরিচয়'-এর ওপর একটু অতিরিক্ত জোরই দেয়া হচ্ছে। প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্তও আমরা এই কারণে দিতে প্রস্তুত থাকি। 'বিশেষ সংখ্যা'-র ধারাবাহিকতা একটু নষ্ট হয়ে যায় বলেই কি পাঠকদের ঠিক নজরে পড়ে না।

'বিশেষ সংখ্যা' আমাদের কিছু কৃতিত্ব হয়তো, কিন্তু খানিকটা সমস্যাও বটে। কারো-কারো কাছে বিশেষ সংখ্যাগুলিই যেন 'পরিচয়'-এর প্রধান ব্যাপার। আবার, এমন পাঠকও তো আছেন যিনি হয়তো মাসিকপত্রের ধারাবাহিকতায় খুব বেশি বিশেষ সংখ্যার 'বাধা' পছন্দ করেন না গ্রাহক-দের অবশ্য এতে আর্থিক কোনো ক্ষতি হয় না। বছরে তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ তো আমাদের ঘোষিত সূচি। এবার, এই ৪৯-বর্ষে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের আচার্য গোপাল হালদার-এর ৭৮ বর্ষ পূর্তিতে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ তার সম্মাননায় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে—৮০-র ফেব্রুয়ারিতে। এটা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি যুগ্ম-সংখ্যা, তাই, জানুয়ারিতে কোনো সংখ্যা বেরবে না। আর যে-জুন সংখ্যা জুনে বেরবে সমালোচনা সংখ্যা। প্রকাশ-সূচির গোলমালে সমালোচনা সংখ্যা গত বছর বেরয় নি।

এবারের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু রচনার পরবর্তী অংশ এই সংখ্যায় বেরোল—পূর্ণেন্দু পত্রীর ভ্রমণ-কথা ও নীহাররঞ্জন রায়-এর প্রবন্ধের অনুবাদ। এই সংখ্যা থেকে আমরা 'মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য'—এই বিষয়ে রচনা সংকলন শুরু করেছি। এই সংখ্যার রচনাটিতে পাওয়া যাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাহিত্য-আলোচনার পুরনো ফর্মালিস্ট ধারার সঙ্গে বর্তমান ধারার সংযোগটি। ডিসেম্বর সংখ্যায় মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে লুসিএঁ গোল্ডম্যান-এর প্রবন্ধের অনুবাদ বেরবে।

মার্ক্সবাদ ও শিল্পসাহিত্য আলোচনা-সংকলন

সম্পাদকীয়-ভূমিকা

ষাটের দশক থেকে মার্ক্সবাদ-চর্চায়, বিশেষত মার্ক্সবাদ ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়ে, বিভিন্ন দেশে নানারকম নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটছে। এদের সবগুলোই যে নতুন তা নয়। কিন্তু অনেক লেখাই ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হলো এই সময়ই। তার ভেতর সবচেয়ে প্রধান নিশ্চয়ই লুকাচ ও ব্রেখট-এর রচনাবলি। আবার, যেমন সার্ত্রে ও ব্রেখট সম্পর্কে থিওডোর অ্যাডরনোর লেখায়, মার্ক্সবাদ ও শিল্প-সাহিত্যিকদের দায় সম্পর্কে নতুনতর প্রশ্ন উঠছে। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক লুসিএঁ গোল্ডমান মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনার ভেতরকার অন্তর্লীন সম্পর্কের ডায়ালেকটিককে তাত্ত্বিক স্পষ্টতা দেন মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর 'পাওয়ার অ্যাণ্ড হিউম্যানইজম' গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের অন্বয়ে। পোলাণ্ডের দার্শনিক স্টিফান মোরাওস্কি মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে এই দশকের গোড়ায় নতুন আলোচনা করেছেন। এ-ছাড়াও, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্ক্সবাদ ও নন্দন সম্পর্কে আরো নানা ধরনের নতুন নতুন কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এই সব কারণেই মার্ক্সবাদী সাহিত্য-তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই, 'মার্ক্সইজম এ্যাণ্ড লিটারেচার'-এর ভূমিকায় এই ষাটের দশক থেকে সময়কে মার্ক্সবাদ ও শিল্প-সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে 'এ পিরিয়ড অব অ্যাকটিভ ডেভেলপমেন্ট' বলেছেন।

এই সক্রিয়তার কারণ নিশ্চয়ই নানাবিধ—কতকগুলি হয়ত নির্দিষ্ট করা যায়।

১. স্তালিনের নেতৃত্বকালে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের সরলীকরণ মার্ক্সবাদ-চর্চার ভেতর ঢুকে যায়। তা থেকে বেরিয়ে এসে শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক জিজ্ঞাসা-উত্থাপন ও সেই জিজ্ঞাসার কিছু উত্তর-সন্ধান এখন সম্ভব হয়ে উঠছে। এই চেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়নেও নতুন ধরনের শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার ধারা সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'রাশিয়ান ক্লাসিকস সিরিজ'-এর গল্প-উপন্যাসগুলির ভূমিকা-নিবন্ধে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।

২. আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকেই এক মতাদর্শগত বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। সেই বিতর্কের বাস্তব-

রাজনীতিক প্রকাশ অনেক সময় ঘটেছে চীনের সোভিয়েত-সীমান্ত বিরোধিতায় বা ভিয়েতনাম আক্রমণে। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে ইতালি, ফ্রান্স, কিউবা, পর্তুগাল-এর কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযাত্রীরা এই বিতর্কের অংশীদার। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সার্বভৌম অধিকারে সুস্থ বিতর্কের এই লেনিনীয় ঐতিহ্যও স্তালিন-পর্বে ব্যাহত হয়েছিল।

৩. 'ষাটের দশক আমাদের শতাব্দীর ইতিহাসে ধনতন্ত্রবিরোধী দশক হিসেবে চিহ্নিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন আদর্শগত ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের অন্তর্গত হলেও এই আন্দোলনের কেন্দ্র পরিচালনা করেছে নিউ লেফ্ট'। 'The New Left openly chellenged bourgeous Society, the all powerful Military Industrial Complex, the aggresive foreign policy pursued by the imperialists, the economic preseres and political repression to which the working people were exposed, together with bourgeouis 'mass culture' and all pervasive ideology. Yet at the same time the New Left rejected the ideological and political leadership of the working class and Marxist-Leninist parties as insufficiently revolutionary'. (E. Batalov The Philosophy of Revolt, pp 7-8, Progress Publishers, Moscow, 1975)

স্তালিনোত্তর পৃথিবীতে মার্কসবাদের নতুন চর্চা, মতাদর্শগত বিতর্ক ও নিউলেফ্টের অভ্যুদয় আমাদের দেশেও কিছু-কিছু ঘটেছে কিন্তু নানারকম ঘোর-প্যাঁচের ভেতর দিয়ে।

মতাদর্শগত বিতর্ক অনেকসময়ই মিশে গেছে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন বামপন্থী দলের বাস্তব-রাজনীতির কূট-কচালিতে। নিউ লেফটের দেশীয় কর্মসূচির প্রকাশ দেখা যায়—রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্ব-নিরপেক্ষ সব পরিস্থিতিরই বিপ্লবী কর্তব্যের সর্বজ্ঞতায়। রাজনৈতিক দল-বহির্ভূত এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের 'নিউ লেফ্ট'-তির্যকতা ভারতবর্ষের বাঁয়ে-চলা কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির প্রশ্রয়ই পেয়েছে। আবার আর-এক ধরনের আশ্রয়ও পায় ভারতের কোনো কোনো রাজ্যের জনসমর্থিত বামপন্থায় কোনো একটি বিষয়েও তাঁরা কোনো স্বতন্ত্রভাবে প্রতিবাদ সংগঠন করেন কি

অথচ এই প্রতিবাদ-সংগঠনই ইয়োরোপ ও আমেরিকার নিউ লেফ্‌টকে নৈতিক মর্যাদা দিয়েছে।

ফলে, মার্কসবাদ, শিল্প-সাহিত্য ও এ-দুইয়ের অন্তর্সম্পর্ক নিয়ে সারা পৃথিবীর নতুন ভাবনা-চিন্তাও বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে এখনো প্রতিফলিত হয় নি। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের একমাত্র সংযোগ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বলেই হয়ত, যতক্ষণ ইংরেজি ভাষায় অনূদিত না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এই নতুন চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতেই পারি না। তাই, মার্কস-বাদের দার্শনিক চিন্তা ও নন্দনচর্চার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে যে-সব লেখা পত্র ষাটের দশকের আগে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এসেছে, তাতেও এই নতুন চিন্তাভাবনার আঁচ মেলে নি।

চল্লিশের পঞ্চাশের দশক জুড়ে সমাজ-অর্থনীতির শ্রেণী বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের মার্কসবাদী বিচার নিয়ন্ত্রিত হত। চল্লিশের দশকের বিখ্যাত আরাগঁ-গারদি বিতর্কের মূলও প্রোথিত ছিল শিল্পের শ্রেণী-চরিত্রে ও শিল্পীর শ্রেণী-ভূমিকায়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এরেনবুর্গ-এর 'দি রাইটার অ্যাণ্ড হিজ ক্র্যাফট' ও হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচার'-এ দু জন সৃষ্টিশীল লেখকের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য আলোচনার সূত্র নির্ধারিত হতো কডওয়েল-এর 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি' ও 'স্টাডিজ ইন ডায়িং কালচার' থেকেই। আর সেই সময় এই ধ্যান-ধারণা দিয়ে যখন বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে তখন অর্থনীতির শ্রেণী-নির্ণয়ের প্রায়-বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তায় শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণী নির্ণয় সাব্যস্ত হয়েছে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও নিহিত থেকেছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিশেষ ধারণা, যা হয়তো সেই দলগুলির বিশেষ মার্কসবাদ থেকেই জন্মেছে। যেন, শিল্প-সাহিত্য, রাজনৈতিক কর্মসূচির একটি প্রয়োগক্ষেত্র মাত্র। যেন, মানব সভ্যতার এক নিগূঢ় ব্যক্তিগত দায় মেনে নিয়েই শিল্প-সাহিত্য রচনার ব্যক্তিগত কুরুক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক অবতীর্ণ নন।

এমনটি যে শুধু চল্লিশ-পঞ্চাশেই ঘটেছে, এখন আর ঘটছে না—তা নয়। প্রায় যেন অঙ্কের নিয়মেই দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশে যে-সব লেখককে যে-সব 'মার্কসবাদী-ব্যত্যয়ের' জন্য যে-সব গালি-গালাজ করা হয়েছে, আবার সত্তরে সেই সব লেখককে সেই সব 'ব্যত্যয়ের' জন্য সেইএকই গালাগাল দেয়া হচ্ছে। তফাৎ শুধু এই, প্রথম ও পরবর্তী আলোচকের মধ্যবর্তী বয়সের

ব্যবধান প্রায় পিতা-পুত্রের। পঞ্চাশের মুখের 'মার্কসবাদী' সাহিত্য-সমালোচনার এক সংকলনের আলোচনায় উনআশির এক তরুণ বুদ্ধিজীবী স্বীকারই করেছেন এ-গুলি আগে পড়া থাকলে তাঁদের আর লেখার দরকার হত না। পিতার যৌবন দিয়ে পুত্রের যৌবনের এই দায় মেটানো জীববিজ্ঞানের রীতিবিরুদ্ধ।

'পরিচয়'-এ আমরা আমাদের দেশের ও ভাষার সাহিত্য-আলোচনাকে তার নির্দিষ্টতার ভেতরও, বিশ্ব-পরিস্থিতিতে প্রসারিত দেখতে চাই। সেই কারণে, গত দুই দশকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক তাৎপর্য-সমন্বিত কিছু-এমন রচনা আমরা পুনঃপ্রকাশ করব, যার বিষয়—মার্কসবাদ ও শিল্প-সাহিত্য। এই পুনঃপ্রকাশের ধরন বিভিন্ন হতে পারে—কখনো মূল প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ, আবার, কখনো হয়ত একজনের সাহিত্য-চিন্তার ওপর অপরের কোনো নিবন্ধ। একজন সাহিত্য-তত্ত্ববিদের মূল প্রতিপাদ্যটির জন্য কখনো তাঁর বিভিন্ন রচনার আংশিক অনুবাদের সমাবেশও ঘটতে পারে বা সাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণও থাকতে পারে।

বলা বাহুল্য—এই প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশিত নানা মতামতের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর মতামত এক নয়, এক হতেও পারে না। প্রগতিশীল চিন্তার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠককে যুক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই শতকের বিশের দশকের গোড়ায় স্ট্রাকচারালইজমের ধারণার সঙ্গে সোভিয়েত-সমালোচকরা কি ভাবে নিজেদের মিলিয়েছিলেন ও আধুনিক-কালে সাহিত্য-বিচারের নিরিখ কি এই নিয়ে বর্তমান সংখ্যার রচনাটিতে আলোচনা করেছেন সোভিয়েতের প্রখ্যাত সাহিত্যতত্ত্ববিদ্।　　সম্পাদক

সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সাহিত্য-বিচারের স্থান

লিদিয়া গিনজবার্গ

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেপ্রস লিতারাতুর (সাহিত্যের সমস্যা)-পত্রের ১৯৭৮-এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত

লাতিনিন

আজকাল প্রশ্ন উঠেছে সাহিত্য-বিচার (Literary Study) কি একটি বিজ্ঞান? নাকি বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা থেকে আলাদা একটা বিশেষ বিষয়?

গিনজবার্গ

সাহিত্য-বিচার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত, বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। সাংস্কৃতিক কাঠামোতে সাহিত্য-বিচারের ভূমিকাও বিচিত্র। পরন্তু, সাহিত্যের ছাত্রকে ত একটা বিশেষ ধরনের গুণ অর্জন করতে হয়। ব্যাকটিরিয়া নিয়ে যাঁদের গবেষণা তাঁদের ব্যাকটিরিয়াগুলোকে ভালো না বাসলেও চলে। বোটানিস্টেরও চলে ফুল ভালো না বাসলেও। তাঁদের শুধু বিষয়টিকে ভালোবাসা আগে দরকার। কিন্তু আমাদের আনন্দ তো শুধু জ্ঞানে নয়, গবেষণাতেও নয়। সাহিত্য-বিচারের আগে, পরে, সবসময়, থাকে এক নান্দনিক আকাঙ্ক্ষা। তাই সাহিত্যের গবেষকের সঙ্গে তাঁর বিষয়ের এমন এক সম্বন্ধ থেকে যায়—যা অন্য কোনো বিষয়ে দরকার হয় না। ফলে সাহিত্য কেমন লেখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে সাহিত্য-বিচার কেমন হবে। সাহিত্য যদি সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতার আধার হয়ে উঠতে না পারে, সাহিত্য-বিচারও তা হলে দুর্বল হয়ে পড়ে।

শার্তিনিনা

'সাহিত্যে প্রতিফলিত সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা'—এর ওপর তো সমালোচনাও (criticism) নির্ভরশীল। সমালোচনা ও সাহিত্য-বিচার (study) সাধারণত তো এ-দুটোকে খুব কাছাকাছির ভাবা হয়। ভাবা হয়—সমকালীন সাহিত্যই সাহিত্য-সমালোচনার (criticism) লক্ষ্য। আর সাহিত্য-বিচারের (study) লক্ষ্য অতীত সাহিত্য। সাহিত্য-বিচার সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

গিনজবার্গ

সমালোচনার লক্ষ্য যে সমকালীন সাহিত্য সে তো পরিষ্কার। সমালোচনার কাজও তাই। সমকালীন সাহিত্যের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা থেকে আমরা একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অতীত ইতিহাসের বিচার করি। বড় সাহিত্য-সমালোচক যে বড় সাহিত্য-ঐতিহাসিকও হয়ে ওঠেন—এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৮৪০-এর রুশ সাহিত্যের নতুন বাস্তবতাচর্চার সঙ্গে মিলিয়েই বেলিনস্কি রুশ সাহিত্যের ইতিহাস ভাবেন। বা, তাঁর সমকালীন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই Sainte-Beuve প্রাচীন ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ভেতর এই পার্থক্য খুব

সাম্প্রতিক কালের। উনিশ শতকে এই ধরনের পার্থক্য ও বিশেষজ্ঞতা অজ্ঞাত ছিল।

অতীত সাহিত্য বুঝতে সমালোচকের অভিজ্ঞতা ও লেখকের অভিজ্ঞতা—এই দুইই খুব দরকার। টি. এস. এলিয়ট তো এতদূর বলেছেন যে শুধু একজন লেখকই পারেন আরেকজন লেখক সম্পর্কে লিখতে। এটাও চরম কথা, খানিকটা স্ববিরোধীও, পরে এলিয়টও নিজেকে শুধরেছেন। কিন্তু তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল—একজন লেখক লেখাটিকে ভেতর থেকে দেখতে পারেন—কেমন করে বিভিন্ন জিনিস জোড়া হয়েছে, কেমন করে এই নির্মাণটি গড়ে উঠেছে। একজন লেখকের মতামত অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিগত (subjective)। অতীত থেকে একজন লেখক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মতোই সংগ্রহ করেন, অন্যদের কাছে তা হয়তো অপ্রত্যাশিত। একজন লেখক যখন আর-একজন লেখক সম্পর্কে বলছেন—তখন তিনি আসলে নিজের সম্পর্কেই বলছেন, নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে।

সাত্তিনিনা

তা হলে তোমার মতে সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সাহিত্য-বিচারের স্থান নির্ধারিত হবে বিষয়ের সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা? বা, বলা যায়, সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের জৈব-সম্বন্ধ (organic link) দ্বারা।

গিনজবার্গ

বটেই তো কিন্তু এই স্থান সাহিত্যের প্রকৃতির ওপরও কম নির্ভরশীল নয়। সাহিত্য তো জীবনের বহুমুখী প্রতিফলন, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা। জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তো আর এমন সীমাহীন সমগ্রতা নেই।

মানব অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বিচিত্র পর্যায় সাহিত্যে ধরা পড়ে। ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে ও এই বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের সম্বন্ধ।...এতটা বহুমুখী-প্রকৃতির বলেই সাহিত্য-বিচারের কর্মও বিচিত্র। 'লিটারারি স্টাডি' শব্দটিই তো হালের। তোমার মনে থাকতে পারে, বিশের দশকে আমরা 'লিটারারি স্টাডি' বলতাম না! বলতাম—'থিয়োরি অব লিটারেচার' আর 'হিস্ট্রি অব লিটারেচার'।

জার্মানদের নানারকম শব্দ আছে—*Kunstwissenschaft* আর *Literaturwissenschaft*। আমেরিকানদের এমন কোনো শব্দ নেই। রেনে ওয়েলেক ও অসটিন ওয়ারেন তাঁদের 'থিয়োরি অব লিটারেচার' বইটিতে বলেছেন 'সায়েন্স অব লিটারেচার' বোঝাতে তেমন কোনো 'বিশেষ শব্দ'

না থাকার কি কি অসুবিধে হয়। তাঁরা ভাগ করেছেন—ইতিহাস, তত্ত্ব ও সমালোচনা।

সাহিত্য-বিচার (Literary Study) শব্দটি ব্যবহারের সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে—এর সীমানার অদল-বদল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মের সঙ্গে এর নানা ধরনের সম্বন্ধ। এই ধরনের বহুমুখী পারস্পরিক সংলগ্নতার জন্যই সাহিত্য-গবেষককে খুব সাবধানে নির্দিষ্ট ভাবে তার বিষয় বেছে নিতে হয়। সব কথা বলে ফেলা বা একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবটুকু দেখা—খুব ভালো সাহিত্য-গবেষণা নয়।

শান্তিনিধি

একটু বেখাপ্পা শোনালো না? আজকাল তো বেশি-বেশি শুনতে পাই—'সমগ্রতার দৃষ্টিভঙ্গি', 'সিসটেম অ্যাপ্রোচ', 'গবেষণার বিষয়-রূপ'।

শিবজবার্গ

বিষয় যদি খুব নির্দিষ্ট হয় তা হলে তো আর 'সামগ্রিকতা' আটকায় না বা বিভিন্ন বিষয়ের সযত্ন ব্যবহারও আটকায় না। সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস, মনোতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব তাদের নির্দিষ্ট ধরনের কাজটুকু দিয়েই তো সাহিত্য-বিচারকে পুষ্ট করে। তারা সাহিত্যকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চৌহদ্দিতে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সংস্কৃতির সেই চৌহদ্দিগুলি যদি সাহিত্য-বিচারকে গ্রাস না করে ফেলে তবেই তাকে উন্নত করতে পারে। সাহিত্য-বিচারে গবেষণার নির্দিষ্টতা সাহিত্য-বহির্ভূত বিষয়ের দ্বারা যেন নষ্ট না হয়।

শান্তিনিধি

যাই হোক, সাহিত্য-বিচারের তো প্রায়ই চেষ্টা থাকে সঠিক বিজ্ঞান—exact science—হয়ে ওঠার দিকে। তখন গবেষণার নির্দিষ্ট (exact) পদ্ধতির ওপর জোর পড়ে, যেমন ধর, স্ট্রাকচারাল মেথড।

শিবজবার্গ

ঠিকই, আমাদের সময় হিউম্যানিটিজ-কে গণিতের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটা ঝোঁক উঠেছে। যে-কোনো বিষয় সম্বন্ধে গবেষণাতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই ব্যবহার করা উচিত। কখনো-কখনো তাতে বেশ ফল পাওয়া যায়, কখনো আবার পাওয়া যায় না। কোনো-কোনো বিষয়ে স্ট্রাকচারাল মেথডে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়—বিশেষত, লোককথা, পুরাণ, মধ্যযুগের সাহিত্য-কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে, যে-আঙ্গিকে বর্ণনার কোনো কোনো বিষয়ের নিয়মমাফিক পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে। ভি. প্রপ-এর মৌলিক

কাজ আছে এ-বিষয়ে—'মরফলজি অব টেল।' সোভিয়েতের আধুনিক সাহিত্য-তাত্ত্বিক, ই. মেলেতিনস্কি, ভি. আইভানভ ও ভি. তপোরভ-এর কাজও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আলাদা আলাদা লেখকের সাহিত্য বিশ্লেষণে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বিতর্ক-সাপেক্ষ। এসব ক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ধরে পৌঁছতে হয় একেবারে খাপছাড়া সিদ্ধান্তে।

সাভিনিনা

একটু উল্টো-পাল্টা শোনাচ্ছে না?

সিরজবার্গ

বোধহয়। আমি একটু ব্যাখ্যা করছি। সাহিত্যে ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে বিধিবদ্ধ (formalisation) করতে হলে, সেই উপকরণগুলিকে আগে নির্দিষ্টভাবে আলাদা করতে হবে—আলাদা করা বলতে যা বোঝায় সেই নির্দিষ্ট অর্থেই আলাদা করতে হবে। কিন্তু শিল্পের শব্দ-প্রতিমা আর কল্পনার বাণী তো অনিবার্যতই বহু-অর্থ-অন্বিত, প্রতীকী, অনুষঙ্গ-প্রধান। তাকে তো এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভবই নয় যেন সেই শব্দের মাত্র একটিই অর্থ, তার বেশি কিছু নয়। সাহিত্যের যে-কোনো ব্যাখ্যায় যে-অনিবার্য ব্যক্তিগত থাকে (subjectivity), তা দিয়েই সাহিত্যের ব্যাখ্যা চলে। তারই ফলে, একই পদ্ধতিগত অবস্থান (methodological position) থেকে একই লেখার নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। লিরিক কবিতার বিশ্লেষণে এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। ব্যাপারটা এ-রকম নয় যে একটা বর্ণনার বদলে আর-একটা বর্ণনাকে মেনে নেয়া। আসলে বিবরণের কোনো একমাত্রিক নির্দিষ্টতায় কাব্যভাষার অর্থবৈচিত্র্য ধরা পড়ে না।

সাভিনিনা

কিন্তু সাহিত্যের কত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে তার দ্বারা সাহিত্যের আলোচনা তো চালিত নয়, 'সত্য' ব্যাখ্যাটি কি সেটাই সে খোঁজে। এর ভেতর অবশ্যই একটা দ্বন্দ্ব নিহিত আছে—গবেষণা-আলোচনার লক্ষ্য আর সাহিত্যের বস্তুগত (objective) অর্থের ভেতর। 'লিতারাতুরনায়া গেজেটা'-তে প্রকাশিত এক আলোচনায় এই প্রশ্নটি উঠেছিল—সাহিত্য-আলোচনায় কতটা অবজেকটিভ, বস্তুগত, হওয়া সম্ভব। 'ভোপ্রোসি লিতারাতুরি'-তেও এক প্রশ্নমালায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'সাহিত্য-বিচারে

কি অনুমানের (hypothesis) প্রয়োজন আছে?' আমার মনে আছে, জবাবে তুমি লিখেছিলে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অনুমান একটি স্বীকৃত পদ্ধতি কিন্তু মানব-বিদ্যায় অনুমেয় ও অননুমেয় এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক করা মুশকিল।

গিনজবার্গ

আমার মনে হয়, মানব-বিদ্যারও 'সত্য' (accuracies) আছে। কিন্তু সেটা মানব-বিদ্যাতেই খাটে। এটা ভুলে গেলে সর্বনাশা ভুল হবে। এই 'সত্যের' নানা স্তর। সবচেয়ে আগে তথ্যের, প্রমাণের 'সত্য', গবেষণা-প্রক্রিয়ার 'সত্য'। তথ্য ও টেক্সট-এর প্রতি মনোযোগ, তথ্য ও টেক্সট ব্যবহারে সতর্কতা—এগুলো তো সবাইকেই আয়ত্ত করতে হয়। যদিও আমরা অনেকেই করি না।

এই যাকে বলা যায় টেকনিক্যাল যাথার্থ (accuracy), তার পরেই আসে, যুক্তি-উত্থাপনে সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবহার; আর সর্বশেষে, একটি ধারণা (conception) তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর সত্য ও তাকে যথাযথ শব্দে প্রকাশ।

মানব-বিদ্যায় 'সত্যের' এই ত হল নানা স্তর-পরম্পরা। কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞানের (exact science) মানদণ্ড মানব-বিদ্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়। যথার্থ বিজ্ঞানে ভুল মানে ভুল আর প্রমাণ মানে প্রমাণ। একজন বৈজ্ঞানিকের ভুল আর-একজন ধরতে পারে। একজনের প্রমাণ আর-একজন যাচাই করতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে আমরা 'সত্য' বলতে কি বুঝব? বাখতিন-এর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচকের লেখাই ধরা যাক। দস্তয়েভস্কির গদ্যে বহুস্বর, (polyphony) সম্পর্কে তাঁর ধারণা, 'শেষ পর্যন্তও সংলাপ-এর ওপর নির্ভরশীলতা তাঁর নিজের মত প্রকাশের অবকাশ আর দেয় না'। কিন্তু অনেকেই এর সঙ্গে একমত নন। অনেকেই মনে করেন না যে দস্তয়েভস্কির লেখায় তাঁর মত শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে নি। কার্নিভাল-গোছের লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে বাখতিন যে বিভিন্ন সাহিত্যরূপকে এক করে দেখিয়েছেন তার সঙ্গেও সবাই একমত নন। আমিও বাখতিন-এর সব ধ্যান-ধারণা মানি না (তাঁর নকল-নবিশদের কথা বাদই দিচ্ছি যাঁরা বাখতিন-এর ধ্যান-ধারণার একেবারে যান্ত্রিক প্রয়োগ করেন)।

কিন্তু গবেষক ও সমালোচক হিশেবে বাখতিন-এর কৃতিত্ব এই নয় যে

তিনি কতকগুলি নিঃসংশয় সত্য বলেছেন। তাঁর প্রবল মনন-শক্তি, নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর কৌতূহল, নতুন-নতুন চিন্তা-ভাবনা সঞ্চারের ক্ষমতা, অন্যেরা যে-সমস্যার ভেতর ঢোকেন নি সেই সব সমস্যার সন্ধান—এতেই তাঁর কৃতিত্ব। লেখকের লেখার ভেতরে কি-সব চিন্তা-ভাবনা আছে চিরকালই সে-সব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দস্তয়েভ্‌স্কির ওপর বাখতিনের কাজে বাখতিন দেখিয়েছেন কল্পনার ও শিল্পের বুনটের ভেতরে কি-ভাবে চিন্তা-ভাবনা অনুসূত থাকে। একটি বিশেষ চিন্তার (idea) অত্যন্ত সাধারণ রেখাচিত্র থেকে শুরু করে শব্দে-শব্দে তার কঠিন নির্মাণ পর্যন্ত দেখিয়েছেন।

লাভিনিন

এতে মনে হতে পারে, একটা ধারণা যথেষ্ট 'ফলপ্রসূ' হওয়া সত্ত্বেও 'সত্য' নাও হতে পারে। এই বিশেষ উদাহরণে, পরস্পরবিরোধী কিছু ধারণাও একসঙ্গে থাকতে পারে কিন্তু তারা পরস্পরকে বাতিল করে না—শিল্পের মতোই, যেখানে নতুন একটি আবিষ্কার পুরাতনকে বাতিল করে না। এই যে নানা রকম 'সত্য' একসঙ্গে থাকতে পারে, অথবা, আরো নির্দিষ্টভাবে, একটি কোনো 'চরম সত্য'-এর অভাব—এতে তোমার কোনো অসুবিধে হয় না?

গিনজবার্গ

তেমন সম্ভাবনা তো আছেই। আমরা তো আর দ্ব্যর্থহীন ফরমুলা দিতে পারি না। আমাদের কারবার এমন বিষয় নিয়ে যার নান্দনিক প্রকৃতিই বহু-অর্থ-সমন্বিত। সেই কারণেই এই বিষয়টি একই সঙ্গে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার মানে কখনোই নয় যে দৃষ্টিকোণ একটা নিলেই হল আর তার সংখ্যারও কোনো মাপজোক নেই। একটা সাহিত্যকর্মের বাস্তব গঠনের সীমা দিয়েই তো আমরা তাকে বুঝতে পারি। এক ভুল-বোঝারই তো কোনো সীমা নেই।

লাভিনিনা

কিন্তু তুমি তো এখনো বলছ—'বৈজ্ঞানিক চিন্তা', 'সাহিত্য-বিচারে আবিষ্কার'। এখানে বোধহয় শিল্পগত আবিষ্কারের বাইরের কোনো ধারণা তোমার মনে কাজ করছে। তাহলে সাহিত্য-বিচারে আবিষ্কার বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? আমি নতুন তথ্যের কথা বলছি না—সে তো নতুন বটেই। কিন্তু জ্ঞাত তথ্যের কি নতুন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তৈরি হতে পারে না?

গিনজবার্গ

সাহিত্য-বিচারে আবিষ্কার বলতে দুই-ই বোঝায়—নতুন তথ্য ও নতুন চিন্তা। কখনো এর দ্বারা বোঝা যায় আগে অজ্ঞাত কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা। অথবা জ্ঞাত তথ্যের নতুন ব্যাখ্যাও বোঝাতে পারে। অথবা, সেই সব তথ্যের নতুন বিন্যাস ও সম্পর্কও বোঝাতে পারে।...

লাভিনিনা

সাহিত্য-বিচারকে শিল্পের সন্নিহিত ধরে নিলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভুলে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায় না? এমন সমালোচনা আমাদের প্রায়ই চোখে পড়ে যেখানে আলোচকের ব্যক্তিত্ব আলোচ্য বিষয়ের চাইতে প্রধান হয়ে ওঠে। ক্ষমতাশালী লেখকদের বেলায় এ দোষ না-হয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু একটা সাহিত্য-কর্মকে আলোচকের আত্মপ্রকাশের ছুতো হিশেবে ব্যবহার করা হচ্ছে—এটা কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সাহিত্য-বিচার তো আর রচনা-লেখা নয়।

গিনসবার্গ

রচনা-লেখাতে আমার আপত্তি নেই—রচনাটি যদি ভালো হয়। আগে আমি Sainte Beuve-এর নাম করেছি। তিনি তো খুব সুন্দর রচনা লিখতেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি তিনি তো ফরাসী দেশকে ফিরিয়ে দেন রঁসার (Ronsard) ও তার সহ-কবিদের। তাঁদের তো চিরকাল রুচি-হীন ভাবা হতো। Sainte-Beuve যা করেছিলেন তাকে বলা যায় পুনর্নির্মাণ। আর সে-কাজ করতে শিল্পের উপকরণ দরকার। আর দরকার ফরাসী রেনাসাঁস-সংস্কৃতি—যা সবাই প্রায় ভুলতে বসেছে।...

আমাদের আজকের কথাবার্তায় সাহিত্য-গবেষণার নানা দিক আর [illegible]দের উপযুক্ততার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। সমস্ত রকম গবেষণা-পদ্ধতিরই [illegible]তা সীমাবদ্ধতা আছে। তার নিজস্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপকরণেরও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এটাও তো স্বাভাবিক। কারণ বিচিত্র বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই তো সাহিত্য-বিচার [illegible]র শক্তি সংগ্রহ করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই বৈচিত্র্যই পশ্চিমি সাহিত্যের বিশেষত্ব। সাহিত্যের নানারকম প্রবণতা ছিল—এক ঝোঁক আর-এক ঝোঁককে [illegible]ড়িত করছে। মার্কসবাদ-প্রভাবিত ঝোঁক ছিল, আবার বিহেভিয়ারিস্ট ও

ফাংশনাল সোসিওলজি দ্বারা প্রভাবিত ঝোঁকও ছিল। মনোতাত্ত্বিক ঝোঁক (মনোবিকলনসহ) যেমন ছিল, তেমনি ছিল ভাষা-স্টাইলগত ঝোঁক, বিভিন্ন দার্শনিক ঝোঁক তো ছিলই। যেমন, ফরাসী এক্সিস্টেনসিয়ালিস্ট স্কুল অতীত ও সমকালীন ফরাসী সাহিত্যের পুনর্বিবেচনার ওপর বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিল। সার্ত্রে এই স্কুলের একজন খুব বড় লেখক।

শান্তিনিনা

তুমি তো এইমাত্র বললে—বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে সাহিত্য-বিচার তার প্রয়োজন-সাধনের উপাদান নিতে পারে। তুমি কি 'ভাষাতত্ত্ব'-কে তার ভেতর অন্যতম প্রধান বলে মনে কর? অনেক সময় তো মনে করা হয়েছে যে সাহিত্যের ওপর ভাষাতত্ত্বের প্রভাব সাহিত্যকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বর্তমান সাহিত্য-বিচারে ভাষাতত্ত্বের প্রভাব কি বলে তুমি মনে কর?

গিনজবার্গ

বিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্বের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। নানা দার্শনিক আলোচনায় ভাষাই হয়ে উঠছে প্রাথমিক উপাদান। আবার অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গেও ভাষাতত্ত্বের সংযোগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে—গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব, সাইকোলিঙ্গুয়িস্টিকস, সোসিওলিঙ্গুয়িস্টিকস।

সুতরাং সাহিত্য-বিচার, যা কি না শব্দ-নির্মিত শিল্পের বিচার, তার ভাষা ও স্টাইলের ওপর জোর পড়বে—এটাই তো স্বাভাবিক। এ-সম্পর্কে নানা মত আছে। স্ট্রাকচারালইজম ছাড়াও, ফ্রান্সে ও ইউনাইটেড স্টেটসে 'নিউ ক্রিটিসিজম' চলছে। এরা টি. এস. এলিয়টের সংস্কৃতি-সম্পর্কিত ধারণা দ্বারা চালিত—যার প্রাথমিক উপাদান হলো ভাষা। এলিয়টের মতে কবিতা ভাষার সীমা পার হয়ে যায় আর সেই প্রক্রিয়ায় মানুষের কাছে তার নিজেরও অজ্ঞাত আন্তর-অভিজ্ঞতা উন্মোচন করে। 'নিউ ক্রিটিসিজম' যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের অনেকেই এলিয়টের দার্শনিক ধারণা সমর্থন করেন না কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে তারা কবিতার পাঠ (text) খুব নিবিড়ভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁর 'কনসেপ্টস অব ক্রিটিসিজম' বইটিতে ওয়েলেক এই প্রবণতাকে বলেছেন, 'জৈব ও প্রতীকী নির্মিতিবাদ' ('organic and symbolic formalism')

লিও স্পিৎসার কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা আমার কাছে বেশ ফলপ্রসূ বলে মনে হয়। স্পিৎসার একজন অস্ট্রীয় ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-ঐতিহাসিক

পরে আমেরিকায় কাজ করেন। স্পিৎসার-এর চেষ্টা ছিল ভাষাতত্ত্বকে সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে মেলানোর। সাহিত্য-কর্মের ঐতিহাসিক ও মনোতাত্ত্বিক অর্থের গভীরতায় প্রবেশের জন্য স্পিৎসার স্টাইলের উপাদানকে ব্যবহার করতেন। স্পিৎসার অনেক পাঠের (text) অনুব্যাখ্যা (micro-analysis) করেছেন। তার বেশির ভাগই ফরাসী। প্রতিটি আলাদা ছোট অংশ বৃহত্তর কাজের নকশারই অন্তর্গত ও লেখকের বিশ্বদৃষ্টির প্রকাশ।

এই একই পদ্ধতি অয়েরবাক ব্যবহার করেন—পরিকল্পনার সঙ্গে বিন্যস্ত বিষয়ের ওপর। ১৯৪৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'মাইমেসিস' বেরয়।

রাশিয়াতে এই শতকের গোড়ার দিকে সমালোচনার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বকে মেলানোর চেষ্টা হয়েছিল। দশের দশকের শেষদিকে 'কাব্যভাষা পঠন-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—ওপোইয়াজ (OPOYAZ)।

কিন্তু শিগগিরই দেখা গেল, সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সংগঠন উন্মোচনের পদ্ধতি নিয়ে ওপোইয়াজ-এর গবেষণায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের সমস্যাকে ধরা যায় না। বিশের দশকেই অপোইয়াজ এর কোনো-কোনো সদস্য—তাঁদের মূল মতবাদের কিছু কিছু অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন।...

বিশের দশকের গোড়ায়, আমি যখন পুরাতন অপোইয়াজ গবেষকদের সঙ্গে কাজ করছি, তাঁরা কেউই আমাদের কখনো বলেন নি, যে, বিষয় থেকে আঙ্গিককে আলাদা করে দেখতে হবে বা বিষয়কে তুচ্ছ করতে হবে। প্রশ্নটি খুবই জটিল। আঙ্গিক আর 'বস্তু'র পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এটা নির্ভরশীল। ১৯২৩ সালের গোড়ায় ভাইনিয়ানভের 'প্রবলেমস অব পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ' বেরয়। তার ভূমিকায় ভাইনিয়ানভ বলেন, কবিতার স্টাইল-বিচারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা কবিতার পদের (poetic word) অর্থ ও তাৎপর্য।

আইকেনবম একবার আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'নিজেদের আঙ্গিকবাদী (formalist) না বলে, আমাদের নির্দিষ্টবাদী (specifist) বলা উচিত ছিল।'

আমাদের দেশের পরবর্তী সাহিত্য-বিচারে ভাষাতাত্ত্বিক ও স্টাইলের আলোচনা থেকে লেখকের বিশ্বদৃষ্টি-ভঙ্গি বিচারের ধারা গড়ে ওঠে।...

সাভিনিনা

তা হলে কি বলা যায় সাহিত্য-গবেষক হিসেবে তুমি সাহিত্য-বিচারের

সেই ধারার সংলগ্ন, যে-ধারায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে মেলানোর চেষ্টা হয়?

গিনজবার্গ

মেলানো, মানে, জীবনের সমন্বয় (organic combination)—কোনো মতেই যান্ত্রিক মিশ্রণ নয়। সমকালীন সাহিত্য-বিচারের অন্যতম মূল কাজ হলো—একটি সাহিত্য-কর্মের ঐতিহাসিক বিচার ও গঠন-বিচারের সমন্বয় সাধন। একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমরা এখনো সাহিত্য-কর্মের গঠন (structure) বিচার বলতে স্থূল-ভাবে স্ট্রাকচারাল মেথড ব্যবহারের কথা বুঝে থাকি। যাঁরা স্ট্রাকচারালিজম মানেন না, তাঁরাও স্ট্রাকচার বা সাহিত্য-কর্মের গঠন-বিচারের প্রয়োজন স্বীকার করেন—সেই বিশ সাল থেকেই।

লাতিনিনা

সাধারণত তো সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার আর গাঠনিক বিচারকে পরস্পরবিরোধী ধরা হয়—

গিনজবার্গ

কিন্তু সে বিরোধিতা তো মিটে যাচ্ছে, যদিও আপাতত মনে হতে পারে এদের মধ্যে বিরোধ আছে। জ্ঞানের সব শাখাতেই তো বিষয়কে নানা অংশে ভাগ করা হয়। হয়তো কৃত্রিম ভাবেই ভাগ করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো গবেষণার জন্য, বিশ্লেষণের জন্য একটা অংশ বেছে নেয়া। কিন্তু একটি কাজের সমগ্র অর্থ বোঝার সময় এই দুই পদ্ধতি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। ইতিহাসের দিক থেকে কেউ যদি শুরু করে তাহলে দেখা যায় একটি কাজের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়—কাজটির শিল্পগুণের বিচার। আবার কেউ যদি শিল্প-কর্মটির বিশেষ গঠনটির ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করে তাকে এসে পড়তে হয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।...

আর-একটি গভীর সমস্যার সামনে পড়তে হয় আমাদের। আমরা শিল্প-কর্মটির কোন্ নির্দিষ্ট গঠনটিকে খুঁজছি? যে-অর্থ ও তাৎপর্যের কল্পনার গর্ভ থেকে লেখকের কাজটি জন্ম নিয়েছে, সেই প্রাক্-জন্ম অর্থ বা তাৎপর্যটিকেই কি আমরা ফিরিয়ে দিতে চাই কাজটিতে? নাকি, পরবর্তী বংশধরদের চেতনার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে কাজটিতে যে অর্থ ও তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে—সেটাকেই আমরা ফিরে ফিরে বুঝতে চাই? এই সব

অর্থ বাদ দিয়ে সাহিত্যের আলোচক বা গবেষক যে-অর্থটি আবিষ্কার করেছেন, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সেটাই কি কাজটির অর্থ বলে আরোপিত হয়ে যেতে পারে না?

এই সব কথার উত্তর নানারকম হয়, পরস্পর বিপরীতও হয়। খুব সম্ভবত আমরা এখানে শিল্পকর্মের মূল্য-নিরূপণের একটা মিশ্র পদ্ধতির ভেতর ঢুকে যাই—একটি কাজের মৌলিক কাঠামো ও ইতিহাস-ক্রমে তার যৌগিক গঠন আবার আলোচক-গবেষকের নিজের সমকালীন ব্যাখ্যা।

শাস্তিনিনা

তুমি যে বলছিলে বংশক্রমে শিল্পের অর্থও বদলে বদলে যায়।

গিনজবার্গ

আমি কিন্তু অগণিত পাঠকের ব্যক্তিগত সাহিত্য-চেতনার কথা বলছি না। আমি বলছি একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক চেতনার কথা। এই সামগ্রিক ঐতিহাসিক চেতনাই সাহিত্য বলে একটা ব্যাপারের টিঁকে থাকার বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি রেখেছে। পাঠকদের ব্যক্তিগত গ্রহণ-প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই সাহিত্য-বিচারের বিষয় হতে পারে—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণই একটা আলাদা বিষয়।

আসল কথা, সাহিত্যের গবেষককে খুব পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে, কি সে খুঁজছে, কি সে চায়।...বস্তুজগৎ ও অন্তর্জগতের কাঁচা উপাদান সাহিত্যকর্মের পরিণতিতে পৌঁছবার আগে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। যখন যায়, তখন তার একটা নির্দিষ্ট গঠন হয়ে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই গঠনের বিশ্লেষণ ছাড়া বিষয়টিকে বোঝা যাবে না, অংশত বোঝা যাবে মাত্র। অথবা বিষয়টি হয়তো নানা রকম ঝোঁকে ঝোঁকে বেরিয়ে আসে, প্রতীকে-রূপকে সৃষ্টিক্রিয়ার ভেতরে কোথাও এই গঠনটি নিহিত হয়ে যেতে পারে। এই দুই ভাবেই সাহিত্যবিচার করা যায়। কিন্তু দুটোর ভেতর কোনো পদ্ধতিগত জট যেন না থাকে।

দস্তয়েভ্স্কির ওপর বাখতিন-এর কাজে দেখা যায়—লেখকের ব্যক্তিত্বের আলোচনায় না গিয়েও তার লেখা কি রকন বিশ্লেষণ করা যায়। এবং শুধু দার্শনিক-নৈতিক দিকই নয়, তার নান্দনিক দিকও দেখা যায়।

শাস্তিনিনা

তুমি তোমার নিজের পদ্ধতিটি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে—যে-পদ্ধতি তুমি তোমার বইয়ে নিয়েছ—'অন লিরিকস' আর 'সাইকোলজিক্যাল প্রোজ'?...

শিবনারায়ণ

...আমি তো আর শিল্প-রচনা করছি না। আমার পক্ষে এগুলো 'গদ্য লেখা'। আমার বরাবরই এই 'ইন্টারমিডিয়েট'—মধ্যবর্তী ধরনের লেখা পছন্দ—স্মৃতিকথা গোছের লেখা।

শান্তিনিনা

তুমি তো এই মধ্যবর্তী ধরনের লেখাগুলোকেও তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করছ। তোমার বইয়ে তুমি চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, ডায়েরি এই সবের ওপর জোর দিয়েছ—এ-গুলোতে বাস্তবতার সিধে প্রতিফলন ঘটে—তুমি বল। 'সাইকোলজিক্যাল নভেল' এই ধরনেরই আরো সংগঠিত লেখা বলে তুমি মনে কর। কিন্তু সারা দুনিয়াতেই এখন এই 'উন্নত সংগঠিত নির্মাণের' লেখার কদর কমছে ও ঐ মধ্যবর্তী ধরনের লেখার কদর বাড়ছে। এর কারণ তোমার কি মনে হয়?

শিবনারায়ণ

প্রথমে ধরা যাক নভেলকে 'মোর অর্গানাইজড্ স্ট্রাকচার' বলতে কি বুঝিয়েছি। এ-কথাটির ভেতর ভালো-মন্দের কোনো বিচার নেই। স্মৃতি-কথার চাইতে নভেল উন্নততর—এ-কথা বলতে চাই না। বলতে চাই—দুটোর সংগঠন দু-রকম।

সাহিত্য কখনো-কখনো নিজের চৌহদ্দির ভেতর থাকে, আবার কখনো-কখনো যাকে বলে 'হিউম্যান ডকুমেন্ট' তার কাছাকাছি চলে আসে। আগেও এ রকম ঘটেছে। যেমন, হেরজেন দেখেছিলেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্রান্সে। ফ্লবেয়ারের আবির্ভাবের আগে কিছুদিন অপেক্ষা-প্রতীক্ষায় কেটেছে—রাশিয়ার তুর্গেনেভের আগে। সেই সময় এই মাঝামাঝি ধরনের লেখার খুব চাহিদা হয়েছিল। আইকেনবাম তাঁর তলস্তয়-এর ওপর বইটিতে এ-বিষয়ে লিখেছেন। সম্ভবত সাহিত্যের পুরনো ধাঁচের জনপ্রিয়তা হ্রাসের সঙ্গেও এর একটা যোগ আছে।

শান্তিনিনা

একে কি তাহলে বলব শক্তি সংগ্রহ? নতুন ভাবে শুরু করার আগে?

শিবনারায়ণ

এ ভাবে তো কিছু বলা যায় না।...এ-কথা সত্যি যে এখন এই 'মাঝামাঝি' ধরনের লেখার প্রতি আগ্রহ খুব বেশি—সারা দুনিয়া জুড়েই। পাশ্চাত্যের 'উপন্যাসের সঙ্কট' নিয়ে যে কথা উঠেছে—সেটাও কিছু এমন

আকস্মিক নয়। এই শতকের প্রথমার্ধের কথাই ধর—প্রুস্ত, জয়েস, কাফকা, মান, ফকনার, হেমিংওয়ে—এঁদের সমতুল্য কেউ এখন পাশ্চাত্য সাহিত্যে নেই।

তবে এই স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে আগ্রহের আরো-একটা কারণ আছে। আমাদের এই সময়ে তো নানারকম ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটছে। সংঘাতেও প্রচুর, ধাক্কাও বেশি। একদিকে বাস্তব অবস্থা তো সবসময় একেবারে টনটন করছে উত্তেজনায়, অপরদিকে এই বাস্তবতার যোগ্য মহৎ শিল্পের আধার নেই—যদিও আমাদের দেশে ও পশ্চিমে অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক আছেন।

লাভিনিন

তাহলে তুমি মনে কর যে মহৎ সাহিত্য-কর্ম সম্পূর্ণ নতুন কোনো ফর্মে ঘটতে পারে?

সিনজবার্গ

হঁ্যা। কিন্তু ফর্ম বলতে আমি বোঝাই তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ, অর্থময় ফর্ম।

লাভিনিন

...সাহিত্য প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক অনুধাবন থেকে কি কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায় যে কোন্ ধরনের সাহিত্য থেকে এমন মহৎ শিল্পকর্ম নির্মিত হতে পারে?

সিনজবার্গ

একটি মহৎ সাহিত্যকর্ম কী রকম হবে সেটা আবিষ্কার করতে পারা মানে তো সেটা লিখে ফেলতে পারা। আবিষ্কার মানেই তো যা আগে ছিল না। আর, এমন প্রায়ই ঘটে যে তেমন আবিষ্কারের ফলে পাঠক খুশি হয় না, বিরক্ত হয়।

ধর, তলস্তয়-এর 'ওয়র অ্যাণ্ড পিস'। বেরবার পর এ-বই নিয়ে কি-ই-না লেখা হয়েছে। আমি সাংবাদিকদের খিস্তি-খাস্তার কথা বলছি না। আসলে সমালোচকরা বুঝতেই পারেন নি উপন্যাসটিতে নতুন কি আছে? যেন নতুন কিছুই ঘটে নি: একটা আজেবাজে ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস বেরিয়েছে, বাস!

মন্দ সাহিত্য-সমালোচকরা একটা সাহিত্যকর্মে তাই শুধু দেখতে পান, তাঁদের জানা। ভালো সমালোচক হতে হলে, বিস্মিত হতে জানতে হয়, আর, অন্যদের দেখাতে জানতে হয়—তারা নিজেদের সম্পর্কে যা জানে

না লেখক যে-কথাগুলি ওদের কি ভাবে জানাচ্ছেন। তলস্তয়-এর মতে, এটাই তো লেখকের কাজ।

সার্তিনিকা

তা হলে নতুন মানুষকে বোঝার চেষ্টা থেকেই সমসাময়িক সাহিত্যে নতুন আবিষ্কার ঘটবে?

শিবজবার্গ

নিশ্চয়ই। কারণ মানুষই তো চিরকাল বিষয়। চিরকালই তাই থাকবে। তৃতীয় নয়নে মানুষকে বোঝার এক-একটি চেষ্টাই তো সাহিত্যেরও এক-একটি দিকচিহ্ন। যদি কোনো মহৎ নবীন লেখক আবির্ভূত হন, তিনি তাঁর সমকালীন মানুষকে দেখিয়ে দেবেন সেই মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা, দিব্য (spiritual) অভিজ্ঞতা, যা তখন পর্যন্ত উচ্চারিত হয় নি। আর তিনি সে কাজ করবেন শিল্পের এমন উপদান দিয়ে, যা আমাদের জানা নেই।

আমরা বরং আশা করব, এই 'মাঝামাঝি ধাঁচের লেখার' প্রতি আগ্রহ আসলে 'উপন্যাসের সঙ্কটের' জন্য নয়—এ-ও প্রতীক্ষা, আকাঙ্ক্ষা। আমরা তো জানি, এমন আগে অনেক ঘটেছে।

অনুবাদ—প্রমীলা মেহ্‌তা

পুরুলিয়া

নন্দদুলাল আচার্য

'উঠ্ ছুঁড়ি তুর বিয়া।'
ই কইরে কাজ হয় কি বড় মিঞা?
আগু পাছু ভাইবতে হবেক,
বেকুব পুরুলিয়া।

তুর লেগোই তকা তকি,
কাঁইদছে আমার হিয়া।
সনায় মুইড়ে দিব তুখে,
দুঃখী পুরুলিয়া।

জুইতের উঠোন না হইলে হেই,
কেমন কইরে নাচি।
যেই কইরব শুরু সাঙাৎ,
অমনি বেঙের হাঁচি।

'উঠ্ ছুঁড়ি তুর বিয়া।'
ই কইরে কাজ হয় কি বড় মিঞা?
আগু পাছু ভাইবতে হবেক
বেকুব পুরুলিয়া......

কথা ছিল

ভাস্কর রায়

কথা ছিল আজ হাঁটা হবে পথ
কাছের পাড়ায় দূরে বহুদূরে
হেরে গিয়ে তবু জয়ে সম্মত
সুর বেজে ওঠে ঘোড়ার ক্ষুরে

হাঁটা হবে পথ—এই ছিল কথা
ক্রুদ্ধ মানুষ আবেগে গভীর
কোলাহল ভাঙে মৃত নীরবতা
গাণ্ডীব থাকে হাতে স্থবির।

তব্‌লা লহর

সলিল আচার্য

তব্‌লায় মেরে চাঁটি
বোল তোলে পরিপাটি
কুব্‌লাই খাঁ।

বাঁয়া কয় : সব মাটি :
দেখ আমি কত খাঁটি—
কাত্‌রাই না।

খাঁ সাহেব মৃদু হেসে
দুহাতে বাজালো ঠেসে
তব্‌লা লহর।

ক্রমে ঘাম পড়ে শমে,
দুভায়ের চোখে নামে
মৃত্যু প্রহর।

খুন

দীপক রায়

পরিত্যক্ত এরোড্রামের মধ্যে দাঁড়িয়েছি
হাস্কিং মেসিনের ব্রিপ্ ব্রিপ্ ব্রিপ্ ব্রিপ্ শব্দ কাশের জঙ্গলের
ভেতর দিয়ে দুপুর থেকে বিকেলের দিকে টেনে নিচ্ছে আমায়
মতিলাল এই জঙ্গলে ছ বছর আগে খুন হয়েছিলো
হাস্কিং মেসিনের শব্দ কাশের জঙ্গল দাপিয়ে বেড়ায়

আর একমাত্র মতিলালই দেখতে পাচ্ছে
বিকেলের পাখি নদীর জলে ঠোঁট ডুবিয়ে নেবার
আগেই
রক্তপাতহীন আর একজন খুন হ'ল

এবার মাঝির কথা

কঙ্কন নন্দী

ঘাটে নৌকা ছিল না তাই নৌকার কথা বলেছি
আমি এবার মাঝির কথা বলবো

অর্ধেক নদী দখল করেছে শ্যামল ক্ষেত
আর অর্ধেকে কোমল কুয়াশা
ভোরের সোনালী আলোয় সবুজ ঘাস গলছে
পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা নদীতে
ঘাসের নাম না জানা সবুজাভ ফুলে প্রজাপতি বসছে না
ফুলগুলো তাই ঝরে পড়ছে নদীর তলায়

বাঁকানো সড়ক পেরিয়ে এসেছি
এখন অনিবার্য এ নদী—তার মন্থর প্রবাহ

আর রোদ ও হাওয়ার দখলে

পড়ে থাকা প্রকৃতির মতো এ নৌকা

আসন্ন পারাপারে

এতদিন নৌকার কথা বলেছি

আমি এবার মাঝির কথা বলবো

অথচ ভাবেনি কেউ

পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান

সারাজীবন খুঁজলেও ঠিকঠাক হিসেব মতো

সব কিছু কখনো মেলে না

নিমন্ত্রণ খেতে যারা এসেছিলো ঘরে, কেউ কেউ

রাগ করে ফিরে গেছে সকাল সকাল

অথচ ভাবে নি কেউ ডাকবাক্সে চিঠি এসে দেবে না পিয়ন !

তবুও আসে না হাওয়া, কুকুরের শীত নেই

সারারাত হাঁকডাকে শরীর গরম, নীলমুখ ভিখিরী বালক

এদিক ওদিক, কুড়িয়েছে এঁটোকাঁটা, বাসিভাত

অতিরিক্ত, চন্দন সুবাস মাখা একটি গোলাপ

কে এখন কোনদিকে আছে, জানলায় ভাঙা ছাইদানী

একটুও হাওয়া নেই, শুকনো গোলাপের দিকে তাকাতে তাকাতে

বালকের দুটি চোখে প্রেম এসে যায়

অথচ ভাবে নি কেউ, সমুদ্রের শ্যামলিমা নদীটি দেখে না !

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

জিরজিরে হাত জিরজিরে পা
          আয়নায় তার স্বাস্থ্য দেখে
মুখের গালে মাস লেগেছে ?
নাকি শুধুই চৈন প্রাচীর তুলছে মাথা
শরীরটা কি চিমড়ে পোড়া
               আবলুস কাঠ
জেল্লা জলুস একটুও নেই ?
শিরার মধ্যে রক্ত কি লাল শুকিয়ে গেছে
                              জাগছে চরা !

এসব ভেবে বিক্ষত মন
     গ্রহ শান্তির কবচ খোঁজে
     ডাকিয়ে আনে পুরুত ঠাকুর
বুকের মধ্যে অবিরতই
     কামারশালার হাপর পড়ে
ঘুমন্ত সেই জিরজিরে হাত
     জাপটে ধরে লক্ষ্মীর পা ।

যৌথ প্রেমে, সাহসে

গৌতম ভট্টাচার্য

শহরে নেই শান্তি
এবং গ্রামেও নেই ক্ষমা—
ডাকবে কাকে ?
সবার বুক এখন বন্ধ বাড়ি
পথ ঢেকেছে শ্যাওলা আর আগাছা : ভুলভ্রান্তি

বাঁকে বাঁকে জমেছে ঘোর অমা—
ক্লান্তি এসে নেমেছে কোন ফাঁকে।

চাতাল জুড়ে দীর্ঘছায়া শুয়েছে আড়াআড়ি
নষ্ট স্মৃতি মুছেছে পদরেখা
বাতাসে বিষ
নদীতে চোরা টান—
হিংস্র জল গোপনে কাটে মাটি—
যথা রাতে স্বপ্ন ভেঙে শোনো
সাপের মতো হাওয়ার চাপা শিস্!

মানবিক এক ভালবাসার প্রাণ
পাতবে কী ফের দাওয়ায় শীতল পাটি!
দেবে কী জল? আনবে কি আর কোনো
কোমল ছায়া—দূর হবে সব ক্লান্তি?
রাত্রি হবে নিবিড় আর সুস্থ হবে সকাল!

সৌহ প্রেমে,সাহসে পার হবে কি সংক্রান্তি

বদলে যাওয়া দিন

অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই হিরন্ময় বৃক্ষটির কথা কেউ বলে না আজকাল
কিংবা অলীক গাঁ-বুড়োর গালগল্প
উড়োজাহাজ দেখে ছুটে আসে না ছেলেরা;
এ বছর শীতের দাঁত নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই।

মানুষের চাষযোগ্য জমি কতোখানি, কতোখানি অধিকার
এ নিয়ে আওয়াজ তুলেছে বহেরু সাঁওতাল
আজকাল তার মাদলে নাকি সর্বনাশা লহরা বাজে।

বহেরু, আমাদের বহেরু কতো বদলে গেছে
তার সাঁওতালী হাঁক শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়
থমকে পড়েন মহান বি-ডি-ও সাব—

মজলিশে ডাক পড়ে বহেরুর,
নিমাই মুর্মুর সাথে ডুব্‌রির বিয়ে হবে কিনা সেই ঠিক করে দেয়
বয়সের সন্ধি মনে পড়ে বহেরুর ?
মনে পড়ে ঋতুর ভেতর থেকে ঋতুর বিস্তার
বনবাসী শিকড়ের উন্মোচন ?

বোঝা যায় বদল হয়েছে।
খেতে রাত হয়, ধুতি শার্ট কাচা হয় প্রায়
ছাঁচতলায় অপেক্ষা করে ক্যাম্বিশের জুতো
ঘুমের বদলে বিড়ির বাণ্ডিল পুড়ে যায় রোজ।
বয়সের সন্ধি মনে পড়ে বহেরুর, মনে পড়ে—

তার বৌ এর পিঠ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে চাবুকের দাগ

দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বাধীনতা দেবী

মঞ্জুভাষ মিত্র

সারারাত্রি দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বাধীনতাদেবী
আমার মনোযোগ দাবী করে

যেন সাগরউত্থিত ভেনাস : এমনি সুন্দর
মসৃণ অবয়ব, হাজার বাতাসের ফুল ঝরে যায়

হাত রেখে দেখি আমার গলায় সুখের শিকলের দাগ

অরণ্যের ভিতর ব্লাডহাউণ্ডের আদিম পিতৃপুরুষ উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে

ঘুমের মধ্যে দ্বিতীয় এক ঘুমে প্রবেশ করি
এবার আমার বুকের ভিতর স্বাধীনতাদেবী
এবার আমার বুকের ভিতর দর্পণ
আমার চুম্বনে ফুটন্ত মুক্ত উপত্যকার একহাজার রক্তফুল

মিথ্যে হারমোনিয়ম

মবিনুল হক

মিথ্যে হারমোনিয়ম সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে

আস্‌সালামো আলেয়কুম। ওয়ালেয়কুম আস্‌সালাম
একজন এপারে আয়নার অন্যজন স্থাপিত ওপারে
ছেঁনি-কোঁদা মূর্তি তো নয় ভাই—মানুষের নাম
পেরেক-বিধ্বস্ত মুখ, ভাঙাচোরা, চাপা-পড়ে যুদ্ধ মাঠে
আস্‌সালামো আলেয়কুম। ওয়ালেয়কুম আস্‌সালাম

মিথ্যে হারমোনিয়ম সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে

কয়েকটি অরাজনৈতিক কবিতা

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

এক

জঙ্গল মহালের গাছগাছালি
যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে
পাতা শুধু আরো ঝরে গেছে দু-চারটি
স্বপ্নের পাতা সোৎসুক সব গাছ থেকেই।

দুই

বিপন্ন বন্ধুকে আরো বিপন্নতা দিলে
শবেরও অর্গারে শৌর্য, তাও
আগুন ছুঁয়েছে চুল, তখন সুখ্যিকে
শব ছাড়া চোখ দিতে মৃৎশিল্পী কোথায় ?

তিন

প্রার্থিত যা দাও তাকে, অত্যন্ত বিনয়
তার যাচ্ঞা, প্রতিশ্রুতি। বিশাল মভূমি
তোমাকে দিয়েছে সে যে, কররেখা খুঁজে
মলিনতা ক্লান্তি কষ্ট ঘাম ও পূর্ণতা
শিক্ষার ও জীবনের, তার অধিকারে
ন্যস্ত কর আয়ুবীজ, কাজ দাও, কাজ, শুধু কাজ
যা খুব সহজবর্গ—অনায়াস, স্থিত প্রজ্ঞা দিলে।

তোমারই জ্রমধ্যে শুধু

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

তোমাকে গল্পের বুকে রেখেছি কখন
সমস্ত সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে !
চরাচর সমগ্রতা, সংর্কিরণ
তুখোড় চাকচিক্য যত, স্পর্শ-তুষ্ট নদী রাজধানী
কূলে কূলে অবিরোধী নিত্যকাল সমুদ্র মন্থন
সমস্ত উদ্যোগ থেকে খুঁজি কত শেষের পারানি

অনেক গড়ার ছিল, সাদৃশ্যও মিলতো সহজে—
যখন সন্তুষ্ট স্নানে কুসুমিত যাও পদব্রজে
জ্যোৎস্নার মবারে পথ—জনপদ আত্মীয়প্রতিম।
উচ্ছিষ্ট স্নায়ুতে নখে প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত মগজে,
জ্রমধ্যে তোমারই শুধু স্থির দিব্য দাক্ষিণ্য অসীম।

গন্ধে স্নিগ্ধ জলতন্তে—নিরুদ্ধির পূর্ণিমার নীড়ে
তোমার সংসার নাকি? চৈতন্যের উড্ডীন মন্দিরে
বাঘের সোনাটা স্রোতে সচকিত সব জানাজানি,
কেবল আমাকে টানে সুখহীন প্রেমের গভীরে—
প্রখর গন্ধের মোহে হৃত কড়ি শেষের পারানি।

পর্যটন

শুভ মুখোপাধ্যায়

ছিল একটি নদীর কাছে
দীর্ঘ মৌনী গাছের দগ্ধ যন্ত্রণার কথামালা,
বিলাসিনীর হাতে তখন তেমন স্বপ্নসাধের বাতাস নেই,
তেমন আলুথালু শিশু নেই আমাদের ঘরে—
বহুদিন মলিন জামায় অহংকার ওঠে না আমাদের,
কি অঞ্জন কাঠিতে—
তুমি বিনাশ করেছো আমাদের মনোবাঞ্ছারাশি!

সমস্ত জোড় খুলে এবার নতুন পর্যটনে যাবো আমরা,
পুরুষ্টু বীজ ছড়িয়ে দেব আনাচ কানাচ,
বিলাসিনীর স্বপ্নসাধ গন্ধবনে—
বদলে নেব মেঘের ওপরকার মেঘ,
হাওয়ার ওপরকার সনির্বন্ধ হাওয়া,
স্বপ্নের ওপরকার স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুমটুকু।

একদিন ভরা আতিথ্যে
মলিন জামায় আলুথালু শিশুদের কি অহংকার,
দেখাবো তোমাদের।

তখন সমস্ত জোড় খুলে
সপ্তসাধ বিলাসিনীর গন্ধ বনে
নতুন পর্যটনে আছি আমরা

স্বদেশ

শোভন মহাপাত্র

নদীর মরা স্রোতের মতো নিঃশব্দ দেশ
কোথায় সুতোটি বাঁধা, কার্পাশ রঙের নীল স্বাধীনতা।
কোথায় মজ্জা ও মনীষা
খড়ের আগুনে বাঘবন্দী দেশ
শেষ দুঃখের খেয়া ভেসে যায় রক্তের ভিতরে
বন্যায় বাঁশপাতা ভেসে আসে
জ্যোৎস্নায় লুকোচুরি খেলে ক্ষুধার্ত মানুষ
গলিত শবের ভিতর বসে থেকে ভাবে
স্বদেশে পাতার ঘরে,
মরা নদীর স্রোতে বেঁধে রাখবো স্বাধীনতা

জ্যোৎস্নায় এইভাবে গুহাবন্দী খেলা হয়
মানুষ ফ্লুট বাঁশী বাজাতে বাজাতে
পোড়াতে যায় স্বজনের শেষ
সারারাত সাড়াহীন নীরব উৎসব
সারারাত আদিম যন্ত্রণায় ডুবে থাকে
সকালে নুনের খোঁজে বাজারে যায়
উলঙ্গ মানুষ!

শেষ দৃশ্যে

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সে তার অমল হাতে সৌখীন ভাস্কর্য ভাঙে
পাথরের বুকে রাখে মাথা :

দুঃস্বপ্ন সাপের মতো রোজ তাকে গিলে খায়
সে খোঁজে না বাঁচার সিদ্ধি মন্ত্র কিংবা বিষ পাথর
বিশ্বাসঘাতক লোভ সর্বাঙ্গে লেপ্টে থাকে
নিজেকে নিজে জানতেই পারে না : অথচ
সে তার পথ পাল্‌টিয়ে নেয় না তবু
পুরানো পোষাক খুলে ভাণ্ডারে [illegible]ায় না।

সে রোজ নিজেকে ছিঁড়ে আগুনে আহুতি দেয়
বিদ্ধ হয় তীক্ষ্ণতম ঘৃণার শায়কে
পুরোহিত হতে গিয়ে শেষ দৃশ্যে চণ্ডাল জাতক
দাসত্ব শিকল বেড়ি পায়ে পরে শব ব্যবচ্ছেদ করে
জঘন্য ঘাতক।

আগুনে পুড়তে থাকে, পায় না সে আগুনের ফুল
তাকে ব্যঙ্গ করে যায় হেসে হেসে কালের পুতুল।

অর্জনের দিন

শ্যামল পুরকায়স্থ

সাঁতার না জেনেও মেয়েটি জলপদ্ম তুলতে গেল—ছলাৎ-ছলাৎ-ছল-
জলজ উদ্ভিদ আর [illegible]াকে জড়িয়ে ডুবে যেতে যেতে
[illegible] মধ্যে নিজেকে ভাবলো জলপরী।
ভাবলো সরোবরে এক [illegible] রাজার নাতিপদের [illegible]াক ;
হাতছানি দিচ্ছে তাকে

এইবার মেঘে মেঘে বাজবে অলৌকিক জলতরঙ্গ।
আজ তার অর্জনের দিন
আজ তার উৎসবের দিন।

তাকে তুলছি টেনে—সে এখন এলিয়ে রয়েছে ঘাসের ওপর।
ভিজে সপসপে শরীর থেকে উঁকি দিচ্ছে বিশ্বমোহিনী ভাস্কর্য—
হলোই বা জলঢোঁড়ার বিষ, তবু মানবীর চেতনা ও মগ্ন-চেতনাজাত
নীল ঠোঁট থেকে বিষাদ-বিবর্ণতা শুষে নিচ্ছি যেই
অসীম দূরত্ব অতিক্রম করে মেয়েটি মেললো চোখ—
ভ্রূ-পল্লব শোভিত ওই চোখ দুটি নীলপদ্ম হলো।
আজ তবে অর্জনের দিন
আজ তবে উৎসবের দিন।

এই রৌদ্র-জাগরণ

আশিস চক্রবর্তী

সুস্থতায় লেগেছিল সব ঋতু মানুষের, প্রকৃতির
জেনেছিল শুধু যেই নগ্নতার পোষাকের ক্ষণ—
সে কবে কখন?

স্মৃতির শরীরে সুখ, নিরবচ্ছিন্ন ভাললাগা থেকে
মুছে গেছে স্বতঃস্ফূর্ত শরীরের শ্রম,
তৃষ্ণাহীন জলপানে কেটে যাচ্ছে রৌদ্র-জাগরণ।

সুস্থতায় মিশেছিল স্বতঃস্ফূর্ত শরীরের শ্রম।
সঙ্গীত শেষ হলে ঘুম নিয়ে যেত শ্রমে
আগামীকালের,
শারীরিক বোধ থেকে দূরে নীল মুখ—মূক,
সঙ্গীতের শেষে
ঘুমের বদলে মেধা মুছে ফেলতে চায় অপমান।

স্মৃতির শরীরে সুখ, বিরবঝির ভাললাগা থেকে
মুছে গেছে স্বতঃস্ফূর্ত শরীরের শ্রম,

তৃষ্ণাহীন জলপানে কেটে যাচ্ছে রৌদ্রজাগরণ।

রদাঁর আলোয় একটা দিন

পূর্ণেন্দু পত্রী

পাঁচ

গেট অব হেল। স্কুলের নীল-সাদা ইউনিফর্ম-পরা এক ঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্রীর ভিড় তখন সেখানে। সঙ্গে শিক্ষিকা, গাইডের ভূমিকায়, অনর্গল ফরাসীর একবর্ণও মগজে ঢুকবে না জেনেই দূরে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেয়েগুলি বড় চকচকে। যেন প্রাচীন পরীদের আধুনিক শহুরে সংস্করণ। ওরা দেখছিল নরক। আমি দেখতে লাগলুম ওদের।

চল্লিশ বছর আগে এক অজ পাড়াগাঁ থেকে অজগর কলকাতায় এসে ঢুকে পড়েছিলুম আর্ট স্কুলের অন্ধকার খুপরিতে। তখন দিনরাত ঘাঁটাঘাঁটি ছিল এ্যানাটমির বই। এক-একটা লম্বা-চওড়া বইয়ের পাতায় ছাপা থাকত বড় বড় সব শিল্পীদের স্কেচ-খাতার হুবহু প্রতিচ্ছবি। কোনোটা হয়তো দেলাক্রোয়া, কোনোটা দা ভিঞ্চি, কোনোটা মাইকেল এঞ্জেলোর। এইখানে একটা পা। তার ডানদিকেই হয়তো বৃষস্কন্ধ কোনো কোনো শরীরের ছাতির খানিকটা। তারই উপরে বা নীচে উত্তেজক অভিশাপের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসা একটা হাত। তার পাশেই, মরব তবু মাথা নোয়াব না, এমনই মরীয়া ভঙ্গির একখানা মাথা। মানুষের পাশেই হয়তো ঘোড়ার তেজস্বী শরীরের টুকরো-টাকরা, আবার হয়তো তারই পাশে রূপসী মডেলের ছিন্নভিন্ন শরীর, সতীর বাহান্ন টুকরোর মতো। নরকের দরজার সামনে দাঁড়াতেই ফর্ ফর্ করে চোখের সামনে খুলে গেল চল্লিশ বছর আগের সেই ভুলে-যাওয়া বইয়ের পাতাগুলো।

নরকের দরজায় শুধু মানুষ। আর্ত, অসহায়, আতুর, অনুতপ্ত, লজ্জিত শিথিল, দুর্বল, দুর্দান্ত, ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, ব্যগ্র, বিপন্ন, বিধ্বস্ত মানুষ, যেন গোনা-গুনতি করলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে। তাদের সামনে প্লাবন। আর, এই প্লাবনের পরেই নতুন জীবন, রেজারেকশন, রেনেশাঁস।

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-র সঙ্গে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ফাদার এমার-এর মারফতে। রদাঁ তখন মনাস্টারি অব দ্য ফাদার অব হোলি

স্যাকরাকেঁই-এ। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছোটমিহি মারী আশ্রয় নিয়েছিল চার্চে। তবুও সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না চরম ধ্বংস থেকে। রদাঁর চোখের সামনে, রদাঁর হাতে হাত রেখে, তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে গেল সেই প্রাণবন্ত যৌবন। মারীর জন্যেই তার ছবি আঁকার যা কিছু অগ্রগতি। মারীই ছিল তার প্রেরণা, তার শক্তি-সাহসের উৎস। মারীকে হারিয়ে রদাঁও হারিয়ে ফেললেন নিজের উপর বিশ্বাস। বেছে নিলেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন এই চার্চে—শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে রোমাঞ্চিত আড্ডা, নগ্ন-মডেলের সামনে ছবি-আঁকা, বু্যা-আর্টস-এ ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন সব কিছুকে মন থেকে মুছে ফেলে।

মনাস্ট্রির অধিনায়ক ফাদার এমার মারীর কাছ থেকে জেনেছিলেন রদাঁর স্বপ্ন ভাস্কর হওয়া। একদিন সরাসরি প্রশ্ন করলেন ভাস্করকে

—তুমি তো ভাস্কর, তাই না ?

—ছাত্র ছিলাম, তার বেশি কিছু নয়।

—শেখা শেষ ?

—না। তাতে কিছু যায় আসে না আর।

—মাই সন, অত বেশি বিনীত হওয়া ভাল নয়। ওটাও এক ধরনের পাপ। যদি কেউ ঈশ্বরের আশীর্বাদে শিল্পের ক্ষমতা পেয়ে থাকে, সেটাকে হাল্কাভাবে দেখা ঠিক নয়। ঈশ্বর এবং শিল্প কেউ কারো বিরোধী নয়।

—আমার আর ভাস্কর্যের উপর টান নেই।

—অস্থির হোয়ো না। ঈশ্বরের যা অভিপ্রায়, সেটাই ঘটবে। তবে মনে রেখো আমাদের এই জায়গাটা কারো পালিয়ে বাঁচার জন্যে নয়। এটা সার্থকতার সন্ধান দেবার জন্যেই···তুমি দান্তে পড়েছ ?

—অল্প-সল্প।

—আমরা কেউ শিল্পের শত্রু নই, যেমন দান্তেও চার্চের শত্রু ছিলেন না ; তিনি শুধু ঘৃণা করতেন এর পাপাচার। আমার কাছে ডিভাইন কমেডির একটা অসামান্য সংস্করণ আছে, যা গুস্তভ ডোরের এচিং দিয়ে অলঙ্কৃত, দেখতে চাও ?

খ্যাতিমান পণ্ডিত ফাদার এমার নিজেই অনুবাদ করেছিলেন দান্তে আর পেত্রার্ক। সে অনুবাদের জন্যে প্রচুর সম্মান-সুখ্যাতিও পেয়েছেন বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। ফাদার বইটা তুলে দিলেন রদাঁর হাতে।

রদাঁর বয়স তখন ২২।

১৮৮০-তে রদাঁর পা ৪০-এ। সেই সময়ে, বলতে গেলে আজীবনের প্রতিকূল হাওয়া ঠেলে, সেই প্রথম, সরকারি মহলের সাগ্রহ আমন্ত্রণ এসে হাজির হল তাঁর জীবনে। মিউজিয়াম অব ডেকরেটিভ আর্ট-এর দরজার জন্যে গড়ে দিতে হবে বড় রকমের কিছু একটা কাজ। রদাঁ জানিয়ে দিলেন, রাজী। দান্তের ইনফার্নোকে মনে রেখে গড়বেন, নরকের দরজা। চলতে-ফিরতে, খেতে-ঘুমোতে আমি এই নিয়েই ভাবছি। আবার নতুন করে পড়ছি দান্তে, বোদলেয়ার, হুগো, বালজাক। দান্তে এবং বোদলেয়ারের মানবিকবোধের সঙ্গে আমার ভাবনার মিলটাই সবচেয়ে বেশি। আমার নরকের দরজা হবে, শক্তি এবং সৌন্দর্যের এক অভাবনীয় সমন্বয়, স্পর্শাতুর এবং ভয়ংকর। সেখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে উন্মত্ত আবেগ আর উদ্দাম গতি। মূর্ত হয়ে উঠবে সেই 'volupté', যা কেবল পারে ভাস্কর্যই। মানুষ যে-রকম চেয়েছিল, পৃথিবী সে-রকম হয় নি। করে চলেছে কেবলই। মানুষ আর সত্য এবং সৌন্দর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাকে ঘিরে রয়েছে দুর্ভাবনা, সন্দেহ, পাপ। এমনকি মানুষের শরীর, যা কিনা সৌন্দর্য আর উদ্দীপনার উৎস, মানুষের সেই শরীরকেও, কুরে কুরে খেয়ে চলেছে অবারিত লোভ, লালসা, কামনা-বাসনা, অহংকার। ভালবাসা হয়ে উঠেছে ক্ষতিকারক উন্মাদনা। আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে উৎপীড়নের নামান্তর। আমার নরকের দরজায় একালের মানুষ মুখোমুখি হবে নিজের আত্মার অবক্ষয়ের সঙ্গে।

সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি ছিল, কাজ শেষ করে দেবেন তিন বছরে। কিন্তু পার হয়ে গেল বছরের পর বছর। একের পর এক নতুন ধ্যান উলটে-পালটে দিতে লাগল পুরনো সিদ্ধান্ত, হাজার হাজার হাত, পা, বুক, পেট, মুখাবয়ব নিয়ে চলল এক অন্তহীন ভাঙা গড়া। তিনি চেয়েছিলেন সংখ্যাতীত মানুষ এসে সমবেত হবে তাঁর এই আশ্চর্য সৃষ্টির দোরগোড়ায়। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের আত্মার ভিতরকার যত কিছু বিচ্ছুরণ, সব ঘনীভূত হবে এইখানে। এত বড় করে ভাবতে গিয়েই দশ বছরেও শেষ হল না মূল কাঠামো। সরকারি হুমকি এসে হানা দেয় তাঁর স্টুডিয়োয়। আরও দেরি হলে অগ্রিম হিসেবে দেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে।

বছর তিনেক পার হয়ে গেল।

ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তোমাকেই।

রদাঁর উত্তর

—সে ক্ষতি আমার নয়। ফ্রান্সের। কাজটা শেষ করতে আমার সময় লাগবে আরও বছর তিনেক।

কিন্তু কাজ শেষ আর হয় না। অথচ এই বিশাল কাজের খসড়া থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে জন্ম নিল অসংখ্য নতুন কাজ, পূর্ণাঙ্গ চেহারায়। তার মধ্যে আছে 'দি কিস', 'দি ওল্ড কোর্টিজান', 'পাওলো এ্যাণ্ড ফ্রানসেসকা', 'ফুজি আমুর', 'দি প্রডিগাল সন', 'উগোলিনো', 'আদম', 'ইভ', 'দি থ্রি স্যাডোজ' আর 'দি থিংকার'।

শেষ পর্যন্ত নরকের দরজায় জুড়ে বসল ১৮৬টা মূর্তি। শেষ পর্যন্ত নরকের দরজা' ডিভাইন কমেডি'র ইলাসট্রেশন না হয়ে, লাস্ট জাজমেন্টের গতানুগতিক বা বদ্ধমূল ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, হয়ে উঠল ভাস্কর্যের ভাষায় লেখা এক মহত্তম কবিতা। এখানেও ট্রাজেডি, কিন্তু তা মাইকেল এঞ্জেলোর ট্রাজেডির থেকে ভিন্ন ট্রাজেডি বলতেই আমরা বুঝি ঈশ্বর অথবা নিয়তি বনাম মানুষের সংঘর্ষ। রদাঁর ভাস্কর্যে ঈশ্বর অনুপস্থিত। নিয়তি নির্বাসিত। রয়েছে শুধু মানুষ। যে-যার নিজের আত্মদহনের আগুনে পুড়তে পুড়তে এখানে এসে জমায়েত হয়েছে, যে-যার নিজেকে চিনে নিতে।

গেট অব হেল-এর সব চরিত্রই নগ্ন। ভাস্কর্যের ইতিহাসে এটা অভিনব কোনো ঘটনা নয়। চিত্রকলার নগ্নতা আমাদের সহজেই উত্তেজিত করে তোলে সংস্কৃতির সুস্থতায় ঘুণ ধরবার আশঙ্কায়। সমাজ দূষিত হয়ে ওঠার উদ্বেগে নিভে যায় আমাদের চোখের স্বচ্ছন্দ নিদ্রা। অথচ ভাস্কর্যের বেলায় সুন্দরকান্তি নগ্নতার আপাদমস্তক এ্যানাটমিই আমাদের কাছে চোখের তৃপ্তি, চিত্তের সন্তোষ, তৃষ্ণার শান্তি, ইংরেজিতে এই নগ্নতার নাম ন্যুড। নেকেড নয়। আধুনিক শিল্পভাষ্যকারদের মতে নেকেড হল, সেই বসনহীন দেহ যা বসনের অনটনে লজ্জিত, সঙ্কুচিত, এামবারাসড, আর ন্যুড হল, 'এ ব্যালানসড, প্রসপারাস এ্যাণ্ড কনফিডেন্ট বডি, দি বডি রি-ফর্মড।'

বডি রি-ফর্মড অর্থাৎ শরীরের নবজীবন বলতে কি বুঝব, তার দৃষ্টান্ত রঁদার কাছে পৌঁছবার আগেই দেখে নিয়েছিলাম দু-চোখ ভরে, বুকভরে। মাইকেল এঞ্জেলোর দুটি অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য রয়েছে সেখানে। এই প্রথম মাইকেল এঞ্জেলোর মুখোমুখি। শরীরে, শিরায়, রক্তে সে এক টান টান উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্তে অবিশ্বাস। সত্যিই আমি এইখানে! সাদা

পাথরের দুটি পূর্ণাবয়ব ক্রীতদাস। একজনের নাম 'ক্যাপটিভ স্লেভ'। অন্য জনের নাম 'ডাইং স্লেভ'। বলিষ্ঠ, পেশীবহুল, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, শিশু অথবা যীশুর মতো নিষ্পাপ মুখমণ্ডলে ভোরের আকাশের মতো স্বচ্ছ আলোর আভা। মনে পড়িয়ে দেয় স্পার্টাকাসকে। বলা বাহুল্য, দুটি মূর্তিই আপাদমস্তক নগ্ন।

৭৪-এ তাসখন্দ থেকে ৫।৬ দিনের জন্যে গিয়েছিলাম আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। নীল ক্যাসপিয়ানের তীরে এক ছিমছাম, প্রাণবন্ত শহর। শহরের মাঝ-বরাবর অনেকখানি এলাকা জুড়ে শহিদ স্মৃতির প্যানথিয়ান। ছাদহীন গোলাকার দেয়াল। মাঝখানে একটি মানুষের প্রসারিত হাত। হাতে আগুনের পাত্র। জলছে অহোরাত্র, অনির্বাণ। ২৬ জন কমিশার, যারা বিপ্লব এবং শান্তি এবং শ্রমের মর্যাদার জন্যে উৎসর্গ করেছিল নিজেদের প্রাণ, তাদের আত্মবিসর্জন এখানে সম্মানিত হয়ে উঠেছে শিল্পের মহিমায়। অপূর্ব পরিবেশ, গোল বেদির চারপাশে সবুজ বাগান। শান্ত, নিভৃত, উত্তেজনাহীন। এ যেন সেই জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করা যায় 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্র। অথবা উচ্চকণ্ঠে গাওয়া যায়, 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'।

পাশেই মাঝারি মাপের বেদির উপরে চৌকো পাথরের একটা বড় কালি। সেখানে ফুটে আছে ঐ ২৬ জন কমিশারের আত্মত্যাগের আরেক শিল্পরূপ। ২৬টি মানুষ, তারা কেউ বাস্তবের ২৬ জন কমিশারের পোশাক বা প্রতিকৃতিকে আঁকড়ে নেই। তারা হয়ে উঠেছে ২৬টি চিরকালের মানুষ। আর সম্ভবত সেই কারণেই নগ্ন।

ভাস্করের নাম মনে পড়ছে না। ও-দেশের একটি সম্মানিত নাম। শুনেছি এই নগ্নতার অপরাধেই হঠাৎ মাঝপথে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল এই অসাধারণ শিল্পকর্মটিকে, তারপর দীর্ঘ বাকবিতণ্ডা, শিল্পী বনাম সরকারি কর্তৃপক্ষ। অবশেষে শিল্পীরই জয়। আবার ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে নেমে পড়লেন কাজে। কিন্তু কাজটা শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুর ছেনি-হাতুড়ির ঘা পড়ল শিল্পীর জীবনে। তবুও আমূল কোনো ক্ষতি ঘটে নি। অসমাপ্ত হয়েও কাজটা সার্থক। রদাঁর 'বুর্জোয়া অ ক্যালে'-র সঙ্গে, প্রকরণগত নয়, ভাবের ঘরে কোথায় যেন মিল। এখানে ২৬ জন বিপ্লবী প্রকৃতপক্ষে ২৬ জন মানুষ। তারা যেন ধাপে-ধাপে ব্যক্তিগত আশা-নিরাশাকে ঠেলে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে সমষ্টিগত বীরত্বের চরম উৎকর্ষে।

ছয়

সামনে ছড়ানো বাগান, বাগানের খোপে খোপে রোদে-ছায়ায় সাদা পাথরের অসংখ্য মূর্তি। দূর থেকে কাউকে কাউকে মনে হয়, যেন জীবন্ত। যেন কাছে গেলেই মাথা নুইয়ে বলবে, বঁজুর ম'সিয়। বাগানের দিকে পা বাড়ানোর মুখেই বালজাক, রদাঁর আর-এক বিখ্যাত এবং বিতর্কিত সৃষ্টি। অন্যান্য বড় কাজের বেলায় যেমন ঘটেছে, এখানেও সেই ঝাঁঝালো তর্ক, শানানো বিদ্রূপ, চিৎকৃত সমালোচনা এবং কুৎসিত আক্রমণের পুনরাবৃত্তি। মনে পড়ে যায় আনাতোল ফ্রান্সের উক্তি,

—'ইনসাল্ট এ্যাণ্ড আউটরেজ আর দি ওয়েজেস অব জিনিয়াস এ্যাণ্ড রদাঁ আফটার অল ওন্‌লি গট হিজ ফেয়ার শেয়ার।'

বালজাকের আগে হুগো। হুগো নিয়েও অপমানের চূড়ান্ত। একসময়, মনের জ্বালা জুড়োতে না পেরে বলে উঠেছিলেন, এই হুগোর মূর্তিটা—'ডেসট্রয়িং এভরিথিং অব মাই লাইফ।' আর এর পরই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় নারী, বান্ধবী, সখী, সচিব ক্যামেলির কাছে কোনও এক সময় বলেছিলেন, আর পাবলিক কমিশনের কাজে হাত দিচ্ছি না কোনোমতেই। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও একবার ঠিক এই রকমই নিন্দা-অপমান-বিধ্বস্ত মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন—সাময়িক পত্রের জন্যে আর কলম ধরছি না কোনোদিন। কিন্তু তাঁকে ধরতে হয়েছিল, এবং বেশ বাগিয়েই, শক্ত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী উদ্দীপনায়, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' থেকে ডাক আসার সঙ্গে সঙ্গেই। রদাঁকেও তেমনি জানাতে হল, হ্যাঁ, 'সোসাইটি দ্য জেনস দ্য লেটারস দ্য ফ্রান্স'-এর সভাপতি হিসেবে স্বয়ং জোলা যেদিন অনুরোধ জানালেন, বালজাকের একটা মূর্তি গড়ে দিতে হবে আমাদের সোসাইটির জন্যে। তাঁর আসন্ন জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে প্রতিষ্ঠা করা হবে সেটি। বালজাক-এর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদনের এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন কী করে?

'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লেখক তো তিনিই। হুগো নয়, ফ্লবেয়ার নয়, জোলা নয়, দোঁদে নয়। 'দ্য হিউম্যান কমেডি' আমার বাইবেল।' কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনার ঝনঝনানি থেমে যাওয়ার পরই নেমে এল অবসাদের ঝিঁ ঝিঁ সুর। তাঁর কপালকে ঘিরে ফেলল দুশ্চিন্তার সরু মোটা অজস্র রেখা।

'আমি যেমনটা চাইব, তেমনটা কি করতে দেবে ওরা? বালজাক

ঠিক যা, আমি চাইব সেটাকেই ফোটাতে। অস্বাভাবিক রকমের মোটা, ফুলে-ওঠা ভুঁড়ি, ছোটখাট্ট হোঁতকা পা, পুরু ভারি ঠোঁট, বলতে গেলে বেমানান কুৎসিত চেহারার মানুষ। কিন্তু সংবেদনশীলতায় ভরপুর। রয়্যালিস্ট, তবু রিপাবলিকানদের কথা তাঁর চেয়ে গভীর করে আর কে বলেছে? তাঁর মুখখানা যেন প্রাকৃতিক। প্রকাণ্ড মাথা। কোনোদিন কাঁচির ছোঁয়া পায় নি এমন অফুরন্ত চুল জড়িয়ে আছে তাঁর কাঁধ ও গলা। আগুনের শিখার মতো জলজলে চোখ। অমন পুরু, ভারি, চৌকো শরীর অথবা ভিতরের আত্মাটা এমন যেন কত না হালকা, হয়তো বা এই ভারটাই তাঁকে দিয়েছে দুরন্ত গতিবেগ।'

প্রথমে কাগজে কলমে অগুনতি স্কেচ। তারপর কাদার মডেল। একটা-আধটা নয়। ১৭টা। সোসাইটিকে কথা দিয়েছিলেন ১৮-মাস-এর মধ্যে শেষ করে দেবেন কাজটা। কিন্তু রদাঁ কোনোদিনই সময়ের মাপের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারতেন না। তাই ১৮-মাস পরে সোসাইটির সদস্যরা যখন তাঁর স্টুডিও-য় এসে দেখল যে শুধু একটা হাতির শুঁড়ের মতো নগ্ন কাঠামো ছাড়া আর কিছুই এগোয় নি, শুরু হল সংঘাত।

—আপনার বালজাককে দেখে মনে হচ্ছে যেন গাবদা-গোবদা স্যাটার-এর মতো।

স্যাটার হল গ্রীক বনদেবতা। আধখানা মানুষ আর আধখানা পশু।

রদাঁর উত্তর,

—দেখা মাত্রই ভালো লেগে যায়, এমন মূর্তি শিল্প হিসেবে কদাচিৎ সার্থক।

—বালজাককে দেখতে হবে এমন কুৎসিত?

রদাঁ ঘুরে তাকালেন জোলার দিকে।

—আপনি কি জানেন, মানুষের শরীর দেখে কিছু কিছু মানুষ এমন লজ্জা পায় কেন, যেখানে গ্রীকরা এটাকে নিয়েছিল কত সহজভাবে।

—কারণ হয়তো তারা নিজেদের নিয়েই লজ্জিত।

জনৈক সদস্য যখন জোলাকে প্রশ্ন করলেন, এরকম একটা মূর্তি আমাদের সোসাইটির নামে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? রদাঁও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন জোলাকে—আমার কাজটা এখনো শেষ হয় নি। আগে শরীরের কাঠামো। তারপরে তাও দেব পোশাকে। আপনি কি আপনার কোনো আধখানা উপন্যাসের বিচার করতে এই কমিটিকে ডাকবেন? রদাঁ

চেয়েছিলেন আরও একবছর সময়। কিন্তু তার মধ্যেও শেষ হল না। সোসাইটি মিটিং ডেকে প্রস্তাব দিলে, চুক্তিটা নাকচ করে দেওয়া হোক। প্রতিবাদ জানালেন চেয়ারম্যান। কিন্তু পরাজিত হলেন ভোটে। সুতরাং পদত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক সদস্যও পা বাড়ালেন ঐ একই রাস্তায়। দেশের একজন প্রতিভাধর শিল্পী সম্পর্কে এমন অসম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে। সোসাইটি বনাম রদাঁর সংঘর্ষ হয়ে উঠল দৈনিক সংবাদপত্রের মুখরোচক শিরোনাম। রদাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হল, ইনি মনুমেন্টাল কাজের অযোগ্য, অক্ষম। তাই বালজাককে বানিয়েছেন একজন মল্লযোদ্ধা, কিংবা তার চেয়েও বিকৃত, বীভৎস, দানবিক।

বাইরে যখন নিন্দের এমন এলোপাতাড়ি হাওয়া, রদাঁ তখন তাঁর স্টুডিওর নির্জন কোণে তপের আসনে। আর তৈরি করে চলেছেন এক, দুই, তিন, চার, ছয়, দশ, বারো অথবা তার চেয়েও সংখ্যাধিক বালজাকের মডেল। তাঁর অন্বেষা বালজাকের শরীর নয়, সত্তা।

আজীবনই তিনি কর্মতৎপর। আলস্যহীন তাঁর উদ্যম। অপরিসীম তাঁর ধৈর্য। উদ্দীপনায় অস্থির তিনি নিয়ত। 'Il faut toujours 'travailler'-এই তাঁর মন্ত্র, গ্যেটের মতো, চেকভের মতো। 'নিরন্তর কাজ করো', রিলকে যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তখন চোখের সামনে দেখেছেন এই মানুষটির বিশ্রামহীন তৎপরতা। এই দেখেছেন মডেলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এই আঁকছেন রেখাচিত্র। এই নিচ্ছেন নোট, কি ভাবে গড়বেন একেবারে গোড়ায় ছাঁচ, এই ঘাঁটছেন প্লাস্টার, আবার এই তুলে নিলেন শক্ত মুঠোয় ছেনি-হাতুড়ি। শুকনো পাথরকে বদলে দেবেন প্রাণময়তায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা এইভাবে তিনি ঘর্মাক্ত অথচ পরিশ্রান্ত নন। প্রফুল্ল, সজীব, যদিও পরিতৃপ্ত নন তবুও প্রদীপ্ত। রিলকে দেখতেন আর মুগ্ধ হতেন আর তাঁর দিনের মধ্যে সংক্রামিত হতো একটা অসহায় আর্তি। একজন কবিকে কি করুণভাবে নির্ভর করতে হয় প্রেরণার উপর। অনুভূতির ভিতরে যতক্ষণ না বাজছে সেই অনুরণনময় ঘন্টাধ্বনি ততক্ষণ একজন কবি যেন তাঁর নিজের ভাগ্যের কাছে ভিক্ষুক। অথচ একজন ভাস্কর তার হাতের অবিরাম আন্দোলনে অথবা শ্রমে প্রতিমুহূর্তে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

তাঁর এই নিরন্তর শ্রম আর সৃষ্টির উৎসাহ মুগ্ধ করেছিল আর-এক দুর্ধর্ষ বুদ্ধিজীবীকেও। তিনি বার্নার্ড শ। চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন

কী ভাবে ক্রমাগত বদল-বদল হতে হতে রদাঁর হাতে জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর নিজের মুখাবয়ব। অবশেষে মন্তব্য,

'The hand of Rodin worked not as the hand of a sculptor work, but as the work of Elan Vital. The Hand of God is his own hand.'

কিছুদিনের থমথমে স্তব্ধতার পর আবার জেগে উঠল সেই ঘূর্ণি-ঝড়, সোসাইটি বনাম রদাঁর সংঘর্ষ। রদাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা যাঁদের কাছে অসহ্য, তাঁরা তাঁর শক্ত ঘাড়টাকে পায়ের দিকে নুইয়ে দেওয়ার জন্যে দাবি তুললে, ফেরত চাওয়া হোক অগ্রিম হিসেবে দেওয়া টাকা। রদাঁ বললেন, রাজি কিন্তু সেটা সোসাইটির হাতে নয়, সরকারের হাতে। কারণ আমি তো কাজ বন্ধ করি নি, করে যাচ্ছি। সরকার সে প্রস্তাব শুনে জানালে, সোসাইটির টাকা আমরা আইনত গচ্ছিত রাখতে পারি না। তাহলে? অনেক মাথা ঘামিয়ে উপায় বেরুলো, টাকাটা জমা থাকবে সোসাইটির আইন-জীবীর কাছে। সেই সঙ্গে তুলে নেওয়া হল কাজটা শেষ করার জন্যে সময়ের জোর-জবরদস্তি, রদাঁর উপরই দায়িত্ব চাপানো হল যথাসময়ে কাজটা শেষ করে দেওয়ার।

এই নতুন চুক্তির পরও পার হয়ে গেল ১৮ মাস। সোসাইটির একদল সদস্য এবার দাবি তুললে, মূর্তি আর চাই না। টাকাটা ফেরৎ চাই। আমরা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডানার ঝাপটায় নড়েচড়ে উঠল সংবাদপত্রের পাতাগুলো। রদাঁর পক্ষে এবং বিপক্ষে বেরোতে লাগল অবিরল মন্তব্য। আর ঠিক এই সময়েই সমালোচক অকটেভ মিরবু 'লে জুর্নল'-এর পাতায় ফাঁস করে দিলেন কর্তৃপক্ষের আসল মতলব।

'ওঁরা আসলে চান কাজটা মিঃ মারকুতকে দিয়ে করাতে। এইটের জন্যেই থেকে থেকে খবরের কাগজে রদাঁর বিরুদ্ধে এমন কুৎসার অভিযান'। আনাতোল মারকুত দ্য ভাসোলো সোসাইটির একজন সদস্য। আগে বালজাকের একটা মূর্তিও গড়েছেন, বই লিখলেন একটা। নাম 'হিস্ট্রি অব দ্য পোর্ট্রেট ইন ফ্রান্স।' খবরের কাগজ ছাড়াও সরকারি মহলে তাঁর খুবই দহরম-মহরম। খুঁটির জোরে রদাঁর হাত থেকে কাজটা ছিনিয়ে নেওয়া যায় কিনা, তারই তৎপরতা। শেষ পর্যন্ত বালজাক-এর প্লাস্টার-ছাঁচ শেষ হলো সাত বছরের মাথায়। জনসাধারণের জন্যে প্রদর্শনী করা হলো Salon de la Société Nationale des Beux-Arts-এ, সঙ্গে

সঙ্গে সারা প্যারিস ফেটে পড়ল নিন্দায়, কুৎসিৎ বিদ্রূপে, আক্রোশে। কোনো শিল্পসামগ্রীকে নিয়ে এমন তুমুল অগ্নিকাণ্ড আগে কখনো ঘটে নি। জনসাধারণকে প্ররোচিত করা হলো, এখুনি কুড়োল দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক এই হত-কুচ্ছিৎ মূর্তিটাকে, যা শুধু প্লাস্টারের পিণ্ড ছাড়া আর-কিছু নয়। সোসাইটি বিবৃতি দিয়ে জানালে, এই মূর্তিকে বালজাক বলে স্বীকার করতে আমরা শুধু লজ্জিত নই, এরকম জঘন্য সৃষ্টির জন্যে আমরা বাধ্য হচ্ছি প্রতিবাদ জানাতে।

রদাঁর অনুরাগীরা এমন বিষিয়ে-ওঠা পরিবেশে চুপ করে থাকতে পারলেন না আর। তাঁরাও ছড়িয়ে দিলেন তাঁদের প্রতিবাদ। তাঁরাও ধিক্কারপত্র জানালেন, রদাঁর প্রতি এই অপমান গোটা ফ্রান্সের সমস্ত ভাস্করের প্রতি অপমান। অসংখ্য শিল্পী, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, ভাস্কর এবং রাজনীতি-বিদ সাহিত্যিক স্বাক্ষর দিলেন এই প্রতিবাদ-পত্রে। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো জনগণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে এই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হবে কোনো উন্মুক্ত পার্কে। আপত্তি জানালেন স্বয়ং রদাঁ।

—না। এখন থেকে এটা একমাত্র আমারই ব্যক্তিগত অধিকার।

এরপর রদাঁর বদলে নতুন করে সোসাইটি মূর্তিটা বানাতে দিলে ফ্লাগুয়ের-কে। মৃত্যুর সময় সেই ফ্লাগুয়ের স্বীকার করেছিলেন,

—ভুল করেছি আমিই। চিরকালই ভুল করে এলাম। তিনিই সঠিক।

সাত

দোতলায় আরও অনেক বালজাক! কোনোটা মুখাবয়ব। কোনোটা পূর্ণাঙ্গ আকৃতি। এসব হল প্রাথমিক পর্বের খসড়া। যেমন আছে হুগোর প্রতিকৃতিরও প্রাথমিক খসড়া! যা পছন্দ হয় নি কর্তৃপক্ষের।

দোতলায় উঠে প্রথম ছুটে গিয়েছিলাম সেই হাত দুটির কাছে যার প্রিন্ট দেখেছি অজস্র এবং 'ক্যাথিড্রেল' নামে যে-কাজ বিশ্ববিদিত। রাজহংসীর গ্রীবার মতো দুটি বাঁকানো হাত মিলেমিশে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

রদাঁর ৪০০ বছর আগে পাথরে নয়, কাগজে-কলমে এমনি 'প্রার্থনার হাত' রচনা করেছিলেন জার্মানীর ড্যুরার। সেও এক অবিস্মরণীয় হাত। তার সর্বাঙ্গে গাছের ডালপালা, কাটা বঙ্কল, শিকড়-বাকড়-এর দাগ। ভ্যান গগের,

আলু চাষীর হাতের মতো, জীবনের দুঃখ-দুর্দশায় অভিজ্ঞ। ভ্যুয়ারের হাত গদ্য। রদাঁর হাত কবিতা।

হাতের উপর কবি, ভাস্কর, চিত্রকর, সাহিত্যিক সকলেরই যেন কেমন এক মমতাময় টান। শেষের কবিতায় অমিত লাবণ্যকে বলেছিল

'সবচেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে কথা কইছে। কোন কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।'

জীবনানন্দে পাচ্ছি

'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।'

এলুয়ার লেখেন

'আমাকে ঘিরে থাকে তোমার বাহুর পথরেখা

যেন এক বিজয় চিহ্নের মশাল।'

আরাগঁ ঐ একই হাতের বন্দনায়

'হেমন্তরূপ মখমল হাত তার

সে যে এক গান অক্লান্ত সে গাওয়া

সে গান দেয় যে দোঁহার প্রেমে দোহার।'

চতুরঙ্গে শচীশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ কৃপণের মতো বেছে বেছে ব্যয় করলেন মাত্র কয়েকটি মূল্যবান বাক্য,

'শচীশকে দেখিলে মনে হয় একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা।'

তাঁর গানে কত যে হাতের কথা, তার হদিশ নেই।

আর এই কারণেই টলস্টয়কে গড়তে গিয়ে গর্কী যখন প্রথমেই লিখে বসলেন হাতের কথা, সেটা আমাদের নতুন করে বিস্মিত করে না।

'হাত দুটি তাঁর অপূর্ব, কুৎসিত। শিরা-উপশিরায় জটিলতায় বিকৃত কিন্তু অসাধারণ, অভিব্যক্তিময়, সৃজনশক্তিতে ভরপুর। সম্ভবত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির হাত ছিল এই রকম। পৃথিবীর যে কোনো কাজ করা যায় এই রকম হাত দিয়ে।'

রদাঁ বুঝি মানুষের হাতকে নিয়ে রচনা করতে চেয়েছিলেন মোৎসার্ট-বেঠোফেনের মতো উত্থান-পতনে উর্বর সঙ্গীতের এক সৌরলোক। যখন

হাত দিয়েছেন 'বুর্জোয়া দা ক্যালে'-র, তখন সকলের আগে হাত লাগিয়েছেন হাতে।

'হি স্পেক্ট মোস্ট অব হিজ টাইম অব দি হ্যাণ্ডস। দেয়ার আর হ্যাণ্ডস দ্যাট প্রে, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডস দ্যাট উইপ। হ্যাণ্ডস দ্যাট কোশ্চেন, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডস দ্যাট গিভ ইন। হ্যাণ্ডস দ্যাট ব্লেস, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ড দ্যাট ব্লাসফেমি। ভায়েলেন্ট হ্যাণ্ডস এ্যাণ্ড টেণ্ডার হ্যাণ্ডস। ক্লীনচ্‌ড হ্যাণ্ডস এ্যাণ্ড রিজাইনড হ্যাণ্ড। আইজ এ্যাণ্ড লিপস্ মে ডিসিভ। হ্যাণ্ডস ক্যাননট লাই। হি সেপ্‌ড ইনিউমারেবল হ্যাণ্ডস এক্সপ্রেসিং দা হোল গ্যামোট অব হিউম্যান সাফারিং এ্যাণ্ড এ্যাংসাইটি।'

দোতলায় হাত বলতে শুধু একটা 'ক্যাথিড্রেল' নয়। আরও অজস্র। দুটি ঊর্ধ্বমুখী হাতের মাঝখানে একটা ছোট্ট কৌটো যেন। নাম সিক্রেট। এইসব ছোটখাটো হাতের পাশেই 'ঈশ্বরের হাত'। ছড়ানো হাতের পাঁচ আঙুল আর তালুর মধ্যে ঈশ্বর ধরে রেখেছেন দুটি নরনারীকে। নরনারী দুটি যেন জলের ভিতরে মাছের মতো চঞ্চল, অাঁকাবাঁকা, পরস্পরে গাঁথা। দেখতে দেখতে প্রশ্ন হানা দেয়, এরা কি কোনদিন অতিক্রম করে যেতে পারবে ঈশ্বরের হাতে সীমাবদ্ধতাকে?

ছেনির অাঁচড় লাগা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই। তার মাঝখানে কোথাও পাড়াগাঁয়ে শালুকফুলের মতো ফুটে উঠেছে একটুখানি মুখ, চিবুক যেন জলের তলায়। নাম—চিন্তা। এমনই অসমাপ্ত অথচ পরিপূর্ণ কাজ অজস্র। মোৎসার্ট-এর দিকে তাকালে মনে হয় যেন আসন্ন-সম্ভব কোনো সোনালি তন্তুজালের ভিতরে জড়িয়ে আছেন তিনি। একটু পরেই মুখের উপর থেকে সরে যাবে স্বপ্নের কুয়াশা। জেগে উঠবেন উচ্ছ্বসিত স্পন্দনে নবীন কোনো স্বরলিপির গুঞ্জরনে। ওদিকে 'চুম্বন'। এদিকে 'বেদনা'। ওদিকে চুল এলিয়ে, পিঠে শিরদাঁড়াসহ উপুড় হওয়া নারী 'দানেদ'। যেন আছড়ে পড়েছে জীবনের শক্ত পাথরে। সেও অপরূপা, কিছুতেই মনে হয় না পাথর দেখছি। চতুর্দিকে যৌবন, ভালবাসার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, জীবন, জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, মহিমা, সৌন্দর্য, ব্যর্থতা, উল্লাস, শান্তি, জীবনের জয়-পরাজয় এবং জীবনের অন্ধকারকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে আসা সোনালি আভার আলো।

কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গ

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পল পটের তথাকথিত "বিশুদ্ধ" বা "নির্ভেজাল" সমাজতন্ত্রের মডেলের মূল ভিত্তি ছিল দুটি : উগ্র, খ্‌মের জাতীয়তাবাদ যার পরিণতি হল অন্ধ ভিয়েতনাম বিদ্বেষ এবং কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ। এই জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বলা হয় যে কাম্পুচিয়া যে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করবে তা হবে সমস্ত দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর, অর্থাৎ একদিকে তা হবে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের ধ্যানধারণার কলঙ্কময় ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ; অপরদিকে নতুন কাম্পুচিয়ার ভিত্তি হবে তার একান্ত নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা। আপাতদৃষ্টিতে এই স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি উঠবে না। বস্তুতপক্ষে একেবারে গোড়ার দিকে যখন পল পট সরকার লন্ নল্ শাসনমুক্ত নতুন কাম্পুচিয়ার নেতৃত্বে আসলেন, তখন এই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো আপত্তিও ওঠে নি। কিন্তু এই স্বাদেশিকতাই এর অতি ভয়ংকর বিকৃত রূপ নিতে শুরু করল যখন পল পট নেতৃত্ব কাম্পুচীয় সমাজতন্ত্র নির্মাণের নামে এই মতাদর্শকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী এক সংকীর্ণ, উগ্র খ্‌মের জাতীয়তাবাদে পরিণত করলেন। এক কথায়, স্বনির্ভরতার স্লোগান পর্যবসিত হতে শুরু করল সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই বিরোধিতায়, আর তারই পরিণতি হল তীব্র ভিয়েতনাম বিরোধিতা। এর ফল দাঁড়াল এই যে গোটা কাম্পুচিয়াকে এই নতুন নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমেই সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সুস্থ মতাদর্শকে বর্জন করে স্বনির্ভরতার নামে এক অন্ধ, উগ্র খ্‌মের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। এর পরিণতিও হয়ে দাঁড়াল মারাত্মক। একদিকে কাম্পুচিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল স্বনির্ভরতার নামে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী উগ্র জাতিদম্ভ ও জাতিবিদ্বেষ ; দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কাম্পুচিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যাঁরাই প্রতিবাদ জানালেন তাঁদেরকে কাম্পুচিয়ার জনগণের শত্রু ভিয়েতনামের চর

মনে করা হতে লাগল ও এঁদের বিরুদ্ধে শুরু হল চূড়ান্ত দমন-পীড়ন; আর তারই পরিণতি পরবর্তীকালে পল পট নেতৃত্বে ভাঙন ও অবশেষে তাঁর পতন। তৃতীয়ত, এই পেটি বুর্জোয়া সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম নিল ঔপনিবেশিক শাসনে ও লন্ নল সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত কাম্পুচিয়াতে রাতারাতি সমাজতন্ত্র কায়েম করার এক রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাস।

স্বনির্ভরতার ও সমাজতান্ত্রিক জগত থেকে (গোড়ার দিকে চীন সম্পর্কেও এই নতুন নেতৃত্ব একই মনোভাব পোষণ করতেন, যদিও পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত চীনের সাথে তাঁদের গভীর সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়) বিচ্ছিন্নতার নামে কাম্পুচীয় মডেলের সাচ্চা সমাজতন্ত্র নির্মাণপর্বে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে প্রথম থেকেই, বলা যায়, অস্বীকার করা হল। কাম্পুচিয়ার মতো সমস্যাজর্জরিত ও পশ্চাদপদ একটি দেশে অন্তত কৃষির উন্নতির জন্যও প্রয়োজন ছিল শিল্পোৎপাদন এবং ঐতিহাসিক কারণেই উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত দেশগুলির পক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়; কিন্তু তথাকথিত স্বয়ংনির্ভরতার শ্লোগান দিয়ে কাম্পুচিয়ার নতুন নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই এই সম্ভাবনা বাতিল করে দিলেন ও তার ফল দাঁড়াল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ মুলতুবি রেখে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে অস্বীকার করে এক ধরনের পেটি বুর্জোয়া কৃষক সাম্যবাদ কায়েম করার উদ্ভট ও হাস্যকর প্রয়াস, আর মূল্য দিতে হল কাম্পুচিয়ার জনগণকেই। একটা কথা এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভিয়েতনাম বা পরবর্তীকালে এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া বা দক্ষিণ ইয়েমেনের মতো দেশগুলির প্রায় একই ধরনের সমস্যা সমাধানের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে কাম্পুচিয়ার নতুন নেতৃত্ব কোনো কাজেই লাগাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কৃষক-কেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার এই উল্লম্ফন পদ্ধতি অচিরেই কাম্পুচিয়ার গোটা সমাজ ও অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি করল আর এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে পল পট নেতৃত্ব যে পথ অনুসরণ করলেন তা তাঁদেরকে আরও এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের পথে নিয়ে গেল। শোষণে ও অত্যাচারে কাম্পুচিয়ার অর্থনীতির মেরুদণ্ড প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে গিয়েছিল। তাই অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল উৎপাদন বাড়ানো; কিন্তু শিল্পোৎপাদনের পথে না যাওয়ার ফলে পল পট নেতৃত্বের সামনে একটি পথই খোলা ছিল; তা হল কৃষিখাতে

যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা ; কিন্তু যেহেতু শিল্পোৎপাদনকে বাদ দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব নয়, তাই এই সমস্যা মেটাতে গোটা কাম্পুচিয়ার জনসাধারণকে বলা হল শহর ত্যাগ করে গ্রামে চলে আসতে এবং সেখানে কমিউন-ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে ; একেবারে গোড়ার দিকে এই জাতীয় আহ্বান অনেকের কাছেই হয়ত বা যথেষ্ট রোমান্টিক বলে মনে হয়েছিল ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে এর পরিণতিস্বরূপ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে অর্থনীতিকে বাঁচাবার জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হতে হচ্ছে প্রায় প্রতিটি নাগরিককে, তখনই পল পটের সমাজতন্ত্র নির্মাণের মডেলটির অন্তঃসারশূন্যতা ধীরে ধীরে প্রকট হতে শুরু করল। এই চূড়ান্ত হঠকারিতার পরিণতিও হল মারাত্মক। উৎপাদন বৃদ্ধির নামে কমিউনগুলিকে কতকগুলি যান্ত্রিক কেন্দ্রে পরিণত করা হল, যেখানে পারিবারিক বন্ধন, মূল্যবোধ প্রভৃতি হল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। শহরগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ায় ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল ; শিক্ষাব্যবস্থারও একই হাল ; তার উপরে মুদ্রাব্যবস্থা বাতিল করে বিনিময় ব্যবস্থা চালু করে পল পট নেতৃত্ব দেশের সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুললেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে এই ধরনের একটি মডেলের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার বা জনসাধারণের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কোনো মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক শিক্ষা বা প্রচারের কথা এই নেতৃত্ব একবারও ভাবলেন না। ফলে গোটা ব্যাপারটা অচিরেই হয়ে দাঁড়াল এক আতঙ্কিত, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, যার প্রাণকেন্দ্র হল 'আংকর' (অর্থাৎ সর্বোচ্চ কর্তৃমণ্ডলী, যাকে স্পষ্ট করে না বললেও কাম্পুচিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতার কর্ণধারদের সাথে এক করে দেখতে অসুবিধে হয় না) ; এই 'আংকরে'র নির্দেশ পালন করার জন্য নিযুক্ত করা হল অত্যুৎসাহী তরুণের দল, যারা চীনের তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর পথ ধরে সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই মহাযজ্ঞে নিজেদেরকে নিয়োজিত করল ; প্রকৃতপক্ষে চীনের 'রেড গার্ড'দের মতো এঁরাই হয়ে দাঁড়াল কাম্পুচিয়ার ভাগ্য বিধাতা আর এঁদের নির্দেশ অমান্য করার অর্থ দাঁড়াল নৃশংসভাবে মৃত্যুকে বরণ করা। আর যতই দিন যেতে লাগল, তত বেশি ভয়ংকর আকার ধারণ করল এই হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড। তার কারণ, এই অবাস্তব ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে যাঁরাই অপারগ হলেন বা যাঁরাই সামান্যতম প্রতিবাদ করতে প্রয়াসী

হলেন, তাঁদেরকে আখ্যা দেওয়া হল কাম্পুচিয়ার জনগণের শত্রু অথবা ভিয়েতনামের চর, যাঁরা উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে বা উৎপাদননীতির সমালোচনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভাঙন ধরাচ্ছেন। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই আজব ব্যবস্থার বিরোধী কোন ব্যক্তিকেই রেহাই দেওয়া হল না; আর এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল কাম্পুচিয়া থেকে দেশত্যাগের হিড়িক; ফলে অর্থনীতিতে সংকট আরও ঘনীভূত হতে শুরু করল; এই নীতির প্রতিবাদে পল পট নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও কাম্পুচিয়ার পার্টির অভ্যন্তরেও তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিল; উপায়ান্তর না দেখে পল পট নেতৃত্ব একদিকে শুরু করল পাইকারি গণহত্যা আর অপরদিকে জাগিয়ে তুলতে শুরু করল তীব্র ভিয়েতনামবিরোধী জেহাদ। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হতে পারল না। কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যখন পল পট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তুলল, তখন দেখা গেল যে পল পটের অনুগামী কিছু সমর্থক ছাড়া আর প্রায় গোটা দেশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হেং সামরিনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে; আর তাই পল পটের নেতৃত্বও গণ সমর্থনের অভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। আর হেং সামরিনের নেতৃত্বে নতুন সরকারকেও তাই পল পটের অনুগামী ভিন্ন আর অন্য কোনো শক্তিই বাধা দানের চেষ্টা করে নি। কাম্পুচিয়ার শাসকবৃন্দের এই সর্বনাশানীতি গোটা কাম্পুচিয়াকে যে কি এক ভয়ংকর ধ্বংস ও অরাজকতার পথে নিয়ে চলেছিল, তার অতি করুণ, মর্মন্তুদ চিত্র পরবর্তীকালে অজস্র সাংবাদিক রিপোর্টে ছাপ আছে,[১৩] যদিও কোনো কোনো ব্যক্তি এই গণ-হত্যার বিষয়টিকে স্বাভাবিক মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু বা অতিরঞ্জিত বলে পল পট নেতৃত্বের প্রতি তাদের নির্লজ্জ স্তাবকতা প্রমাণ করার হাস্যকর প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন।[১৪] তথ্যাভিজ্ঞ মহলের রিপোর্টে জানা যায় যে কাম্পুচিয়ার নেতৃবৃন্দের এমন যে পরম সুহৃদ্ চীন তার নেতৃত্বেও শেষ পর্যন্ত পল পটের এই, উদ্ভট, অবাস্তব নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে ও জনরোষ এবং গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন এই সরকারকে সম্ভাব্য ও প্রায় আবশ্যম্ভাবী পতনের হাত থেকে উদ্ধারের ব্যাপারেও কোন আশ্বাসদানে বিরত থাকে,[১৫] যদিও এ কথাও অবশ্যই ঠিক যে শেষ দিন পর্যন্তও কাম্পুচিয়াতে চৈনিক সমরসম্ভারের যোগান অব্যাহত ছিল।

৪

উপসংহারে কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সাফল্যের পিছনে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা এবং কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর প্রবেশের প্রশ্নটি আলোচনা করা প্রয়োজন। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে কাম্পুচিয়ার মাটিতে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর এই উপস্থিতির প্রশ্নটি আজও পর্যন্ত কিন্তু হ্যানয় সরকার কখনও অস্বীকার করে নি। চীন যেমন ভিয়েতনামকে আক্রমণ করে তার অপকীর্তি ঢাকবার জন্য ভিয়েতনামকেই আক্রমণকারী আখ্যা দিল, ভিয়েতনাম কিন্তু একবারের জন্যও তার সেনাবাহিনী পাঠানর প্রশ্নটিকে বা কাম্পুচিয়ার মুক্তি ফ্রন্টের সাথে ভিয়েতনামের যোগসাজসের বিষয়টিকে ধামা চাপা দিয়ে তথ্য-বিকৃতি বা ইতিহাসবিকৃতির পথে যায় নি। এর প্রধান কারণ হলো যে ভিয়েতনামের তরফ থেকে এই সক্রিয় সাহায্যদানের প্রশ্নটি ছিল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের সুস্থ নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে নীতি ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় অনুসৃত হচ্ছে অ্যাঙ্গোলায়, ইথিওপিয়ায়, আফগানিস্থানে বা দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামে। যাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব বা তথ্য কোনোটিতেই আগ্রহী নন, তাঁরা ঘটনাটিকে ভিয়েতনামের কাম্পুচিয়া আক্রমণ ভেবে বসবেন; আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত চতুর, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বলবেন যে "জনপ্রিয়" পলপট সরকারকে উচ্ছেদের জন্য ও কাম্পুচিয়াকে নিজেদের দখলে আনার জন্য ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর মদতে হেং সামরিনের পুতুল সরকার বর্তমানে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অর্থাৎ ভিয়েতনাম মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তার পছন্দমত মডেলের বিপ্লব রপ্তানী করার হঠকারিতার নীতিতে সে বিশ্বাসী : আর এই যুক্তিতে ভিয়েতনামকে খুব সহজেই পররাজ্যলোভী, আগ্রাসী প্রভৃতি মুখরোচক বিশেষণে বিভূষিত করতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার। প্রথমত, দিনের পর দিন তীব্র ভিয়েতনাম বিদ্বেষকে মদত দিয়ে কাম্পুচিয়াতে বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের উপরে এবং ভিয়েতনামী চর সন্দেহে কাম্পুচিয়ার জনসাধারণের একটা যথেষ্ট বড় অংশের উপরে পল পট সরকার যে দমনপীড়ন শুরু করেছিলেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় ভিয়েতনাম ও পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ডে স্রোতের মতো এই নির্বাসিত শরণার্থীদের প্রবেশ যাঁদের মধ্যে, বলা বাহুল্য, অনেকেই কিন্তু ছিলেন

কাম্পুচীয়। ভিয়েতনাম যখন তার যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় কাম্পুচীয় নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে এই ধরনের নীতি অনুসৃত হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা ভিয়েতনামের উপর এক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে; সেই সাথে চলে যথেচ্ছভাবে ভিয়েতনামের সীমানা লঙ্ঘন ও ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যত্রতত্র অত্যাচার চালান। কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সরকারের পক্ষেই এই ধরনের ঘটনাবলীকে মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে কাম্পুচিয়ার অভ্যন্তরে ভিয়েতনামের পাল্টা অভিযান কিন্তু তখনই শুরু হয় যখন ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দের কাছে এটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পল পট সরকার কাম্পুচীয় জনগণের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ও হেং সামরিনের নেতৃত্বে কাম্পুচীয় জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের পিছনে ব্যাপক গণ-সমর্থন আছে, অর্থাৎ আইনত স্বীকৃত না হলেও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট যে কাম্পুচীয় জনগণের এক ব্যাপক ও বৃহৎ অংশের প্রতিনিধি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই হেং সামরিন নেতৃত্ব ও ভিয়েতনামী বাহিনী পলপটের প্রায় ভেঙে পড়া সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযান চালায়। হেং সামরিন নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ভিয়েতনাম-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ বর্জন করা এবং এই সুস্থ চিন্তার পিছনে যে ব্যাপক গণসমর্থন ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিয়েতনামবাহিনী যখন নম্ পেন্-এ প্রবেশ করে, তখন বা তার পরে আজও পর্যন্ত সেখানে ভিয়েতনামের কয়েক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন আছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের গণবিক্ষোভ দেখা দেয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রতিরোধবাহিনী-গুলির প্রত্যক্ষ সহায়তায় যেমন সোভিয়েত লাল ফৌজ সমাজতন্ত্রের বিজয়-কেতন ওড়াতে সাহায্য করে এক পবিত্র আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছিল, এ ক্ষেত্রেও অনেকাংশেই ভিয়েতনামী ফৌজের ভূমিকা ছিল অনেকটাই সেইরকম। পল পট নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতিকে যে ভগ্নস্তূপে পরিণত করে-ছিলেন, তা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধারকল্পে আজ কাম্পুচিয়াতে সে দেশের শ্রমিক-কৃষকের সাথে হাত মিলিয়েছেন দক্ষ ভিয়েতনামী কুশলীরা।[১৬] পলপট নেতৃত্ব অবসানের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন একটি খবরও পাওয়া যায় নি যা থেকে বলা যায় যে হেং সামরিনের পুতুল সর-কারের বিরুদ্ধে কাম্পুচিয়াতে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে বা ভিয়েতনামী বাহিনীর উপস্থিতিতে কাম্পুচিয়ার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। বরং ঠিক উল্টোটাই

সেখানে ঘটছে ; ভিয়েতনামের ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদেশগুলির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পলপটের অবাস্তব কাণ্ডজ্ঞানহীন নীতিকে বিসর্জন দিয়ে সেখানে আজ প্রকৃত সমাজতন্ত্র গঠন করার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে চলেছে। অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘেও একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ক্ষমতাচ্যুত পলপট ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা হেং সামরিনের সরকারকে উৎখাত করার জন্য যত কদর্য অপচেষ্টাই চালাক না কেন, সমগ্র কাম্পুচিয়াতে আজ নতুন সরকারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে কোনোভাবেই ভিয়েতনাম পরিচালিত তাঁবেদার সরকার বলে আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের উগ্রভাবপন্থী মহলের বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা প্রতিমুহূর্তেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুলি আওড়ান, ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর কাম্পুচিয়াতে প্রবেশকে সরাসরি বোম্বেটেগিরি বা দস্যুতা বলে আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন ; আর তাই কাম্পুচিয়ার নতুন সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নেও তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের চিন্তার শরিক হতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কাম্পুচিয়ার নতুন সরকার (যেখানে ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী এখনও মোতায়েন আছে) সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই এঁরা যুগপৎ আতঙ্কিত ও মর্মাহত হবেন।

কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামী বাহিনীর উপস্থিতির প্রশ্নটি আরও একটি দিক থেকে আলোচনা করা প্রয়োজন। পলপট নেতৃত্ব মুখে স্বনির্ভরতার নাম করলেও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তার ঘনিষ্ঠতম দোসর ছিল চীন। প্রত্যক্ষ চৈনিক সমর্থন ও ব্যাপক চীনা সমরসম্ভার ও চীনা সমরবিশারদদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করেই পলপট সরকার দীর্ঘদিন ধরে একদিকে ভিয়েতনাম ও অপরদিকে পলপটবিরোধী প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁদের হিসেবের ভুল ধরা পড়ে যখন পলপটের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। এর ফলে পল পটের মতো চীনের পার্টির নেতৃত্বেও তেং শিয়াও পিং গোষ্ঠী আতঙ্কগ্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে পল পট সরকারের উচ্ছেদের পরমুহূর্তেই ভিয়েতনামের উপর বর্বর হানাদারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ; চীন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ হল কাম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামীবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ভিয়েতনামের উপরে চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া মৈত্রী অটুটই রইল ; বরং

চীনের নির্লজ্জ আক্রমণে কাম্পুচিয়ার মানুষের কাছে আরও একবার প্রমাণিত হল যে কাম্পুচিয়ার অগণিত খেটেখাওয়া মানুষের স্বার্থে, কাম্পুচিয়াতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে, চীনের যোগসাজশে পল পট নেতৃত্বের পুনরাগমনকে প্রতিহত করার স্বার্থেই কাম্পুচিয়ার মাটিতে ভিয়েতনামের অস্ত্রের বাহিনীর উপস্থিতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে ভিয়েতনামবিদ্বেষ ও উগ্র খ্মেরের জাতিদম্ভকে পরিহার করে কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রামী মৈত্রীকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করার। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সরকার যদি মনে করে থাকে শুধুমাত্র চীনা সমরবিশারদদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে যেন তেন প্রকারেণ তার টিঁকে থাকার অধিকার আছে, তাহলে কাম্পুচিয়ার ব্যাপক গণসমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট যদি ভিয়েতনামী বাহিনীর সহযোগিতায় তথাকথিত 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রের' ধ্বজাধারী এই সরকারকে উচ্ছেদ করার ব্রত নেয়, তবে তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও বোধহয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবার মতো একটা ভয়ঙ্কর অন্যায় ব্যাপার হয়ে যায় নি বা তাতে ভিয়েতনামের সংগ্রামী ঐতিহ্যও ভূলুণ্ঠিত হয় নি। বরং, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাথে মৈত্রীতে বদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম লাওস ও কাম্পুচিয়াসহ গোটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলির আজ সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল।

ভিয়েতনামের কাম্পুচিয়া প্রশ্নে যাঁরা এখনও শাপশাপান্ত করছেন, তাঁরা কিন্তু উটপাখীর মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে কয়েকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে একেবারেই নারাজ। শেষদিন পর্যন্ত পল পট সরকারকে চীনা সমরযন্ত্র যে প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে গেছে ও যার সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই নেতৃত্ব গোটা কাম্পুচিয়াতে এক অমানুষিক ও জঘন্য হত্যালীলা চালিয়েছিল,[১৭] সে সম্পর্কে এঁরা একটি কথাও বলতে রাজি নন। তবে তার চেয়েও কলঙ্কজনক ঘটনা হলো যে ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া মৈত্রী ধ্বংস করার জন্য জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পল পটের তথাকথিত গেরিলাবাহিনীকে চীন আজ মদত দিচ্ছে থাইল্যাণ্ডে আশ্রিত সি. আই. এর প্রত্যক্ষ সমর্থনপুষ্ট খ্মের সেরেই বাহিনীর সাথে হাত মেলাবার জন্য, যারা একসময়ে ছিল লন্ নলের পক্ষাশ্রয়ী পেশাদার ঘাতকবাহিনী; শুধু তাই নয়, গোটা ভিয়েতনাম ও লাওসে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাবার জন্য চীন আজ প্রত্যক্ষ সমর্থন জানাচ্ছে সি. আই. এর অর্থপুষ্ট তথাকথিত বিদ্রোহী মেও পার্বত্য উপজাতিদের;

উদ্দেশ্য এঁদের সহায়তায় ভিয়েতনাম ও লাওসে এক অস্থিতিকর অবস্থা সৃষ্টি করা। চীনা নেতৃত্বের সাথে সি. আই. এর এই প্রত্যক্ষ যোগসাজসের কথা স্বয়ং নরোদম সিহানুকই পৃথিবীকে জানিয়েছেন।[১৮] যাঁরা এ্যাঙ্গোলাতে সি. আই এ সমর্থিত এফ. এন. এল. এর সাথে বা আফগানিস্থান, মোজাম্বিক, চিলি, ইথিওপিয়াতে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী দল ও শক্তিগুলির সাথে চীনা নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা এতদিন অস্বীকার করে এসেছেন, তাঁদেরকে অনুরোধ যেন আরও একবার কাম্পুচিয়ার ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে গোটা বিষয়টা ভেবে দেখে চীনের খাঁটি বিপ্লবী নেতৃত্বের মূল্যায়ন করেন।

কাম্পুচিয়ার মাটিতে আজ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে চলেছে। ভিয়েতনাম ও লাওসের সাথে মৈত্রী বন্ধনে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অকৃত্রিম সহযোগিতায় আফগানিস্থান, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়ার মতো বিপ্লবী সরকারগুলির দৃঢ় সমর্থনে দক্ষিণপূব এশিয়ায় নতুন কাম্পুচিয়ার অভ্যুদয় আজ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতির মুখে পল পট নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে; যাঁরা এখনও এই নেতৃত্বের পুনরুত্থানের অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন তাঁদের প্রতি দু-এক ফোঁটা করুণাবর্ষণ ছাড়া সত্যিই আর কিছু করার নেই।

১৩. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য Harish Chandola, 'Eyewitness at Phnom Penh' *Mainstream*, ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃঃ ১১-১৩ এবং Wieslaw Gornicki, 'Genocide in Kampuchea; Prelude to aggression on Vietnam', *New wave*, ৩ জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৮-১০ /: সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটের প্রতিবেদনের জন্য দেখুন, *The Guardian*, ২০ মে, ১৯৭৯, পৃঃ ৮।

১৪. David Boggett, 'Democratic Kampuchea and Human Rights', *Economic and Political Weekly*, ৫ মে, ১৯৭৯, পৃঃ ৮১৩-৮২১।

১৫. এই রিপোর্টের জন্য দেখুন *FEER*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃঃ ১০-১২, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৯, পৃঃ ১০।

১৬. এই বিষয়ে নম্ পেন্ থেকে প্রেরিত প্রখ্যাত সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটের রিপোর্ট দেখুন, *The Guardian*, ৩ জুন, ১৯৭৯, পৃঃ ৯।

১৭. চীন নেতৃত্ব পল পট নেতৃত্বকে এই গণহত্যা সংগঠিত করতে ও ভিয়েতনাম বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলতে কি ধরনের কদর্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তার জন্য দেখুন *Kampuchea Dossier II.* পৃঃ ৭৮-১০২, ১১৩-১২২।

১৮. *Mainstream,* ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃঃ ৩১-৩২, এবং *FEER,* ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ৮-১১।

জনস্রোত, জলস্রোত

আফসার আমেদ

সেই সব জন্মাবধি অবোধের সূত্র নিয়ে তারের ওপর পুতুল নাচায়। সে নাচছে। বেঁকেচুরে যাচ্ছে। আরো অনেকে নাচছে বাঁকছে চুরছে। সে তার জন্মাবধি অবোধের কাছে ঘুরে ফিরে আয়নায় প্রতিবিম্বিত। বউটা প্রতিবিম্বিত। সে। এবং কচিটা আঙুল চুষে প্রথম সামাল দিচ্ছে। সঞ্চয় করছে উত্তরকালের জন্য অভিজ্ঞান। সে, কচির বাবা, নুরুর সাবেক সহনশক্তির পরীক্ষা। অবাক অমিত ক্রীড়া-নৈপুণ্য। তো বাঁকাটারা হোচ্ছে লোহারে পেটানো লৌহযন্ত্রণায়। ঘুরে-ফিরে একই বৃত্তে আবর্তিত। টানাপোড়েনের যন্ত্রবোধ, সেই সব সাদামাঠা সুতিশিল্প, কর্মকৌশলে বিঁধে যাচ্ছে, বন্দী হচ্ছে তৃপ্ততা উপভোগ সচ্ছলতা। নুরুর ভাঁজকাগজ মনন, আশা-ভরসা, বাস্তব প্রতিকূল অবস্থায় অদ্ভুত ভগ্নাংশ। নুরু ভাঙছে। বউ ভাঙছে। কচি ভাঙছে। অনেকে ভাঙছে। হৃদয় ভাঙছে। মন ভাঙছে। বাড়ি ভাঙছে। গ্রামীণতা ভাঙছে। প্রাচুর্য ভাঙছে। সেই সব ভাঙনের সামনে উঁচুতে দাঁড়িয়ে নুরু এবং বউ-ছেলে, এবং আরো নুরু বউ-ছেলে দুর্যোগে ক্ষত-বিক্ষত। বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড় এল। কল্পিত ঈশ্বরবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া চলছে। নুরু দেখছে প্রকৃতিকে। নুরু দেখছে নিজেকে। চমকাচ্ছে। দুর্যোগের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছেগুলোকে নিক্ষেপ করছে। যেখানে বউ আছে, ছেলে আছে, আবার কেউ নেই এই বোধ ঘনীভূত। বউ দূরে নেই। কাছে আছে। অমন বউটাকে আমার, পর পুরুষের সামনে দাঁড় করালে। লতাপাতা জড়ানো কাচের চুড়ির ঘনিষ্ঠ ইশারা যার বাহুতে উঠে আসে অবলীলায়, যার নির্ভুল আত্মীয়তা পৃথিবীর যন্ত্রণা থেকে অমর্ত আবহাওয়ায় দাঁড় করায়, তার চোখে কালি পড়ছে। তার লিপ্ত-জিজ্ঞাসা ঠোঁটে নিঃশব্দে দৌড়ঝাঁপ করছে। সে, শিশুকে স্তব্ধতা দেবার মতো করস্পর্শে প্রতুল সান্ত্বনা তুলে দেয়।

'কিছু আনোনি?'

'নাহ্!'

'হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল?'

'নাহ্।'

'কচির বাল্লিকের ডিবে, হাঁড়িটা আনলেনি। অ্যাঁ! কচি খাবে কি? তুমি কি লোক বলতো?'

'স্রোত ঠেলে যেতে পারিনি বউ।'

বউ নিজের কপাল-মুখের বাঁকচোরের ছায়াপড়া অব্যক্ত বিন্যাস কোথায় বুকের চৌহদ্দিতে ঠেলেঠুলে দেয়। নিম্ন স্বরে বলা উচিত কথা কাউকে শুনতে দেয় না। খোকাকে জড়িয়ে ধরে। ভাবনাজাত ক্লান্তিবিন্দু স্বেদ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। কচির বাবা সেই সাক্ষী-সাবুদ সালিসীর মধ্যে জেগে হঠাৎ দৃশ্যমান হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। পায়ে পা ঠেকছে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি খেয়ে যাচ্ছে। হাঁটা যায় না। চারদিকে তাকাচ্ছে। দৌড়নো যায় না। ক্রমশ ভিড়ের খোলসে শ্বাসরুদ্ধ। ভিজে শরীরে থেকে-থেকে কেঁপে যাওয়া। গুর গুর। সেই ভেতরের অলিগলি, রক্তলিপ্ত শরীরী অনুভূতি, চেতনায় কর্ষিত হচ্ছে। কচির মায়ের কাছ থেকে সরে থাকতে পারছে না। ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে বরং।

'হিমানীর কৌটোতে লুকনো সাতটা টেকা ছিল।'

'লুকনো টেকা হকে এল না।'

'তোমার টেকা নাকি?'

'তবে—'

'ও আমার, খুঁটে বেচে জমিয়েচি।'

'ভারি তো সাতটা টেকা!'

'এক গলা মাটি খুঁড়লে এক পাই পাওয়া যায়?'

'হার মানছি।'

এই সবের মধ্যেও বউ-এর হাসি পায়! নুরু একা কেমন বোকা বনে যায়। সবাই হাসতে পারে কাঁদতে পারে নুরু পারে না। সে ভাবল এই সবের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আচরণ, নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার হারটা নাও হতে পারে। মুক্তকণ্ঠে যেমন হাসবে তেমন কাঁদবে অনর্গল। সে স্রোতের মুখে কুটি ফেলল, সে বলল জীবনটাই এরকম। নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ। শিশুর মতো সে ঘুরে ফিরে মজা দেখছে। লাল পানির প্রতুল অণু-সমগ্র কিভাবে মানুষের সুখকে ভেঙে ফেলে মাটির বাড়ির মতো। ভেঙে ফেলে একফালি বিছানা। ভেঙে ফেলে একটুকরো আয়না, ক্ষেতের স্নেহস্পর্শ, ভাতঘুম, ঝিঁ-ঝিঁ মধুর রাত। এই সব সুখের কোনো বিকল্প নেই। এই সব ঘটনার বিস্মরণ হয় না।

'কচিকে ধরো তো একবার।'

সে শুনতে পেল না।

'কি বলচি—'

'কি?'

'তুমি শুনতে পাওনি সত্যি?'

'না।'

'কি ভাবতেচ?'

'কিচ্ছু না।'

'আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে তুমি নিজের খেয়ালে আছো, ধরো একবার খোকাকে।'

সে কচিকে টিপটিপি বৃষ্টির মধ্যে গামছা আড়াল করে রাখে। তার খাঁদা নাক সিম করার চেষ্টা করে। শরীর নাড়া দিয়ে দুলোয়। 'ওই দ্যাখ্ বান, সাঁতার দিবি, সাঁতার দিবি? উঁহু তা হবে না, তোর চোদ্দ পুরুষ পারবে না। কি খাবি কি? আসমানের পানি খাবি? হুঁ হচ্ছে। চোপ্। প্যাদানি খাবি। ও বাব্বা ঠোঁট ফুলোস! আঙুল চুষ আঙুল চুষ। এই তো কুঁড়েঘরে থাকার ছেলে, আবার কান্না? ধরো তোমার ছেলেকে।'

'বাবারে একবার নিয়ে তর সয় না। বলে কি না তোমার ছেলে। তোমার ছেলে নয়?'

'আমারই তো। দেখবি বড় হয়ে বাঘ শিকার করবে।'

'ছাই। ইট সাজাবে।'

'কেন মিস্ত্রীর ব্যাটা বাবু হয় নি?'

'ওই সুখে থাকো।'

'বেশ।'

'এই, কচি ক্যানো সদাই আঙুল চুষছে জানো?'

'ওসব বাজে কথা।'

'ফেরেস্তা ছেলে, কিছু আলামত পাচ্ছে বুঝি!'

'ধ্যাৎ!'

'নাগো, আমরা বুঝি সব না খেতে পেয়ে মরে যাব।'

'তা হয় না।'

'আঙুল চোষার মানে তো আকাল!'

কচিটা বজ্জাত। নিজের সুখে আঙুল চুষছে। আর সকলকে ভয়

ধরাচ্ছে। ফেই, ওসব মিছে। মুকুর হঠাৎ কুচিন্তার একট বুড়বুড়ি বস্তির-প্রাচীর খাড়া হচ্ছে। প্রতিষেধক না থাকা এই সব সংক্রমিত আকাল রোগ দেহের কোষানুভূতিতে সঞ্চারমান। সে কেমন জড়সড়, সে কেমন বিলম্বিত, সে কেমন রক্তশূন্য, সে কেমন ছায়াহীন, সে কেমন পরাভূত। কচিটা তাবত বানভাসি মানুষদের তর্জনী তুলে শাসায়।

'ওগো তুমি কুথাগো—'

'এই মাগী চুপ মার।'

'ওগো তুমি যে ঘরে ছিলে গো।'

'চুপ মার! ভাতারের জন্যে জান হু হু করছে, ছেনালি হচ্ছে!'

শোকরজানের কান্না থামছে না। কার্নিসে পা ঝুলিয়ে উদোম-পাদাম শরীরে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইনোচ্ছে বিনোচ্ছে।

জিকরিয়া তার চুল টেনে ধরে—'সোহাগ, সোহাগ! ধ্যুৎতোর, সোহাগের কাঁতায় আগুন। মড়াকান্না কাঁদচে। সুখে থাকতে দিবেনি।'

'সুখ!' মুকুর মাথায় কথাটা কেমন ঘুরপাক খায়।

'শালা নতুন বে বলে ভাতারের জন্যে আঁকপাঁক। তোদের জন্যে দুনিয়াটা জাহান্নামে গেল।'

কাসেম জিকরিয়ার সিনাতে ঝাঁকানি দেয়—'আবে তোর বউ হাতছানি দিচ্চে বে।'

'সব শালির ঘরের শালিদের ছুঁড়ে ফেলে দোব।'

'আবে শুকনো চাল খাবার তরে তোর ছেলেদের মারামারি লেগে গেছে বে।'

জিকরিয়া চিৎকার করে কাঁচা খিস্তি করল: কাছে গিয়ে ছেলেদুটোর চুল ধরে বেশ ঠোকাঠুকি করে দিল। বেপাড়ার কুকুরের মতো অবলীলায় কার্নিসের বিপদরেখা ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে লাগল।

মুকু পড়ে গেল। না পড়েনি। ওগো ওই জিকরিয়া কার্নিস ধরে সার্কাসের ফর্শা মেয়েমানুষের মতো হাঁটতে লাগল। সে পড়লে মুকুও বুঝি পড়ে যেত।

একটা ছানিপড়া বুড়ি কাকে যেন বলল—'ও বাপ্, মোরা ঘর যাব কখন?'

সে, বিলাত বকস, লাল ছোপ দেড়োর হফিন কাশি জড়িত হা হা হাসে। 'যাবি, তোর আসল ঘরে যাবি। একটুকুনি বাদে। থির হয়ে আল্লা রসুলকে

ডাক।' সেও কার্নিস ধরে সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো হাঁটতে লাগল।

'ও সবুরনের মা, হালা, তোর মুরগি, একমুঠো গম এনেছি তাও খেয়ে নিল?'

সবুরনের মা-র কপালে রেললাইনের রেখা এঁকেবেঁকে গেল। 'একমুঠো গমের জন্যে তোর নিদ ধরচে না মাজলি?'

'ধরবে কেন? এখন মানুষের মাথা মানুষ খাবে। এই মুরগি যদি খাস, শূয়োর খাবি।'

'এই খানকি মাগী আমরা হারাম খাই?'

'যে ব্যাটাখাকিদের মুরগি আমার ছেলের মুখের আহার খায় তাদের ব্যাটাদের অরকেশে হোক!'

'ওলো ওই সাতভাতারি।'

'ওলো সতীন কপালী।'

'ওলো তোর ঘরের মড়া বেরোক।'

'ওলো ব্যাটার ভাতার মাথা খা।'

সবুরনের মা মাজলি কার্নিসের দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

ওহো নুরু ধাঁধা চোখে সার্কাস দেখছে। নাচ দেখছে। সবুরনের মা মাজলির 'যুদ্ধং দেহি' ভাবমূর্তি এক বাস্তব জনজীবনের সাময়িক সময়োপযোগী নব সংস্করণ। হাতে তাদের কোনো মারণাস্ত্র নেই। মুখের অস্ত্র বুকের যন্ত্রণা বিকর্ষিত খেদোক্তি। বেদের হাতে দু সতীনের লড়াই। বেদের অঙ্গুলি সংকোচন প্রসারণে ইত্যাকার নাট্যামোদীদের মনোরঞ্জন সুখ।

ফিসফিসিনি বৃষ্টির হাওয়ায় বেনোজলের বারুদগন্ধ নাকে মুখে চোখে ইন্দ্রিয়ে বুভুক্ষায়। সেই সব কামানের গর্জন-পাথার উদ্ধত শক্তি-সমগ্র পাঁজর চুরমার হা হা তে মেয়েপুরুষের যুগ্ম নৃত্যমুদ্রায় অখণ্ড সৃজনী গ্রামবাংলার মেটে বাড়ির মড়মড়ররর...লাল পানির মধ্যে এই রক্ত আপ্লুত হা হা তে কোন প্রাণ পাওয়া যন্ত্রণা বিদেহী হয়ে মিশে যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্। ঘুটঘুটে আঁধারে আর্ত-নির্ভর মানুষের মধ্যে নুরুও একটা মানুষ হয়ে মিশে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচল ফুটো হয়ে খোকার মাথায় পানি পড়ছে। খোকা কাঁদে না। সেই হানাদারদের ব্যাণ্ডপার্টি ছলাত ছলাত ছলাত ছলাত কর্ণে বুকের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে বিঁধছে। বউ-এর অনেক কাছে সরে এসেছে নুরু। বউকে অনিবার্য স্বরে বলল—'আমাদের ঘরটা পড়ল ফুলু।' এই তার নাম ধরল প্রথম।

'আহ্, কলজেটা ছ্যাদা হয়ে গেল।'

'দ্যাখ্, বুকটায় মোর কে যেন পেরেক সাঁটচে।' বউ-এর হাতটা নুরু নিজের বুকে ছোঁয়ায়।

'মড়মড়মড়রররর...'

মাজলি বুক চাপড়াল। 'ওগো ওই মোদের ঘর পড়লো গো।'

সবুরনের মা চঁ্যাচাল—'না গো উ যে মোদের ঘর গো, দখিন দিক থিকে আওয়াজ এল গো, কলজে মড়মড় করে গো।'

'মড়মড়মড়ররর...'

'শালার ব্যাটা শালা ঘর রে তুই চোখের সামনে পড়ে গেলি।' জিকরিয়া বুক চাপড়ায়।

'মড়মড়মড় র র র...'

'আবে শালার ঘরও সোঁদর মাগের মতন বেজাত হল।' কাসেম চুল ছেঁড়ার মতো রাগে দুঃখে কার্নিসে আছড়ে পড়ে।

নুরুর বউ ফুলু আবেগ প্রেম মথিত শব্দের স্বতোৎসারিত আন্তরিকতায় ইনোয় বিনোয় 'ওগো কলার কাঁদির মতো ধড় ধড় করে কলজে ফাটানো ঘর পড়ছে গো।'

এই সব শব্দে শরীর কাটাছেঁড়ার অর্থে নুরুর অস্ত্রোপচারের অন্তর্গত রূপায়িত। ফুলু কাঁদছে। সে কেবল ফুলুর কাছে নড়ে সরে যায়। সমবেত সংগীতে তার অংশগ্রহণ নেই, সেই সোনাবাহী নারীর গিঁট খুলে সে ছড়ের আঘাতে সংগীত জানে না। শুধু ফুলুর কাছে সরে সরে যায়। ফুলুর কোনো সম্বিত নেই। সে তার সংগীতে মেতে আছে। সে যেন স্বামীর স্পর্শ জানে না। তার ত্বক ইন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শকে ছাড়িয়ে চলে গেছে কোন্ এক কিন্নরীকণ্ঠের মানবীয় যন্ত্রনায়।

'ও বউ বউ, বউ?'

বউ-এর কোনো সাড়া নেই।

'ও ফুলু ফুলু, ফুলু?'

ফুলুর কোনো সাড়া নেই।

'ও ফুলু বউ?'

'হ্যাঁ!'

'তুই কাঁদচিস ক্যানো?'

'কান্না যে বুক ছেঁড়াছিঁড়ি করচে গো।'

'আমি তো আছি তোর ভয় কি ?'

বউ-এর ভিজে চুলের সুতো নুরুর গলায় শিরশিরিয়ে যায়। কচি দুধ খাচ্ছে আরামে। ফুলু আঁচল নিংড়োয়। সে যেন নুরুর বুকে নিংড়োবে। সেই সব চারদিক প্রচণ্ড শব্দের হা হা তে নুরুর কানে ভালো লাগে। বাড়ি পড়ার মড়মড়ানি, মোচড়। অন্ধকারে বেঁচে থাকা কোনো মানুষ-চোখ নিরুদ্দেশ, শুধু কণ্ঠশব্দ বিলম্বিত গতিবেগে প্রাণের পতনের শব্দ দীর্ঘায়িত করছে। এই সব চিন্তার মধ্যে নুরুর অবস্থান, বউ-এর অবস্থান, কচির অবস্থান, আর সকলের অবস্থান ক্ষণস্থায়ী হচ্ছে। বউ-এর অন্তরের মধ্যে সে ঢুকে পড়ছে। কলজে হাতড়াচ্ছে। 'এই বউ তোর কলজেটা মোর মতো কেমন কাটাছেঁড়া দেখি।' বউ-এর অতি নিকটে সুচের মতো প্রবেশ করে চলে সে। তার সংকুচিত ভুরু-ভয়ে জড়সড় অন্তর্দাহ। সে আঙুল ছুঁইয়ে বউ-এর দাবদাহ জরিপ করে। 'এই বউ তোর বুক অংরা হয়ে জলে পুড়ে যাচ্ছে।' সে মুক্ত নয়। ফাঁদে পড়া জন্তু হয়ে ছটফটায়। পা হাতের মুদ্রায় নৃত্যসুখ আনে। নুরু নাচছে। বউ নাচছে। 'এই এই এই এই, এই বউ, বউ বউ বউ।'

'এই নুরু নুরু নুরু ?' জিকরিয়া নুরুর কাছে সরে আসে।

'কি ?'

'তুই একবার আজান দে নুরু।'

'না। অন্য কাউকে দিতে বল।'

'তুই জানিস, আর কেউ জানে নি '

'আমি আমি—'

'দে ভাই একবার, এ আল্লার গজব।'

কানে আঙুল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ভো বাঁকছে চুরছে। 'আল্লাহ-হু আকবর আল্লাহ্...' এই প্রথম যেন তার কান্না এল। সবাই শুনে ফেলছে নুরুর কান্না। বুড়ো ছেলেটা কেঁদে আকুল।

ফুলুর হলদি মাজা শরীর। মিস্ত্রী ঘরের বউ-এর রূপ এরকম হয় না গো। চোখের কোলে কালি। শরীরে কালো কালো ছোপ। কোমর ভেঙে রয়েছে। ভিজে শাড়ি। কোলটুকুকে সুরক্ষিত রাখছে। খোকা মাই চুষছে। ফুলু যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। খোকার মুখটা সরিয়ে দিচ্ছে। খোকা কেঁদে ভাসাচ্ছে। সব সহ্য হয় খোকার কান্না সহ্য হয় না। ফের খোকাকে দুধ দিতে চুপ। নুরুর ইত্যাকার আবর্তিত খানির কাঁচ কাঁচ

শালকাঁটা-কোঁটা ব্যথা হয়ে বেরিয়ে এল। হাত দিয়ে বউকে ছুঁচ্ছে। তার যন্ত্রণাকে ছুঁচ্ছে। কচি হাত-পা ছুঁড়ে খেলছে। আঙুল চুষছে। ফুলুর সঙ্গে অসম্ভব দুর্ঘটনার চোখাচোখি হল। ফুলু বেরিয়ে এল খোলস থেকে। ফুলুর স্বরূপ জেনে ফেলেছে নুরু। চোখাচোখি হলে ফুলুর ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেদনার চকচকে দাঁত বেরিয়ে এল। সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ছে ঠোঁটের সব শাসনকে ভেঙেচুরে। ফুলুর চকচকে সাদা দাঁত দেখছে নুরু। দাঁত বেরুলে হাসে মানুষ। ফুলু কি হাসছে! ফুলুর দিকে আরো সরে যাচ্ছে নুরু। ফুলুকে স্পর্শ করল। ফুলু নুরুর মাথায় হাত বুলোল। চুল টেনে টেনে পানি নিংড়োতে লাগল। তার ফাঁকে ফুলু নুরুর থুতনি স্পর্শ করে দুরন্ত ব্যবধানের স্বরে বলল 'বড্ড খিদা লেগেছে।'

নুরু দুর্ঘটনার মতো বলল—'আমরাও।'

'হায় আল্লা মোরা ভিখিরি হনু গো।'

'সকাল হলে জান যাক ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

'না না না। মোর পাওুলের জন্যি তোমাকে বানে ভাসাব? হায় আল্লা! মেয়েদের জেবন একটা জেবন!'

'ফুলু বুক ফেটে যাচ্ছে, হাত দিয়ে ছাখ্।'

ফুলু নুরুর বুকে হাত দেয়। 'হ্যাঁ, সব দেখে বুকের ভিতরি হাত-পা ঢুকে যাচ্ছে গো।'

'ফুলু কাঁদিসনি যেন, সবাই জেগে রয়েচে, মোর খারাপ লাগবে।'

'জোরে কাঁদতে পারচি কই। চোখ দিয়ে পানি ঝরচে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে বুক হালকা হোতক।'

তার শৈশবের 'জলকের সিলেট জলকে যায়' কিন্তু এ জল যায় না। যেন আরশিনগরের বসত। পীরিত করছে। ভেসে যাচ্ছে মানুষের সবকিছু। যেমন নুরুর হাত-পা বাঁধা। যেমন খোকা আঙুল চুষছে। যেমন ফুলু বলছে তার খিদা পেয়েছে। যেমন মাজলি সবুরণের মা ঝগড়া করছে। যেমন জিকরিয়ার ছেলেদের শুকনো চালের কণা চিবোবার জন্য খুনোখুনি। হেই এসব মানুষে করতে পারে। এ তো কুকুরছানাদের কাজ। মানুষ কুকুর হয়ে গেল গো। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে! মানুষ কাঁদে। এইসব মানুষের জন্মাবধি অভ্যাসের সূত্র নিয়ে তারের ওপর পুতুল নাচায়, পুতুল নাচছে। বেদের আঙুলের সংকোচন প্রসারণ। বেদে বলছে ব্যাটা ভাতারের মাথা খেয়ে হাত নাচিয়ে গালাগাল দে। এক

সতীন তাই করল। অন্য সতীনও আঙুলের ইসারায় নাচের ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষকে হারাতে লাগল। এই সব নৃত্যের মক গড়া হয়ে থাকে।

জিকরিয়া চিৎকার করল—'দ্যাখ্‌রে কাসেম!'

'কি?'

'একটা গরু ভেসে আসছে রে।'

'হ্যাঁ বেশ মোটাসোটা।'

'চল শালাকে জবাই করি।'

'ধ্যুৎ মরে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে রে।'

'দেখবি ছুরি চালালে ছটফট করবে খন।'

'মরা গরুর গোস্ত খাবি জিকরি?'

'শালা নিজেরাই মরে ভূত!'

জিকরিয়া ছাদ থেকে লাফ দিল লাল পানিতে।

সবুরনের মা কাসেমের কাছে সরে আসে। 'ও কাসেম?'

'কি গো সবুর মা?'

'তোরা মরদরা থাকতে মোরা কচি ছেলে বুকে নিয়ে মরে যাব?'

'মর না, ভাসিয়ে দেব লাশ লাল পানিতে।'

সবুরনের মার চোখ ছল ছল করে ওঠে—'আজ চাদ্দিন চার রাত ছ্যাঁওড়-গুলোনকে একমুঠো খেতে দিতে পারি নি।'

কাসেম ছোপঅলা দাঁত বার করে বলে—'তোর খুব খিদা পেয়েচে বল না।'

'হ্যাঁ, কলজেটা ছেঁড়াছিঁড়ি করচে।

'এই নূরু তোদের ভাতের হাঁড়ি থেকে এক থালা ভাত আর এক পেয়ালা পোনামাছের ঝোল দে তো, সবুরনের মাকে খুব খিদা পেয়েচে।'

'কেন ঠাট্টা করচিস কাসেম। বাছুরগুলোন আমার শুকিয়ে।' সবুরনের মায়ের ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে চোপ দেওয়া শিশুর মতো।

নূরু বেঁকে যাচ্ছে। শরীরে ভাঁজ পড়ছে। শরীরের নানা জায়গায় জখম। দাঁড়াতে গেলে বেঁকে যায়। সারা বুক জোড়া তার নদী। সারা চোখ জুড়ে নদী। তো বাঁকাটারা হচ্ছে নেহায়ে পেটানো লৌহ-যন্ত্রণায়। একটা লম্বাটে মানুষ রোগাটে হয়ে আরো লম্বা হয়ে গেল। সে তার শরীরে আর-এক শরীর খোঁজে। তার রক্তে হিমের অণু জড়িয়ে থাকে। তার না বলা কথার বীজ চারা হয়ে জেগে উঠছে। সে চিৎকার করছে। তার কোনো

স্বর বেরুচ্ছে না। এমনিতেই যে চ্যাণ্ডা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে রক্ত কণিকার তপ্ততা বায়ুতে নিষ্ফল ছড়িয়ে দিচ্ছে মনে মনে। তার এই সব খিভিন্ন রঙে চোবানো রক্তিম কাগজের ছায়াছবি বোধ হয়ে বস্তুত বেরিয়ে আসে অভিজ্ঞতা-সমগ্র। বউ-এর কাছে সরে সরে যায়। বউ-এর দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। বউ-এর নরম বুকের মাংসপিণ্ডের ত্বক-ছিদ্র দিয়ে যে খানিক শ্বেত-রুধির বেরিয়ে আসে তা অল্প স্নেহের অবহেলায় খোকার শরীরী প্রয়োজনকে উদ্দীপ্ত করে, জঠরে প্রাণের কণিকাগুলোকে শান্ত করে। এই সব স্নেহলব্ধ সাংগঠনিক মমতায় বউ খিদা পাওয়া বুকে পরিমিতি আনে না। ওহো ওহো ওহো! গুরু অবাক হলো! ফুলু তোর বুকে এত প্রাণ। সে ভাবল খোকার মতো শিশু হয়ে ফুলুর বুকের শ্বেত-পানীয় কিছু পান করে নিই।

'ফুলু ফুলু ফুলু।'

'কিগো।'—

'তোর বুকের দুধ খোকাই শুধু খাচ্ছে, খায়?'

'নাগো আমিও খাই, খাচ্ছি।'

'তোর দুধ তুই কি করে খাস?'

'বোকা!'

'বোকা হয়ে যাচ্ছি না?'

'হ্যাঁ গো।'

'বোধহয় খিদা পাচ্ছে বলেই এ কথা জিগেস করচি।'

'মোর বুক শুকিয়ে গেছে।'

'তবে খোকা চুষচে?'

'অবোধ হয়ে গেছে তাই। ভাবচে পেলেও পেতে পারি।'

'ফুলু?'

'কি বলচ?'

'কিছু না।'

'ফুলু?'

'কি বলচ?'

'কিছু না।'

'ফুলু?'

'কি বলচ?'

'কিছু না।'

কারো পায়ের ফাঁকে সামান্ত জায়গায় ফুলু শুয়ে আছে। খোকাটিকে পুঁটুলির মতো আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করছে দৃষ্টি। নুরু ফুলুর এই সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বোধ যন্ত্রণার মধ্যে বাঁধা টানটান। নুরু নজরবন্দী। ছাদের সব জায়গায় ফুলুর চোখ যায়। নুরু সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো ছুটে যায় ছাদের শেষ প্রান্তে। চোখের মণি খসিয়ে বান মাপে। আবার ছুটে আসে। আবার যায়। আবার ফিরে আসে ফুলুর কাছে। ফুলুর শরীরে যেন তার নাক-মুখচোখ ঘষে দিতে চায়। বান কমছে। 'ও ফুলু তুই ঘুমোচ্ছিস? বান কমে গেল।' ফুলুর শরীরের বিশেষ বিশেষ উপত্যকায় নুরুর ইচ্ছে করে নাকমুখচোখ ঘষতে। বুকের সুখগুলোকে একটা একটা করে গহনার মতো খুলে রেখেছিল পরে ফেলতে চায় সে। বান কমছে বান কমছে। আবার সার্কাসের ফর্সা মেয়েমানুষের মতো কার্নিস দিয়ে ছুটে ছাদের শেষপ্রান্তে গিয়ে বান মাপে। নুরু ছুটোছুটি করছে, ফের ফিরে আসছে ফুলুর কাছে।

জিকরিয়া বান-পানিতে সাঁতার দিয়ে তরতরিয়ে চলে গেল। বাঁধে লাইন দিয়ে রুটির প্যাকেট আনল। কাসেম গেল, সেও আনল। বিলাত বকস আনল। আরো অনেকে আনছে। নুরুও গেল সাঁতরে। ফিরে এল হাতে রুটির ভিজে প্যাকেট নিয়ে। সকলে রুটি খাচ্ছে। সকলে হাসছে। খেলছে। নাচছে। সকলে জড়াজড়ি করছে। বান কমছে বান কমছে। পোঁটলা বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। মাজলি, সবুরনের মা কার্নিস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দুজনের চোখাচুখি হলো। দুজনে গলা জড়িয়ে ধরল।

সবুরনের মা ইনোচ্ছে—'ওগো মাজলি কুথায় যাব গো।'

মাজলি আরো জোরে সবুরনের মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে যায়। 'ওগো মাথা গুঁজবার খোপটাও চলে গেল গো।'

বেদে দু' সতীনের গলা জড়াজড়ি করে থলের্য় পুরছে।

নুরু ফুলুর কাছে চলে যায়।—'ফুলু খা।'

ফুলু উঠে খেতে লাগল।

জিকরিয়ার ছেলে দুটো হঠাৎ, নাটকের বিশেষ জায়গায় হাততালি দেবার মতো, হাততালি দিল। নুরু ফুলু চমকাল। যেমন আকাশে পায়রা উড়ছে। পায়রা উড়ছে পায়রা উড়ছে। ওহো হেলিকেপ্টার উড়ছে। নুরু ফুলুর শরীরের

আরো কাছে সরে সরে থাকছে। মুক আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গড়াচ্ছে দু-জনে। মাথার ওপর হেলিকপ্টার। মুক ফুলু দৌড়াদৌড়ি করছে। ফুলুর পা পিছলোল। মাচুলে পা নিয়ে বসে পড়ল ফুলু। মুক ফুলুর পা স্পর্শ করছে। ফুলু পায়ের আঙুল ভেঙে যাওয়া যন্ত্রণায় প্রথম জোরে কাঁদল—'ওগো আমাদের কি হল গো!'

গিরগিটি

প্রবীর নন্দী

ওরা থম হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। রসুল আর ছিদাম। রসুলই প্রথম টের পায়। তারপর দেখাদেখি ছিদাম। অনেক ডাঁটাকলমি আর কালকাসুন্দি ঝোপের মধ্যে ব্যাপার-স্যাপার। অদূরে চলটা ওঠা ভাঙা কালভার্টের পায়ের কাছে দামবাধা ঝোপ, উপুড় করা। অনায়াসে ধাঙড়দের শুয়োরের বাথান হতে পারে সেখানে। আর তার দু পাশে তড়বড়িয়ে বয়ে গেছে আই-আর-এইট ধানের ক্ষেত, ভূ-বিস্তৃত সুখের মতন। মধ্যিখানে এই সরু লম্বা জায়গাটা আবাদহীন। যাতায়াতের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য। সবাই জানে, ৭১নং নিশিন্দা মৌজার এই পথটা এখন ভূগোল।

পলকা হাওয়ায় দুলছিল ডালপালা। রসুল আখুটে চোখে ইতিউতি করতে থাকে। ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন একটা খসখস শব্দ বিঁধে আছে, কাঁটার মতন। রসুল খরগোশের মতন কান পাতে বাতাসে। ফালাফালা করে দেখে নেয় ভিতরটা। চকিতে হৈ-হৈ করে ওঠে রসুল। দূরে সরে আসে। বাপস! উলটোদিকে ভাবলেশহীন বড় একা তাকিয়েছিল ছিদাম। শালার ছিদামটা যেন কী! চোখ ঘুরিয়ে তড়িঘড়ি নিজের শরীরের দিকে তাকায়। হাতের রগগুলো কেমন কেঁচোর মতন জড়িয়ে ওম দিচ্ছে, বিশ্রীরকম। দু চোখ উসকে তৎক্ষণাৎ রগের উপর আলতো চাপ দেয় সে। চিনচিন করে ওঠে হাতটা। ক্ষীণরক্তধারা টের পায় রসুল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ হয়।

'এ্যাই ছিদাম, উই ছাখ—'

'তিনবার বুকের ভেতর থুতু দে রসুল।'

ভয়ডর পেলে শালা ছিদামটা ওইরকম বলে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। হাতের তালুতে খানিকটা ধুলো নিয়ে ফুঁ দেয়। ফুঁ ফুঁ ফুঁ—। ব্যস, তাতেই ভয়ের নিকেশ সারা। পারার মতন ভয় শরীর থেকে হুস্ করে নেমে যায় যেন। রসুলের গা-পিত্তি জ্বলে ওঠে তখন। মাথার মধ্যে চিরিক দিয়ে আগুনের হল্কা বয়ে যায়। মনে হয়, গদাম করে একখানা লাথি কষিয়ে ইস্তক পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দেয়। কিন্তু আদপে তার ভাবগতিক

অন্যরকম। যা ভাবে তা করতে মন সরে না। ছিদামের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তখন হাতেপায়ে কেমন খিল ধরে আসে। ধীরে ধীরে শম্বুকগতিতে ভয়টা ভর করে যেন। ছিদাম সেই ভয় নামানোর মন্ত্র জানে; ভয় তার বশ, রসুল শুনেছে।

'এ্যাই ছিদাম—'

কি?

'উই ভাখ—'

'তিনবার মন্ত্রটা আওড়ে যা—'

'ওতে শালার কি হয়?'

'ভয় শরীল থেকে নেমে যায়।'

'চোপ্ কর শালা! ভয়ের মুখে মুতে দেই তোর, বুঝলি।'

রসুল হঠাৎ-ই ফটাস করে রেগে যায়। ছিদাম রোদ পোহানোর ভঙ্গিতে ভাঙা কালভার্টটার উপর বসে রকম-সকম লক্ষ্য করে। ট্যাঁকে গোঁজা কৌটো থেকে একখানা বিড়ি বের করে ধরায়। ভুক ভুক করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। রসুল দূরে দাঁড়িয়ে আতিপাতি করে খুঁজতে থাকে। নাড়িয়ে নাড়িয়ে জঙ্গল ঘোলা করে। আশেপাশে কোথাও মটকা মেরে পড়ে আছে দেখ। রসুল খু-উ-ব সাবধানে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেখে নেয় ভিতরটা। গাছ-গাছড়ার ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়। নাহ্, শালা কোথাও নেই।

'এ্যাই রসুল—'

'হুঁ।'

'বিড়ি খাবি একটা?'

'আছে?'

ছিদাম আরো একখানা বিড়ি বের করে রসুলকে ডাকে, 'তো এদিকে আয়। ও শালার খুঁজে পাবি না।'

রসুল খুঁটির মতন মেরুদণ্ড সোজা করে তৎক্ষণাৎ ছিদামের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'কেন? খুঁজে পাব না কেন—যাবে কোথায়?'

'ওরা রঙ পালটায় রসুল।'

রসুল ছিদামের পাশে এসে বসে। হাত-পা ছড়িয়ে বিড়ি খেতে লাগে। এতক্ষণ শালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের কলজে শুদ্ধু ব্যথা ধরে গেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে কোমরের হাড়খানা মটাস করে ফাটায় রসুল। বেশ আরাম লাগে। ছিদাম ইস্তক মন খারাপ করে বসে আছে। কী ভাবছে কে জানে।

রসুল আরো একবার লম্বা টান দিয়ে আধপোড়া বিড়িখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জিভটা শুধুমুদু তেতো হয়ে গেল। বিশ্রি! হঠাৎই রসুলের সারা শরীরটা কেমন ঝ ঝ করে গুলিয়ে উঠে। জিভের তলায় একগাদা থুতু জমে যায়। রসুল হট্ করে সেটা গিলে ফেলে।

মুখ ব্যাদান করে রসুল বলে, 'মাটির মতন রঙ, চটচটে গা—কেমন টিকটিকির মতন দেখতে নাহ্?'

'হুঁ।'

'ওরা কিন্তু রক্ত খায় ছিদাম!'

'জানি।'

আর তৎক্ষণাৎ কেমন আশ্চর্য বোধ হয় রসুলের। শালা ছিদামটার তবু ভ্রূক্ষেপ নেই এতটুকু। মরণ-বাঁচন নেই যেন। গা-গতরে রক্ত না থাকলে মানুষ মরে, একা রসুল কেন—গাঁয়ের সবাই জানে এ কথা। হালিম মিঞার সারা শরীর গাঁদা ফুলের মতন হলুদ হয়ে পটাশ করে মরে গেল একদিন। রসুল দেখেছে। আর তখনই ভিতরের ঘর-গেরস্থালি সব শিরশির করে দুলে উঠে। কাঁপন ধরায়। বারেক হাতের উপর আলতো চাপ দেয় সে। চিন্‌চিন্ করে ওঠে হাতটা। চোখ ঘুরিয়ে পরক্ষণেই আবার ছিদামকে লক্ষ্য করে। ইচ্ছা হয়, পাঁচ-আঙুলে ছুঁয়ে দেখে একবার। আলতো চাপ দেয়। হাত বাড়িয়ে ফের কেন জানি আবার হাত গুটিয়ে নেয় রসুল।

'ছিদাম—'

'হুঁ।'

'খালি হুঁ হুঁ করছিস যে! কি ভাবছিস?'

'একটা গন্ধ টের পাচ্ছিস রসুল?' রসুল অবাক হয়ে ছিদামের মুখের দিকে তাকায়। নাক টানে। বাতাস শোঁকে।

'পাচ্ছিস?'

রসুল আরো জোরে বাতাস টানে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। আবার ছেড়ে দেয়। ফের আবার বাতাস টানে। আবার হুড়মুড় করে ছেড়ে দেয়। রেচক কুম্ভক খেলতে থাকে।

'কি মনে হচ্ছে তোর?'

'ধানের গন্ধ—নাহ্!'

'হুঁ। কলমার গায়ের গন্ধ—' বলেই ছিদাম উদাসভরে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে।

'বটে। খেতের কাছে এলেই তুই যে বড় ধানের গন্ধ পাস—আমি কিছুই বুঝি না, নাহ্—? এই যে আমারে মাঝেমধ্যেই শুনিয়ে শুনিয়ে জয়া পদ্মা কলমা রত্না ঝিঙেশালের কথা বলিস সে কিসের জন্য?'

'মেলা ফটর ফটর করিস নে রসুল। আর তুই বড় স্যাঙা সাজাছিস! নিজেরটা চেপে গেলেই হল! দিন নেই রাত নেই এসে এসে এই যে খালের পাড়ের জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুরুৎ ফারুৎ বাতাস টানিস—ছাড়িস, ভরন্ত ধানের পেটে হাত বুলিয়ে একা একা বিড়বিড় করিস—সে তোর কিসের জন্য, বল্?'

রসুলের বুকজোড়া রাগ আল্‌গা হয়ে পড়ে তখন। নিজের কথা নিজে বলতে পারে না। হড়কে যায়। ছিদাম রসুলের কথা না-বলার মানে বোঝে।

'বল্ না—সে কিসের জন্য?' ছিদাম আবার চাঁওড় দেয়।

'জানিস যখন তুই-ই বল?' রসুল উত্তর করে।

'আমি কেন বলব, তুই বল—'

রসুল তবু কিছুই বলে না। ছিদামের মুখ থেকে কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করে যেন।

'বটে। তখন তোর ভাতের কথা মনে পড়ে জানি।'

'ছিদাম—' রসুল ভীষণ গর্জে উঠে আবার পরক্ষণেই শান্ত হয়। ৭১নং নিশিন্দা মৌজার তৌজি নম্বর ১২। বারো। দাগ নম্বর ৩৩২, ||০ (আট) আনায় ৩১ শতক। অত্র স্বত্বের দখলকার রায়ত শ্রীছিদাম মণ্ডল পিং মৃত হরিকৃষ্ণ মণ্ডল সাং নিজ। রসুল জানে, আজ বছর চারেক জমিটা বাঁধা পড়ে আছে গাঁয়ের রামদুলাল মশায়ের কাছে। সে-ই ৩৩২-এর ৩১ শতক ফসল ঘরে তোলে। দেনার দায়ে এখন ছিদামের মানুষ বাঁধা দেওয়ার উপক্রম। সুদে-আসলে দুশো ছুঁইছুঁই। তবু রামদুলাল মানুষটা ভালোয়-মন্দয় কেমন যেন। ছিদাম ঠিক বোঝে না।

দেখা-সাক্ষাৎ হলেই বাবু বলেন, 'ছেদাম—মনে আছে নাকি ভুলে গেছিস, র‍্যা?'

'নাহ্, মনে আছে।' ছিদাম জবাব দেয়।

'তোর জমিটার দাগ নম্বর কত হে যেন?'

আর তৎক্ষণাৎ ছিদামের যেন সব গুলিয়ে যায়। এলোপাথাড়ি চিন্তার জট পাকাতে থাকে মাথার মধ্যে। সারা শরীরে মুক্তোর মতন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠে। আলজিভে তেষ্টা পায়। বারবার ঢোক গিলতে ইচ্ছা করে।

মনে করে বলে, '৩৪২'।

'৩৪২!'

'নাহ্ ৩২২।'

'২২!'

'৩৩২।' ছিদাম পাঁশুটে মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

'কত শতক?'

'বিঘাটেক হবে বাবু।'

'বড় বাড়িয়ে বললি যে ছেদাম।'

ছিদাম লজ্জা পায়। ফের মুখ নিচু করে বলে, 'না বাবু বাড়াব কেন—সীমানা তো আছে।'

'জানি। তবু শুনতে চাইছি কত শতক?'

ছিদাম বলে, 'এ্যাই ধরুন গে ৩০ শতক।'

'তিরিশ!' রামদুলাল ফিকফিক করে হাসেন। মজা পান।

ছিদাম দ্রুত শুধরে নেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে, '৩১ শতক।'

'এই তো পারলি। লেগে-পেগে একাকার, বোকা!' একটু থেমে রামদুলাল মশাই আবার যোগ করেন, 'তো অনেকদিন তো হল। আর কদিন এভাবে পরের কাছে ফেলে রাখবি? পরের জিনিস গচ্ছিত রাখা সে কি কম ঝক্কি নাকি, অ্যাঁ! এই ভাবি নতুন কিছু আইন পাশ হল, সব ধান বুঝি ছোটলোকেরা কেটে নিয়ে গেল...ভাবতে ভাবতে দিন কাটে, রাত কেটে যায় আমার। এখন হাই ব্লাডপ্রেশার। তোর জমি তুই ফিরিয়ে নে আমাকে রেহাই দে।' বলেই রামদুলাল ছিদামের ভ্রূযুগলের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন। 'অত টাকা কোথায় পাব বাবু?' কেমন আর্তের মতন শোনায় ছিদামের কণ্ঠস্বর।

'অত কোথায়! দু শোর মতন তো।'

'দু-শো'! ছিদামের চোখদুটো চিকচিক করে জলে উঠে। আবার

পরক্ষণেই তা নিতে যায়। বলে, 'জমি ছাড়ানোর মতন আমার যে আর কিছুই নেই বাবু—'

'নেই বললেই নেই, হাঁরে। ঘরে তু দুটো মানুষ মাত্তর—তুই আর তোর বউ। ছেলেপুলেও তোদের হয় নি কিছু। নিজে অন্ধ বলে জগৎটাও অন্ধ ঠাওরালি নাকি, অ্যাঁ!'

'বাবু কি যে বলেন—'

'ছেদাম, মিথ্যে বলিস নে—ঘরে জমি ছাড়ানোর মতন তোর মূলধন আছে, আমি জানি!'

'বা-ব-উ—'

'চোপ্ কর হারামজাদা। খোঁজ, খুঁজে ছাখ—' বলেই রামদুলাল হনহন করে চলে যান। ছিদাম বসে-বসে উথাল-পাতাল ভাবতে থাকে।

'এ্যাই ছিদাম—'

'বল্?'

'জমিটা এবার ছাড়িয়ে নে—'

'বাবুটাও তাই বলে।'

'আমি বাবুর কথা বলছি নে, আমি আমার কথা বলছি। ছাড়িয়ে নে—'

'হুঁ।'

ছিদাম ভাঙা কালভার্টটা ছেড়ে একসময় উঠে দাঁড়ায়। রসুলও। ওরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। ডাক্সা-কলমি আর কালকাসুন্দি ঝোপের ভিতর ঘন অন্ধকার। রসুল আর ছিদাম দু জনই নজর ফেলে ঝোপটা দেখে একবার। নাহ্, শালার কোথাও নেই। ছিদাম একটা ঢিল কুড়িয়ে আলতোভাবে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। ঢিলটা শব্দ করে মাটিতে পড়ে। ততক্ষণে রসুল সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় আরো খানিকটা। ছিদাম পা চালিয়ে ওকে ধরে।

ডাকে, 'রসুল—'

'হুঁ।'

'মনে পড়ে সে বছর ধান হল গে বাইশ মণ। সারা বছর খেয়ে-দেয়ে আরো বিক্রি বাট্টা হলো—'

রসুল মাথা ঝাঁকায়। বলে, 'সে বছর আমিও ফসল পেলাম হারাহারি। জয়া আর পদ্মা—'

'বটে। বউ দু খানা ডুরে শাড়ি কিনল একসাথে লাল।' খুশিতে ঝলমল করে উঠল ছিদাম।

'আর আমার বউ বিয়োল সেবার। দু বেলাই তখন ভাত চাপল হাঁড়িতে। হা-হা।' আনন্দে রসুলও ডগমগ হয়ে বলল।

'সে বছরটাই ছিল আলাদা।'

'হুঁ। ভাত-কাপড়ের কোনো চিন্তাই ছিল না।'

'বটে। তারপরই সব ওলটপালট হয়ে গেল যেন—'

'হুঁ। পরপর দু সন অজন্মা গেল। কিছুই হলো না।'

হঠাৎই ওরা নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ভীষণ। চোখমুখের হাবভাব দ্রুত পাল্টে যায়। ভুরু কুঁচকে উঠে। থমথম করে হাওয়া।

চলতে চলতে রসুল আবার একসময় সবাক হয়, 'এ্যাই ছিদাম—'

'বল্‌?' ভারি বিমর্ষ শোনায় ওর কণ্ঠস্বর।

'তোর জমিটা যাহোক এবার ছাড়িয়ে নে—'

ছিদাম আড়-চোখে রসুলকে লক্ষ্য করে। কেমন অবাক হয়। বলে, 'আর তুই? নিজে ভাগী থেকে উচ্ছেদ হলি সে যে—'

চমকে রসুল সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। টান টান ধনুকের ছিলার মতন। ছিদামও দাঁড়িয়ে পড়ে কখন। চোখে চোখ রেখে বলে, 'উচ্ছেদ করলেই হলো যেন, হ্যাঁ! গাঁয়ের সবাই জানে তেরো বছর বাবুমশায়ের খালপাড়ের জমির বর্গা আমি—আর এখন উচ্ছেদ করলেই হলো! মগের মুলুক? তুই ভাখে নিস ছিদাম, ও জমির পরচা আমি নিবই—' বলেই ও আবার হাঁটতে থাকে। পিছনে পিছনে ছিদামও। মাঠ পেরিয়ে দূরে তখন দেখা যায় একফালি ছোট ওদের নিশ্চিন্দাপুর গ্রাম।

ভারতীয় জীবনে ও মননে শিল্পের স্থান

নীহাররঞ্জন রায়

দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে যে-সব শাস্ত্রগ্রন্থ, যেমন ভট্ট লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত—প্রভৃতি পণ্ডিতদের রচনা, তার কালসীমা ৭০০ থেকে ১০০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এঁরা সকলেই লিখেছেন কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে এবং এঁদের রচনাতেই প্রথম গুরুত্বের সঙ্গে কাব্যের আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ও উত্তর সন্ধান করা হয়েছে। এই আলঙ্কারিক-দের তত্ত্ব সম্প্রসারিত করে দৃশ্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রয়োগ করা যায়। এরা শিল্পের মর্মবস্তু, শিল্প-অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এবং শিল্পের প্রয়োজন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেন। এই পণ্ডিতেরাই, বিশেষ করে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এ-তাবৎ শিল্পের অবয়ব সংক্রান্ত এবং অকাদেমিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনার ধারাকে প্রায় একটা দার্শনিক প্রস্থানে উন্নীত করেন। তবুও স্বীকার করতে হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের পণ্ডিতরা যে তত্ত্বসৌধ নির্মাণ করলেন তার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল বহুশতাব্দী আগে ভরতের হাতে। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, শিল্প-অভিজ্ঞতা একটি বাস্তব আনন্দানুভূতি। শৃঙ্খলাময় শিল্পরূপের প্রভাবে জাত এক মানসিক-শারীরিক উপলব্ধি। এ আনন্দানুভূতি শিল্পবস্তুর কোনো গুণ নয় এবং শিল্পরূপ বিশ্লেষণ ও বোঝার চেষ্টা সফল হলেও শিল্প আস্বাদনের অভিজ্ঞতা কখনো বিশ্লেষণ করা যায় না, সে বিষয়ে কোনো ধারণা গঠন করাও যায় না। পরবর্তী পণ্ডিতদের সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়েছে এখান থেকে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্-এর উপরে লেখা যশোধরের টীকা—যাতে প্রথম শিল্পের ষড়ঙ্গ, নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা হয় এবং দৃশ্য-শিল্পের ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়—তারও রচনাকাল দশম শতাব্দী।

আনন্দবর্ধনের বক্তব্য ছিল, শিক্ষিত নৈপুণ্য বা উপস্থাপনার দক্ষতা শিল্পের মর্মবস্তু নয়, শিল্পের মর্ম নিহিত 'ধ্বনি'-তে, ভাবাবহ জাগাবার শক্তিতে। তাঁকে অনুসরণ করে অভিনবগুপ্ত নৈয়ায়িক-ব্যবহারিক বিচার-পদ্ধতির পথ বর্জন করে 'ভাব' সম্পর্কে একটি সুষম তত্ত্ব গড়ে তুললেন। ফলে শিল্প ও শিল্প-অভিজ্ঞতা মানবিক অনুভূতির বিষয় রূপে স্বীকৃতি পেল। শিল্পবস্তুর

রূপগত বৈশিষ্ট্য বিচারের পরিবর্তে শিল্পী ও সামাজিকের সৃজনবৃত্তি, পরাদৃষ্টি ও কল্পনাবৃত্তির দিক থেকে শিল্পের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা শুরু হল। তখন থেকে বক্তব্য দাঁড়ালো, নৈপুণ্য ও ছন্দোবোধ থেকে সম্ভব হয় শিল্পের শরীরগত বা রূপগত বৈশিষ্ট্য সম্পাদন কিন্তু শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করে শিল্পীর প্রতিভা বা সৃজনশক্তি, তার পরাদৃষ্টি ও কল্পনা। নৈপুণ্য ও ছন্দোবোধ, প্রকৃতপক্ষে প্রকরণিক দক্ষতা ও উপকরণের সহায়ে কাজটি নিষ্পন্ন করার ক্ষমতা—কাব্যের উপকরণ শব্দ, সংগীতের উপকরণ ধ্বনি, নৃত্যের উপকরণ দেহের গতিভঙ্গি, ভাস্কর্যের উপকরণ পাথর।

প্রাচীন ও নবীন শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যে সাধারণভাবে যে পার্থক্য দেখা গেল তা থেকে এবং আমাদের কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মতো মূর্ত শিল্পের বিকাশধারার দৃষ্টান্তে কখনো কখনো আমার মনে হয়, প্রাচীন ও নবীন তত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কি অংশত হলেও আমাদের শিল্প-সাহিত্য বিকাশের ইতিহাসের দ্বারাই, তাঁদের সাক্ষাৎ শিল্প-অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়নি? উচ্চাঙ্গের মূর্তশিল্পের মধ্যে প্রাচীন তত্ত্ববিদদের সামনে ছিল মৌর্য-রাজসভার পরিপোষণে জাত শিল্প, পাঁচ শতাব্দী ধরে তৈরি পাথরে খোদাই করা বৌদ্ধ কাহিনী, অগণিত পোড়া মাটির কাজ এবং গুপ্ত যুগের সূচনা কালের শিল্পবস্তু; শেষোক্ত অংশ মোটামুটিভাবে প্রাচীন তত্ত্ববিদ্‌দের সমসাময়িক হওয়ায় হয়তো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি বা পরিপূর্ণ ও যথার্থভাবে বুঝবার চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু বিপুল পরিমাণ পাথরে খোদাই প্রতিরূপ ও কাহিনী বর্ণনাত্মক ভাস্কর্য, পোড়ামাটির কাজ এবং চরণচিত্র বা নানা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আঁকা জড়ানো পট তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল মনে হয়। সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁদের সামনে নিশ্চয়ই ছিল বীররসের কাহিনী বা প্রেম কাহিনী নিয়ে রচিত লৌকিক 'গাথা' এবং পরিশীলিত নাগরিক স্তরের নাটক, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ও ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা। প্রাকৃতে লেখা চতুর্ভাণ জাতীয় ছোট আকারের প্রহসনধর্মী রচনার কথাও হয়তো জানা ছিল। ভামহ ও দণ্ডীর মতো পণ্ডিত নিশ্চয়ই কালিদাসের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এসব রচনার কাব্যিক উৎকর্ষ ও নাট্যগুণ সম্পর্কে ধারণা হয়তো খুব ছোট পরিশীলিত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তখনো এগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের কাজ শুরু হয়নি। স্থাপত্য ও চিত্রকলায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের সৃষ্টি সম্পর্কেও এই একই কথা সত্য মনে হয়, অর্থাৎ তখনকার

শিল্পতাত্ত্বিকদের চেতনায় সমসাময়িক উচ্চাঙ্গ শিল্পের কোনো গভীর প্রভাব ছিল না। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ও প্রাচীন পণ্ডিতদের শাস্ত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হবে বর্ণনাত্মক ও প্রতিরূপ শিল্পের দিকেই এঁদের মনোযোগ একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে খুব সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্ণনাধর্মিতা ও প্রতিরূপধর্মিতাই ছিল পঞ্চম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য ও মূর্তশিল্পের বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের শিল্পে প্রধান অর্জনীয় বিষয় ছিল স্পষ্টতা ও অর্থবোধ, মানপরিমাণ ছন্দ ও সামঞ্জস্যে যথাযথ প্রতিরূপ সৃজন এবং পর্যাপ্ত প্রকরণিক দক্ষতা। এ থেকে বুঝতে পারা যায় কেন প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দ ও অর্থ, ব্যাকরণ ও অবয়ব, ছন্দ ও অলংকার—অর্থাৎ কাব্য বা নাটকের রূপগত গঠনের উপরে এত গুরুত্ব আরোপ করতেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্-এও সাধারণভাবে শিল্পের এই রূপগত শরীরগত বৈশিষ্ট্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃত হয়েছে দেখা যায়।

কিন্তু নবীন আলঙ্কারিকেরা, বিশেষভাবে ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত যখন কাব্য ও নাটক বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করেন, তাঁদের শিল্প-অভিজ্ঞতার পশ্চাৎপটে ছিল সমগ্র ক্লপদী সংস্কৃত সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ বা মেঘদূতের মতো রচনার দৃষ্টান্তে তাঁদের মনে হয়েছে, শুধু প্রকরণিক দক্ষতার এবং রূপগঠনের গুণাগুণ বিশ্লেষণে এসব সৃষ্টির আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না ; এ ভিন্ন বস্তু, এ ক্ষেত্রে রূপ-গঠনের নিপুণতা জাগিয়ে তোলে এক ভাবানুভূতির আবহ। মূর্তশিল্প বিষয়ে যশোধরও মোটামুটিভাবে একই সিদ্ধান্ত করেছেন।

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্ ॥

চিত্রের এই যে ছয়টি অঙ্গ তিনি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে চারটি,—রূপ-ভেদ-প্রমাণ-সাদৃশ্য-বর্ণিকাভঙ্গ রূপগঠন সংক্রান্ত, যা শিল্পবস্তুর শরীরগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে। কিন্তু অপর দুটি, ভাব ও লাবণ্য—শিল্পের আত্মারই ধর্ম। সারনাথ বা মথুরার ভাস্কর্য, বাঘ ও অজন্তার চিত্রকলা, এলোরা ও এলিফ্যান্টার উৎকীর্ণ শিল্প—অর্থাৎ ভারতীয় মূর্তশিল্পের মহত্তম ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যশোধর তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন মনে করা যায়।

এতক্ষণ যেসব শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে সবই রীতিবদ্ধ, ছকে ফেলা আলোচনা। লেখক বা সংকলকেরা শিল্প ও শিল্পবৃত্তিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছেন। তারপরে বিষয় ও উদ্দেশ্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গুণাগুণ, প্রকৃতি ও মর্মের দিক থেকে তার উপকরণ ও প্রকরণ, প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোনো শিল্পবস্তুর সামনে এলে আরও মৌলিক প্রশ্ন মনে আসতে পারে। যেমন কোনো প্রস্তর-ভাস্কর্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে :

> এই বস্তুটি আমায় আনন্দ দিচ্ছে এবং একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা জোগাচ্ছে। কিন্তু মূলে এটি ছিল একখণ্ড পাথর, জড়বস্তু ; এতে প্রাণ সঞ্চারিত হল কী ভাবে? কী করে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু হয়ে উঠল?

যদি শিল্পী এই রূপান্তর সাধন করে থাকেন তবে তিনি কীভাবে তা করেছেন? শিল্পী যদি নির্মাতা বা বিষয়ী হন এবং নির্মিত শিল্পবস্তুটি যদি শিল্প-বিষয় হয়, তাহলে শিল্পবিষয়টি কি পাথরের টুকরোর মধ্যেই নিহিত ছিল অথবা শিল্পীর মনে ও কল্পনায় বিধৃত ছিল? অথবা উভয়ত্রই বিদ্যমান ছিল এবং পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় আকার ও রূপ পেয়েছে?

> শিল্পবস্তু একটি নির্মিত রূপ। রূপহীন পাথরের টুকরো যা জড়বস্তু মাত্র, তা থেকে এই শিল্পরূপটি উদ্ভবের বিকাশ পদ্ধতি কী? অর্থাৎ রূপ ও বস্তুর সম্পর্ক কী?

এসব প্রশ্ন সৃজনপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত এমন সব সমস্যা সূচিত করে যা আমাদের শিল্পশাস্ত্রে-অলংকারশাস্ত্রে উত্থাপিত হয় নি, তাই সেখানে এর কোনো উত্তরও পাওয়া যায় না।

এ রকম আরও প্রশ্ন উঠতে পারে

> শিল্প 'নাম' ও 'রূপ'-এর জগতের বিষয়, যা 'কাম' বা সৃজনবাসনার এলাকার ব্যাপার। ভারতীয় ঐতিহ্যে মোক্ষ ও নির্বাণকে অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে বাসনা নির্বাপনকে, 'নাম' ও 'রূপ'-এর অতীত কোনো লোকে পৌঁছনোকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে আসা হয়েছে। তাহলে ভারতের সমস্ত ধর্মমতে শিল্পকলাকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপায়

হিশাবে ব্যবহার করা হয়েছে কী করে? মোক্ষ ও নির্বাণ যে প্রত্যাশা করে তার পক্ষে শিল্পের উপযোগিতা কী?

যদি ধরে নেওয়া যায়, ব্যবহারিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে শিল্পের উপযোগিতা স্বীকৃতি ছিল—তাহলে শিল্পের ভূমিকা কী ছিল এবং কী ধরনের দৃষ্টিতে শিল্পকে দেখা হত?

এ জাতীয় সাধারণ প্রশ্নেও পূর্বোক্ত শিল্পশাস্ত্র থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

এর কারণ সন্ধানে বেশি দূর যেতে হয় না। রূপ ও উপকরণ, বিষয়ী ও বিষয়, শিল্পী ও শিল্পসামগ্রী, সৃজন-প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ক প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসামূলক এবং দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত। মনে হয়, খৃস্টীয় অব্দের সূচনা অবধি এই দুই ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল তা মেনে নিয়ে পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় আলোচনা চালানো হয়েছে। ভারতীয় শিল্প বিষয়ে কোনো পর্যালোচনায় সেইসব সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, এখানে আমি সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করব।

যারা মোক্ষ প্রত্যাশী বা মোক্ষলাভ করেছিল তাদের পক্ষে শিল্পের কোনো উপযোগিতা ছিল কিনা—প্রথমে এই প্রশ্নটির মীমাংসা করা যেতে পারে। সকলেই জানেন অন্তত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে ভারতে 'মোক্ষ' বা বৌদ্ধ পরিভাষায় 'নির্বাণ' ছিল মানব অস্তিত্বের চরম আদর্শগত লক্ষ্য। শিল্পের জগৎ যে 'নাম' ও 'রূপ'-এর সীমায়, মোক্ষদশার অবস্থান তার বিপরীতে 'নাম'-হীন অ-রূপ কোনো লোকে। মোক্ষপথের পথিকদের তাই শিল্পের প্রতি সাক্ষাৎ বা দূরতম কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। বস্তুত কোনো কোনো প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় শিল্পকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বাধাই মনে করা হয়েছে। যতদূর জানা যায়, মতবাদের দিক থেকে আদি বৌদ্ধধর্মের ও জৈনধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি এই ধরনের ছিল।[১] দুই ধর্মেই সঙ্গীতকে মনে করা হত মোহ সঞ্চারী, 'মুহূর্ত-সুখ' প্রদায়ী; অন্যান্য শিল্পকেও ইন্দ্রিয় সুখের উৎস ও বাসনা তৃপ্তিকর মাত্র মনে করা হয়েছে। হয়তো এই ধারণার জন্যই বুদ্ধদেব তাঁর আবাস চিত্রালঙ্কারে সাজানোর আপত্তি করেন। অনেক পরবর্তীকালে বুদ্ধঘোষের উল্লেখ থেকে মনে হয়, জীবনের কোনো একটা পর্বে বুদ্ধদেবের মত পরিবর্তিত

হয়েছিল, চলচ্চিত্র বা জড়ানো পট সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং চিত্র বা ভাস্কর্যকে মনন ফল বলে বিবেচনা করেছিলেন। তবুও একথা সত্য যে সন্ন্যাস আশ্রিত আদি বৌদ্ধধর্ম সাধারণভাবে শিল্পের প্রতি বিরূপ ছিল। এই একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল শংকরভাষ্য নির্ভর বেদান্ত দর্শনে। এই মত অনুযায়ী 'নাম' ও 'রূপ'-এর এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া মাত্র, ভ্রমভ্রান্তির কারণ। শিল্প যেহেতু 'নাম' ও 'রূপ'-এর এলাকার ব্যাপার তাই পরামুক্তি যারা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের পক্ষে শিল্প পাশস্বরূপ।

কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে বৌদ্ধ ও জৈন এবং বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আশ্রিত জীবনধারা থেকে বিপুল পরিমাণ শিল্পসামগ্রীর উদ্ভব হয়েছে, যার একটা বড়ো অংশ উচ্চতম নান্দনিক শর্ত পূরণ করে। এটা কী করে সম্ভব হল?

আমার বিশ্বাস এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যেও বেশি দূর যাবার প্রয়োজন হয় না।

বৌদ্ধ ও জৈন দুটি ধর্মই ছিল সন্ন্যাস আশ্রিত এবং উভয় ধর্মে যে সংযমবিধি নির্দিষ্ট হয়েছিল সে শুধু উভয় সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয়, বৃহত্তর বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচরণবিধি মোটের উপর অনেক বড়ো ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ গ্রামীণ-সমাজ ও উপজাতীয় সমাজ থেকে কিছু পৃথক ছিল না। তাছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ, জৈনদের চেয়ে বৌদ্ধরাই বেশি,—ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের আকৃষ্ট করার দিক থেকে এবং নিজেদের পুরাণ-উপকথা, প্রতীক-প্রতিমা প্রচারের পক্ষে শিল্পকে একটা প্রত্যক্ষ ও কার্যকর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মতো মূর্ত শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষার চিরাচরিত উপায় ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষু নেতৃবৃন্দ এক সময়ের মতবাদগত বাধা সরিয়ে রেখে এই সব পদ্ধতির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন।

আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মতাদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরামুক্তিবাদের মোকাবিলা করা হয়েছিল। উপনিষদে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে, যেমন কঠোপনিষদে, যেখানে বলা হয়েছে যে ইহলোকে জীবৎকালেই 'মুক্তি' অর্জন সম্ভব। পরলোক সম্পর্কে পুরনো বিশ্বাসের জের যা মানুষকে ইহজীবনের বাস্তবতা বিষয়ে নিরুৎসুক ও অতত্ত্বাপরায়ণ

করে তোলে এবং নানা ধরনের ও নানা মাত্রার তপশ্চর্যার পোষকতা করে—কখনোই ভারতীয় মানস সম্পূর্ণভাবে তার প্রভাব মুক্ত হতে পারে নি ঠিকই। তবুও মানা হয়েছে এবং বেশ জোর দিয়েই বলা হয়েছে যে-কোনো নিষ্ঠাবান মানুষের পক্ষে বাস্তব জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতার বাধা পেরিয়ে এই জগতেই, এখানেই মোক্ষ অর্জন সম্ভব। বস্তুত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ ব্রাহ্মণ্য নীতিবিদ্যা ও মনোবিদ্যায় এ আদর্শ উচ্চতম জীবনাদর্শ রূপে স্বীকৃত হয় এবং সাধারণভাবে ভারতীয় জীবনদৃষ্টিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। একে বলা হত জীবন্মুক্তির আদর্শ ;—কোনো লোকান্তরে নয়, এই জীবনেই মুক্তি অর্জন।

ভারতীয় জীবনে, বিশেষ করে নৈতিক ও শিল্প বিষয়ক ধারণা গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে জীবন্মুক্তির আদর্শের প্রভাব সুগভীর। এ বিষয়ে হিরিয়ান্না বলেছেন, 'এই আদর্শ ভারতীয় মানুষের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি রূপান্তরিত করেছে এবং নৈতিক আদর্শ নতুন ছাঁদে গড়ে তুলেছে।...জীবনের লক্ষ্য আর ইহলোকের পরপারের অভিষ্ট বলে ধারণা করার প্রয়োজন রইল না, ইহলোকে, চাইলে বর্তমানেই উপলব্ধি সম্ভব মনে করা হলো। স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি দমন করে নয়, তাদের পরিশুদ্ধ ও পরিস্রুত করে সামঞ্জস্যময় জীবন অর্জন করাই এই নতুন আদর্শ।...এ আদর্শ সাধনের জন্য অনুভূতির পরিশীলন প্রাথমিক প্রয়োজন এবং ফলত জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য হিশাবে বুদ্ধিচর্চা বা ইচ্ছাশক্তি বিকাশের দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হলো না, যতটা দেওয়া হলো অনুভূতি কর্ষিত করে তোলার উপরে।' (M. Hiriyanna, *Art Experience*, Mysore, 1954, P 4 অনূদিত)। শিল্প-বৃত্তি ভিন্ন আর কোন্ মানবিক বৃত্তির সাহায্যে সার্থকভাবে অনুভূতির পরিশীলন সম্ভব? তাই আমাদের শিল্পশাস্ত্রে 'ভাব' ও 'রস' সম্পর্কে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের দিকে এবং শিল্পের মাধ্যমে ভাব ও রস সুষ্ঠুভাবে জাগানো ও নিয়মন-সংযমনের দিকে এত যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তা আদৌ অযৌক্তিক নয়। আমাদের ইতিহাসের আদিতম পর্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছিল শিল্প আত্মসংস্কৃতির উপায়। প্রধানত অনুভূতি ও আবেগের দিক থেকে আত্মোৎকর্ষ সাধন, গৌণত বুদ্ধির দিক থেকে।

ইরান জার্নাল ঃ তাব্রিজে

দরবেশ

প্রকাণ্ড জানলার ধারে বিছানায় শুয়ে আরাম করে প্রভাতি চা খাচ্ছি। আকাশছোঁয়া ফাইভ-স্টার হোটেল। আকাশেরই মাঝ মধ্যিখানে আমার ঘর। কাচে ঢাকা বিরাট জানলা। হাত বাড়িয়ে জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে দিই। আকাশে ম্লান একখানি চাঁদ। জানলার বাইরে রাজপথে বরফ পড়ছে। বরফ পড়ছে তো পড়ছেই। উষাকণের আলোয় তাই দেখছি। একটু পরেই আকাশের নিচু দিয়ে শব্দ করে উড়বে ব্রাউন-নীল সেই সব পাখিরা যাদের নাম আমি জানি নে। রাস্তা গড়িয়ে দৈত্যাকার একটা ট্যাঙ্ক যাচ্ছে। মুখে যেন মোটা একটা অশ্লীল চুরুট। অটোমেটিক মেশিনগান্।

হামাগুড়ি দিচ্ছে মিলিটারি ট্যাঙ্ক। মেড ইন ইংল্যাণ্ড।

জানলার পাল্লা খুললেই শুনতে পাব ফজরের নমাজ পড়ার ডাক। শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে।

কালকে একজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু। বয়েস বছর চল্লিশের কাছাকাছি। তার একটা ছাপাখানা ছিল। পৈতৃক কারবার। বন্ধুবান্ধবদের কথার ফেরে পড়ে সে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিল। মাত্রই সাহিত্য পত্রিকা। সেইটেই হয়েছিল তার কাল। পত্রিকায় 'হেমলেট' 'মেকবেথ', আর 'রিচার্ড থার্ড' বিষয়ে একটি নিবন্ধ ছেপেছিল সে। সে নাকি জানত না শেকস্পীয়ারের এই বই তিনটি শাহেনশাহি আইনের এদেশে বাজেয়াপ্ত বই। বাজেয়াপ্ত, কারণ, এই তিনটি গ্রন্থে নাকি রাজাকে হত্যা করার উসকানি আছে। বন্ধুবরের কাগজে নিবন্ধটি ছেপে বেরোনো-মাত্র পত্রিকার দপ্তরে সাভাক-পুলিশ হানা দেয়। সাপ্তাহিকটার অপমৃত্যু কেন ঘটল সেটা যেন বোঝা গেল; কেন আমার বন্ধুকে এক বছরের মেয়াদে কয়েদখানায় রাখা হলো তাও বুঝলাম। কিন্তু প্রেসটাও তুলে দিতে বাধ্য হয় আমার বন্ধু। জীবনে এমন একটি অবসর আসবে ; ভাবতেও পারে নি সে। ফার্সীভাষায় যাকে নজরবন্দ বলে, সে এখন তা-ই। আন্-অফিশিয়েলি।

যাই হোক, প্রেস-ট্রেস তুলে দিয়ে বন্ধুটি বর্তমানে একটি বাতিক নিয়ে

খাত। বাতিকটা হলো, কোথায় কোন শহরে কোন জেলায় কি ধরনের আড্ডা জমে তার প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা। রীসার্চ ওয়র্ক। বাতিকটা নিয়ে সুখেই আছে সে। অন্তত একজন সম্পাদকের চাইতে যে সুখী তার আর বলার কী।

কালকে যখন তার ডেরায় হাজির হয়েছি, ইয়ার-বকশীদের নিয়ে তখন সেখানে একটা মিনি আড্ডা চলছিল। বিষয়: আড্ডার ধরন। গোটা ইরানে এখন নাকি আড্ডাগুলো আগেকার চেয়ে মজাদার হয়ে উঠেছে। আগেকার চেয়ে আরো ব্যঙ্গপ্রবণ। আড্ডাবাজদের মানসিক গঠনভঙ্গিই নাকি আমূল পালটে গেছে। ট্র্যাজেডিকেও এখন নাকি কমিক করে দেখতে শিখছে আড্ডাবাজরা। সংবাদ টিপ্পনি যাই পরিবেশিত হোক না কেন আড্ডায়, বাগবৈদগ্ধের দরুন সবেতেই বেজাজি রূপক ব্যবহার হয়। ফলে ট্র্যাজেডিও ব্যঙ্গের উপাদান হয়ে যায়।

আড্ডার আকর্ষণ এদেশের সর্বত্রই একটা জব্বর টান। জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলে তবেই বোধ হয় আড্ডাবাজ হওয়া সম্ভব। বন্ধুর ওখানে বসে জমিয়ে আমিও আড্ডা দিচ্ছিলাম, একসময় বন্ধুটি আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গম্ভীরস্বরে বলল, দরবেশ, বলতে পারো আমাদের কী দশা হবে? তোমাকে সত্যি বলছি, বড়লোকেরা এদেশে এখন শাহেনশার দেখাদেখি সোনা দিয়ে গড়ছে তাদের পায়খানা; অথচ পাকা পায়খানার অভাবে আমরা এখনো মাঠেঘাটে গিয়ে প্রাতঃক্রিয়া করে আসছি! জানো, আমার পেছনে আবার শাহেনশার সিকরেট পুলিশ পড়েছে? যাই হোক, হয়ত দু-এক দিনের মধ্যেই আমি হাওয়া হয়ে যেতে বাধ্য হব। তখন আমার খোঁজ কোরো না কিন্তু। তাহলে তুমিও খামোকা ফ্যাসাদে পড়বে। বুঝলে?

ফ্যাসাদে পড়া বন্ধুর আড্ডা থেকে চলে এসেছিলাম পিন্টুদের মুসাফিরখানায়। যা বুঝেছি, তাব্রিজে শিগগির একটা কিছু হাঙ্গামা ঘটতে যাচ্ছে। হিচহাইকের পিন্টুরা পথের মাঝে যদি কোনো বিপদে পড়ে? পিন্টু তো আর একা নয়, সঙ্গে রয়েছে একটি বাঙালি মেয়ে।

শুয়ে শুয়ে চা খেতে খেতে দেখছি জানলার বাইরের দৃশ্যটা। দিগন্তে আকাশ-ছোঁয়া বরফ-শাদা পাহাড়ের তরঙ্গ। শাদার ওপর আছড়ে পড়ছে রক্তিম আভার বন্যা।

বাইরে এখন আর বরফ পড়ছে না। আজ তাহলে রোদ উঠবে।

ফাঁকা রাস্তা। গাধার পিঠে একটি তরুণী যাচ্ছে। এরই মধ্যে ভিখিরিরাও রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এই শীতের মধ্যে ঠাণ্ডায়। খবরের কাগজের বাণ্ডিল ঘাড়ে ছুটছে হকাররা।

নাঃ, আর শুয়ে থাকা নয়। এবার উঠে পড়ি।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলাম। গমগম করছে ডাইনিং রুম। বিজনেস্ রিপ্রেসেনটেটিভ, কোম্পানীর মালিক, ইউরোপীয় কারবারী। তাব্রিজে আধুনিক কলকারখানা বসেছে। আর সেকেলে পাথুরে গুহুজ-টুম্বদের তাব্রিজ এখন নয়; লোহালক্কড় কংক্রীটের বানানো হাই-লাইফের তাব্রিজ: ইয়া লম্বা-লম্বা পাইপ লাইন দিয়ে এই পথে কোটি কোটি টাকার গ্যাস যাচ্ছে রাশিয়ায়।

হোটেলে মার্কিনী স্টাইলের বাচ্ছন্দ্য বিখুঁত। বেশির ভাগ বাসিন্দেই আমেরিকান। কি জানি, এই হোটেলের মালিকও বোধহয় রাজপরিবারেরই কেউ। সম্ভবত শাহেনশা স্বয়ং। দেশে-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ওঁদের কোটি কোটি টাকার পেল্লায় পেল্লায় সম্পত্তি। এত সম্পত্তি দিয়ে কী করবে ওরা? মরবার দিন সঙ্গে নিয়ে যাবে সব সম্পত্তি?

ওদিকের টেবিলে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে মার্কিন ব্যাবসায়ীরা। ওদেরই পাশে ভারতীয় একজন রাজপুরুষ। কালকে আমি ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়েছিলুম। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যদি জানত আমি সাংবাদিক তাহলে বোধকরি মুখ ফেরাত না।

কি ছিল আর দেখতে দেখতে কী হয়ে গেল তাব্রিজ। শাহেনশাহি আধুনিকতার হুজুগে পড়ে এখানেও ক্যাবারে পর্যন্ত খোলা হয়েছে। তাতে ইজিপ্ট থেকে আনানো নাচনে-ওয়ালিদের বেলি ডান্স হয়। কাপড় খোলা নাচ।

শহরের যত্রতত্র মার্কিনি স্টাইলের পানশালা, ডিস্কোথ। স্পোকন্ ইংরেজি শেখার ইস্কুল। বুকস্টলে 'প্লে-বয়' ম্যাগাজিন। সিনেমা হলে সেক্সি ছবি।

তাব্রিজি ছেলেমেয়েরাও আর আগের মতো পিছিয়ে নেই। মার্কিনি সভ্যতার সঙ্গে দ্রুত পাল্লা দিচ্ছে। পারছে কী পাল্লা দিতে? এদেরই তো একজন কালকে আমাকে বলল, দেখছেন, দেশের কি রকম হোলসেল কালচুরাল বাস্টার্ডাইজেশন?

বাস্তবিকই, দিনকাল দ্রুত বদলাচ্ছে। কোন দিকে?

উটকো একটা মন্তব্য আস্তে করে উচ্চারিত হলেও আমার কানে সেটা ধাঁ করে এসে লাগল। আমার পাশের টেবিলে এরা ইরানী। বয়েস কম। স্থানীয় দৈনিকপত্র 'বাহে আজাদি'-র প্রথম পৃষ্ঠায় শাহেনশার প্রকাণ্ড ছবি। ছবিটা দেখতে দেখতে একজন ছোকরা মন্তব্য করল, 'এঁর বাপেরই মতো এঁরও দিন ফুরিয়ে আসছে। অতি-বাড়ের ফল সব দেশেই এক।'

ছেলেটার কী কোনো ভয়ডর নেই? গুপ্ত পুলিশের কেউ শুনতে পেলে জন্মের মতো শেষ এই ব্রেকফাস্ট খাওয়া।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি বাইরে বেরুচ্ছি, রিশেপশনের স্মার্ট এবং 'মড' মেয়েটি কেক-পেস্ট্রির সুন্দর একটা বাক্স আর দুখানা টিকিট দিল আমাকে। সিনেমা যাওয়ার টিকিট নয়; এরজুরুম যাওয়ার ইনটারন্যাশনাল বাস টিকিট। আগামী কালকের ডেট। শিলটুদের জন্যে বলে রেখেছিলুম। ঝটপট এই রিশেপশন-মেয়েদের কাজ। লক্ষ্মী মেয়ে।

রাস্তায় রূপোলি রোদের ফুলঝুরি। দালানকোঠাগুলো যেন আলোর ঢেউয়ের ওপর ভাসছে। দোকানপাটের ঝাঁপি এখনো খোলে নি। কালকে এমন সময় শিলটুরা চলে যাবে ককেশাস পাহাড়ের ঐতিহাসিক রাস্তা বেয়ে, যে রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে পরম সাহসী কিন্তু চরম উদ্ধত আর্যরা এসেছিল ভারতে; ধর্মে দর্শনে বিজ্ঞানে আলোকিত করেছিল ভূমণ্ডল।

এই বিশ্বের যত ঔদ্ধত্যতারও প্রপিতামহ কি তাঁরাই?

শিলটুদের মুসাফিরখানায় এসে দেখি ছোট্ট একটি স্টোভে ওরা চায়ের জল চাপিয়েছে। আমাকে দেখে বেজায় খুশি। ফুটন্ত জলে আরেক মগ জল ঝট ঢেলে দিল।

খোঁপা খুলে পিঠে চুল ছড়ানো স্বাতীর মুখখানি ভারি মিষ্টি।

বিদেশে স্বজাতিকে পেলে এত ভাল লাগে। তাও আবার কুরুপাণ্ডবের পূর্বপুরুষের এই তাব্রিজে।

চা পেস্ট্রি খেতে খেতে শিলটু বললে, 'জয়বেশদা, এত করে তো দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ফিরে গিয়ে চাকরি-বাকরি না পেলে সমস্ত প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে।'

শুনে বুকটা কেমন করে উঠল। জানি তো, আমাদের দেশে চাকরি পাওয়াটা নিতান্তই একটা লটারি। বললাম, 'কেন পাবে না চাকরি। নিশ্চয়ই পাবে।'

'আপনি বলছেন, কিন্তু ভরসা যোটেই পাচ্ছিনে। পুরো তিনটে বছর

কষ্টে একেবারে মরে যাচ্ছিলাম ; তবু চাকরির টিকি দেখি নি। কি করে যে বন্দর-আব্বাস পর্যন্ত জাহাজের মাস্তুল জুগিয়েছি আমিই জানি।'

মনটা কেমন অসাড় হয়ে গেল। এই মুসাফিরখানায় একবার আমিও আস্তানা নিয়েছিলাম। সামনের ফুটপাতে ফুলের দোকানটার মালিক আমার চেনা। এই মালিকের বন্ধু একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে আমারও ভাবসাব হয়েছিল। বড়ই সরল ছিল তার মন। তেমনি ছিল সে দিল-দরাজ। জাতে আরমানি। স্বেচ্ছায় আমার দোভাষী হয়েছিল। আজারবাইজানের ভাষাটা রাষ্ট্রভাষা ফার্সী থেকে কিছুটা ভিন্ন। যেমন হিন্দির সঙ্গে বাংলার প্রভেদ, তেমনি। পরের বারে এখানে এসে শুনেছিলাম আমার আরমানি বন্ধুটি তার বইয়ের কালেকশান আর কারপেট বেচেবুচে বিবিবাচ্চা সমেত আরমেনিয়ান প্রজাতন্ত্রে চলে গেছে।

আসলে আরমেনিয়ান প্রজাতন্ত্রে চলে যাওয়ার খবরটাই ছিল নিছক একটি পুলিশি গুজব। সাভাক-গুপ্তপুলিশ এই গুজবটির জন্মদাতা। তাব্রিজে এখন আর কারো অজানা নয়, সাভাক-পুলিশ যন্ত্রণা দিয়ে মেরে সাবাড় করেছিল এই পরিবারটিকে। পুলিশের গুজব অনুসারে আমার এই বন্ধুটি ছিল নাকি 'ছুপে রুস্তম'—লুকিয়ে লুকিয়ে কমিউনিস্ট।

কিন্তু তিন বছরের তার সন্তানটি তো আর রাজনীতি বুঝতো না ; বুঝতো না কেন রাজপরিবারের সকলে এদেশে সোনার পায়খানায় হাগে আর সাধারণ মানুষের ভাগ্যে পাকা একটি পায়খানাও জোটে না। তাকে কেন রাজরাজেশ্বর শাহেনশার পেয়ারের গুণ্ডারা মেরে ফেলল ? আর আমার বন্ধুর অন্ধ স্ত্রী ? তাকে কেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করান হল ?

দূর ছাই, মনটা মুষড়ে গেল।

তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম। শিল্টুদের দেখিয়ে আনলাম ঐতিহাসিক আর্ক, যেখানে শুরু হয়েছিল এদেশে শাহেনশার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। দেখিয়ে আনলাম নীলা মসজিদ। বাজার। বিখ্যাত সেই বাজার যা হাজার বছর আগেও ঝমঝম করত দিশি-বিদেশি কারবারিদের কেনাকাটায়।

চার-চারটে দেশের মিলনতীর্থ এই তাব্রিজে বোধহয় বাজার শব্দটার জন্ম। শব্দটা তারপর গিয়ে ঠাঁই পেয়েছে আমাদেরও অভিধানে। বাজার মানে মেলা। সবার সাথে সবার যেখানে মিলন হয়।

ঝং দেখেচেখে দু'পাশে দোকানঘরের সার দেওয়া বড় রাস্তায় একটা

গলিতে ঢুকে কলের গানে ফিল্মী গীত শুনতে শুনতে দুপুরের আহার। মৌরুলি-ভাজা দিয়ে ফুলো-ফুলো নানরুটি। রুটি ভেড়ার মাংস দিয়ে দুধের মতো শাদা ভাত। দুধার ডালনা বাখিয়ে পাতলা-পাতলা রুমালি রুটি। কাবাব তাফতান। গজ-মিষ্টি। মোরব্বা। আঙুরের পায়েশ। আর দই।

আজারবাইজানিরা দই খেতে এত ভালোও বাসে। নাস্তায় দই, দুপুরের খাওয়ায় দই, বিকেলে শুধু মুখে দই, রাত্তিরে দই। দই চাই এদের ঘড়ি-ঘড়ি। এই দইয়ের দরুন এদের নাকি এত লম্বা আয়ু। আর মেয়েরা দেখতে কেমন স্বাস্থ্যবতী ?

এক ঝিলিক হাসল স্বাতী, 'এমন পেট পুরে যে কবে খেয়েছিলাম ভুলেও গেছি। ক'দিন ধরে যা খেলাম। পরশু রাত্তিরে, কালকে দু'বেলা। আর এই আজ এখন।'

শুনে ভারি কষ্ট হল। আবার এও ভাবলাম, ভরপেট খেয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ইট-পাথরে গড়া দেশ দেখায় বাহাদুরি আছে ; তবে সেটা করেন এক্সচেঞ্জ হাতানোর কারসাজি। আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে মুসাফিরি করার সঙ্গে নিজস্ব একটা হয়ে ওঠা আছে। সেই হয়ে ওঠায় যে আনন্দ যে অভিজ্ঞতা যে সার্থকতা তার তুলনা কই ?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাস্তায় নেমে বললাম, 'এবার তোমরা দু'জনে একা একা একটু বেড়াবে, না এই বুড়োকেও সঙ্গে চাই ?' আমার কথায় কুলকুল করে হেসে ফেলল দু'জনাতে। স্বাতী বলল, 'আপনি বললেন, আর অমনি সখের বুড়ো মানুষকে ছেড়ে দিলাম ?'

সাধারণ একটা সুতির শাড়ি-পরা মেয়েকে সকলে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। এমনটি এরা দেখেনি কখনো।

কাজ আমারও আছে। দু-একজন পরিচিতদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে। তাদের একজন সাংবাদিক। অতঃপর সরকারি কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাত করার আছে। জীবিকার তাগিদে।

ঠিক ছায়। আজও আমার ছুটি। ওটা নয়, এটাই আমার জীবন।

খানিকটা পথ এগিয়ে স্বাতী বলে, 'বড় মজা তো, এখানে দই ছাড়া দোকান দেখিনে।'

বাস্তবিক, তাব্রিজের দই দেখলে তাক লাগে। দই-অন্ত প্রাণীদের জন্যে

কনফেকশনারদের শো-উইণ্ডোর মিলবে রকমারি দই। দই আর কুকিজো-খিচি ভাজা, পেস্তা ভাজা, খোবানি কিসমিস মনাক্কা।

সোনার গয়নার দোকানে বসে একজন বচ্চের বাবা খেলছে দোকানদারের সঙ্গে। মাদুলি-তাবিজের দোকানদার গুড়ুক-গুড়ুক শটকা টানছে। পুরনো হাঁড়ি-কলসির দোকানে বেজায় ভিড়। পাশ ফিরে পাস বাঁধানো রাস্তায় লাঠি ঠুকে ঠুকে যাচ্ছে অন্ধ এক ভিখিরি বুড়ি। 'ইয়া আল্লা, মেহেরবান!' গায়ে ছেঁড়াকোঁড়া একটা চট জড়ানো। খালি পা।

শীতকাল। ককেশাস পাহাড়ের শীতল পথ। তার ওপর খালি একজোড়া পা। ফেটে-ফুটে চৌচির। যেন আমারই মায়ের পা। মা। তুমি তো দেখো নি তাব্রিজ।

সঙ্গে এখন পরভিন থাকলে হয়ত সে এখন নিজের মনে ভাবত, বিবেকের গলা যদি না টিপে ধরি, তাহলে প্রশ্ন করতেই হয়, জাতীয় সম্পদ পেট্রল থেকে মাথা পিছু প্রত্যেক ইরানী মানুষের যে সাড়ে চার হাজার টাকা আয়, এই বুড়ির পাওনা টাকা প্রাপ্য টাকাটুকু হাতে পেলেই তো অন্ধ এই থুথ্‌থুড়ে বুড়ি পায়ের ওপর পা রেখে দিব্যি আরাম—সে ঘরে থাকতে পারে!

যাই বলো, পরভিনের সঙ্গে বেশ মজার মজার কথা হয় এই বাজার। বেশি কথা বলে না পরভিন। অথচ না বলেও যেন অনেক কিছু বলে ফেলে সে। তেলের দরুন দেশে তো এখন অগাধ টাকা। সেই টাকার বেশ কিছুটা শাহেনশা নিজের ব্যক্তিগত একাউন্টে পাচার করছেন, কোটি কোটি টাকার পেল্লায়-পেল্লায় সম্পত্তি কিনছেন আমেরিকায়, বিলেতে, ফ্রান্সে, দক্ষিণ আমেরিকায়, সুইজারল্যাণ্ডে, এমন কি স্পেন দেশেও; এমন কোনো ইরানী কারবার ব্যবসাই নেই, যাতে শাহেনশার মোটারকম শেয়ার নেই। শাহেনশাহি লোলুপতার এই উদাহরণটা পরভিন সুন্দর একটি তুলনার মধ্যে ফুটিয়ে ছিল। তুলনাটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

কথা বলার ধরনটাই পরভিনের অমনি। যা বলার বড়ই সংক্ষেপে হঠাৎ করে বলে। যেমন, আমি এবার যেদিন তেহরান থেকে রওনা হই, সে বলল, ফিরে আসুন, দেরীউশ শায়েগাম পড়াবো আপনাকে।

দেরীউশ শায়েগাম? তিনি আবার কে? তেহরানবাসী তিনি একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। তাঁর বক্তব্য, ইন দি ইরানীয়ান ক্যারেক্টার নিরাকরণ অলওয়েজ হ্যাপন্‌স্ অ্যাট দি লাস্ট মোমেন্ট। শেষ মুহূর্তেই ইরানী চরিত্রে নিরাকরণ্ ঘটে যায়।

বোকো ব্যাপার! দেরীউশ শায়েরের ওই একটি কোটেশন মিলেই তো ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারতাম। তাঁর সমগ্র রচনা আমাকে অত করে পড়তে হবে কেন? কি জানি, পরভিন সম্ভবত কোনো নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আছে।

স্বাতী শুধোলো, 'বাটা কোম্পানি এখানেও নাকি একটা নতুন শো রুম খুলবে?'

'তার শো রুমেও দই থাকবে।' চুকুমুখে শিলটু বলল।

'ধ্যাৎ!' ঠোঁটের কোণে হেসে স্বাতী টুপির দোকানটা ছাড়িয়ে চলে গেল যেখানে দোকানপাটের ফাঁকে ফাঁকে বরফ-ছাওয়া ককেশাস পাহাড়ে রোদ পড়ে সূর্যের সাত রঙ ঝিকমিক করছে। আবার তখুনি আমাদের পিছিয়ে থাকতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল। দুই কানে শাদা পাথরের সাধারণ দুটি দুল—আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে জেনেও স্থির করল বড় ঘরের কেরানী না হয়ে দেশ দেখবে, বিশ্বের মানুষ দেখবে, যদি পারে তো হাতে-কলমে কিছু কাজ শিখবে। বাড়ির ছোট মেয়ে। আগুপিছু না ভেবে চোখ কান বুজে বেরিয়ে পড়েছে কারুর কথা না শুনে।

পশমের একটা টুপি কিনলাম! কালকে দেখেছিলাম, শিলটুর কান দুটো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে কালচে ধরে গিয়েছিল। শিলটু কিছুতেই নেবে না আমার কেনা টুপিটা—শিলটু এম. এস. সি. পাশ করে দাদার সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকত। পাসপোর্ট আপিসে গিয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। চাকরি খোঁজে; যে কোনো চাকরি। দেখল অচেনা একটি মেয়ে পাস-পোর্ট নিতে এসেছে। স্বাতী।

বিস্তর ঝোলাঝুলি করতে হল, তবে টুপিটা নিয়ে কাঁধের ঝুলিতে যত্ন করে রাখল শিলটু। সূর্যের আলোয় মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। স্বাতীর বেলাতেও তা-ই। কান ঢাকার চামড়ার ওড়না ও নেবে না। কিছুতেই না! কখ্খনো না। কেন মিছিমিছি খরচ। এত দামী জিনিস। বাব্বা, কী দরকার?

দরকারটা আমার।

বললাম, রাস্তায় যে কেমন ঠাণ্ডা পড়ে মালুম হবে। এরজুরুমকে সাধে কি আর বলা হয় এদিককার সাইবেরিয়া?

সেও এক বিচিত্র দেশ।

খোজা নসরুদ্দিন না কার যেন জমানায়। শীতকালে একবার নাকি

তেকেফু ঁড়ে বরফের কনকনে ঠাণ্ডায় কার হাবেলির ছাতে, কি কুক্ষণে একটা মিনিবেড়াল উঠেছিল। এক পা খাড়া করে যেমনভাবে কার্নিশে উঠে দাঁড়িয়েছিল অবিকল তেমনিভাবেই ঠাণ্ডায় বিলকুল জমে গিয়ে একদম কুলফি হয়ে গিয়েছিল বেড়ালটা। যেতে যেতে শীতের পর যখন বসন্ত এল, সেই হাবেলির রাস্তায় যাচ্ছিল গোঁফে তা দিয়ে একটা হুলো বেড়াল। তার ডাক শুনে মিনি বেড়ালটা আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে ম্যাঁও বলে এক লাফ দিতে পেড়েছিল।

গল্পটা শুনে শিলটুরা খলখলিয়ে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে স্বাতী বললে, 'আপনার বন্ধু, যার হাবেলিতে গিয়ে ওখানে আমরা উঠবো, তিনিই তো আপনাকে গল্পটা বলেছেন? তা আপনার বন্ধুমশাই কী করেন নিরিবিলি ওই সাইবেরিয়ান শীতে?'

মেয়েটি সমঝদার। বললাম, 'করবে আবার কী। আপন মনে থাকে, আর মাঝেমধ্যে কবিতা-টবিতা না কি যেন লেখে-টেখে।'

'যা ভেবেছিলাম। কিন্তু মাঝে মধ্যে পেটে তো কিছু দিতে-টিতে হয়? চলে কী করে?'

'ওর স্ত্রী কবি নয়। সে ঠিকেদার। আমেরিকান আর্মিকে পনির মাখন মাখন দই সাপ্লাইয়ের ঠিকেদারি।'

ঝকঝকে রোদের মধ্যেই চাদরের ওড়নাটা মাথায় পরে নিয়েছে স্বাতী। ওর চোখের পাতা ভিজে ভিজে।

বিকেলের দিকে বটানিক্সের পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় কাচুমাচু মুখে স্বাতী জিগেস করলে, 'আচ্ছা দরবেশদা, আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?'

কিছুই না ভেবে বলি, 'পোস্তো চচ্চড়ি, সোনামুগের ডাল আর গরমা-গরম ভাত। তার সঙ্গে যদি আলুভাজা জোটে তাহলে আর কথা কী।'

মনে পড়ল আমার দুঃখী মাকে। দুঃখী এবং সুখী মায়ের হাতের রান্না। স্বাতী বললে, 'এই সেরেছে, পোস্তো, সোনামুগের ডাল—বলুন ওসব এখানে পাই কোথায়?'

'এখানে সব পাওয়া যায়। তেলের টাকায় সুন্দরবনের বাঘের দুধও।'

ট্যাক্সি করে গেলাম বিখ্যাত বাজারে। কারো ওজর আপত্তিতে কোন কর্ণপাত না করে কিনলাম ডাকব্যাক দু জোড়া গামবুট। দেখলাম ভ্রাম্যমান ভারতীয় রাজকর্মচারী মশাই বাজার উজাড় করে কিনছে রাজ্যের সাকসারি

শুভ্রস্, আমাকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে বললে, 'শুনলাম আপনি নাকি জর্নালিস্ট'— দেঁতো হাসি হেসে আমি কাট মারলাম।

পোস্ত কিনল স্বাতী। মুগের ডাল কিনল। দেরাদুনের ফাইন রাইস। বেছে বেছে নৈনিতালের আলু কিনল স্বাতী।

রাত্তিরে যা খেলাম তার স্বাদ আমার জিভে লেগে থাকবে। আঃ, মায়ের হাতের রান্না যেন। কোথায় লাগে ইরানী কাবাব কোর্মা।

কালকে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর স্বাতী আমাকে বলেছিল, তেহরানে থাকবার সময় একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করেছি, এদেশের মেয়েরা পলিটি-ক্যালি দরুন কনশাস্।

এই কথা বলেই পরক্ষণে নিচুমুখে বলেছিল, 'যখন দেশে ফিরে যাবো, ফিরে তো একদিন যাবোই, লোকেরা তখন আমার যাচ্ছেতাই নিন্দে করবে।'

—'নিন্দে? নিন্দে কেন? কিসের নিন্দে?'

—'এই যে একা একা এভাবে বেরিয়েছি, ঘুরছি দু-জনে মিলে।'

অনেক যে দেখেছে শুনেছে সেই আবদেল হলে এর জবাব দিত, লোকে নিন্দে করে—নিন্দে করতে ভালোবাসে বলে : অনিন্দনীয় কিছু যে একটা চায় তা নয়। আমিও ওই কথাই স্বাতীকে বললাম।

আজকে এখন খেয়েদেয়ে একটু গল্পসল্প করে রাত দশটা নাগাদ মুসাফির-খানায় ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝুরঝুরে তুষারপাতের মধ্যে যখন ফিরছি, বলা তো যায় না পরদিন হয়ত আজই হুট করে এসে গেছে, সামনের ফুটপাতে ফুলের দোকানের এদিকে এসে হঠাৎ চমকে উঠলুম।

রাস্তাটাকে একদম ঘেরাও করে ফেলেছে সশস্ত্র মিলিটারি ব্যাটেলিয়ন। আমার হোটেলের পথ বন্ধ!

সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা—গোপাল হালদার অরুণ, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০০০৯ মূল্য ৮'০০।

সতীনাথ ভাদুড়ী আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি পাঠক ও সমালোচকের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতাধন্য একথা বহুবিদিত এবং সতীনাথের প্রতিষ্ঠার ভূমিকে যারা প্রশস্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপাল হালদার প্রথম না হলেও, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ রায়ের পরই অনিবার্যভাবে তাঁর নাম উচ্চারিত। সতীনাথ বিষয়ে গোপাল হালদারের আকর্ষণ-উৎসাহ-অনুসন্ধিৎসা প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানেই আত্মক্লান্ত হয়ে পড়ে নি বরং বরাবরই সক্রিয়। এবং এই বর্ষীয়ান্ সমালোচকের অগ্রণীশোভন অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর বহন করছে 'সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও সাধনা' নামক গ্রন্থটি। সম্ভবত সতীনাথ বিষয়ক গোটা বই লেখার দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য ; যতদূর জানি, অন্যতম অগ্রগণ্য গোপাল হালদারই এ বিষয়ে প্রথমতম।

গোপাল হালদারের এই বইটি সতীনাথ সম্পর্কিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই বলে আমাদের সপ্রশংস মনোযোগ দাবি করবে নিঃসন্দেহে ; কিন্তু সুদৃশ্য তন্বী বইটির সূচিপত্রের দিকে তাকালেই আমরা তাঁর আলোচনার পরিধিপ্রবণতাবোধ চিন্তার ধারণা করতে পারি অনায়াসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম 'সতীনাথ বক্তৃতামালা'-র প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা অবলম্বনে প্রাগুক্ত বইটি রচিত। সতীনাথের জীবনের আবশ্যিক তথ্যগুলি, কালের মাত্রা ও সংঘাত, পরিজন-পরিবেশ কথা, সতীনাথের উপন্যাসের ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের ভাববস্তু-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যের রূপকল্প ও প্রযুক্তির তাৎপর্যান্বেষণ, জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা ইত্যাদির যৌগপদ্যে মানুষ ও সাহিত্যিক সতীনাথের সামগ্রিক কাঠামোটিই গোপাল হালদারের অন্বিষ্ট। আর এই কাঠামোয় 'তাঁর কালের তাঁর দেশের বিশেষ মানবআধারে সকল কালের সকল দেশের জীবনসত্যের ও মানব সত্যের' (সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, পৃঃ ১১) প্রতি সতীনাথের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সজীবতাই অভিব্যক্ত পায়।

সতীনাথের ব্যক্তিত্বগঠনে পরিজন-পরিবার-পরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁদের ঠাকুরমা, রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই পরিবারের শিক্ষা ও কৃষ্টি একদা উৎসাহিত। সতীনাথের পারিবারিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের ভূমিকে ভাদুড়ী পরিবারের আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা দুর্দমনীয়ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। সতীনাথের ব্যক্তিস্বরূপ (personality) গঠনে তাঁর একাগ্র পাঠনিষ্ঠাও যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কয়েক বছরের অমানুষিক নিত্যপরিশ্রম ও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি চর্চা সতীনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এক নতুন এবং অভূতপূর্ব দিককে উন্মোচিত করে। সতীনাথ যথার্থতই 'কায়মনোবাক্যে' দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। এবং অনায়াসে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বৃত হন। লক্ষ্য করবার বিষয়, সতীনাথ রাজনীতির কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গন থেকে প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেন—তাঁর প্রবল আদর্শবাদের সঙ্গে কোনোরূপ আপোস রফায় সম্ভবত সতীনাথ রাজি ছিলেন না, আর গোপাল হালদার যাকে বলেছেন 'Revolution Betrayed' হবার যন্ত্রণাও হয়ত তাতে অনুস্যূত ছিল কোনোভাবে। গোপাল হালদার একদা সেই রণক্ষেত্রের বেশ কাছাকাছি মানুষ ছিলেন বলে সতীনাথের জীবনের এই পর্বটার উপর সন্ধানী আলোকপাত করতে পারতেন। কিন্তু তথ্যান্বেষী গবেষণা বোধহয় তাঁর লক্ষ্য নয়, তাই তিনি জায়গায়-জায়গায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন কিছু ইঙ্গিত, যা পাঠককে আশাহত অপ্রাপ্তির বেদনায় স্বতই মথিত করে। এবং গোপাল হালদার সতীনাথের ব্যক্তিচরিত্রের রেখাচিত্রকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন,

> দাদামশায়ের সত্যপ্রিয় পাঠপ্রিয় সতীনাথ আপন স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে সর্বপ্রিয় সকলের তিনি আত্মীয়, সকল কর্মে আগ্রহবান ; মিতভাষী, মৃদুভাষী, সতীনাথ বক্তৃতায় সুপটু ; বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, সংকল্পে সুদৃঢ় সতীনাথ আন্দোলনের গোঁড়ামি অপেক্ষা সংগ্রামের লক্ষ্যানুযায়ী কর্মপদ্ধতিকে সংহত করতেও নিপুণ। সত্যই পূর্ণিয়ায় কেন, আজ আমরা জানি দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন স্থিরচিত্ত সাধক সর্বদাই দুর্লভ। (ঐ, পৃ ১৮)

তাতেই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হয় আপাতত।

অবশ্য রাজনীতি চর্চার তুঙ্গ মুহূর্তেও বইয়ের জগতের সঙ্গে সানুরাগ

ঘনিষ্ঠতা সতীনাথ বজায় রেখেছেন বরাবরই—নিজেকে শৌখিন করার এক মহৎ পন্থা হিসাবেই একে গ্রহণ করেন সতীনাথ। এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের আঙিনায় স্থায়ী আসর জমান। গোপাল হালদার প্রতিষ্ঠা বিমুখ সতীনাথের সাহিত্য কৃতিকে মুখ্য ও বিস্তৃত আলোচনার বিষয় করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বস্তুত লেখকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো প্রবল হয় যখন দেখি লেখক কদাচিৎ কেতাবি বিদ্যা জাহির করেছেন বরং অন্তরঙ্গ ভঙ্গি ও মেজাজে সতীনাথের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধনেই তিনি তৎপর। ফলে বইটিতে গোপাল হালদারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ছাপ নেই, তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার প্রতিও লেখক উদাসীন। অথচ বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে মার্জিত বৈদগ্ধ্য ও মনীষার বিচিত্র কলালাপ। আর সমালোচনার ক্ষেত্রে লেখক কথকতার রীতিকে ('আমি ইচ্ছা করেই কথার রীতি ও ভঙ্গি মুদ্রণকালে পরিবর্তিত করতে চাই নি—মুখের আলাপে যে নৈকট্য সৃষ্টি হয় ; ছাপার আকারে তা অক্ষুণ্ণ আছে কিনা জানি না।' নিবেদন, ঐ) আমদানি করে অন্তরঙ্গতার নিবিড় আবহাওয়া-টাকেই করে তোলেন অমোঘ।

অত্যোল্পকালের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এলেও সতীনাথের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিঘাতটি প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর উপন্যাস এবং গল্পেরও একটা মোটা অংশ রাজনীতির কবলিত, অবশ্য এজন্যই কেউ তাঁকে রাজনৈতিক লেখক (political writer) বলে আখ্যায়িত করবেন না। সতীনাথ সৌখিন রাজনীতিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না, যদিচ সন্ত্রাসবাদের রোমান্টিক আবেগপ্রেরণাও তাঁকে যথেষ্ট উদ্দীপিত করে। কিন্তু প্রবাসী বাঙালি (পূর্ণিয়ার অধিবাসী) বলে গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলনে তাঁর ছিল সরাসরি লব্ধ অভিজ্ঞতা যা সতীনাথের উপন্যাসকে অনবদ্য করে তোলে। সতীনাথের প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'র উৎসর্গ-পত্রটি লেখকের অঙ্গীকারের সংহত দলিল—নিবিড় অন্তরঙ্গ সংবেদনায় ইতিহাসের অলিখিত মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন সতীনাথ। অগাস্ট বিক্ষোভের আবেগতরঙ্গ আমাদের পারিবারিক জীবনকেও 'উথালপাতাল করেছে আর একে ভঙ্গিষ্ঠভাবে ব্যবহার করে সতীনাথ বিদগ্ধ পাঠকের ('বাংলা সাহিত্যের এই নবীন শক্তিমান লেখককে অভিবাদন জানাচ্ছি।'—অতুলচন্দ্র গুপ্ত) অভিবাদনও আদায় করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ রায় 'জাগরী' আলোচনা শেষে মন্তব্য করেছিলেন 'গুণী

লেখক সর্বদাই নিজের অতীত কীর্তিকে অতিক্রম করিতে সচেষ্ট থাকেন।' সতীনাথের পরবর্তী সাহিত্যকর্মে এই প্রত্যাশা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। সতীনাথের 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' অন্তত তাঁর কীর্তিপতাকার নতুন তারকা হিসাবেই গণ্য হবে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ প্রথম দেখা গেল রাজনৈতিক আন্দোলনের বেনোজলে নয় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের যথার্থ শক্তি এবং প্রগতিশীলতাকে লেখক পরিস্ফুট করতে যত্নবান। ভারতের আধুনিককালের রাজনীতি গান্ধীজির প্রবর্তনায় বদ্ধ্যাত্ব কাটিয়ে জনজীবনকে স্পর্শ করে। গোপাল হালদার যথার্থতই বলেছেন—'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' সেই অখ্যাত anonymous India-র ঘুম ভাঙা নতুন জাগরণের ও বাধাজড়িত পদযাত্রার প্রধান মহাকাব্য—ঠিক এই মহিমা দ্বিতীয় কোনো বাঙলা উপন্যাসের নেই। জনজীবনের এই অভিজ্ঞতা, ভারতীয় জনসমাজের মূল সত্তাকে, অখ্যাত মানুষের সহজ মানবতাকে ক্ষুদ্র মহৎ বহুদিকের রসরূপে মূর্ত করার কৃতিত্ব, যুগ-যুগব্যাপী ভারতের ঢোঁড়াই রামদের ট্রাজিডির উচ্ছ্বাসহীন সুস্থ সার্থক এই বাংলা সাহিত্যে রূপায়ণ—কখনো আর হয় নাই।' (ঐ, পৃ ১১৬)।

সতীনাথের প্রায় সব কটি উপন্যাসে 'নবজীবনের গান' রচিত। গোপাল হালদারের ৬৫ পৃষ্ঠার আলোচনার পরিসরে সতীনাথ-সাহিত্যের 'মীড়গমকমূর্ছনা' ধরার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে (সৃষ্টি-প্রতিভার কথা) গোপাল হালদার সতীনাথের সাহিত্যের মর্মমূলে পৌছাবার চাবিকাঠিটি পাঠকের হাতে সোজাসুজি তুলে দিয়েছেন। 'সতীনাথ ভাদুড়ী: সাহিত্য ও সাধনা' বইটি এমনই প্রাণবান সমগ্রতায় পরিপূর্ণ যে গ্রন্থ-শেষে গোপাল হালদারের ঈষৎ ভাবাতিশয্যযুক্ত মন্তব্যও—'সত্তার সততায় ও জীবন শিল্পীর সরলতায়, অকৃত্রিম শিল্পসাধনায় এবং সুস্থ সহৃদয় মানবতায় তিনি সেখানে শান্ত অনন্যশ্রীতে অধিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের এই পরিচয় সর্বস্বীকার্য —তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা সচেতন শিল্পী, সর্বাপেক্ষা বিবেকবান স্রষ্টা' (ঐ, পৃ ১২৫)—ইত্যাদি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

প্রতিষ্ঠা-বিমুখ স্বেচ্ছানির্বাসিত সতীনাথ-সাহিত্যের সারাংসার পাঠক-মানসে ছড়িয়ে দেবার কাজে গোপাল হালদারের এই ক্ষীণতনু বইটি দীর্ঘকাল অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

রমেন্দ্র বর্মন

* Tradition, Modernity and Development—S. N. Ganguly. The Macmillan Company of India Limited, 1977. Rs. 45·00

দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতীয় লেখকদের রচনাবলির অধিকাংশই আমাদের বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত—বিরল দৃষ্টান্তকে বাদ দিলে, ইংরেজি শিক্ষিত এই লেখক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ শূন্যচারী পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী বিশেষ। সেক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথের গ্রন্থটির প্রবল ইতিহাসচেতনা, পটচেতনা, প্রতিবাদ অবাক করে দেবার মত।

শচীন্দ্রনাথের অন্য দুটি গ্রন্থ বর্তমান আলোচকের পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে নড়বড়ে, লজিক্যাল-পজিটিভিজম সম্পর্কে আকাট এই আলোচক তাঁর প্রথম গ্রন্থটি পড়ে অশেষ উপকৃত হয়েছিল, যার অন্যতম কারণ শচীন্দ্রনাথের ঈর্ষণীয় প্রাঞ্জলতা। 'রবীন্দ্র দর্শন'—শীর্ষক গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ অংশটুকু তিনিই লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের বহুধাবিভক্ত, নানাভাবে ছড়িয়ে পড়া রচনাবলির মধ্যে দর্শন-প্রস্থান আছে কিনা সেটির দর্শনশাস্ত্র সম্মত বিচার শচীন্দ্রনাথই প্রথম করলেন।

কিন্তু উক্ত দুটি গ্রন্থই (হিটগেনস্টেইনের ওপর আর একটি বইও তিনি লিখেছিলেন) শচীন্দ্রনাথের মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা অর্জনের পূর্বের ঘটনা। সেই কারণেই প্রাঞ্জলতা পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, প্রথমটির অনবদ্য কার্য-কারিতায় মন ভরে নি, দ্বিতীয় গ্রন্থটি আদৌ খুশি করতে পারে নি। এই সর্বশেষ গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথের উত্তরণ শ্রদ্ধা জাগায় এই কারণেই যে তিনি এক দার্শনিকভূমি ছেড়ে অন্যভূমিতে ঝাঁপ দেওয়ার বিরল সাহস দেখিয়েছেন। বেদোক্ত ভারতীয় বাস্তব থেকেই এখানে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন—তাৎক্ষণিককে সরিয়ে, সত্তার বহুজীর্ণ আবরণকে ছিঁড়ে ফেলে, পৌঁছতে চেয়েছেন সত্তার অভিজ্ঞান দ্বারা ভারতীয় সঙ্কটের কেন্দ্রে, নগ্ন সত্যে। এই যন্ত্রণার আবেগে বইটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ দর্শনালোচনা—অবশ্যই, মার্কস দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যেমন ভাবতেন, দার্শনিকদের প্রধান কাজ জগৎ পরিবর্তন, সেই অর্থেই।

শচীন্দ্রনাথ শব্দ ধরে, পদ ধরে এগিয়েছেন—আর যেহেতু তাঁর সবরকম চিন্তার কেন্দ্রস্থলে আছে কমিউনিকেশন বা সংযোগের প্রশ্নটি, সেহেতু এই পদ্ধতি তাঁর আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডেভেলপমেন্ট ও গ্রোথ, অনডেভেলপমেন্ট ও আণ্ডার ডেভেলপমেন্ট, ট্র্যাডিশনাল বা এগ্রিকালচারাল ও ব্যাকওয়ার্ড—ইত্যাদির যে-বিরোধ প্রচলিত ধারণানুযায়ী করা হয় এবং যার

দাপট শিক্ষিত মহলে প্রচণ্ড, তার বিরুদ্ধেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর জিজ্ঞাসাকে তীক্ষ্ণ করেন। মার্কস তাঁর ভারতশাসনবিষয়ক প্রবন্ধে পুরনো জগৎ হারিয়ে, নতুন জগৎ অর্জন না করে যে বিষাদে 'হিন্দুরা' আক্রান্ত হয়েছিল বলেছিলেন, তারই সাংস্কৃতিক স্তর শচীন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয়। বস্তুত শচীন্দ্রনাথ দৃষ্টি মূলত আবদ্ধ রাখেন সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোয়। বাইরের ঔপনিবেশিক আঘাতে যে সাংস্কৃতিক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে যে-গাঠনিক আঘাত এসেছে সেটিই তাঁর বিশ্লেষণের বস্তু। সেই কারণে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন তাঁর কাছে রস্টীয় টেক-অফে ধরা দেয় না, উন্নতি-অনুন্নতি ইত্যাদির আলোচনায় তিনি আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ককে স্মরণ করেন, পল বারানকে সাক্ষী মানেন। ফ্রাঙ্ক ও বারানের মতামত এখন খুবই পরিচিত—কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে অচ্ছুৎ, ভারতবর্ষ বিষয়ক আলোচনায় সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারাও বিরল ব্যবহৃত। হবেই বা না কেন? ডাকসাইটে সমাজতাত্ত্বিক এম এন শ্রীনিবাসও মনে করেন, টেবিল-চেয়ারে খাওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা। এঁদের সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়া ন্যায্য ও সুস্থ। আর ঐতিহ্য বা ঐতিহ্যিক নিয়ে ভ্রান্তিবিলাস এতই ব্যাপক, যে, যে-কোনো রকম কুসংস্কারকেই আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য বলে চালাই, আধুনিকীকরণের শত্রু ভাবি—যেন ইয়োরোপে কোনো কুসংস্কার নেই, ধর্মযুদ্ধ ছিল না। আসলে এ কথা আমলেই আনা হয় না, ইয়োরোপা-মেরিকার মর্ডানাইজেশন-এর ধারণা আমাদের মতো দুর্গত দেশে শোষণ বজায় রাখারই একটি উপায়—ইতিহাসের লজ্জাকর ঔপনিবেশিক পর্যায়কে 'মানবিক' করার, আবার চাপা দেবার বদ্ প্রচেষ্টা। এরই মায়ায় শ্রীনিবাসরা ভোলেন, যাকে ব্যঙ্গ করে শচীন্দ্রনাথ লেখেন : fact-Indepndent lyric in graise of the British empire.

বইটির প্রথমে চারটি অধ্যায় তো বটেই, পঞ্চমটিও এই সমালোচনায় গভীরভাবে চিন্তা-উদ্দীপক। শচীন্দ্রনাথ খুব নিপুণভাবে ছিঁড়ে দেন আধুনিকীকরণ-পশ্চিমীকরণের সমীকরণটি। এই ব্যবচ্ছেদ মনে করিয়ে দেয় ফ্রানজ ক্যানসকে—বোঝা যায় লেখক এখানে হিমশীতল অ্যাকাডেমিক পাণ্ডিত্যের মিনারবাসী নয়, নিজেও এই ঔপনিবেশিক বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যন্ত্রণাদগ্ধ, যে যন্ত্রণা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে আত্মহননে প্রচণ্ড বিষাদে, আবার কর্মিষ্ঠ উজ্জীবনেও। শচীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনো সময়ই মন্ময়ী বিষয়ে ঢোকেন না—মার্কসীয় পদ্ধতি ও প্রজ্ঞাকে অর্জন করতে চান। এই

আত্মচেতনা অর্জন থাকে সমাজের কঠোর প্রতিবাদ, [illegible]
সাংস্কৃতিক বিবাদ, আবার নতুন কথা আমরা, [illegible]
জ্ঞান—যে-উত্তাপ সমকালীন ভারতবর্ষের এবার বিচ্ছিন্ন 'আধুনিকতা' [illegible]
পায়, মাঝেমাঝেই নিরর্থক হয়ে ওঠে।

'আধুনিক' কি? শচীন্দ্রনাথ চমৎকার বলেন, 'The term 'modern' is notoriously ambiguous, considering the tremendous commitments it has!' এই যে 'অজস্র' দায়বদ্ধতা এটাই আত্মসচেতন আধুনিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এই সূত্র থেকেই শচীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তে আসেন,

> The term 'modern', by the simplest standard, should mean and have meant everywhere, except in our country or similar colonies, an adjective qualifying those men or priniples that have advanced the country as a whole, by using appropriate means available or even by creating new means, towards an advancement material and/or spiritual.

এই আধুনিকতা অর্জনে ঐতিহ্যকে বাতিল করা চলে না, বরং ঐতিহ্য থেকেই আরম্ভ করতে হয়। আধুনিক ও পশ্চিমী শব্দ দুটো একার্থক নয়।

সংস্কৃতি কি? এর উত্তরেও শচীন্দ্রনাথ বিশেষ সতর্কতার পরিচয় দেন। সংস্কৃতি নির্ভর করে, সাধারণ উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে ধারণা, ভাবাদর্শ ও আচরণের সামাজিক অংশগ্রহণের ওপর। শিক্ষিত আচরণ সংস্কৃতিকে ধরে রাখায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নিয়মিত সংযোগের ওপরই এসব নির্ভর করে। শচীন্দ্রনাথ সংযোগের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। সংস্কৃতির প্যাটার্নটি সমাজের সর্ব অংশের আভ্যন্তরীন ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। এই ঐক্যের ফলেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে, সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। সংস্কৃতির মূলাধার ভাষা—কারণ ভাষাই সংযোগের প্রধান সেতু। রামমোহনের সময় থেকে শিক্ষিত ভারতীয়ের ইংরেজি-মুখীনতায় ক্ষতি শচীন্দ্রনাথ এই সূত্রেই দেখেন। যেমন খুশি তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি সংস্কৃতি বেছে নিতে পারে না, কারণ তার পিছনে স্ব-ঐতিহ্য যেমন থাকে, তেমনি থাকে তাদের ইতিহাস-বিকাশ। ভাষার দর্পণেই সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। এই আলোকে দেখলে ভারতবর্ষের অদ্ভুত পরিস্থিতি একটি হয়ে ওঠে—

যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগই শিক্ষিত ভারতীয়রা করে ইংরেজিতে। (যে-'বন্দেমাতরম' যুগে ভারতীয়রা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে, প্রতিবাদ করেছে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে, সেই 'বন্দেমাতরম'-এর প্রণেতাই চিঠিতে লেখেন, তিনি ইংরেজিতে বলতে ও লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।) ফলে প্রকৃত সাধনা বা উপায়ের মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রকাশ করতে বা উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ায় কিছু উৎপাদন করতে ব্যর্থ হই। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই বোঝা যাবে, আধুনিকীকরণ কেবল কালগত ধারণা নয়। ইয়োরোপ-আমেরিকার 'আধুনিক' দেশগুলো তাদের 'আধুনিকতা' বাড়াচ্ছে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার দেশদের শোষণ করেই। আধুনিকীকরণ কেবল শিল্পায়ন-নগরায়ণ নয়—আধুনিকতা একটি রাজনৈতিক ধারণাও। জাপান অর্থনৈতিকভাবে আধুনিক, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ। সমাজের গাঠনিক পরিবর্তন বা উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া যথার্থ আধুনিকতা আসতে পারে না; এ পরিবর্তনের রূপ বিভিন্ন, প্রক্রিয়া নানাবিধ, পশ্চিমি দেশগুলোর ছাঁদরাই একমাত্র ছাঁদ নয়। অবশ্য মডার্নিটি সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ ৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

> there is a great difference between modernisation and modernity. By modernity, I mean the superstructural incorporation of a partial life-style of the modern metropolis and then percholating such culture or commodity orientation to the less fortunate sector. But all this happens without any significant structural change or changes in productor factors or production relations.

আবার ৫২ পৃষ্ঠায় লেখেন,

> Modernity consists in modifying the existing traditions and creating room for new and better traditions for a different terminology, modernity helps to enrich our existing value-orientation in terms of new values that assure as of a smooth-progress towards an image fulfilment.

দুটো উক্তি কি পরস্পর বিরোধী নয়?

ভারতীয় ঐতিহ্যে আধুনিক চালের ধরনে বলতে গিয়েই, মডার্নাইজেশন ও মডার্নিটির পার্থক্য দেখিয়েই শচীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়ের কেন্দ্র স্পর্শ করেন, যেখান ম্যাক্স হেবারের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কল্পনাবিলাসকে। ইদানীং ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় ম্যাক্স হেবার নানাভাবে আসছেন। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতিতে হিন্দুধর্মের প্রভাব মূলত নঞর্থক, হেবার এমন মত প্রকাশ করেন। এমন কি তাঁর এ ধারণাও ছিল, প্যাক্স-ব্রিটানিকার অপসারণে ভারতবর্ষে প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক দস্যু রোমান্টিকতার পুনরাগমন ঘটবে। মোক্ষ, ধর্ম, কর্মের ধারণা মানবিক উৎসাহ উদ্দীপনাকে ভোঁতা করে দেয়, নিষ্ক্রিয় গ্রহণকেই বড় করে কঠোর সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দুঃখ দুর্দশা দূর করতে দেয় না। বলাই বাহুল্য, পশ্চিমী আধুনিকীকরণবাদীরা এমন কথাই বলে থাকে। এর থেকেই এই সব সিদ্ধান্ত আসে ভারতবাসীরা আবিষ্কারে ভয় পায়, প্রযুক্তি বিদ্যা আয়ত্ত করতে জানে না, ভারতীয় চাষীরা অলস ইত্যাদি—হয়তো ভারত ইতিহাসের চর্চায় ম্যাক্স হেবারকে ব্যবহারের পেছনে এই ঔপনিবেশিক ঘোর-প্যাঁচই আছে। বস্তুত ভারতীয় সব ভাল, জাতিবর্ণ ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ইত্যাদি উৎকট জাতীয়তা ও বক্তৃতারই আরেক জের হেবারীয় তথা পশ্চিমাবাদী উন্নাসিক আধুনিকীকরণের জের। শচীন্দ্রনাথ স্বাভাবতই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন, আসেন কৃষক-প্রসঙ্গে। তিনি আধুনিকতার কেন্দ্রে স্থাপন করেন কৃষককে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের মোকাবেলা করা, রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রক কৃষকদের সঙ্গে শ্রেণীজোট গঠন করা, জাতি বর্ণব্যবস্থাকে ভেঙে শ্রেণীচেতনা নিয়ে আসাই
ভারতীয় আধুনিকীকরণ। কৃষক সমাজ, কৃষি রাজনীতি ও কৃষি অর্থনীতি এখানে মূল প্রসঙ্গ। কৃষক-কেন্দ্রিক পুনরুজ্জীবন না ঘটার দরুনই, রেলপথ প্রবর্তনে যে-বৈপ্লবিক রূপান্তর ভারতবর্ষে ঘটবে বলে মার্কস আশা করেছিলেন, তা ঘটে নি। উপনিবেশের কৃষকরাই সেই জীবনচর্যা যাপন করেন যেখানে ঐতিহ্যের ধারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবহমান। আধুনিকতার লড়াই, নতুন দিগন্ত সেখানেই। আধুনিকতা ও ঐতিহ্য—দুটি বিরোধী ধারণা নয়, পরিপূরক। আর, এক্ষেত্রে রামমোহনদের লিবারেল মডেল ও রাধাকান্ত দেবদের অর্থতন্ত্র মডেল—শেষ বিচারে একই। আমাদের সংস্কৃতির বিশৃঙ্খলার মূলে ঐতিহ্য—আধুনিকতার সংঘর্ষ নয়, ঐতিহ্যের অভাবই—ঔপনিবেশিক ভাঙনে শিক্ষিতশ্রেণী মূল বিচ্ছিন্ন হয়ে ভ্রান্ত-অভিজ্ঞানের শিকার হয়। এই বিচ্ছিন্নতা ভাঙতে পারে সংযোগের স্রোতস্বিনীতে : শচীন্দ্রনাথের ভাষায় এখন

প্রয়োজন কমিউনিকেশনাল বা সায়েন্টিফিক মডেলের, যা আবার প্রেসক্রিপটিক-ডেসক্রিপটিভ। বইটির শেষ অংশে নানাবিধ মডেলের প্রসঙ্গই মূলত আলোচিত।

আর এ অংশটিই বইটির দুর্বল অংশ। বইটির প্রথম অর্ধাংশে ভারতীয় বাস্তবে স্থিত এক দর্শনশাস্ত্রজ্ঞর বস্তুপাম্প্ট বোধে উজ্জ্বল—সেখানে মডেলের ছাঁচুতে কিছু তিনি ধরতে চান নি, জীবনের প্রবহমানতাকেই প্রাণময় করেছেন তাঁর বিশ্লেষণ, তীব্র করেছেন তাঁর আক্রমণ। কিন্তু যে বিশ্ববীক্ষার আলোকে তিনি এটি করেন, সেটি যে এখনও তাঁর সত্তার সমন্বিত নয়, তা বোঝা যায় বইটির শেষ অংশে—বিশেষত শিক্ষা-বিষয়ক তাঁর আলোচনাগুলিতে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি শচীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু ভাষা ও সংযোগ শচীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে থাকে, সেহেতু শিক্ষা-প্রসঙ্গের যাথার্থতা আলোচনায় স্বীকার্য। কিন্তু এই শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্য তাঁর যে-সব মডেল বা পরিকল্পনা তার সঙ্গে বইটির প্রথম অংশের কৃষক-কেন্দ্রিক উজ্জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।

আসলে, 'ট্র্যাডিশন, মডার্নিটি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' শচীন্দ্রনাথের নতুন জগতে উত্তরণের, পরিবৃত্তিকালের গ্রন্থ—পুরনো জগৎ ছেড়ে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার যুক্তিতে তিনি যখন আসছেন, তখনকার প্রবল আন্দোলিত চিন্তা-ভাবনার সাক্ষী এই বই। তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা হতো আরও পরিণত, তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মৃত্যু তা হতে দিল না। আমাদের জন্য রইল শুধু পরিতাপ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

লিও টলস্টয়ের শয়তান অনুবাদক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুঁথিপত্র ৯, এ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ পৃষ্ঠা ১০+১১০ দাম দশ টাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

তলস্তয়-এর জন্মের দেড়শ বছর গেল গত বছর। উপলক্ষটিকে মনে রেখে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অনুবাদ-গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। অনুবাদটি অনেক আগের। একটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। এতদিন পর বই আকারে বেরল।

বিমলাপ্রসাদ বাবু অনেক কারণেই ধন্যবাদার্হ। সাধারণভাবে প্রবন্ধ-গোছের কিছু রচনায় কয়েকটি জানা কথার পুনরাবৃত্তিতেই তিনি তলস্তয়-এর জন্মের এই সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের দায়িত্ব চুকিয়ে দেন নি। যে-কথা-সাহিত্যের সৃষ্টিতে তলস্তয় অবিনশ্বর, তারই একটি অল্প পরিচিত রচনা তিনি বেছে নিয়েছেন অনুবাদের জন্য। এই গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ, 'দি ডেভিল'-ও খুব সুলভ নয়। বস্তুত, তলস্তয়-এর প্রচলিত কোনো সংকলনেই গল্পটি সচরাচর দেখা যায় না। ফলে তলস্তয়-এর সৃষ্টির এক বিশেষ ধরনের উদাহরণ বাঙালি পাঠকদের কাছে আসতে পারল এই অনুবাদে। এমন আরো একটি আপাত-দুর্লভ বড় গল্পের বাংলা অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন মস্কোর প্রগতি প্রকাশন—ফাদার সেগিঁউস। এই দুটি গল্প একত্রে পাঠ করলে তলস্তয়ের বাস্তবতাসন্ধানে যৌন-সঙ্কটের ব্যবহার সম্পর্কে পাঠক ধারণা করতে পারবেন।

তলস্তয়-এর গল্পের প্রায় অনিবারণীয় টান কোনো একটি জায়গাতেও অনুবাদে ব্যাহত হয় না—অনুবাদকেরও সেটাই প্রাথমিক দায়। গল্পের গতিকে এই অব্যাহত রাখতে তিনি কোনো কৃত্রিম উপাদানের সাহায্য নেন নি। বাংলা ভাষায় সরল গল্প বলার যে-রীতি স্বাভাবিক, তাকেই আশ্রয় করেছেন। ফলে, পাঠকের সরাসরি লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই গল্প, ঘটনা ও এই দুইয়ের দ্বারা চিহ্নিত চরিত্রগুলি।

হয়তো কিছু ঘাটতিও হয়ে যায়। তলস্তয়ের জটিল বাক্যবিন্যাসে ঘটনা আর চরিত্র একত্র মিলেমিশে থাকে। তাতে ঘটনার বিবরণ আর চরিত্রের নির্মাণ একত্রেই সাধিত হয়। আখ্যায়ন (ন্যারেশন) আর চরিত্র-নির্মাণ হয়ে ওঠে একই প্রক্রিয়া। কাহিনীর সরল বিবরণ চরিত্রের জটিল উপস্থাপনের আনুষঙ্গিকতায় নতুনতর তাৎপর্য পায়। কিন্তু এই ধরনের অনুবাদে তলস্তয়-এর গদ্যের এই কাজ বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তলস্তয়-এর রচনায় জটিলতম সার ও দক্ষতম নিষ্পত্তিকে অনুবাদে, অভিজ্ঞ ও সতর্ক পাঠকের কাছে, একটু সরলীকৃত মনে হয়ে যেতে পারে। যেমন এই লেখাটির প্রায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি—স্তিপানিডার সঙ্গে পুনর্সাক্ষাত,

> ‘তবু না তাকিয়ে পারে নি ইউজিন। উপায় ছিল না। দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছিল স্তিপানিডার সতেজ, জীবন্ত শরীরটার উপরে। কোমরের নিচেকার অংশটা ঈষৎ দুলে দুলে উঠছিল দৃঢ়তায়

> স্বাভাবিক ছন্দে, কটিদেশ কম্পিত হচ্ছিল তার দৃঢ় অথচ লঘু পদক্ষেপে। ইউজিন চোখ সরিয়ে নিতে পারে নি, তাকাতে বাধ্য হয়েছিল তার সুঠাম বাহুর দিকে। তার সুডৌল কাঁধের শুভ্র কমনীয়তা, ব্লাউজের নরম পড়ন্ত ভাঁজগুলো, গাউনের আঁটসাঁট ছাঁদের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত দেহ-রেখার নম্র বঙ্কিমা আর মাংসল পায়ের গোছের সুঠাম গড়নটুকু ইউজিনের চোখ দুটিকে যেন জাদু-মন্ত্রে স্তব্ধ, আবদ্ধ করে রেখেছিল। (পৃ ৫৫)

যে সঘন ইন্দ্রিয়তার এই দেখা, ইউজিনের পক্ষে শেষ হয় এই কৃষক-মেয়েটির পায়ের গোছের নরম পিচ্ছল বর্তুলতায়—তা এই অনুবাদে ব্যাহত হয় এতগুলো তৎসম শব্দের ব্যবহারে। এই তৎসম শব্দগুলির অনুষঙ্গে তো বাস্তব ইন্দ্রিয়তা নেই, আছে বাস্তবের বিমূর্তিসাধনের দীর্ঘ প্রয়াস। আবার বাক্যের বিরতিহীন প্রবাহে ইউজিনের চোখের চাঞ্চল্য ও মনের এক অস্থিরতা ধরা পড়ে যায় আপাত কার্য-কারণ-সম্পর্কহীন যে-এক বিশৃঙ্খলায় —প্রথমেই কোমরের নীচেকার অংশ, তার পর কোমর, তার পর বাহু, কাঁধ, আবার ব্লাউজ, গাউন ও শেষে পা—তা এই পৃথক্-পৃথক্ বাক্যে যেন এক ধরনের শৃঙ্খলা পেয়ে যায়। ইউজিনকে অভিসন্ধির সংঘাতে কাতর মনে হয় না, মনে হয় অভিসন্ধিতেই স্থির।

কিন্তু তলস্তয়-এর স্টাইলের এই গূঢ় গঠনের প্রতি আনুগত্যের দায় যে অনুবাদক নেন নি—এতে সাধারণভাবে কোনো ক্ষতি হয় নি। বাংলা ভাষার পাঠক তলস্তয়-এর রচনার সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণই অপরিচিত। এ-কথা গল্প-উপন্যাসের সাধারণ পাঠকদের পক্ষেই প্রযোজ্য নয় শুধু, যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের পক্ষেও সমান সত্য। তাই, তলস্তয়-এর লেখাগুলিকে বাংলা-ভাষার পাঠকদের কাছে সরাসরি উপস্থিত করাটাই খুব বড় দায়িত্ব। তাতেই বাংলা ভাষার পাঠক গল্প-উপন্যাসের কাহিনী-ঘটনার-বিবরণের এক নতুন অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। এই ধরনের অনুবাদের উদাহরণ বাংলা ভাষায় সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এমন অনুবাদের বেশ সমৃদ্ধ প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই অনূদিত লেখকের স্টাইলানুগত্যের প্রশ্নাদি ওঠানো যায়, পরে।

কাহিনীর দিক থেকেও এই বিশেষ রচনাটির একটা অন্যতর মূল্য বাংলা গল্প-উপন্যাসের চর্চায় থাকতে পারে। গত পনের-বিশ বছরে বাংলা ভাষায় গল্প-উপন্যাসে নরনারীর শরীর-সম্পর্ক বিষয় হিশেবে এক নতুনতর তাৎপর্য

পেয়েছে। যতদূর জানি, ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এমন ঘটেছে। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আমাদের বাণিজ্যিক অর্থনীতির দ্রুত বিস্তারের ভেতর নিহিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্যতায় আমাদের সামগ্রিক সমাজই একটি পণ্য সমাজে পরিণত হয়েছে। এতে ভালো-মন্দের কোনো প্রশ্ন জড়িত নেই, ব্যক্তিপুঁজির সমাজে যেমন ঘটায় তেমনি ঘটেছে। ফলে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি এখন বিজ্ঞাপনের স্লোগান, একান্ত হাসিটুকুও এখন বিজ্ঞাপনের ছবি (উইলস ফিল্টার সিগারেট-নির্মাতাদের মতো বিজ্ঞাপন-দাতারা তো তাঁদের মেড-ফর-ইচ আদার স্লোগানের জন্য দম্পতিদের একান্ত ছবিই আহ্বান করেন—মডেল দিয়ে তাঁদের কাজ ভালোভাবে হবে না ধরে নিয়েই)। নারী-শরীর, পুরুষ-শরীর ও নর-নারীর শরীর-সম্পর্ক পণ্য-বাজারের যে-নিয়মে পণ্য হয়ে উঠেছে সেই নিয়মেই সাহিত্যেরও বিষয় হয়েছে।

কিন্তু আবার আমাদের দেশে এর একটা অন্য ধরনের অর্থও আছে। এই ভারতীয় হিন্দু সমাজে নরনারীর যৌন সম্পর্ক সবসময়ই তো সংস্কারে নিষিদ্ধ, ব্যক্তি-সম্পর্কের স্ফূর্তি তো সর্বদাই অপরাধ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের বহুকৌণিক বাস্তবতা তো অস্বীকৃত। নরনারীর শরীর-সম্পর্ককে সাহিত্যের প্রকাশ্যতায় আনার ভেতর নিষেধ ভেঙে ফেলার চেষ্টা, অস্বীকৃতিকে না-মেনে অপরাধ-বোধ থেকে মুক্তির এক ধরনের প্রয়াস নিহিত থেকে যায়—সে-প্রয়াস এই পণ্য-সমাজে যতোই বাধাত বিকৃত হোক না-কেন।

ঐতিহাসিক তুলনার দিক থেকে—এই রচনা, শয়তান-এর ঘটনাকাল, আমাদের বর্তমান অবস্থার সমতুল্য। আজ থেকে প্রায় শ-খানেক বছর আগে রুশদেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দাস-প্রথার অবলোপ, ভূমি-প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি সংস্কারের ভেতর দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো সামগ্র প্রভাবিত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রথম অভিঘাত কেটে যাওয়ার পর, এক-পুরুষ অনুপস্থিত-জমিদারির টাকা ফুঁকে যাওয়ার পর, রুশী ধনতন্ত্রের জমিদার-পুত্রর ক্রমবর্ধমান বেকারির মুখে, গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছিল বাপের রাজধানী-বাসের ঋণ মিটিয়ে বাকি ভূ-সম্পত্তি দিয়ে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা সংস্থান করা যায় কিনা দেখতে। এ উপন্যাসের নায়ক ইউজিন আর্তেনিভ—এই জাতেরই লোক।

'জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে যে-যে উপকরণের প্রয়োজন তার

কিছুরই অভাব ছিল না', 'আইনের ডিগ্রী নিয়ে...উত্তীর্ণ হয়েছিল', 'কোনো এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর আনুকূল্যে ইতিমধ্যেই সে এক রাজদপ্তরে সরকারি কাজ যোগাড় করে নিয়েছে।' কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর দেখা গেল বিস্তর দেনার দায়, সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। পরে আর-এক ভূস্বামীর পরামর্শে সম্পত্তির কিছু অংশ রেখে, বাকি অংশ বেচে, ইউজিন সাব্যস্ত করে, 'সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে মাকে নিয়ে জমিদারিতেই বাস করবে আর নিজে হাতে জমিদারী চালাবে।' 'গ্রামে এসে...তার লক্ষ্য হলো পুরানো দিনের জীবন-প্রণালীকে আবার ফিরিয়ে আনা।'

সমগ্র উপন্যাসটিই এই আয়রনির কাহিনী—মাঝখানে এক পুরুষের (ইউজিনের বাবা) ধনতান্ত্রিক নগর-বাসের অভিজ্ঞতা টপকে আর-এক পুরুষের গ্রামীণ জমিদারি জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়ার আয়রনি। এই আয়রনিটি প্রায় কার্টুনের ভঙ্গিতে তলস্তয় দু-একটি উল্লেখেই দেখিয়ে দেন—ইউজিনের 'দেহের একমাত্র ত্রুটি তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা,' 'এখন একটা প্যাঁস-নে ছাড়া সে চলতেই পারে না।...নাকের ওপর বরাবরের মতো একটা দাগ বসে গিয়েছে।' এই প্যাঁস-নে আবার ফিরে আসে স্টিপানিডার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের আগে,

> 'জোরে যেতে যেতে কাঁটাগুলো পায়ে ফুটতে লাগল ইউজিনের। মাঝপথে নাক থেকে খসে পড়ল প্যাঁস-নে চশমাটা।...প্রায় মিনিট পনের-কুড়ি পরে হলো ছাড়াছাড়ি। এদিক ওদিক নজর করে খুঁজতেই পাওয়া গেল প্যাঁস-নে চশমা জোড়াটা।'

যে-ঠাকুর্দার জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চাইছে ইউজিন তাঁর নারী সম্পর্কের ভেতর নেহাতই গা-আলগা ব্যাপার ছিল। বুড়ো চাকর দানিয়েল বলে, একবার শিকারে ক্লান্ত হয়ে দূরের গ্রামের পাদরি-গিন্নির কাঠের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়—'ঐ খানেই কাদার জাখারিচ প্রিয়ানিশনিকভের জন্যে একটি মেয়ে-মানুষ জোগাড় করে আনি।'

কিন্তু ইউজিন তো এক-পুরুষ শহর-ফেরতা, ওকালতি পাশ, আধুনিক। নারী-ব্যাপারে তার গা-আলগা আধুনিকতা আর তার ঠাকুর্দার গা-আলগা গ্রামীণতার মাঝখানে তো রুশী ধনতন্ত্রের প্রেতচ্ছায়া। তাই ইউজিন সমস্ত কিছুকেই বিচার করতে চায় ব্যক্তি-সম্পর্কহীন নিরপেক্ষতায়। পণ্য-সমাজে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি তার ব্যক্তিচরিত্রকে গঠন করেছে। তাই

তার সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত নারী সম্বন্ধেও সে অজ্ঞানেই ভাবে

> ব্যক্তিগত জীবনে, এই গোপন প্রণয় আর দৈহিক সম্পর্ক যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এই চিন্তা কোনদিনই ইউজিনের মাথায় উদয় হয় নি। স্টীপানিডার সম্বন্ধে সে কোন কিছুই ভাবত না। মানে, ভাবনার কোন অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করত না। টাকা দিত তাকে এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। পৃ ২৩
>
> শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের খাতিরে ওর প্রয়োজন ঘটেছিল একদিন। টাকা দিয়ে ইউজিন মিটিয়ে ফেলেছে যখন, তখন পূর্বচ্ছেদ পড়ে গেছে। (পৃঃ ৩৮)

এই টাকা দেওয়াটাই যেন সমস্ত ব্যক্তি-সম্পর্ককে নিয়ে যেতে পারে ব্যক্তি নিরপেক্ষতায়। ধনতন্ত্রেরই তো প্রায় অবিচ্ছেদ্য দর্শন র‍্যাশনালিজম, বিজ্ঞান সেই র‍্যাশনালিজমকে সাহায্যও করে। তাই ইউজিন তার ঠাকুর্দার মতো শিকারের শারীরিক উন্মাদনায় কোনো এক 'মেয়েমানুষ'-এর সঙ্গে শরীরের প্রয়োজনটুকু সেরে আবার বেরিয়ে পড়তে পারে না—ইউজিন-এর তো দরকার তার শারীরিক প্রয়োজনেরও 'র‍্যাশনালাইজেশন'।

> স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে, আর তার নিজের ধারণা—মনটাকে খোলা ও পরিষ্কার রাখতে হলে স্ত্রীলোকের দৈহিক সম্পর্ক অপরিহার্য পুরুষের পক্ষে। (পৃ ৬)
>
> কিন্তু ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক আত্মদমনের ফলে শরীর ও মনের ওপর টান পড়তে শুরু হয়েছে। তা হলে কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত কি তা হলে দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে শহরেই ছুটতে হবে? (পৃ ৭)
>
> ইউজিন এই ভেবে মনকে বোঝালে যে, বর্তমানে তার এ ধরনের চেষ্টা মোটেই অন্যায় নয়। কেননা, সে তো কামপ্রবৃত্তির দাস, হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করতে যাচ্ছে না। যা কিছু করতে যাচ্ছে, সেটা স্বাস্থ্যেরই খাতিরে, নিছক শরীর-ধর্ম পালনের জন্যে। (পৃ ৮)

র‍্যাশনালাইজেশনের এই তাড়ায় ইউজিন অনায়াসেই এত দূর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হতে পারে যে, ব্যাপারটা যেন দুটো মানুষের মধ্যে নয়, দুটো

শরীরের মধ্যেও নয়, যেন অ্যামিবা, যেন হাজার হাজার বছরের শ্রমে মানুষ তার শারীরিক অনুভূতির স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্ক নির্মাণ করে নি। তাই সে যখন বুড়ো দানিয়েলকে প্রস্তাব দেয় তখন এটাই বারবার বোঝাতে চায়, একটা মেয়ে হলেই হল, 'আমার কাছে সবই সমান, কানা-কুৎসিত না হলেই হল', 'এমন যদি কেউ থাকে যার শরীরে রোগের বালাই নেই।'

এবং, হায়, যুক্তি! এই হতভাগা যুবা শরীরসঙ্গমের পরবর্তী অবস্থাকেও কেমন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ করে তুলতে পারে অমানবিক র‍্যাশনালাইজেশনের জোরে, 'ব্যাপারটা বেশ সহজেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল।...বর্তমানে ইউজিন বেশ সুস্থ বোধ করছে...আর মেয়েটি? তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবে নি ইউজিন।'

কিন্তু ব্যক্তির দায় তো ব্যক্তিকে মেটাতেই হয়। এই নেহাত যুক্তিবাদী যুবাটির যুক্তি উপে যায় ব্যক্তির সেই প্রবল আসক্তিতে। তাতেও যেন কার্টুনেরই আমেজ আসে। যখন দানিয়েল তাকে আশ্বাস দেয়, দিন ঠিক করে, তাকে আপনমনে ভাবতেই হয়, ভবিষ্যতের এই মেয়েটি কেমন হবে? আবার, প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী দিনগুলিতে মেয়েটি তার স্মৃতির সঙ্গিনী হয়ে পড়ে, 'সেই উজ্জ্বল কালো চোখের চঞ্চল তারা দুটি, সেই ভরাট গলায় ঈষৎ কম্পমান আওয়াজ'—

এই ব্যক্তি আর যুক্তির এমনই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যে, স্টিপানিডার স্বামী শহর থেকে গ্রামে এলে দানিয়েল আর-কোনো মেয়ের প্রস্তাব দিলে ইউজিন কিছুতেই রাজি হয় না। আর, স্টিপানিডার কাছ থেকে ইউজিন জানতে চায় সে কেন ইউনিকের কাছে আসতে রাজি হল, তার স্বামী থাকা সত্ত্বেও? ইউজিনের বিস্ময় সমস্ত যুক্তি ছাড়িয়ে যায় যখন স্বামীগর্বে 'তৃপ্ত, গর্বিত সুরে জবাব দেয় স্টিপানিডা—'সারা গ্রামে ওর জুড়ি নেই।''

আইজিন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক মানে না, মানে শুধু যুক্তির সম্পর্ক। অথচ কোনো কিছুই নেহাত ব্যক্তিগতভাবে পাওয়া না হলে তার পাওয়া হয় না, সমস্ত কিছুকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ দখল না করার যুক্তি সে কোথাও পায় না!

আইজিনের সঙ্গে স্টিপানিডার সম্পর্কের প্রথম পর্যায়ের পর আসে আইজিনের প্রেমে পড়া ও বিয়ে করার প্রসঙ্গ। সেখানে আইজিনের স্ত্রী লিজাতে তলস্তয় তার নারী-প্রতিকল্প আবিষ্কার করেন, শিক্ষিতা, আধুনিকা, নাগরিকতায় অভিজ্ঞা অথচ এখন গ্রামে মায়ের ওপরেই আছে। 'লিজা

যখন ইনস্টিটিউটের ছাত্রী হিসেবে বোর্ডিং স্কুলে থাকত, বয়েস আন্দাজ পনেরো—তখন থেকেই সে ক্রমাগত প্রেমে পড়ছে।' আর, 'লিজাকে ইউজিন যে পছন্দ করল, তার প্রধান কারণ হল এই—লিজার সঙ্গে তার আলাপ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল এমন একটা সময়ে যখন ইউজিন বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।'

তাদের প্রেম, পরস্পরকে পছন্দ করার অনিবার্যতা, সবটাই খুব ঠাণ্ডা হিসেব-নিকেশের ব্যাপার—সুযোগ-সুবিধের ব্যাপার। এরা প্রেমে না পড়ে বিয়ে করে না আর বিয়ে সাব্যস্ত করে শেষ প্রেমটিতে পড়ে। উনিশ শতকের শেষার্ধ ই হোক আর বিশ শতকের শেষার্ধ ই হোক, রাশিয়াই হোক আর ভারতই হোক এরা এভাবেই প্রেমে পড়ে।

বিয়ের মধ্য দিয়ে 'শুরু হলো…নতুন জীবনের প্রথম পর্ব'—অথবা পুরনো জীবনের শেষ পর্ব।

কারণ, এর পর ইউজিন-লিজার দাম্পত্য-জীবন ও ইউজিনের সম্পত্তিরক্ষার নানা বিবরণের শেষে আখ্যান এসে পড়ে ইউজিন-স্টিপানিডার কাহিনীতেই। ইউজিন আবার এসে অজ্ঞাতে মুখোমুখি হয়ে পড়ে স্টিপানিডার—ইউজিনের শোয়ার ঘরেরই চৌকাঠে। সেই সহসা সাক্ষাতের পর থেকে শুরু হয়ে যায় ইউজিনের দ্বিতীয় জীবন। ব্যক্তি বলে যাকে সে গ্রহণ করে নি, টাকা দিয়ে যার সঙ্গের পণ্য খরিদ করেছে, যুক্তি দিয়ে যে-সঙ্গের দার্শনিক সমর্থন জুগিয়েছে, সেই মেয়েটি একটি বিশেষ ব্যক্তিগত মেয়ে বলেই, তার মাথার রুমাল থেকে পায়ের বাটি পর্যন্ত সেই মেয়েটি বলেই, ইউজিনের তাকে পাওয়ার তাড়না। আর কোনো মেয়েতেই ইউজিনের চলে না। আর এই সম্পূর্ণ আবেগগ্রস্ত ইউজিনের চোখের সামনে দিয়ে জীবনের রকম্ভর কর্মের পরিধির চলচ্চিত্রে স্টিপানিডা ঘুরে-ঘুরে আসে, সরে-সরে যায়। তার খামার বাড়ির অন্ত মেয়ের ভেতর বা গ্রামের অন্ত কৃষক-রমণীর ভেতর ইউজিন একমাত্র স্টিপানিডাকেই চায়।

অথচ এই চাওয়া, এই ভূতগ্রস্তের চাওয়া ঘটে যেতে থাকে দৈনন্দিনের কর্মবৃত্তেই। ইউজিন দেওয়ানা হয়ে যেতে পারে না তো, তাই তার প্রতিদিন আর প্রতিটি কাজ এই তাড়নার বিপরীতে থেকেই যায়। ইউজিন, একপুরুষের ধনতন্ত্রের শহরে আধুনিক শিক্ষিত বাবু ইউজিনকে, ঋণ শোধ করতে হবে তো—মানুষকে ব্যক্তির মর্যাদা না-দেয়ার ঋণ-শোধ!

সেই ঋণ-শোধের ঘটনাটি তলস্তয় লিখেছিলেন তাঁর খ্রীষ্টীয় মনুষ্যত্বের

আবেগে—অনুতাপ, স্বীকারোক্তি ও আত্মহত্যা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টিপানিডার গন্ধ ইউজিন একবারও পায় নি—অথচ সেই সময়ই সে এমন তাড়িত! তলস্তয় কেন দুটো খশড়া করেছিলেন—গল্পের শেষাংশের? পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে এই কাহিনী একটি ব্যক্তির জীবনের বাস্তব হয়ে ওঠে। শিমফনির স্বর-বৈচিত্র্যের অলঙ্ঘনীয় সন্ধিকে ইউজিনের প্রতিটি কাজ ও ভাবনা যুক্তিতে বাঁধা থাকে। তাতে, এই যুবাটির আত্মহত্যার অধিকার আছে কিনা এ-বিষয়ে কোনো সংশয় এসেছিল তলস্তয়ের? 'তার' মা বরাবরই তাকে বেশি স্নেহ দিয়ে এসেছেন', স্কুল-কলেজের বন্ধু-সঙ্গীরা এমনকি টাকা ধার দেয়ার মহাজনও তো তাকে সমর্থনের প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছে। তাই জীবনের এমন সঙ্কটে তার পক্ষে তো স্বাভাবিকই ভাবা যে এর কারণ সে নয়, স্টিপানিডাই। যেন, স্টিপানিডা আছে বলেই তার এমন কামনা জন্মেছে। 'ও আমায় পেয়ে বসেছে—আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জয় করে আমায় বশীভূত করে ফেলেছে...' হায়, র‍্যাশনালাইজেশন! সেই কারণেই স্টিপানিডাকে হত্যা করে সে নিজেকে মুক্তি দিতে চাইবে—এটাই কি ছিল তলস্তয়-এর দ্বিতীয় মত, পরিণততর সিদ্ধান্ত, যাতে তিনি পৌঁছেছিলেন ঘটনা ও চরিত্রের যুক্তির ধাপে ধাপে? উপসংহারের অংশ আসার আগে ইউজিন তার কর্ম ও চিন্তার সার-সংক্ষেপ করেছে ও নিজের সামনে একটি বিকল্প উপস্থিত করেছে—লিজার মৃত্যু বা স্টিপানিডার মৃত্যু। বিকল্প এমন হলে তো উকিল-স্বামী আধুনিক বাবুর হাতে স্টিপানিডাকেই মরতে হয়। আর সেই বাবুর জন্য নানা বিকল্পই খোলা থাকে। স্বল্প জেলবাস, দায়িত্বহীন নেশাগ্রস্ত দীর্ঘ জীবন তারই একটি বাছাই।

সব সমালোচনাই তো আসলে আর একবার পড়া। কিন্তু কোনো সমালোচনাতেই তো আর তলস্তয়ের বাস্তব যুক্তি পরম্পরার অনিবার্যতা বলে ওঠা যাবে না। তবু, পাঠক হিশেবে, প্রায় শিশুর অসহায়তায় আবিষ্কার করতে হয়, পুনর্সাক্ষাতের পর স্টিপানিডার সঙ্গে সামান্য বাক্য-বিনিময়ের ঘটনা না-থাকা সত্ত্বেও (একবার একটি মাত্র বাক্য বলেছে স্টিপানিডা) ইউজিনের একার দিক থেকেই সম্পর্কটি কেমন যুক্তি-নিশ্ছিদ্র হয়ে যায়। গল্প উপন্যাসের আঙ্গিকে এ প্রায় অসম্ভব দায়। স্টিপানিডার সঙ্গে পুনর্সাক্ষাতের পর লিজা-ইউজিনের কফির টেবিলে কেমন অন্যমনস্কতা এসে যায়। কৃষক মেয়েদের সমবেত নৃত্যের ভেতর থেকে স্পষ্ট

হয়ে ওঠে শুধু ক্লিপানিডা। সকলের কাছ থেকে সরে জোড়দার কাদম্বা ছিয়ে একা-একা ক্লিপানিডাকে দেখায় যেন ঘটে যায় নতুন সম্পর্ক। তারপরই ক্লিপানিডার অনিশ্চিত সন্ধানে বনপথে। আবার অনুতাপ। ক্লিপানিডাকে গ্রাম থেকে সরিয়ে দেয়ার ক্ষীণ চেষ্টা। লিজার পা মচকানো। অসুস্থ লিজার বিছানার পাশে স্বামী-স্ত্রীর নতুন ধরনের সম্পর্ক যেন প্রতিষ্ঠা পেয়েই যায়। কিন্তু সে-ও যেন পুরনো হয়ে যায়, আবার খামারে। আবার ক্লিপানিডা। ঋতু বদলে যায়। বর্ষার রুক্ষতা। মনের অবসন্নতা। আবার ক্লিপানিডা। সন্তান-জন্ম ও লালনে লিজার ব্যস্ততা। একটু ক্রিমিয়ায় বেরিয়ে আসা। একটু বিস্মরণ। আবার ক্লিপানিডা। আর এই হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিজের বন্দী হিসেবেই ইউজিন নিজেকে আবিষ্কার করে ফেলে। আর কোনো পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু থাক। এভাবে তো কোনো আলোচনা কখনো শেষ হয় না। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তিনি বাংলা-পাঠককে তলস্তয়-পড়ার একটি সুযোগ অন্তত করে দিলেন।

বাবু বৃত্তান্ত সমর সেন আশা প্রকাশনী ৭৪ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৭০০০০৯ দাম দশ টাকা পৃ ১৪৩ ১৯৭৮

বাঙালির আত্মজীবনী অতি ভয়ঙ্কর বস্তু। লেখার এই ধরনটির প্রতি বাঙালি মাত্রেরই দুর্বলতা—স্নায়বিক। ষাট পার হয়েছে অথচ কোনো-এক-রকমে আত্মকথন শুরু করেন নি এমন বাঙালি দুর্লভ। যদিও তরা যৌবন থেকেই ছদ্মবেশী আত্মকথন অভ্যাসে আসে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশী ও স্নায়ুর শৈথিল্য যেন আর কোনো আড় মানে না। একটু শহুরে, একটু বুদ্ধিজীবী ও একটু সাহিত্যিক বাঙালির স্নায়ুশৈথিল্য প্রথম ঘটে জিহ্বায় কলম তো জিহ্বারই বকলম।

সমর সেন-এর প্রায়-কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর এই লেখাটির অনেক দূর পর্যন্ত একটি সেয়ানা চাল রাখতে পেরেছেন—যাতে তাঁর একটু বখে যাওয়া, একটু দায়িত্বজ্ঞানহীন, একটু 'ডিলাটাক' ব্যক্তিত্ব বেশ ধরা পড়ে।

বাল্য আর কৈশোরের স্মৃতিতেও তাঁর হা-হুতাশ নেই—এ বড় সচরাচর

দেখা যায় না, ঠাকুর্দার পূর্বপুরুষে বা মায়ের দাদামশাইয়ের বংশলতিকায় একটু-আধটু উঁকিঝুঁকি সত্ত্বেও। বেশ একটা ছবি জোটে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কলকাতার, বাগবাজারের রকের আড্ডায়। বয়স-নিরপেক্ষ মেলা-মেশায় একটা সামাজিকতার আভাসও মেলে। জানলা দিয়ে গোপন দৃশ্য দেখা সেখানে বালকের দিন-যাপনের অপরিহার্য অংশ বা, স্কুল পালিয়ে গঙ্গার ঘাটে কাটানো। 'শিবমন্দিরে গাঁজার আড্ডা, অনেক ব্যায়াম সমিতি, বোসবাড়ির বিরাট মাঠে বারোয়ারি দুর্গা পুজো, প্রদর্শনী, মেলা ও ব্যায়াম-বীরদের কসরৎ; পাড়ায় পাড়ায় সিদ্ধির কুলপি, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের দোকান; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কাছেই যামিনী রায়ের বাড়ি। সকালে গঙ্গাতীরে নানা বিচিত্র দৃশ্য—নিতম্বিনীদের মুক্তকেশ, স্নান ও চলানি। আবহাওয়া ভালো থাকলে আকাশ ভরে যেত ঘুড়ি ও নানা ধরনের পায়রাতে। চৌরঙ্গীতে যাওয়া নিরাপদ ছিল না, গোরাদের অত্যাচারে। দক্ষিণ কলকাতা তখনো গজিয়ে ওঠে নি মজুদ মধ্যবিত্ত বসতি হিসেবে।... একটা বাগবাজারী বখাটে ভাব কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

প্রথম পৃষ্ঠাতেই ঠাকুর্দাকে পুরুষাঙ্গ দেখানো—'দাদু, পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বিলেত যাব না', আর তার পর বাবার বিয়ে দেখানোয় (২০ পৃষ্ঠা), সমরবাবু সেই বাগবাজারী বখাটেপনাকে বাংলা ভাষায় বেশ সরেস এনে দিয়েছেন মনে হতে পারে। কিন্তু এও বোধহয় সম্ভব হয়েছে তাঁর চিরকালের ইংরেজি-চর্চার গুণেই। বাংলা গদ্যের সঙ্গে চিৎপুরি যাত্রার একটা বিশেষ সম্পর্ক—ছুটোই তো কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে গদ্য-আওড়ানো। সমরবাবুদের মতো ইংরেজি-দক্ষ 'বাগবাজারী বখাটে'-রা আর-একটু বেশি লিখলে হয়ত বাংলা গদ্যের উপকারই হত—অন্তত এমন ধরণের হাল্কা গদ্যের। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে—বাগবাজারী বখাটেপনাও সমরবাবুদের মতো 'সাহেবদের' ফাত-ফেরতা না হয়ে আমরা পাই না।

সে বিষয়ে সমরবাবুও সেয়ানা। তাই, তাঁর কবিত্বের স্থূল-উল্লেখে একটু রসিকতা করে যান, 'আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ—ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম'। আবার, এই ইংরেজি জানা-না-জানার কথা আনেন 'ক্রাটিয়ার'-এর প্রিফেসরশিপ প্রসঙ্গেও, 'এখানে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলা-চামুণ্ডারা ইংরেজিতে ওয়াকিবহাল নয় বলে 'ক্রন্টিয়ার'-এর কিছুটা সুবিধে হয়।' ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলা হওয়া মার্জনীয়, হয়তো, কিন্তু তাদের ইংরেজি না-জানাটা ক্ষমার অযোগ্য! আর ফ্রন্টিয়ারের 'সুবিধে'টা একটু গর্বের!

বলা অবান্তর, নিজের ইংরেজিজ্ঞান সমরবাবু নিশ্চয়ই কখনো জাহির করতে চান না, এমন-কি তাঁর বি. এ-তে প্রথম হওয়ার খবরও চেপে গিয়েছেন। '১৯৩৬-এ যে-বছর আমরা বি. এ. দিই, দর্শন, অর্থনীতি ও ইংরেজিতে প্রথম হয়। দর্শনে শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্তী ঈশান স্কলারশিপ পান, অর্থনীতিতে প্রথম হন অনিলা (আইলিন) বনার্জি...'।

নীরবতার এমন অ্যাংলো-স্যাকসনি ব্যবহারে সমরবাবু প্রায় বিরক্তিকর করে যেন—তিনি 'বখাটে' হলেও, 'সাহেব'।

এ সাহেবিআনা সমরবাবুর প্রায় স্বভাবগতই যেন। ফলে, বাঙালি-ভারতীয় পরিবেশের অনেক কিছুই তিনি সইতে পারেন না। কিন্তু তাঁর সহ্য-করতে-না-পারার ভেতরও একটা পশ্চিমি সভ্যতা-সম্মত সীমা আছে। 'শান্তিনিকেতনের পরচর্চার আবহাওয়া দেখে বলতাম ব্রাহ্ম-পল্লীসমাজ', 'কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করবো কিনা গভীরভাবে চিন্তা করে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না', 'ছোট কলেজে দলাদলি ছিল খুব। এ-সবে নাক না গলিয়ে...', '১৯৫৬-এ জ্ঞাতিদের কেচ্ছা শুরু হল। ব্যাপারটা অত্যন্ত কদর্য ঠেকেছিল...', ইত্যাদি আরো অনেক জায়গায় এই চারপাশ নিয়ে সমরবাবু খুব বিব্রত—বিব্রত তাঁর রুচি ও ইচ্ছের সঙ্গে চারপাশটা মেলে না বলে, আর সেই না-মেলার জন্য তাঁকে মনে মনে বিরক্ত হয়েও একটা গা-আলগা ভাব রাখতে হয় বলে।

কিন্তু এই রোগা বইটির শেষ দিকে এই সেয়ানা চাপ সমরবাবু আর রাখতে পারেন নি। কারণ, তাঁর সারা জীবনে সেই প্রথম তিনি একটি সংগঠিত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন—'নাও' প্রকাশ ও সম্পাদনা। এই কাজটি তাঁকে একটা বিশেষ রাজনীতি ও সামাজিক কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আর, এমন ভাবে যুক্ত হওয়ার দায়ে তাঁকে কিছু সমর্থন আর কিছু বিরোধিতা উশকোতে হয়েছে, এটুকু করাও সম্ভব হয়ে উঠত না যদি আমাদের দেশে তখন তাঁর রাজনীতির ও সামাজিক কর্তব্যবোধের সমর্থক একটা মত ও হয়তো কিছুটা আলগা সংগঠন তৈরি না-হত।

৮-এর পরিচ্ছেদের শেষাংশ থেকেই তিনি একটু অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁর তিন বছরের রুশ-প্রবাসে সোভিয়েত জনগণের সামাজিক ব্যবহারের অধোগতি দেখে ফেলেন। 'রাশিয়া বিরাট দেশ, পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ। জারেরা পারদেশ দখলে বেশ তৎপর ছিলেন। সেগুলি ধরে রাখা উত্তরাধিকারীদের মহান কর্তব্য'—এমন মন্তব্য করে ফেলেন প্রায়

কমিউনিস্ট বিদেশীদের ভাষাতেই। '...এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার কথা লিখব না। আমরা অনুবাদ করে জীবনধারণ করতাম, ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মতো অতিথি হিসেবে রাজকীয় ভাবে থাকি নি—ভালো হোটেল, গাড়ি, দোভাষিণী ইত্যাদি ইত্যাদি'। সেজন্য মুখ বন্ধ রাখার বাধ্য-বাধকতা আমার নেই'—প্রায় চার দিকে-দিকের ভাষায় ঘরের হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেয়ার হুমকি দিয়ে ফেলেন! সেই গা-আলগা ভাব আর রাখতে পারেন না। ১৯৬৮ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন, ভারতের রাজনীতি আর বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়েও। শেষের দিকে সমরবাবুকে তো বেশ বিচলিত দেখায়। এবং গম্ভীরও বটে।

পাঠ্য একটি বই হিসেবে তাতে তো 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর ক্ষতিই হল। তাঁর জীবৎকালের ঘটনা ও একটি ব্যক্তিত্বের বিকাশের আখ্যান হিসেবে তো আর এ-বই কেউ পড়বে না। পড়বে লেখার গুণেই, পড়ার আনন্দেই। তাঁর বিষয়ের সঙ্গে অর্থাৎ নিজের সঙ্গে এত বেশি জড়িত হয়ে পড়ায়, এই বইটির শেষাংশে সমরবাবুর লেখার চালটাই গেল নষ্ট হয়ে—বাড়িতে আগুন লাগলেও যে চাল নষ্ট করতে নেই। যে 'বিপ্লব'পন্থী তরুণ একজিকিউটিভ শ্রেণী প্রথমে 'নাও' ও পরে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর স্থায়ী পাঠক-সমর্থক হয়ে ওঠেন, ভালো ইংরেজিতে রাজনীতি পড়তে পারা যাঁদের স্বল্প পারিবারিক সময়ের, ততো-স্বল্প নয়-সামাজিক সময়ের ও চাকরির দীর্ঘ সময়ের প্রায় একমাত্র 'হবি', তাঁদের তো আমরা সমরবাবুর লেখার লক্ষ্য হয়ে উঠতে দেখতে পেলাম না। কৃষক মুক্তি, সংগ্রামের পক্ষেও পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার বিপক্ষে পরিচালিত ইংরেজি সাপ্তাহিকটি শুধুমাত্র ইংরেজির সুবাদে হয়ে ওঠে সরকারি-বেসরকারি ব্যুরোক্রাসির ব্যসন—এই ঘটনায় সমরবাবুর নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার রঙ্গ-রস আমরা পেলাম না। নিজেকে নিয়ে হাসিঠাট্টা সাহেবদের তেমন আসেও না।

এ বইয়ের প্রথম-আর দ্বিতীয়াংশে তাই এক মজার স্ববিরোধিতা। প্রথমাংশে সমরবাবু শুধুই বক্তা—কিছু ঘটনার, কিছু কিছু ব্যক্তির। কিন্তু কোনো সময়েই সমরবাবু কর্তা নন। দ্বিতীয়াংশে তিনিই কর্তা—তাই তিনি আর বক্তা নন। বক্তা আর কর্তা তাঁদের হিউমারে আর কর্মে এক হলেন না।

হওয়া সম্ভবও কি? সমরবাবুরা নিজেদের জন্য একটা ভূমিকা

ভেবেছিলেন। যা বলা উচিত, সৎ আবেগেই তাঁরা চেয়েছিলেন এই দেশকালে সমষ্টির কোনো যোগ্য ভূমিকা তাঁরা দেখতে পাবেন। কর্মের ভূমিকা তাঁদের থাক আর না থাক, দর্শক, একটু লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা তাঁদের আছে বলে তাঁরা ভাবতেনও হয়তো। হয়তো ভাবতেনও না, কিন্তু সবসময়ই কোথাও একটা বিচ্ছিন্নতার বাধা তো বোধ করতেই পারেন, বাধাই আবার আরেক অর্থে তাঁদের রুজি-রোজগার, সামাজিক মর্যাদা, এমনকি দর্শক হলেও সাক্রিয়তার মর্যাদাও এনে দিত। ফলে কোথায় তাদের অবস্থান তাঁরা জানতেন না—কখনো কবিতায়, কখনো মিছিলে। সমরবাবুরা তো কোনো ব্যক্তি নন, একটা লক্ষণ—গত প্রায় দুশ বছর ধরেই একটা লক্ষণ। উনিশ শতকের বাঙালি কবির দাম্ভিক শিরোনাম, 'আমার জীবন' আর বিশ শতকের বাঙালি কবির আত্মশ্লেষ 'বাবুবৃত্তান্ত' যেন সেই লক্ষণেরই একশ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস। তফাৎ এই—প্রথমটি মূঢ়, দ্বিতীয়টি চালাক।

আজকাল ইংরেজ সংসর্গজাত এই প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন সেয়ানাগিরি, 'বাবু' এই বিশেষণ নিয়ে নিজেদের বাঙালি প্রমাণের মতলবে মেতেছে। কিন্তু 'বাঙালি-বাবু'-রও তো একটি জাতি-পরিচয় আছে। সমরবাবুদের তা নেই। সমরবাবুরা বাবু নন—সাহেব।

দেবেশ রায়

পাঠকগোষ্ঠী

সবিনয় নিবেদন,

'পরিচয়' পূজা সংখ্যায় (১৯৭৮) নীহার বড়ুয়ার লেখা 'ছাড়িয়া না যান মোর মইষাল বন্ধুরে', প্রবন্ধটি গভীর আগ্রহের সাথে পড়েছি। লেখিকা ঐ অঞ্চলের, স্বভাবতই তিনি তাঁর আবেগ নিয়েই লিখেছেন। কিন্তু প্রবন্ধে কিছু গুরুতর বক্তব্য আছে যার প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

প্রখ্যাত অসমীয়া সাংস্কৃতিক নেতা প্রয়াত বিষ্ণু রাভা ব্রহ্মপুত্রর নামকরণ বিষয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বুল্লং বুথুর থেকে (শ্রীরাভার মতে ঐ শব্দ বড়ো ভাষায় অর্থ কলকলনাদিনী) এই নাম এসেছে। 'কিরাত জনকৃতি' বইয়ে ডঃ সুনীতিকুমার সে বিষয় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তথাপি কিছু কিন্তু তিনি রেখেছেন। কিন্তু বড়ুয়া মহাশয়া 'কোচরাজবংশীভাষী বা বাহেভাষী' পরে 'বাহেভাষী অঞ্চল' ইত্যাদি লিখে এক বালতি দুধে চোনা ঢেলেছেন। এই বাহেভাষী কথাটার কে জন্ম দিয়েছে জানি না কিন্তু শ্রীমতী বড়ুয়া কি জানেন না যে রাজবংশী এবং কোচরা নিজেদের বাহেভাষী বলেন না, বললে তাঁদের ক্ষোভ হয়? এ প্রসঙ্গে আমি 'বাহে' শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় ৪ অগাস্ট, ১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'বাহে' শব্দের প্রকৃত অর্থ (লেখক দীনেশ নাকুরা—লেখক কোচবিহার জেলার রাজবংশী এবং এম. এস. এ.) দেখতে বলব। দীনেশবাবুর বক্তব্য: "'বাহে' কথাটির প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ না জেনে হয়তো রাজবংশীদের নিজেদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে 'বাহে' বলে সম্বোধন করতে শুনে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আগত কেউ কেউ গোটা রাজবংশী সম্প্রদায়টাকেই 'বাহে' সম্প্রদায় ভেবে বসলেন এবং যাকে-তাকে 'বাহে'

বলে ডেকে অথচ বিন্দুমাত্র সম্মান না করে রাজবংশী ও স্থানীয় মুসলমানদের বিরক্তির উদ্রেক করেছেন। প্রথমদিকে অজ্ঞতাবশত হলেও পরবর্তীকালে তাচ্ছিল্যভরে 'বাহে' শব্দটির অপপ্রয়োগ হয়ে আসছে। সেজন্য 'বাহে' শব্দটির সঠিক প্রয়োগে যেখানে রেগে যাওয়া মানুষও অপত্যস্নেহে বিগলিত হওয়ার কথা, এর অপপ্রয়োগে শান্ত ও নম্র রাজবংশী সমাজ ও স্থানীয় মুসলমানেরাও ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত বোধ করেন।" প্রাক্তন রাজবংশী এম. পি শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালী' পুস্তকে এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "প্রসঙ্গত 'বাহে' শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা প্রয়োজন। ইহা 'বাবাহে' শব্দের সংক্ষেপ প্রয়োগ। দুইটি ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতাপুত্র খুল্লতাত-ভাইপো অর্থাৎ যেখানে এক ডিগরি উঁচু-নিচু সম্পর্ক আছে এমত ক্ষেত্রে অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিত নিঃসম্পর্কিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। যেখানে ভ্রাতা, ভ্রাতৃবৎ বা বন্ধু। মিত্র বা সম সম্পর্ক সেখানে কখনো ব্যবহার হয় না বা হতে পারে না। এ শব্দ সম্বোধনবাচক। অজ্ঞতাবশত অপপ্রয়োগে বিরক্তি ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে।" কাজেই বড়ুয়া মহাশয়ার বক্তব্য 'বাহেভাষী' আমাদের বিশেষ বিরক্তি ও বিক্ষোভের কারণ হয়েছে।

তাঁর অপর বক্তব্য আসামের পশ্চিম প্রান্তে 'ব্রহ্মপুত্র' লৌকিক ভদ্র নাম নিল 'বরমপুত্তোর'—আদৌ সঠিক নয়। ব্রহ্মপুত্র আসনাম এবং সেটার উৎপত্তি বরমপুত্তোর থেকে হয়েছে একথা মানা যায় না যদি না আমরা জানতাম এটা এসেছে তিব্বতের মানস সরোবর থেকে।

গোয়ালপাড়া বা রাজবংশী এলাকায় মহিষের লালন পালনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে "তার জন্য ফিরে যেতে হবে অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীতে"। হাতি ধরা, বশ করার জন্য বনের মোষের বাচ্চা ধরার ইতিহাসও বহু পুরাতন। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্বপুরুষদেরও বাথান ছিল। বাঘের উৎপাতে এ অঞ্চলে গরু থেকে মোষ পালন করা সুবিধাজনক ছিল। বিশ্ব সিংহ (কোচরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) সম্বন্ধে জানা যায়:

"During his adolescence a boy from each or the families of the hill had attended the kine with him. He raised each of the Companies of his childhood to an office of dignify... The whole management of the principality was entrusted

to the twelve karzees". (*An Account of Assam*, by Dr. John Peter Wade, written in 1800, 2nd Impresion Page 201).

কাজেই ঘোষ-চড়ান এর আগেও হতো। মইষাল গান ভাওয়াইয়ার অন্তর্ভুক্ত। শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাল 'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি'-র (ভাওয়াইয়া খণ্ড) নিবেদন-এ লিখেছেন :

"আঞ্চলিক নামকরণ অনুসারে ভাওয়াইয়া গানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) চিতান ভাওয়াইয়া

(২) ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া

(৩) দরীয়া ও দীঘল নাসা ভাওয়াইয়া

(৪) গড়ান ভাওয়াইয়া

(৫) মইষালী ভাওয়াইয়া :—এই গান অন্যান্য গানের মতো কিন্তু চাল ভিন্ন ধরনের। এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোন কিছুর সোয়ার (সওয়ার) হয়ে চলেছে এবং চলার ছন্দ গানের ছন্দে প্রকাশ পায়। এই চালকে সোয়ারী চাল বা মইষালী চাল বলে।"

মইষাল অথবা হাতীর মাহুত এদের দুঃসহ দুঃখময়, নারী বঞ্চিত জীবন গানের বক্তব্যকে ঘিরে রেখেছে। একই গানে বিভিন্ন জায়গায় কথান্তর ঘটেছে। গোয়ালপাড়া থেকে কুচবিহার আবার উত্তর থেকেই জলপাইগুড়ির, এই গান সুরে ও বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্ন হলেও মূল বক্তব্য সেই বিরহ, প্রেম নিবেদন অথবা কাতর প্রার্থনা।

শ্রীনীহার বড়ুয়া কতকগুলি উক্তি দিয়েছেন, ব্যাখ্যাও করেছেন কিন্তু গোড়ায় তিনি বেশ বিভ্রান্তির পরিচয়ও দিয়েছেন। লেখিকা প্রবীনা, দীর্ঘদিন রাজবংশীদের সাথে ওঠবস করেও তাঁদের বিষয়ে ভুল করতে পারেন তার প্রকাশ অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

তথাপি এই প্রবন্ধের জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা পাবেন। আমরা আশা করব ঐ উপরোক্ত বিভ্রান্তিগুলো তিনি ভবিষ্যতে সংশোধন করবেন।

পরিতোষ দত্ত

দেবেশ বাবু,

'পরিচয়'-এর বিষ্ণু-দের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি সংখ্যা পড়ে শেষ করলাম। খুব ভাল হয়েছে। এত উপকারে লাগবে যে বলা যায় না। অনেক পুরনো লেখা একসঙ্গে পাওয়া গেল। এত সুন্দর সংকলনের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিচয় বেশ অনিয়মিত। সাধারণ সংখ্যাগুলি আজকাল আর ভাল লাগে না। সে রকম কিছু থাকে না। বিশেষ করে প্রবন্ধ আর পুস্তক-পরিচয়, যা কিনা পরিচয়-এর এতদিনের গর্ব তা, বলতে গেলে, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকাংশই প্রবন্ধই অধ্যাপকদের অনার্স অথবা এম. এ. ক্লাশের ছাত্রদের নোট দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অবশ্য, সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের যা হাল এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। আর অত আজেবাজে কবিতা ছাপান কেন বুঝি না।

জানি, আপনাদের সংগঠন দুর্বল, আর্থিক সঙ্গতি প্রায় নেই। নানারকম ফাঁপড়ে তো আপনারা পড়ছেন। তাই, বুঝতে পারছি, কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা যান, তবে, ঐ যা বললাম, একটু দেখবেন কতদূর কি করা যায়। বিক্রয় কেমন হয় জানিনে, তবে 'পরিচয়'-এর প্রতি একটা মমতা তো অনেকেরই আছে। যেমন আমি। সেই ১৯৩৮।৩৯ সাল থেকে পড়ে আসছি। না পেলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এতদিনের অভ্যেস তো।

শান্তিকুমার সান্যাল

মাদার থেরেসা

এই কলকাতারই মাদার থেরেসা এবার শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন এ তো আনন্দেরই কথা আমাদের। শিয়ালদা স্টেশনের মতো আমাদের দৈনন্দিন আসা-যাওয়ায় বা ট্র্যাফিক জ্যামের মৌলালির মতো রোজকার বিকেলে, টিনের লম্বা চালায় বা পাকাপোক্ত বাড়িতে, তাঁর কাজ আমরা দেখে আসছি বেশ কয়েক বছর। খবরের কাগজে বা রেডিওতে তাঁর খবর শোনাও তো আমাদের অভ্যেস। আত্মহত্যার দুঃখ মানছেন এমন হতাশ্বাস মানুষও তাঁর শেষ সম্বল গচ্ছিত রেখে যান তাঁর কাছে বা সংসারের যন্ত্রণায় নিরুপায় মা তাঁর শিশুটিকে দিয়ে যান তাঁর দুয়ারে—এমন খবরও আমাদের চেনাজানাই হয়ে গেছে। নানা দেশের নানা মানুষের নানা রকম ভিড়ের এই কলকাতায় মাদার থেরেসা কোনো এক অস্পষ্ট শূন্যতা পূরণ করে ফেলেছেন বোধহয়। তিনি যেন আমাদের এই নাগরিক জীবনের এক ধরনের ভরসা হয়ে উঠেছেন—সে বিষয়ে আমরা খুব সচেতন না হলেও। নোবেল পুরস্কারের ঐতিহ্য ও স্বীকৃতি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে একজন যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন তাঁর কর্মের পরিধি ও গভীরতায় নতুনতর তাৎপর্য আসে। আমাদের দৈনন্দিনে-সামাজিকে এমন জড়িত কেউ যখন পান, তখন কোনো-এক-ভাবে আমাদেরও তা স্পর্শ করে। এই স্বীকৃতি তাঁর ভবিষ্যৎ-কর্মকে প্রভাবিত করবে—তাতেও আমরা হয়তো প্রভাবিত হবো। মাদার থেরেসার এই পুরস্কারের সঙ্গে তাই কলকাতাবাসী আমাদের যোগ অনিবার্যতই বড় ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীর কাছে তাঁর পরিচয়ও তো কলকাতার মাদার থেরেসা বলে।

এ পুরস্কারে উল্লাসের যে বাঙালি কলকাত্তাই বিস্ফোরণ ঘটতে পারত, তা কিন্তু ঘটে নি। বামফ্রন্ট সরকার জনসংবর্ধনা দিয়েছেন, সামাজিকভাবে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাঙ্গণে, রবীন্দ্র সদনে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা

প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিম। তবু যেন মনে হলো, কলকাতা তত উচ্ছ্বসিত হলো না—আনন্দিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

তার কারণ কি নিহিত আছে—খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসেরই ভেতর, গত প্রায় তিনশ-সাড়ে তিনশ বৎসরে সে ইতিহাস তো উচ্চতর-নিম্নতর সংস্কৃতির মহাজন আর গ্রহীতার। আজও ভারতবর্ষের আদিবাসীদের ভেতর মিশনারীদের কাজকর্ম আমাদের জাতীয়তা-বোধকে নিয়তই অপমান করে চলে।

তার কারণ কি নিহিত আছে—মাদার থেরেসার সেবাকর্মের এই প্রয়োজনের মধ্যে আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের গত তিরিশ বছরের নিদারুণ ব্যর্থতাই যে প্রমাণিত হয়ে থাকে তার ভেতর। এখনো আমাদের দেশের মানুষ মরবার ঠাঁই পায় রাজপথে। এখনো আমাদের দেশের শিশু তার বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

তার কারণ কি নিহিত আছে—নোবেল পুরস্কার ইত্যাদি গোছের স্বীকৃতিতে এক জাতিগত হীনমন্যতাবোধে যে আমাদের বাধ্যতই ভুগতে হয় তার ভেতর। এক মার্কিনি সাপ্তাহিকে দেখা গেল—কোন দেশ কোন বিষয়ে কতবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তার গর্বিত তালিকা। তাই আমাদের দেশের ছেলে, খোরানা, বিদেশে গিয়ে নোবেল বিজয়ী হলে আমরা উল্লসিত হতে পারি না—কোথায় এক পরাজয় আমাদের আঘাত দেয়। আবার, বিদেশিনী আমাদের দেশের মানুষ হয়ে উঠে নোবেল বিজয়ী হলেও আমরা উল্লসিত হতে পারি না—কোথায় এক ব্যর্থতাবোধ আমাদের পীড়ন করে।

কেমন অনুমান করতে ইচ্ছে হয়—মাদার থেরেসা বোধহয় আমাদের এই মনটাকে চেনেন। নইলে, কেন তিনি বেছে নেবেন কলকাতা শহরকেই—সাম্রাজ্যের প্রথম শহরকেই। কেন তিনি সাম্রাজ্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত চার্চের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলির বাইরে তাঁর একাকী কাজ শুরু করলেন? তাঁর কর্মিনীদের জন্য নেবেন কলকাতার জমাদারনির পোশাক?

তাঁর কাজগুলোতেও ঘটে যায় কি এই কল্পনারই সম্প্রসারণ। অনাকাঙ্ক্ষিত জন্ম আর উপেক্ষিত মৃত্যু—এই তো তাঁর কাজের প্রধান দুটি জায়গা। সব জন্মের জন্য অপেক্ষিত হাসি আর সব মৃত্যুর জন্য অপেক্ষিত চোখের জল—এই তো তাঁর ব্রত। তাঁর কাজ যেন কবিতা হয়ে ওঠে ব্রতের এই কল্পনায়।

আমাদের পক্ষে এ কবিতা তো শোকেরই কবিতা। আমাদের এই

দেশ আর এই সমাজ এখনো বদলানো যায় নি বলেই তো তাঁর মতো মহিয়সীর এমন দুঃখব্রত ! আমাদের তো তিনি শ্মশানবন্ধু—চোখের জল, শোক আর উপায়হীন পরাজয়ে সে বন্ধু আমাদের কত ভরসা ! কিন্তু শ্মশানে তো উল্লাস আসে না।

দাদার খেরেসা তাঁর কর্মের কবিতা দিয়ে আমাদের এই অনুভবকেও নিশ্চয় স্পর্শ করতে পারবেন।

দেবেশ রায়

বরেণ্য কবি মুহম্মদ ইকবালের জন্মশতবার্ষিকী

আমাদের উপমহাদেশের বিশিষ্ট বরেণ্য কবি ইকবালের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে আমরা শরিক।

কবি ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথকে একসময়ে ভারতমাতার দুইচোখ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। কবি ইকবালের জন্ম গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষে এবং মৃত্যু বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের মাঝামাঝি সময়ে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মতোই, কবি ইকবালকেও, উপমহাদেশের নিপীড়িত মানুষের মহাজাগরণের বাণীবাহী হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত এবং অবনত ও অপমানিত শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের অধিকারের সনদ নিয়ে সন্ধান পেয়েছিল। আমরা কবি ইকবালের মৃত্যুর চারদশক পরেও তাঁকে প্রাণবন্ত করেই পাচ্ছি, কারণ, ১৯২১ সালের গণ অভ্যুত্থানের মুখে ইকবাল যে শ্রমজীবীদের 'খিজর-ই-রাহ' কবিতায় স্বাগত জানিয়েছিলেন নতুন পৃথিবী গড়ার জন্যে, তারা আজ গত চল্লিশ বছরের নানারকম বিভ্রান্তি কাটিয়ে সমাজতন্ত্রের অবস্থান নিতে যাচ্ছে। সেই সময়ে ইকবাল একটি কবিতাতে লিখেছিলেন।

'জনগণের জাগরণের গান প্রচুরপ্রচুর আনন্দের।
আলেকজাণ্ডার আর জারের স্বপ্নার্ত কাহিনী নিয়ে—
আর কতকাল চলবে ?
পৃথিবী থেকে একটা নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে।
হে স্বর্গ, যে সব তারা অস্ত গিয়েছে
তাদের জন্যে আর কান্না কেন ?
মানুষের স্বভাব ভেঙে ফেলেছে
সমস্ত বন্ধন ও শৃঙ্খলকে।

যে স্বর্গ হারিয়ে গেছে তার জন্যে
আদম আর কতকাল কাঁদতে পারতো ?
হে আমার পৃথিবীর দরিদ্রেরা
ওঠো, জাগো
অভিজাতদের প্রাসাদের তোরণ
আর দেয়ালকে কাঁপিয়ে দাও।
জলন্ত বিশ্বাসে
ক্রীতদাসের রক্তে জাগে অগ্নিশিখা।

(কুরবত্‌উল আইনের ইংরেজী অনুবাদ থেকে)

ইকবাল ছিলেন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী আধিবিদ্যা ও দর্শনের সাধক ও শিক্ষক। সুতরাং উচ্চমার্গের ভাববাদী জ্ঞান ও দর্শন তাঁর কাব্যেও প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে প্রাচ্যের নিপীড়িত বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষের দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। দরিদ্র ও রিক্তের বাস্তব দুঃখই তাঁকে দেশপ্রেমিক ও বিদ্রোহী করেছিল। তাঁর কবিতায় ও গানে নানাভাবে নানাসময়ে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন দেশপ্রেম ও বিদ্রোহকে। পরাধীনতা, ক্লৈব্য ও দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণ অনৈক্য ও ভেদবিভেদকে দূর করে নিজেদের গলদগুলোকে দূর করার জন্যেই তিনি লিখেছিলেন 'নয়া শিবালয়'। সঙ্গে সঙ্গেই জুলুমবাজ ইউরোপীয়-সাম্রাজ্যবাদীদের বা ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। রুশ বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা মার খেয়েছিল বলে ইকবাল লেনিনকে এবং শ্রমজীবীদের অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর ভাববাদী দর্শন এক্ষেত্রে বাধা হয় নি। অবনত প্রাচ্যের জনগণের প্রতি মমতার সূত্রেই ইকবাল অবনত মুসলমান সমাজের জন্যে গভীর বেদনা অনুভব করতেন। এই বেদনার কাব্যিক রূপ 'শেকোয়া' বা অভিযোগ।

এই 'শেকোয়া' কাব্যে ইকবাল খোদার কাছে মুসলিমসমাজের দুরবস্থার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন বলে রক্ষণশীলরা ইকবালকে দারুণভাবে আক্রমণ করেছিল। ইকবাল এরপরে 'জবাবে শেকোয়া' লিখে অবনতির দায়িত্বটা নিজেই গ্রহণ করেন।

এরপরে লোকায়ত ব্যাপার ছেড়ে ইকবাল 'আত্ম' ও 'অধ্যাত্ম'তত্ত্বের সন্ধানে ও নির্ণয়ে নিমগ্ন হন। উর্দু ছেড়ে ফার্সীতে 'আসরারে খুদী' এবং 'রমুজে বেখুদী' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে ইকবালের

'খুদী' বা 'অহং'তত্ত্ব। এখানে রয়েছে মানুষের অতি-মানুষ হতে পারার সম্ভাব্যতার দর্শন।

এই তত্ত্বে অবস্থান করেও ইকবাল আবার লোকায়ত কাব্যের ধারার কাজ করতে পরাঙ্মুখ হন নি। বস্তুতপক্ষে, বিশের দশক এবং তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইকবাল উর্দু কাব্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'বালে জিব্রিল' বা 'জিব্রাইলের ডানার' সমস্ত কবিতাই মানবতার নতুন রং-এ রাঙানো। সে রং সমাজতন্ত্র।

উপরোক্ত দুটো অবস্থান নিয়েই ইকবালের কাব্যসমগ্র। যাঁরা ইকবালকে সমাজবিপ্লব থেকে আলাদা করে দেখতে চেয়েছেন তাঁরা ইকবালের 'খুদী' দর্শনকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রাচ্যের ক্রন্দন ও বিদ্রোহ এবং সমাজতন্ত্র ও শ্রমজীবীদের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইকবালের কবিতাকে গৌণ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ইকবাল যে শেষের দিকে লোকায়তে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেই ঘটনাটাকেই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে রক্ষণশীলেরা। সামগ্রিকভাবে ইকবাল কাব্যের যে-লোকমুখিতা, তাকে এই জন্যেই যথাযোগ্য ভাবে সামনে আনা দরকার।

ইকবালের উচ্চ অধ্যাত্ম দার্শনিক চিন্তার দিকটাকে তাঁর কাব্যের অন্যতম উপাদান বলে ধরে নিয়েই আমরা তাঁর বিদ্রোহাত্মক ও বিপ্লবাত্মক লোকায়ত দিকটাকে বড করে দেখব।

উর্দু কাব্যের আধুনিক বিদ্রোহী শিল্পীরা তাঁকে এইভাবেই দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন।

মখদুম মহিউদ্দীন ইকবালকে তাঁর একটি কবিতায় 'প্রাচ্যের জাগরণের অগ্নিকণ্ঠ কবি' বলে অভিহিত করেছিলেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তাঁর 'ইকবাল' প্রশস্তিতে লিখেছেন :

আমাদের দেশে এসেছিল
সুকণ্ঠ দরবেশ এক, তারপর
চলে গিয়েছিল আপনার
সুরে গড়া গজলের মালা রেখে।
যেখানে দাঁড়িয়েছিল দরবেশ
সেইখানে
কচিৎ কারুর চোখ পৌঁছেছিল,

কিন্তু তার গানগুলি
প্রবাহিনী হয়ে নেমেছিল
হৃদয়ে সবার।
এসব গানের
উদ্‌যোক্তা চিরঞ্জীব।
এইসব গান
যেন অগ্নিশিখা।

কবি শামসুর রাহমান পঞ্চাশৎ বর্ষে

বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবি শামসুর রাহমান পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। তাঁর কাছ থেকে আমাদের আরও অনেক পাওনা রয়েছে। আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রগতির ধারার একজন অক্লান্ত শিল্পী হিসেবে তিনি দুই বাংলারই প্রিয়।

১৯৪৮ সালে ১৯ বছর বয়সে, চমক লাগানো প্রেমের কবিতা 'রূপালি স্নান' লিখে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তের ছোঁয়ায় বিদ্রোহী ও আশাময়ী হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। এরপরে দুই দশক ধরে বিশ্বের আধুনিকতম কাব্যের এবং বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন একটি নিজস্ব কাব্যকক্ষে। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় একদল তরুণ কবির একজন হিসেবেও একটা ধারা নিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি। ইংরাজী সাহিত্যের স্নাতক শামসুর রাহমান আধুনিক ইংরাজী কবিতার প্রতি আকৃষ্ট। তবে ক্রমে ক্রমে পল এলুয়ার প্রভৃতির আকর্ষণ তাঁর কাছে বেড়ে গেছে। বাংলা কবিতার শিল্পী হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িককে তিনি বস্তু ও ভাবের দিক থেকে জোরের সঙ্গেই সামনে এনেছেন। মাটিতে পা আছে তাঁর শামসুর রাহমান যে ঢাকা নগরীর বাসিন্দা, সেকথা উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। ৬৮-৬৯ সালের বাংলাদেশের গণঅভ্যুদয় শামসুর রাহমানের কাছ থেকে আদায় করেছে 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' এবং ফেব্রুয়ারী

উনসত্তর'-এর মতো গণবিপ্লবাত্মক কবিতা। তাঁর 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' কবিতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই কবিতাটি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলির একটি।

অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী শামসুর রাহমান অন্তর ও বাহিরের, স্বদেশ ও বিশ্বের, বিমূর্ত ও মূর্ত এবং ব্যক্তি ও জনতার টানাপোড়েন ও আকর্ষণ-বিকর্ষণে সাড়া দিয়ে আসছেন গত তিরিশ বছর ধরে। ষাটের দশকের শুরুতে প্রকাশিত তাঁর কবিতা-সংগ্রহ 'রৌদ্র করোটিতে' থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' পর্যন্ত তাঁর সমস্ত বইতে এই জন্যেই রয়েছে বৈচিত্র্য। এর মধ্যে অন্তর্বিরোধ রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। ধ্রুপদী এবং আধুনিক বাংলাকাব্যের কাঠামোকে ভাঙচুর না করে তার মধ্যে অভিনব শব্দ ভরে দেবার ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত তৎসম এবং ইংরেজী শব্দের সঙ্গে মাঝেমাঝেই অতর্কিতে সাক্ষাৎ হয় তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে। তবে সমস্ত ব্যাপারেই আতিশয্য পরিহারের পন্থী শামসুর রাহমান এই ধরনের শব্দ ব্যবহারকে একটা শৈলীতে পরিণত করেন নি। এই জন্যে সাধারণভাবে তাঁর কবিতা রীতিমতো আটপৌরে। তাঁর অধিকাংশ বইএর নাম বিমূর্ত ধরনের হলেও বিষয়বস্তু এবং বাণী একান্তভাবেই মূর্ত। সর্বোপরি শামসুর রাহমান মানবতাবাদী। লোকজনের কাছ থেকে সরে যেতে চাইলেও সরতে পারেন না। তাঁকে আমরা এইভাবেই আরও প্রসারিত ও ঘনিষ্ঠ এবং হৃদয়গ্রাহী দেখতে চাই।

শামসুর রাহমান বছর কয়েক আগে একটি কবিতাতে লিখেছেন :

> 'তারা ক'টি যুবা হিংস্র যুদ্ধে
> ভাবে না কখনো জিৎকার, হার কার ?
> দেয়ালে দেয়ালে শুধু সেঁটে দেয়
> লাল গোলাপের নতুন ইস্তাহার।'

কবির কাছে আমাদের ফরমায়েস রইলো অজস্র লালগোলাপের—আগামীতে দুর্দিনে—সুদিনে। প্রগতিবাদীদের অবশ্যই জিততে হবে। লালগোলাপ তারই প্রতীক।

রণেশ দাশগুপ্ত